রহস্য সপ্তক

রহস্য সপ্তক

সম্পাদনা : কমল চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫

প্রকাশক :
শান্তনু ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স
৫৯/১বি পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
সুনীলকুমার ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী প্রিণ্টার্স
৫৯/২ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস ও রহস্য কাহিনী

পঞ্চশর
নির্মলেরা খুন হচ্ছে
ত্রিভুজে রক্তের দাগ
নিখোঁজ নায়িকা
ফুলে গন্ধ নেই
রত্নহার রহস্য
শ্রীমতী ভয়ংকরী
কনেবিভ্রাট
পরমপ্রেমী
কাঞ্চন অভিলাষ
প্রতিনিয়ত
পাপঅপাপ
গ্রীক প্রেমকথা
গ্রীক ট্র্যাজেডি
ছোটদের ইলিয়াড
ছোটদের অডিসি
হীরের বুদ্ধ
পঞ্চমপিতা
তখন রাত বারোটা
খুনটা হতে পারতো
সোনার প্যাঁচা
শতরূপে নারী
স্বৈরিণী
ইতিহাসের জ্যান্তভূত
আয়তি নিরুদ্দেশ
পরগাছা
ভাঙ্গাদূর্গ-ভয়ংকর
আড়ালে অন্যখেলা

নাটক ও নাটিকা

খাঁচার পাখি
পদ্মপাতায় জল
গোপন সত্য
ওলট পালট
মধুরেণ
ছন্দপতন
কনেবিভ্রাট
শ্রীমান নাবালক
নির্ভিক সমিতি
সংকার
আগন্তুক (শ্রুতি)
বউ কথা কও
বাজনিদ্রা
রঙ্গ ব্যঙ্গ একাংক
অশোকার অসুখ
নাতজামাই
নো প্রবলেম
এই আমি
আশানিরাশা
তেলে ঝোলে অম্বলে
চমৎকার সুন্দরী
একাংক ছয়রঙ্গ

সূচীসম্ভার

কুলাঙ্গার

নীলেব যে হঠাৎ কি হয়েছে বুঝতে পারছি না। ইদানীং কেমন যেন ও বোবা হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর হুঁ-হ্যাঁ উত্তর দিয়ে চুপ করে যায়। বেশির ভাগ সময় একা একা বসে থাকে। আর, কারণে-অকারণে একটা আপাত অর্থহীন ছড়া আউড়ে যায়। ছড়াটার মাথামুণ্ডু কিছুই আমার বোধগম্য হয় না।

কনকনে শীতের সন্ধ্যা। কিছুক্ষণ আগেই বাগানের পশ্চিম দিকে ঝাঁকড়া-মাথা নিমগাছটার ফাঁক দিয়ে সূর্যটা বিদায় নিয়ে গেছে। শীতকালে কখন যে টুপ করে সন্ধে নেমে এসে দিনের আলোটা নিভিয়ে দেয় বোঝাই যায় না।

নীলের ছোট্ট ঝুলবারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে ওর সদ্য কেনা মডার্ন ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশনের ইন্টারেস্টিং একটা চ্যাপ্টার গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলাম।

নীল আমার সামনের চেয়ারটায় ওর গাঢ় সবুজ রঙের শালটা লম্বালম্বি বুক থেকে পা পর্যন্ত চাপা দিয়ে একের পর এক ফিল্টার উইলস্ শেষ করে চলেছে আর মাঝে মাঝে সেই ছড়াটা আওড়াচ্ছে,

-ব্যাং বাদুড়ের একটা কিছু দিলে, এক্ষুণি আমি ফেলবো তাকে গিলে।

এই নিয়ে বার দশেক ও ছড়াটা আওড়াল। কেবল আজ না, দিন সাতেক হল ঐ ছড়াটা ছাড়া ওর মুখে অন্য কোন কথা নেই। একদিন তো আমার সামনেই ওদের সাইকেল হাউসের একজন খদ্দেরকে ছড়াটা বলে বসল। লোকটা বোধ হয় কোন গ্রাম্য ক্রেতা। বেচারি একটা সাইকেল পছন্দ করে দামটা একটু কমাতে বলেছিল। তা সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে নীল দুম করে বলে উঠল,—ব্যাং বাদুড়ের একটা কিছু দিলে, এক্ষুণি আমি ফেলবো তাকে গিলে।

লোকটা হাঁ করে খানিকক্ষণ নীলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, —মাথার ব্যামো নাকি?

তারও উত্তরে নীল বলেছিল,—ব্যাং বাদুড়ের একটা কিছু দিলে, এক্ষুণি আমি ফেলবো তাকে গিলে।

শেষ পর্যন্ত লোকটা রেগে গিয়ে, 'ভারি ছ্যাঁচড়া লোক' এবং 'ভদ্রতা সভ্যতা শেখেনি' বলে চলে গিয়েছিল। নীল কিন্তু নির্বিকার।

অনেকবার আমিও চেষ্টা করেছিলাম ওর কাছ থেকে ছড়াটার মানে জানতে। কিন্তু আমারও সেই লোকটার মত, ছ্যাঁচড়া এবং ভদ্রতার বালাই নেই বলতে ইচ্ছে করেছে বার বার। নীল তথৈবচ।

আজ বিকেল থেকে তো বেশ ঘন ঘন ছড়াটা আওড়াচ্ছে।

—নাহ্, বিরক্তিকর, বলে আমি বইটা বন্ধ করে উঠে পড়লাম। বরং এর থেকে রান্নাঘরে গিয়ে তপার মার কাছ থেকে শুক্তোয় কি কি মশলা লাগে অথবা আলুবখরার চাটনিতে কতটা গুড় দিতে হয়, নাকি চিনি, এসব শিখে রাখলে পরে প্রয়োজনে কাজে লাগবে।

নীলকে পাশ কাটিয়ে চলে আসছি। হঠাৎ ও আমার চাদরের খুঁটটা চেপে ধরল।

—বোস, বোস। রাগ করে যাচ্ছিস কোথায়?

—তপার মার কাছে রান্না শিখতে।

—ওটা তোর দ্বারা হবে না। বরং বোস। একটু গল্প করি।

— সেকি গোয়েন্দাপ্রবর! গল্প করার মতো মন আর মেজাজ এখনও তোমার আছে নাকি?

—আছে, আছে। নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কি জানিস বড় অবহেলায় সময়টা বয়ে যাচ্ছে। কিছুই করা হচ্ছে না।

—তাই বুঝি আবোল-তাবোল বকছিস?

—কি করব বল? কাজ না থাকলে মাথাটা ডেভিলস্ ওয়র্কশপ হয়ে যায়। তখন ঐ সব হাবিজাবি কথা বেরিয়ে আসে।

— তোর আবার কাজের অভাবটা কোথায় শুনি? অমন একটা শাঁসালো ব্যবসা দেখে আর সময় থাকে কারো হাতে?

হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিতে দিতে নীল বলল,—ভাল্লাগে না, একদম ভাল্লাগে না। কেবল দোকানদারি করতে কাঁহাতক ইচ্ছে করে বল তো?

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললাম,—কিন্তু কি করতে ইচ্ছে করে তাই তো বলবি?

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে নীল বলে উঠল,— কেবল খেতে ইচ্ছে করছে। নেমন্তন্ন খেতে। বিয়ে-বাড়িতে পাত পেড়ে।

এবার আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। নেমন্তন্ন খেতে চাইছে নীল! আশ্চর্য! আমি যতদূর ওকে জানি, পারতপক্ষে ও কখনোই কোন কাজবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যায় না। বরাবরই এটা-সেটা অজুহাত দেখিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। সেই নীল বলে কিনা নেমন্তন্ন খেতে ইচ্ছে করছে! খানিকটা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম,—তোর কি আজকাল মাথার ব্যামো-ট্যামো হয়েছে?

সজোরে মাথা নেড়ে নীল বলল,—না, একদম না। ব্যাং বাদুড়ের একটা কিছু দিলে, এক্ষুণি তাকে ফেলব আমি গিলে। আসলে কি জানিস, চিরকেলে ভেতো বাঙালির ছেলে। বিয়ে-বাড়ির ফুলকো লুচি আর সেন্টের পাঁচমিশেল একটা গন্ধ না পেলে মনে হয় বাঙালির ছেলের জাত গিয়েছে। আচ্ছা অন্তু, তোর একদম ইচ্ছে করে না মাটিতে বসে কলাপাতা সাজিয়ে লুচি বেগুন-ভাজা থেকে দই মিষ্টি দিয়ে এক একদিন রাতের খাওয়া সারতে? ক্যাটারারের রান্না এবং টানা টেবিল চেয়ারে বসে নয় কিন্তু।

—কিন্তু ব্রাদার, লুচি, বেগুনভাজা, ছোলার ডাল এসব মেনু তো আজকাল পাল্টে যাচ্ছে। এখন খাদ্যগুলিই তো প্রায় ভিনদেশীয়। কিন্তু এসব ব্যাপারে তো তোর কোনদিনও ইন্টারেস্ট ছিল না।

— ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন মনে হল, অনেকদিন আমাকে কেউ নেমন্তন্ন করেনি। তবে কি কলকাতা শহরে আমাকে নেমন্তন্ন করার মতো কোন বন্ধুবান্ধব নেই? এই কমপ্লেক্সটা যেদিন থেকে গ্রো করেছে, সেদিন থেকেই কেমন যেন ভেতরে ভেতরে একটা খাই খাই ভাব এসে গেছে।

—আর তাই ব্যাং বাদুড় যা পাবি তাই গিলে খাবি?

—খাব। আলবত খাব। চাঁদের পাহাড়ে মনে নেই, তেষ্টায় ছটফট করতে করতে শঙ্কর ত্রিশ বছরের পুরনো পোকা-কিলবিলে কালো জলই ঢকঢক করে খেয়ে নিল। তার ওপর, এটা কি মাস বল তো?

—মাঘ।

—চোখ বন্ধ করে নাক খুলে যে কোন রাস্তায় হেঁটে যা, কেবল লুচি ভাজার গন্ধ ছাড়া আর কিছু পাবি না।

— নারে, আরও অনেক কিছু গন্ধ পাওয়া যায়। ফ্রায়েড রাইস, চিলিচিকেন কিংবা বিরিয়ানি, বললাম না মেনু পাল্টেছে...রুচি পাল্টাচ্ছে। তুই বরং এক কাজ কর। এবার একটা বিয়ে কর।

— তোর মাথায় গোবর পোরা। নিজের বিয়েতে কেউ পাতা পেড়ে খাদ্যরসিক হতে পারে?

— বেশ তো, তোর অনারে না হয় আমিই বিয়েটা সেরে ফেলছি। সোমেন জেঠু তো পা বাড়িয়েই আছেন।

—না রে, সে হয় না। তোর বিয়েতে আমাকে খেটে খেটে হয়রান হতে হবে। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না!

—কি?

—অজন্তা বা রেখার একটা বিয়ে লাগিয়ে দিলে কেমন হয়?

আমি কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল রিরিরিং শব্দে।

—নেমন্তন্ন, বলেই নীল তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ফোন ধরল।

বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছিল, পা থেকে হাঁটু পর্যন্ত কে যেন বরফ ঘষছে। আসলে

ডংপাতা বাঘের মত শীতটা শহরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আচমকা। কুয়াশার চাদরে মোড়া বাইরের অন্ধকারটাও বেশ গভীর মনে হচ্ছে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। প্রায় সওয়া সাতটা। বাইরেটা দেখে কে বলবে রাত এত কম? চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে চলে এলাম। নীল তখনও ফোনে কথা বলে চলেছে। এরই ফাঁকে আমি নিচে গিয়ে তপার মাকে দু'কাপ কফির কথা বলে এলাম।

ফিরে এসে দেখি নীল ওর ওয়ার্ডরোবের সামনে দাঁড়িয়ে জামাপ্যান্ট বার করছে। সামনের সোফাটায় আমি বসতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ নীল বলে উঠল,—না রে, আর বসবার সময় নেই। এক্ষুণি বেরুতে হবে।

—এই ঠাণ্ডার মধ্যে আবার বেরুবি কোথায়? কে ফোন করেছিল?

—স্ট্রেইট্ লায়ন। তুই বোস। আমি রেডি হয়ে আসছি।

—কিন্তু, কি ব্যাপার?

—নেমন্তন্ন। বিয়ে-বাড়িতে।

—তার মানে?

—ঐ যে ব্যাং বাদুড়ের একটা কিছু দিলে, এক্ষুণি আমি ফেলবো তাকে গিলে! কেউ বোধ হয় ব্যাং বাদুড় কিছু ছড়িয়েছে। আর সেটা আমাকেই গিলতে হবে। ডাক দিয়েছেন স্ট্রেইট লায়ন।

—হেঁয়ালি রেখে কি হয়েছে বলবি তো?

—বলব। যেতে যেতে।

নীল চলে গেল। জামাকাপড় পালটাতে। এই এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি। কোন কথাই আজকাল সহজ আর সরল করে বলতে পারে না। সব কিছুতেই একটা হেঁয়ালি পুষে রাখা। ডাক দিয়েছেন স্ট্রেইট লায়ন। স্ট্রেইট লায়ন অর্থাৎ সরল সিংহ। ইনস্পেক্টর সরল সিংহ। তার মানে পুলিসি ব্যাপার। নিশ্চয়ই খুনখারাপি। এই সরল সিংহের ওপর আমার মাঝে মাঝে বেশ রাগ জমে ওঠে। নিজে যে কেসটা জটিল মনে করেন, সঙ্গে সঙ্গে এত্তেলা পাঠান নীলকে। সিংহীমশাই ভালো করেই জানেন, নীল মুখে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও রহস্য ওর ভালো লাগে। যে কোন কেসের জটিল জট ছাড়িয়ে আসল ক্রিমিন্যালটিকে খুঁজে বার করতে ওর দারুণ ইন্টারেস্ট। আর এই দেখতে-বোকা অথচ চতুর সিংহীমশাই ঠিক ঠিক সময়ে নীলকে তলব করেন।

স্ট্রেইট লায়ন নামটা নীলের দেওয়া। সিংহীমশাই-এর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল নীলের জামাইবাবু পুলিস অফিসার সত্যেন মুখার্জির বাড়িতে। গতবার অজয় সামন্তর হত্যারহস্য ভেদ করার পর সত্যেনদার বাড়িতে বসে নীল ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিল কেমন করে ও কেসটা সলভ করেছে। এমন সময় সিংহীমশাইয়ের রাজকীয় আবির্ভাব ঘটে।

এসেই হম্বিতম্বি হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছিলেন,—দাদা, এসে পড়লুম। বৌদি একটু চা হয়ে যাক।

বয়েসে বোধ হয় সত্যেনদাই ছোট হবেন। কিন্তু পদমর্যাদার জন্যে সিংহীমশাই সত্যেনদাকে দাদা বলে ডাকেন, তা আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি। খানিকটা তেলটেল দেওয়া আর কি।

বিশাল শরীর নিয়ে ভদ্রলোক আমার পাশেই সোফাটার তিন ভাগ জায়গা দখল করে বসেছিলেন। আমি একটু সরে ওঁকে ভালো করে বসার জায়গা করে দিয়েছিলাম।

মাথা থেকে টুপিটা খুলে 'আহ' বলে রুমাল দিয়ে টাকটা মুছে ভদ্রলোক দুনিয়ার গল্প শুরু করলেন। অধিকাংশই খুন, নাবালিকা হরণ, আর বিধবার সম্পত্তি ঠকানোর রোমাঞ্চকর গল্প। পুলিসের নিষ্ক্রিয়তা কিংবা অধঃপতনের জন্য অনুযোগের আর শেষ ছিল না তাঁর। তিনি নিজের কথাতেই ব্যস্ত। আর আমরা দুজন, অর্থাৎ আমি আর নীল যে এতক্ষণ ওঁর সামনে নীরবে বসে আছি সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপই ছিল না। আমার মনে হয়েছিল, অবাঞ্ছিত আমাদের তিনি তেমন কোন মূল্যই দিতে চান না। ভদ্রলোকের এই অহঙ্কারী মেজাজটা আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। তবু ওঁর দিকে ভালো করে না তাকিয়ে পারিনি।

নিপাট ভালোমানুষের মত মুখে একটা অদ্ভুত বোকামি ছড়িয়ে রয়েছে। মাথা জোড়া বিশাল টাক

অচঞ্চল মরুভূমির মত। রুক্ষ না, তৈলাক্ত। সেতারের ছেঁড়া তারের মত দু'একটা সাদা চুল সামনের দিকে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। মরুভূমিটা ঘোড়ার খুর-এর মত অর্ধবৃত্তাকারে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে পিছনাংশে। মনে হয় সিংহীমশাই প্রাণপণে ঝোপের বেড়া দিয়ে টাকের সীমানা আর বাড়তে দেবেন না ঠিক করেছেন। সাদা ঘোলাটে মার্বেলের গুলির মতো চোখ দুটো ছিটকে বেরিয়ে আসার তালে রয়েছে। অত বড় চোখ, কিন্তু বুদ্ধির তেমন ছাপ পাওয়া যায় না। বড়ির মতো গোল নাকের নিচে কর্পোরেশনের নোংরা ঠেলা ব্রাশের মতো ঝাঁটা গোঁফের কি বাহার! নেই-থুতনিই বলা যায়। কারণ, সামান্য একটা রেখা ছাড়া গলা আর থুতনি মিলেমিশে সব একাকার। পুলিসি মোটা য়ুনিফর্মের আড়ালেও অমন মেদের আধিক্য চেপে রাখা যায় না। পেটের মাপটা ছাপ্পান্ন-টাপ্পান্ন বোধ হয় ছড়িয়ে যাবে। সব থেকে যেটা বিরক্তিকর, সেটা হল ওঁর একঘেয়ে বকবকানি। বকতে শুরু করলে থামতে চান না। আর তার অধিকাংশই নিজের বাহাদুরী সম্বন্ধীয়। পরে জেনেছিলাম, পুলিসি লাইনে উনি তেমন সুবিধে করতে পারেননি। কোন জটিল কেস হলে তো প্রশ্নই নেই। সাধারণ কেসেও বিশেষ তৎপরতা দেখাতে পারেন না। আমার মনে হয় ঐ বিশাল পাহাড়ের মত দেহ নিয়ে চোর-টোর ধরা সম্ভব নয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পৌঁছতে অপরাধী অনেক আগেই নিপাত্তা হয়ে যাবে। এবং যায়ও। তাই আজও সাধারণ ইন্সপেক্টর থেকে উপরে ওঠার স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কিছুই হয়ে ওঠেনি। ভদ্রলোক যখন নিজে থেকে আমাদের সম্বন্ধে কিছুই কৌতূহল দেখালেন না, তখন সত্যেনদাই বাধ্য হয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আর সেই আলাপ করানোই হল কাল। কারণে-অকারণে ভদ্রলোকের আবদার যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে লাগল।

সত্যেনদার মুখে নীলের সামান্য পরিচয় পেয়েই ভদ্রলোক তাঁর বিশাল শরীর নিয়ে কদমতলায় নৃত্যরত হস্তির মতো সোফাটার ওপর বসে বসেই নাচ শুরু করে দিলেন। দৈত্যের থাবার মতো বিশাল পাঞ্জা দিয়ে নীলের হাতটা চেপে ধরে বলেছিলেন,—কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য! এমন একটি ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হল, ভাবতেই কেমন শিহরন হচ্ছে। কাগজে তোমার, ভায়া হে, তোমাকে আর আপনি বললুম না। আমার থেকে অনেক ছোট তো, তা তুমিতে আপত্তি নেই তো?

হালকা হেসে নীল বলেছিল,—আপত্তি করার সময় দিলেন কোথায়? তবে ওটাই চলুক।

আগের কথার বেশ টেনে সিংহীমশাই বলেছিলেন,—হ্যাঁ, কি যেন বলছিলুম, মনে পড়েছে। কাগজে তোমার কীর্তিকলাপ পড়ে মনে হয়েছিল জিনিয়াস। এ রকম ইয়াংম্যানরা পুলিসে না এলে ক্রিমিন্যালরা টিট্ হবে না। সেদিন থেকেই তোমার সঙ্গে আলাপ করবার ভয়ংকর ইচ্ছে হয়েছিল।

এই সময় ফস্ করে আমি বলে ফেলেছিলাম—ভয়ংকর কথাটা এক্ষেত্রে কি ঠিক হবে?

মার্বেলের গুলি অগ্নিবর্ণ হয়ে আমার দিকে তেড়ে এসেছিল,—এ ছোকরাটি কে দাদা?

উত্তরটা নীলই দিয়েছিল,—আমার বন্ধুও বলতে পারেন, ভাইও বলতে পারেন।

ঠোঁটের কোণে এক চিলতে অনুকম্পা আর তাচ্ছিল্য মিশিয়ে উনি প্রশ্ন করেছিলেন,—ভয়ংকরটা হবে না কেন শুনি?

—না, মানে, আমতা আমতা করে বলেছিলাম, কথাটার মধ্যে একটা ভয়াবহ ইঙ্গিত থাকে তাই বলছিলাম।

—তা হলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টার্মটা কি হবে শুনি?

—আপনি 'খুব' শব্দটা ব্যবহার করতে পারেন।

—ও দুটোর মানে একই। খুবও যা, ভয়ংকরও তাই। তা কি করা হয়?

—আমি একটা কলেজে পড়াই।

—মাস্টার? তা নইলে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠর তফাত বোঝ না? বাংলার নিশ্চয়ই?

—ঠিক ধরেছেন।

—ধরবই! হ্যাঁ, যা বলছিলুম,

সেই থেকে ভদ্রলোক আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। যতবারই এর পর দেখা হয়েছে, কিছু

না কিছু কারণে খিটিমিটি লেগেইছে। নীল যে কেন এ লোকটাকে পাত্তা দেয় বুঝি না। এই হাড়-কাঁপানো শীতের সন্ধেয় কোথায় একটু আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে নীলের সঙ্গে আড্ডা দেব, তা না, এখন হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে যেতে হবে কোথায় কি হয়েছে তার তদারকি করতে।

মনে মনে ইতস্তত করছিলাম, যাব কি যাব না। বদখত একটা লোকের সঙ্গে সারাটা সন্ধে কাটাতে হবে ভেবে নীলের ওপরই রাগ হচ্ছিল। এমন সময় নীল একেবারে তৈরি হয়ে এলো। বলল,— নে চ, অনেক দেরি হয়ে গেল।

—কিন্তু কোথায় তা তো বলবি?

—বললাম না তোকে, নেমন্তন্ন। শ্রীধর রাই লেনের রামতনু লাহার বাড়ি। ওঁর মেয়ের বিয়ে। বেশি দেরি করলে আবার স্ট্রেইট লায়ন খেপে যাবে।

—ওর নাম স্ট্রেইট লায়ন না দিয়ে বেবি এলিফ্যান্ট দেওয়া উচিত ছিল। তুইও যেমন, মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ হাসিল করে নিচ্ছে।

—ঠিক বলেছিস। ব্যাঙ বাদুড়ের একটা কিছু দিলে, এক্ষুণি আমি ফেলব তাকে গিলে। কিছু বুঝলি?

— বুঝলাম। অনেক দিন রহস্য-টহস্য না পেয়ে গোয়েন্দাপ্রবরের ব্যাঙ বাদুড় যা হোক কিছু একটা খেতে ইচ্ছে করছিল। এই তো?

পিঠের ওপর ঠাস করে একটা চাপড় কষিয়ে নীল বলল,—কে বলে শালা তোর বুদ্ধি খোলেনি?

—তা সে যাই বলিস না কেন, তুই কিন্তু প্রোফেশনাল গোয়েন্দা হয়ে গেলি। চল, আর কি করা যাবে।

শীত-টীত ঝেড়ে ফেলে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, প্রায় পৌনে আটটা।

রামতনু লাহার বাড়িটা খুঁজে নিতে খুব বেশি বেগ পেতে হল না। গলির মোড়ে দাঁড়ালেই বিয়ের সাজে সাজা আলোকোজ্জ্বল বাড়িটাই প্রথম চোখে পড়ে। তবে রাস্তাটা খুব কম না। সেই নিউ আলিপুর থেকে শ্রীধর রাই লেন। নেহাত ছুটির দিন। তায় হাড়-কাঁপানো শীতের সন্ধে। রাস্তায় লোকজনও কম। জ্যাম-ট্যামও বেশি পড়েনি। নীলের হাতে স্টিয়ারিং থাকলে আর রাস্তা ফাঁকা পেলে পাখির মতো ও উড়ে যেতে পারে। এলোও তাই। প্রায় ঝড়ের মতো। অন্যদিন কতক্ষণ সময় লাগতো জানি না, কিন্তু সাড়ে আটটার আগেই আমরা বিয়ে-বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম।

গলির মুখ থেকেই কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। খুব একটা বেশি লোকের যাতায়াত চোখে পড়ল না। আশপাশের বাড়িগুলোর দরজায় বৃদ্ধ আর মেয়েদের ভিড়টাই প্রধান। কয়েকটা উঠতি বয়েসের ছেলেকে দেখলাম বাড়ির সামনে ভিড় করে রয়েছে।

গলিটা খুব একটা প্রশস্ত নয়। তবে বাড়িগুলো মোটামুটি পুরনো ধাঁচের। বেশির ভাগ বাড়িই সাবেকি আমলের একটা ঠাট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ বোঝা যায়, এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাই প্রাচীন কলকাতার বংশধর।

এ গলির মধ্যে নিঃসন্দেহে রামতনু লাহার বাড়িটাই সব থেকে বড়। কতটা বড় সেটা ঠিক বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তবে বেশ কয়েক কাঠা জায়গা নিয়ে যে বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে সেটা বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। লোহার গেট পেরিয়ে একটা ছোট্ট ঘাস-জমি। সেখানে সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। অতিথি অভ্যাগতরা ম্লান মুখে বসে রয়েছেন। প্রত্যেকের মধ্যে একটা ত্রস্ত চাঞ্চল্য। সেটা বোঝা যায় অতিথিদের হাবভাবে। এদের অনেকেই যে নেমন্তন্ন না খেয়ে বাড়ি ফিরে যেতে চান, সেটা একটা ছোট্ট জটলা থেকেই জানা গেল। লোহার গেটটার সামনে দুজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভেতর-বাড়ি থেকে কাউকেই তারা বাইরে যেতে দিচ্ছে না। আর তাই নিয়েই কয়েকজন বৃদ্ধের মধ্যে অসন্তোষের প্রতিক্রিয়া।

ছিপছিপে লম্বা এক যুবককে পাকড়াও করে বৃদ্ধেরা চলে যাবার দাবি জানাচ্ছেন। বিব্রত যুবকটি কোনমতে তাঁদের আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার জন্যে অনুনয়-বিনয় করে চলেছেন।

নীল আর ওখানে অপেক্ষা না করে ভেতর-বাড়ির দিকে পা বাড়াল। পিছন পিছন আমিও চলে এলাম। দরজার মুখেই আর একজন কনস্টেবল আমাদের পথরোধ করল,—অন্দর যানা মানা হ্যায়, বাবুজি।

মৃদু হেসে নীল জিজ্ঞেস করল,—কৌন মানা কিয়া? ইন্সপেক্টর সাহাব তো?

—জী হাঁ।

—ঠিক হ্যায়, বলে নীল পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে কনস্টেবলের হাতে দিয়ে বলল, এটা আপনার ইন্সপেক্টরকে পৌছে দিন।

কনস্টেবলটি সেটা হাতে নিয়ে যখন কি করবে ভাবছে, অর্থাৎ গেটে সে একা। ইন্সপেক্টরের হুকুম না পেলে গেট ছেড়ে যাবার উপায় নেই তার, অথচ নীলের হাবভাব আর চেহারা দেখে তাকে খুব একটা ফালতু ভেবে উড়িয়েও দিতে পারছে না, এমন সময় ভেতর থেকে একজন যুবক এগিয়ে এসে নীলকে জিজ্ঞেস করলেন,—আপ মানে আপনাদের তো ঠিক চিনলাম না। কোথা থেকে আসছেন? আসলে আজ এ বাড়িতে একটা মিসহ্যাপ হয়ে গেছে, তাই,

কনস্টেবলের হাত থেকে কার্ডটা ফেরত নিয়ে নীল সেটা যুবকটির হাতে দিয়ে বলল,—আমি জানি। আপনি কাইন্ডলি এটা ইন্সপেক্টরের হাতে দিয়ে দিন। তাহলেই হবে।

যুবকটি কার্ডটা নিয়ে চোখ বুলিয়েই বলে উঠলেন,—আই সি। আপনিই মিস্টার নীলাঞ্জন ব্যানার্জি? একটু আগে মিস্টার সিন্‌হা আপনাকেই ফোন করেছিলেন?

ঘাড় কাত করে নীল সম্মতি জানাল।

—আসুন, আসুন আমার সঙ্গে। উনি আমাকে বলে রেখেছিলেন আপনি এলেই ওপরে নিয়ে যেতে।

তারপর কনস্টেবলকে উদ্দেশ করে বললেন,—এঁকে ছেড়ে দিতে হবে। ইনি আপনাদের সিন্‌হা সাহেবের লোক।

কনস্টেবলটি একবার নীল আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে রাস্তা ছেড়ে দিল।

সাদা সাবেকি পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে একটা অদ্ভুত থমথমে নিস্তব্ধতা অনুভব করলাম। এত বড় বিয়ে-বাড়ি। লোকজনও নেহাত মন্দ হয়নি। কিন্তু কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। চিৎকার-চেঁচামেচি দূরের কথা, মানুষের পায়ের শব্দগুলোও যেন থেমে গেছে। অদ্ভুত একটা চাপা বিষণ্ণতা মাঘের এই ভরা তিথির কুমারী রাতকে যেন হত্যা করেছে বলে মনে হল।

দোতলার লম্বা বারান্দা পার হতে হতে দেখলাম, প্রত্যেকটা ঘরেই পর্দা ফেলা রয়েছে। কয়েকজন উৎসাহী মহিলার মুখ ক্ষণিকের জন্যে পর্দায় এসে দেখা দিয়েই লুকিয়ে গেল।

তিনতলার সিঁড়ির মুখেই দেখি একটি পাঁচ-ছ বছরের ফুটফুটে ছেলে। অবাক চোখে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। সামনের যুবকটিকে দেখতে পেয়েই ছেলেটি 'বাপি' বলেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল।

—না বাপি, ও রকম কোর না। তুমি এখন মণির কাছে যাও।

সিঁড়ির পাশেই একটি ঘরের দরজা খুলে চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েসের এক যুবতী বধূ বেরিয়ে এসে বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিয়েই ভেতরে চলে গেলেন।

তিনতলার সিঁড়িতে পা দিতেই চাপা কান্নার আওয়াজ পেলাম। এই প্রথম শোকের বহিঃপ্রকাশ। এতক্ষণ ছিল ঝড়ের পূর্বাভাস। একটা থমথমে ভাব। ঝড় যে বয়ে গেছে তার প্রমাণ এই কান্না। কিন্তু উথাল-পাতাল নয়। চাপা। সংযমে বেঁধে রাখার চেষ্টা। আওয়াজটা যে কোন ঘর থেকে আসছে বুঝতে পারলাম না। নীল ততক্ষণে অনেকগুলো ধাপ উপরে উঠে গেছে। অগত্যা আমিও তিনতলায় চলে এলাম।

ঘরে পা দিয়েই সর্বনাশের সংকেত পেলাম। প্রচুর ফলফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। দারুণ মিষ্টি একটা সুবাস ঘরের সর্বত্র ছড়ানো থাকলেও বুঝলাম, মৃত্যুর বাতাস একটু আগেই এই ঘরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। এক মুহূর্তের জন্য হলেও নীল থমকে দাঁড়ালো। আমার মতোই ও এতক্ষণ নীরবে সব কিছু দেখতে দেখতে আসছিল। যে যুবকটি আমাদের নিয়ে আসছিলেন, তিনি এগিয়ে গিয়ে সোফার ওপর নিবিষ্টচিত্তে বসে থাকা সিংহীমশাইয়ের কানে কানে কিছু বললেন। ভদ্রলোক ঐ মোটা শরীরেও তড়াক

করে লাফিয়ে উঠে বললেন,—আরে এসো এসো, নীল এসো। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম।

মৃদু হেসে নীল এগিয়ে গেল বটে কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারলাম, সারা ঘরটাকে ও চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে। ঘরের প্রত্যেকটা জিনিস ও নিমেষের মধ্যে মনের পর্দায় এঁকে নিচ্ছে।

লাহারা উচ্চবিত্ত নিঃসন্দেহে। এবং বনেদি। সারা বাড়িতে তার নমুনা আছে। কিন্তু এ ঘরটা একটু আলাদা। বনেদিআনার স্টাইলের মধ্যেই অনেকটা জায়গা জুড়ে আধুনিকতার ফ্যাশান। দেওয়াল, সিলিং, ঘরের বড় বড় জানলা। পুরনো আমলের বড় বড় চৌকো সাদা কালো পাথরের ছককাটা মেঝেয় বনেদি স্টাইলের ছাপ। কিন্তু তারই সঙ্গে রয়েছে আধুনিক কালের সোফা সেট, খাট-বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ডরোব। মায় জানলার পর্দাগুলোরও মধ্যে বর্তমান ফ্যাশান বিদ্যমান। এ ঘরের সব থেকে আকর্ষণীয় যেটা, সেটা হল একটা বিরাট অ্যাকোরিয়াম। বিরাট বলছি এই কারণে, চট করে এতো বড় অ্যাকোরিয়াম দেখা যায় না। দশ বাই তিন ফুট তো হবেই। উচ্চতাও কমপক্ষে আড়াইফুট। খাটের ঠিক পাশেই দেওয়াল কেটে সেট করা, বিশেষ কায়দায়। নানান রঙের অনেক মাছ এলোমেলো খেলা করছে। আসলে সব কিছুর মধ্যেই বেশ রুচির ছাপ পাওয়া যায়। আর পরিচয় পাওয়া যায় আর্থিক সচ্ছলতার।

নীলের গলার আওয়াজে আমি সম্বিৎ ফিরে পেলাম। অস্ফুটে ও একবার উচ্চারণ করল,—আশ্চর্য! দেখি, ও একদৃষ্টে অ্যাকোয়ারিয়ামটার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু তা কেবলমাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। সিংহীমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল,—হঠাৎ জোর তলব কেন মিস্টার সিন্‌হা? ঘটনাটা কি?

—খুব ইন্টারেস্টিং এবং জটিল। ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

বলেই বোধ হয় আমার কথা সিংহীমশাই-এর মনে পড়ে গেল। এতক্ষণ ঘটনার চাপা উত্তেজনায় তেমন খেয়াল করেননি। আর পুলিস মানুষ। নিজের না বোঝা দুর্বলতার কথা ফস্ করে বলে ভুল বুঝতে পেরেই হঠাৎ হাউ-মাউ করে চিৎকার করে উঠলেন,—এ্যায় কেয়া, কেয়া মাংতা হ্যায় ইধার?

বাজখাঁই চিৎকারে নীলও বোধ হয়, চমকে উঠেছিল। ও বলে উঠল,—আরে মিস্টার সিন্‌হা, ওকে চিনতে পারছেন না? ও আমাদের অজু।

চিনতে সিংহীমশাইয়ের আমাকে একটুও ভুল হয়নি তা জানি। কিন্তু কি যে এক বিজাতীয় বিদ্বেষ উনি আমার ওপর পুষে রেখেছেন বুঝি না। তাই কিছুতেই আমাকে সহ্য করতে পারেন না। কে জানে কখন আবার কি ভুল ধরে ফেলব। বোধ হয় সেই কারণেই আমাকে চিনতে না চাওয়ার চেষ্টা। নীলের জন্যই আমাকে কিছু বলতে পারেন না। গোলার মতো চোখ দুটো দিয়ে আমাকে সর্বাঙ্গে ধ্বংস করতে করতে উনি বললেন,—ও, তুমি! তা এখানে এসে তোমার কি লাভ? এসব ব্যাপারে তো তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছুই নেই। বুঝলে নীল, এরা এসব দৃশ্য-টৃশ্য ঠিক সহ্য করতে পারবে না। তাই তোমাকে একলাই আসতে বলেছিলুম।

নীল মুখে কিছু বলল না। একবার কেবল ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা সিংহীমশাইয়ের মুখের ওপর স্থাপন করে বলল,—বলুন, আপনার ইন্টারেস্টিং কেসটা কি?

চুপসানো বেলুনের মতো হয়ে ঝাঁটা গোঁফে একবার হাত বুলিয়ে উনি বললেন,—অ্যাঁ, হ্যাঁ বলছি। বস। সন্ধে পৌনে সাতটা নাগাদ থানায় বসে একটা ফোন পেলুম। বিয়ের কনের রহস্যময় মৃত্যু। লাহা বাড়ি আমার চেনা বাড়ি। তাড়াতাড়ি চলে এলুম। এসে শুনি, এ বাড়ির একমাত্র মেয়ে, আজ তার বিয়ে। বিয়ের কিছুক্ষণ আগে মেয়েটি বাথরুমে যায়। কিন্তু আর বেরোয় না। অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া না পেয়ে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে দেখে, মেয়ে বাথরুমে মরে পড়ে আছে। এই হল মোদ্দা ব্যাপার।

সিংহীমশাইয়ে চাঁছাছোলা বর্ণনা থামলে নীল জিগ্যেস করল,—আপনাকে কে ফোন করেছিল?

—সেটা নাকি কেউই জানে না।

—দরজা খোলবার আগে ফোন করেছিল, না পরে?

—এই রে, তা তো জিগ্যেস করা হয়নি, বলেই তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। সে সব পরে হবে। বিয়ে কখন হবার কথা ছিল? মানে লগ্নটা কখন,

তা জেনেছিলেন?

—হ্যাঁ জেনেছি। সাতটা চুয়ান্ন থেকে বাত এগাবোটা বাইশ।

—কটা নাগাদ মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হয়?

—ডাক্তাব বলেছে, সোয়া ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে। কাবণ ঐ সময়েই নাকি মেয়েটা বাথরুমে ঢুকেছিল।

—সেটা কে দেখেছিল?

—প্রত্যেকেই ঐ সময়টা বলছে। বিশেষ করে মেয়েরা, যারা তখন ওব আশেপাশে ছিল।

—মেয়েটিব কে কে আছে?

—মা নেই। আব সবাই আছে।

—বব এসেছে?

—হ্যাঁ। সাড়ে সাতটা নাগাদ।

—ঠিক আছে, চলুন। বডিটা একবার দেখা যাক।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। চল।

ধীবে ধীবে বাথরুমের দিকে ওঁরা এগিয়ে গেলেন। অ্যাটাচড্ বাথ। বাথরুমেব দরজার সামনে গিয়ে ওঁরা থেমে গেলেন। লালেব ওপর সবুজ আর ইয়লো-অকাবেব কাজ কবা ভাবী সিল্কেব পর্দাটা নিথব হয়ে ঝুলছে। দবজাটা খোলাই ছিল। পর্দা ঠেলে ওঁরা ভেতরে ঢুকে পডলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল, দুব ছাই যাব না। সিংহীমশাইয়ের অপমানটা আমার ঠিক সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু কেমন যেন আমাবও ওঁকে ইগ্‌নোর করাব জেদ চেপে গেল।

কিছু না হলেও বারো দশের চোখ ধাঁধানো বাথকম। ঝকঝকে শ্বেতপাথবের মেঝেতে লাল টকটকে গোলাপেব মতো পড়ে আছে অপূর্ব সুন্দবী একটি মেয়ে। চমকে উঠলাম। গোলাপের উপমাটা দিয়ে আমি ভুল করিনি। সত্যিই যেন সদ্য-ফোটা রক্তগোলাপ। নীলেব দিকে তাকালাম। ওকেও মুহূর্তের জন্য কেমন বিমনা হতে দেখলাম। বোধ হয় এ দেখাটা আমার ভুল না। এমন সুন্দর একটা মেয়েকে দেখে আমার বা নীলেব মতো যুবকদেব বিমনা হতে দোষ নেই। মেয়েটিকে দেখে মনে হল, বছর তেইশ চব্বিশের মধ্যেই ওর বয়েস। গায়ের রঙটা আশ্বিনের রোদেব মতো। মুখের মধ্যে এখনও যেন একটা রক্তিম উচ্ছ্বাস লেগে আছে। কপালের দু'পাশ থেকে গাল পর্যন্ত নেমে এসেছে চন্দনের ফোঁটা। কপালের ঠিক মধ্যিখানে কুমকুম দিয়ে এঁকেছে একটা পদ্ম। সারা মুখে বিন্দু বিন্দু জল জমে আছে। মনে হয় মেয়েটিব জ্ঞান ফেরাবার জন্য বাড়ির লোকেবা হয়তো জলের ঝাপটা দিয়েছিল। চন্দনের ফোঁটাগুলো একটু ঝাপসা। কোথাও বা ধুয়ে গেছে। রক্তের মতো লাল বেনাবসি। ওর ঐ উজ্জ্বল গৌব শবীরে লাল বেনাবসিটা কি অপূর্বই না লাগছিল। মনে হচ্ছিল, এমন একটা শরীবকে সাজাবার জন্যই বুঝি বেনাবসিটা তৈরি হয়েছিল। মাথায় লাল ওড়নাটা খসে পড়েছে। সিঁথি থেকে কপালে আটকে রয়েছে মুক্তোর টিক্‌লি। ম্যাচিং সেটে হার, কানের দুল। বাহু আব মণিবন্ধে ঐ সেটেরই অলঙ্কার। খুব একটা কাটা-কাটা চোখ নাক, মুখ, এসব না। কিন্তু সব মিলিয়ে অনবদ্য। নীরবে ঘুমন্ত মেয়েটিকে দেখতে থাকলাম। কেননা আমি যুবক। আর রূপের প্রতি অনুরক্ত নয় এমন যুবক কে আছে?

কিন্তু বাদ সাধবার মতো জগতে কেউ কেউ নিশ্চয়ই আছে। আমার নীরব রূপসুধা পান করাটা বোধ হয় স্ট্রেইট লায়নের পছন্দ হল না। বিশ্রী কর্কশ পুলিসি গলার আওয়াজ পেয়ে আমার বিমোহন ভাবটা কেটে গেল। সিংহীমশাইয়ের সিংহনাদ শোনা গেল,—কি হে নীল, কিছু বুঝলে?

নীলের কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। পরিচিত এক ভঙ্গী বুঝিয়ে দিল ওব তন্ময়তা। সেই এক ভঙ্গী। সেই এক ধরনেব দাঁড়ানোর কায়দা। বুকের মাঝামঝি হাত দুটো ভাঁজ করা। ডান হাতের তর্জনী ঠোঁটের ওপর ন্যস্ত রেখে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঘুমন্ত লাল পরীটির দিকে। সিংহনাদ ওর কানে যায় নি, তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি ওর মনের মধ্যে এখন হাজারটা প্রশ্ন এলোমেলো ছোটাছুটি করছে। সিংহীমশাই বোধ হয় আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। এবার আমি আর চুপ করে থাকতে

পারলাম না। একটু আগেই উনি আমায় বেশ অপমান করেছেন। আমিও শোধ নিলাম,—ওঁকে যখন নিজে থেকেই ডেকে এনেছেন, দয়া করে ওঁকে ওঁর মতোই কাজ করতে দিন।

সিংহীমশাই কটমটিয়ে তাকালেন। কিন্তু কিছু বললেন না। বুঝতে পারলেন নীলকে বিরক্ত করলে ওঁর নিজেরই ক্ষতি। অধৈর্যে সিংহীমশাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সিগারেট ধরিয়ে আবার ফিরে এলেন। হঠাৎ নীল প্রশ্ন করল,—আচ্ছা মিস্টার সিনহা, মেয়েটিকে আপনি এসে এইভাবেই পড়ে থাকতে দেখেন, না?

—হ্যাঁ।

—তখন এখানে আর কেউ ছিল?

—থাকবে না মানে? সে তো এক ক্রাউড-সিন মশাই। বাড়ির ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি সব এসে ঘরটার মধ্যে ভিড় জমিয়েছে। এখনও কি এ রকম ফাঁকা থাকতো? সব হটিয়ে দিয়েছি পাশের ঘরে।

—হুঁ। আচ্ছা, মেয়েটি যে মারা গেছে আপনি বুঝলেন কেমন করে?

—নাড়ী টিপে। অবশ্য এদের হাউস-ফিজিসিয়ানও তাই বললেন।

—আর কিছু বলেননি তিনি?

—কি?

—এই, কেমন ভাবে মারা গেল? এইচ ডাবলু ডাবলুর এইচটা?

—এইচ ডাবলু ডাবলু মানে?

পাশ থেকে আমি বলে ফেললাম,— সে আপনি বুঝবেন না।

—তুমি থামো তো হে ছোকরা। এসব তদন্তের তুমি কি বোঝো?

আমার উত্তর দেওয়া হল না। নীল বলল,—এইচ মানে হাউ? কেমন করে?

প্রবল ভাবে মাথা নাড়িয়ে মশাই সিংহ বললেন,—নাথিং নাথিং। কিছুই বলতে পারলো না। আরে টুকে পাস করা ডাক্তাররা কি নাড়ী দেখে বলতে পারে কেমন করে মারা গেল? বিধানবাবু থাকলে,

—বিধানবাবু থাক, নীল বাধা দিল, আপনার কি অনুমান?

—হেঃ, মানে সেটা, এখনও ঠিক তেমন বুঝে উঠতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে মার্ডার-টার্ডার নয়। রক্তারক্তির তো কোন ব্যাপারই নেই। মনে হচ্ছে স্ট্রোক-ট্রোক হয়েছে, টেঁসে গেছে।

—আহ্, মিস্টার সিন্‌হা, মৃতা মহিলা সম্বন্ধে এ ধরনের কথা বলবেন না। তবে একটা কথা, মার্ডারই হোক বা অন্য কিছুই হোক, আপাতদৃষ্টিতে দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। দেন হাউ?

—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়েছে। আর ঐ হাউটির জন্যেই তোমাকে ডাকা।

—আচ্ছা মিস্টার সিন্‌হা, হাউস ফিজিসিয়ানকে কী একবার ডাকা যাবে?

—যাবে না মানে, বলেই উনি দুমদুম করে পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন। ঠিক মিনিট চারেকের মধ্যেই ফিরে এলেন এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোককে নিয়ে।

এই চার মিনিটের মধ্যে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে নীল দুটো কাজ করল। প্রথমেই সে মৃতার দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে খুব নিবিষ্ট চিত্তে তার মুখে কিছু যেন খুঁজতে চাইল। তারপর একেবারে মুখের কাছে নাক নিয়ে গিয়ে ভালো করে নিঃশ্বাস নিতে নিতে কিছুর ঘ্রাণ নিল। এ কাজটা করতে ওর সময় লেগেছিল প্রায় দেড় মিনিট। আর আড়াই মিনিটের মধ্যে ও বাথরুম সংলগ্ন পিছনের দরজার নবটা ধরে মৃদু চাপ দিল। দরজাটা খুলে গেল। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মিনি টর্চটা জ্বালিয়ে যতটা সম্ভব দেখে নিল।

এমন সময় সিংহীমশাই-এর পায়ের আওয়াজ পেয়ে ও দরজাটা বন্ধ করে নিজের জায়গায় ফিরে এলো।

ঘরে ঢুকেই সিংহীমশাই বললেন,—এই ইনিই হচ্ছেন এ বাড়ির ডাক্তার, মানে হাউস-ফিজিসিয়ান।

—একস্‌কিউজ মি, ডক্টর?

—ডাক্তার অরিন্দম বাসু।

ডাক্তার নিজেই উত্তর দিলেন। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। অত্যন্ত সুপুরুষ চেহারা। বয়স

পঁয়ত্রিশের মধ্যে। প্রায় ছ'ফুটের মত লম্বা। একরাশ কালো কোঁকড়ানো মাথার চুল। ব্যাক ব্রাশ করা। লম্বা জুলপি। মোটা কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমের মধ্য দিয়ে বড় বড় চোখের উজ্জ্বল ভাষা নষ্ট হয়নি। তীক্ষ্ণ লম্বাটে নাক। দৃঢ় চিবুক। টকটকে উজ্জ্বল গায়ের রঙ। ভদ্রলোক ডাক্তার না হয়ে ফিল্ম আর্টিস্ট হলে মানাতো ভালো। ডাক্তারের গলার স্বরও বেশ মিষ্টি আর গম্ভীর।

—নমস্কার ডাক্তার বাসু। নীল বেশ ভারিক্কি চালেই বলতে শুরু করল, আপনিই তো এঁদের হাউস-ফিজিসিয়ান?

—তা বলতে পারেন।

—বলতে পারেন কেন?

—এই কারণে, গত এক দেড় বছর আমি এ বাড়ির চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে যুক্ত আছি। তার আগে আমার বাবাই ছিলেন লাহা-বাড়ির একমাত্র চিকিৎসক।

—তা উনি এখন করছেন না কেন?

—প্রায় আশি বছর ওঁর বয়স। আর কতদিনই বা ডাক্তারি করবেন? অবশ্য ডাক্তারের অবসর বলে কিছু নেই। ডাক্তার আর অভিনেতাবা সাধারণত অবসর নেবার কথা ভাবেন না। এক রকম আমিই জোর করে,

—আচ্ছা ডাক্তার বাসু, মৃতদেহ প্রথম কে আবিষ্কার করেন আপনি বলতে পারেন?

—তা কেমন করে বলব? খবর পেয়ে আমি এখানে চলে আসি। অবশ্য এমনিতেই আসতুম। কারণ আজ আমারও নেমন্তন্ন ছিল।

—আপনাকে ফোন করে কে?

—সুতনু, মানে পাঁপড়ির দাদা।

—পাপড়ি?

—যাকে অত্যন্ত অসহায়ের মতো আজ এইভাবে পড়ে থাকতে দেখছেন।

—আই সি। আচ্ছা, আপনি এসে কি দেখলেন? অর্থাৎ কি ভাবে এঁকে আবিষ্কার করলেন?

—যেমন ভাবে দেখছেন সেই ভাবেই। তবে তখন ছিল এ ঘরে প্রচণ্ড ভিড়। এখন ফাঁকা।

সিংহীমশাই এক দাম্ভিক গলা-খাঁকারি দিয়ে বললেন,—সব হটিয়ে দিয়েছি। এসে দেখি মশাই, একেবারে মাছের হাট বসে গেছে। একটা মেয়ে মরে গেল আর সারা বাড়ির লোকের মজার শেষ নেই। একটা লোককেও বাড়ির বাইরে যেতে দিই নি। এক এক করে সব ক'টাকে ক্রস করে তবে ছাড়ব।

—আপনি কি এখনও সবাইকে আটকে রেখেছেন মিস্টার সিন্‌হা?

—রাত বারোটার আগে কাউকে ছাড়ব ভেবেছেন?

—পাবলিক যে কেন আপনাকে এখনও ঘেরাও করেনি সেটাই আশ্চর্যের। এক কাজ করুন, প্রত্যেকের নাম-ঠিকানা রেখে ছেড়ে দিন। বলে দিন, দরকার পড়লেই থানায় ডেকে পাঠানো হবে।

—কিন্তু?

—কিন্তু কি? আর য়ু ডেফিনিট যে এটা মার্ডার কেস?

—না। মানে, আমতা আমতা করেন সিংহীমশাই। কেসটা সাসপেক্টেড তো?

—কেমন করে বুঝলেন?

—মনে হচ্ছে।

—আপনার অযথা কি মনে হচ্ছে, না হচ্ছে তা দিয়ে এতগুলো ভদ্রলোককে আটকে রাখবেন? বেড়ে মজা তো। এক্ষুণি ছেড়ে দিন সবাইকে। এইভাবে আটকে রেখে সন্দেহটা তো আপনিই লোকের মধ্যে বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

—তাহলে ছেড়েই দিই, উনি চলে যাচ্ছিলেন। আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন, —আরো একবার ভেবে দেখো।

—নিজে ভেবে যা করবার নিজেই করুন। আমাকে আর জিগ্যেস করার দরকার নেই।

সিংহীমশাই বেরিয়ে গেলেন। নীল আবাব প্রশ্ন শুরু করল, — আচ্ছা ডাক্তার বাসু,

—হ্যাঁ, বলুন।

—পাপড়ি দেবীর মৃত্যুর কারণ আপনি কিছু বুঝতে পেরেছেন?

—অ্যাট আ গ্লান্স কিছু বলা যায় না। ফেলিওব অব হার্ট,

—সে তো বটেই, বাট হাউ?

—বলতে পারছি না।

—আপনি হাউস-ফিজিসিয়ান হিসেবেই জিগ্যেস করছি। পাপড়ি দেবীর কি হার্ট-এর অসুখ ছিল?

—না, আমার জানা নেই। উনি কোনদিনও তা বলেননি।

—আপনাব কি মনে হয়? মৃত্যুটা নরম্যাল?

—দেখে তো তেমন কোন অ্যাবনরম্যাল কিছু পাওয়া গেল না।

—ঠিক কথা। কিন্তু হঠাৎ এভাবে মারা যাবেনই বা কেন? হার্ট অ্যাটাক? অব সেরিব্রাল?

—হতেও পাবে! দুটোব যে কোন একটা হতে পারে।

—আপনি কি ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারেন?

—না' কেন না, কেসটা তো এখন পুলিসের আন্ডারে। তা ছাড়া ডেফিনিট না হয়ে কিভাবে ডেথ সার্টিফিকেট দোব?

শেষ কথাটা বোধ হয় সিংহীমশাইয়ের কানে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে উঠলেন,—আচ্ছা নীল, এটা সুইসাইডাল কেসও তো হতে পারে।

—পারে না, তা বলছি না। কিন্তু বিয়ের রাতে এমন সেজেগুজে কোন মেয়ে কি সুইসাইড করে?

—না করার কি আছে? সিংহীমশাই গলাব জোর তুলে বলেন, আলবত করতে পারে। অ্যান্ড আই ডাউট সো।

—হুঁ। ইউ ডাউট সো। আচ্ছা ডাক্তার বাসু, যদিও এটা আপনার জানার কথা না, তবু জিগ্যেস করছি, পাপড়িদেবী কি নিজেব ইচ্ছেতে, আই মিন এটা কি লাভ ম্যাবেজ, অব,

—হ্যাঁ। এটা লাভ ম্যারেজ। ডাক্তার বেশ জোর দিয়েই বললেন, আমি জানি এটা লাভ ম্যারেজ। এবং বিয়ের ব্যাপারে এদের মধ্যে বেশ কিছু পারিবারিক বিদ্বেষ-টিদ্বেষও জমে আছে। বলতে পারেন পাবিবারিক অনিচ্ছাতেই এ বিয়ে হচ্ছিল। নইলে পাপড়ি বলেছিল, এ বাড়ি ছেড়ে উদ্দালকের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে।

—উদ্দালক মানে যার সঙ্গে পাপড়িদেবীর বিয়ে হচ্ছিল?

—হ্যাঁ।

—তিনি এখন কোথায়?

—মাথায় হাত দিয়ে নিচে বসে আছেন।

—তা হলেই দেখছেন মিস্টার সিন্‌হা, পাপড়িদেবীর আত্মহত্যার কোন কারণ থাকতে পারে না। যে মেয়ে এক রকম সবার অমতে নিজের মনোমত পাত্রকে বিয়ে করতে চলেছিল, তার পক্ষে বলা নেই কওয়া নেই, আত্মহত্যা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কাবণ থাকতে পারে কি?

—এতো ফ্যাঁকড়া আমি কোত্থেকে জানব? সিংহীমশাই যেন সাফাই গাইবার চেষ্টা কবলেন। এই মুহূর্তে আমার বলতে ইচ্ছে করছিল যে এসব তো আপনারই জানবার কথা। নেহাতই ঝগড়া বাধার ভয়ে আমি চুপ করে গেলাম। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সিংহীমশাই বললেন,—তবে এখনও জিজ্ঞাসাবাদ কিছু করি নি। করলেই সব বেরিয়ে পড়তো।

আচমকা নীল একটা অন্য ধরনের প্রশ্ন করল ডাক্তারকে, —আচ্ছা ডাক্তার বসু, ক্লোরোফর্মেব গন্ধ সাধারণত কতক্ষণ থাকতে পারে একটা ঘবে?

—ক্লোরোফর্ম? বন্ধ ঘরে?

—ধরুন তাই।

—বন্ধ ঘরে একটু বেশি মাত্রায় ব্যবহার করলে প্রায় ঘণ্টা চার-পাঁচ থাকতে পারে।

—আর যদি দরজা জানালা খোলা থাকে?

—ঘণ্টাখানেক একটা হালকা রেশ থাকলেও থাকতে পারে।

—পাপড়িদেবী কতক্ষণ আগে মারা গেছেন বলে মনে হয়?

ডাক্তার একবার হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। তারপর বললেন,— এখন প্রায় সোয়া ন'টা। তার মানে, একজ্যাক্ট আওয়ার এইভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে মনে হয় ঘণ্টা তিন কি আড়াই আগে উনি মারা যেতে পারেন।

—তার মানে, নীল পালটা প্রশ্ন করল, ওঁকে যদি কেউ ক্লোরোফর্ম করে থাকে তাহলে সে গন্ধ কি এখনও থাকতে পারে?

—না বোধ হয়। কারণ ঐ যে দেখছেন পাশের জানলাটা। ওটা তো খোলাই রয়েছে। দু'আড়াই ঘণ্টায় গন্ধটা উবে গেছে। তা ছাড়া যে পরিমাণে এয়ার ফ্রেশনার ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে ক্লোরোফর্মের গন্ধ বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

—বেশ। গন্ধ নয় উবে গেল। কিন্তু প্রমাণটা যে রয়ে গেছে।

—প্রমাণ? কি প্রমাণ? সিংহীমশাই লাফিয়ে উঠলেন।

—মৃত্যুর আগে পাপড়িদেবীকে জোর করে ক্লোরোফর্ম করা হয়েছিল।

—কি করে বুঝলে?

—ভালো করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন, ভদ্রমহিলার নাকের উপর কিছু সরু ছুঁচ ফোটানো মতো ব্ল্যাকস্পট, যেটা সাধারণত ক্লোরোফর্ম থেকেই হতে পারে।

—ইস, শালা আমি কি গর্দভ!

—উত্তেজিত হবেন না মিস্টার সিনহা, আরো আছে। একটু ভাবুন, একটি মেয়ে, একটু পরেই যে ফিটফাট সেজে বিয়ে করতে বসবে, তার খোঁপাটা ওভাবে ভেঙে এলোমেলো হয়ে যাবে কেন? কপালের আর গালের চন্দন ঘষে যাবে কেন?

—সেটা হতে পারে। আমি তো এসে দেখলুম, এরা সবাই মিলে মেয়েটার মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে।

—বেশ। তাহলে গলার মালাটা ছিঁড়ল কেন?

—সেটা হয়তো মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে ডাকতে গিয়ে কারো হাত লেগে ছিঁড়ে যেতে পারে।

—ছিঁড়ে যেতে পারে, কিন্তু থেঁতলে ঘাড়ের সঙ্গে লেপটে তো থাকতে পারে না?

সিংহীমশাই একটু ইতস্তত করে বললেন,—তা অবশ্য পারে না। কিন্তু তুমি জানলে কি করে?

—ভালো করে দেখলে আপনিও বুঝতে পারবেন।

—আঁা, তাই নাকি! বলেই উনি তড়াক করে লাফিয়ে মৃতার ঘাড়ের কাছে হেঁট হয়ে দেখতে দেখতে বললেন,— ঠিক বলেছ নীল। ইউ আর সেন্ট পার্সেন্ট কারেক্ট।

—এখানেই কিন্তু শেষ হল না। আরও আছে। ডাক্তার বাসু,

—বলুন।

—আপনারা যখন ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশান দেন তখন কি ভাবে দেন?

—সাধারণত ভেইন না পাওয়া গেলে অর্থাৎ স্বাস্থ্যবান মানুষ হলে ভেইন পেতে একটু অসুবিধা হয়, তখন আমরা প্রথমেই ইনজেকশান দেবার পজিশান ঠিক করে নিয়ে সরু রাবার পাইপ দিয়ে একদিক শক্ত করে বেঁধে নিই। তারপর ভেনটা ভিজিবল্ হলে তবেই নিড্‌ল প্রিক্ করতে পারি।

—ঠিক তাই। আমিও সেটাই আঁচ করেছিলাম। তাহলে ডাক্তার বাসু, এবার ভালো করে দেখুন তো, পাপড়িদেবীর ডান হাতের কনুইয়ের ভাঁজটা,

ডাক্তার বাসু আর নীলকে শেষ করার অবসর দিলেন না। তিনি অবিলম্বে ঝুঁকে পড়ে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন,—হ্যাঁ মিস্টার ব্যানার্জি, সত্যিই আপনার দেখার মতো চোখ আছে। ডাক্তার হয়েও যেটা আমার চোখ এড়িয়ে গেছে, সেটা আপনার চোখে ধরা পড়েছে। অবশ্য আপনাদের

চোখ আলাদা, আর আমি এ দিকটা মোটেই ভাবতে পারিনি। এই তো স্পষ্ট নিড্‌ল প্রিকিং এর দাগ। গায়ের রঙ অত্যন্ত ফর্সা বলে ব্লাড স্পট দেখা যাচ্ছে। এখনও জায়গাটা ঈষৎ ফুলে রয়েছে। বাইসেপের ওপরে অস্পষ্ট হলেও বাঁধার চিহ্ন অনুমান করা যাচ্ছে।

ডাক্তার বাসুর দেখাদেখি সিংহীমশাইও ঝুঁকে পড়লেন। কি বুঝলেন জানি না। বলে উঠলেন, —তোমাকে না কি বলব মাইরি! তুমি না একটা জিনিয়াস। তুমি না একটা, ঐ জন্যেই না তোমাকে এত প্রেম করি।

উৎসাহের মাথায় সিংহীমশাই যা খুশি তাই বকে চললেন। নীল সিংহীমশাইয়ের আবেগে এক ঘড়া জল ঢেলে দিয়ে বলল, — তা হলে এ দিয়ে কি প্রমাণ হয় মিস্টার সিন্‌হা?

—প্রমাণ? প্রমাণ মানে ইয়ে, বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে পয়জন ইনজেক্ট করে মেয়েটাকে মারা হয়েছে।

—এবং, নীল বলল, সেটা এমনই একটা ওষুধ যেটা নাকি ভেইনে চালান করতে হয়। তাই না?

—তাই-ই তো! তাহলে দেখ, আমার অনুমানটা মিথ্যে নয়। লাশ দেখেই আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল, এটা অ্যাবনরম্যাল কেস। তারই জন্যেই তো সব ক'টাকে আটকে রেখেছিলুম।

— এখন সবাইকে ছেড়ে দিয়েছেন তো?

—তুমি যখন অত করে বললে।

ঠিক সেই সময় হঠাৎ বাইরে থেকে প্রচণ্ড চিৎকার ভেসে এলো। কেউ যেন চিৎকার করে বলছে, —না না, এসব চলতে পারে না। পুলিসের লোক বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে? আমাদের মেয়ে মারা গেল, আর বাড়ির লোককে সেখানে যেতে দেবে না।

চেঁচামেচি আর হট্টগোল শুনে আমরা প্রায় সকলেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলাম। সিংহীমশাই প্রথমেই সিংহনাদ করে উঠলেন, — কি? ব্যাপারটা কি? এত হম্বিতম্বি কিসের?

পাপড়ির ঘরের চৌকাঠের কাছে তখন ছোটোখাটো একটা জটলা। তার মধ্যে বেশির ভাগই বয়স্ক আর মহিলা। সিংহীমশাই-এর হঠাৎ ঐ রকম ধমকে তারা ক্ষণিকের জন্য একটু শান্ত হলেও একজন প্রায়-প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন,— আপনাদের কি ব্যাপার বলুন তো, ইন্সপেক্টরবাবু?

সিংহীমশাইয়ের মেজাজ তখন অন্য রকম হয়ে গেছে। ভারিক্কি পুলিস অফিসারের মত বললেন, —কিসের কি ব্যাপার?

ক্রুদ্ধ ভদ্রলোক গলার স্বর উঁচু রেখেই বললেন,—আপনারা পুলিসের লোক বলে কি মাথা কিনে নিয়েছেন? আমাদের বাড়ির মেয়ে। আজ তার বিয়ে। হঠাৎ সে মারা গেল। অথচ আমাদের সেখানে যেতে না দিয়ে আপনারা করছেনটা কি শুনি?

—আপনি কে? সিংহীমশাইয়ের দারোগাসুলভ বাজখাঁই আওয়াজ।

ভদ্রলোক তাতে ঘাবড়ালেন না। বললেন,—আমি মেয়ের কাকা।

—তা, অত চেঁচাবার কি হল?

—চেঁচাবো না মানে? কি বলছেন কি মশাই?

—শাট আপ্! বলে সিংহীমশাই বোধ হয় রাগের মাথায় কিছু করেই বসতেন। মধ্যস্থতা করল নীল। সে এগিয়ে গিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়াল,—দয়া করে আপনারা একটু চুপ করুন। এ ভাবে চেঁচামেচি করলে কারোই কোন লাভ হবে না।

নীলের কথা বলার ভঙ্গিতেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, পরিবেশটা কিন্তু অনেক শান্ত হল। তবু পূর্বের সেই ক্রুদ্ধ ভদ্রলোক পরিপূর্ণ শান্ত হলেন না। মোটামুটি রাগের ঝাঁঝটা গলায় রেখেই বললেন,—কেন? শান্ত হব কেন? এটা কি শান্ত হবার সময়? না সমস্ত পরিবেশটা শান্ত হয়ে বসে থাকার মতো?

নীল চট করে রাগে না। এখনও রাগল না। শান্তকণ্ঠেই সে বলল,—তা হলে আপনারা কি করতে চান বলুন?

—আমাদের মেয়ে, আমরা তার কাছে যেতে চাই। একবাড়ি নিমন্ত্রিত লোকের কাছে আমরা কোন

জবাব দিতে পারছি না। খবরটা শুনে পর্যন্ত দাদা অজ্ঞান হয়ে গেছেন। এর পরেও আপনাবা বলবেন আমাদের শান্ত হয়ে বসে থাকতে?

—দেখুন, অযথা আমাদের ওপব বাগ করে লাভ নেই। আমবা তো এসেছি এই মৃত্যুর ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য করতে।

—রসিকতা কবছেন? মৃত্যুর পব আবাব কি সাহায্যের ব্যাপার আসতে পারে?

—আপনি উত্তেজিত বলে আমাব কথাটা বুঝতে পাবছেন না। একটু চিন্তা কবে দেখুন তো, একটি মেয়ে, একটু পরেই যাব বিয়ে, দুম কবে সে মাবা গেল কেন? ভেবেছেন কি কথাটা?

—ভাবতে আব দিলেন কোথায়? সব ভাবনা যে আপনাবাই ভাবতে শুরু করে দিলেন। এইজন্যেই বলেছিলুম, পুলিসে খবর দিও না। আমাব কথা কেউ শুনল না। দুম্ করে পুলিস এসে হাজির।

—খবর না দিলেও কিন্তু পুলিস আসত। কাবণ এ ক্ষেত্রে পুলিসের আসার অধিকার আছে।

—কেন? কেন?

—ডাক্তাব বাসু, কারণটা আপনিই বলে দিন।

বোধ হয় ডাক্তাববাসু বলতে ইতস্তত করেছিলেন। সেই অবসরে সিংহীমশাই বলে উঠলেন, —কেন আবার কি? এটা মার্ডাব কেস। তাই! আপনাদেব মেয়েকে কেউ খুন কবেছে, তাই পুলিসেব রাইট আছে আসাব। বাইট আছে যতক্ষণ খুশি ঘবে ঢুকতে না দেবাব।

শুধু এই ক'টা কথাতেই মন্ত্রের মত কাজ হল। উপস্থিত যাঁবা ছিলেন, অদ্ভুত এক মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল তাঁদের মধ্যে। 'অ্যাঁ, খুন?' 'কি সর্বনেশে কথা।' 'কেন যে ছাই এসেছিলুম মরতে?' 'লাও এবার ঠেলা সামলাও' ইত্যাদি নানা বকম মন্তব্য শোনা গেল অস্ফুট গুঞ্জনেব মাধ্যমে। কেউ কেউ সবে পড়াব তালে ছিলেন। সিংহীমশাইযেব চিৎকাবে তাঁদেব আব সবে যাবার সাহস হল না। সবাই কেমন বোবা আব নিথব হয়ে যে যাব জায়গায় দাঁড়িয়ে বইলেন। যে ভদ্রলোক এতক্ষণ গর্জন করছিলেন তিনিও কেমন যেন মিইয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে বললেন,—কি বলছেন ডাক্তাব? পাপড়ি মানে, খুন হয়ে গিয়েছে?

এবার নীল ধীরে ধীরে বলল, — হ্যাঁ, ঠিক তাই। এবং খুব ঠাণ্ডা মাথায় কেউ তাকে খুন করেছে।

—কে?

—তা তো জানি না। এখনও পর্যন্ত আমবা কেবল বুঝতে পেবেছি তাকে কেউ হত্যা করেছে। কে, কেন, এসব আমবা কিছুই বুঝতে পাবি নি। আপনাবা মৃতা পাপড়ি দেবীব নিকট আত্মীয় হয়ে নিশ্চযই চাইবেন, যে তাকে খুন কবেছে তাকে আইনেব হাতে তুলে দেওয়া উচিত।

ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সম্পূর্ণ পাল্টে গেলেন। কোথায় বা সেই হম্বিতম্বি আর চিৎকাব চেঁচামেচি। কেমন যেন বিহ্বলেব মত বললেন,—হ্যাঁ, হাঁ, নিশ্চযই, নিশ্চযই।

—তা হলে আপনারা এবাব আমাদের একটু সাহায্য করুন।

—বেশ, বলুন কি কবতে হবে?

—আমি জানি এটা শোকেব সময়। তবু যতদূর সম্ভব নিজেদেব একটু শান্ত রেখে স্থির হোন। কিছুক্ষণেব মধ্যে আমবা আমাদের কাজ সেবে চলে যাব। তার আগে একটু জিজ্ঞাসাবাদের প্রযোজন। অত্যন্ত সংক্ষেপে, কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথা আমরা জানতে চাই।

—বেশ, আমরা সবাই পাশের ঘবেই আছি। দবকার মত ডাকবেন।

আব একটা কথাও না বলে তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়টাও উধাও হয়ে গেল।

ভোবের ঘুম আব মেয়েদের মন বোধ হয় একই রকম। একবার চলে গেলে আব ফিরে পাওয়া কঠিন। গতরাত্রে লাহাবাড়ি থেকে ফিবতে অনেক রাত হয়েছিল। আমাকে নামিয়ে দিয়ে নীল যখন চলে গেল তখন রাত প্রায় একটা। অত রাত্রে বাড়ি এসে আব খেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু রেখা, আমাব নাছোড়বান্দা বোন। ওর দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া আমাব পক্ষে অসম্ভব। হাজার কৈফিয়ত দিলেও রেহাই

পাওয়া যায় না। যা হোক কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। ঘুমে তখন আমার চোখ জ্বালা করছিল। ভেবেছিলাম অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠব। রেখাকে বলে রেখেছিলাম যেন ডাকাডাকি করে আমার ঘুম না ভাঙায়।

রেখা ঘুম ভাঙায়নি। কিন্তু পাশের বাড়ির ভুবনবাবু কোথা থেকে একটা মোরগ কিনে এনে পুষতে আরম্ভ করেছেন। একটা মোরগ কেউ পোষে কি না আমার ধারণায় নেই। এরকম বিদ্‌ঘুটে কথাও কোনদিন শুনিনি।

সে যাই হোক, যে যার পছন্দমতো শখ করতে পারেন। তাতে আমার কিছুই বলার থাকতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের এই অবলা জীবটির সময়-জ্ঞান খুব কম। কাকডাকা ভোর থেকে উনি ঘাড় গলা ফুলিয়ে এমন ডাকাডাকি আরম্ভ করবেন তখন মনে একটি মাত্র চিন্তার উদয় হয়। শুনেছি মুরগির থেকে মোরগের মাংসই খেতে সুস্বাদু। ভুবনবাবুকে একদিন ডেকে জিগ্যেস করার ইচ্ছে আছে ওঁর এইরকম শখের কারণ কি?

আজ ভোরে, ভুবনবাবুর সেই মোরগ বাবাজির কি মরজি হয়েছিল কে জানে? মাথার কাছে খোলা জানলার কপাটের মাথায় বসে বিকট চিৎকারে আমার যুবতী ঘুমটাকে খুন করে দিয়ে গেছে। হুস-হাস শব্দ করে ওটাকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার ঘুম ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু অভিমানীর মান ভাঙে নি।

চিন্তা ছাড়া সুস্থ মানুষ বাঁচতে পারে না। এক এক করে গতরাতের সব কথা মনে পড়তে থাকল। প্রথমেই মনে পড়ল পাপড়ির মুখখানা। কি সুন্দর মিষ্টি দেখতে। তার ওপর বিয়ের সাজে ওকে কি দারুণই না লাগছিল। মাঝে মাঝে আমি কিছুতেই ভেবে উঠতে পারি না মানুষ মানুষের ওপর এত নৃশংস হয় কেমন করে?

অবশ্য ভুবনবাবুর মোরগের ওপর যে আমার মাঝে মাঝে নৃশংস হতে ইচ্ছে করে তার একটা অন্য কারণ আছে। মানুষ অনেক কিছু সহ্য করতে পারে। কিন্তু ঘুমের মতো পরম শান্তির সময়টাকে কেউ তছনছ করে দিলে তাকে ক্ষমা করতে ইচ্ছে করে না।

কিন্তু পাপড়ি! কি তার অপরাধ? কি সে এমন ক্ষতি করেছিল কার? জীবনের পরম মূল্যবান এবং শ্রেষ্ঠ সময়ে তাকে সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হল। কত আশা আর সুখের স্বপ্নে মশগুল হয়ে তার একান্ত প্রিয় মানুষটার কাছে সে যেতে চেয়েছিল। শুনলাম, এই নিয়ে অনেক পারিবারিক অশান্তিও সে সহ্য করেছে। সবকিছু বাধা অতিক্রম করে ঠিক পাবার মুহূর্তেই তাকে চলে যেতে হল মৃত্যুর নির্মম আকর্ষণে। পৃথিবীতে মাঝে মাঝে কী যে সব কাণ্ড-কারখানা ঘটে, বুঝে উঠতে পারি না।

কাল পাপড়িকে দেখার পর থেকেই আমি ভাবছিলাম কী ওর মৃত্যুর কারণ? নীল অবশ্য যুক্তি দিয়ে প্রমাণও করিয়েছে এটা খুন। কিন্তু বিয়ের রাতে একজন যুবতী নারীর খুন হবার কি-ই বা কারণ থাকতে পারে?

পারে। হয়ত অনেক কিছুই কারণ আছে। কারণ না থাকলে খুনই বা সে হবে কেন? এটাই তো ঘটনা। আর ঘটনা মানেই চরম সত্য। কিন্তু এই সত্যের পিছনে যে আরও এক অদৃশ্য চরম সত্য আছে সেটাই তো এখন খুঁজে বার করতে হবে।

স্ট্রেইট লায়নের পক্ষে এ খুনের কিনারা করা একেবারেই অসম্ভব। এ আমি হলফ করে বলতে পারি! একটা জটিল খুনের কিনারা করতে মগজে কিছু ঘিলুর প্রয়োজন। সেটা সিংহীমশাইয়ের একেবারেই নেই। আর নেই জেনেই সিংহীমশাই নীলকে ডেকে নিয়ে গেছেন।

একে তো নীল বেশ কিছুদিন ধরে নিষ্কর্মা হয়ে বসে আছে। যতক্ষণ না এই খুনের কিনারা করতে পারছে, ততক্ষণ ওর আর কোনদিকে মন থাকবে না। নতুন আর এক বোবা রোগে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে থাকবে।

তবে, প্রথমে আমি স্ট্রেইট লায়নের ওপরে রাগ করলেও এখন ঠিক ততটা রাগ নেই। এত সুন্দর একটা মেয়েকে তার জীবনের আরো সুন্দর একটা মুহূর্তে যে এমন ভাবে তাকে হত্যা করতে পারে তার শাস্তি হওয়া দরকার। এর জন্যে যদি আরো কিছুদিন আমাকে নীলের গোমড়া মুখ দেখতে হয়, তাও

সইতে বাজি। মনে মনে আমি নীলের সাফল্য কামনা করলাম।

কাল রাতের অনেক ঘটনাই আমার মনে পড়ছিল। এক এক করে সবাইকে জেরা করা। উদ্‌ভ্রান্ত উদ্দালকেব মুখটাও মনে পড়ল। বেচাবা কেমন হতভম্ব হয়ে গেছে। আর হবেই বা না কেন? ভালোবাসার মানুষকে এভাবে হারাতে কে-ই বা চায়? ভালো করে সে তেমন উত্তবও দিতে পারছিল না। সিংহীমশায়ের সামাজিকতাও বড় কম। ঐ অবস্থার মধ্যেও ওঁর জেরা কবার কি ধুম। নীল না থাকলে উদ্দালক অত সহজে নিষ্কৃতি পেতো বলে মনে হয় না।

এত সব কাণ্ডকারখানার মধ্যে আমি কিন্তু নীলকেই বাববার লক্ষ করে গেছি। একমাত্র ডাক্তার অরিন্দম বাসু ছাড়া ও আব কাউকেই তেমন কোন প্রশ্ন কবে নি। বোধ হয় ইচ্ছে করেইনি। ঐ অবস্থার মধ্যে পুলিসি জেরা চালানো বোধ হয় ওর নীতিবিরুদ্ধ। এতটা হৃদয়হীন যে ও হতে পারবে না সেটা আমি জানতাম।

কাল ওকেবল সব কিছু দেখেছে। লক্ষ কবেছে সবাইকে। ওব নজর এড়িয়ে যাবাব মতো একটাও জিনিস ও-বাড়িতে আছে বলে আমার মনে হয় না।

দুটো জিনিস ও বাববার লক্ষ করছিল। বারবার ঘুরে ফিরে অ্যাকোয়ারিয়ামটার কাছে ঘোবাফেরা কবছিল। অনেকক্ষণ ধবে মাছেদের খেলা দেখছিল। এমন কি, আমাব বেশ মনে আছে একবার অ্যাকোয়ারিয়ামটাব ডালা তুলে জলেব ভেতরেও যেন কি খুঁজছিল। ওকে দেখে তখন মনে হচ্ছিল ও যেন মাছের কত ভক্ত। যেন মাছই ওর জগতে একমাত্র প্রিয় বস্তু। ওব রকম-সকম দেখে সিংহীমশাইও বিরক্ত হয়ে একবাব বলেই বসলেন, —আরে নীল, কি তখন থেকে অত বঙীন মাছ দেখছ? কলকাতা শহরে অমন মাছের খেলা তুমি অনেক দেখতে পাবে। এদের একটু জিগ্যেস টিগ্যেস করবে না?

নীল যেন বড্ড বোকাব মতো কাজ করে ফেলেছে, এমন একটা করুণ মুখ নিয়ে এসে বলেছিল, —মিস্টার সিনহা, যেখানে আপনি ইন্টারোগেট করছেন সেখানে আমার কথা বলার কোন মানেই হয় না। ও আমি কবলেও যা, আপনি কবলেও তাই।

নীলের উত্তরে সিংহীমশাই মনে মনে পুলকিত হয়ে বলেছিলেন,—সে তো নিশ্চয়ই। তবু তোমার যদি কোন প্রশ্ন থাকে?

ঠোঁট টিপে নীল ক্ষণিকের জন্যে কি ভেবে বলেছিল,— ঠিক আছে। প্রয়োজন হলে করব।

তারপর ও মাত্র দুজনকে প্রশ্ন করেছিল। প্রথম অতনু লাহাকে। রামতনু লাহার একমাত্র ভাই। মানে পাপড়ির কাকা। যে ভদ্রলোক আমাদের ঘরে থাকাকালীন চিৎকার চেঁচামেচি করেছিলেন। সিংহীমশাইয়ের জেবাব মধ্যেই নীল প্রশ্ন করেছিল, — আচ্ছা মিস্টাব লাহা, পাপড়ি দেবীব বাথরুমেব ও পাশেব দবজাটা কিসের?

অতনুবাবু উত্তর দেবার আগেই সিংহীমশাই বলে উঠেছিলেন, — আহা, কিসেব আবার! ও তো ধাঙড়দের আসার জন্যে।

ব্যঙ্গেব সুরে নীল বলেছিল, —ও, তাই নাকি? তা, ও দরজাটা কি সর্বদাই খোলা থাকে?

অতনুবাবু বলেছিলেন,—না তো। আমি যতদূব জানি ওটা দিনে একবারই খোলা হয়। সকালে। অবশ্য মালতিই ভালো বলতে পারবে এ বিষয়ে।

—মালতি কে? নীল জিজ্ঞাসা করেছিল।

—মালতি এ বাড়ির ঝি।

—তাকে একবাব ডাকবেন।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

একটু পরেই মালতি এসেছিল। চমকে উঠেছিলাম। মালতি এ বাড়ির কাজেব মেয়ে? কে বলবে? না বলে দিলে বোঝাব উপায় নেই। বছর চব্বিশের মধ্যেই বযস। মাজা মাজা গায়েব রঙ। আঁটো সাঁটো টসটসে শরীর। যৌবনটা যেন দেহ থেকে ছিটকে বেবিয়ে আসতে চাইছে। শরীরে যে যে চড়াই উৎরাইয়ের কারুকার্য থাকলে একজন মহিলা পুরুষের চোখে মনোহরা হয়ে উঠতে পারে, তার সব গুণটুকুই

ছিল ওর দেহের বিভিন্ন অংশে। ঐ যে 'দৃষ্টিতে পঞ্চশরের জাদু', 'মদির কটাক্ষ', হেন তেন, সব কি বলে-টলে না, সে সবই ছিল ওর একজোড়া চোখে। তাছাড়া বিয়ের দিনে একটু অন্য রকম সাজও ছিল। সিংহীমশাইয়ের মতো রসকষহীন মানুষও একটু যেন বিষম-টিষম খেয়েছিলেন বলে মনে হয়েছিল।

আমার মতো নীল এতো সব ভেবেছিল কি না জানি না। তবে ওকেও একটু ইতস্তত করতে দেখলাম সম্বোধনের ক্ষেত্রে। আপনি বলবে, না তুমি বলবে। শেষ পর্যন্ত ভাববাচ্যেই বলেছিল, বাথরুমের দরজাটা কি কাজে ব্যবহার হয় জানা আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জানি। বাথরুম পরিষ্কার করার জন্যে প্রত্যেক দিন সকালে মেথর আসে ঐ দরজা দিয়ে।

গলার স্বরটা ঈষৎ ভাঙা ভাঙা। ঠাণ্ডা লেগেও এই ধরনের আওয়াজ হতে পারে। এসে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। বোধ হয় দু' তিনজন অপরিচিত পুরুষ থাকার জন্য।

নীল আবার প্রশ্ন করেছিল,—দরজাটা কি সর্বদাই খোলা থাকে?

—না তো। সকালে মেথর পরিষ্কার করে চলে যাবার পর চাবি দিয়ে দেওয়া হয়।

—কে বন্ধ করে?

—আজ্ঞে, দিদি নিজেই করতেন।

—আজও করেছিলেন?

—তা বলতে পারব না।

—চাবি কোথায়?

—দিদিমণির চাবির রিং-এ থাকে।

—রিংটা পাওয়া যাবে?

—সে তো দিদির কাছে।

কিন্তু চাবির রিং পাওয়া যায়নি। পাপড়িদেবীর কোমরের গোঁজেও ছিল না। বাড়ির অন্য লোক কেউ কিছু বলতে পারেনি।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নীল আবার প্রশ্ন করেছিল, —এই অ্যাকোয়ারিয়াম-এর গাছগুলো কতদিন আগে লাগানো হয়েছিল?

আমার স্পষ্ট মনে আছে প্রশ্নটা শুনে হঠাৎ-হাওয়ায় প্রদীপের আলো যেমন কেঁপে ওঠে, ঠিক সেই রকম কেঁপে উঠে মালতি আমতা আমতা করে জবাব দিয়েছিল,—ইয়ে, মানে, আমি তা কেমন করে জানব বলুন?

—হুঁ, বলে নীল সেই যে চুপ করে গিয়েছিল, তার পর আর কাউকেই ও একটাও প্রশ্ন করেনি। সোয়া বারোটা নাগাদ সিংহীমশাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চলে এসেছিলাম। সারা রাস্তায় নীল প্রায় কোন কথাই বলেনি। কেবল নামার সময় বলেছিল,—কেসটা খুব জটিল রে।

বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। আর শুয়ে থাকা যায় না। বেলাও বাড়ছে। পুব দিকের জানলা দিয়ে শীতের সকালের রোদ এসে ঘরের মধ্যে ঢুকছে। মিঠে রোদ বেশ ভালোই লাগে। রেখাকে চায়ের কথা বলে রোদে পিঠ লাগিয়ে সকালের কাগজটা টেনে নিলাম। প্রথম পাতার নিচের দিকেই বোল্ড হেডলাইনে পাপড়ির রহস্যময় মৃত্যু-সংবাদ ছাপা হয়েছে। 'উত্তর কলকাতার সম্ভ্রান্ত লাহা পরিবারের একমাত্র কন্যা বিবাহের ঠিক পূর্বেই রহস্যজনক উপায়ে খুন হয়েছেন। খুনের প্রক্রিয়াও বেশ অভিনব! নিকটবর্তী থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর এই খুনের তদন্তের ভার নিয়েছেন।' ইত্যাদি...।

কাগজটা রেখে দিলাম। এতক্ষণ তো পাপড়ির কথাই ভাবছিলাম। কাগজ আর কি নতুন সংবাদ জানাবে। সবই তো আমার জানা। মাঝে মাঝে ভাবতে বেশ লাগে। যে খবর আমি অনেক আগেই পেয়ে গেছি সেই খবর এখন, এতক্ষণ পরে সারা কলকাতার লোক জানতে পারছে।

কাগজটা পাশে সরিয়ে রেখে চায়ে চুমুক দিচ্ছি। রেখা এসে হাজির।

কাগজটা টেনে নিয়ে প্রায় সব রোদটাই একা দখল করে বসতে বসতে বলল,—দাদা, দেখেছিস আজকের কাগজটা? খুব স্যাড্ না?

—হুঁ।

—হুঁ কিরে? কি বিশ্রী কাণ্ড বল তো! একবাড়ি লোক, একটু পরেই বিয়ে, মেয়েটার মনে কত আনন্দ, তার মধ্যেই মেরে ফেলল মেয়েটাকে! পৃথিবীতে এমন নৃশংস লোকও থাকে বাবা।

—আমি আগেই জানি।

—আগেই জানতিস মানে?

—কাল সারা সন্ধে আমি আর নীল ওখানেই ছিলাম।

—আর তুই কিনা ফিরে এসে আমাকে বেমালুম মিথ্যে কথা বলে গেলি?

—কি করি বল? সত্যি বললে আবার তুই রেগে যাবি।

—তার মানে আজ কলেজ যাচ্ছিস না?

—কি করে বুঝলি?

—প্রথমত এত ভোরে ঘুম থেকে উঠেছিস

—সে তো তোর ঐ ভুবনবাবুর মোরগটার জন্যে। ব্যাটা সকালেই উঠে কানের কাছে এমন জোরে চিৎকার করে, আর দ্বিতীয়টা কি?

—আজ তোর পক্ষে কলেজ করা অসম্ভব।

—ঠিক বলেছিস রেখা। রহস্য জিনিসটা বোধ হয় সংক্রামক ব্যাধির মত। একবার ছোঁয়ায় গেলেই পেয়ে বসবে। এক্ষুণি নীলের বাড়ি যেতে হবে। সে কিরে, উঠছিস কোথা?

—মুখ-হাত ধুয়ে আয়, তোর খাবার করে দিই। দুপুরে খাবি তো? নাকি— ?

—ঠিক বলতে পারছি না। নীলের আজ কি প্রোগ্রাম জানি না।

রেখা উঠতে উঠতে পাকা গিন্নীর মত শুনিয়ে গেল,—নীলদার পক্ষে যা মানায়, তোর পক্ষে তা মানায় না, মনে রাখিস। তোকে চাকরি করেই খেতে হবে।

আমার উত্তর না শুনেই গটগট করে বেরিয়ে গেল সে। বুঝলাম ও খুব রেগে গেছে। এইসব গোয়েন্দাগিরি ওর একদম পছন্দ না। নীলকেও অনেকবার বারণ করেছে। ওর ধারণা, এইসব ব্যাপারে জড়িয়ে থাকলে একদিন না একদিন আমাদের কোন গুণ্ডা বদমাইশের হাতে বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে। ওর গমনপথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, ও সত্যিই আমাদের জন্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

কি আর করা! ক্রাইম ডিটেকশান বা রহস্যের কুয়াশা সরিয়ে আসল সত্যকে খুঁজে বের করার নেশা মদের নেশার চেয়েও বড় সাংঘাতিক। মাথায় ঢুকলে চট্ করে সরিয়ে ফেলা যায় না। আর সত্যকে খুঁজে পাবার নেশা মানুষের মধ্যে আছে বলেই না জগতে এত বড় বড় আবিষ্কার ঘটেছে, ঘটছে। ভয় পেয়ে বসে থাকলে কোনদিন চাঁদে যাওয়া যেতো না। এভারেস্ট জয় করাও মানুষের পক্ষে কল্পনাই থেকে যেতো। নীলের কথা বাদই দিলাম। ও তো এক নম্বর ডানপিটে ছেলে। কিন্তু আমি বরাবরই গোবেচারা ভালোমানুষ টাইপের। আমার প্রফেশনও সেই রকম। এক কলেজের বাংলার অধ্যাপক।

সত্যই তো, এসব কাজ আমার পক্ষে মানায় না, শোভাও পায় না। খুনির পিছনে ছোটছুটি করে তাকে ধরা, বা বন্দুক পিস্তল বাগিয়ে এলোপাতাড়ি চালানো কলেজের এক সামান্য লেকচারের স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। তাছাড়া আমি অত্যন্ত সাধারণ লোক। আমাকে পেট চালানোর জন্যে বেশ পরিশ্রম করতে হয়। যেটা নীলের পক্ষে স্পোর্টস আমার পক্ষে তা রীতিমত বিপদজনক অ্যাডভেঞ্চার। মাঝে মাঝে আমিও ভাবি কি দরকার এইসব উড়ো ঝামেলার মধ্যে থাকার। বেশ তো আছি, নির্ভেজাল বাঙালি হয়ে।

কিন্তু পারি না। নীল আমার একমাত্র প্রিয় বন্ধু। দীর্ঘদিন সুখে-দুঃখে ওর পাশে পাশে আছি। ওর মতো বন্ধু পাওয়াও ভাগ্যের কথা। গোয়েন্দাগিরি কাজে ও যেভাবে আস্তে আস্তে ইনভলভ হয়ে পড়ল,

ইচ্ছে থাকলেও আমি ওর সঙ্গ ছাড়তে পারলাম না। তারপর একে একে ও কেসগুলোকে সমাধান করে চলেছে। আমিও বেশ মনে মনে রোমাঞ্চিত এবং উত্তেজিত হয়ে পড়ছি। এ এক বেশ মজার খেলা। শক্ত একটা ধাঁধা সমাধান করতে পারলে যেমন একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়, রহস্যের জটগুলো ধীরে ধীরে খুললে তেমনি এক মানসিক পরিতৃপ্তি আসে। এগুলো ঠিক বলে বা লিখে প্রকাশ কবা যায় না। এটা উপলব্ধির ব্যাপার। তাছাড়া এতে আমার আরো একটা অন্য ধরনের আনন্দের মশলা তৈরি হচ্ছে। লেখা-টেখার সামান্য একটু নেশা আমার আছে। দু' একটা বই-টইও যে না হয়েছে তা নয়। নীল আর তাব রহস্যগুলো নিয়ে কিছু লেখা যায়, এমন একটা চিন্তাও ইদানীং আমায় পেয়ে বসেছে। সুতরাং নীলের সঙ্গে থাকতে পারলে বন্ধুকে সঙ্গদান ছাড়াও আমার নিজেবও কিছু লাভের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এসব কথা রেখাকে বলে বোঝানো যাবে না। ও ঠিক বুঝবে না। টিপিক্যাল বাঙালির মেয়ে। যে কোন বিপদে ভাই দাদা বা প্রিয়জনকে ছেড়ে দিতে এদের বড় অনীহা। এদের একটাই চরিত্র, আত্মীয়-পরিজনদের সামান্যতম বিপদের সম্ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।

আর বসে থাকা গেল না। উঠে পড়লাম। ঘড়িতে তখন প্রায় সাড়ে আটটা বাজতে চলেছে। এখনই নীলেব বাড়ি যেতে হবে। নীল আমাকে টানছে।

চা জলখাবার খেয়ে যখন বাস্তায় পা দিলাম তখন ন'টার সাইরেন বাজছে। তাড়াতাড়ি চলেছি। দেখি সামনেই ভুবনবাবু চলেছেন হনহনিয়ে। একবাব মনে হল ওঁকে ডেকে সেই প্রশ্নটা করি। হঠাৎ উনি একটা মোরগ কেন কিনে আনলেন? কিন্তু প্রশ্নটা করা গেল না। নিমেষে গলি পেরিয়ে ডানদিকে মোড় ঘুরে গেলেন উনি।

ঘবে ঢুকে দেখি নীল তখন বুলওয়ার্কার প্র্যাকটিস কবছে। আমাকে দেখে একটু মুচকি হেসে ইশারায় বসতে বলল। প্রায় সাত আট মিনিট পর একটা মোটা চাদব জড়িয়ে সামনেব সোফায় এসে বসল।

আমার যেন আর তর সইছিল না। গতবাত থেকে মাথাব মধ্যে কেবল পাপড়ি পাক খাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম,—কাল তো আব একদম মুখ খুললি না। কি ভাবলি বল?

—বলছি। চা বলে এসেছিস?

এক গাল হেসে দীনু ঘবে ঢুকল, —এ আর যেন নতুন করে বলাবলির কি যেন আছে। সে তো যেন আমি জানিই। তোমরা যেন দুই বাবু এসে একসঙ্গে বসেছ, আর আমি চা নে আসবনি যেন!

'যেন'টা দীনুব মুদ্রাদোষ, ওব কথা থেকে 'যেন'টা বাদ দিলে বাক্যটা পুরো পাওয়া যায়। আমরা অভ্যস্ত। নতুন কেউ হলে দীনুর কথার মানে বোঝা মাঝে মাঝে শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

টেবিলের ওপর ডিম সেদ্ধ, কলা, টোস্ট আর চা রেখে চলে যাচ্ছিল। নীল খবরের কাগজটা উল্টে পাল্টে দেখছিল। দীনুকে চলে যেতে দেখে ও বলল, —কিন্তু যেন সিগারেটটা যেন ঠিক সময় হাতের কাছে পাওয়া যায় যেন।

ঘাড় নেড়ে দীনু বলল, —সে আর বলতে হবে না যেন।

—মাঝে আর একবার চায়ের কথাটাও বলতে যেন হবে না তো?

—না না, আমার সব দিকেই খ্যাল আছে যেন।

—এবার তাহলে আপনি আসুন যেন।

দীনু চলে গেল।

ব্রেকফাস্টটা নীল প্রায় নিঃশব্দেই সারলো। ইতিমধ্যে দীনু এসে এক প্যাকেট নতুন সিগারেট রেখে গিয়েছিল। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে ও একটা সিগারেট ধরাল। এতক্ষণ আমি ওকে লক্ষ করছিলাম। নিঃশব্দে খেয়ে গেলেও আমি জানি, এখন ও অনেক কিছু ভাবছে। মনের মধ্যে এখন ওর ভাবনার পাহাড় ভেঙে পড়েছে। জুত করে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধীরে ধীরে ও বলল, —ভাবনার কথা বলছিলি, তাই না? তার আগে বল তুই কি ভাবলি?

—আমি? দূর, আমার ও সব ভাবনা-টাবনা তেমন আসে না। তবে আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না মেয়েটাকে কেন খুন করা হল?

—এটা তো একটা ভাইটাল প্রশ্ন। আসলে কি জানিস, সব কিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে আছে। একটু গুছিয়ে নেওয়া দরকার। তুই কি বলিস?

—বেশ তো তুই বল।

নীল সিগারেটে আর একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, —শুধু তোর শুনলে হবে না। একটা কাগজ পেন্সিল নে। নোট কর। আর আমি যদি কোথাও কোন পয়েন্ট মিস্ করে যাই ধরিয়ে দিস। নে প্রথমেই লেখ,

সোফায় পিঠটাকে টানটান মেলে দিয়ে গাছের গায়ে লেগে থাকা পাকা গঁদের মতো রোদ্দুরের রঙ দেখতে দেখতে নীল যেন কোথায় হারিয়ে গেল। তারপর খুব মৃদু স্বরে ও বলতে শুরু করল,

—উত্তর কলকাতায় লাহা পরিবার বেশ বনেদি এবং সঙ্গতি সম্পন্ন। একটা নামকরা পরিবার। এক ডাকে অনেকেই এঁদের চেনে। ফ্যামিলিটা আজকের নয়। অনেক পুরনো। বাড়িতে ঢুকতেই ওদের বংশ তালিকাটা দেখেছিলি তো?

—হ্যাঁ, সে এক মস্ত ফিরিস্তি।

—মস্ত। তবে ইতিহাসের পাতায় এখন ফিরে যাবার প্রয়োজন নেই। বর্তমানটাই খুঁটিয়ে দেখা যাক। এই বংশের বর্তমান কর্তা রামতনু লাহা। বয়স আনুমানিক যাট। কিন্তু দেখলে অতটা বোঝা যায় না। সুন্দর, স্বাস্থ্যবান এবং সম্ভ্রান্ত চেহারার পুরুষ। গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর। তীক্ষ্ণ নাক, দৃঢ় চিবুক ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিচ্ছে। কাল আমরা তাঁকে কি ভাবে দেখেছি মনে আছে?

আমি বললাম, —হ্যাঁ, মনে আছে। চেহারায় চরিত্রের কঠোরতা যাই থাক, মেয়ের মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন।

—এবং বার দুয়েক বোধহয় মূর্ছা গিয়েছিলেন। এ দিয়ে কি প্রমাণ হয়?

—বাইরে থেকে যতটা শক্ত মনে হয়, ভেতরে ভেতরে উনি অতটা শক্ত নন।

মাথা নাড়তে নাড়তে নীল বলল, —বেশ, ধরা গেল তাই। একমাত্র মেয়ের মৃত্যুতে অবশ্যই মানুষ সংযম হারাতে পারে। সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু,

—থামলি কেন?

—এই টোট্যাল আপসেট, শুধু কি মেয়ের শোকে?

—তা ভিন্ন আর কি হতে পারে বল?

—আমার মনে হয়, এখানে খানিকটা সামাজিক মর্যাদার ব্যাপারও রয়ে গেছে।

—অস্বাভাবিক কিছু না। সেটাও নিশ্চয়ই আর একটা পয়েন্ট।

—তাহলে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষের মতো তিনি শোকে এবং সামাজিক মর্যাদাহানির কারণে বেশ বিব্রত। অর্থাৎ রামতনুবাবুর সমস্ত ব্যাপারটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। আচ্ছা, এর পর চলে আয়, সেকেন্ড ম্যান। অতনু লাহা। রামতনু লাহার একমাত্র ভাই। বয়স আনুমানিক পঞ্চান্ন। চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বে কিন্তু রামতনুবাবুর সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ বেঁটেখাটো এবং সাধারণ চেহারার মানুষ। কিন্তু শরীরটা কেমন যেন পাকানো। সাধারণত নেশাটেশা করলে এই ধরনের পাকানো চেহারা হয়। রংটা মাজা মাজা। এবং এটাও রামতনুবাবুর বিপরীত। যেমন আরো একটা বিপরীত ব্যাপার আছে। রামতনুবাবুর একমাথা কোঁকড়ানো চুল। অথচ অতনুবাবুর টাক পড়ো পড়ো। হয়ত খুব জোর আর বছর পাঁচেক। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। রামতনুবাবুর পেশা কি মনে আছে?

—না। আমি ঠিক খেয়াল করিনি।

—পৈতৃক ব্যবসা। তবে এটা আর এখন পৈতৃক বলা যায় না। কারণ সমস্ত ব্যবসার একচ্ছত্র মালিক এখন রামতনুবাবু নিজে।

—কিন্তু ব্যবসাটা কি সেটা তো কাল ওঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

—তা হয়নি। কিন্তু আমি জেনেছি। এবং অনেকেই জানে। বড়বাজারে লোহালক্কড়ের দোকান আছে ওঁদের। উনি ওখানকার নামকবা হার্ডওয়ার মার্চেন্ট।

—কিন্তু পৈত্রিক ব্যবসা এখন নয় কেন বললি?

—তার অন্তর্নিহিত কারণটা তোকে এখনই ডেফিনিট হয়ে বলতে পারব না। কিন্তু পৈতৃক ব্যবসা যদি হত তাহলে অতনুবাবুর তো ঐ একই ব্যবসায় থাকা উচিত ছিল। কিন্তু অতনুবাবুর ব্যাপারটা যে অন্যরকম।

—অতনুবাবু কি করেন?

নীল এবার আমায় একটু ধমকাল, —তোর মনটা কোথায় থাকে রে হতভাগা? স্ট্রেইট লায়ন তো ম্যাক্সিমাম টাইম নিয়েছিলেন অতনুবাবুর বেলায়, মনে পড়ছে না?

—না, আমি স্পষ্ট জবাব দিলাম, আমি তো কাল তোকেই লক্ষ করছিলাম।

নীল এবার হেসে উঠল, বলল, —গোয়েন্দার ওপর গোয়েন্দাগিরি?

—না, তা নয়। আসলে বুদ্ধিমান গোয়েন্দার কাজগুলো নিখুঁতভাবে লক্ষ করলে অনেক কিছু জানা যায়। আর স্ট্রেইট লায়ন তো অনেক বাজে প্রশ্ন করেন। মনে আছে তোর, আর কোন প্রশ্ন-ট্রশ্ন খুঁজে না পেয়ে হঠাৎ মালতিকে কি জিগ্যেস করেছিলেন?

নীল হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর স্ট্রেইট লায়নের মতো গলার স্বর গম্ভীর করে বলল, —মরার পর মানুষ কোথায় যায় তা জানো? এই তো?

নীলকে থামিয়ে আমি বললাম, —আচ্ছা, তুই বল, এ ধরনের প্রশ্নের কি মানে হয়? প্রথমত, তুই গিয়েছিস একটা খুনের মামলার তদন্ত করতে। তার সঙ্গে মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায় তার কি কোন সম্পর্ক আছে? দ্বিতীয়ত, প্রশ্নটা করছিস কাকে? না একজন প্রায় অশিক্ষিত বাড়ির কাজ করার মেয়েকে। তা এগুলোকে ইডিয়টিক প্রশ্ন বলব না তো কি বলব বল? এসব প্রশ্ন শোনার চেয়ে তোর কাজের পদ্ধতি লক্ষ করা অনেক কাজের।

আমার প্রশংসা বোধহয় নীলের ভালো লাগছিল না। তাই ও আগের কথায় ফিরে গেল, —আটপৌরে ভাষায় অতনুবাবুর পেশাটা হচ্ছে দালালি।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, —সে কিরে? অত বড় বাড়ির ছেলে, দাদা নামকরা ব্যবসাদার আর তার ভাই দালাল?

—তাও কোন একটা নির্দিষ্ট ব্যবসার নয়। যখন যা জুটে যায়।

—আশ্চর্য।

—খানিকটা। তবে এর পিছনেও নিশ্চয়ই কোন কারণ লুকিয়ে আছে।

—কি কারণ?

—জানি না। আর সেটাই তো জানতে হবে।

—ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা কেমন?

—কখনো জোয়ার, কখনো ভাটা।

—কিন্তু উনি হঠাৎ এত রেগে গেলেন কেন?

—সেটা অবশ্য খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ ঐ পরিস্থিতিতে কতকগুলো বাইরের লোক এসে ওঁদের মৃত মেয়েটিকে পরীক্ষা করার নামে বেশ কিছুক্ষণ ওদের অন্য ঘরে আটকে রাখবেন, সেটা ঠিক মনঃপূত না হওয়াই স্বাভাবিক।

—তা ওঁর মধ্যে কোন অস্বাভাবিক কিছু তোর নজরে এলো?

—সেটা পরে। তবে ওঁর এই পেশার কারণটার একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা জানতে হবে।

—তিন নম্বর কে?

—রামতনু লাহার ছেলে সুতনু লাহা। বয়স প্রায় আটাশ-উনত্রিশ। রোগা ছিপছিপে চেহারা। চোখে চশমা। গায়ের রং বাবার মতোই। সুশ্রী। কথাবার্তা সহজ, স্বাভাবিক। বোনের মৃত্যুতে যতটা দুঃখ পাওয়া

উচিত ঠিক ততটাই উনি এলোমেলো। ভদ্রলোক চাটার্ড। ভালোই রোজগার করেন। বিয়ে করেছেন। সুন্দরী স্ত্রী। বছর চারেকের একটি ছেলে।

আমি বাধা দিলাম, —একটা প্রশ্ন। আটাশ-উনত্রিশ বছর বয়সে বছর চারেকের ছেলে?

নীল বলল, —আর্লি ম্যারেজ হতে পাবে। অথবা বয়সটাও তো অনুমানেব ওপর। হয়তো আমরা যা ভাবছি তা নয়। আর একটু বেশি। বত্রিশ-তেত্রিশ হতে পারে।

—বেশ। অস্বাভাবিক কিছু পেলি?

—তেমন কিছু না। বরং, আগেই বলেছি, সবটাই স্বাভাবিক।

—এরপর কে?

—এর পর আসা উচিত পাপড়ির। কিন্তু ও সব শেষে। এবার ধর শর্মিষ্ঠা। সুতনুর স্ত্রী। পাপড়িরই বয়েসী। সুন্দরী। শিক্ষিতা। একটু চাপা। চট্ করে ঘরের কথা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ কবতে চান না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু বলারও পক্ষপাতী নন। এগুলো সব স্বাভাবিক ব্যাপার। একটু বুদ্ধিমতী রুচিশীলা এবং শিক্ষিতা মহিলা হলেই ঘরের কথা সাধারণত বাইরের কারো কাছে প্রকাশ করতে চাইবেন না। বাচ্চাটাকে বাদ দিলাম। ও এখন পিকচারে নেই। নিকট আত্মীয় আর কে রইল?

—পাপড়ির মামা, মেসো, মাসি।

—ওরা তো সব অন্য বাড়ির। প্রয়োজনে ভাবা যাবে। বাড়িতে বাদ রইল কে?

—মালতি।

—আসছি। তার আগে ধর মালবিকা দেবী মানে অতনু লাহার স্ত্রী। অত্যন্ত খিটখিটে এবং বদমেজাজী। প্রত্যেকের সঙ্গেই ঝগড়া করার টেনডেন্সি।

—ঠিক বলেছিস। স্ট্রেইট লায়নের মত লোককেও বেশ নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিলেন। মনে আছে, উনি যখন প্রশ্ন করলেন, —'পাপড়ি দেবীর বিয়েটা কি আপনারা দেখেশুনেই দিচ্ছিলেন', তাতে ভদ্রমহিলা যেন খেঁকিয়ে উঠলেন, 'তবে কি আপনারা দেখেশুনে দেবেন?'

—হুঁ। তবে এ দিয়ে ঠিক চরিত্রটা বোঝা যায না। কিন্তু ওর এত বগচটা স্বভাব কেন? তাও জানাব ব্যাপার। এবার আয় উদ্দালক মিত্তিরকে নিয়ে পড়ি।

—মানে পাপড়িব উড-বি হাজব্যান্ড?

—সে আর হল কোথায়? সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘদেহী যুবক। একটা মার্কেন্টাইল ফার্মের এক্জিকিউটিভ। এ ছাড়াও আরো একটা কোয়ালিফিকেশন রয়েছে। ভালো গাইয়ে। গতকাল সন্ধ্যায় সে ছিল সম্পূর্ণ এলোমেলো এবং উদভ্রান্ত।

—যেটা আমার মতে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা!

—অস্বাভাবিক আমিও বলছি না। কিন্তু এমন দুর্লভ জামাই বাংলা দেশেব যে কোন মেয়ের বাবাব কাছে কাম্য। তবুও এই বিয়ের ব্যাপারেই নাকি লাহা পরিবারে অশান্তি! কেন?

—জাতের অমিল টমিল হতে পারে কি?

—বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষে এসে সামান্য জাত-টাত নিয়ে? কে জানে, বনেদি ফ্যামিলির কি মর্জি? তবে মিত্ররা তো কুলীন কায়স্থ, নিচু জাত তো নয়ই। ঠিক আছে, সে পরে দেখা যাবে। বাকি রইল মালতি আর সুদাম। দুজনেই বাড়ির কাজের লোক। ড্রাইভারকে ছেড়ে দিলাম। সে সকালে ডিউটি করতে আসে, রাতে চলে যায়। সুদাম হাঁদাবোকা। বছর পঞ্চাশ বয়স। কানে কালা। আবার চোখেও কম দেখে। অবশ্য এতগুলো গুণ একসঙ্গে থাকা একটু ভাববার কথা।

বাধা দিলাম, —গুণ বলছিস কেন?

—গুণ না? একে হাঁদাবোকা, তার ওপর কানে কালা, চোখে কম দেখে। এমন আইডিয়াল চাকব চট্ করে পাওয়া যায় না। পুলিস তো কোন ছার। স্বয়ং ভগবান পর্যন্ত পেট থেকে কথা বাব করতে পারবেন না। মানিকজোড়ের অপরটি হল মালতি। এ যেন সেই হিন্দী সিনেমায় দেখা লাস্যময়ী কোন নটীকে কাজের মেয়ের রোলে অভিনয় করতে নামানো হয়েছে। সর্বাঙ্গে কোথাও কাজের মেয়ের লেশমাত্র

নেই। একটু সেজে-টেজে নিউ মার্কেটে ঘুরলে তুই কিছুতেই বুঝতে পারবি না মেয়েটা অরজিনালি কি? বয়স ধর চব্বিশ-পঁচিশ। চেহারায় উগ্র দৈহিক কামনার আবেদন। চোখে পুরুষ-হৃদয় তোলপাড় করা চাহনি। কথাবার্তায় একটু চটুল। আর পুরুষকে অবজ্ঞা করার মনোভাব সুস্পষ্ট। অর্থাৎ পুরুষদের আমি বেশ ভালো চিনি এরকম একটা ভাব, তাই না?

—ঠিক বলেছিস।

—তবে মেয়েটা যে বাড়ির কাজ করে সেটা ওর অত উগ্র যৌবন থাকা সত্ত্বেও বোঝা যায় ওর হাতের আঙুলগুলো দেখলে। নেল পালিশ লাগানো সত্ত্বেও বোঝা যায় আঙুলের নখ বেশ খাওয়া-খাওয়া। আর হাতের চেটো বেশ রুক্ষ। এবং গোড়ালি হালচষা মাঠ।

একটু অবাক হয়েই বললাম, —বাবা, দূর থেকে তুই এতো বুঝতে পারলি?

—সবগুলো ঠিক না-ও হতে পারে। কিছুটা আমার অনুমান। তবে মেয়েটা খুব ফেলে দেবার মতো বা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। মনে হচ্ছে ও অনেক কিছু জানে। ওর চোখে অনেক গোপনতার ছায়া দেখতে পেলাম।

—তার মানে, বলছিস রহস্যের চাবিকাঠি ওখানেই আছে?

—দূর পাগল, এতো তাড়াতড়ি কি কিছু বলা যায়? জলটা খুব ঘোলাটে আর গভীর। কোথায় যে কি লুকিয়ে আছে খালি চোখে কিছুটা বোঝা যাচ্ছে না। এবার আয় পাপড়ি পরিচয়ে। বাংলা দেশের একটা মিষ্টি মেয়ে। যে মেয়েকে দেখলে যে কোন সহজ পুরুষ ভালো না বেসে থাকতে পারবে না। ব্যবহারে মেয়েটা কেমন ছিল তা জানি না। কিন্তু চেহারাটা ঐ রকমই। উদ্দালকের মতো একটা সুন্দর ছেলেকে ও ভালোবেসেছিল। বাড়ির অমত সত্ত্বেও পারিবারিক মর্যাদা রক্ষা করেই সে বিয়ে করতে যাচ্ছিল তার ভালোবাসার মানুষকে। কিন্তু বিধাতার অন্য ইচ্ছায় তার সব প্রতিরোধ ভেঙে গেল। মৃত্যু এসে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নকে কেড়ে নিয়ে চলে গেল।

মেয়েটি জেদী। নিজের প্রতিজ্ঞায় একনিষ্ঠ। সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো ক্ষমতা রাখতো। ভালোবাসাকে মর্যাদা দেবার জন্যে সে সামাজিক সংস্কারগুলোর বিরুদ্ধে মাথা নত করতে চায়নি। বাংলায় এম.এ পড়ছিল অথবা পাস করেছিল। গান গাইতো। বোধ হয় উচ্চাঙ্গ।

—বুঝলি কেমন করে?

—পাপড়ির অ্যালবামের পাতা ওল্টালেই বুঝবি; কনভোকেশান গাউন পরা সুন্দরী মেয়েটি নিশ্চয় বি.এ. পাস করেছিল। আর ওর বইয়ের র‍্যাকে কিছু এম.এ ক্লাসের বাংলা পাঠ্যপুস্তক শোভা পাচ্ছিল। আর গান? ঘরে ঢুকেই বাঁ দিকের কোণের তানপুরা তবলা নিশ্চয়ই বলে দেবে মেয়েটি গানের অনুরক্তা।

—কিন্তু গান যে করেই ডেফিনিট হয়ে কি করে বলছিস? অন্য কেউ যদি

—নাহ্। অন্য কেউ গান করলে তার তানপুরা নিজের ঘরে, মানে অত সাজানো গোছানো ফিটফাট ঘরে পাপড়ি রেখে দেবে না। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরে সেটা সম্ভব হতে পারে। জায়গার অভাবে এক ঘরেই হয়ত সবকিছু ঢুকেছে। হারমোনিয়ামের পাশেই হয়ত দেখবি ক্রিকেট ব্যাট রয়েছে। কিম্বা লক্ষ্মীর ছবির পাশে বক্সিং গ্লাভস। পরিবারে দু'ভাই থাকলে তোর পক্ষে বলা অসুবিধার হোত কে গান করে আর কে ক্রিকেট খেলে। কিন্তু পাপড়ির অবস্থা অন্য রকম। অত বড় বাড়ি। ঘরের অভাব নেই। তার ওপর পাপড়ির নিজস্ব একটা ঘর রয়েছে। অন্য কারো তানপুরা নিজের ঘরে সে নিশ্চয়ই রাখবে না। গান ছাড়াও পাপড়ির শখ রঙিন মাছের।

মাছের কথা আমি একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল অ্যাকোয়ারিয়ামের পাশে নীলের অনেকক্ষণ তন্ময় হয়ে থাকার দৃশ্যটা। তাই বেশ আগ্রহ নিয়েই প্রশ্ন করলাম, —আচ্ছা নীল, মোটামুটি তুই লাহা বাড়ির চরিত্রগুলোর একটা স্কেচ তৈরি করলি। কিন্তু তিনটে প্রশ্ন এখনও আমার ক্লিয়ার হচ্ছে না। একটু ব্যাখ্যা কর।

—বল।

—এক নম্বর, ঘরে ঢুকেই তোর মুখে প্রথম একটা কথা শুনে ছিলাম। তুই বলেছিলি 'আশ্চর্য'। কেন?

এবং কি দেখে তুই ঐ শব্দটা উচ্চারণ করেছিলি?

মুচকি মুচকি হাসছিল নীল। সিগরেটটায় শেষ টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিতে দিতে ও বলল —প্রশ্নটা ভালো। এবং বুদ্ধিমানের মতো। বলতে পারিস অজু, একটা সাজানো ঘর, কোথাও কোন এলোমেলো ব্যাপার-স্যাপার নেই। সব কিছুতেই একটা পরিচ্ছন্ন রুচির ছাপ। এমন কি ঐরকম ঘরে ম্যাচিং করিয়ে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে স্পেশাল সাইজের অ্যাকোয়ারিয়াম যে মেয়ে বসাতে পারে, নিশ্চয় সে প্রতিদিনই সেই অ্যাকোয়ারিয়াম যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করবে। বিশেষ করে বিয়ের দিনে আরো বেশি করে সাজানো থাকবে। তুই কি বলিস?

—নিশ্চয়ই। তাই তো হওয়া উচিত। অবশ্য ফুল-টুল দিয়ে ঘরটা বেশ গোছানো এবং সাজানোই ছিল।

—ছিল। কিন্তু খুবই মামুলি হলেওএকটা জিনিস আমার অত্যন্ত বিসদৃশ লাগল। যত্নে লাগানো মাছের চৌবাচ্চায় সার দিয়ে সাজানো রয়েছে অ্যামাজন গাছের সারি। মাছের শখ যাদের আছে, তারাই জানে অ্যামাজন গাছটা বেশ দামি। অমন দামি গাছ কেউ অযত্নে রাখে?

—না।

—কিন্তু আমি গিয়েই দেখি, পাশাপাশি লাগানো তিনটে গাছ শিকড় সমেত উপড়ানো হয়ে জলের ওপর ভাসছে। এটা কি হওয়া উচিত? বিশেষ, যে বাড়িতে সেদিন উৎসবের আয়োজন। যে ঘর সৌখিন সব ফুলে টিপটপ করে সাজানো হয়েছে। এটা আশ্চর্যের নয়?

মাথা নেড়ে জানালাম নীল ঠিকই বলেছে। তারপর বললাম, —আমার দু'নম্বর প্রশ্ন, তুই কি ঐ জন্যেই অ্যাকোয়ারিয়ামটার ধারে অতক্ষণ ঘুরঘুর করছিলি?

—খানিকটা তো বটেই। যে কোন ব্যাপারেই আমি ডেফিনিট হতে চাই। আর সামান্য একটা কৌতুহল মেটাতে গিয়ে আমি দুটো জিনিস লক্ষ্য করেছি।

—কি?

—কাচের চৌবাচ্চার নিচে যে বালির আস্তরণ থাকে সেখানে বেশ পুরু হয়ে শ্যাওলা জমেছে। অ্যাকোয়ারিয়ামে শ্যাওলা জমানোর জন্য বিশেষ নজর দেওয়া হয়। এখানেও তাই দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পাপড়িদেবী বেশ যত্ন নিয়েই বিশেষ কায়দাকানুন মেনে কাচের চৌবাচ্চায় পুরু শ্যাওলা জমিয়ে শোভা বর্ধন করিয়েছিলেন। কাছে গেলে, ভালোভাবে নজর দিয়ে পরীক্ষা করলেই তুই দেখতে পেতিস, একটা বিশেষ জায়গায় বালির চাপড়া শ্যাওলা সমেত সরে গেছে। অর্থাৎ কেউ ওখানকার বালি সরিয়ে কিছু করেছিল। তারপর নিজের কাজ মেটার পর আবার সেই চাপড়াটা পূর্বস্থানে বসিয়ে দিয়েছে। কাজটা বোধহয় খুব তাড়াতাড়ি করা হয়েছিল, যার জন্য বালির সরানো অংশটা ঠিকমতো বসানো যায়নি। এবং সেই তাড়াহুড়োর জন্যেই গাছের সার থেকে তিনটে গাছ শিকড় সমেত উপড়ে জলে ভাসছিল।

—এ দিয়ে তুই কি বোঝাতে চাইছিস?

—কিছুই বুঝিনি। বোঝাতেও চাইছি না। কেবল যা ঘটনা, আমার অনুমানে যা ঘটেছে বা ঘটে থাকতে পারে তাই-ই বললাম। এবার তিন নম্বর প্রশ্ন কর।

—স্ট্রেইট লায়ন যখন এদের জেরা করছিল তখন তুই প্রায় মিনিট দশেকের জন্যে বাথরুমে, আই মিন যেখানে পাপড়ির দেহটা পড়ে ছিল, সেখানে কি করছিলি?

নীল একদৃষ্টি প্রায় সেকেন্ড দুয়েক আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল,—ঘড়ি দেখেছিলি ' প্রায় দশ মিনিট, তাই না? দশ মিনিট সময়টা খুব বেশি নয়। কিন্তু তার মধ্যেই ক'টা ইমপর্টান্ট ব্যাপার আমার মগজে ঢুকেছিল। বাথরুমের ওপাশে সুইপার ঢোকার দরজাটা খোলা ছিল, আগেই দেখেছিলি। তখন থেকেই আমার মনে হচ্ছিল, বাথরুমের দরজাটা খোলা থাকবে কেন? ওটা তো খোলা থাকার কথা নয়। তবু খোলা। কেন? তার ওপর মালতি বলল, দরজাটা কখনোই খোলা থাকে না। সেকেন্ড টাইম বাধ্য হয়েই আবার গেলাম। কি আছে দরজার ওপাশে তাই দেখতে।

—গিয়ে কি দেখলি?

—বলছি। দরজাটা খুলে দেখলাম একটা স্পাইরাল স্টেয়ার সোজা নিচের দিকে নেমে গেছে। এই ধরনের সিঁড়ি আজকাল কমই ব্যবহৃত হয়। যেহেতু এটা পুরনো কালের বাড়ি, সেই রীতি অনুসারে স্পাইরাল ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সুবিধা হয়। খুব অল্প জায়গার মধ্যে সিঁড়ির কাজটা মিটিয়ে ফেলা যায়। বাইরেটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ওটা বাড়ির পিছন দিক। লোকজন প্রায় যাতায়াত করেই না। টর্চটা জ্বালিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নিচে নেমে গেলাম। একটা বাগানের মতো। কিন্তু বাগান না। খানিকটা পড়ে থাকা জমিতে আগাছার জঙ্গল। দু'একটা ডুমুরের গাছ। কয়েকটা টগরের ঝাড়। দেখলেই বোঝা যায় জায়গাটা অব্যহৃত, অপরিষ্কৃত। সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে একটা চলার পথ সোজা চলে গেছে সীমানা পর্যন্ত। সেখানে পাঁচিলের গায়ে ছোট্ট খিড়কির দরজাটা রয়েছে। বোঝা গেল এই পথ দিয়েই সুইপার যাতায়াত করে। অন্ধকারে আর তেমন বিশেষ কিছুই নজরে পড়ল না। তার ওপর এখন শীতকাল। কোথাও কোন পায়ের ছাপ-টাপ দেখতে পেলাম না। ওঠার পথে একতলা আর দোতলার বাথরুমের দরজাগুলোও ধাক্কা দিয়ে দেখলাম। সবই ভেতর থেকে বন্ধ।

—তাহলে বলছিস পরিশ্রমই সার হল। কাজের কাজ কিছুই হল না।

—উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু অবশ্য পাইনি। তবুও একেবারে যে বৃথা পরিশ্রম তাও বলছি না। হত্যাকারী খুব চালাক। কোন বিশেষ কিছুই সে নিজের অজান্তে ফেলে যায় নি। কিন্তু ক্রাইমের ক্ষেত্রে দুটো জিনিস আমি সর্বদাই মানি। কিছু না কিছু সূত্র অপরাধী ফেলে যাবেই। যেতে বাধ্য। অপরাধের সময় অপরাধীর নার্ভের অবস্থা যে রকম থাকে তাতে করে খুব সজাগ লোকও কোন না কোন সামান্যতম নিদর্শনও ফেলে রেখে যায়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সূত্র হিসেবে সে কোথাও পায়ের ছাপ রেখে যায়নি, একটা রুমাল পর্যন্ত অসাবধানে তার হাত ছাড়া হয়নি। কিন্তু যে জিনিসটা সে ফেলে রেখে গেছে সেটা অত্যন্ত কমন একটা নিদর্শন। কলকাতা শহরে কয়েক লাখ লোক সেই জিনিসটা ব্যবহার করে। তবুও সেটা আমার কাছে একটা সূত্র।

—কী? কী সেটা? আমি বেশ উৎসাহ নিয়েই জিজ্ঞাসা করি।

নীল চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল। ওর বইয়ের আলমারির একটা বই সরিয়ে তার পেছন থেকে একটা রুমাল বার করে নিয়ে এলো। রুমালটা টেবিলের ওপর খুলে দিতেই দেখলাম একটা অর্ডিনারী সিগারেটের প্যাকেট। আর তিনটে পোড়া সিগারেট। সিগারেটের প্যাকেটটাও কমন। রয়েল সাইজ ফিল্টার উইলস্-এর। আধ-পোড়া সিগারেটগুলোও ঐ উইলস্-এরই। আমার মগজে তেমন কিছু ঢুকল না। সূত্র বা হত্যাকারীর নিদর্শন হিসেবে নিতান্তই নগণ্য। জানি না, নীল এর মধ্যেই কি এমন উল্লেখযোগ্য সূত্র পেয়েছে। তাই বললাম,—কিন্তু কলকাতা শহরে তো

আমার কথা কেড়ে নিয়ে নীল বলল,— বেশ কয়েক হাজার লোক এই সিগারেট খায়, তাই তো?

—নিশ্চয়ই।

—তা হোক। এই ক'টা পোড়া সিগারেট আর এই খালি প্যাকেট থেকে দুটো সূত্র বেরিয়ে আসছে। দুটো জিনিসই পড়ে ছিল মাথা-ঝাঁকড়া ডুমুর গাছটার নিচে। জায়গাটা দিনের বেলাতেই বেশ অন্ধকার থাকে। ইচ্ছে করলে যে কোন লোক ঐ গাছের নিচে আত্মগোপন করে থাকতে পারে। অর্থাৎ এটাই মনে করা যেতে পারে যে হত্যাকারী হয়তো বেশ কিছুক্ষণ ঐ গাছটার নিচে লুকিয়ে ছিল। বেশ কিছুক্ষণ অর্থাৎ অন্তত পক্ষে মিনিট পঁয়তাল্লিশ গাছটার নিচে সে অপেক্ষা করেছিল। কেননা তাকে তিনটে সিগারেট শেষ করতে হয়েছিল। তিনটে কিংসাইজ সিগারেট শেষ করতে বোধহয় ঐ রকম সময়ই লাগে। আর একটা জিনিস লক্ষ কর, দুটো সিগারেট প্রায় যেখানটায় নামটা লেখা আছে অতদূর পর্যন্ত পোড়া। কিন্তু একটা সিগারেট অর্ধেকও শেষ হয় নি। তার মানে কিছু বুঝলি?

—খানিকটা। দুটো সিগারেট পুরো সময় নিয়েই খেয়েছে। কিন্তু শেষ সিগারেটটা শেষ হবার আগেই তার অপেক্ষা করার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল।

—কারেক্ট। এবার দেখ এই প্যাকেটটা খোল। কিছু বুঝতে পারছিস?

প্যাকেটটা খুলে দেখলাম সেটা সম্পূর্ণ খালি। এছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ল না। নীল

নিজেই ব্যাখ্যা করে দিল। সাধারণত আমরা সিগারেটের প্যাকেট খুলে প্রথমেই কাটা রাংতাটা ফেলে দিই। কিন্তু কিছু কিছু লোকের স্বভাব দেখবি, তারা রাংতার ঐ কাটা অংশটা ফেলে দেয় না। প্যাকেটটা খুলে বাংতা সরিয়ে সিগারেটটা বাব কবে আবার রাংতাটা চেপে রেখে দেয়। তাদের ধারণা, এতে সিগারেটের ফ্লেভারটা ঠিক থাকে আর ড্যাম্প ধরে না। পাপড়ির হত্যাকারীও সেই দলের। তার স্বভাব রাংতাটা রেখে দেওয়া। যেটা এখানে এখনও আছে।

বাধা দিয়ে বললাম,—কিন্তু কলকাতা শহরে এই হ্যাবিট বহু লোকের পাবি।

উত্তরে নীল বলল,—পাপড়িকে হত্যা করেছে কলকাতাব বহু লোক নয়। একজন। এবং সেই একজন পাপড়িদের অতি পরিচিত। এমন পবিচিত যে সেও বাড়ির সব কিছু জানে, চেনে। এবং সেই বিশেষ একজন এও জানত, কোন লোক কোন কারণে তাকে ঐ অবস্থায় দেখে ফেললেও এটা সেটা বলে সে ম্যানেজ করতে পারবে। তার ওখানে যাবার এক্তিয়ার আছে, এটাও ধরে নেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ লোকটাকে লাহা বাড়ির সবাই চেনে।

খুব একটা অযৌক্তিক মনে হল না নীলের কথাটা। ওর কথা মেনে নিয়ে বললাম,—তারপর?

—তারপর ওগুলো কালেক্ট কবে ওপরে চলে এলাম্। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলাম না। ঐ সিঁড়ি বেয়েই সোজা ছাদে চলে গেলাম। কারণ সিঁড়িটা ছাদ পর্যন্ত চলে গেছে। ছাদে গিয়ে দেখলাম, সেখানে ম্যারাপ বাঁধা। কিন্তু লোকজন একদম নেই। অর্থাৎ এই দুর্ঘটনার জন্যে ছাদে যাবার আর কারো প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু আমি নিশ্চিত বলছি, হত্যাকারী হত্যা করার পর নিচে নামেনি। সে ছাদে উঠে বাড়ির মধ্যে নেমে গেছে।

—এত ডেফিনিট হলি কেমন করে?

—নিচে নেমে গেলে তাকে বাড়ির বাইরে যেতে হোত খিড়কি দরজা দিয়ে। কিন্তু খিড়কির দরজা বন্ধ। আর বাগানের উঁচু পাঁচিল ডিঙিয়ে যাবার কথা ভাবছি না। কারণ সেটা খুবই রিস্কি ব্যাপার হয়ে যেতো। ধরা পড়লে চেনা লোককেও সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে অসুবিধায় পড়তে হোত। তোর প্রশ্নগুলো সব শেষ হয়েছে তো?

—একটা বাকি। হাসবি না তো?

—না। বল্।

—পাপড়িব ঘরে যাবার জন্যে যখন আমবা তেতলাব সিঁড়ির কাছে পৌছেছি, তখন, জানি না তোর কানে গেছে কিনা, একজন মহিলাকণ্ঠের চাপা কান্নার আওয়াজ।

একটা সিগারেট ধরিয়ে নীল বলল,—সাবাস! ভেবেছিলাম এটা তোর কান এড়িয়ে গেছে। আমার মনে আছে। কিন্তু কে? তা জানি না। কেই বা অমন কবে কাঁদতে পাবে? মালতি? না। কারণ মালতিকে আমরা যখন দেখলাম তখন বিন্দুবিসর্গ কান্নার চিহ্ন তার চোখে মুখে ছিল না। তবে কে? মালবিকা দেবী? উঁহু! শর্মিষ্ঠা দেবী? হতে পারে না। ঠিক তখনই পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উনি ওঁব বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। অতএব এরা কেউ না। তাহলে?

—কোন আত্মীয়-স্বজন হতে পারে কি?

—বিয়ে-বাড়ি। কে যে কোথায় লুকিয়ে কাঁদছে, কি করে বলা যাবে? তবে যিনিই কাঁদুন না কেন, পাপড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গভীর। হয়তো পাপড়ির মৃত্যু তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছে। বাট হু ওয়াজ দ্যাট লেডী? তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে। কারণ গতকাল তাঁকে আনা হয়নি। মনে হয় ইচ্ছে করেই। কিন্তু কেন? আসলে কি জানিস, কেসটা ঘোলাটে আর জট পাকানো।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম,—তুই সিওর যে এটা মার্ডার?

— সেন্ট পার্সেন্ট। এবং কুল ব্রেনে অনেকদিন ধরে হিসেব করেই মার্ডার করা হয়েছে। আরো একটা কথা, হত্যাকারী তোর আমার মতো খুব সাধারণ নয়। লোকটা হয় একজন ডাক্তার অথবা ডাক্তারি শাস্ত্রে তার অগাধ জ্ঞান। অবশ্য কম্পাউন্ডারও হতে পারে। কারণ সে জানে কেমন করে ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশান দেওয়া হয়।

ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললাম,—তা তো বটেই। তা তো বটেই! তাহলে কনক্লুসানটা কি দাঁড়ালো? প্রি-প্ল্যানড অ্যান্ড প্রিমেডিটেটেড একটা মার্ডার। দেখেশুনে হিসবে করে বিয়েব দিনটাই বেছে নিয়েছে। হত্যাকারীও বাড়ির পরিচিত। কিন্তু মোটিভ?

নীল আমার কথাটা উড়িয়েই দিল,—পরে, পরে। সে পরে ভাবব। আগে তো পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা আসুক। ঠিক কি ধরনের বিষ অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, সেটা দেখা যাক। তাব ওপরও অনেক নির্ভব কবছে। হত্যার প্রসেস জানতে পারলে হত্যাকারীর চরিত্রটাও বোঝা যায়। রিপোর্টটা না পেলে আপাতত এগুনো যাবে না। তবে একটা কথা, গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়লেব মতো ব্যাপাবটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

—কেন?

—সরল সিংহ নিজের স্বার্থে কাল আমাকে ওখানে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমাব পক্ষে কি উচিত হবে, দুম করে কেসটার মধ্যে মাথা গলিয়ে দেওযা?

—তাহলে এতো সব ভাবলি কেন?

—ভেবে রাখতে দোষ কি? কাউকে না কাউকে তো ভাবতে হবেই।

—তোকে ডাকবেই।

—বলছিস?

—সবল সিংহের পক্ষে এ কেস সল্ভ কবা নেক্স্ট টু ইমপসিবল।

—এনি ওয়ে। ওপরওলা থেকে খবব-টবব না দিলে আমি আর সময় নষ্ট করছি না।

এবার আমি ছোট্ট একটা রসিকতা করতে ছাড়লাম না,—কিন্তু ব্যাঙ বাদুড়ের একটা কিছু তো গিলতে হবেই।

—তা বলে একেবারে হ্যাংলার মতো না।

হ্যাংলামি করতে হল না। সন্ধে নাগাদ এসে হাজিব হলেন সত্যেনদা। পুলিস অফিসার সত্যেন মুখার্জি। হাতে ওপরওয়ালাব স্পেশাল আমন্ত্রণপত্র। কাগজটা খুলে নীল পড়ল। তাবপব আমার হাতে দিয়ে বলল,—নে, পড়ে দেখ। একে বলে খাতির।

নীলকে কিছু না বলে লেখাটা পড়লাম। বাংলার তর্জমা করলে দাঁড়ায়, নীলাঞ্জন ব্যানার্জির পূর্ববর্তী অনুসন্ধান এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পদ্ধতি লক্ষ্য করে কমিশনার সাহেব অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন। বর্তমানে পাপড়ি হত্যা রহস্যের ক্ষেত্রে শ্রীব্যানার্জি প্রথম দিনই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বুদ্ধির উপর আস্থা রেখেই তিনি শ্রীব্যানার্জিকে এই হত্যা রহস্যের সমাধানে বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছেন। শ্রীব্যানার্জি তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে এই বহস্যের সমাধান করলে পুলিস কর্তৃপক্ষ তাকে সর্ববিষয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন। শ্রীব্যানার্জির সাফল্য কামনা করে দস্তখত করেছেন স্বয়ং পুলিস কমিশনার।

পড়া হয়ে গেলে চিঠিটা ভাঁজ করে টেবিলে চাপা দিয়ে রাখলাম। পাইপ টানতে টানতে সত্যেনদা বললেন,—কি নীলবাবু, এবার খুশি তো?

—সত্যেনদা, এটা বোধহয় ঠিক খুশি অখুশির ব্যাপার নয়। আসলে এই ইনভিটেশনটা বোধ হয় আমার পক্ষে সম্মানের। তাই না?

—নিশ্চয়ই। মাথা নেড়ে সত্যেনদা বললেন।

—তাছাড়া, নীল আগের কথার জের টেনে বলল, উপযাচকের মতো কেসটার মধ্যে মাথা গলালে সম্মান থাকে না। আর আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমি টাকাপয়সা চাই না। চাই সম্মান। সেটা হারাতে কোন মতেই রাজি নই।

—সেই জন্যেই তুমি যখন আমাকে সবকিছু জানালে, আমি সঙ্গে সঙ্গে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তোমার কথা বললাম। উনি তো তোমাকে ভালো করেই চেনেন। খুব আনন্দের সঙ্গেই উনি এই চিঠিতে সই করে দিলেন। এবার তোমাব খুশিমত এগিয়ে যাও।

হঠাৎ আমি বললাম,—আচ্ছা, স্ট্রেইট লায়ন আবাব খেপে যাবে না তো?

সত্যেনদা হেসে ফেললেন,—স্ট্রেইট লায়ন মানে সরল সিংহ? তা একটু কি আর জেলাস হবে না?

নিশ্চয়ই হবে। তবে অন্য কেউ হলে খেপে যেতেন। নীলের ক্ষেত্রে সেটা হবে না। নীলকে তো উনি নিজেই ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাহলে আর রাগার কি থাকতে পারে? তাছাড়া অ্যাকচুয়ালি কেসটা তো সরল সিংহের এলাকারই। দায়িত্ব তো ওঁরও রয়েছে। না না, ও নিয়ে কিছু ভাবার নেই। গো অ্যাহেড, নীল। আর কেউ না থাক আমি তো আছিই তোমার সঙ্গে।

নীল হেসে জবাব দিল,-- সে আমি জানি সত্যেনদা। তাই তো গোয়েন্দাগিরিতে গোড়ার দিকে তেমন ইচ্ছে না থাকলেও এখন আস্তে আস্তে ইনভলভ্‌ড্‌ হয়ে যাচ্ছি।

— তাহলে এখন বল, তুমি কি কি ভেবেছ বা ভাবছ?

একটুখানি চুপ করে থেকে নীল কি যেন ভাবল। তারপর সকালে নীল আমাকে যে যে কথাগুলো বলেছিল তাই আগাগোড়া এক এক করে সব খুলে বলল। কেবলমাত্র সিংহীমশাই-এর বোকামিগুলো বাদ দিয়ে। গভীর মনোযোগ দিয়ে সত্যেনদা সব শুনলেন তারপর ধীরে ধীরে বললেন,—এখন তাহলে তোমার সামনে তিনটে প্রবলেমের আশু মীমাংসা হওয়া দরকার। এক নম্বর, কাল রাত্রে ও বাড়িতে কোন্ মহিলার কান্না তুমি শুনেছিলে? দু'নম্বর, অ্যাকোয়ারিয়ামটা কেন এলোমেলো হয়েছিল? তিন নম্বর, পাপড়িদেবীর চাবির রিং কোথায় গেল? চাবি হারালে উনি গয়নাগাটি পরলেন কেমন করে?

মাথা নেড়ে নীল সম্মতি জানিয়ে বলল,—সব থেকে আগে আমার পাওয়া দরকার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট। ভিসেরা রিডিং না পাওয়া গেলে হত্যাকারীর নেচারটা বোঝা যাচ্ছে না।

নীল একটু যেন অধৈর্য হয়ে পড়ল।

—কিন্তু রিপোর্টটা পেতে কি খুব দেরি হবে?

সত্যেনদা একটু হেসে হেসে বললেন,-- যা তোমাদের লোডশেডিং এর ধুম। অন্ধকারে কি ঠিকমত ঠিক সময়ে রিপোর্ট পাওয়া যায়? তবে আমার মনে হচ্ছে কালকের মধ্যেই রিপোর্ট পেয়ে যাবে।

—লাহা বাড়ির খবর কি?

—জানি না। সিংহীমশাই হয় তো খবর রাখছেন।

—ওদের দিক থেকে কিছু তাড়ার ব্যাপার শুনলেন?

—তেমন কিছু আমি শুনি নি। তবে তোমার চুপ করে বসে থাকা উচিত নয়।

এবার আমিই উত্তরটা দিলাম,—না সত্যেনদা, নীল কিন্তু একদম বসে নেই। হয়ত শারীরিকভাবে বসে আছে কিন্তু মনে মনে, আমি জানি, পাপড়ি লাহা ছাড়া ওর মাথায় অন্য কিছু নেই।

হঠাৎ সত্যেনদা হাতঘড়িটা দেখেই উঠে পড়লেন,—আজ চলি নীল। আমারও হাতে অনেকগুলো ঝামেলার কেস ঝুলছে। পরে একদিন বলব।

—মার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—না, যাবার সময় দেখা করে যাব। চলি। উইস ইউ বেস্ট অব লাক। মাঝে মাঝে দেখা কোরো।

—সে আর বলতে।

সত্যেনদা চলে গেলেন। নীলও ধীরে ধীরে সোফার পুরু গদিটার মধ্যে চাদর মুড়ি দিয়ে ডুবে গেল। ওকে দেখে বেশ বুঝতে পারলাম আজ আর ওর সঙ্গে এসব নিয়ে কোন আলোচনা করে সুবিধে হবে না। হাজার ডাকাডাকি করলেও ও এখন হুঁ-হাঁর বেশি কিছুই উত্তর দেবে না। মিনিট পাঁচেক আমি চুপ করে বসে থেকে উঠে পড়লাম। শীতের রাত। যেতেও হবে অনেকটা। 'আমি চলি রে' বলে বেরিয়ে পড়লাম।

ঠিক তিন দিন পর রবিবার সকালে নীল এলো আমার বাড়িতে। যথারীতি ভুবনবাবুর মোরগের ডাক শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সেদিনও। দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে ভাবছিলাম নীলের বাড়িতেই যাব। ভাগ্যিস বেরিয়ে পড়ি নি। তাহলে দেখা হোত না।

খুব গম্ভীর মুখ নিয়ে নীল এসে বলল,—চল, একটু বেরুতে হবে।

—তা না হয় বেরুচ্ছি, কিন্তু পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেলি?

তেমনি গম্ভীর হয়েই ও মাথা নেড়ে বলল, —হ্যাঁ, পেয়েছি। বড় সাংঘাতিক ব্যাপার রে!

—একটু ক্লিয়ার করে বল। নইলে বুঝব কেমন করে?

—মার্ডারটা যে খুব সাদামাঠা নয় তা আমি প্রথম দিনই বুঝতে পেরেছিলাম। হত্যাকারী নিঃশব্দে কাজ সারতে চেয়েছিল। আর তাতে কৃতকার্যও হয়েছে। বন্দুক পিস্তল বা ছোরাছুরির ধারে কাছে না গিয়ে বড় অদ্ভুত উপায়ে খুনটা করেছে। এমন ভাবে হত্যা করা হয়েছে যা সাধারণ পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ধরা পড়বে না। আমি ভাবতে পারি নি এভাবে মার্ডার হয়েছে।

ধৈর্য হারাচ্ছিলাম। বললাম,—তাড়াতাড়ি বল।

নীল একটা সিগারেট ধরাল। বেশ আগ্রহ সহকারে দীর্ঘমেয়াদী একটা টান দিয়ে আস্তে আস্তে নাক মুখ দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

রেগে গিয়ে বললাম,—গাঁজাখুর মত মৌজ করে ধোঁয়া ছাড়বি, না আসল কথাটা বলবি?

—তোকে আমি আগেই বলেছিলাম হত্যাকারী অত্যন্ত বুদ্ধিমান। কেবল বুদ্ধিমান না, ডাক্তারি শাস্ত্রে তার জ্ঞান আছে যথেষ্ট। এও বলেছিলাম যে হত্যা করেছে সে হয় ডাক্তার, নয় কম্পাউণ্ডার। কিভাবে খুন করেছে জানিস, এম্‌টি সিরিঞ্জ ভেইনে পুস করে কয়েকটা বাব্‌ল চালান করে দিয়েছে। আর সেটা সটান গিয়ে হার্টের রেসপিরেশানের দরজাটাকে করে দিয়েছে ব্লকড্। আর তার অবধারিত ফল মৃত্যু। সাধারণত এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যেই এইভাবে একজনের মৃত্যু ঘটানো যেতে পারে।

হাঁ করে বোকার মতো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম,—বলিস্ কিরে?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। সাধারণ পোস্টমর্টেম-এ এটা ধরা যায় না। এর জন্যে অন্য প্রসেসে বডি ওপন্ করতে হয়। যার নাম এয়ার এম্‌বলিজম্।

—সেটা কি জিনিস?

—খুব ইনটারেস্টিং। একটা বড় বাথ টাব-এর মধ্যে বডিটাকে শুইয়ে দিয়েছে টাবটা কানায় কানায় জল ভর্তি করে দিলে নিশ্চয়ই সেখানে কোন বাতাস থাকবে না?

—না।

—এবার ঐ অবস্থায় খুব সরু আর তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে হার্টটা ওপন করলেই যদি বাব্‌ল দ্বারা রেসপিরেশন চোক্‌ড্ হয়ে থাকে তাহলে সেই বাব্‌ল্‌টা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসবে। এক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছিল। আর অবধারিত নিয়মে তিনচারটি বাব্‌ল পাপড়ির হার্ট থেকে বেরিয়ে এসে প্রমাণ করে দিয়েছে ভেইনে কোন মেডিসিন অ্যাপ্লাই না করে কেবলমাত্র কয়েকটি বুদবুদে চিরদিনের মতো তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এবং এটা হত্যা।

আমার মুখ থেকে নিজের অজান্তেই একটা বাক্য নির্গত হল—উঃ শালা মানুষের কি বুদ্ধি!

নীল বলল—বড় সর্বনেশে বুদ্ধি রে। এখন এই সর্বনেশে লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে।

—কাউকে সন্দেহ করেছিস?

—দূর! সব কিছু অগাধ জলে। ভালো করে লোকগুলোর সঙ্গে পরিচয়ই হল না, কে কি কেমন তাই জানলাম না।

—আচ্ছা, তুই তো একবার বলেছিলি হত্যার চরিত্র দেখে হত্যাকারীর ইমেজ পাওয়া যায়।

—এখনও তাই বলছি।

—তাহলে তো প্রথমেই মনে আসবে অরিন্দম বাসুর কথা।

—ডাক্তার বলে? কেন কোন কম্পাউন্ডার হলে তার অসুবিধাটা কোথায়?

—না, তা নয়। কিন্তু কম্পাউণ্ডার এখানে আর কে আছে?

—থাকতে পারে। আমরা তো আর সবাইকে চিনি না। কারো অতীত ইতিহাসও আমাদের জানা নেই। আবার এও হতে পারে যে, যে হত্যা করেছে সে ডাক্তারও নয় অথবা কম্পাউণ্ডারও নয়।

—তাহলে কি এইভাবে ইনজেক্ট করা সম্ভব?

—নয় কেন? ইনজেকশান দেওয়াটা সম্পূর্ণ প্র্যাকটিসের ব্যাপার। প্র্যাকটিস করলে তুই আমি যে

কেউ ও কাজটা করতে পারি। তার জন্যে ডাক্তার, কম্পাউন্ডারের দরকার হয় না।

—হত্যাকারী তাহলে খুব রিস্ক নিয়েছিল বলতে হয়।

—কিসের?

—এক বাড়ি লোক। এত লোকের মধ্যে আবার যে সে নয়, সবার দৃষ্টি যার ওপর সেই কনেকেই হত্যা করা, তাও ছুরি বন্দুক দিয়ে নয়, এটা রিস্ক্ নয়?

—হয়ত রিস্ক্ ছিল। তবু আমার মনে হয়, হত্যাকারী ইচ্ছে করেই বেছে বেছে ঐ দিনটাই খুন করার পক্ষে সব থেকে সুবিধেজনক সময় বলে মনে করেছিল।

—কেন?

—সাধারণত বাড়িতে বিয়ে-টিয়ে হলে লোকে ব্যস্ত থাকে নানান কাজে। প্রত্যেকটা লোকই যখন তখন যেখানে খুশি যেতে পারে কাজের অজুহাতে। হত্যাকারীকে অন্য কেউ সে সময় যদি দেখেও ফেলতো, সে যা হোক একটা কিছু অছিলা দেখাতে পারতো। দ্বিতীয়ত, নানান কাজে লোকে ব্যস্ত থাকার দরুন কোন বিশেষ একজনকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। তাছাড়া পাপড়িকে হত্যা করার পক্ষে আরো একটা সুবিধে, পাপড়ির একটা নিজস্ব ঘর আছে, সেখানে একটা অ্যাটাচ্‌ড্ বাথ আছে। চট্ করে পাপড়ি ছাড়া অন্য কেউ বড় একটা সে ঘরে ঢুকবে না।

নীলকে বাধা দিয়ে বললাম,—কিন্তু, বিয়ের দিন যতই সেপারেট ঘর থাক, কনের ঘরে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ ঢুকবে। নানান কারণে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় কনের ঘরেই তার সাজটাজগুলোর কাজ সারা হয়।

নীল বলল,—কথাটা অযৌক্তিক নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাই হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে হয়নি। কনের সাজা-টাজার ব্যাপারগুলো হয়েছিল অন্য ঘরে। আর বাসরটা হয়েছিল পাপড়ির নিজের ঘরে। আগেই বলেছি, হত্যাকারী ও-বাড়ির সকলের পরিচিত। এবং সে নিশ্চয়ই এই সব খবর জানতো। আর জানতো বলেই তার পক্ষে ঐ সময়টা বেছে নেওয়া সব থেকে যুক্তিসঙ্গত।

—কেন? পাপড়ি যদি বিয়ের আগে বাথরুমে না যেত?

—নাও যেতে পারতো। তবে সাধারণত বাথরুম জায়গাটা এমনই যেখানে মানুষ নিজেকে সব থেকে বেশি আপন করে পায়। সেখানে মানুষ নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে। সেখানে মানুষ নিজেকে যাচাই করে। এই মনস্তত্বটা হত্যাকারীর জানা। জীবনের এক চরম মুহূর্তে বিশেষ করে মেয়েরা, নিজের বাথরুমটা একবার ঘুরে যাবেই। অন্তত একবারও আয়নার সামনে নিজেকে দাঁড় করাবেই। তার ওপর সেটা কোন কমন বাথরুম নয়। ওটা ওর একান্তই ব্যক্তিগত। এক্ষেত্রে তুই বলতে পারিস, আমার কল্পনাটা একটু কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঘটনা তো তাই-ই ঘটেছে। শেষবারের মত ও একবার বাথরুমে গিয়েছিল। যেটা হত্যাকারীর একান্তই কাম্য ছিল।

কি জানি নীলের ব্যাখ্যা ঠিক কি না! কিন্তু ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে নীল ভুল করছে না। তবু একবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—বেছে বেছে বিয়ের দিনটা বেছে নেবার কি আর কোন কারণ নেই?

—কে বলছে নেই! আমি তা একবারও বলি নি। হয়ত শেষকালে দেখা যাবে বিয়ের দিনেই হত্যা করার পেছনে অন্য কারণ রয়েছে। আমি যা বললাম সবটাই অনুমানের ওপর।

নীলের দিকে অন্যমনস্কের মতো একটু তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা, সেই প্রশ্ন দুটোর জবাব পেয়েছিস?

—কোন দুটো?

—সেদিন কার কান্নার আওয়াজ শোনা গিয়েছিল? আর অ্যাকোয়ারিমের গাছগুলো এলোমেলো হয়েছিল কেন?

—না। তাই তো আজ এখনই ও-বাড়িতে একবার যাওয়া দরকার।

—তাহলে আর দেরি করে লাভ নেই। চল।

জামা-কাপড় আমার পরাই ছিল। মিনিট দুয়েকের মধ্যে লাহা বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

নীল কিন্তু সোজাসুজি রামতনুবাবুর বাড়ি ঢুকল না। গলির থেকে একটু দূরে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে বলল,—চল, একটু ঘুরে যাওয়া যাক।

সামান্য একটু ঘুরে লাহা বাড়ির একেবারে পিছনের দিকে চলে এলাম। দুনিয়ার যত নোংরা আর আবর্জনায় অপরিষ্কৃত গলিটা। ঠিক গলি বলা যায় না। পগার বলতে হয়। তিন থেকে চার ফুট চওড়া একটা সরু রাস্তা দু'দিকের বাড়িগুলো আলাদা করে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। লাহা বাড়ির ঠিক পিছনেই একটা টিনের শেড দেওয়া, হয় লেদের কারখানা নয়ত গ্যারাজের পিছনের অংশ। নোংরা আবর্জনা ডিঙিয়ে আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম পাঁচিলের ধারে। একটা ছোট্ট খিড়কি দরজা ছাড়া পাঁচিলের ও-পাশে যাবার কোন রাস্তা নেই। পাঁচিলটাও বেশ উঁচু। প্রায় দু'মানুষ উঁচু পাঁচিলের মাথায় কাচের ভাঙা টুকরো সাজানো। চোর-ছ্যাঁচড়ের হাত এড়াবার জন্যে। নীল একবার দরজাটা ঠেলে দেখল। ভেতর থেকে বন্ধ। তার মানে মেথর এসে পরিষ্কার করে চলে গেছে। দেওয়ালটাও ও একবার ভালো করে দেখে নিল। কিন্তু কোথাও কোন পায়ের ছাপ বা অন্য কোন রকম বিশেষ চিহ্ন নজরে পড়ল না। দেখতে দেখতে আপন মনেই বলল,—আমার অনুমানই ঠিক। এ রাস্তাটা খুনি ব্যবহার করেনি। যা কিছু হয়েছে বাড়ির মধ্যেই। চল, এবার ফেরা যাক।

লোহার গেটটার মুখেই দেখা হয়ে গেল সুতনুবাবুর সঙ্গে। তিনি বোধহয় কোথাও বেরুচ্ছিলেন। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা। গায়ে একটা খয়ের রঙের আগাগোড়া জংলা কাজ করা আলোয়ান। সকালের উজ্জ্বল রোদে ভদ্রলোকের সুশ্রী মুখে কোথায় যেন একটা বিষণ্ণতার ছাপ লুকিয়ে রয়েছে। খুবই স্বাভাবিক। মাত্র ক'দিন আগেই এই বাড়িতে একটা অকল্পনীয় ঘটনা ঘটে গেছে। নিজের একমাত্র বোন বিয়ের ঠিক আগেই খুন হয়েছে। এর সঙ্গে পরিবারের সুনাম দুর্নামের অনেক কিছু রয়ে গেছে। বাড়ির বড় ছেলে হিসেবে এ বিষণ্ণতা অত্যন্ত স্বাভাবিক। উনি বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন। প্রথমে আমাদের খেয়ালই করেননি'। আনমনে মাথা নিচু করে গেটটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। নীলের ডাকে ফিরে তাকালেন, বললেন,—কি আশ্চর্য! আমি যে আপনার বাড়িই যাচ্ছিলাম।

অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে নীল বলল,—আমার বাড়িতে? কেন বলুন তো?

ভদ্রলোক বোধ হয় রাস্তায় দাঁড়িয়ে এইভাবে কথা বলতে চাইছিলেন না। তাই বললেন,—যখন এসেই পড়েছেন, তখন চলুন বাড়ির ভেতরে যাই। এভাবে ঠিক রাস্তায় দাঁড়িয়ে

—বেশ তো চলুন। আমিও অনেক দরকারে এখানে এসেছি।

সুতনুবাবুর পেছন পেছন আমরা ভেতরে এলাম। কত পরিবর্তন মাত্র এই ক'দিনেই। সামিয়ানা মেরাপ সব উঠে গেছে। সেদিন প্রসাধনের আড়ালে ভালো করে সব দেখা হয়নি। তাছাড়া কাজের বাড়ি। তার ওপর দুর্ঘটনা।

সকালের রোদটা এসে পড়েছে বাড়ির সামনের ছোট্ট লনটায়। এখনও খুঁটি পোঁতার দাগ রয়ে গেছে। ছিমছাম সাজানো লন। আগেকার আমলের সাদা পাথরের দুটো পরীর স্ট্যাচু। শীতকালীন কিছু লাল সাদা ফুলের বাহার। জাজিমের মতো নতুন ঘাসের আস্তরণ। দুটো লোহার লম্বা বেঞ্চ মুখোমুখি পাতা রয়েছে।

সব কিছু থাকা সত্ত্বেও একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। এ পাড়াটাই বোধহয় একটু নির্জন। তেমন লোকজনের আধিক্য চোখে পড়ে না। আর এ বাড়িটা তো নিস্তব্ধ হবেই। মাত্র ক'দিন আগে সব কোলাহল থেমে গেছে। অথচ এখন কত আনন্দের দিন হতে পারতো।

লন পেরিয়ে আমরা বৈঠকখানায় এসে পড়লাম। দিব্য প্রশস্ত ঘর। অত্যল্প কালের মধ্যেই যে ঘরের চুনকামের কাজ হয়েছে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। এখনও বইয়ের আলমারিগুলোর গায়ে দু'এক ফোঁটা করে কোথাও কোথাও রঙের ছিটে লেগে রয়েছে। তাছাড়া নতুন চুনের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। দেওয়ালে পূর্ব-পুরুষদের সব ছবি টবি টাঙানো রয়েছে। প্রত্যেকটা ছবিতেই বড় বড় জুঁইয়ের মালা ঝুলছে।

মালাগুলো একটু শুকিয়ে লাল্চে আকার ধারণ করেছে। দেখে মনে হল বিয়ের দিনে মালা দিয়ে সাজানো হয়েছিল। কাঠের ব্লেডের দুটো সীলিং ফ্যান প্রশস্ত ঘরটার দু'ধারে ঝুলছে। বড় বড় তিনটে আলমারি। দুটোয় ঠাসা আইনের বই। অন্যটা ফিজিওলজি আব মেডিক্যাল সায়ান্স-এর বই। একটু আশ্চর্য লাগল। এ বাড়িতে একজন লোহাব ব্যবসায়ী। অন্য জনের কোন সঠিক লাইন নেই। আর তৃতীয় জন চার্টাড। তাহলে এ বইগুলো কার?

ঘবের ঠিক মধ্যিখানে মেহগনি কাঠের সোফাসেট। এগুলোও পুরনো কালেব। এ ধরনের সোফা-টোফা আজকাল বড় একটা কেউ ব্যবহাব কবে না। একটা সাদা পাথবের বড় গোল টেবিল মাঝখানে পাতা।

সোফায় বসতে বসতে নীল জিজ্ঞাসা কবল,—আচ্ছা সুতনুবাবু আপনি তো বললেন না, হঠাৎ আমার বাড়ি যাচ্ছিলেন কেন?

—বলছি, সব বলছি। একটু বসুন, আমি চা বলে আসি।

—থাক না, চায়ের আবার কি দবকার?

—সে কি হয়? আপনি বলতে গেলে প্রথম আমাদেব বাড়ি এলেন।

বলতে বলতেই উনি বেবিয়ে গেলেন। নীল ওর পকেট থেকে সিগারেট বাব করে ধরিয়ে আমার দিকে প্যাকেটটা ঠেলে দিল। সিগারেট ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞাসা কবলাম,—কি ব্যাপাব বল তো? এতো আইনের আর মেডিকেলের বই এ বাড়িতে কেন?

—কেউ হয়তো ডাক্তারি বা ওকালতি প্র্যাকটিস করতো। খুব হালকা করে সিগাবেটেব ধোঁয়ার মতোই কথাগুলো ভাসিয়ে দিল।

সুতনুবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। আমাদের সামনের সোফায় বসে অন্যমনস্কের মত কয়েক মিনিট সামনের একটা ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন,—সত্যি কথা বলতে কি জানেন মিস্টার ব্যানার্জি, পুলিসের ওপর আমি ঠিক ভরসা করে উঠতে পারছি না। তাব মানে আমি বলছি না পুলিসে এফিসিয়েন্ট স্টাফ নেই। অনেক আছেন। তবু, মানে আমি ঠিক বলে বোঝাতে পারছি না, মানে ঠিক বিশ্বাসটা তৈবি করতে পাবছি না। তাই দু'দিন ধবে আপনাব কথা বিশেষ করে ভাবছিলাম।

—কিন্তু আমি তা পুলিসেব লোক নই।

—সে জন্যেই তো আপনার কাছে যাওযা। আসলে পুলিস নানা ধবনের কেস-টেস নিযে এমনভাবে জড়িয়ে থাকে, সামান্য একটা কেসের দিকে তারা সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পাবে না। তার ফলে অধিকাংশ কেসই কিছুদিন পব আস্তে আস্তে ধামা-চাপা পড়ে যায। তাই এই কেসটাব ভার আমি পার্সোন্যালি আপনার হাতে দিতে চাই। আমি চাই এটা যেন ধামা-চাপা পড়ে না যায়। আর এব জন্যে আপনার উপযুক্ত সম্মান দক্ষিণা দিতে না পারলেও ঠিক অসম্মানও কবব না।

ধীর, সংযত এবং মার্জিত কণ্ঠস্বরে সুতনু কথাগুলো বললেন। ওঁর কথার মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষার ছাপ ফুটে উঠেছে।

নীল এবাব বলল,—কিন্তু সুতনুবাবু, আমি পুলিস না হলেও, পুলিসের ওপর মহলের অনুরোধে কেসটা আমাকে টেক আপ করতে হয়েছে সবকারিভাবে। অতএব আপনার কুণ্ঠার কোন কারণ নেই। আপনি না বললেও এ কাজটা আমি নিয়ে নিযেছি। এ একদিকে ভালোই হল। আপনাদেবও যখন ইচ্ছে একই তখন আশা করি আপনাদের দিক থেকে সব রকম সাহায্য আমি পাব।

—নিশ্চয়ই। একথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

—বেশ, আজ আমার এখানে আসার কারণ খানিকটা অনুমান করতে পারছেন নিশ্চয়ই।

—মনে হয, খানিকটা।

—তাহলে আমার ক'টা প্রশ্নের সহজ উত্তর আপনাদের কাছ থেকে আশা করছি। কোন কিছু গোপন না কবে উত্তরগুলো দিলে আমার তদন্তের কাজটা ইজি হয।

—প্রশ্ন করুন। আমার জানা কোন কিছুই আমি গোপন করব না। কারণ আমি চাই আমার একমাত্র বোনের হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে, শেষের দিকে সুতনুর গলার আওয়াজটা বেশ কঠিন শোনালো।

নীল এতক্ষণ একদৃষ্টে সুতনুর দিকে চেয়ে ছিল। এইভাবে আরো কিছুক্ষণ থেকে হঠাৎ ও জিগ্যেস করল,—আপনার বোনের, আই মিন পাপড়িদেবীর এটা বোধ হয় লাভ ম্যারেজের ব্যাপার ছিল। তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমি শুনেছিলাম, এই নিয়ে আপনাদের মধ্যে একটা পারিবারিক অশান্তি ঘটেছিল? তাই কি?

উত্তরটা দিতে গিয়ে সুতনু বোধহয় একটু ইতস্তত করলেন। তারপর একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—যা শুনেছেন তা ঠিক। পাপড়ির এই বিয়েটা এ বাড়ির প্রায় কেউই মেনে নিতে পারেন নি।

দুম করে নীল প্রশ্ন করল,—আপনি?

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা এলো না সুতনুর কাছ থেকে। কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তারপর বেশ দ্বিধা নিয়েই বললেন,—শেষের দিকে আমি রাজিই হয়েছিলাম, কিন্তু প্রথম দিকে, সত্যি বলতে কি আমারও আপত্তি ছিল।

—কেন, জানতে পারি?

—কোন দিক দিয়েই উদ্দালক পাত্র হিসেবে কম কিছু ছিল না। তার ভালো উপার্জন, দেখতে শুনতেও বেশ। কিন্তু

-দয়া করে কোন কিছু গোপন করবেন না।

—জানি আজকের দিনে এসব নিয়ে কেউ কিছু ভাবে না। শহর জীবনে প্রায় সব মানুষই নিজের খেয়াল নিয়েই ব্যস্ত থাকে। দৈনন্দিন জীবনের হাজার চাহিদার খোরাক মেটাতে গিয়ে মানুষের অন্য কিছুতে মন দেবার সময় থাকে না। তবু সেই মানুষই, অন্য মানুষের সামান্য ছিদ্র পেলে যে সেখানেই নাক গলানোর চেষ্টা করে না, তা নয়।

—আপনি কিন্তু এখনও আসল কারণটা বললেন না?

—বলছি। উদ্দালকের একটা পারিবারিক স্ক্যান্ডাল রয়েছে।

—যেমন?

—অনিন্দিতা মিত্রের নাম শুনেছেন?

—কে অনিন্দিতা? যিনি সিনেমায় অভিনয় করেন?

—হ্যাঁ। উদ্দালক সেই অনিন্দিতারই ছেলে।

—বেশ তো, তাতে হোলটা কী?

—আমরা আজকের ছেলেরা, আমরা এসব হয়ত মানি না বা সংস্কারে আমল দিই না। কিন্তু আমার বাড়ি এই শহরের একটা বনেদী পরিবার। আমার বাবা কাকা এঁরা কোন মতেই অভিনেত্রী মায়ের কোন ছেলেকে ঠিক জামাই হিসেবে মেনে নিতে পারেননি।

—অভিনেত্রীর ছেলের কি বিয়ে হয় না?

—কিছু মনে করবে না। বলতে আমার খুব খারাপ লাগছে। কারণ তিনি আমার মায়ের মতোই। তবু অভিনেত্রী জীবনে বোধহয় কিছু না কিছু স্ক্যাণ্ডাল থাকে। অনিন্দিতা দেবীরও আছে। আর অভিনেত্রী অনিন্দিতাকে এ শহরের সবাই চেনে। তাই, তাঁর ছেলেকে ঠিক, আমি বোধহয় আপনার কাছে আমাদের বাড়ির সংস্কারকে তুলে ধরতে পারছি না।

—আমি বুঝতে পারছি সুতনুবাবু। কিন্তু তার জন্যে তো উদ্দালকবাবু দায়ী নন।

—না, কখনই নন। বরং ছেলে হিসেবে উদ্দালককে আমার খুব ভালো লাগে। যেমন স্বভাবচরিত্র, তেমনি শান্তশিষ্ট। আর খুব ব্রাইট ফিউচারের ছেলে। কিছু না হলেও গাইয়ে হিসাবেই দারুণ নাম করা ছেলে হবে ভবিষ্যতে। ওর অমায়িক ব্যবহারের জন্যেই আমি শেষ পর্যন্ত সব সংস্কার ঝেড়ে

ফেলে এ বিয়েতে রাজি হয়েছিলাম।

—আপনার বাড়ির আর সকলে?

—রাজি কেউই হননি। কিন্তু পাপড়ির জেদের কাছে সবাই এক রকম বাধ্য হয়েই নিমরাজি হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ও জানিয়েছিল, ও অ্যাডাল্ট। পছন্দমত যে কোন ছেলেকেই ও বিয়ে করতে পারে। বাড়ির সকলের যখন এতই আপত্তি তখন ও এ বাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে উদ্দালকের সঙ্গে গিয়ে অন্যত্র ঘর বাঁধবে। বুঝতেই পারছেন, এক সম্মান বাঁচাতে গিয়ে আর এক কেলেঙ্কারিতে পড়তে হয়। লাহা বাড়ির মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে বংশের সম্মানটা কোথায় থাকে?

মাথা নিচু করে নীল গভীর মনোযোগ দিয়ে সুতনুর কথা শুনছিল। আস্তে আস্তে ও মাথা তুলে এক সময় প্রশ্ন করল,—আচ্ছা সুতনুবাবু, এ ব্যাপারে এ বাড়িতে সব থেকে আপত্তি কার বেশি ছিল।

—কাকা আর কাকিমার। বিশেষ করে কাকিমা। বড় গোঁড়া।

—আপনার বাবা?

—আপত্তি তো ছিলই। এমন কি উনি একদিন রাগের মাথায় পাপড়িকে মেরেও ছিলেন। কিন্তু মা মরা মেয়ে, বোধহয় শেষ পর্যন্ত সেই কারণেই বাবা রাজি হয়েছিলেন।

কয়েক সেকেন্ড নীল কি যেন ভাবল। তারপর সরাসরি সুতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, —বাড়িতে ডাক্তারি করেন কে?

আচমকা প্রশ্নে সুতনু একটু যেন বিব্রত বোধ করল। সেটা সাময়িক। বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বললেন,—আমার দুই কাকা। দেবতনু লাহা আর অতনু লাহা ওঁরা ছিলেন যমজ ভাই। দেবতনু কাকা পড়তেন ডাক্তারি আর অতনু কাকা আইন।

—দেবতনুবাবু কোথায়? তাঁকে তো সেদিন দেখলাম না।

—তিনি অনেকদিন আগেই মারা গেছেন।

—মারা গেছেন, তা কত বছর আগে?

—বাবার মুখে শুনেছি, প্রায় উনত্রিশ বছর আগে। তখন আমি খুব ছোট।

—তিনি বিয়ে করেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তাঁর স্ত্রী বা ছেলেমেয়ে, তাঁরা কি এ বাড়িতেই থাকেন?

—তাঁর ছেলেমেয়ে নেই। তবে স্ত্রী আছেন। মানে আমার সেই কাকিমা কাকা মারা যাবার পর থেকেই পাগল হয়ে গেছেন।

—কোথায় থাকেন?

—এই বাড়িতেই। তবে ওকে বাইরে বেরুতে দেওয়া হয় না।

এ বিষয়ে আর দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন না করে ও বলল,—আজ তো রবিবার। নিশ্চয়ই বাড়িতে সবাই আছেন।

—হ্যাঁ, আছেন।

—আমি কিন্তু সকলকে কিছু না কিছু প্রশ্ন করব। আপত্তি নেই তো?

—আগেই বলেছি, আপনার তদন্তের জন্য আমাদের পক্ষে সম্ভব সব কিছুই করব।

—এবার তাহলে আপনার বাবাকে,

—আপনি বসুন। আমি ডেকে দিচ্ছি।

সুতনু বেরিয়ে গেলেন। উনি চলে যাবার মিনিটখানেক পরেই একজন কাজের লোক চা বিস্কিট আর মিষ্টি নিয়ে ঘরে ঢুকল। ট্রে নামিয়ে রেখে ও চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ নীলের গলার আওয়াজ পেলাম, —তুমিই সুদাম?

লোকটা চলেই যাচ্ছিল। নীল গলা চড়িয়ে ডাকল,—এই যে শোনো।

আওয়াজটা বোধহয় কানে ঢুকেছিল। লোকটা ফিরে তাকাল। নীল হাত নেড়ে ইশারায় কাছে ডাকল।

—তোমারই নাম সুদাম?

—আজ্ঞে?

—বলছি, তোমাব নামই তো সুদাম?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এ বাড়িতে কতদিন আছ?

—তা আজ্ঞে বছর তিরিশ।

—রোজ সকালে জমাদারকে খিড়কির দবজা খুলে দেয় কে?

—আজ্ঞে আমিই।

—তোমার দিদিমণি যেদিন মারা গেলেন সেদিন কে খুলেছিল?

—আজ্ঞে আমিই দিই।

—জমাদার আসে কখন?

—আজ্ঞে শীতকালে একটু দেরিই হয়। বোধ করি সাড়ে ছ'টা হয়।

—খিড়কির দরজাটা বন্ধ করে কে?

—আজ্ঞে আমিই করি।

—সেদিনও তুমি করেছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ঠিক করে মনে করে বল।

—আজ্ঞে, তা ঠিক স্মরণে আসছে না।

—তার মানে?

—আজ্ঞে বাবু, বুড়ো হয়েছি, আজকাল আর তেমন স্মরণশক্তি নাই।

—ঠিক করে মনে করে দেখতো সেদিন খিড়কির দরজা দিয়ে ছিলে কিনা?

—অনেকদিনের কথা বাবু, ঠিক মনে নাই। সেদিন আবার অনেক কাজের ফরমাশ ছেল কিনা! ছোটবাবু মাছ আনার তাগাদা দিচ্ছিলেন তো,

—মাছ আনার কথাটা মনে আছে আর এটা মনে নেই?

—আজ্ঞে বাবু, সূক্ষ্ম কথা তেমন মনে থাকে না।

—তোমার দিদিমণি কেমন লোক ছিলেন?

—আজ্ঞে হীরের পতিমা, আমারে বড় ভালোবাসতেন।

বলেই হাউমাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। লোকটা বোধহয় পাকা অভিনেতা। অন্তত আমার তেমনি মনে হল। দু'শ্রেণীর মানুষ হঠাৎ হঠাৎ কাঁদতে পারে। এক, সত্যিকারের যার মনে দুঃখ থাকে, আর এক, পাকা অভিনেতা। সুদামের কান্নার মধ্যে আন্তরিকতার চেয়ে অভিনয়টাই প্রথম মনে আসে। নীলও ওব কান্নাকে কোন আমল দিল না। প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে ওকে থামিয়ে দিল,—ওসব কান্নাকাটি পবে কোরো, যা জিজ্ঞাসা করছি উত্তর দাও।

লোকটা সত্যিই অভিনেতা। নিমেষে কান্না থেমে গেল। তাকিয়ে দেখি চোখে এক ফোঁটাও জল নেই। হাঁ করে নীলের দিকে বোকার মতো ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে আছে।

—আমাকে চেনো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি করে?

—সেদিন যেন দারোগাবাবুর সঙ্গে এয়েছিলেন?

—তবে যে শুনলাম তুমি চোখে ভালো দেখতে পাও না?

সুদামের চোখ দুটো হঠাৎ বেশ বড়ো হয়ে গেল। মনে হল একটা ভয়ের ক্ষীণ রেখাও যেন ওর দু'চোখে উঁকি দিতে শুরু করেছে। নীল আবার সেই ধমকের সুরে বলে উঠল,—তাকিয়ে আছ কি?

যা জিগ্যেস করছি তার উত্তর দাও।

—আজ্ঞে মাঝে মাঝে কম দেখি বাবু।

—বা, চমৎকার। তা আমাকে যখন চিনেছই তখন বুঝতে পেরেছ তো আমি তোমাকে এক্ষুনি গারদে পুরে দিতে পারি।

—আজ্ঞে বাবু, আমি কি অপরাধ করলুম?

—মিথ্যে কথা বলছ, তাই।

—আজ্ঞে না বাবু।

—ফের চালাকি হচ্ছে?

—না বাবু।

—তোমাদের আর এক কর্তা কতদিন আগে মারা গেছেন?

—তা বাবু আমি যে বছর এলুম, তো সেই বছরেই।

—একটু আগে বললে, তোমার পুরনো কথা কিছুই মনে থাকে না।

—সে তো বাবু খুব সূক্ষ্ম কথার কথা বলেছিলুম।

নীল বোধহয় আবার ধমকাতে যাচ্ছিল। এমন সময় রামতনু এসে ঘরে ঢুকলেন। পিছনে সুতনু। ওঁদের দেখে সুদাম যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কোন রকমে নীলকে নমস্কার করেই এক রকম দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নীল একটু মুচকি হেসে রামতনু লাহাকে হাত তুলে নমস্কার করল। সুঠাম সুদেহী লাহা মশাইকে কেমন যেন কৃশ আর ক্লান্ত লাগল। চোখের তলায় খুব হালকা একটা কালিমা জড়িয়ে রয়েছে। আভিজাত্যময় পুরুষটি যে সদ্য কন্যা হারানোর ব্যথায় ম্রিয়মাণ, তা ওঁকে দেখলেই বোঝা যায়। নীলকে প্রতিনমস্কার জানিয়ে তিনি ধীরে ধীরে সামনের সোফায় বসলেন। সুতনু এগিয়ে এসে বললেন, —বাবা ইনিই নীলাঞ্জন ব্যানার্জি। কাল এঁর সম্বন্ধেই তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। পাপড়ির কেসটা উনি অ্যাকসেপ্ট করেছেন। তারপর নীলকে উদ্দেশ করে বললেন, —মিস্টার ব্যানার্জি, বাবার সঙ্গে আপনি কথা বলুন। আমি যাই। বোধহয় আমার এখন থাকার প্রয়োজন নেই। তবে আমি ওপরে আছি। ডাকলেই আসব।

সুতনু বুদ্ধিমান। সে জানে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে তার থাকাটা অনুচিত। সুতনু চলে গেলে নীল একটু সঙ্কোচ নিয়ে লাহা মশাইকে বলল,—আমি জানি, এ সময়ে আপনাকে বিরক্ত করা আমার পক্ষে খুব অন্যায় কাজ হচ্ছে। তবু, দায়িত্বটা যখন আপনাদের দিক থেকেও আমার কাছে এসেছে তখন অপ্রিয় হলেও কিছু যদি প্রশ্ন করি, দয়া করে মানিয়ে নেবেন।

খুব গম্ভীর এবং মৃদু স্বরে লাহা মশাই বললেন,—যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার। আমি জানি এসবের প্রয়োজন আছে। কি জানেন মিস্টার ব্যানার্জি, পাপড়ি আমার বড় ভালো মেয়ে ছিল। সে চলে গেছে বলে বলছি না, জীবনে যেটাকে ন্যায্য বলে মনে করেছে, তাই-ই করেছে। অন্যায়কে সে কখনও প্রশ্রয় দেয়নি। শুনেছেন বোধহয়, মেয়ে আমার ভালোবেসেছিল একটি ছেলেকে। ভালোবাসাটাকে সে সৎ আর সুন্দরভাবে নিয়েছিল। তাই সে আমাদের সংস্কারকে মূল্য দেয়নি। না দিক। তার জন্য আজ আর আমার কোন অনুযোগ নেই। আমি তার জেদকে মেনেই নিয়েছিলাম। তবু শেষ রক্ষা হল না।

শেষের দিকে ওঁর গলাটা কেমন যেন ধরে এলো। একটু সময় নিলেন। তারপর বললেন, —আমার পাপড়ি-মার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তটাকে যে এমনভাবে কেড়ে নিয়েছে, মিস্টার ব্যানার্জি, আমি তার শাস্তি চাই। যেমন করে পারেন তাকে খুঁজে বার করুন। সেই নৃশংস পশুটাকে আমি শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, পাপড়ি তার কি ক্ষতি করেছিল?

উনি থামতে ঘরের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা নেমে এলো। নীল কয়েক মিনিট সময় নিলো এই নিস্তব্ধতা ভাঙতে। এক সময় সে প্রশ্ন করল,—লাহা মশাই, আপনাকে বেশিক্ষণ আমি বিরক্ত করব না। দু'একটা প্রশ্ন আমার জানার আছে।

—বেশ তো, বলুন।

—পাপড়িদেবীর এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য আপনাব কি কাউকে সন্দেহ হয়?

—কাকে সন্দেহ করব? কে আমার এমন শত্রু আছে তাও জানি না। জানি না তাকে মেবে কার কি লাভ হল?

—আপনাব আব এক ভাই তো অনেক দিন আগে মারা গেছেন?

—হ্যাঁ প্রায় ত্রিশ বছর হবে।

—কি হয়েছিল তাঁর?

—পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্টালি গড়িয়ে খাদে পড়ে যায়।

—এ নিযে কোন ইনভেস্টিগেশন হয়েছিল?

--হয়েছিল। ও খুব মদে অ্যাডিক্টেড ছিল। মদের ঝোঁকেই, ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাকসিডেন্ট।

—উনি তো বিয়ে করেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—ওঁর স্ত্রীর শুনলাম মাথা খাবাপ?

—হ্যাঁ দেবতনু মারা যাবার পরই বৌমার মাথাটি যায়। এখন তো টোট্যালি ম্যাড্।

সামান্য একটু ভেবে নিয়ে নীল জিজ্ঞাসা করল,—আপত্তি না থাকলে বলুন, আপনি কোন উইল-টুইল কবেছেন?

—একটা উইল আমি করে রেখেছিলাম। আর বোধহয় তার প্রয়োজন নেই।

—বয়ানটা কেমন ছিল বলবেন?

—আমার সব কিছু মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করেছিলাম। অবশ্য দুই বৌমার নামে ব্যাঙ্কে দু লাখ টাকা কবে ফিক্সড্ ডিপোজিট করা আছে। আমার মৃত্যুর পর ওঁরা সে টাকাটা সুদে আসলে পাবেন। আমাব ছেলে মেয়ের তাতে কোন অধিকার থাকবে না। অবশ্য আমার পাগল ভ্রাতৃবধূটির প্রাপ্য দুলাখের জিম্মাদার থাকবে আমাব ছেলে সুতনু আব অ্যাটর্নী বিপুল সেন। আমৃত্যু বৌমাব কারণেই সে টাকাটা খরচ করা হবে।

—অর্থাৎ ঐ চার লাখ বাদে বাকি যা কিছু সব সুতনুবাবু আব পাপড়িদেবীব?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিন্তু শুনেছিলাম এটা আপনাদেব পৈত্রিক ব্যবসা।

—ঠিক শুনেছেন। তবে বর্তমানে ব্যবসাব সম্পূর্ণ মালিকানা আমাব। ভাইদের কোন অংশ নেই।

—তাহলে এ বাড়িব মালিকানাও আপনার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবাব উইল অনুসাবে এ বাড়ি এবং ব্যবসা সবই আমার। অন্য দু' ভাইকেও একটি করে বাড়ি দেওয়া হয়েছিল। পবে দেবতনু আব অতনু আমাকে তাদেব বাড়ি বিক্রি কবে দেয়। প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সবই দেখাতে পারি।

—আপনাব বক্তব্য অনুসারে সম্পত্তির অধিকাংশই আপনাকে দেওয়া হয়েছে। কেন, তা জানতে পারি কি?

—আমার জীবিত ভাই অতনুকেই জিজ্ঞাসা কববেন।

—রামতনুবাবু, আর একটি মাত্র প্রশ্ন। আপনি বোধ হয শুনেছেন, আপনাব মেয়ে, আই মিন পাপড়িদেবীব ঘবের চাবিটা পাওয়া যাচ্ছিল না। সেটা কি পাওয়া গেছে?

—হ্যাঁ, পরদিন সকালে বাড়ির পিছনের বাগান থেকে পাওয়া গেছে। সুদামই আমাকে এনে দেয়।

—ভারি মজার ব্যাপার! ঠিক আছে, এবার আপনি যেতে পারেন। দয়া করে যদি আপনার ভাইকে

—বেশ, পাঠিয়ে দিচ্ছি, বলতে বলতে উনি চলে গেলেন। ক্ষণকাল পরেই অতনুবাবু এসে হাজির হলেন।

নীলই প্রথম প্রশ্ন করল,—চিনতে পারছেন?

—এমন সুন্দর চেহারার বুদ্ধিমান মানুষকে কি চিনতে দু'দিন সময় লাগে?

—তা তো বটেই। তা আজ রোববার। কোথাও যাননি?

—নাহ্, রোববারটা সাধারণত বাড়িতেই থাকি। সারা সপ্তাহ ধরে হাজার হাজার মাইল চষে বেড়াতে হয়। একদিন না রেস্ট করলে চলে? আর বয়সও তো হচ্ছে।

—আপনি বোধ হয় শুনেছেন আজ আমি কেন এখানে এসেছি?

—প্রশ্ন করবেন তো? করুন।

—আপনার ভাইঝি যেদিন মারা যান, অর্থাৎ ওঁর বিয়ের দিন আপনি কোথায় ছিলেন?

—শ্রীরামপুর।

—সেকি? বাড়িতে বিয়ে অথচ আপনি শ্রীরামপুর কেন?

—একটা অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যাপার ছিল।

—ফিরেছিলেন কখন?

—ইচ্ছে ছিল সকাল সকালই ফিরব। তা আর হল না। ট্রেনের গণ্ডগোল। তা ফিরেছি আপনার প্রায় সাতটা নাগাদ।

—বাড়িতে ফিরে আপনি কি দেখলেন?

—হইচই, চেঁচামেচি। সবাই পাপড়ির দরজার ধাক্কা দিচ্ছে। দরজা ভেতর থেকে লক করা।

—আপনি কি করলেন?

—দাদার কাছ থেকে ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি আনিয়ে দরজা খুলে ভেতর ঢুকলুম।

—কিন্তু আরো একটা দরজা তো ছিল?

—আরো দরজা মানে?

—মানে বাথরুমের পেছনের দরজা।

—ও, হ্যাঁ তা ছিল। কিন্তু তখন আর ওসব কথা মনে আসে নি। তাছাড়া ও দরজাটাও তো ভেতর থেকে বন্ধ থাকে।

—স্বাভাবিক। আপনারা ভেতরে গিয়ে দেখলেন উনি মৃত।

—প্রথমটা বুঝতে পারি নি। ভেবেছিলাম হয়ত অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে গেছে।

—এরকম মনে হল কেন? ওঁর কি ফিটের অসুখ ছিল?

—না না, কোনোদিন শুনি নি। তবে মরার কথা চট্ করে কারো সে সময় ভাবার কথা নয়। বিশেষ করে যে মেয়ের একটু পরেই বিয়ে।

—এ বিয়েতে তো আপনারও আপত্তি ছিল?

—ছিল।

—পরে আবার রাজিও হয়েছিলেন?

—কি করব বলুন। বাড়ির একমাত্র মেয়ে। আমার নিজের কোন ছেলেমেয়ে না থাকায় ওকেই আমি মেয়ের মতো মানুষ করতুম। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই মত দিয়েছিলুম। অবশ্য আমার মতামতে কি যায় আসে। দাদার মত না থাকলে কিছুতেই কিছু হোত না। দাদা জেদি মানুষ।

হঠাৎ নীল সম্পূর্ণ অন্য রাস্তায় প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল,—অতনুবাবু এ বাড়িতে তো আপনার কোন অংশ নেই, তাই না?

অত্যন্ত নির্লিপ্তের মত অতনু বললেন,—আজ্ঞে না।

—কেন জানতে পারি?

—আমার বাবার মর্জি।

দেখলাম ভদ্রলোক বাবার এই খামখেয়ালিপনায় বেশ অসন্তুষ্ট। নীল আবার প্রশ্ন করল, —আপনার বাবার এ ধরনের মর্জির কারণ কী হতে পারে? কিছু অনুমান করতে পারেন?

—না।

—আপনি ছোটবেলায় ডাক্তারি পড়েছিলেন তাই না?

হেসে উঠলেন অতনুবাবু। বললেন,—না, ডাক্তারি পড়ত আমার টুইন ব্রাদার দেবতনু। আর আমি পড়তাম আইন। অবশ্য দুজনেব কেউই শেষ পর্যন্ত পবীক্ষা দিতে পাবি নি। আমার ভালো লাগে নি। দেবুর ব্যাপারটা সে-ই জানত।

—হুঁ। আচ্ছা, পাপড়িদেবীর মৃত্যুর ব্যাপারে আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?

এতক্ষণ অতনুবাবু বেশ সহজ আব স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর দিচ্ছিলেন। কোন জড়তা বা দ্বিধার কিছু ছিল না। হঠাৎ নীলের এই প্রশ্নে ভদ্রলোক চোখ কুঁচকে অন্যমনস্কের মতো নীলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর গলার স্বরটা খুব নিচু করে বললেন,—হয়। একজনকে।

—কাকে?

—বলাটা কি ঠিক উচিত হবে?

—এ আপনার নিছক সন্দেহ। তাছাড়া আমি তো আর কাউকে কিছু বলতে যাচ্ছি না।

—অরিন্দম বসুকে।

—অরিন্দম বাসু? মানে আপনাদেব হাউস ফিজিসিয়ান?

—ফিজিসিয়ান না ঘেঁচু। বেটা পয়লা নম্বরি বজ্জাত। একটা বাঙামুলো।

—কিন্তু আমি তো শুনেছি উনি একজন ভালো ডাক্তার। ওঁর বাবাও আপনাদের পরিবারে অতি পরিচিত।

—সেটাই তো হল কাল মশাই। ভেবেছিলুম, ছেলে এ বাড়ির জায়গা নেবে। ছোঁড়া প্রথম দিকে বেশ ভালোই ছিল। কিন্তু পাপড়িকে দেখার পর থেকেই ওব মাথাটা গেল ঘুরে। নিজের বিয়ে করা বউকে তালাক দিয়ে পাপড়িকে বিয়ে করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। আমাদেব বংশে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। তাছাড়া পাপড়ি ওকে পাত্তা দিতো না। দেবেই বা কেন? উদ্দালকই ওর ধ্যান-জ্ঞান। কি ভালোই না বাসতো সে উদ্দালককে। তো, তখন ঐ বজ্জাত মুলোটা কি করল জানেন? যখন দেখল মেয়েটা আর একটা ছেলেকে ভালোবাসে, তাকে ছাড়া অন্য কোন ছেলেকে সে বিয়ে করতে কোন মতেই রাজি নয়, তখনই আরম্ভ করল বাগড়া দেওয়া।

—কি রকম বাগড়া?

—আরে ঐ তো সব খুঁজে-টুজে উদ্দালকের ফ্যামিলি হিস্ট্রি বার করেছে। ঐ ছোকরাই দাদার কাছে গিয়ে দাদার কান ভাঙিয়ে বিয়েটা নাকচ করতে চেয়েছিল। উদ্দালক সম্বন্ধে আমরা তো প্রায় কিছুই জানতুম না। ওই প্রথম এসে বলল, ওর মা সিনেমা করে। চরিত্রে গন্ডগোল। ওদেব ফ্যামিলিটাও ভালো না।

—তারপর?

—বাড়িতে তখন এইসব ব্যাপার নিয়ে প্রচণ্ড অশান্তি চলছে। স্বভাবতই আমারও মন খুব খারাপ ছিল। কারণ তার দিন দুয়েক আগে দাদা জীবনে যা করেন নি তাই করেছিলেন। রাগের মাথায় পাপড়িকে ঠাস ঠাস করে গোটাকতক চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন সন্ধে নাগাদ বাড়ি ফিরে একবার ভাবলুম মামণির কাছে যাই। আদর করে পাপড়িকে আমি মামণি বলে ডাকতুম। ওর ঘরটা তেতলায়। সিঁড়ি পেরিয়ে ওর ঘরের কাছে এসেছি, হঠাৎ শুনতে পেলুম মামণির ঘর থেকে চাপা কথাবার্তা ভেসে আসছে। একজন পুরুষ; একজন মহিলা।

মেয়েটির আওয়াজ চেনা। মামণি। কিন্তু ছেলে-গলার আওয়াটা চেনা চেনা হলেও ঠিক বুঝতে পারছিলুম না। কেমন যেন কৌতূহল হল। পাপড়ির ঘর থেকে তো কোন অপরিচিত ছেলের কণ্ঠস্বর আসতে পারে না। তবে কি পাপড়ি উদ্দালককেই এনে হাজির করল?

আশ্চর্য লাগল। পাপড়ির এত সাহস হবে? বাড়িতে যখন উদ্দালককে নিয়ে এত ঝামেলা চলছে তখনই ও উদ্দালককে নিয়ে এলো? মনে মনে ভাবলুম প্রেমে পড়লে মানুষ সত্যিই সাহসী হয়ে যায়। বিশেষ করে মেয়েরা। তার ওপর আবার এ যুগের এম.এ পাস করা মেয়ে। কৌতূহল দমন করতে

পারলুম না। পা টিপে টিপে দরজার গায়ে কান লাগিয়ে শুনতে গেলুম কি কথা হচ্ছে।

স্বীকার করছি মশাই কাজটা অন্যায়। অভিভাবকই হই আর যাই হই, প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ের ঘরে আড়ি পাতা অনুচিত। তবু অভিভাবকেব অহঙ্কারটা যাবে কোথায়?

ওদের কথা শুনতে গিয়েই ভুল বুঝতে পারলুম। উদ্দালক নয়। ঐ ডাক্তার অরিন্দম বাসু। ছোকরা তখন বলছে—ভেবে দেখো পাপড়ি, উদ্দালকের কাছে তুমি কিই বা পাবে? না পাবে বংশমর্যাদা, না পাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা। একটা সামান্য অফিসের জুনিয়ার অফিসার। আর একটু গান-টান জানে। এই সামান্য গুণেব জন্যে উদ্দালককে তোমার বিয়ে করা উচিত নয়। বরং তুমি কত কি হারাবে ভেবে দেখ। লোকে বলবে তুমি একজন নষ্টা মেয়েমানুষের ছেলেকে বিয়ে করেছ। মাথাটা কোথায় নেমে যাবে ভেবেছে? কত বড় বংশের মেয়ে তুমি তা ভুলে যেও না।

উত্তরে পাপড়ি বলেছিল, —বাঙালির মেয়েরা জীবনে একবারই বিয়ে করে, এটা আপনার জানা উচিত ছিল ডাক্তার। এও জানা উচিত ছিল, মেয়েরা কাউকে ভালোবাসলে চট্ করে অন্য কোন পুরুষকে সে জায়গায় বসাতে পাবে না। আর বংশ, মান, সামাজিক মর্যাদা? মেয়েদের একমাত্র গর্ব তার প্রেমিকের ভালোবাসা পাওয়া। আর কিছুতে নয়।

উত্তরে ডাক্তার বলেছিল, —ঘোর লাগা চোখের ওপর থেকে রঙিন চশমাটা সবিয়ে নিলে দেখতে পেতে জীবনে এক অসাধারণ ভুল করতে চলেছ।

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে পাপড়ি বলেছিল—ভুলে যাবেন না ডাক্তার আমি পাপড়ি লাহা। স্রোতের মুখে ভেসে যাবার মতো খড়কুটো হয়ে জন্মাই নি। ভালোবাসার মানুষকে বুকের মধ্যে আগলে রাখাব ক্ষমতা আমার আছে।

ডাক্তার শাসিয়েছিল, —এই তোমার শেষ কথা?

ভয় পাবার মেয়ে তো পাপড়ি নয়। বলেছিল, —শেষ কথা অনেক আগেই বলেছি। নতুন কবে বলার কিছু নেই।

কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে অতনু বললেন,—উত্তরে চামারটা কি বলেছিল জানেন? বলেছিল, আচ্ছা, আমিও অরিন্দম বাসু। আমিও দেখব কেমন কবে তুমি উদ্দালককে পাও?

হঠাৎ চেয়ার সরানোর আওযাজ শুনে আমি সবে গিয়েছিলাম। একটু পরেই ডাক্তার হনহনিয়ে চলে গিয়েছিল। আমার তখনই মনে হয়েছিল ডাক্তারকে ঘুরিয়ে একটা চড় কষাতে। মিস্টার ব্যানার্জি, আমি আপনাকে হলফ করে বলতে পারি, ওই ডাক্তারই মামণিকে খুন করেছে।

আচমকা অতনু চেয়াব থেকে উঠে এসে নীলের হাত দুটো জড়িয়ে ধবে বললেন, —মিস্টার ব্যানার্জি, আমার হাতে কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু আপনি যদি প্রমাণ কবে দিতে পারেন ঐ ব্যাটাই খুনি, বিশ্বাস করুন, চিরজীবন আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব। আমাদের মেয়েকে যে খুন করেছে তাকে আমি জ্যান্ত ক.র দিতে চাই। প্লিজ, আপনি কথা দিন।

ধীরে ধীরে নীল হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল,—আপনি শান্ত হোন অতনুবাবু। আমি কথা দিচ্ছি সত্যিকারের খুনিকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করব। একটা কথা মনে রাখবেন, ক্রাইম ডাজ নেভার পে। খুনি একদিন ধরা পড়বেই। কিন্তু তার জন্যে আপনাদের সহযোগিতা একান্তই প্রয়োজন। বিয়ের দিন আপনাদের এখানে মালতি নামে একজন কাজের মেয়েকে দেখেছিলাম। সে কি এখানেই থাকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

—ঠিক আছে। আমি তাকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বলেই উনি চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ নীল বলে উঠল,—অতনুবাবু, সে তো বাড়ির মধ্যেই আছে। আমি কথা বলে নোব'খন। তবে তার আগে এ বাড়িটা আমি দেখতে চাই। আপত্তি নেই তো?

—না না। আপত্তি কিসের? চলুন না।

অতনুবাবুর পেছন পেছন আমরা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলাম। বাড়িটা বেশ বড়-সড়। সেদিন

লোকজনের ভিড়ে অতটা বোঝা যায়নি। নিচেব তলাটা একদম ফাঁকা। ঢুকতেই ঠাকুরদালান; চৌকো আকারেব উঠোন। লম্বা সিঁড়ির ধাপ উঠে গিয়ে ঠাকুরদালানে মিশেছে। ওখানে একটা কাঠের বড় সিংহাসন। বোঝা যায়, সব পুজো-টুজো এখানেই হয। বাঁদিক দিযে ওপরে ওঠাব সিঁড়ি উঠে গেছে। নীল অতনুবাবুকে জিজ্ঞাসা করল,—আচ্ছা মিস্টার লাহা, নিচেব ঘরগুলো কি ফাঁকাই থাকে?

—হ্যাঁ। এক রকম ফাঁকাই বলতে পাবেন। কেবল ডানদিকেব ঐ কোণের ঘবটায সুদাম থাকে। সুদামের ঘবটা কি দেখবেন?

—না থাক। চলুন ওপরে যাওয়া যাক।

সিঁড়ি বেয়ে আমরা ওপরে এলাম। সাবা বাড়ির মেঝেই শ্বেত পাথরের। একতলার সঙ্গে সমতা রেখেই দোতলার ঘরগুলো সাজানো। দোতলায় মোট পাঁচখানা ঘর। সব কটা ঘরই বেশ প্রশস্ত।

—মিস্টার লাহা, দোতলায কারা থাকেন?

—এই যে সামনের দুটো ঘর, এ দুটোয় আমবা থাকি। মানে আমি আর আমাব স্ত্রী। ওই যে ওপাশের কোণের ঘরটা ওটা রান্নাঘর। তাব পাশেই ভাঁড়ার।

—আপনাদেব কি জয়েন্ট ফ্যামিলি?

—হ্যাঁ। দাদা চান না তিনি বেঁচে থাকতে হাঁড়ি আলাদা হোক।

—আচ্ছা, তেতলায ওঠাব মুখে ঐ যে সিঁড়িব পাশেব ঘব, ওটায় কে থাকেন?

—ওটায় দেবতনুর স্ত্রী থাকেন।

—দরজায় তালা ঝুলছে। উনি কি এখন বাড়িতে নেই?

—উনি বাড়ির বাইরে কোথাও যান না। মানে, ওনাব মাথার ঠিক নেই। উন্মাদ বলতে পারেন। তাই বাধ্য হয়েই দরজায় তালা দিয়ে রাখতে হয়।

নীল আব কিছু বলল না। তিন তলার সিঁড়িব কাছে গিয়ে প্রশ্ন কবল,—আপনাদেব দাদা কোথায় থাকেন?

—দাদার পুবো পরিবারই তিনতলায় থাকেন।

—আপনার স্ত্রী কোথায়? তাঁকে তো দেখছি না?

—বোধ হয রান্নাবান্নায় ব্যস্ত আছেন।

চলুন না, আপনার ঘবেই একটু বসি। সেই ফাঁকে আপনার মিসেসের সঙ্গেও কথা বলে নেওয়া যাবে।

—বেশ তো, বেশ তো, তাই চলুন।

নীল যে কি করতে চাইছে, আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। ওর মস্তিষ্ক যে কখন কোন্ দিকে চলছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সিঁড়ির কাছ বরাবব এসে আবার ফিরে চলল অতনুবাবুর ঘবের দিকে।

অতনুবাবুর ঘরটা কিন্তু মোটেই সাজানো গোছানো নয়। সবকিছুই কেমন যেন এলোমেলো। খানিকটা অগোছালো গৃহিণীর মতো। একদিকে ডাঁই কবা বাসি কাপড় লুঙ্গি গেঞ্জি। অন্যদিকে খাটের ওপর আধখোলা মশারি। বালিশ-টালিশ সব এদিক ওদিক ছড়ানো। একটা বই আধখোলা অবস্থায় উপুড় করা রয়েছে। পাশেই একটা ট্রানজিস্টার রেডিও। আসবাবপত্রেরও তেমন বাহুল্য নেই। সাদৃশ্যও নেই। একটা মান্ধাতা আমলের পালঙ্ক। সেখানে ময়লা চিটচিটে বিবর্ণ নাইলন মশারি টাঙানো। অন্যদিকে গোদরেজ আলমারি। চাবিটা তখনও ঝুলছে। তারই পাশে একটা পুরনো কালের বই-এর আলমারি। এটা-সেটা কিছু বই-এর সঙ্গে কয়েকটা কাচের পুতুল। আবার তার মধ্যে অন্য র‍্যাকে কয়েকটা সোয়েটার, শাল, কোট এলোপাতাড়ি ঢোকানো রয়েছে। কিন্তু কোথাও কোন মেয়েদের ব্যবহৃত কিছু দেখা গেল না।

তবে এক কথায সমস্ত ঘরটাই বড় অপরিষ্কার। অতনুবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ঘরের একপাশে রাখা এখানে সেখানে স্প্রিং সরে যাওয়া আদ্যিকালের একটা সোফার ওপর পড়ে থাকা গামছা-লুঙ্গি

সরিয়ে আমাদেব বসতে বললেন।

বসাব ইচ্ছে আমাদেব দুজনের কারোরই ছিল না। নীল কি ভাবছিল জানি না। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, এ কি রকম ব্যাপার রে বাবা! ঠিক এর ওপবেব ঘরটা ঝকঝকে তকতকে সাজানো গোছানো। আর সেই একই বাড়ির নিচের ঘরটার এই অবস্থা কেন? তবে কি অতনুবাবুর আর্থিক সচ্ছলতাব অভাব? নাকি স্বামী-স্ত্রী দুজনের স্বভাবেই পরিচ্ছন্নতার অভাব? নাকি এঁদেব দাম্পত্য জীবন এই ঘরটাব মতোই ছড়ানো ছিটনো?

বসব কি বসব না ভাবছিলাম। হঠাৎ কাংস্যবিনিন্দিত মহিলা-কণ্ঠস্বরে পিছন ফিরে তাকালাম। মধ্যবয়েসী এক ভদ্রমহিলা এসে ঘরে ঢুকলেন। আগেও এঁকে দেখেছি। মানে বিয়ের দিন। স্ট্রেইট লায়ন যার হুঙ্কারে সেদিন পবাজিত হয়েছিলেন।

—বলি হোলটা কি? সাত তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে

দুজন প্রায় অপবিচিত পুরুষকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেয়ে ওঁর মুখে রাগের প্রকোপটা যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। মাথাব ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে স্বামীর উদ্দেশে বললেন,—তোমার কি আক্কেলজ্ঞান মরার আগেও হবে না? এবা কারা?

বিব্রত এবং কাঁচুমাচু মুখে অতনুবাবু বললেন,—না, মানে, এই পাপড়ির ব্যাপারে এঁরা একটু এসেছিলেন।

ঝাঁজ ঘণ্টা বেজে উঠল একসঙ্গে,--তো এখানে কী? এটা কি পাপড়িব ঘর? যান যান, আপনারা ওপরে যান। পাপড়ি ওপরে থাকতো।

অতনুবাবু বাধা দিতে গেলেন স্ত্রীকে,—আহা, ওঁদের সঙ্গে ওভাবে কথা বলছ কেন? ওঁরা পুলিসের লোক।

সমস্ত ঝঙ্কারটা গিয়ে পড়ল অতনুবাবুব ওপর,—পুলিসের লোক বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে? বলি পুলিসের লোক আমাব ঘবে ঢুকবে কেন শুনি? আমবা চোব না ছ্যাঁচোড়? না আমরাই পাপড়িকে খুন করেছি। এটা কি মগের মুলুক? যা খুশি তাই করে যাবে? আর চোখের মাথা কি খেয়ে বসে আছ? দেখতে পাচ্ছ না ঘবদোবের কি অবস্থা? কোথাকার কে না কে, হুট করে ঘরের মধ্যে এনে ঢুকিয়েছো? বলি তোমাব এতো আদিখ্যেতা কেন? অ্যাঁ? এতো আদিখ্যেতা কিসের?

এই মুহূর্তে আমাব এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। জীবনে এমন অসভ্য মহিলা আর একটাও দেখিনি। নীলেব দিকে তাকিয়ে দেখলাম। সমস্ত মুখটা ওব লাল হয়ে গেছে। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ও মহিলাকে লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ তীক্ষ্ণস্বরে ও বলে উঠল,—অযথা উত্তেজিত হবেন না মিসেস লাহা। আমরা এখানে ছেলেখেলা করতে আসিনি। আপনাদেব মেয়ে পাপড়িদেবীর হত্যা রহস্যের তদন্ত করতেই পুলিসেব পক্ষ থেকে এখানে এসেছি। যদি আমাদের তদন্তের কাজে কোন রকম বাধা দেবার চেষ্টা করেন, তাহলে বাধ্য হব আপনাকে পুলিসের হেফাজতে তুলে দিতে। বোধ হয় সেটা আপনার সম্মানেব পক্ষে উপযুক্ত হবে না।

কোন মহিলাব সঙ্গে এর আগে নীলকে এ ধরনের কথা বলতে আমি শুনিনি। তবে এই মহিলার দুর্ব্যবহারের যোগ্য উত্তব বোধ হয় এটাই। শক্তের সঙ্গে শক্তই হতে হয়। তাতে কাজও হল। মহিলা একটু শান্ত হলেন। তবে একেবারে না।

--তাই বলে দুম করে ঘরেব মধ্যে ঢুকে পড়বেন?

—দুম করে আসিনি। আপনার স্বামীর অনুমতি নিয়েই এসেছি।

--ও তো এক নম্বরেব শয়তান। ভালোমন্দর ও কি বোঝে?

অতনুবাবুব দিকে তাকিয়ে দেখলাম। লজ্জায়, রাগে, দুঃখে ভদ্রলোকের মুখটায় না পাংশু, না রক্তিম একটা অদ্ভুত মিশ্রিত বর্ণচ্ছটা ফুটে উঠেছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই উনি মাথা হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মনে মনে ভাবলাম, সত্যিই এঁদের দাম্পত্য জীবন বিষময়। নীল কিন্তু এসব ভাববিলাসের ধাবে কাছে গেল না। ধীব এবং কঠিন কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করল,—সে আপনাদের

ব্যাপার। আমি এসেছি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব বলে। আশা করি একটু দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন।

মহিলা কটমট করে নীলের দিকে তাকিয়ে বললেন,—বেশ, প্রশ্ন করা হোক। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি। আমি ছ্যাঁচড়া চাপিয়ে এসেছি।

—আপনাকে তাড়াতাড়িই ছেড়ে দোব। পাপড়িদেবীকে কে খুন করেছে বলে আপনার ধারণা?

—আমি কি জ্যোতিষী না ভগবান যে কে খুন করেছে বলে দোব?

—আপনার অনুমানের কথা জিগ্যেস করছি?

—জানি না।

—উনি যখন খুন হন সে সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

—পাপড়ি খুন হবে জানলে আগে থেকে ঠিক করে রাখতুম। এখন মনে পড়ছে না।

—আপনার স্বামী তখন কোথায় ছিলেন?

—ও ইতরের খবর ওকেই জিগ্যেস করলে হয়।

—সেদিন উনি নাকি বাড়ি ছিলেন না?

—জানি না।

—পাপড়িদেবী তো আপনাকে খুব ভালোবাসতো, তাই না মিসেস লাহা।

—ছাই বাসতো। ভালোবাসলে কেউ বংশের মুখ পুড়িয়ে একটা বেজন্মা ছেলেকে বিয়ে করে? মুখপুড়ী মরেছে, ভালোই হয়েছে। সবাই বেঁচেছে!

—কিন্তু আপনাদের মেয়ে এভাবে মারা গেলেন, তার জন্যে আপনার দুঃখ হচ্ছে না? আপনি চান না তার হত্যাকারী ধরা পড়ুক?

—দুঃখু যে একদম হচ্ছে না তা নয়। যতই হোক বাড়ির মেয়ে তো। আর যে হতচ্ছাড়া ওকে মেরেছে সেটারও ফাঁসি হওয়া দরকার। তবে এসব ব্যাপারে আমাদের জ্বালাতন না করলেই বাঁচি। কারণ আমরা কেউই তাকে মারিনি। এবার তাহলে আসা হোক। আমার ছ্যাঁচড়া পুড়ে যাচ্ছে। আমি যাব।

—আপনি থাকুন। আমরাই যাচ্ছি।

ঘর থেকে দুজনে বেরিয়ে এলাম। সত্যি কথা বলতে কি, এ রকম মুখরা মহিলার সামনে বেশিক্ষণ থাকতে আমারও ভালো লাগছিল না। বেরিয়ে এসে দেখি বারান্দার এক কোণে ঠেস দিয়ে অতনুবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা কাছে আসতে ম্লান হেসে মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, দেখলেন তো, এই আমার জীবন। ওপরে যাবেন তো চলে যান। আমি একটু নিচে যাব কাজ আছে।

অতনুবাবু চলে গেলেন। নীল একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিল, —চল, একবার পাপড়ির ঘরটা দেখে যাই।

তিনতলার সিঁড়ির কাছে এসে ও থমকে দাঁড়াল। বাঁ দিকের দরজা বন্ধ সেই ঘর। কি মনে করে ও এগিয়ে গিয়ে দরজার তালায় নাড়া দিল। কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

তিনতলায় পাপড়ির ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। আজ দ্বিতীয় দিন। সে দিনের থেকে অনেক তফাত। সমস্ত উৎসবের আলো এক ফুঁয়ে কে যেন নিভিয়ে দিয়েছে। ফুলের ঝাড় টাঙ্গানো হয়েছিল বারান্দায়। সেগুলো আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত তিনতলাটায় এক অদ্ভুত শূন্যতা।

পাপড়ির ঘর লক করা ছিল। ডেড বডি নিয়ে যাবার পর পুলিস ঘরটা লক করে যায়। চাবি না পেলে ঘর খোলা যাবে না। ভাবছিলাম, চাবি তো সিংহীমশাই-এর কাছে। তাহলে নীল এখন কি করবে? হঠাৎ পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুতনুবাবু। বললেন,— পাপড়ির ঘরে যাবেন? কিন্তু পুলিসের লক করা চাবি তো আমাদের কাছে নেই?

নীল মৃদু হেসে পকেট থেকে একটা চাবি বার করে বলল,—আমার কাছে চাবি আছে। আপাতত সিংহীমশাই এটা আমার জিম্মায় রেখেছেন।

সরিয়ে আমাদের বসতে বললেন।

বসার ইচ্ছে আমাদের দুজনের কারোরই ছিল না। নীল কি ভাবছিল জানি না। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, এ কি রকম ব্যাপার রে বাবা! ঠিক এর ওপরের ঘরটা ঝকঝকে তকতকে সাজানো গোছানো। আর সেই একই বাড়ির নিচের ঘরটার এই অবস্থা কেন? তবে কি অতনুবাবুর আর্থিক সচ্ছলতার অভাব? নাকি স্বামী স্ত্রী দুজনের স্বভাবেই পরিচ্ছন্নতার অভাব? নাকি এঁদের দাম্পত্য জীবন এই ঘরটার মতোই ছড়ানো ছিটনো?

বসব কি বসব না ভাবছিলাম। হঠাৎ কাংস্যবিনিন্দিত মহিলা-কণ্ঠস্বরে পিছন ফিরে তাকালাম। মধ্যবয়েসী এক ভদ্রমহিলা এসে ঘরে ঢুকলেন। আগেও এঁকে দেখেছি। মানে বিয়ের দিন। স্ট্রেইট লায়ন যার হুঙ্কারে সেদিন পরাজিত হয়েছিলেন।

—বলি তেলটা কি? সাত তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে

দুজন প্রায় অপরিচিত পুরুষকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেয়ে ওঁর মুখে রাগের প্রকোপটা যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে স্বামীর উদ্দেশে বললেন,—তোমার কি আক্কেলজ্ঞান মরার আগেও হবে না? এরা কারা?

বিব্রত এবং কাঁচুমাচু মুখে অতনুবাবু বললেন,—না, মানে, এই পাপড়ির ব্যাপারে এঁরা একটু এসেছিলেন।

ঝাঁজ ঘণ্টা বেজে উঠল একসঙ্গে,— তো এখানে কী? এটা কি পাপড়ির ঘর? যান যান, আপনারা ওপরে যান। পাপড়ি ওপরে থাকতো।

অতনুবাবু বাধা দিতে গেলেন স্ত্রীকে,—আহা, ওঁদের সঙ্গে ওভাবে কথা বলছ কেন? ওঁরা পুলিসের লোক।

সমস্ত ঝঙ্কারটা গিয়ে পড়ল অতনুবাবুর ওপর,—পুলিসের লোক বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে? বলি পুলিসের লোক আমার ঘরে ঢুকবে কেন শুনি? আমরা চোর না ছ্যাঁচোড়? না আমরাই পাপড়িকে খুন করেছি। এটা কি মগের মুলুক? যা খুশি তাই করে যাবে? আর চোখের মাথা কি খেয়ে বসে আছ? দেখতে পাচ্ছ না ঘরদোরের কি অবস্থা? কোথাকার কে না কে, হুট করে ঘরের মধ্যে এনে ঢুকিয়েছো? বলি তোমার এতো আদিখ্যেতা কেন? অ্যাঁ? এতো আদিখ্যেতা কিসের?

এই মুহূর্তে আমার এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। জীবনে এমন অসভ্য মহিলা আর একটাও দেখিনি। নীলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। সমস্ত মুখটা ওর লাল হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ও মহিলাকে লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ তীক্ষ্ণস্বরে ও বলে উঠল,— অযথা উত্তেজিত হবেন না মিসেস লাহা। আমরা এখানে ছেলেখেলা করতে আসিনি। আপনাদের মেয়ে পাপড়িদেবীর হত্যা রহস্যের তদন্ত করতেই পুলিসের পক্ষ থেকে এখানে এসেছি। যদি আমাদের তদন্তের কাজে কোন রকম বাধা দেবার চেষ্টা করেন, তাহলে বাধ্য হব আপনাকে পুলিসের হেফাজতে তুলে দিতে। বোধ হয় সেটা আপনার সম্মানের পক্ষে উপযুক্ত হবে না।

কোন মহিলার সঙ্গে এর আগে নীলকে এ ধরনের কথা বলতে আমি শুনিনি। তবে এই মহিলার দুর্ব্যবহারের যোগ্য উত্তর বোধ হয় এটাই। শক্তের সঙ্গে শক্তই হতে হয়। তাতে কাজও হল। মহিলা একটু শান্ত হলেন। তবে একেবারে না।

—তাই বলে দুম করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বেন?

— দুম করে আসিনি। আপনার স্বামীর অনুমতি নিয়েই এসেছি।

—ও তো এক নম্বরের শয়তান। ভালোমন্দর ও কি বোঝে?

অতনুবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। লজ্জায়, রাগে, দুঃখে ভদ্রলোকের মুখটায় না পাংশু, না রক্তিম একটা অদ্ভুত মিশ্রিত বর্ণচ্ছটা ফুটে উঠেছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই উনি মাথা হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মনে মনে ভাবলাম, সত্যিই এঁদের দাম্পত্য জীবন বিষময়। নীল কিন্তু এসব ভাববিলাসের ধারে কাছে গেল না। ধীর এবং কঠিন কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করল,—সে আপনাদের

ব্যাপার। আমি এসেছি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব বলে। আশা করি ওবন্ধ রেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন।

মহিলা কটমট করে নীলের দিকে তাকিয়ে বললেন,—বেশ, প্রশ্ন করা হোক। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি। আমি ছ্যাঁচড়া চাপিয়ে এসেছি।

—আপনাকে তাড়াতাড়িই ছেড়ে দোব। পাপড়িদেবীকে কে খুন করেছে বলে আপনার ধারণা?

—আমি কি জ্যোতিষী না ভগবান যে কে খুন করেছে বলে দোব?

—আপনার অনুমানের কথা জিগ্যেস করছি?

—জানি না।

—উনি যখন খুন হন সে সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

—পাপড়ি খুন হবে জানলে আগে থেকে ঠিক করে রাখতুম। এখন মনে পড়ছে না।

—আপনার স্বামী তখন কোথায় ছিলেন?

—ও ইতরের খবর ওকেই জিগ্যেস করলে হয়।

—সেদিন উনি নাকি বাড়ি ছিলেন না?

—জানি না।

—পাপড়িদেবী তো আপনাকে খুব ভালোবাসতো, তাই না মিসেস লাহা।

—ছাই বাসতো। ভালোবাসলে কেউ বংশের মুখ পুড়িয়ে একটা বেজন্মা ছেলেকে বিয়ে করে? মুখপুড়ী মরেছে, ভালোই হয়েছে। সবাই বেঁচেছে!

—কিন্তু আপনাদের মেয়ে এভাবে মারা গেলেন, তার জন্যে আপনার দুঃখ হচ্ছে না? আপনি চান না তার হত্যাকারী ধরা পড়ুক?

—দুঃখু যে একদম হচ্ছে না তা নয়। যতই হোক বাড়ির মেয়ে তো। আর যে হতচ্ছাড়া ওকে মেরেছে সেটারও ফাঁসি হওয়া দরকার। তবে এসব ব্যাপারে আমাদের জ্বালাতন না করলেই বাচি। কারণ আমরা কেউই তাকে মারিনি। এবার তাহলে আসা হোক। আমার ছ্যাচড়া পুড়ে যাচ্ছে। আমি যাব।

—আপনি থাকুন। আমরাই যাচ্ছি।

ঘর থেকে দুজনে বেরিয়ে এলাম। সত্যি কথা বলতে কি, এ রকম মুখরা মহিলার সামনে বেশিক্ষণ থাকতে আমারও ভালো লাগছিল না। বেরিয়ে এসে দেখি বারান্দার এক কোণে ঠেস দিয়ে অতনুবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা কাছে আসতে ম্লান হেসে মুখ তুলে তাকালেন। বললেন,— দেখলেন তো, এই আমার জীবন। ওপরে যাবেন তো চলে যান। আমি একটু নিচে যাব কাজ আছে।

অতনুবাবু চলে গেলেন। নীল একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিল, — চল, একবার পাপড়ির ঘরটা দেখে যাই।

তিনতলার সিঁড়ির কাছে এসে ও থমকে দাঁড়াল। বাঁ দিকের দরজা বন্ধ সেই ঘর। কি মনে করে ও এগিয়ে গিয়ে দরজার তালায় নাড়া দিল। কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

তিনতলায় পাপড়ির ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। আজ দ্বিতীয় দিন। সে-দিনের থেকে অনেক তফাত। সমস্ত উৎসবের আলো এক ফুঁয়ে কে যেন নিভিয়ে দিয়েছে। ফুলের ঝাড় টাঙ্গানো হয়েছিল বারান্দায়। সেগুলো আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত তিনতলাটায় এক অদ্ভুত শূন্যতা।

পাপড়ির ঘর লক করা ছিল। ডেড বডি নিয়ে যাবার পর পুলিস ঘরটা লক করে যায়। চাবি না পেলে ঘর খোলা যাবে না। ভাবছিলাম, চাবি তো সিংহীমশাই-এর কাছে। তাহলে নীল এখন কি করবে? হঠাৎ পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুতনুবাবু। বললেন,— পাপড়ির ঘরে যাবেন? কিন্তু পুলিসের লক করা চাবি তো আমাদের কাছে নেই?

নীল মৃদু হেসে পকেট থেকে একটা চাবি বার করে বলল,—আমার কাছে চাবি আছে। আপাতত সিংহীমশাই এটা আমার জিম্মায় রেখেছেন।

—ওহ্, সরি, বলে সুতনুবাবু বোধ হয় চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ নীলের ডাকে ফিরে দাঁড়ালেন।

—সুতনুবাবু, পাপড়ির ঘরের চাবির গোছাটা সেদিন বোধ হয় হারিয়ে গিয়েছিল, তাই না?

—পাপড়ির চাবি হারিয়েছিল নাকি? আমি তো ঠিক বলতে পারব না।

—আপনি জানতেন না?

—না।

—ঠিক আছে। আমি একটু একলাই ঘরটা দেখে নিচ্ছি। আপনি বরং মালতিকে যদি পারেন একবার পাঠিয়ে দিন।

ঘরের মধ্যে যেখানে যা ছিল সব তেমনিই আছে। কোন পরিবর্তন নেই। এমন কি ফুলের আভরণ তেমন নষ্ট হয় নি। একটু যা শুকিয়েছে। ঘরের অন্য সব আসবাবের থেকেও আজও আবার নীল অ্যাকোয়ারিয়ামের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সেদিনের থেকে আজ মাছগুলোর মধ্যে একটু বেশি রকমের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম। নীল অ্যাকোয়ারিয়ামের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম, মাছগুলো সব একসঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে এসে কাচের গায়ে ঠোকর দিচ্ছে।

আমার দিকে না তাকিয়ে নীল বলল,—মাছগুলো এ রকম করছে কেন জানিস?

—কি করে বলব? আমি তো মাছের ভাষা জানি না।

—পাপড়ি মারা যাবার পর থেকে ওদের কোন খাবার জোটে নি। দেখবি একটা মজা? বলেই নীল অ্যাকোয়ারিয়ামের পাশে রাখা মাছের খাবারের শিশি থেকে কিছু গুঁড়ো খাবার জলের এক কোণে ছড়িয়ে দিল। দেখা গেল, মাছের ঝাঁক পড়ি মরি করে ছুটে গিয়ে খাবার খেতে আরম্ভ করেছে। 'বেচারারা' বলে নীল সরে ঘুরেছে, এমন সময় মালতি এসে ঘরে ঢুকল। ওর আজকের সাজটা একটু অন্য রকমের। খুব আট পৌরে সাজ। গাছকোমর করে পরা একখানা ছাপা শাড়ি। হলুদ রঙা একটা ব্লাউজ। চুলটা টেনে উঁচু করে পিছনে খোঁপা করা। আজ কিন্তু নীল সরাসরি 'তুমি' দিয়েই শুরু করল। বলল, আমাদের নিশ্চয়ই চিনতে পারছ?

ঘাড় নেড়ে ও সম্মতি জানাল।

—তাহলে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব। কিছু গোপন কোরো না। তাতে তোমার ক্ষতি হবে না।

—জিগ্যেস করুন। জানা থাকলে নিশ্চয়ই উত্তর দোব।

—তোমার দিদিমণির চাবির গোছাটা সেদিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে নাকি পাওয়া গেছে? কোত্থেকে পাওয়া গেছে, জান?

—আমি কিছু শুনিনি।

—তার মানে তুমি চাবির ব্যাপারে কিছুই জান না।

—আজ্ঞে দিদির চাবি, আমি তার কি খোঁজ রাখব?

—বটেই তো। আচ্ছা, ঐ চাবির গোছার মধ্যে আলমারির চাবিও নিশ্চয়ই ছিল।

—আজ্ঞে সেটাও তো আমি বলতে পারব না।

—হুঁ। তা চাবিটা কখন থেকে পাওয়া যায়নি তা বোধ হয় জানতে?

—শুনেছিলুম বিয়ের দিন সকাল থেকেই পাওয়া যায়নি।

—তাহলে বিয়ের দিন তোমার দিদি গয়নাগাঁটি পরলেন কিভাবে?

—ওটা ছাড়াও আরো এক সেট চাবি দিদির ছিল।

—তোমার দিদির ঘরে সাধারণত কে কে যাতায়াত করত?

—আমি ছাড়া তেমন আর কেউ নয়।

—বেশ। বিয়ের দিনে?

—সেদিন কিন্তু অনেক লোকই ঢুকেছিল। বিয়ে বলে কথা।

—বিয়ের দিন যখন তোমার দিদি শেষবারের মত এ ঘরে ঢোকেন, তুমি তখন কোথায় ছিলে?

—রান্নাঘরে চা তৈরি করছিলুম।

—তখন ঘড়িতে কটা বাজে?

—আজ্ঞে ঠিক তা বলতে পারব না।

—তাহলে ঠিক কি করে বলতে পারলে সেই সময় তুমি রান্নাঘবে চা তৈরি করছিলে?

—আজ্ঞে সেদিন আমি সারাক্ষণই চা করছিলুম।

—পাকা অ্যালিবাই! তা জানতে পারলে কখন?

—ওপবতলায় যখন হই-চই চেঁচামেচি হল, তখন।

—আচ্ছা, আর একটা প্রশ্ন। চেঁচামেচির সময় ছাদেব ওপর থেকে কাউকে কি নামতে দেখেছিলে?

—বিয়ের দিনে অনেকেই তো ছাদে ওঠানামা করছিল। তবে ছোটদাদাবাবুকে যেন সেই সময় নামতে দেখেছিলুম।

—ছোট দাদাবাবু, মানে সুতনুবাবু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ:

—চাবির অন্য গোছাটা এখন কোথায় আছে জান?

—আজ্ঞে সেটা বড়কর্তাবাবুর কাছেই থাকে। নিশ্চয়ই এখনও আছে।

—ছাদ থেকে ছোটদাদাবাবু নেমে এসে কি করলেন?

—সটান নিজের ঘবে চলে গেলেন।

—পাপড়িদেবীর ঘবে তখন চেঁচামেচি চলছিল?

—হ্যাঁ।

—আশ্চর্য! আচ্ছা মালতি, মাছের চৌবাচ্চাটা কে দেখাশুনো করতো?

—আজ্ঞে দিদি নিজেই কবতেন। ওটা ওনার বড় শখেব জিনিস। কাউকে হাত দিতে দিতেন না।

—তুমি কোনদিন কাউকে ওটায় হাত দিতে দেখেছ?

—না। মনে পড়ে না।

—এ বাড়িতে তুমি কত দিন আছ?

—বছর ছয়েক।

—দিদিমণির সঙ্গে কোনদিন কারো ঝগড়া হয়েছে?

—এই বিয়ের জন্যে ইদানীং হোত। আগে কোনদিন শুনি নি।

হঠাৎ নীল একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বসল,—তুমি বিয়ে করেছ?

এই প্রশ্নে মালতি যেন কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপর মাথা নিচু করে বলল, —হয়েছিল।

—তাহলে?

—এক বছরের মধ্যেই আমার বর মবে গেছে।

—তার পর থেকেই তুমি এখানে?

—হ্যাঁ।

—তোমাকে এখানে কে এনেছে?

—আজ্ঞে ছোট দাদাবাবু।

—দেশ কোথায় তোমার?

—কোলাঘাট।

—আর একটা প্রশ্নেব জবাব দাও। তেতলার মুখে সিঁড়ির পাশে যে তালাবন্ধ ঘরটা আছে, ওখানে তোমাদের আর এক কাকিমা থাকেন। তিনি কি একেবারেই মানুষজন চিনতে পাবেন না?

—না।

—ওঁকে দেখাশুনো করে কে?

—কে আবার করবে? পাগলা হাবলা, নিজের মনেই থাকে। বেশি চেঁচামেচি করলে ঘরে তালা

দিয়ে রাখা হয়।

—বিয়ের দিন কি চেঁচামেচি করছিলেন।

—না। তবে লোকজন আসবে তো, তাই বন্ধ করে রাখা হয়েছিল।

দুম করে নীল অন্য একটা প্রশ্ন করল।

—আচ্ছা মালতি, ধর একগোছা চাবি সকালে মেথর চলে যাবার পর চুরি গেল। তারপর সন্ধেবেলা, বিয়ের হিড়িকে এক সময় চোর গিয়ে সেই চাবি দিয়ে বাথরুমের পেছনের দরজা খুলে চাবিটা কাছাকাছি কোথাও ফেলে দিল, তাহলে খুনির নিশ্চয়ই খুব সুবিধে, তাই না?

মালতি বোকার মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল,—আজ্ঞে আপনি কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।

—হুঁ, বোঝা শক্ত। ঠিক আছে। তুমি এবার যেতে পারো। তোমার ছোটদাদাবাবুকে একটু পাঠিয়ে দিও।

একটু পরেই সুতনু এলেন। বললেন,—কি বুঝলেন মিস্টার ব্যানার্জি, হত্যাকারী ধরা পড়বে তো?

—পড়া তো উচিত। সময়মত সবই জানতে পারবেন। আজ চলি। অনেক বেলা হয়ে গেল।

সওয়া বারোটা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লাম। অত্যন্ত গম্ভীর মুখে নীল সারাটা পথ গাড়ি চালিয়ে এলো। মাঝরাস্তায় আমি একবার জিজ্ঞাসা করলাম,—কি বুঝলি নীল?

নীল আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল,—ভাব না একটু।

—দ্যুৎ, এত ফ্যাঁকড়া, সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

—তবু ভাব।

আমাকে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিতে দিতে নীল বলল,—কয়েকদিন তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আমি একটু ব্যস্ত থাকব।

বলেই ও চিলের মত উড়ে চলে গেল।

আমাকে ভাবতে বলে নীল চলে গেল। কিন্তু কি ভাবব? সব ভাবনা-টাবনা গুলিয়ে যাচ্ছে। এত সব জট-পাকানো আর গণ্ডগোলের ঘটনা রয়েছে যে, কোন একটা বিশেষ সূত্র ধরে ভাবনাটাকে চালাতে পারছি না। ওর এইচ ডাবলু ডাবলু-র এইচ'টার ব্যাখ্যা তো হয়েই গেছে। জানা গেছে কিভাবে খুনটা হয়েছে। কিন্তু কেন? হোয়াই? মোটিভটা কী? সুস্পষ্টভাবে কারো কোন সঠিক মনোভাব বোঝা যাচ্ছে না। আবার আলাদা আলাদা করে ধরলে সকলের ওপরই সন্দেহ বর্তাচ্ছে। আমি তো সন্দেহের তালিকা থেকে কাউকেই বাদ দিতে পারছি না। পাপড়িকে সরিয়ে দিতে পারলে, অর্থাৎ পাপড়ি না থাকলে লাহা পরিবারের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ভাবে লাভবান হচ্ছে।

স্নান করে খেয়েদেয়ে উঠতে প্রায় আড়াইটে বেজে গেল। কড়া শীতের দুপুর। বালিশ শতরঞ্চি আর চাদর নিয়ে সোজা ছাদে চলে গেলাম। অনেকক্ষণ রোদ থাকবে, এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে চাদর গায়ে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। সিগারেট টানতে টানতে সোজা আকাশের দিকে তাকালাম।

নীল আকাশ। যদিও খুব স্বচ্ছ নয়। সামান্য ঘোলাটে। দূরে টুকরো সাদা সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। কনট্রাস্টের মতো কয়েকটা কালো চিল এলোমেলো উড়ছে। ইতস্তত উড্ডীয়মান চিলগুলোকে দেখতে দেখতে মনটা আবার পাপড়ির চিন্তায় ফিরে গেল। ভেতর থেকে কে যেন বারবার জিজ্ঞাসা করছে, কেন, কেন, কেন এই খুন?

বিশ্লেষণটা একেবারে প্রথম থেকেই শুরু করলাম। পাপড়ি লাহা পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার মেয়ের মধ্যে একজন। বিয়ের রাতে তাকে খুন করা হল। কেন?

তেইশ চব্বিশ বছর বয়সের একটা মেয়ের খুন হবার কি কি সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে? প্রথমেই আমার মনে হল সম্ভাব্য এবং প্রধান কারণ দুটো।—এক প্রেম আর এক অর্থ। একটি প্রেমজাত কারণে প্রতিহিংসা, অন্যটা অর্থকরী লাভালাভি।

পাপড়ির ক্ষেত্রে দুটোই হতে পারে। প্রেমেব ক্ষেত্রে তাকে আর একজন চেয়েছিল। পাপড়ি তাকে প্রত্যাখ্যান করে। অর্থের ক্ষেত্রে সে এক বিত্তবান পিতার সন্তান। এমন কি রামতনু লাহার উইল অনুসারে বিরাট সম্পত্তির অর্ধাংশ তার বা তার স্বামীর প্রাপ্য। যদিও তা অনেক দূরের। অর্থাৎ রামতনুবাবুর মৃত্যুর পর সম্পত্তি ভাগাভাগির প্রশ্ন আসত। কিন্তু একদিন না একদিন তা আসতই। তাই বিয়ের আগেই সরিয়ে দেওয়া। কারণ তার বিয়ের পর সম্পত্তিব জন্যে খুন করতে হলে, দুজনকে খুন করতে হবে। তাকে এবং তার স্বামীকে। খুনি অতটা রিস্ক্ নিতে রাজি হয় নি। কাজটা তাই আগেই সেরে রাখল।

প্রেম এবং অর্থ ছাড়া আরো এক কারণ আমার মনে উঁকি দিল। বংশমর্যাদা রাখাব প্রশ্ন এখানে একটা মারাত্মক দিক। অর্থাৎ পাপড়ি এমনি একজন ছেলেকে বিয়ে কবতে চেয়েছিল যাকে লাহা বাড়ির কেউই পছন্দ করেননি। প্রত্যেকেই চেয়েছিলেন তার সঙ্গে বিয়ে না হোক। তার সঙ্গে বিয়ে হওয়া মানে বংশেব মর্যাদাহানি। বিশেষ করে প্রাচীনপন্থী মানুষের মধ্যে বংশ-কৌলিন্য বজায় রাখা একটা মারাত্মক ব্যাধির মতো জড়িয়ে আছে। আজও।

এই তিনটে কারণকে সামনে রেখে আমি পবিবাবেব সকলের স্বার্থ এবং হত্যার সম্ভাব্য দিকটা ভাবতে শুরু করলাম।

প্রথমেই ধরা যাক রামতনু লাহা। তিন নম্বব কারণে তাঁকেও দোষী ভাবতে আমার আপত্তি হল না। হোক আত্মজা, তবু রামতনু বিরক্ত ছিলেন পাপড়ির এই স্বামী মনোনযনে। তিনি কিছুতেই চাননি পাপড়ি এ বিয়ে করুক। তার জন্যে একদিন মারধোর-এর ঘটনাও ঘটে গেছে। বংশের ঐতিহ্য এবং কৌলিন্য বজায় রাখতে অনমনীয়া, স্বার্থপর এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন মেয়েকে সরিয়ে দিতে হয়তো কুণ্ঠিত হননি। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস বা রাজ-রাজড়ার পরিবারেব কি এমন ঘটনা এর আগে ঘটে নি? ঘটেছে। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে বেশির ভাগই দেখা গেছে নিজের পুত্র বা কন্যাকে যথাসম্ভব দূরে রেখে তাদের প্রেমিক বা প্রেমিকাকে হত্যা করা হযেছে। এ ক্ষেত্রে উদ্দালককে হত্যা করতে পারলেই রামতনুবাবু বেশি খুশি হতেন। কিন্তু উদ্দালককে হযতো তিনি সুবিধাজনক আয়ত্তে পাননি। তাই একান্ত বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত এবং শেষ সময়ে নিজেব কন্যাকেই খুন করেছেন।

মানুষের চরিত্র বড় বিচিত্র এবং জটিল। অনেক সময় এমন এক একটা অঘটন ঘটে, বুদ্ধি এবং সম্ভাব্যতা দিয়ে সেগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা হয় না। সত্য প্রায়শঃই কল্পিত কাহিনীর চেয়ে চমকপ্রদ হয়।

পরিস্থিতি এবং মানসিক অবস্থা হয়তো রামতনুবাবুকে এমন জায়গায় ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল, যেখান থেকে তিনি নিজের মেয়েকে খুন করা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেননি।

অর্থাৎ মোটিভের বিশ্লেষণে রামতনুও খুনি হতে পারেন। কিন্তু যে অভিনব প্রক্রিয়ায় তাকে খুন করা হয়েছে তা কি সম্ভব রামতনুবাবুর পক্ষে? ঐভাবে খুন করতে গেলে রামতনুবাবুকে ডাক্তারি শাস্ত্রে কিছু জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আর ইনট্রাভেনাস ইনজেকশানের দক্ষতাও রাখতে হবে। তবে তা যে একেবারে অসম্ভব, তাও না। এক আলমারি ঠাসা মেডিকেল সায়েন্সের বই। সেখান থেকে খুনের এ তথ্যটুকু যোগাড় করা শক্ত কিছু না। আর ইনজেকশন দেওয়ার কায়দা?

রামতনুবাবুর পিছনের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা নেই। হয়ত কোন না কোনভাবে উনি ইনজেকশন দেওয়াটা রপ্ত করেছিলেন। সেটা এখন সুযোগে লাগল।

তারপর, চাবি। খুনের দিন সেটা হারালো। সেদিন কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। পরদিন সেটা সুদাম বাগান থেকে পেল এবং রামতনুবাবুকে ফেবত দিল। চাবিটা যে পাওয়া গেছে সেটা বাড়ির অন্য কোন লোকই জানে না। কি কারণ? কেন রামতনুবাবু চাবির ব্যাপারটা কাউকে জানালেন না? এটাও যে একটা ধন্দ।

মোট কথা, রামতনু লাহাকে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। এর পরই যাব ওপর সন্দেহ আসে সে হচ্ছে সুতনু লাহা। রামতনু লাহার ছেলে। মোটিভের দিক থেকে বিচার করলে সুতনুও হত্যাকারী হতে পারে। পাপড়ির মৃত্যুতে সব থেকে লাভবান হচ্ছে সুতনু। বিশাল সম্পত্তির পুরো মালিকানা। কলকাতা

শহরে অত বড় বাড়ি। এ ছাড়াও আরো কিছু বাড়ি-টাড়ি আছে। ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা। তার ওপর বড়বাজারে বিরাট এবং নামকরা রানিং হার্ডওয়ার ব্যবসা। পাপড়ি না থাকলে সবটাই ওর। পাপড়ির বিয়ে না হলে অবশ্য ততটা ভাবতো না সুতনু। কিন্তু বিয়ের পর সব কিছুর ওপর বিরাট ওয়ারিশ বর্তাবে সম্পূর্ণ এক অবাঞ্ছিত বাইরের লোকের। সেটা মেনে নেওয়া বোধ হয় সম্ভব হয়নি সুতনুর পক্ষে। তাই ঠিক বিয়ের আগেই সে খুন করবার ঝুঁকি নিয়েছে। আর রামতনুবাবুর পক্ষে যদি ঐভাবে খুন করা সম্ভব হতে পারে, সুতনুর পক্ষেও তা সম্ভব।

তৃতীয় ব্যক্তি অতনু লাহা। অতনু লাহার মোটিভটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ওর লাভটা ঠিক কী? না টাকা-পয়সা, না প্রেম। অবশ্য বংশমর্যাদার একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু যেখানে মেয়ের বাবাই বিয়েতে মত দিয়ে দিয়েছেন, সেখানে কাকা হিসেবে সে কি-ই বা করতে পারে? বংশমর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব কেবল তার একার নয়।

অবশ্য অন্য ধরনের একটা রাগ থেকে সে পাপড়িকে হত্যা করতে পারে। যদিও যুক্তিটা খুব জোরালো নয়, তবু একটা পয়েন্ট হলেও হতে পারে।

অত বড় বংশের ছেলে হয়েও সে পৈত্রিক সম্পত্তি তেমন কিছু ভোগ করতে পারেনি। যে বাড়িতে বা দোকানে তারও ভাগ থাকা উচিত ছিল তার কিছুরই সে ভাগীদার নয়। অবশ্য রামতনুবাবুর কথামত তার প্রাপ্য অংশের মূল্য বাবদ সে প্রচুর টাকাপয়সা নাকি রামতনুবাবুর কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে। এবং সে সব টাকাকড়িও কম নয়। সেসব গেল কোথায়? অত বড় ঠাট-ঠমকের বাড়িতে নিতান্ত দুরবস্থায় সে পড়ে আছে। ঘরদোর দেখে মনে হয় তার অবস্থা খুব ভালো নয়। রোজগারপাতি যে খুব ভালো তাও মনে হয় না।

এর মানে কি ধরে নিতে হবে যে, পাপড়ি না থাকলে সেই অংশের কিছুটা অনুগ্রহ করে রামতনু তাকে দিয়ে যাবেন, এই ভেবে সে পাপড়িকে খুন করেছে? উঁহু। বড় বেশি কষ্টকল্পনা এবং অতিরিক্ত ভাবনা হয়ে যাচ্ছে। এই মোটিভ থাকলে তার দুজনকে খুন করতে হয়। সুতনু আর পাপড়ি! কিন্তু যেহেতু সুতনু এখনও বেঁচে আছে, তাই অতনু সম্বন্ধে অতটা চিন্তা না করলেও চলে। তার ওপর শোনা গেল তিনি আইন পড়েছিলেন। তাঁর পক্ষে ডাক্তারি বই ঘেঁটে ঐভাবে খুন করার কথা ভাবা কি সম্ভব? ইঞ্জেকশন দিতে পারার কথাও চিন্তা করতে হবে। যে লোকটা সারাদিন বাইরে বাইরে থাকে, বাড়িতে যার স্ত্রীকে নিয়ে অশান্তির আগুন জ্বলছে, তার পক্ষে এত সুস্থ মাথায়, এত ধৈর্য ধরে খুন করা কি সম্ভব?

অবশ্য খুন করার সুযোগ ওঁরই সবথেকে বেশি। পাপড়ির ঠিক নিচের তলার ঘরটিই ওঁর ঘর। অ্যাটাচড্ বাথের পিছনের সিঁড়ি দিয়ে পাপড়ির ঘরে যাওয়া ওর পক্ষে সব থেকে সুবিধার। তার ওপর তিনি সারাদিন বাড়িতে ছিলেন না, এটাই জনশ্রুতি। এবং এই অ্যালিবাই-এর অন্তরালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে সেই অবসরে সবার অলক্ষ্যে খিড়কি দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পাপড়িকে খুন করা অসম্ভব নয়।

তবে আমার যতদূর মনে হচ্ছে, আরো দু'-একজনের সাহায্য এই খুনের অন্তরালে রয়েছে। মেথর চলে যাবার পর খিড়কির দরজা সুদাম বন্ধ করে দেয়। সেদিনও, নীলের কথামত দরজা বন্ধ হয়েছিল। একজন সেই চাবি চুরি করেছিল এবং খুনিকে পরে সেই দরজা খুলে দিয়েছিল। খুনি, যেই হোক, খুনের অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট কি এক ঘন্টা আগে বাইরে থেকে এসে গাছতলায় অপেক্ষা করেছিল এবং সে অন্তত তিনটে সিগারেট খেয়েছিল। সে যাই হোক, আরো একজন খুনিকে চেনে। হয় সুদাম, নয় মালতি। আমার মনে হয়, ওদের চাপ দিলে বা ভয় দেখালে খুনির নামটা জানা যেতে পারে। নীলকে বলতে হবে কথাটা।

এর পরই ডাক্তার অরিন্দম বাসু। মোটিভ একটাই। জেলাসি। পাপড়িকে সে চেয়েছিল। পায়নি। এবং শাসিয়েছিল, কিছুতেই সে উদ্দালকের সঙ্গে বিয়ে হতে দেবে না। অবশ্য উদ্দালককেও সে খুন করতে পারত। কিন্তু তাতে করেও অন্যমনা পাপড়ির মনটা সে কোনদিনও পেতো না, এটা ভালো

করেই বুঝেছিল। এবং, বিয়ে করে সে উদ্দালকের ঘরণী হয়েছে, এটা দেখতেও তার বুক জ্বলে যেত। 'রাজভোগ আমি পাব না, তাই তোকেও খেতে দেব না'—এই মনোভাব নিয়েই তার কাছে বিষফলের মতো পাপড়িকেই সে চিরতরে সরিয়ে দিয়েছে। আর এই ধরনের খুন করার সব থেকে দক্ষতা একমাত্র তারই।

মেয়েদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ মালবিকাদেবী, শর্মিষ্ঠাদেবী বা মালতি, এদের ইচ্ছে থাকলেও ঐ প্রক্রিয়ায় খুন করার অসুবিধা আছে। অবশ্য এদের মধ্যে যদি কেউ অতীতে নার্সিং শিখে থাকে তা হলে আলাদা কথা।

শর্মিষ্ঠাদেবী বাংলায় এম এ। মালবিকা দেবী লেখাপড়া শিখেছেন বলে মনে হয় না। আর মালতি। ও যে ঠিক কি বোঝা যাচ্ছে না। শিক্ষিতা না অশিক্ষিতা, কথাবার্তার ধরন দেখে বোঝা যায় না। চালচলনেও না। লোকের বাড়ি কাজ করা ওর সত্যিকারের পেশা না অভিনয়, তাও বুঝতে পারিনি। আসলে ও আমার কাছে এক রহস্য। ও বাড়িতে একজন পাগল মহিলা আছেন। যদিও তাঁকে চোখে দেখিনি, তবু সত্যিই কি তিনি পাগল, না ভান? পাগলের সাত খুন মাপ, ব্যাপারটা কি সেই রকম? কে জানে? তবে মেয়েদের এ ব্যাপারে কারো না কারো হাত থাকলেও থাকতে পারে।

উদ্দালকের খুন করার কোন প্রশ্ন আসছে না। তার অ্যালিবাই জোরালো। সে তখন স্পটে ছিল না। তার মা অনিন্দিতাদেবী অনেক দূরে। সে মহিলার খুনের কোন মোটিভই পাচ্ছি না।

অর্থাৎ কে যে খুনি তা আমার চিন্তার ধারে কাছে আসতে পারছে না। আমার কাছে সবাই খুনি, আবার কেউ না। বড় জট পাকানো ব্যাপার।

ওদিকে আরো কয়েকটা ঘটনা রহস্যটাকে আরো রহস্যময় করে তুলেছে। প্রথমত ও বাড়িতে তিনজন পুরুষই সিগারেট খায়। কিন্তু সে কোন্ লোক যে কাটা রাংতা না ফেলে দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট ব্যবহার করতে অভ্যস্ত? সেদিন তো কাউকেই সিগারেট খেতে দেখা গেল না!

দ্বিতীয়ত, চাবির ব্যাপারটা সত্যিই বেশ ঘোরালো। নীল মালতিকে যা বলল তাই কি সত্যি? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

তৃতীয়ত, অ্যাকোয়ারিয়ামটা এলোমেলো হয়েছিল কেন? অ্যাকোয়ারিয়াম-এর বালি সরানো ছিল কি জন্যে?

আর সর্বশেষ, মোটামুটি সম্ভ্রান্ত একটা পরিবারে মালবিকাদেবীর মতো অশিক্ষিতা এবং মুখরা মহিলা কিভাবে বৌ হয়ে আসতে পারে তাও রহস্য।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। জোর ধাক্কায় ঘুমটা ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি মাথার ওপর নীল সামিয়ানাটা তুলে নিয়ে কে যেন কালো পর্দা বিছিয়ে দিয়েছে। মাঘের সন্ধে সারা ছাদটাকে অন্ধকার আর কুয়াশা দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। শীতও করছে খুব। একটা চাদরে কি এই শীত যায়?

—তোর কি বোধশক্তিও চলে গেছে দাদা? এই শীতের মধ্যে পাতলা চাদর জড়িয়ে মোষের মত ঘুমচ্ছিস? ভাগ্যিস ছাদে এসেছিলাম। নইলে তো সারারাত ঐখানেই পড়ে থাকতিস।

রেখার চিৎকারে উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলাম। কে জানে, আবার ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লাগল কিনা?

সেদিন সন্ধের হিম লাগার জন্যেই হোক অথবা যে কোন কারণেই পাঁচ দিন বাড়িতে আটকে পড়লাম। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর তার সঙ্গে সর্দিজ্বর। ইচ্ছে থাকলেও বাইরে বেরুতে পারলাম না। মাথার ওপর আমার একজন কড়া অভিভাবক আছে এখানে। দেশে আমার বৃদ্ধ বাবা মা আমার জন্যে উদ্বিগ্ন নন। কারণ ওঁরা জানেন, এখানে রেখা নামে একটি কড়া ধাঁচের পিসতুতো বোন আছে, যার শাসন এড়িয়ে বখে যাওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। যদিও রেখা আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট, তবুও ওর আদরের শাসনটা আমার বরাবরই ভালো লাগে। অনেক সময় শাসনটা উপভোগ করার জন্যে ইচ্ছে করেই ওকে রাগিয়ে দিই। আর তার অবশ্যম্ভাবী ফল ওর মুখ থেকে অভিভাবকসুলভ

ধমকানি।

এই পাঁচ দিন জ্বরের মধ্যে সেই সব ধমকানির তিলমাত্র বিবৃতি ছিল না। যেমন বকুনি তেমনি আদর। ওষুধ পথ্য থেকে আরম্ভ করে সেবাশুশ্রূষা। কোনটারই কোন খামতি ছিল না। কিন্তু ছ' দিনের দিন আর ও আমাকে আটকে রাখতে পারল না। মাথার মধ্যে পাপড়ি পোকা সর্দিজ্বরের সব যন্ত্রণা ছাপিয়ে উঠেছে। জ্বরের মধ্যেও ভালো করে ঘুম আসেনি। কেবল ভেবেছি মেয়েটাকে কে খুন করতে পারে? কিন্তু কোন কূল-কিনারা চোখে পড়েনি।

এদিকে নীলেরও কোন পাত্তা নেই। সেই যে সেদিন দুপুরে ও আমাকে ছেড়ে দিয়ে পালালো, এর মধ্যে আর একদিনও এ পথ মাড়ায় নি। অন্য সময় হলে আমার সঙ্গে এত দিন দেখা না হওয়ার জন্যে এসে হাজির হত। আমি জানি ও এখন খুব ব্যস্ত। বোধ হয় ও এতদিনে অনেক এগিয়ে গেছে। আমার কাছে এখনও যা তমসাচ্ছন্ন, ও নিশ্চয় সেখানে থেকে আলোর রশ্মি খুঁজে পেয়েছে। নিঃসন্দেহে আমার থেকে ওর চিন্তার পদ্ধতি আলাদা। চিন্তা করতে ও জানে। চিন্তার সু-ফসলটুকুও নানান বাধার মধ্যে থেকে ঠিক তুলে আনতে পারে।

নিজের ঘরে বন্দী থাকতে থাকতে আমি ছটফট করে উঠলাম। কোন রকমে রেখাকে ম্যানেজ-ট্যানেজ করে বেরিয়ে পড়লাম। আজ যেমন করেই হোক নীলের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

চারটে নাগাদ ওর বাড়ি পৌঁছে গেলাম। মনে মনে একটা আশঙ্কা ছিল হয়ত ওর সঙ্গে আজ দেখা নাও হতে পারে। হয়ত কোথাও বেরিয়ে গেছে। কিংবা কারো পিছন পিছন কোথাও ছুটছে। কিন্তু একতলার বৈঠকখানাতেই ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

ও একা ছিল না। আমার অপরিচিত এক যুবক দরজার দিকে পিছন ফিরে নীলের সামনাসামনি বসে ছিল। আমাকে দেখে ও ইশারায় পাশে বসতে বলল। সামনে গিয়ে বসেই যুবকটিকে ভাল করে লক্ষ্য করলাম। পিছন থেকে তাকে অপরিচিত মনে হয়েছিল। কিন্তু একেবারে আমার অপরিচিত না। চিনতে পারলাম। যদিও এর আগে মাত্র একবারই তাকে দেখেছিলাম। উদ্দালক মিত্র।

ওরা যেন কি সব কথাবার্তা বলছিল। আমি যাওয়াতে সেটা থেমে গেল। নীল পরিচয় করিয়ে দিল,—মিস্টার মিত্র, এর সামনে আপনি সব কথাই বলতে পারেন। ও আমার বিশেষ বন্ধু।

উদ্দালক ম্লান হেসে বলল,—অজেয় বসু? তাই না?

আমি বললাম,— সে কি, আপনি আমার নামও জানেন দেখছি।

—জেনে ফেলেছি। আপনার বন্ধুই একটু আগে আপনার কথা বলছিলেন। এছাড়াও আপনার আর একটা পরিচয় আমার জানা আছে। অবশ্য তখন জানা ছিল না আপনার দুজন একই লোক। পৌরাণিক প্রেমের ওপর আপনার লেখা বইটা বাজারে বেশ নাম করেছে। গত জন্মদিনে পাপড়িকে ঐ বইটা প্রেজেন্ট করেছিলাম।

পাপড়ির স্মৃতি মনে আসতেই উদ্দালকবাবুর মুখের রেখাগুলো কেমন যেন ধীরে ধীরে পালটে যেতে লাগল। এক রকম বিষণ্ণতা স্নিগ্ধ প্রকৃতির গায়ে কুয়াশার ছায়া হয়ে ছড়িয়ে গেল। উজ্জ্বল ভাসা ভাসা চোখ দুটোয় অন্যমনস্কতা নেমে এল। আমি আর নীল, উভয়েই সেটা বুঝলাম। কথার বাধা দিয়ে নীল এই ছোট্ট অন্যমনস্কতা ভাঙিয়ে দিতে চাইল না। প্রায় নীরবে লাইটার জ্বালিয়ে ও একটা সিগারেট ধরাল। এই অবসরে উদ্দালকবাবুকে আমি আপাদমস্তক লক্ষ্য করলাম। আজ ওকে দেখে আমার বারবার কেমন মনে হচ্ছে, এই রকম একটা মুখ আমি যেন এর আগে কোথায় দেখেছি, বিয়ের বাসরে না অন্য কোথাও কিছুতেই খেয়াল করতে পারছিলাম না। কিন্তু বড় চেনা মুখ।

বিয়ের সাজে সাজা বরকে ঠিক আটপৌরে মানুষ হিসেবে খুঁজে পাওয়া যায় না। ফোঁটা-চন্দন আর টোপরে আসল মানুষটা তখন অন্য রকম হয়ে যায়। বিয়ের দিন যে উদ্দালকবাবুকে দেখেছিলাম তার সঙ্গে আজকের এই যুবকের বেশ কিছুটা তফাত হয়ে গেছে। গরদের পাঞ্জাবি, ধুতি আর ফুলের মালায় পরিচিত একটা রূপই চোখের সামনে ভাসে। সেটা আদি অকৃত্রিম বর। সনাতন নিয়মে বিয়ে করতে যাওয়া একজন পুরুষ। তখন তার আলাদা এবং নিজস্ব সত্তাটা চিরাচরিত বরেদের দলে মিশে

হারিয়ে যায়। তা ছাড়া আমি যখন উদ্দালককে দেখেছিলাম তখন তাকে কি রকম উদ্‌ভ্রান্ত আর সর্বহারা মনে হচ্ছিল। একটা অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য আর সব হারানোর বৈরাগ্য তাকে ঘিরে রেখেছিল।

আজ, যদিও সেদিনেব তুলনায অনেক স্বাভাবিক মনে হল, তবু ওব বিশাল বিষণ্ণ চোখে সংসার বৈরাগ্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

উদ্দালককে দেখতে সুন্দর। এক কথায় রূপবান। এমন সুপুরুষ ছেলে না হলে পাপড়ির সঙ্গে মানায় না। একমাথা তার কোঁচকানো কালো চুল। উজ্জ্বল ভাসা ভাসা দুটো চোখ। চাহনিতে কোথায় যেন একটা কোমল মায়া জড়িয়ে আছে। বোধহয় এক লহমায ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলা যেতে পাবে, ওর মধ্যে কোন ক্রূরতা নেই। কোন শঠতা কবতে বোধ হয ও শেখে নি। দীর্ঘ ধারালো নাক। ঈষৎ পুষ্ট ঠোঁট। আর সমস্ত মুখে নির্মল সারল্য বজায় বেখে এক পুরুষ-ব্যক্তিত্ব ছড়িয়ে দিয়েছে ওর উন্নত আর দৃঢ় চিবুক। প্রায় পাঁচ ফুট ন ইঞ্চির মত লম্বা। দোহারা গড়ন। গায়ের রং মাঝাবি।

আসলে এই সব কিছু নিয়ে আমারে ওকে দারুণ ভালো লেগে গেল। ওকে দেখতে দেখতে একটা চিন্তা আমার মাথার মধ্যে কেবলি পাক খেতে লাগল। ওকে যেন কোথায় দেখেছি। কিংবা ওরই মত কাউকে। কোথায দেখেছি কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। অথবা আমার ভুলও হতে পারে। আসলে ছোটবেলায় মা মাসিদের মুখে যে ধরনের রূপটুপ থাকলে একজন পুরুষকে সুন্দর বলা যায়, সেই রকম একটা ইমেজ তৈরি হযে ছিল মনের মধ্যে। উদ্দালককে দেখে হয়ত অবচেতন সেই ইমেজটা কথা বলে উঠেছে।

প্রায়মিনিট খানেক অন্যমনস্ক থাকার পর হঠাৎ উদ্দালক একটু নড়ে-চড়ে বসল। পকেট থেকে সিগারেট বার করে বলল,—ইফ য়ু ডোণ্ড মাইন্ড।

নীল ব্যস্ত হয়ে বলল,—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এ আবার একটা কথা হল নাকি?

সিগারেটের প্যাকেটটা হাতের ওপর তুলে ধরল। রয়েল সাইজ ফিল্টার উইলস্। একটু খটকা লাগল। পরক্ষণেই চমকে উঠলাম। আমি ঠিক দেখছি, না ভুল? উদ্দালকবাবু সিগারেটের প্যাকেট খুলতেই দেখলাম কাটা বাংতা ফেলে দেওয়া নেই।

রাংতাটা সবিয়ে একটা সিগাবেট বার করে ফেব বাংতাটা যথাস্থানে রেখে প্যাকেট বন্ধ কবে দিল। চকিতে আমি নীলের দিকে তাকালাম। নীল আমাব দিকে। কিন্তু নীল নির্বিকাব। ওর মুখে কোন ভাবের অভিব্যক্তি নেই। একটু পবে ঘবের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কবে নীলই বলে উঠল,—উদ্দালকবাবু, আপনি কিন্তু এখনও বলেননি আজ হঠাৎ আমার কাছে কেন এলেন?

—বলছি। এই বলে একটু থেমে ঠিক আগের মত অন্যমনস্কের সুরে বলতে শুরু কবলেন, প্রথমে আমি ইনস্পেক্টর সবল সিংহের কাছেই যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু যখন শুনলাম, পুলিসের পক্ষ থেকে প্রাইভেটলি আপনিই এই কেসটা ডিল করছেন তখন আপনার কাছে আসাই শ্রেয় মনে হল।

মিস্টার সিংহকে আমার প্রথম দিনই ভালো লাগে নি। ওনার স্বভাব বা ব্যবহাব আমার খুব ক্রুড মনে হয়েছিল। ডাক্তার উকিল আর পুলিস, এঁরা যদি সাধাবণ মানুষেব সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার করেন তাহলে মানুষ তাঁদের ওপর নিজেদের আস্থা রাখতে পারেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা হয় না। আর সত্যি বলতে কি পুলিস-টুলিস আমার একদম ভালো লাগে না। জীবনে কোন দিনও থানায় যাবার কথা চিন্তা করি নি। থানার ফুটপাথ থেকে যতদূর সম্ভব দূর রাস্তায় চলাফেরা করতাম। অথচ ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে আজ আমাকেই চিন্তা করতে হচ্ছে পুলিসের কাছে যাবার কথা। কিন্তু যে মুহূর্তে শুনলাম কেসটা আপনার হাতে এসেছে, আপনার সেদিনের ব্যবহার আমার মনে আছে, তাই।

নীল বাধা দিল,—ঠিক আছে। ঠিক আছে, এবার বলুন, কেন এলেন?

উদ্দালক আমাদের থেকে বয়সে ছোটই হবে। মনে হয় ও এখনও ত্রিশ পার হযনি। তবু একেবারে ছেলেমানুষ না। যদিও ওর মুখের মধ্যে ছেলেমানুষি সারল্য লুকিয়ে আছে। সেই সরল আবেগটা ফুটে উঠল ওর কথার মধ্যে,—ছোটবেলায় কোন এক রূপকথার গল্পে পড়েছিলাম, এক রাজপুত্র সব হারালে যে কি ব্যথা লাগে তা গল্প পড়ে সেদিন উপলব্ধি করতে পারিনি। আজ পারছি, বিশ্বাস

করুন নীলাঞ্জনদা।

নীলকে সবাসরি দাদা সম্বোধন করে বসল। কিন্তু আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সে কথা পরে। উদ্দালকের কথায় ফিরে আসি। ও তখনও বলে চলেছে,—আমি এখনও ভাবতে পারছি না, পাপড়ি নেই। পাপড়ি আব কোনদিনও আমাব কাছে ফিরে আসবে না। আর কোনদিন ও আমার পাশে এসে দাঁড়াবে না আমাব চবম দুঃখের দিনে। একটা খেইহাবা নৌকোয় চেপে জীবনের নদীতে পাড়ি দিয়েছি। ছোট থেকেই কেউ আমার পাশে নেই। মাঝে মাঝে বড সঙ্গহীন মনে হয়েছে নিজেকে। অসহায়ের মত মাঠে ময়দানে অথবা শহবেব হাজার ভিড়ে একা একা ঘুবে বেড়িয়েছি। ছোটবেলায় আমার বেশ মনে পড়ে, একটা মিশনাবী স্কুলে পড়তাম।

হঠাৎ ও থেমে গেল। তাবপর বলল,—আপনি বোধ হয় বোর ফিল করছেন!

—না, একেবারেই না। আপনি বলুন।

—'আপনি' বলবে না, আমি আপনাকে দাদা বলে ডেকেছি।

একটু হেসে নীল বলল,—বেশ তাই হবে। বল, কি বলেছিলে। থেমো না। কিছু গোপন না করে সব খুলে বল।

—বলছি। বলব বলেই তো এসেছি আপনাব কাছে। যাকে সব বলতে পাবতাম সে তো আর কোনদিন আমার কথা শুনতে আসবে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বলতে শুরু কবল,—একটা মিশনাবী স্কুলে পড়তাম। পড়াশুনায় কোনদিনও খাবাপ ছিলাম না। কিন্তু সব থেকে খারাপ লাগত কি জানেন, যখন দেখতাম প্রতিদিনই আমারই মতো সব ছোট ছোট ছেলেদের মায়েবা টিফিনে এসে তাদেব আদব কবে যত্ন কবে মাথায় হাত বুলিয়ে খাইয়ে যেতেন। কোনদিন কিন্তু আমাব জন্যে কেউ আসে নি। আসত না। সীমাদি, মানে আমাদের সেই সময়েব আয়া টিফিন সাজিয়ে সুটকেসে ভরে দিতেন।

কোনোদিনও খেতাম না সে সব। খেতে ইচ্ছেও করতো না। স্কুল বাড়িব সামনে প্রতিদিন টিফিনের সময় একটা কুকুব ল্যাজ নেড়ে নেড়ে ঠিক আমাব কাছে এসে দাঁড়াতো। আর আমি সবাইকে আড়াল করে তাকে সব খাইয়ে দিতাম। কুকুবটা আমার ন্যাওটা হয়ে গিয়েছিল। বোধহয় আদরেব মর্ম জন্তুরাও বোঝে। খাবারগুলো তখন কেন যে খাইয়ে দিতাম তা আজ বুঝতে পারি। বোধ হয় আমিও চাইতাম, সবার মতো আমার মাও আমাকে আদব করে খাইয়ে দেন।

বাৎসরিক পরীক্ষার বেজাল্ট বের হলে দেখতাম, বন্ধুদেব মায়েরা তাদেব ছেলেদের কেউ বা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধবেছেন, কেউ বা ধমক দিচ্ছেন। আমাব মা আমাকে কোনদিন ধমকও দেননি, আদবও করেননি।

কথাব মাঝে নীল বলল,—কিন্তু তুমি তো মায়েব কাছেই থাকতে?

—হ্যাঁ, মায়ের বাড়িতে থাকতাম। মায়ের কাছে না। পাস করে রেজাল্ট নিয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত না খেয়ে বসে থাকতাম, মা এলে বেজাল্ট দেখাব। আমাব মা ফিরে এসে আর সব ছেলেদের মায়ের মতো আমাকে আদর কবে বুকে জড়িয়ে ধরবেন এই আশায়। কিন্তু বাংলা বম্বের নামকরা সেরা অভিনেত্রী। তাঁর সময় কোথায় ছেলের রেজাল্ট দেখার। তবে আমাব কিন্তু কোনোদিনও খাওয়া-পরা আব শিক্ষার অভাব হয়নি। এই বাংলাব হাজাব হাজার ছেলের এগুলো থাকে না, কিন্তু মা থাকে। আমাব সব ছিল কিন্তু মা ছিল না। জানেন, আজও আমি এই বয়সে অন্ধকার রাতে ছাদের ওপর একা একা পায়চারি করি, আর বুকের মধ্যে থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় একটা কান্নাজড়ানো শব্দ 'মা'। মাঝে মাঝে নিজেকে বড় অভিশপ্ত মনে হয়। এ জীবনে কোনদিনও মা বলে ডাকতে পারলাম না। মা সামনে এসে দাঁড়ালে বিশ্বজোড়া অভিমান গলায় আটকে 'মা' ডাকা বন্ধ করে দেয়।

—কিন্তু তোমার বাবা?

—বাবা? ঠোঁটের কোণে শ্লেষ ফুটে উঠল, আমি কোনদিন সে ভদ্রলোককে চোখেই দেখিনি।

—তিনি বেঁচে আছেন?

—জানি না।

—সে কি! তোমার মায়ের কাছ থেকে কোনদিন জানতে চাওনি?

—চেয়েছিলাম। উত্তরে উনি বলেছিলেন, ধরে নাও তোমার বাবা মরে গেছে। কোন লম্পট দুশ্চরিত্র এবং বেইমান কোনদিন এসে তার ছেলে বলে তোমাকে দাবি করলে, আমার আয়রনচেস্টে রিভলবার আছে, সোজাসুজি তাকে গুলি করবে। এর বেশি আর কিছুই বলেননি। আমার মার জীবনে যতই কলঙ্ক থাক না কেন, তিনি অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালিনী। মুখের ওপর মুখ তুলে কথা বলতে আমি কোনদিনও পারিনি।

—তোমার বাবার নামটা নিশ্চয়ই জান?

—জানি। সুরঞ্জন মিত্র।

—আগে কোথায় থাকতেন, জানতে পারনি?

—না। এ পৃথিবীতে একমাত্র যিনি তাঁকে চেনেন বা জানেন, সেই মা-ই তো আমার কাছে নীরব।

—বেশ। তারপর কি হল বল?

—খেইহারা নৌকোটা যখন দরিয়ায় একা একা ভাসছে, দেখা হয়ে গেল একদিন পাপড়ি নামের এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে। সত্যিই ও ছিল যেন ফুলের একটা পাপড়ি। যে ওর নাম রেখেছিল পাপড়ি তার দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করে পারা যায় না।

—বাই দ্য বাই, পাপড়ির সঙ্গে তোমার আলাপ হয় কেমন করে?

—আপনি বোধহয় শুনে থাকবেন, আমি একটু গাইল্ত টাইতে পারি। পণ্ডিত রামকিঙ্কর সেন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে যাঁর নাম অনেকেই মনে রাখবেন, বিশেষ করে ধ্রুপদ আর ধামারে, আমি তাঁর কাছেই গান শিখি। একদিন পাপড়ি এল ওঁর কাছে গান শিখতে। আমাদের আলাপ হল। হল পরিচয়। তারপর একদিন দু'জনে দু'জনকে ভালোবাসলাম। বিশ্বাস করুন নীলাঞ্জনদা, জীবনে আমার সব না পাওয়ার দুঃখ ভুলে গিয়েছিলাম ও আমার পাশে এসেছিল বলে।

—একটা কথা উদ্দালক, ও কি তোমার সব পরিচয় জেনেছিল?

—আমি কোন কথাই ওর কাছে লুকোইনি। লুকোব কেন বলুন? ও ছাড়া আপন বলে তো আর কাউকে আমার জীবনে পাই নি। সত্যিকারের ভালোবাসা আমি ওর কাছেই পেয়েছিলাম। এক একসময় যখন আমি পিছনের জীবনের গ্লানিতে ভেঙে পড়তাম, যখন নিজেকে জগতের একটা অপাংক্তেয় জীব বলে মনে হোত, পাপড়ি তখন আমার মাথাটা ওর বুকের মধ্যে চেপে ধরে আমার কল্পনার মায়ের মতো আমাকে আদর করে বলতো, 'মনে রেখো এখন আর তুমি একা নও। আমি আছি তোমার পাশে, সারাজীবন।'

হঠাৎ বাচ্চা ছেলের মতো হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল উদ্দালক। আমি ভাবতেই পারিনি প্রায় অপরিচিত দুজন মানুষের কাছে ও এইভাবে ভেঙে পড়বে। বড় অস্বস্তি লাগছিল। আবেগ বড় ছোঁয়াচে রোগ। আশপাশের সবাইকে বুঝি পেয়ে বসে। আমিও বড় বেশি আবেগপ্রবণ। আমার সেই মুহূর্তে ইচ্ছে করছিল কান্নায় ভেঙে পড়া উদ্দালককে বুকে টেনে নিয়ে বলতে আজ থেকে তুই আমাদের ভাই হলি। আর কিছু ভাবিস না তুই।

নীলের দিকে তাকালাম। এমনিতে ও খুব শক্ত মনের ছেলে। এ রকম সেন্টিমেন্টাল মুহূর্ত ওর জীবনে এর আগে আসেনি। তাই দেখবার ছিল এখন ও কি করে। কিন্তু আশ্চর্য, নীল কিছুই করল না। চুপ করে বসে নির্বিকার সিগারেট টেনে চলল।

একটু পরে, কান্নার বেগ থামলে উদ্দালক পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা মুছে নিয়ে একটু সহজ হয়ে বলল,—সরি, এক্সট্রিমলি সরি নীলাঞ্জনদা। মাঝে মাঝে আমি স্থান কাল পাত্র সব ভুলে যাই। কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারি না পাপড়ির কথা আর ভেবে কোন লাভ নেই। আর কোনদিন পাপড়ি পাশে এসে বলবে না সে আমার পাশে আছে চিরজীবন। আমি আজ সত্যিই সর্বস্বান্ত।

নীল যে কোথা থেকে এই অল্প বয়সে সান্ত্বনা দেবার মতো ব্যক্তিত্ব খুঁজে পায়, আমি জানি না।

যা করতে গেলে আমাকে উদ্দালকের মতো কেঁদে-টেঁদে করতে হোত, অন্তত চোখে জল-টল এসে যেতো, নীল অদ্ভুত গম্ভীর স্বরে মাত্র কয়েকটা কথায় বলে দিল,—না উদ্দালক, এ পৃথিবীতে নিজেকে কখনোই একা ভেবো না। মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখ। কেউ না কেউ তোমার পাশে দাঁড়াবেই। দাঁড়াতে হবেই। জগতের তাই নিয়ম। একটু আগে আমাকে দাদা বললে না? এবার বলো তো, কেন তুমি আমার কাছে এসেছ?

নিমেষে উদ্দালক ওর সব দুর্বলতা কাটিয়ে বলে উঠল,—-পাপড়ি চলে যাবার পর আমি মরতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু মবতে পাবিনি। এক সপ্তাহ আমাব কিভাবে কেটেছে আমি নিজেই জানি না। কিন্তু হঠাৎ গতরাত্রে আমাব মনে হল, কাওয়ার্ডেব মতো মবার কোন মানে হয় না। অন্তত যে আমাব জীবনে শেষ শান্তিটা কেড়ে নিয়েছে তা.ক আমি ছাড়ব না। আমি চাই তাব চরম শাস্তি। আর এটা যদি করতে না পাবি পাপড়ি আমাকে ক্ষমা কববে না। নীলাঞ্জনদা, তাই আমি এসেছিলাম আপনার কাছে। পাপড়ির হত্যাকারীকে আপনি খুঁজে বার করুন।

নীল একটু হাসল,— তা এর জন্যে তোমার না এলেও চলতো ভাই। কারণ খুনিকে আমি খুঁজে বাব করবই। তবে এ একদিকে ভালোই হল। তুমি নিজে আমাব কাছে না এলে আমাকেই তোমাব কাছে যেতে হোত। আমাকে কয়েকটা খবর দিতে পার উদ্দালক।

—বলুন। জানা থাকলে নিশ্চয়ই বলব।

নীলেব গলাব স্বর পাল্টে গেল। ঘরোয়া নীল নিমেষে গেল হাবিয়ে। শুরু হল পুলিসি সওয়াল, —এই ব্র্যান্ডের সিগারেট তুমি কত দিন খাচ্ছ উদ্দালক?

—সিগারেট আমি বেশি দিন ধবিনি। বোধ হয় বছর পাঁচেক। আর তখন থেকেই এই ব্র্যান্ডই খাই।

—ববাবরই তুমি বাংতাটা শেষ পর্যন্ত বেখে দাও?

অবাক হয়ে উদ্দালক বলল,—হ্যাঁ, ববাববই।

— বিয়ের দিন তুমি সাবাদিন কি করেছিলে মনে আছে?

—হ্যাঁ মনে আছে। সাবাদিন আমি বাড়িতেই ছিলাম।

—কখন বেরিয়েছিলে?

—তা ধরুন সাতটা নাগাদ। আমাব বাড়ি থেকে পাপড়িব বাড়ি যেতে বড় জোব আধ ঘন্টা।

—তোমার বাড়িটা যেন কোথায়?

—তারক দত্ত রোড।

—সেটা কোথায়?

—সৈয়দ আমির আলি অ্যাভেন্যুর কাছে।

—সাতটার আগে? তারপরে নিশ্চয় নয়।

—না। কারণ পঞ্জিকা মতে ঐটাই নাকি শুভ সময়। কি শুভ সময় দেখলেনই তো।

—তোমাব সঙ্গে কে কে গিয়েছিলেন? আমি মিন বরযাত্রী।

—তেমন বিশেষ কেউ নয়। আমার পুরনো কয়েকজন কলেজেব বন্ধু। ওরা অবশ্য কমন ফ্রেন্ড। আমাব আব পাপড়ির।

—তোমাব মা কি সেদিন সারাদিনই বাড়ি ছিলেন?

—প্রায় বছব দুয়েক আব মার সঙ্গে থাকি না।

—কেন?

—মাকে বলেছিলাম, তাঁর ঐ প্রফেশন আমার ভালো লাগে না, ওটা ছেড়ে দিতে। দেননি। তাই।

—উনি এই প্রফেশনটা ছাড়ছেন না কেন, সে সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা আছে?

—অর্থ আর যশের মোহ মানুষ বোধ হয় জীবনেব শেষদিন পর্যন্ত ছাড়তে পারে না।

—তোমাদের এই বিয়েতে তোমার মায়ের মত ছিল?

—আপত্তি ছিল না।

—আগ্রহ?

—তেমন একটা না। কারণ বেশি বড় বনেদি মানুষের সঙ্গে কুটুম্বিতা ওঁর ইচ্ছে ছিল না। তবে মত দিয়েছিলেন পাপড়ির জন্যে।

—উনি সেদিন তোমার বাড়িতে আসেননি?

—হ্যাঁ। এসেছিলেন। এবং প্রায় সারাদিনই ছিলেন।

—তার মানে তুমি সন্ধেবেলা যখন বিয়ে করতে বের হও তখন উনি ছিলেন না?

—উনি পাঁচটা নাগাদ চলে গিয়েছিলেন।

—এ রকমটা হওয়ার কাবণ কিছু জান?

—আমার বন্ধু-বান্ধবদের সামনে যেতে ওনার আপত্তি।

—কেন?

—মনে হয় কোন কমপ্লেক্স।

—তোমার বন্ধুরা কখন এসেছিল?

—বেশির ভাগই পৌনে সাতটা নাগাদ। অবশ্য সাতটাব মধ্যেই সবাই এসে গিয়েছিল। তবে,

—তবে কি?

—সুদীপ্তা নামে আমার এক গাইয়ে বান্ধবী এসেছিল সাড়ে পাঁচটার সময়।

—সুদীপ্তা কোথায় থাকে?

—থাকে বালীগঞ্জ প্লেসে। তবে এখন আর ওখানে পাওয়া যাবে না। আমার বিয়ের দিন পাঁচেক পবেই দিল্লী চলে গেছে।

—হঠাৎ দিল্লীতে কেন?

—মিউজিক কনফারেন্সে। আমাদেরও মানে আমার আর পাপড়িবও যাবার কথা ছিল।

প্রায় মিনিট খানেক মাথা নিচু করে ভ্রু কুঁচকে নীল কি যেন ভাবল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, —একটা অড্ প্রশ্ন করছি। তোমরা দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসতে, তাই না?

—হ্যাঁ।

—পাপড়ির দিক থেকে অন্য কারো প্রতি দুর্বলতাব কিছু ছিল কি না জান তুমি?

—কি বলছেন আপনি?

—প্রশ্ন কোরো না, উত্তর দাও।

—না। বেশ দৃঢ় স্বরেই ও বলল, এ রকম কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

—এমন কি শুনেছ কখনও পাপড়িকে অন্য কেউ প্রপোজ করেছে?

—সে রকম কিছু ঘটলে আমি জানতে পারতাম। পাপড়ি আমায় না বলে থাকতে পারতো না।

—এই বিয়ের ব্যাপারে কেউ কোন হুমকি দিয়েছিল? মানে তোমাদের এ বিয়ে হতে দেবে না, এই রকম কিছু?

—ওর বাড়ির লোকের আপত্তি ছিল, এটা জানতাম। তার জন্যে আমি পাপড়িকে অনেকবারই বলেছিলাম আমার কথা ভুলে যেতে। কিন্তু এসব কথা ও কোনদিন কানেও তোলেনি। তবে আপনি যে ধরনের হুমকির কথা বললেন, তা কোনদিনও শুনিনি।

—ডাক্তার অরিন্দম বাসুকে চেনো?

—চিনি না, তবে পাপড়ির মুখে ওনার নাম শুনেছি।

—আর কিছু শোননি?

—কই না তো।

—পাপড়ি দেবীর মাছ পোষার শখ কত দিনের?

—অনেক দিনের। ও বলেছিল বিয়ের পর অ্যাকোয়ারিয়ামটা আমার বাড়িতে নিয়ে আসবে।

—তোমার কাউকে সন্দেহ হয়?

—না। তা যদি হোত, মনের যা অবস্থা, এতদিনে হয়তো তাকে আমি খুন করতাম।

নীল ওর গাম্ভীর্য খসিয়ে ফেলল। হেসে হেসে বলল,—ভাগ্যিস করনি। তাহলে দুটো কেস নিয়ে আমার হিমশিম খেতে হোত। যাক, তুমি আজ বাড়ি যাও। প্রয়োজন হলে কিন্তু আমি তোমার ওখানে যাব।

উদ্দালক বিনয়ের সঙ্গে বলল,—যাবার দরকার নেই। আমায় খবর দিলেই আসব।

—তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে কি আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যেতে হবে?

—আপনার ক্ষেত্রে আলাদা। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে বোধহয় তাই। আমি ঠিক বলতে পারব না ওনার এখনকার পরিস্থিতি কি?

নীল একটা প্যাড এগিয়ে দিয়ে বলল,—এতে তোমার আর তোমার মায়ের ঠিকানা লিখে রেখে যাও। তোমার অফিসের ঠিকানাটাও দিও।

একটু পরেই উদ্দালক চলে গেল। নীল ওকে এগিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরতেই আমি একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। হাত তুলে আমায় থামিয়ে বলল,—তার মানে, তোর লিস্টে আরো একজনের নাম বাড়ল, তাই না?

অবাক হয়ে আমি বললাম,—আরো একজন মানে?

—এ ক'দিনে সন্দেহের তালিকায় তুই যাকে যাকে চিন্তা করেছিলি, সেই তালিকায় আরো একটা নাম ইনক্লুডেড হল। অর্থাৎ উদ্দালক এসে মাথাটা আরো গুলিয়ে দিল। এই তো?

নীল বোধহয় সত্যিই অন্তর্যামী। এতক্ষণ আমি তাই ভাবছিলাম। বললাম,—উদ্দালককে কি বাদ দেওয়া যায়?

নীল উত্তর দিল,—ঘটনা আর ওর স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ওকে বাদ দেওয়া যায় না। অর্থাৎ সিগারেটের ব্রান্ড, কাটা রাংতা যত্ন করে রেখে দেওয়া এগুলো ওর বিপক্ষে রায় দেবে। তারপর, পাপড়ি খুন হয়েছে ধর সোয়া ছটা থেকে সাড়ে ছটার মধ্যে। উদ্দালকের বক্তব্য অনুসারে বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধে পৌনে সাতটা পর্যন্ত ওর কাছে কেউ ছিলই না। একজন ছিল। সুদীপ্তা। কিন্তু সে যে ঐ সময় উদ্দালকের কাছে ছিলই তার কোন প্রমাণ নেই। একমাত্র ওর বক্তব্য সত্যি বলে মেনে নিলে, ছিল। কিন্তু বিনা প্রমাণে তো কিছু মানা যাচ্ছে না। যে প্রমাণ, সে তো কলকাতা থেকে ন'শ মাইল দূরে। অর্থাৎ সুদীপ্তার থাকার কথাটা যদি মিথ্যে হয় তাহলে বিকেল পাঁচটা থেকে পৌনে সাতটা পর্যন্ত উদ্দালক যে বাড়িতেই ছিল তাবও কোন প্রমাণ নেই।

আমি বাধা দিলাম,—কিন্তু যে ছেলে এমন করে কাঁদতে পারে,

নীল ধমকে উঠল,—অজু, সস্তা সেন্টিমেন্ট দিয়ে গোয়েন্দাগিরি চলে না। ও যে একজন বড় অভিনেতা নয় কি করে বুঝলি? ভুলে যাস না ওর রক্তে অভিনয়ের ধারা রয়েছে। ওর মা একজন বড় অভিনেত্রী।

আমি বোকা। এবং থ। নীল বলে কি? যে ছেলে তার প্রেমিকাকে হারিয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদতে পারে, সে হবে কিনা সেই প্রেমিকার খুনি? আমার সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। নীল প্রথমে ঠিকই বলেছিল, কেসটা খুব জটিল। কিন্তু আরো একটা বড় কথা, উদ্দালকের মোটিভ কি? নীলকে তাই প্রশ্ন কবলাম।

নীল চট করে কোন মন্তব্য করল না। তারপর বলল,—সেখানেই তো কথা। মোটিভ বিচার করতে গেলে উদ্দালককে খুনের তালিকা থেকে বাদ দিতে হয়। পাপড়িকে হত্যা করার মধ্যে ওর কোন জোরালো মোটিভ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বরং ভেবে দেখতে গেলে বিয়ের আগে পাপড়িকে খুন করলে ওরই লোকসান। বামতনুবাবুর উইল অনুসারে ওনার সম্পত্তির অর্ধাংশ বিয়ের পর উদ্দালকের হতে পারতো। তাই উদ্দালক পাপড়িকে খুন করতে চাইলে বিয়ের পর করবে, আগে নয়।

—তাছাড়া, নীলের কথাব মধ্যেই আমি বলে ফেলাম, যত বড় পাকা অভিনেতাই হোক, এ তো রেগুলার স্পোর্টসম্যানেব কাজ। পাঁচটা থেকে সাড়ে ছটাব মধ্যে বিয়ের বর মেয়ের বাড়িতে গিয়ে

মেয়েকে সবাব চোখে ধুলো দিয়ে খুন কবে এসে আবাব ঠিক সময়েব মধ্যে নিপাট ভালো মানুষ সেজে বিয়ে কবতে আসা, নাহ্, নীল তুই যাই বলিস, ও আমি যুক্তি দিয়ে মানতে পাবছি না।

নীল মুচকি হাসল,—তাব মানে তুই কিছুতেই চাইছিস না উদ্দালককে খুনি বলতে।

—সত্যি কবে বল না, তোবও কি তাই মনে হয় না?

—মনে হওয়া দিয়ে কিছু হয় না, প্রমাণটাই বড। তবে তোকে আমি উদ্দালকেব ব্যাপাবে নিশ্চিন্ত কবতে পাবি। ওকে খুনিদেব তালিকা থেকে বাদ দিতে পাবিস।

—যাক, বাঁচালি। সিগাবেটেব প্যাকেটটা তো আমাকে বেগুলাব চিন্তায় ফেলেছিল। এবাব তুই কত দূব এগোলি?

বেশ বুঝলাম নীল এডিয়ে গেল আমাব প্রশ্নটা, বলল,—জট, জট, চাবিদিকে কেবল জটেব উর্ণনাভ জাল। তুই নিশ্চযই এ ক'দিন ভেবে সবাইকে খুনি বলে চিন্তা কবতে আবম্ভ কবেছিস?

—তা কবেছি। আমাব ভাবনায় সবাই খুনি। কাউকে বাদ দিতে পাবছি না।

—খুবই স্বাভাবিক। প্রথমটা আমাবও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু তা তো আব নয়। খুনি একজনই। তবে মনে হয় তাকে সাহায্য কবেছিল অন্তত দু'-একজন।

—কে কে?

—জানি না। সেসব কিছু বুঝতে পাবছি না। আসলে প্রত্যেকেই এমন চুপ কবে আছে যে, আসল কথা কাবো মুখ ফসকে বেরুচ্ছে না। সামান্য একটা সূত্রেব সন্ধানও কেউ দিচ্ছে না।

—কি ধবনেব সাহায্য কবেছিল কিছু আঁচ পেয়েছিস?

—খুনি বাডিব বাইবে থেকে এসেছিল। সে খুব চেনা লোক। কোন একজন খিডকিব দবজা আগে থেকেই খুলে বেখেছিল। চাবি চুবি কবেছিল। তাবপব বাথরুমেব দবজা খুলে খুনিকে সংকেত জানিয়েছিল পাপডি এখন ঘবে ঢুকেছে। কিন্তু সে বা তাবা কাবা? একজনেবও হদিস পাচ্ছি না।

—সুদাম হতে পাবে কি?

—পাবে। মালতিও' হতে পাবে। শর্মিষ্ঠা বা মালবিকা এদেবও কেউ হতে পাবে। আসলে খুনিব থেকে খুনিব সাহায্যকাবীকে ধবতে পাবলে এখন অনেক কাজ দেয়।

—এ ক্ষেত্রে কোন্ মোটিভটাব ওপব তুই বেশি জোব দিচ্ছিস?

—সেও এক সমস্যা। প্রেম না অর্থ? প্রতিহিংসা না লোভ?

—আমি বুঝতে পাবছি, তুই কোন্ দুজনকে সব থেকে বেশি সন্দেহ কবছিস।

—হ্যাঁ, সুতনুব লোভ আব অবিন্দমেব প্রতিহিংসা। আচ্ছা বলতে পাবিস, তুই তো লিখিস-টিখিস, প্রেম আব অর্থ, কাব আকর্ষণ সব থেকে বেশি। কে মানুষকে চবম কিছুব দিকে টেনে নিয়ে যায়?

বড কঠিন প্রশ্ন কবল নীল। প্রেম বড না অর্থ বড? প্রেমেব জন্যে মানুষেব সর্বস্ব ত্যাগেব ঘটনাও বিবল না। আবাব অর্থেব কাবণে অনর্থ লেগেই আছে। প্রবঞ্চনাব জ্বালা অথবা প্রার্থিত বমণীব কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওযায় দুঃখ বহু মানুষকে বিপথে নিয়ে গেছে, এ জগতে তাব ভূবি ভূবি প্রমান আছে। কোনটাই ফেলে দেওযাব নয়। অর্থাৎ সুতনু আব অবিন্দমেব মধ্যে যে কেউ খুন কবতে পাবে। আমি তাই-ই নীলকে জানালাম। আবও বললাম,—যদিও এ দু'জনেব যে কেউ একজন হতে পাবে, তবে তাব একদিনেব একটা কথাব উল্লেখ কবেই বলছি, আমাব সন্দেহ অবিন্দমেব ওপব বেশি। কাবণ তুই-ই বলেছিলি, খুনেব প্রক্রিযা খুনিব চবিত্রকে ফ্ল্যাশ কবে। খুনেব নমুনা দেখে অনেক সময়েই বোঝা যায় খুনিব পেশা কি? এক্ষেত্রে,

বাধা দিল নীল,—আমি জানি, অবিন্দমকেই সব থেকে বেশি সন্দেহ কবা উচিত। সন্দেহ আমিও কবি। কিন্তু প্রমাণ কই? প্রমাণ? প্রমাণ না পেলে আমাব হাত পা সব বাঁধা। এতক্ষণ নীল কথাগুলো বলছিল সমানে ঘবেব মধ্যে পাযচাবি কবতে কবতে। এটা ওব অনেক দিনেব পুবনো অভ্যাস। ছোট থেকেই দেখছি। খুব অন্যমনস্ক আব অস্থিব চিন্তা ওব মাথায় থাকলে ও ঘন ঘন একটা নির্দিষ্ট জাযগাব মধ্যে পাযচাবি শুরু কবে দেয়, মনে মনে ও কতটা অস্থিব তা আমি বেশ আন্দাজ কবতে পাবছি।

কিছুক্ষণ এইভাবে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ ও দাঁড়িয়ে পড়ল জানলার ধারে,—চল অজু, একটু ঘুরে আসি।

—কোথায়?

—ঠাণ্ডা হাওয়ায়। মাথাটা বড় জ্যাম হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া না লাগালে আর মাথা ধরা ছাড়বে না।

—ঠিক করে বল তো কোথায় যাবি?

—চল্ না বেরুই।

জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখলাম সন্ধে হয়ে গেছে। আকাশটা বেশ অন্ধকার। নীলের মাথায় এখন কোথায় যাওয়ার মতলব বুঝতে পারছি না। ঠাণ্ডা হাওয়া খাওয়ার জন্যে যে বাইরে যাচ্ছে না তা আমি জানি। শালটা ভাল করে মুড়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়।

এলোমেলো উদ্দেশ্যহীন ভাবে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক গাড়ি চালালো। একসময় আমরা গঙ্গার ধারে এসে পৌছলাম। কি যে ও করতে চায়, কোথায় ওর যাবার মতলব কিছুই বুঝতে পারছি না। নিজে থেকে কিছু না বললে ওর মুখ থেকে এ সময়ে কিছু কথাই বের হবে না। গাড়ি চালাতে চালাতে ও বারবার ঘড়ি দেখছিল। হঠাৎ গঙ্গার ধার থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে এ রাস্তা সে রাস্তা করে রেড রোডে এসে পড়ল। গাড়ি চলছে দু'পাশে ময়দানকে রেখে সোজা উত্তরমুখো। এবার আর না জিগ্যেস করে পারলাম না,—কোথায় যাচ্ছিস সেটা বলবি, না বলবি না?

রাস্তার ওপর দৃষ্টিকে স্থির রেখে বলল,—যাচ্ছি অভিসারে।

—মানে?

—প্রেম।

—ইয়ার্কি হচ্ছে?

—কেন ইয়ার্কির কি আছে? একটা প্রেম আমি করতে পারি না?

—এখন তোর প্রেম করার সময়? আর সেটা আমায় বিশ্বাস করতে হবে?

—বিশ্বাস না করলে আমার কিছু বলার নেই। তবে দেখতেই পাবি চল্।

পার্ক স্ট্রিট দিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে চৌরঙ্গীতে এসে পড়ল। লাল সিগন্যাল পেয়ে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়াতে হল। লিন্ডসে স্ট্রিটের মুখে এসে ধীরে ধীরে গাড়িটাকে দাঁড় করাল পার্কিং জোনে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় সাড়ে ছ'টা।

গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ও কিন্তু নেমে পড়ল না। মনে হল ও যেন কাউকে খুঁজছে। এমন সময় বাইশ-তেইশ বছরের একটা ছেলে এসে একখানা কাগজ গুঁজে দিয়ে গেল ওয়াইপারটার গায়ে। তারপর বোধ হয় মিনিট তিনেক কাটেনি, এমন সময় নীল সচকিত হয়ে উঠল, বলল,—বিশ্বাস করছিলি না তো?

—কি?

—ঐ যে অভিসারে যাবার কথা?

—তো কি?

—শ্রীরাধা এসে গেছেন। সামনের দিকে চেয়ে দেখ। টাইগারের ঠিক নিচে। দেখতে পাচ্ছিস লাল রঙের শাড়ি পরা আর গায়ে ঘি রঙের লেডিস শাল। আমি যতক্ষণ না আসি কোথাও যাবি না। আর এই নে, এটা সঙ্গে রাখ। সাদা পোশাকে কিছু পুলিস এদিকে ঘুরঘুর করবে। এটা দেখালেই আর হাঙ্গামা করবে না।

দ্রুত কথাগুলো বলেই ও নেমে গেল। রাস্তা পার হয়ে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করল। দূর থেকে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না মেয়েটি কে? নীলের দেওয়া কার্ডটা খুলে দেখলাম। ওর আইডেনটিটি কাডটাই আমাকে দিয়ে গেছে।

কিন্তু এও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? নীল প্রেম করছে? আর সেটা এতদিন আমাকে না জানিয়ে?

এব থেকে অবাস্তব ঘটনা আর কি ঘটতে পাবে?

মুহূর্তে জগৎ সংসারের ওপর আমার কেমন যেন অবিশ্বাস হয়ে গেল। পারে, পারে মানুষ সব কিছু কবতে পাবে। অর্থের জন্যে ভাই বোনকে হত্যা করতে পারে। প্রতিহিংসা নেবাব জন্যে প্রেমিক প্রেমিকাকে খুন করতে পারে। নীল আমাকে লুকিযে প্রেমও কবতে পারে।

ছিঃ নীল, ছিঃ, এ ধরনের ব্যবহার আমি তোর কাছ থেকে আশা করতে পাবিনি। রহস্য-টহস্যর ব্যাপারে আমার কাছে ও অনেক সময় অনেক কিছু গোপন কবে এবং অতীতেও করেছে। তার জন্যে খুব একটা কিছু মনে করি নি। কাবণ সেগুলো ও যদি আমার কাছে বলে দেয আব আমি উল্টো-পাল্টা জায়গায় প্রকাশ করে ফেলি তাহলে ওর তদন্তের কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। কিন্তু এই প্রেম করার ব্যাপাবটা? এটা যদি আমি কোথাও বলেই ফেলি তাতে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। বড জোর একটু হাসাহাসি হতে পারে। সোমেন জেঠু নতুন করে নীলের পেছনে লাগার সুযোগ পাবেন। কিন্তু আমি ওর অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু। আমাকেই কিনা,

গাড়িব কাচগুলো তুলে রাজ্যের অভিমান নিয়ে বসে রইলাম। এব একটা বিহিত করা দরকার। একটা কৈফিয়তের আমার প্রয়োজন। ও যদি আমাদেব মধ্যে গোপনীয়তার বেড়া তুলতে চায়, তুলুক। আব না। আমিও তাহলে সেই ভাবেই ওব সঙ্গে মেলামেশা করব।

কতক্ষণ কেটেছিল জানি না। বসে বসে একটা ঝিমুনির ভাব এসেছিল। হঠাৎ উইন্ড স্ক্রীনে টরে-টক্কাব আওয়াজ পেলাম। নীল ফিরে এসেছে। ঘড়িব দিকে তাকিয়ে দেখলাম। রাত আটটা। মানে পাক্কা দেড় ঘন্টা গাড়িব মধ্যে বসে রয়েছি। গাড়িটা ভেতর থেকে লক করা ছিল। দরজাটা খুলে দিলাম।

একটাও কথা বললাম না। একবারও জিজ্ঞাসা করলাম না, মেয়েটা কে? কোথায় থাকে? এতক্ষণ ও কোথায ছিল? কেবল আড় চোখে একবার তাকিয়ে দেখলাম, ঘন্টা তিনেক আগের সেই চিন্তাচ্ছন্ন নীল কোথায যেন পালিয়ে গেছে। বদলে একটা খুশি-খুশি রোম্যান্টিক মেজাজ।

স্টিযারিং টেনে অ্যাকসিলাবে চাপ দিয়ে গাড়িটা স্টার্ট করল। গুনগুন করে অস্পষ্ট একটা থামা থামা সুবও ভাঁজছে।

যেমন আমিও ওর সঙ্গে কোন কথা বললাম না, নির্লজ্জ নীলও আমার সঙ্গে কোন কথা বলার ভাব দেখালো না। গোল্লায় গেছে। একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। অনুতপ্ত হয়ে সামান্য কিছু বললেও এ সময়ে আমার অভিমানটা কেটে যেতো। কিন্তু ওর এই একা একা প্রথম প্রেমেব পুলকিত আস্বাদন নেওয়াটা আমার ভেতর একটা চিড়বিড়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল।

মানুষ প্রেমে পড়লে এত স্বার্থপর হয়ে যায়? ভুলে যায় তার বন্ধুকে? ভুলে যায় তার কাজকর্ম আব কর্তব্যজ্ঞান? এত বড় একটা দায়িত্ব মাথার ওপর ঝুলছে। সেদিকে একবাবও নজর দেবার সময় নেই। স্ট্রেইট লায়নের কাছে তো মুখ দেখানো যাবে না!

বয়ে গেল। বয়ে গেল। আমার কি দরকার অত ভাবার? কেসটা সলভ্ করতে না পাবলে ওরই ডিসক্রেডিট। আর আমিও যেমন বোকা! কলেজ, লেখা সব মাথায় তুলে দিয়ে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে অসুস্থ শরীর নিয়ে ওর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি? বেখা ঠিকই বলে, এসব বিলাসিতা নীলের মতো খামখেয়ালি বড়লোকদেরই মানায়।

নিজের মনে ভাবতে ভাবতে খেয়াল কবিনি ও সম্পূর্ণ উল্টো দিকে চলেছে। গাড়ি তখন হিন্দ সিনেমার কাছে। আব চুপ করে থাকতে পারলাম না। একে আমার অসুস্থ শবীব, তাব ওপর নীলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেশি রাত করে বাড়ি ফেরা যাবে না। বাধ্য হয়ে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, ও কোথাও যেতে চায়?

তার আগেই নীল বলে উঠল,—রাগ করেছিস?

অভিমানে আমার প্রায় কান্না পাবার যোগাড়। জীবনে এমন কিছু কিছু মুহূর্ত আসে যখন কেউ ঠাস্ করে মাবলে লাগে না, অথচ সামান্য একটা কথায় চোখে জল এসে যায। এসব কথা নীল

বুঝবে না। তাই চুপ করেই রইলাম।

নীল হেসে বলল,—নয় একটা প্রেমই করলাম। তাতে এত রাগ? আচ্ছা তুই বল না প্রেম করাটা কি অপরাধের?

ঝাঝিয়ে উঠলাম,—না, অপরাধ না। তবে তুই কি করছিস না করছিস সে তোর ব্যাপার। আমাকে বলাব কোন দরকার নেই। এখন কোথায় যাচ্ছিস বলবি? আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।

হাসি বজায় রেখেই নীল বলল,—বলব। সব তোকে বলব। কিন্তু পাপড়ির হত্যাকারীকে ধরার প্রয়োজন নেই?

—তোব বকম-সকম দেখে তো মনেই হচ্ছে না, ঐ ব্যাপারে তুই ওরিড।

—প্রেম কবলে কি পাপড়ির হত্যাকাবীকে ধরা যায় না?

—হয়তো যায। আমার কোন ধারণা নেই।

—আচ্ছা বেশ, আমি তোকে কথা দিচ্ছি, আর এক সপ্তাহের মধ্যে আমি পাপড়ির হত্যাকারীকে তোদের সামনে তুলে ধরব।

চমকে উঠলাম। নীল কখনও কাউকে বাজে কথা বলে না আমার বিশ্বাস। ভণিতা বা মিথ্যে আশ্বাস দেওয়া ওর চরিত্রে লেখে নি। ওর দিকে ফিবে তাকালাম। ঠোঁটের কোণে একটা সুন্দর আর রহস্যময় মিষ্টি হাসিব প্রলেপ ছড়িয়ে রয়েছে। এই হাসিটাই আমার এতক্ষণ প্রেমিকের প্রশান্ত হাসি বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু অভিমানের জ্বালায় এই হাসির যে আব একটা অন্য অর্থ আছে, তা ভুলেই গিয়েছিলাম। তবে কি পাপড়ির হত্যাবহস্য সমাধানের পথে? ও জানতে পেরেছে কে খুনি?

প্রতিবারেব মতো এবারও আমার তর সইল না। বাগ অভিমান ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললাম, —নীল, প্লিজ, লুকোস না। তুই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিস, কে খুনি? বল মাইরি?

—বলব।

—সময এলে, তাই তো?

—হ্যাঁ বৎস।

—এখন কোথায় যাচ্ছিস?

—আজ বিকেলে তুই যখন উদ্দালকের সিগারেট খাওয়া দেখে আশ্চর্য হয়েছিলি, আমিও তখন সামান্য একটু দ্বিধায় পড়েছিলাম। তবে সেটা সাময়িক। কারণ উদ্দালক খুন করেনি। তোকে আর একটা চমক দেব, চল্।

ও আব একবাব ঘড়িব দেখল,—নাউ ইট ইজ দ্য বাইট টাইম। এর পরে বা আগে গেলে ভদ্রলোককে পাওযাই যায না। এই নিয়ে তিন দিন গেলাম। আজ একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসেছি। উঃ, যা বিজি।

—এটাও তোব আর একটা সাসপেন্স?

—না। যাচ্ছি ডাক্তার অবিন্দম বাসুর চেম্বারে। ওনার চেম্বারটা আমহার্স্ট স্ট্রিট আর হ্যারিসন বোডের ক্রসিং-এ। এই তো এসে গেছি। অ্যান্ড ইন রাইট টাইম।

বলতে বলতে গাড়িটা থামল ডাক্তার বাসুব চেম্বাবের সামনেই। বেশ সাজানো আর বড়-সড় চেম্বার। দু একজন বোগী তখনও বসে ছিলেন। আমাদের দেখে ডাক্তার হেসে ফেললেন। একবার ঘড়ি দেখে বললেন,—ঘড়ির কাঁটাকেও হার মানিয়ে দিলেন মশাই? কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটা?

নীল হেসে বলল,—গাড়িটা তেমন কোথাও আটকায় নি, তাই সময়ে আসা গেল।

—বাঙালির ছেলেদের এত পাংচুয়ালিটি আগে দেখিনি মশাই। বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

—হ্যাঁ, এই বসি। কিন্তু এনারা?

—সব হয়ে গেছে। ওষুধ নিয়েই ওনারা চলে যাবেন। চলুন, পাশেব ঘরে যাওয়া যাক। কি খাবেন? চা না কফি?

—শীতকাল,, কফি হলে মন্দ হোত না।

—ও.কে., আমি ব্যবস্থা করে আসছি। তবে খুব একটা সুস্বাদু হবে না, আগেই বলে রাখছি।

—আমার সব কিছু অভ্যেস আছে। আপনি বলে আসুন। আমরা বরং পাশের ঘরে বসছি।

পাশের ঘরটায় গিয়ে বসলাম। নীলের চলাফেরা দেখে মনে হল এর আগে ও এখানে এসেছে। ঘরটা যেন ওর চেনা।

এ ঘরটা অপেক্ষাকৃত ছোট ধরনের। রুগীদের বিশেষ ধরনের পরীক্ষার জন্যে যেমন অ্যাটাচড্ ছোট চেম্বার থাকে, সে রকমই। ছোট আকারের চেয়ার পাতা রয়েছে। আর একটা লম্বা বেড। দেওয়ালে দেজ মেডিকেলের বড় রেডক্রস মার্কা অল-মাষ্থ ক্যালেন্ডার ঝুলছে।

ক্যালেন্ডারটার উপর কোন বিশেষত্ব ছিল না। তবু একটা বিশেষ চিহ্ন আমাকে আকৃষ্ট করল। একটা মাসের একটা তারিখের গায়ে লাল কালিতে গোল মার্ক দেওয়া রয়েছে। কেন, এই কথাটা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ঐ দিনটাই ছিল পাপড়ির বিয়ের দিন। মনে মনে একটা 'আশ্চর্য' শব্দ ব্যবহার না করে থাকতে পারলাম না। নীলের দিকে তাকতেই দেখি, ও মিটমিট করে হাসছে। ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করতে যাব হঠাৎ পর্দা ঠেলে ডাক্তার এসে ঘরে ঢুকলেন।

আমরা দুজনে দুটো চেয়ারে বসেছিলাম। কম্পাউন্ডারকে দিয়ে আর একটা চেয়ার আনিয়ে উনি আমাদের সামনে বসতে বসতে বললেন,—এবার বলুন কি আপনার বক্তব্য? বলেই পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন।

বিকেলে যখন উদ্দালক সিগারেটের প্যাকেট বার করেছিল তখন আশ্চর্য হয়েছিলাম। এখন চমকে উঠলাম। নীল ঠিকই বলেছিল,—তোকে একটা চমক দোব।

এটা চমকই। কেবল প্যাকেট দেখে না। প্যাকেট খুলতেই দেখলাম রাংতাটা ঠিক সেই রকমই। ফেলে দেওয়া হয়নি। নিজে একটা সিগারেট নিয়ে প্যাকেটটা আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। আমাদের দুজনের কিন্তু কেউই প্যাকেটটা ছুঁলাম না। এ একটা ডেঞ্জারাস লোক, এসব ভেবে আমি সিগারেট নিলাম না। নীল কেন নিল না জানি না।

কথা আরম্ভ করল নীলই,—ডাক্তার বাসু, বুঝতেই পারছেন বিশেষ প্রয়োজন না হলে এভাবে আপনাকে ডিসটার্ব করতাম না। একান্ত বাধ্য হয়েই।

—না না। সে কি কথা! আমি নিজেই তো আপনাদের সঙ্গে আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি। তা ছাড়া ক্ষমা আমারই চাওয়ার কথা। তিন দিন আপনাকে সময় দিতে পারি নি। যা বিচ্ছিরি আমাদের প্রফেশান। সামাজিকতার ব্যাপার স্যাপার সব বিসর্জন দিতে হয়েছে। নেহাৎ বাবা ডাক্তাব ছিলেন তা না হলে এই বৃত্তি আমার খুব একটা মনঃপুত ছিল না। সমাজের মধ্যে থেকেও এক অসামাজিক জীব হয়ে রয়েছি।

—অসামাজিক বলছেন কেন? নীল যেন ভদ্রতা করল, আপনারা না থাকলে সমাজটাই তো লোপাট হয়ে যেতো। সভ্যতা থেমে যেত, সংসারে যদি চিকিৎসক না থাকতো।

বিনয়ে গলে গিয়ে ডাক্তার বললেন,—ও কথা থাক। আপনার আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে, আমি বুঝতে পারছি। বলুন আপনার কি প্রশ্ন?

ইতিমধ্যে চাওয়ালা ছোঁড়াটা তিন কাপ কফি দিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিতে দিতে নীল বলল, —একান্ত আপত্তি না থাকলে কয়েকটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চাই।

ডাক্তার সোজাসুজি নীলের দিকে তাকিয়ে বললেন,—নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং গোপনীয় না হলে নিশ্চয়ই উত্তর দোব।

—আপনি তো ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন, তাই না?

—হ্যাঁ, লন্ডনেই দয়মন্তীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

—আপনার স্ত্রী বোধ হয় অবাঙালি ছিলেন?

—কি করে বুঝলেন?

—দয়মন্তী নামটা সাধারণত বাঙালি মেয়েদের হয় না।

—ঠিকই ধরেছেন। ও ইউ পি.-র মেয়ে।

—উনিও কি ডাক্তার?

—মস্ত বড় ভুল সেখানেই হয়েছিল। সেম প্রফেশনের কাউকে বিয়ে করা বোধ হয় আমার উচিত হয় নি। কয়েকটা ইগো আর পারসোন্যালিটির ক্ল্যাশ শুরু হয়ে গেল। বিয়ের পরই। শেষকালে অশান্তিটা এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো, তখন বাধ্য হয়েই

—আপনাদের বিবাহবিচ্ছেদ কতদিন হয়েছে?

—বছর দুয়েক।

—ছেলে মেয়ে?

—এক মেয়ে। সে তার মায়ের কাছেই থাকে।

—তাঁরা কি বর্তমানে কলকাতায় আছেন?

—না। বিবাহবিচ্ছেদের পর দময়ন্তী মেয়েকে নিয়ে দেশে ফিরে গেছে।

—দয়মন্তী ছাড়া আপনার জীবনে আর কোন মহিলা এসেছিলেন কি?

—না।

—ভাল করে ভেবে উত্তর দিন। সামান্য দুর্বলতা?

—মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন, বুঝতে পারছি না।

—বেশ, আমি বুঝিয়ে বলছি।

এই বলে নীল সেদিন অতনুবাবু ওনার সম্বন্ধে যা যা বলেছিলেন, সবকিছু বলে গেল। তারপর বলল,—এইবার বুঝতে পারছেন কেন এই সব প্রশ্ন তুলে আপনাকে উত্ত্যক্ত করছি?

ডাক্তার থুতনির উপর দুটো হাত রেখে গভীর মনোযোগ দিয়ে নীলের কথাগুলো শুনছিলেন। ওর কথা শেষ হতেই ভেবেছিলাম উনি হয়তো প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়বেন। কিন্তু আমার ধারণা পালটে দিয়ে অদ্ভুত ধরনের একটা হালকা শব্দহীন হাসি হাসতে হাসতে বললেন,—লোকটা এতটা শয়তান, তা আগে ভাবতে পারিনি। মানুষ যে স্বার্থের জন্যে কোথায় নামতে পারে, অতনু লাহাকে না দেখলে বোঝা যায় না। শেষে আমাকেই খুনি করে তুলতে একটুকু বাধল না। আশ্চর্য!

—পাপড়িদেবীর সঙ্গে আপনার এই ধরনের কোন কথা হয়নি?

—মিস লাহার সঙ্গে আমার কোনদিনও এ ধরনের কোন সম্পর্ক ছিল না। আর আমি তো মাত্র কিছুদিন ওদের বাড়ি যাতায়াত করছি।

—কতদিন হবে?

—বছর দুয়েক।

—আপনার স্ত্রী সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদের আগে না পরে?

ডাক্তার চকিতে একবার নীলকে দেখে নিয়ে বললেন,—ঠিক মনে নেই!

—তা হলে আপনি বলতে চাইছেন আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পাপড়িদেবীর কোন কথাবার্তা কখনোই হয়নি?

—একমাত্র অসুখ বিসুখ ছাড়া কখনোই তেমন কিছু হয় নি।

—আপনার কি ধারণা আছে, কেন অতনুবাবু আপনার সম্বন্ধে এই ধরনের মিথ্যে গল্প বলতে পারেন?

—এখন মনে হচ্ছে, বোধহয় পারি। অনেক দিন আগে উনি আমার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। আমি সেটা ইগনোর করি। সেদিন উনি আমায় শাসিয়ে বলেছিলেন পরে নাকি আমি এর মজা টের পাব।

—প্রস্তাবটা কি?

—ডু ইউ নো দ্যাট হি ইজ মরফিন অ্যাডিক্টেড পার্সন?

ফস্ করে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—তার মানে?

—তার মানে, আজ বছর দুয়েক উনি মরফিনে আসক্ত। আর এটা নিশ্চয়ই জানেন, মরফিন অ্যাডিকশন একটা সর্বনাশ নেশা। একবার কোন লোক এর খপ্পরে পড়লে তার আর নিস্তার নেই। নেশাটা বেড়েই চলে নিতে নিতে। আর নেশার সময় অ্যামপুল না পেলে সে প্রায় পাগলের মতো হয়ে যায়। সে অবস্থাটা ওর এখনও আসেনি। তবে আসবে। আমার কথাটা কোন রাগ বা অন্য কিছু থেকে নয়। আর কিছুদিন পরই দেখতে পাবেন শরীরটা ক্রমশ ওর বেঁকে যাবে। শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে কাঁপতে থাকবে সময় মতো ওষুধ না পেলে।

কিন্তু নীল বেশ সহজভাবেই প্রশ্ন করল, তার জন্যে আপনাব ওপর ওঁর বিদ্বেষ কেন?

—কারণ আমি ওঁদের হাউস ফিজিসিয়ান হয়েও মবফিন পারমিট জোগাড় করে দিইনি, তাই।

—ঠিক বুঝলাম না।

—আগেই বলেছি, নেশাটা কমে না। দিন দিন বেড়ে যায়। সাবাদিনে তখন একটা দুটো অ্যামপুলে কোন কাজ হয় না। এত বেশি অ্যামপুল দরকার হয তখন এইসব নেশাড়ুদের ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। ডাক্তারদের ঘুষ দিয়ে বা নেশা ধরিয়ে তাদের নামে পারমিট যোগাড় করে এঁরা ওষুধ, আই মিন নেশার যোগাড় ঠিক রাখেন। আজকাল বেশ কড়াকড়ি হওয়ার জন্যে উইদাউট ডক্টরস প্রেসক্রিপশন কোন ওষুধ কোম্পানিই মরফিন বিক্রি করে না। অতনু লাহা এসেছিলেন আমার নামে পারমিট বার করে নিজের নেশাব বন্দোবস্ত করতে। আমি বাজি হই নি। প্রথমত, এটা আমার নীতি বিরুদ্ধ। দ্বিতীয়ত, আমি ওঁদেব পরিবারের ডাক্তার। ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করেই ওনাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার মনে হয় এই কারণেই উনি আমার উপর প্রতিশোধ তুলতে চান। তবে আমিও ডাক্তার অরিন্দম বাসু। দেখা যাক, অতনু লাহার দৌড় কতটা?

ভ্রূকুটি করে নীল ডাক্তাবের মুখের দিকে চেয়ে কথাগুলো শুনছিল। একটু পরে ও বলল—আর দুটো প্রশ্ন করেই আমরা উঠব। আচ্ছা, সত্যিই সেদিন আপনি বুঝতে পারেননি, পাপড়িদেবীর কিভাবে মৃত্যু হয়েছে।

—হ্যাঁ। পেরেছিলাম।

—বলেননি কেন?

—পুলিসকে আমি দূরে দূরে রাখতে চাই। অযথা কেসটার মধ্যে জড়িয়ে যাবার ইচ্ছে আমার এখনও নেই।

—কিন্তু ডাক্তার হিসাবে এটা আপনার জানানো উচিত ছিল।

—না জানিয়েও আপনারা আমায় ছাড়ছেন না। জানালে তো ফেঁসে যেতাম।

—দেবতনু লাহার স্ত্রী কি সত্যিই বদ্ধ পাগল হয়ে ও বাড়িতে আছেন?

ডাক্তার কয়েক মিনিট নীরবে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন,—হ্যাঁ, ভদ্রমহিলা সত্যিই পাগল।

—কতদিন ওঁর ওই পাগলামি?

—জানি না, তবে অনেক দিনের কেস, এই রকমই শুনেছি।

—শুনেছেন কেন? আপনি নিজে তাঁকে কোনদিন অ্যাটেন্ড করেননি?

—একবার। সেদিন বড় বাড়াবাড়ি করেছিলেন। তাই।

—ভদ্রমহিলা কার আন্ডারে আছেন, আপনি জানেন?

—আজ্ঞে না।

—আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় উনি কোনদিনও ভালো হবেন না?

—প্রথমত আমি সাইকিয়াট্রিস্ট নই। হলে বলতে পাবতাম। তবে মডার্ন ডাক্তারি শাস্ত্র অনেক ডেভেলাপড্। ঠিক মত ট্রিটমেন্ট হলে সেরে যেতেও পারেন।

—তার মানে ওঁর ঠিকমতো চিকিৎসা হয় না?

—কী করে বলব বলুন? উনি তো আমার পেশেন্ট নন। তবে মনে হয় ট্রিটমেন্ট হয় না।

—হুঁ। আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা, মালবিকাদেবী সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা আছে?

—মালবিকাদেবী? মানে অতনু লাহার স্ত্রী? উনি আর এক ম্যানিয়াগ্রস্ত। স্বামীকে কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। স্বামী সামনে থাকলে বেশ মুখরা এবং রগচটা। কিন্তু অন্য সময়ে গেলে আপনার সঙ্গে অতি ভদ্র ব্যবহার করবেন। আমার ধারণা, অতনুবাবুর কাছ থেকে উনি বোধ হয় কোন ব্যাপারে শকড্। বিশেষত ঐ রকম নেশাগ্রস্ত লোককে কোন্ স্ত্রী সহ্য করে বলুন?

—নেশা ছাড়া আর কিছু আঁচ করতে পারেন?

—এমন কিছু না। তবে সাইকোলজিক্যালি বলতে পারি, ইস্যু না হলে মেয়েরা তাঁদের স্বামী সম্বন্ধে বেশ কমপ্লেক্সে ভোগেন। সেই থেকেও এটা হতে পারে।

—অনেক ধন্যবাদ এই ইনফরমেশনের জন্য। আচ্ছা, আজ আমরা উঠি। বলেই নীল উঠে পড়ল।

গাড়ি যখন ল্যান্সডাউনে, নীলকে জিজ্ঞাসা করলাম,—ডাক্তারের সব কথা তুই বিশ্বাস করিস?

—কিছু কিছু করি।

—কিছু বলতে?

—অতনুবাবুর নেশার ব্যাপারটা ঠিক। মালবিকাদেবী বা দেবতনুবাবুর স্ত্রী সম্বন্ধে যা বললেন, সেটা পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে।

—অতনুবাবু যে অ্যাডিকটেড, এটা তুই জানতিস?

—চেহারা দেখলে কিছুটা আঁচ করা যায়। তবে পাপড়ির সঙ্গে ডাক্তারের কোনদিন কোন কথাবার্তা হয়নি, এটা ঠিক বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। কে জানে ডাক্তার ঠিক বলছেন, না অতনু লাহা ঠিক বলছেন? দেখা যাক। আমি নীল ব্যানার্জি। বেশি দিন মুখে কুলুপ এঁটে রাখতে দিচ্ছি না। আসল সত্যটা খুঁজে বার করবই।

—আমি হলে কিন্তু এখনই ডাক্তারকে অ্যারেস্ট করতাম।

—কোন্ গ্রাউন্ডে? ভুলে যাস না অজু, অর্থে এবং সামাজিক প্রতিপত্তিতে ডাক্তার অরিন্দম বাসু একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। তাঁর একটা অন্য স্টেটাস আছে। এ কি ঠেলাওয়ালা, না হকার? বিনা প্রমাণে ধরে ঢুকিয়ে দিলেই হল? প্রমাণ চাই, প্রমাণ। নিশ্চিত একটা প্রমাণ।

—কিন্তু স্পষ্টই তো বোঝা যাচ্ছে, এ ধরনের মার্ডার একমাত্র ওঁর পক্ষেই সম্ভব। সামান্য কারণে অতনুবাবু ডাক্তার ভদ্রলোকের ওপর একটা জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা বলবেন, আমার তাও বিশ্বাস হয় না।

—ওই যে বললাম, নিশ্চিত প্রমাণ। সেটা কি দিয়ে করবি? অতনুবাবুর ডাক্তারের ওপর রাগ আছে। আবার ডাক্তারও নিশ্চযই কোন কারণে অতনুবাবুকে সহ্য করতে পারেন না। হয়ত শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, পুরনো রাগের কারণে দুজনেই দুজনকে ফাঁসাতে চাইছেন। তবে হ্যাঁ, কথাটা উড়িয়ে দিচ্ছি না, এই অভিনব প্রক্রিয়ায় মার্ডার করাটা ডাক্তারের দিকেই আঙুল তুলে দেখিয়ে দিচ্ছে। এবং সেটাই সব থেকে বেশি সম্ভব। আর সিগারেটের প্যাকেটটা সেদিন সম্ভাব্য পরবর্তী খুনের উত্তেজনায় ডাক্তারের পক্ষে অজ্ঞাতসারে ফেলে আসাও বিচিত্র নয়। এবং বহু ক্ষেত্রে এই রকম ছোটোখাটো সূত্র থেকেই খুনিকে খুঁজে বার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই সব বালসুলভ প্রমাণ দিয়ে ডাক্তারকে অ্যারেস্ট করা যায় না। আরো নিশ্চিত কিছু চাই।

—কি সেটা?

—আসল সত্যের জটটা যেখানে পাকিয়েছে সেখানে ফিরে যেতে হবে।

—কিন্তু মনে আছে, তুই কথা দিয়েছিস এক সপ্তাহের মধ্যেই খুনিকে ধরবি। আমার মনে হয় খুনি কে, এটা বোধ হয় তুই ধরতে পেরেছিস?

—ধরতে পারিনি। তবে খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি। কিন্তু হোয়াট ইজ দ্য মোটিভ? অ্যান্ড হোয়াই?

—কিন্তু সময় মোটে এক সপ্তাহ।

—তুই তো জানিস, কথা দিলে কথা রাখার অভ্যেস আমার ছোটবেলা থেকেই আছে।

আমার বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামল। নেমে পড়লাম। মুখ বাড়িয়ে নীল বলল,—রেখাকে বলিস, একদম তোকে ঠাণ্ডা লাগতে দিইনি।

—তা বলব। কিন্তু তোর প্রেমিকাটি কে?

—তাও বলব। তবে সময়ে। কাল তৈরি থাকিস। যখন খুশি আসতে পারি।

—কিন্তু কলেজ?

—গুলি মেরে দে।

পরদিন বারোটা নাগাদ নীল ফোন করল,—এক্ষুণি চলে আয়। এক জায়গায় যেতে হবে। একটার মধ্যে আসবি কিন্তু।

একটা বাজার আগেই আমি পৌঁছে গেলাম। দেখি নীল তৈরি হয়েই বসে রয়েছে। কিন্তু গিয়েই আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। স্ট্রেইট লায়ন আসর জাঁকিয়ে বসে আছেন।

আমাকে দেখেই বলে উঠলেন,—মানিকজোড়ের মানিকটি ছিল, এবারে ন্যাজ হল যুক্ত।

চিমটি দিতে আমিও ছাড়লাম না,—আসলে কি জানেন, আমরা এখনও ব্যাঙাচিই রয়ে গেলাম। ন্যাজ খসে কোলা ব্যাঙ হতে অনেক সময় লাগবে।

—হেঃ হেঃ, ব্যাঙাচির ন্যাজ হওয়ার চেয়ে কোলা ব্যাঙ হওয়া অনেক ভাল।

—ঠিক বলেছেন, এক মাথা চুল থাকার চেয়ে টেকো হলে অনেক সুবিধে। চিরুনি কেনার পয়সা বাঁচে। নাপিতের খরচ লাগে না।

—ভাল হবে না, ভাল হবে না কিন্তু! নীল, দেখো তোমার বন্ধুই হোক, আর যাই হোক, পার্সোন্যাল অ্যাটাক করলে কিন্তু আমি লক-আপে ঢুকিয়ে দোব।

—এই জন্যেই তো চোর গুণ্ডা আর বদমাইশে দেশটা ছেয়ে গেল।

নীল এবাব দুজনকেই ধমক দিল,—মিস্টার সিন্‌হা, বয়সটা আপনার ওর থেকে অনেক বেশি। ছেলেমানুষের মতো ঝগড়া করছেন কেন? আর অজু, তুই কি ওঁর পেছনে না লেগে থাকতে পারিস না?

—প্রথম আক্রমণটা যিনি করেছেন, কথাগুলো তাঁকেই বল্ না।

—আমি তো আর তোমাকে টেকো বলতে যাই নি।

—আমার কি চালে খড় নেই যে টেকো বলবেন? তা হলে তো আপনাকে কানাও বলতে হয়।

—দ্যাখ, দ্যাখ নীল, বয়ঃজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্ভাষণের রীতি দেখ। ছোটলোক!

—ব্যস, ব্যস, খুব হয়েছে। হাত তুলে দুজনকে থামালো নীল,—এ বিষয়ে আর একটাও কথা নয়। নিন মিস্টার সিন্‌হা, চা খান।

দীনু চা নিয়ে এসেছিল। চা খেতে খেতে পরিস্থিতি একটু ঠাণ্ডা হলে নীল বলল,—সব কথা তা হলে মনে থাকবে তো মিস্টার সিন্‌হা?

—নিশ্চয়ই। তবে আমার মত যদি শোন তাহলে এক্ষুণি আমি ডাক্তারকে অ্যারেস্ট করি।

—তা হয় না মিস্টার সিন্‌হা। আর কটা দিন আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন। খুনি হাতে-নাতে ধরা পড়বে। আর তাকে ধরার দায়িত্বটা আপনারই থাকবে। দেখবেন, তখন আবার গণ্ডগোল করে বসবেন না।

—কি যে বল। এই লাইনে থাকতে থাকতে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললুম।

হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,—এ ক্ষেত্রে চুল না বলে টাক পাকানো বলাই ভাল।

—শা-ট্-আ-প—ঘরের মধ্যে যেন বোমা ফাটল। খানিকটা চা আমার সাদা আলোয়ানটায় চল্‌কে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এক্ষুণি এটা দুধ দিয়ে ধুয়ে না দিলে দাগ রয়ে যাবে। সিংহীমশাইয়ের গর্জন তখনও চলছে।

মাসিমার ঘরে মিনিট পনেরো কাটিয়ে যখন ভাবছি এবার গেলে হয়, ঠিক তখনি নীল এসে ঘরে ঢুকল। বলল,—নে, চল।

—গ্যাছে?

নীল হেসে ফেলল,—সত্যি, তুই পারিসও বটে। এখন দেড়টার মধ্যে পৌঁছতে পারলে হয়।

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন,—কোথায় যাবি রে তোরা?

নীল মায়ের কাছে গিয়ে জামার কলারটা পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে বলল,—অনিন্দিতা মিত্রের বাড়ি।

—সে আবার কেরে?

—নাঃ মা, তোমাকে দিয়ে আর চলে না। বড্ড সেকেলে রয়ে গেলে। অত বড় একজন ফিল্ম অ্যাকট্রেসের নাম শোন নি?

—ও, তাই বল। আমি ভাবলুম, তুই বুঝি প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিস।

—আজকালকার ছেলেমেয়েরা কিন্তু প্রাইম মিনিস্টারের চেয়ে ফিল্ম আর্টিস্টদের কদর দেয় বেশি মা।

—তা হবে। আমি তো আর আজকালকার মেয়ে নই। তা অনিন্দিতা এখনও অভিনয় করছে?

—এখনও প্রতি বছর বেস্ট সাইড অ্যাকট্রেসের পুরস্কার পাচ্ছেন।

—বরাবরই ভালো অভিনয় করে। তা তাড়াতাড়ি ফিরিস বাবা। খাওয়া-দাওয়া করে নিয়েছিস তো? অজু খেয়ে এসেছিস?

—হ্যাঁ মাসিমা।

বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দালকের দেওয়া কাগজটায় ও একবার চোখ বুলিয়ে নিল। জিজ্ঞেস করলাম, —কতদূর?

বলল,—বাঁশদ্রোণী। তাড়াতাড়ি যেতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেড়টায়।

নীরবে ও গাড়ি চালাচ্ছিল। ভরা শীতের রোদ টইম্বুর মিষ্টি দুপুর। বেশ লাগছিল। হঠাৎ কালকের নীলের অভিসারের কথা মনে পড়ে গেল। ব্যাপারটা না জানতে পারা পর্যন্ত মনের মধ্যে অস্বস্তি কাঁটা খচখচ করছে। বললাম,—বলবি না তো?

—প্রেমিকার নাম?

—হ্যাঁ।

—শ্রীমতী মালতি দাসী। বলেই ও হো হো করে হেসে উঠল।

—তুই একটা ছোটলোক। কাল থেকে আমাকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিস।

—তুই-ই বা কি করে ভাবলি, তুই জানবি না অথচ আমি প্রেম করব? তবে অভিনয় করছি। অনুরাগের। খুব একটা খারাপ পার্ট করছি না। নইলে কি আর পরপর তিনদিন ও আমার সঙ্গে ঘুরতে বের হয়? কাজটা খুব অন্যায় হচ্ছে জানি, কিন্তু এ ছাড়া আর আমার কোন উপায় ছিল না।

সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্য। আগাপাশতলা কিছুই বুঝতে পারছি না। দাবার চাল নীল কোন্‌দিকে চালছে, আমার অনুর্বর মাথায় তা ঢুকবে না, যতক্ষণ না ও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়। তবে কাল সন্ধে থেকে যে অভিমানের ঢেউটা আমার বুকের মধ্যে ফুঁসছিল সেটা নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন আমার মনটা শরতের আকাশ।

—তা ব্যাপারটা কি একটু বলবি তো? বিশ্বাস কর, কারো কাছে আমি এ সব ফাঁস করব না।

—প্রমিস?

—আচ্ছা, তুই কি মনে করিস তোর কাজে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হলে আমার আনন্দ হবে?

—তবে শোন। মালতিকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, এই মেয়েটাই রহস্যের চাবিকাঠি। ওর চোখমুখে অনেক গোপন কথা লুকিয়ে আছে। মেয়েটাকে মুঠোয় আনতে পারলে পাপড়ি রহস্যের অনেক কিছু জানতে পারা যাবে। কিন্তু কাজটা শক্ত। একটা মেয়ে, মনের কথা কার কাছে হুড়হুড় করে বলে ফেলে, জানিস?

—জানি। মনের মানুষের কাছে সে কোন কিছুই গোপন রাখতে পারে না।

—কারেক্ট। ওকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, মেয়েটা একটু লঘু ধরনের। হালকা চাপল্য ওর সর্বাঙ্গে জড়ানো। রঙিন হাতছানি উপেক্ষা করার মতো মানসিক দৃঢ়তা একদম নেই। এরও একটা কারণ আছে। পরে ভেবে দেখেছি।

ছোটবেলা থেকেই মালতি পরের বাড়ি মানুষ হয়েছে। মা-বাবা ছিল না। মামা-মামীর কাছে বড় অনাদরে উনিশ-কুড়ি বছব পর্যন্ত কাটিয়েছে। কোন রকমে একজন পাত্র যোগাড় করে ওঁরা মালতির বিয়ে দিয়ে দেন। কিন্তু মালতির তাকে পছন্দ হয়নি। ওর আগাগোড়া দুটো জিনিসের ওপর প্রচণ্ড লোভ ছিল। অধিকাংশ মেয়েরই তাই থাকে। খুব সুন্দর দেখতে বর। আর বরের বেশ টাকা থাকবে। কিন্তু যে ছেলেটার সঙ্গে বিয়ে হয়, তার এ সব কিছুই ছিল না। ছেলেটা না বলে লোকটা বলাই ভাল। ওর থেকে বয়েসে অনেক বড়। বয়েস নিয়ে মালতি মাথা ঘামাতো না। যেটা ঘামাতো সেটা তো আগেই বলেছি, টাকা আর রূপ। প্রায় পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ বছর বয়েসের কদাকার, লেদ মেশিনের মিস্তিরিকে মালতির কেন মনে ধরবে বল?

এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটেছিল। দারুণ হ্যান্ডসাম দেখতে একটা ছেলে, মালতি আমাকে ওর ছবি দেখিয়েছে, তার সঙ্গে ওর ভাব হয়েছিল।

আমি বাধা দিলাম,—বিয়ের আগে, না পরে?

—পরে। কিন্তু ধোপে টিকল না। ছেলেটা একটা ফেরেব্বাজ। ওরা যখন গোপনে পালাবার কথা প্রায় পাকা করে এনেছে, সেই সময় একদিন পুলিস এসে ছেলেটিকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায়। স্মাগলিং করার অপরাধে। ছেলেটা সম্ভবত ওকে খারাপ রাস্তায় নিয়ে সবার ধান্দায় ছিল।

এই সব নানান কারণে মালতি যখন বেশ অখুশি, ঠিক সেই সময়ে মেশিনে সামান্য হাত কেটে ধনুষ্টঙ্কারে মারা যায় ওর স্বামী। একদিকে বাঁচল, কিন্তু ঝামেলা হল অন্য দিকে। মামা-মামী আর জায়গা দিলেন না। এখন পেট চলে কি করে? এর বাড়ি, ওর বাড়ি বাসন মেজে, রান্না করে কোন রকমে চালাচ্ছিল। কিন্তু যুবতী বিধবা মেয়ে। মধু থাকলেই মৌমাছি আসবে। কিন্তু মৌমাছিদের কাউকেই ওর পছন্দ হচ্ছিল না। অধিকাংশই চা-অলা কিংবা মোটর ড্রাইভার। হঠাৎ যোগাযোগ হয়ে গেল লাহা বাড়ির সুন্দর ছেলে সুতনুর সঙ্গে।

আশ্চর্য হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম,—সুতনুর সঙ্গে মালতির কি ভাবে যোগাযোগ হতে পারে? সে একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

—বলছি। সে সময়ে লাহা বাড়িতে সারাদিন কাজের জন্যে একজন লোকের দরকার পড়েছিল। সুদাম ছাড়া আগে একজন বুড়ি ঝি ছিল। তা সে অক্ষম হয়ে পড়ায় ছুটি নিয়ে দেশে চলে যায়, কাজ ছেড়ে দিয়ে। তাই সুতনু একদিন কথায় কথায় ওদের অফিসের বেয়ারাকে একজন ঝি-এর কথা বলেছিল। সেই সূত্রে মালতি এসে যায়। বেয়ারা লোকটা মালতির দেশের লোক।

—এ তো রীতিমতো গল্প ফেঁদে বসলি রে?

—গল্প শোনালেও সত্যি। মালতি তো এসে হকচকিয়ে গেল। এত বড় বাড়ি। এত প্রাচুর্য। এত সুন্দর খাওয়া পরা। যে স্বপ্ন সে ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছে। কিন্তু এ সবই তো অন্যের। তোকে আমি আগেই বলেছি, মালতি চটুল স্বভাবের। আর সুন্দর ছেলের দিকে ওর ঝোঁক বরাবরের। ওর দৃষ্টি পড়ল সুতনুর ওপর। আড়ালে আবডালে ছলাকলা আর রসিকতা করতে ছাড়তো না সুতনুর সঙ্গে। আর সুতনুও,

—কিন্তু সুতনুর তো বিয়ে হয়ে গেছে?

—না, তখনও হয়নি। তবে সুতনুর আর্লি ম্যারেজের অন্যতম কারণ সেটাই। পাপড়ির নজরে পড়েছিল মালতির ছটফটানি। মেয়েদের চোখে এ সব এড়ায় না। বাবাকে গিয়ে সে সব কিছু জানায়। মালতিকে তাঁরা তাড়িয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তাতে হয়ত সুতনুর কাছে ছোট হয়ে যাবার ভয়ে রামতনুবাবু আর পাপড়ি দুজনে মিলে যুক্তি করে পাপড়ির সুন্দরী বন্ধু শর্মিষ্ঠার সঙ্গে বিয়ে লাগিয়ে

দিলেন। সুন্দবী শিক্ষিতা বৌ এসে তাব স্বামীব সব দুর্বলতা কেড়ে নিল মালতিব ওপব থেকে। এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল বিশেষত পাপড়িব জন্যেই। পাপড়িই প্রথম ওদেব দুজনকে এক ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে দেখে ফেলেছিল। তাই মালতিব একটা প্রচণ্ড চাপা বাগ জমে ছিল পাপড়িব ওপব।

—বুঝতে পাবছি, সেই কাবণেই পাপড়ি হত্যাব বিশেষ সক্রিয়া পার্ট প্লে কবেছিল মালতি।

—হুঁ। তাই। মেয়েদেব প্রতিহিংসা স্পৃহা বড ভযঙ্কব। তা সে যাই হোক, মালতি সুতনুকে হাবিযে বেশ কয়েকদিন একা একা কাটালো। হঠাৎ ওব জীবনে আবির্ভাব ঘটল আব এক পুরুষেব।

—সে কি বে? লোকটা কে?

—লোকটা একজন লোক। আব সেই লোকটাকেই এখন আমাদেব ধবতে হবে।

—তাব মানে, সেও এই খুনেব সঙ্গে জড়িত থাকতে পাবে বলে তোব সন্দেহ?

—পাবে, আবাব নাও হতে পাবে।

—এই তোব এক মহা বিদ্‌ঘুটে দোষ। কেবল হেঁযালি কবিস।

—বলতে পাবিস। তাবপব শোন, মালতিব চবিত্রেব দুর্বলতা আমাব প্রথম দিনই নজবে পড়েছিল। আব চোখেব দিকে তাকিযে ও যখন কথা বলছিল, কিছুতেই আব চোখ নামাতো না। অদ্ভুত এক কামনাব আবেদন থাকতে সেই চাহনিতে। বুঝেছিলাম, ওব দুর্বলতা এখানেই।

—আমাব সেটাই তুই কাজে লাগালি?

—পবপব পাঁচ ছ' দিন কাজেব অছিলায ওদেব বাড়ি গিযেছিলাম। আব বেশিব ভাগ সময়ে পাপড়িব ঘবে মালতিকে একা ডেকে নানান বকম প্রশ্ন কবতাম। উল্টো-পাল্টা। প্রশ্রয় দিতাম অকাবণে। এমন একটা ভাব দেখাতাম, যেন আমি ওব প্রেমে পড়ে গেছি। যদিও আব একজন পুরুষেব সঙ্গে সে সেই সময যুক্ত ছিল, তবু আমাব ছল প্রেমেব আবেদন ব্যর্থ হল না। কেন জানিস? কোন একটা ব্যাপাব নিয়ে দুজনেব মধ্যে তখন বোধ হয বিবাদ শুরু হযে গেছে। ওব কথাবার্তায় তাই বোঝা যাচ্ছিল।

—বিবাদ কি নিযে?

—পবে বলব।

—তাবপব?

—পাঁচ দিনেব দিন বুঝলাম, ও প্রায সাবাদিনই আমাব প্রতীক্ষায় থাকে। ওকে জানালাম, বোজ বোজ এভাবে এসে কথা বলা যায না। চল বাইবে কোথাও যাওযা যাক। সঙ্গে সঙ্গে সে বাজি হযে গেল। বোধ হয এটাই ও চাইছিল। তাব প্রমাণ তো কালই পেলি।

—কিন্তু কাজেব কিছু হল?

—আব এখন কিছু বলব না। সব শেষ দৃশ্যেব জন্যে তোলা থাক। মনে হয অনিন্দিতা দেবীব বাড়ি এসে গেছি।

গাড়ি থামিযে নীল চলতি একজনকে প্রশ্ন কবল,—অনিন্দিতাদেবীব বাড়ি কোন্‌টা?

লোকটা হাত দিযে সামনেই একটা ছোট্ট সুন্দব সাজানো গোছানো দোতলা বাড়ি দেখিয়ে দিল।

বেল বাজাতেই একজন ছোকবা চাকব বেবিযে এল। চাকবটাকে বোধ হয আগেই নির্দেশ দেওযা ছিল। কোলাপ্সিবল গেট খুলে আমাদেব ভিতবে নিযে গিযে বসাল।

বাইবে থেকে বাড়িটাকে যতটা সুন্দব লাগছিল, ভেতবটা তাব থেকেও অনেক মনোবম কবে সাজানো। খুব অল্প জাযগাব মধ্যে প্ল্যান কবে বাড়িটা তৈবি, দেখলেই বোঝা যায।

একটু পবেই দোতালা থেকে নেমে এলেন অনিন্দিতাদেবী। বোধ হয একটু আগেই উনি স্নান টান সেবেছেন। একটা হালকা পাবফিউম সমস্ত ঘবটাকে সুগন্ধে ডুবিযে দিল। উনি এসে নীলকে দেখে হাসতে হাসতে পাশেব সোফাটাতে বসলেন।

এত সামনেব থেকে এব আগে আব কোন অভিনেত্রীকে দেখিনি। সত্যি কথা বলতে কি, এই

বয়সেও কোন মহিলা এত সুন্দরী হতে পারেন আমার জানা ছিল না। প্রায় পঞ্চাশের কাছে ওঁর বয়স। চওড়া কমলা রঙ পাড়ের সাদা টাঙ্গাইল শাড়ি।

চোখ-নাক-মুখ, এই বয়সেও নিখুঁত আর কাটা কাটা। গায়ের রঙটা উজ্জ্বল গৌর। অনেকটা চাঁপা ফুলের মত। কেবল মাথার চুলে কয়েকটা সাদা রেখা এদিক সেদিক উঁকি দিচ্ছে।

উনিই প্রথম কথা বললেন। মনে হল, মিষ্টি সুরে বাঁধা একটা সেতার টুং-টাং আওয়াজ করে উঠল, —তুমি কিন্তু একটু দেরি করেছ নীলাঞ্জন।

—হ্যাঁ, একটু দেরি করে ফেলেছি। মিস্টার সিন্‌হা এসেই সব গণ্ডগোল করে দিলেন।

—এ ছেলেটি কে বাবা? একে তো—

—আমার বন্ধু এবং ভাইও বলতে পারেন। ও আমার সঙ্গে সব কাজেই থাকে।

মহিলা তেমনি মিষ্টি সুরে হা-হা করে হেসে উঠলেন,—ঠিক ডিটেকটিভ বইয়ে যেমন পড়ি। তোমার ওয়াটসন?

নীল বাধা দিল,—না, ঠিক তা নয়। ওর লেখাটেখার বাতিক আছে। তাই আমার সঙ্গে থেকে থেকে লেখার মশলা যোগাড় করছে।

ভদ্রমহিলা এবার আমার দিকে তাকালেন,—তুমি লেখো?

—একটু একটু।

—কি কি লিখেছো?

বললাম আমার বইগুলোর নাম। নামগুলো শুনেই উনি বললেন,—ওমা, তুমিই সেই অজেয় বসু? আরে, তোমার বই তো আমি কিনেছি। তুমি এতটুকু ছেলে! আমি তো ভাবলাম, বেশ বয়স্ক-টয়স্ক কেউ হবে। লেখো। তোমার হাত ভালো।

এমন সময় এক ট্রে ভর্তি স্ন্যাকস্ আর কফি এলো।

আমরা একটু ইতস্তত করলাম। নীল বলল,—এইমাত্র চা খেয়ে এসেছি। এখন না হলেও চলতো।

—বেশ তো, পরেও না হয় আবার হবে। তোমরা আমার ছেলের মতো। লজ্জা-টজ্জা কোর না। মেকানিক্যাল আর ফর্মাল হয়ো না বাবা। জানো তো আমার জগৎটা? কেবল ফর্মালিটিজ আর লোক দেখানো ভদ্রতার খোলস। সহজ সাধারণ মানুষগুলো এ জগতটায় এলেই কেমন যেন মুখোশ এঁটে নেয় মুখে। তখন আর তাদের চেনা যায় না। তোমরা এসেছ। খানিকটা সহজে হয়েই মিশতে দাও তোমাদের সঙ্গে।

নীল আর কিছু না বলেই ট্রেতে হাত চালিয়ে দিল। ইশারায় আমাকেও নিতে বলল। মিনিট খানেক পর অনিন্দিতা দেবীই বললেন,—বল নীলাঞ্জন, আমার কাছে তুমি কি জানতে এসেছ?

চানাচুর চিবোতে চিবোতে নীল বলল,—এর মধ্যে একদিন উদ্দালক আমার কাছে গিয়েছিল। অনেক কিছুই বলল। ও চায় পাপড়ির হত্যাকারী কে, আমি খুঁজে বের করি। অবশ্য ও না চাইলেও এটা আমার কর্তব্য। আমি করবই। উদ্দালকের কথাটা তুললাম এই কারণে, বর্তমানে ও খুব এলোমেলো আর অস্থির।

উদ্দালকের প্রসঙ্গে অনিন্দিতা দেবীর মুখের চেহারাটা ধীরে ধীরে কেমন যেন পালটে গেল। একটা করুণ বিষণ্নতা নিয়ে উনি মাথাটা নিচু করলেন। তারপর একটু পরে বললেন,—ছেলেটা আর মেয়েটা পরস্পরকে বড্ড ভালবাসত। বিশেষ করে মেয়েটা। তাই তো আমাকে শেষ পর্যন্ত মত দিতে হয়েছিল।

—উদ্দালক কি এর মধ্যে আপনার কাছে এসেছিল?

—নাহ্। আজকাল আর ও আমার কাছে আসে না। আমিও চাই না, ও আমার কাছে আসুক।

—কেন?

—ওর একটা আলাদা জগৎ তৈরি হয়েছে। সেখানে আমার পরিচয় দিতে ওর বাধবে। তাই আমার কাছে ওর না আসাই ভাল।

—কিন্তু, আজ যে ও বড় একা।

—আমি জানি। কিন্তু আমার কিছু করার নেই।

—আমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন, তবু বলছি, ও চায় এই জগৎটাকে দূরে সরিয়ে রেখে আপনি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ান।

উনি ক্ষণিক কি যেন ভাবলেন। তারপর বললে,—উদ্দালক আমাকে সে কথা বলেছিল। কিন্তু এসব কথা আমি বিশ্বাস করি না। আবেগ আর সাময়িক উত্তেজনায় মানুষ অনেক কিছু বলে। কিন্তু সেগুলোর স্থায়িত্ব বেশি দিনের না। সারাজীবন ধরে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। ঘা খেতে খেতে আমি বড় প্র্যাকটিক্যাল হয়ে গেছি নীলাঞ্জন।

—কিন্তু সব ছেলেই তো তার মাকে কাছে পেতে চায়। মা আর ছেলের সম্পর্কে স্বার্থপরতা বা বিশ্বাসঘাতকতা, এইসব প্রশ্ন কি ওঠে?

নীলের দিকে উনি সরাসরি তাকিয়ে বললেন,—পৃথিবীকে কতটুকু তুমি দেখেছো নীলাঞ্জন? আমার এখন বাহান্ন বছর বয়স। অন্তত তোমার থেকেও বেশ কিছুদিন আগে আমি পৃথিবীর পুরনো বাসিন্দা। অন্তত তোমার থেকে একটু বেশি আমি দেখেছি। আর অভিজ্ঞতা? এক জীবনে এত অভিজ্ঞতা তুমি কোথা থেকে পাবে নীলাঞ্জন? অনেক ঘাটের জল-খাওয়া মেয়ে আমি। স্বার্থপরতা আর বিশ্বাসঘাতকতা তোমার থেকেও আমার অনেক বেশি দেখা।

—তাই বলে মা আর ছেলের সম্পর্কেও?

ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটিয়ে অন্যমনস্কের সুরে বললেন,—বাবার রক্ত যে ছেলের গায়ে থাকে নীলাঞ্জন। সেটা অস্বীকার করা যায় না। তাই তো ছোটবেলা থেকেই উদ্দালককে আমি দূরে দূরে রেখেছি। কাছে থেকেও কাছে আসতে দিইনি। নেহাত পেটের ছেলে, তাই ত্যাগ করে যেতে পারি নি। লেখাপড়া শিখিয়েছি। বড় করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত সামর্থ্য তৈরি করে আস্তে আস্তে সরে গিয়েছি। এতে অন্যায় কোথায় বল?

—কিন্তু ও যে ওর মাকে কোনোদিন পেলো না। বাবাকেও না।

—পৃথিবীতে বাবা-মা হারা ছেলে অনেক আছে। ও তো তবু কোনদিন অভাব বোঝেনি। কিন্তু আর পাঁচটা ছেলের তাও জোটে না। সেদিক থেকে ও ভাগ্যবান।

অনিন্দিতা দেবীকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এই তো একটু আগেই কত মিষ্টি করে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ওঁকে তখন কত ঘরোয়া আর মমতাময়ী মনে হচ্ছিল। কিন্তু ছেলের প্রসঙ্গ আসতেই কেমন যেন কঠোর হয়ে উঠলেন। এক অনমনীয় জেদের প্রভাবে মুখের শিরাগুলো কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু কেন? এ কি বিজাতীয় বিদ্বেষ? তাও অন্য কেউ না। নিজের সন্তান। এ হয়? এমন হতে পারে আমার ধারণায় ছিল না। সত্যিই পৃথিবীতে যে কত মানুষ রয়েছে। কত যে তাদের চরিত্রের বিচিত্র গতিবিধি। তবে পৃথিবীতে কোন কিছুই কারণ ব্যাতিরেকে ঘটে না। সবের পিছনেই একটা অনিবার্য কারণ থাকে। ছেলের প্রতি এই যে জমে থাকা এত বিদ্বেষ, নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন কারণ আছে। অতীতের কোন ঘটনার জেরও হতে পারে। কিন্তু সেটা কি?

হঠাৎ নীলকে প্রশ্ন করতে শুনলাম,—সুরঞ্জন মিত্র কি বেঁচে আছেন?

—জানি না। কিন্তু তুমি কোথা থেকে এ নাম শুনলে?

—উদ্দালকই বলেছে। কিছু মনে করবেন না, আমি কোন খারাপ ইঙ্গিত নিয়ে প্রশ্ন করছি না। সুরঞ্জন মিত্রই তো উদ্দালকের বাবা?

—কোনো সন্দেহ নেই তাতে। ধর্ম সাক্ষী করে সুরঞ্জন আমাকে বিয়ে করেছিল। উদ্দালকের জন্মে কোন পাপ নেই।

নীল মাথা নিচু করে বলল,—আমি সে কথা বলি নি। আমি কেবল সত্যটুকু জানতে চেয়েছি। কিন্তু ভদ্রলোক কোথায় গেলেন, তাঁর কোন খবর আপনি রাখেন নি কেন, এগুলো যে আজ উদ্দালকের জীবনে অনেক বড় প্রশ্ন। জানি, এ সব আপনার ব্যক্তিগত কাহিনী। বলতে পারেন, একান্ত গোপনীয়।

আমি একজন বাইরের ছেলে। আমার কাছে আপনার এসব প্রকাশ করার ন্যায় সঙ্গত আপত্তি থাকতে পারে। তবু পাপড়ি নামের একটা নিষ্পাপ মেয়ে খুন হয়েছে, এটা মনে রাখবেন। একটি সহজ-সরল ছেলের জীবন নষ্ট হতে বসেছে। এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, একটি ছেলের মরুভূমির মতো রুক্ষ জীবনে যে মেয়েটি একটু শান্তির ছোট্ট ফুল ফোটাতে চেয়েছিল, সেই মেয়েটিকে যে খুন করেছে, তার শাস্তি হওয়া উচিত।

—আমি তো তা অস্বীকার করছি না। পাপড়ি বড় ভালো মেয়ে ছিল। তাই তো আমিও চেয়েছিলাম, উদ্দালকের জীবনে মেয়েটা আসুক। উদ্দালককে আমি যা দিতে পাবি নি, পাপড়ি তাই দিক। কিন্তু সব ওলটপালট হয়ে গেল। পাপড়ির হত্যাকারী ধরা পড়ুক, সে আমিও চাই। কিন্তু পাপড়ির হত্যাব সঙ্গে আমার বা সুরঞ্জনের জীবনের পুরনো কাহিনীর কি সম্পর্ক, তা আমি বুঝতে পারছি না। তুমি কি শেষে আমাকেই সন্দেহ করে বসলে?

—না। এই হত্যাকাণ্ডে আমি উদ্দালক আর আপনাকে সন্দেহ করিনি একবারও। তবে পাপড়ি হত্যা-রহস্যের সঙ্গে আপনারাও পরোক্ষে জড়িয়ে আছেন, সেটা তো অস্বীকার করতে পারেন না। একটা খুনকে কেন্দ্র করে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমাদেব একটু খুঁটিয়ে দেখতে হয়। কখনও কখনও ব্যক্তিজীবনেব অতীতকেও হাতড়াতে হয়। তাই একান্ত আপত্তি না থাকলে আপনি আমায় সব বলুন। আমায় বিশ্বাস করতে পারেন, বিশেষ প্রয়োজন না হলে এসব কথা বাইবেব কেউ জানবে না।

প্রায় মিনিট দুয়েক অনিন্দিতাদেবী কোন কথা বললেন না। এই দু মিনিট সময় বড় কম না। মনে হচ্ছে যেন একটা যুগ। আর সেই অন্য এক যুগের ওপার থেকে ধীরে ধীবে কথা শুরু করলেন অনিন্দিতাদেবী,—তোমাকে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন প্রশ্ন আসছে না। বাইরের লোক জানলেও আমার কিছু এসে যায় না। কারণ আমি আজ তোমাদের তথাকথিত সমাজের বাইবের লোক। এসব কথা কাউকে কোনদিন বলিনি, বলার প্রয়োজন মনে করিনি বলে। আর সুরঞ্জনকে খুঁজিনি। খুঁজে লোকটাকে মূল্যবান করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। এখন ওর নামটা মুখে আনতেও আমার ঘেন্না করে। যৌবনের অনেক নোংরা ইতিহাস আমার বুকে জমে আছে। কিন্তু নোংরামিব এক পুকুর কলঙ্কে আমায় ডুবিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সুরঞ্জন মিত্র নামের একজন ডিবচ্।

লোকটা একটা বেইমান। আসলে কি বললে লোকটার সত্যিকার পরিচয় দেওয়া যায়, তা এখনও অভিধানে খুঁজে পাইনি।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য থামলেন অনিন্দিতাদেবী। বোধ হয় অতীতটাকে খুঁজে বার করতে চাইছেন। তারপর আবার বলতে আরম্ভ করলেন,—অথচ একদিন মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলাম সুরঞ্জনকে। ও বললে সে সময় আমি ওর জন্যে মরতেও পারতাম। আজ ভাবলে মনে হয়, কি বোকাই না তখন ছিলাম। আসলে মানুষ না ঠকলে বোধ হয় মানুষকে চিনতে পারে না।

গরিব বাবার তিন মেয়ে আমরা। আমিই বড়। অনিন্দিতা আমার আসল নাম নয়। ওটা সুরঞ্জনেরই দেওয়া নাম। আগে আমার নাম ছিল শিখা। আগুনের শিখার মত ছিল আমার রূপ। যে একবার তখন আমায় দেখত, সেই আমার রূপে মুগ্ধ হত। এ নিয়ে যে আমারও কিছু গর্ব ছিল না, তা নয়। লোকের মুখে শুনতে শুনতে আমার মনেও কেমন যেন একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল, বিয়ের জন্যে আমার কোনদিন ভাবতে হবে না।

কিন্তু কথায় বলে, অতি বড় সুন্দরী, না পায় বর। কে জানতো আমার অবস্থা তেমনিই দাঁড়াবে? তেইশ-চব্বিশ বছর পর্যন্ত দেখাদেখিই হল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। আমার তখনকার ছেলেমানুষি গর্বিত মনে একবারও মনে হয়নি, মেয়েদের বিয়ে হতে গেলে দুটো জিনিস বড় দরকার এই দেশে। একটা রূপ, আর একটা অর্থ। রূপটা আমার ছিল। টেস্টে পাস করে যেতাম। আটকাতো ফাইন্যালে। আমার বাবা সামান্য অফিসের সামান্যতম কেরানি ছিলেন। যা মাইনে পেতেন, কোন রকমে তিন মেয়ে এক ছেলে আর আমাদের রুগ্ণা মাকে সারা মাস চালিয়ে অবশিষ্ট থাকত মোটা

ধার। ধারটা দিনে দিনে বেড়েই চলছিল। এই অবস্থায় মেয়ের বিয়েতে খরচ করার মত টাকা কোথায়?

বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের সামান্য কিছু টাকা জমেছিল। তখনকার দিনের প্রভিডেন্ট ফান্ড আজকের মত নয়। এখন যেমন তোলাতুলির অনেক ঝামেলা, তখন তা ছিল না। চাইলেই ফেরত পাওয়া যেত। আর সেই টাকা দিয়েই মায়ের শুশ্রূষার-কাজ চলছিল। কিন্তু ব্যাঙের আধুলি শেষ হতে আর ক'দিনই বা লাগে? শেষে মাইনের টাকায় হাত পড়ল। এমন অবস্থায় এল, যখন ধার পাওয়া যায় না বাইরে কোথাও। কোন রকমে দশ দিন চলার পর অচল অবস্থা।

বিয়ের ভাবনাটা প্রায় চলেই গিয়েছিল। রূপের থেকে পাত্রপক্ষ টাকার বায়না ধরতো বেশি। রূপটা নাকি দু-দিনের। টাকাটাই সব। আগে তবু মাঝে মাঝে বিয়ের কথাবার্তা হোত। দেখাদেখি হোত। শেষের দিকে ওসব বিলাসিতা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত বাবা মারা গেলেন। স্ট্রোক। আমাদের কিছুই করার ছিল না। পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া।

হঠাৎ একদিন একটা সুযোগ এল কিছু টাকা রোজগারের। পাশের বাড়ির একটি ছেলে, ছেলেটা বোধ হয় মনে মনে আমাকে পছন্দ করতো। নামটা আজ ভুলে গেছি। আমার মায়ের কাছে গিয়ে বলেছিল ইদানীং মেয়েরা হামেশাই থিয়েটারে নামছে। মেয়েকে থিয়েটারে নামালে সংসারের সুরাহা হবে। মা প্রথমে অত কষ্টের মধ্যেও আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু আমি শুনিনি। পেট বড় শক্ত ঠাঁই। মান-ইজ্জত তখন মনে থাকে না। নাম লেখালাম স্টেজের খাতায়।

সেই শুরু। কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে চলছিল। ইচ্ছে ছিল পরের বোন দুটোকেও ঐ লাইনে নামিয়ে দেব। কিন্তু কোথা থেকে এসে জুটল সুরঞ্জন মিত্র। আমার পার্ট-টার্ট দেখে গ্রীনরুমে এসে খুব বাহবা টাহবা দিয়ে চলে গেল। তারপর সাত দিন কাটেনি, আবার এসে হাজির হল। একেবারে আমার বাড়িতে।

সুরঞ্জনকে আমার ভাল লেগেছিল। দেখতে শুনতে বেশ। তার ওপর মিষ্টি অমায়িক ব্যবহার। আসা যাওয়াটা বেড়ে গিয়েছিল। স্টেজ থাকলে অভিনয়ের শেষে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিত। নইলে সারাক্ষণই আমাদের বাড়িতে আড্ডা দিত। শেষকালে এমন হল ও যেন ঘরেরই ছেলে। যখন খুশি আসতো, যখন খুশি চলে যেতো। আর দু'হাতে টাকাও খরচ করতো। প্রথম প্রথম আমার আপত্তি ছিল। শেষে একদিন মায়ের সামনেই আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাবটা জানালো। মা তো এক কথাতেই রাজি। এমন সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে। তার ওপর পয়সাকড়িও আছে। যেচে এসে নিখরচায় বিয়ে করতে চায়। কোন্ মা রাজি না হবেন? তা ছাড়া আমারও বয়স বেড়ে যাচ্ছে। তখনও আইবুড়ো দু'বোন, এক নাবালক ভাই। সুরঞ্জনের দৌলতে আমার ভাই আবার লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছিল।

এই সময় নীল একবার কথা বলল,—সুরঞ্জনবাবুকে বিয়ে করতে আপনার আপত্তি ছিল না তো?

—না নীলাঞ্জন, বরং মনে মনে আমি ওকে ভালোই বেসেছিলাম। আর ওর মধ্যে কোন ছলচাতুরির কিছু দেখি নি।

—উনি থাকতেন কোথায় বা কি কাজ করতেন কিছু জেনেছিলেন?

—হ্যাঁ, জেনেছিলাম। পাট না কিসের ব্যবসা ছিল। বাড়িঘর কিছু ছিল না। সংসারে ও একা। থাকতো একটা মেসে।

—তারপর কি হল বলুন?

—বিয়েতে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু স্টেজ নিয়ে মুশকিল। বিয়ের পর আমি যদি স্টেজ নিয়ে পড়ে থাকি, তাহলে সুরঞ্জনের দেখাশুনো করব কখন? আবার স্টেজ যদি ছেড়ে দিই, তাহলে সংসারের কি হাল হবে? সমস্যার সমাধান করেছিল সুরঞ্জন নিজে। বলেছিল, তার দিক থেকে কোনো অসুবিধে হবে না। আমি স্টেজে যেমন যাচ্ছি তেমনি যাব।

একদিন বিয়ে হয়ে গেল। ধুমধাম করে না। অতি সাধারণভাবে। ধুমধাম করার ইচ্ছে সুরঞ্জনের ছিল না। আর আমাদের তো অবস্থাই ছিল না। স্টেজের পয়সা সংসারেই খরচ হয়ে যেতো।

ভেবেছিলাম জীবনটা বুঝি সহজ হয়ে এল। কিন্তু জীবনটা যে সহজ নয়, কিছুদিন পরেই তা

বুঝলাম। বিয়ের পর মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলাম সুরঞ্জনকে। বিয়ের আগে সুরঞ্জন যেমন দিনরাত বাড়িতে পড়ে থাকতো, বিয়ের পর হল উলটো। তখন সারাদিন বাইরে। অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরতো। জিজ্ঞাসা করলে বলতো ব্যবসা মন্দা চলছে। নানান জায়গায় খুব ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে। শুনে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে যেতো। নিজেকেই দোষী ভাবতাম। ভাবতাম আমার জন্যেই ওর এই অবস্থা হল। আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে ও নিজেকে জড়িয়ে নিজের দুর্ভাগ্য টেনে আনল।

হঠাৎ একদিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরল। মুখে মদের গন্ধ। চমকে উঠলাম, সুবঞ্জন মদ খেয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে বলল, তার ইচ্ছে সে খেয়েছে। নিজের পয়সায় সে যা খুশি তাই করতে পারে। চুপ করে গেলাম। বুঝতে চেষ্টা করলাম, ওর হাতে এখন পয়সাকড়ি নেই, তাই মদ খেয়ে ভুলতে চাইছে। চুপ করেই থাকতাম। কিন্তু থাকতে দিল না। ধীরে ধীরে ওর ভদ্রতার মুখোশটা কখন সরে গেছে টের পাইনি। একদিন এসে নেশা করার টাকা চাইল।

সুরঞ্জন জানে, আমাদের কি ভাবে দিন কাটে। এর মধ্যে ওকে কোথা থেকে টাকা দেব? মাস মাইনের স্টেজ। গোনা-গুনতি পয়সা। ওকে দেওয়া মানে, সংসার চালানোর টানাটানি। তবু দিতাম। একদিন আমাদের সংসাবের জন্যে অনেক খরচ করেছে তো।

কিন্তু চাওয়াটা থেমে রইল না। দিন দিন বেড়েই চলল। শেষকালে একদিন বাধ্য হয়েই বলতে হয়েছিল, টাকা আর নেই। শুরু হল অত্যাচার। মারধর। এমনি কবেই চলছিল। হঠাৎ একদিন সুরঞ্জন বাড়ি ফিবল না। আমি তো সারা রাত ভেবেই আকুল। গেল কোথায়? তার ওপর তখন আমার পেটে এসেছে উদ্দালক।

নীল জিজ্ঞাসা করল,—উদ্দালকের কথা সুরঞ্জন জানতেঁন?

—হ্যাঁ জানতো। বড় ভাবনায় পড়ে গেলাম। পরের দিন সকাল গেল, বিকেল গেল, সন্ধেও গেল। সারা রাতেও সুরঞ্জন ফিরল না। প্রায় এক মাস পর হঠাৎ এসে হাজির হল। ঝোড়ো উসকো-খুসকো চেহারা। এসেই বলেছিল—তার তখুনি দশ হাজার টাকা দরকার। যেমন করেই হোক দিতে হবে। কতটা অমানুষ হলে মানুষ ঐ অবস্থায় টাকা চাইতে পারে! তাও অতদিন পর ফিরে এসে! খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলেছিলাম, দশ-হাজার?। আমি কোথা থেকে পাব?

উত্তরে বলেছিল, না পাবার কিছু নেই। সব ব্যবস্থা সে করে এসেছে। আমাকে নাকি তখন থেকে রতন হালদারের কাছে থাকতে হবে। বিনিময়ে সে সুরঞ্জনকে দশ হাজার টাকা দেবে।

রতন হালদার কে, তা আমি জানতাম না। পরে জেনেছিলাম, রতন হালদার টায়ারের ব্যবসা করে। স্টেজে আমাকে দেখে নাকি আমার প্রেমে পড়ে গেছে। সে আমাকে পেতে চায়। আমার জন্যে যা খরচ, সব করতে রাজি।

প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে সুরঞ্জনকে বলেছিলাম,—তাই তুমি সেই লম্পটেব হাতে আমায় তুলে দিতে চাও?

তার উত্তরে, বুঝলে নীলাঞ্জন, সুরঞ্জন বলেছিলো, থিয়েটারের মেয়ে কতদিন আর এক বাবুর কাছে থাকবে? মাঝে মাঝে বাবু পালটাতে হয়।

লজ্জায় ঘেন্নায় আমার তখন মরে যেতে ইচ্ছে করছিলো। নেহাত পেটে তখন উদ্দালক। নইলে আজ তোমরা আমার সামনে বসে কথা বলতে পাবতে না।

সুরঞ্জনের প্রকৃতি বুঝতে তখন আমার আর বাকি ছিল না। কিছুদিন আমাকে ভোগ করতে চেয়েছিল। এমনিতে পেতো না। তাই লোক দেখানো একটা বিয়ের নাটক করেছিল। নেশা কেটে যেতে আমাব কাছ থেকে টাকাপয়সার অভাব দেখিয়ে সবে পড়তে চেয়েছিলো। কিন্তু সুরঞ্জন যেমন নাবীলোভী, তেমনি অর্থপিশাচ। তাই মোটা দাঁও দেখে রতন হালদারের হাতে আমাকে বিক্রি করে হাজার দশেক টাকা লুটবার মতলবে ছিল।

নীল এবার জিজ্ঞাসা করল,—আপনি সুবঞ্জনবাবুকে কিছু বললেন না?

—পায়ে ধরে কেঁদেছিলাম। বলেছিলাম, অভাবের জন্যেই আমাকে থিয়েটার করতে হয়। তার বেশি কিছু নয়। মনেপ্রাণে তোমাকে আমি ভালোবাসি। তুমি আমার স্বামী। তোমার ছেলে আমার গর্ভে। তোমার মুখ থেকে এসব কথা আমার শোনাও পাপ। আর আমি কোনদিন থিয়েটার করব না। চল, আমরা এখান থেকে কোথাও চলে যাই।

একটা চোর হয়ত কখনো-সখনো ধর্মের কথা শোনে, কিন্তু শয়তান ঈশ্বরেরর নামে চিরদিনই কালা। বিশ্রী হাসি হেসে সুরঞ্জন বলেছিল,—তুই যাবি না, তোর বাপ যাবে। টাকা আমি পেয়ে গেছি। বলেই পকেট থেকে একবাণ্ডিল নোট বার করে দেখিয়েছিল। তারপর বলেছিল, রতন হালদারের লোক এসে পরের দিনই আমাকে সেখান থেকে নিয়ে যাবে। না যদি যাই, তাহলে আমার বোন দুটোই রেহাই পাবে না। একদিন সকালে উঠে আর ওদেরও দেখতে পাবো না।

মরিয়া হয়ে বলেছিলাম,—কিন্তু তোমার ছেলে যে আমার পেটে রয়েছে? শয়তানটা তার উত্তরে বলেছিল, রতন হালদার সব জানে। ওর হাতে ডাক্তার আছে। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

এই পর্যন্ত বলে অনিন্দিতাদেবী থেমে গেলেন। অনেকক্ষণ আর কোন কথাই বলতে পারছিলেন না। আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, উনি কাঁদছেন। মুক্তোর মতো ফোঁটাগুলো টুপটুপ করে ঝরে পড়ছে।

অনেকক্ষণ পর নীল বলল,—এর পরের ইতিহাস আর আমার জানার ইচ্ছে নেই। প্রয়োজনও নেই। কিন্তু সুরঞ্জন মিত্র কি আর কোনদিন আপনার কাছে এসেছিল?

—না।

—আপনি তাকে খুঁজলেন না কেন?

—কি করব খুঁজে? আমার কাছে তার অনেক কিছু পাওয়ার ছিল, তা সে কোনদিন বোঝেনি। সে কেবল বুঝেছিল, তাকে আর আমার কিছু দেওয়ার নেই। এর পরে, কি লাভ তার খোঁজ করার?

—অন্তত একবারও মুখোমুখি দাঁড়াবার ইচ্ছেও কি নেই?

—না।

স্পষ্ট এবং দৃঢ় জবাব। তারপর বললেন,—রতন হালদার লোকটা আর যাই হোক, শয়তান নয়। ওই আমাকে ফিল্মে সুযোগ করে দিয়েছিল। আমার একান্ত আপত্তির জন্যে উদ্দালককে ও নষ্ট করেনি। বরং আমাকে ও মহারানির সুখে রক্ষিতা হিসেবে রেখে দিয়েছিল।

—এসব কথা থাক: সুরঞ্জনবাবুর কোন ফটো আপনার কাছে আছে?

—কি করবে? খুঁজে বার করবে তাকে?

স্মিত হেসে নীল বলেছি,—ক্ষতি কি খুঁজে পেলে? একটা খুনের তদন্ত করতে গিয়ে যদি কোন ছেলে তার হারিয়ে যাওয়া বাবা মাকে ফিরে পায়, তাহলে সেই মানসিক পরিতৃপ্তিটা উপরি পাওনা হবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনিন্দিতা দেবী বললেন,—তুমি তাকে চেনো না। তাই এমন কথা ভাবতে পারছ। আমি বুঝতে পারছি, উদ্দালক তোমাকে নাড়া দিয়েছে। ভালোই, খুঁজে দেখব। যদি পাই দেব।

—ধন্যবাদ। আজ তাহলে উঠি।

বেরিয়ে আসছিলাম। উনিও পেছনে পেছন আসছিলেন এগিয়ে দিতে। হঠাৎ নীল থেমে পড়ে বলল,—ছোট মুখে হয়তো বড় কথা হয়ে যাচ্ছে। তবুও আমি আপনার ছেলের মতো। সেই হিসেবেই বলছি, ঠিক খুনের তদন্ত নয়, উদ্দালকের জন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছিলাম। যদি পারেন, উদ্দালকের কথাটা একবার ভেবে দেখবেন। চিরদিন সে তার মাকে চেয়েছে। পায়নি। আজও চায়। পাচ্ছে না। বাবার অপরাধে ছেলে কেন শাস্তি পাবে? সুরঞ্জনবাবুর ভুলটা আপনিও করবেন? এক জীবনে এত অভিজ্ঞতা নিয়েও আবার ভুল করা?

নীল বেরিয়ে এল। আমিও। গাড়িতে উঠতে উঠতে দেখলাম, দরজার কপাটে মাথা ঠেকিয়ে অনিন্দিতা দেবী তখনও দাঁড়িয়ে।

দেখতে দেখতে চার দিন কেটে গেল। আগে প্রায় সাড়ে সাতটার আগে আমার ঘুম ভাঙতো না। ইদানীং খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। সেটা অবশ্য এই জটিল কেসটার জন্যে নয়। ভুবনবাবুর পড়শীদেব ঘুম ভাঙানো মোরগটাব জন্যে। ঘুম ভেঙ্গেই প্রতিদিন দেখি, মোরগটা যেন দিনে দিনে শশীকলার মত গতরে ফুলছে। আব ফুলবেই নাই বা কেন? এ তো আব কসাই-এব মোরগ না। কসাই-এব মোরগগুলো বোধ হয় বুঝতে পারে, তাদের অন্তিমকাল আসন্ন। তাই যতই তাকে দানা আব ধান খেতে দেওয়া হোক, মৃত্যুর পথ চেয়ে চেয়ে সে ক্রমশ কমতে থাকে। সেটা ভয়ে আর ভাবনাতেও হতে পাবে। তবে আমি একটা অন্য ব্যাখ্যা মনে মনে খুঁজে পেয়েছি। ওরা মৃত্যুব আগে শেষ প্রতিশোধ নিযে যায়। না ফুলে কসাইকে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত করাই বোধহয় ওদের শেষ বাসনা।

কিন্তু ভুবনবাবুর মোরগের কোন দুশ্চিন্তা নেই। তা ওর ঘাড় গলা ফোলানো উর্দ্ধমুখ কণ্ঠনিনাদ শুনলেই বোঝা যায়। আর দুশ্চিন্তা নেই বলেই যা খুশি খাচ্ছে, আব তাতেই মোটা হচ্ছে।

ভুবনবাবু যে কাজটা খুব ভাল কবছেন না, তা অচিরেই টের পাবেন বলেই আমাব বিশ্বাস। কাবণ ইতিমধ্যে পাড়ার কোন দস্যি ছেলেব নজরে ও যদি না পড়ে থাকে তাহলে নির্ঘাত নীলকে একদিন ডেকে নিয়ে এসে বগলদাবা করে নিউ আলিপুবেব বাড়িতে গিয়ে স্পেশাল রোস্ট বানাব। নীল এত জাঁহাবাজ খুনি, আসামি পাকড়াও কবে, আব সামান্য এক মোরগ পাকড়াও করতে পারবে না? আলবাত পারবে। এ বিশ্বাস আছে। আব নীল পাখিব মাংস রাঁধেও খুব ভাল।

শুয়ে শুয়ে এইসবই ভাবছিলাম। এর থেকে গভীর ভাবনা আমাব মাথায় তেমন খেলে না। ইদানীং কোন উপন্যাসের ভালো প্লটও পাচ্ছি না। যাই ভাবতে যাই, মনে হয় এ সব কিছুই লেখা হয়ে গেছে। আসলে বোধ হয় নতুন কোন কাহিনীব জন্ম হচ্ছে না। আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে মাত্র। আর আমরা সব লিখিয়েরা যে যার নিজের নিজেব ভাষা আর ভঙ্গীতে সেগুলো লিখে-টিখে কেতাদুরস্ত নকলনবিশ কলমবাজ হয়ে উঠছি। এ সেই ওল্ড ওয়াইন ইন নিউ বটল্ হয়ে যাচ্ছে। যাব ফলে অধিকাংশ গল্প উপন্যাসই পড়া শেষে মনে হয়, সব কথা বলা হয়ে গেছে। নতুন আর কিছুই নেই।

এব থেকে ভুবনবাবুব মোরগ নিয়ে চিন্তা করা অনেক ভাল এবং ভাবী খাদ্যলাভের আশায় মানসিক পুষ্টি আসে। নীলের কথামত আর মাত্র তিন দিন বাকি। তার পরেই ও বলেছে পাপড়ির হত্যাকারীকে ধরবে।

ওর দেওয়া সময়টাকে ধ্রুব সত্য মেনে নিলে আগামীকাল রবিবার থেকে নীল ফ্রী। এবং নিশ্চয়ই তারপর ও ব্যাঙ বাদুড় না হোক, নিদেনপক্ষে ভুবনবাবুর এই লোভনীয় মোরগটিকে গেলার প্রস্তাব ঠেলতে পারবে না। অর্থাৎ রবিবার সকালেই ও নীলের হাতে বন্দী হচ্ছে। রবিবারের কল্পিত ভোজটির আশায় আবার আমার জানলার কপাটে বসে থাকা ব্রাউন রঙের চিড়িয়াটিকে গভীর মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করতে থাকলাম। এমন সময় প্রায় মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসাব মত নীল 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে ঢুকল। এত ভোরে ওব আবির্ভাব দেখে আমি একটু বিস্মিত হলাম। তার মানে, ওর হাবভাবে প্রকাশ পাচ্ছে ঘটনা দ্রুত সমাপ্তিব পথে।

আমি বললাম—ব্যাপাব কিবে? এই সাতসকালে 'ইউরেকা', 'ইউরেকা' বলে চ্যাঁচাচ্ছিস কেন? আর্কিমিডিসের মত কোন কিছু আবিষ্কার করে এলি নাকি?

—ঠিক তাই রে। মনে মনে যে সন্দেহটা তিন-চাব দিন ধরে মাথার মধ্যে ঘুরছিল, কাল রাত্রেই তা সলভ্ হয়ে গেছে। এইবার,

—এইবার কি? হাতে-নাতে ধবা তো?

—কিন্তু ফাঁদ পাততে হবে। নইলে ঘুঘু ফুড়ুৎ।

বিছানা থেকে উঠে লেপটাকে বেশ করে গাযে জড়িয়ে জুত করে বসে বললাম,—তাহলে এবার গুছিয়ে বল, তিন-চাব দিনে কি কবলি?

নীল ক্ষেপে গেল,—দুর হতচ্ছাড়া, গুছিয়ে বলার সময় কি এখন আছে নাকি? এক্ষুণি বেরুতে হবে। অনেক জায়গায় যাবার আছে। ওঠ্ ওঠ।

বলেই ও আমার গা থেকে লেপ ছাড়াবার উপক্রম করল। হাঁই হাঁই করে উঠলাম আমি,—খবরদার ও কাজটা করিস না। এক্ষুণি ঠাণ্ডা লেগে যাবে। তার আগে ঐ চাদরটা দে।

ঘরের কোণে চেয়ারের ওপর থেকে চাদরটা আমার হাতে দিয়ে বলল,—দেরি করার আর এক মুহূর্ত সময় নেই।

—একটু চা-টা খাবি তো?

—তা খেতে পারি। কিন্তু বেশি দেরি করা যাবে না। ভোর না হতেই বেরিয়েছি তোর সঙ্গে খোসগল্প করার জন্যে নিশ্চয়ই নয়।

চাদর জড়িয়ে বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বললাম,—কাজের মানুষ তোরা। সময় কোথা সময় নষ্ট করার। সামান্য কিছু হিন্ট্‌স্‌ও দিবি না?

—নো, নাথিং। কোন কিছুই এখন জিজ্ঞাসা করবি না। কেবল দেখে যাবি, কি করছি, না করছি।

—মানে, লক্ষ্মণের ফলটি ধরে তোমার পিছন পিছন আমায় টো-টো করতে হবে।

—তোকে সঙ্গে রাখছি কেন জানিস, পাপড়ি হত্যা নিয়ে একটা দারুণ লেখা হয়ে যাবে। এই জন্যে তোর আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অবশ্য তুই আবার কি লিখবি কে জানে? লেখা শেষ করে আমায় দেখিয়ে নিস্।

—অহংকারটা বেড়েছে দেখছি। এই গর্বের জন্যেই তুই একদিন মরবি।

—আরে মরণ তো সবারই হবে। তা বলে গর্ব করার সুযোগটা নষ্ট করে কোন্ পাগলে? যা যা, আর মেলা বকিস না। আধ ঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে চলে আয়। আমি ততক্ষণ কাগজটায় চোখ বুলিয়ে নিই।

আধ ঘণ্টার আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পিছু ডাকল ভুবনবাবুর অবলা জীবটি। একটু দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমাকে দাঁড়াতে দেখে নীল বলল,—কিরে, দাঁড়ালি কেন?

মোরগের দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বললাম,—জিনিসটা কেমন বল তো?

—বেওয়ারিশ?

—না, বিরক্তিকর। চোর বা খুনি ধরায় তুই আজকাল বেশ পোক্ত হয়েছিস। ওটাকে ধরতে পারবি না?

পিঠে এক থাপ্পড় কষিয়ে বলল,—খুনি ধরা আর মোরগ ধরা এক হল?

বললাম—ওটাও একটা খুনি। রোজ আমার ভোরের ঘুমটাকে খুন করে।

—পোষা নাকি?

—হ্যাঁ! ভুবনবাবুর।

—ভুবনবাবুর বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। লোকটা বোধ হয় কোন অফিসের কেরানি তাই না?

—হ্যাঁ।

—হতেই হবে। খোঁজ নিয়ে দেখিস, আগে লোকটার নিশ্চয়ই রোজ অফিসে লেট হোত। ভোর ভোর ঘুম থেকে ওঠার জন্য মোরগটা পুষেছে।

ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে তাকালাম। ও আমাকে ঠেলে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গাড়ি স্টার্ট করে দিল।

গাড়িতে যেতে যেতে ভাবতে লাগালাম—এদিকটা তো একদম ভাবি নি। ভুবনবাবুকে সত্য কথাটা জিজ্ঞাসা করতে হবে। যদি তাই হয় তাহলে তো নীলকে অসাধারণ বলতে হবে।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে আটটায় শ্রীধর বাইলেনের একটু দূরে এসে গাড়িটা থামল। গলির থেকে বেশ একটু দূরে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে গাড়ির মধ্যেই বসে রইলাম। নীল আগেই বলে রেখেছিল,

যা করবে, একটাও প্রশ্ন না করে কেবল দেখে যেতে। কোন প্রশ্ন নয়। কোন কৌতূহল নয়।

এমন কি, গাড়ি থামতেই আমি যখন নামতে যাচ্ছিলাম, নীল কেবল বলল,---নামতে হবে না।

প্রশ্ন মনে এসেছিল, 'কেন'? কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল নিষেধাজ্ঞা। চুপ করে বসে রইলাম।

মিনিট পাঁচেক পর নীল আবার ঘড়ি দেখল, বলল, —দেরি করছে কেন? সাধারণত দেরি হয় না তো?

কে দেরি করছে, কার আসার কথা কোন কিছুই বুঝতে পারছি না। অন্ধকারে বোকার মতো চুপ করে বসে থাকলে যেমন হয়, আমার অবস্থা ঠিক তেমনি। কিছুই জানছি না, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। হঠাৎ নীল বলে উঠল, —যাক বেরিয়েছে, নে চল। তুই কিন্তু কোন কথা বলবি না।

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, স্যুট কোট টাই পরে সুতনু লাহা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে। হাতে একটা অ্যাটাচি। দেখলেই মনে হবে, অফিস যাচ্ছে।

আমি আর নীল আনমনে এগিয়ে চলেছি। যেন সুতনুকে আমরা কেউই দেখিনি। সামনাসামনি আসতে সুতনুই প্রথম আমাদের দেখল।

মৃদু হেসে কাছে এসে বলল,—আপনারা এদিকে এ সময়ে?

নীল বলল,—হ্যাঁ, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। বেরুচ্ছেন নাকি?

—অফিস যাচ্ছি। এখন রোজই এ সময় বের হই। গাড়িটা কয়েক দিন হল গ্যারাজে রয়েছে। নইলে সোওয়া ন'টা নাগাদ বের হলেই চলে।

আফসোসের সুরে নীল বলল,—ইস্, তাহলে তো এ সময়ে আসা উচিত হয়নি?

—না, না। ঠিক আছে, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। একদিন অফিসে একটু দেরি হলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। চলুন, ভেতরে গিয়ে বসি।

---বাড়ির মধ্যে যাবার দরকার নেই। চলুন, হাঁটতে হাঁটতে বলা যাবে।

তিনজনে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। বাস-স্ট্যান্ডে একটু দূরেই। বোধহয় উনি বাসেই যাবেন। চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি রকম বুঝছেন মিস্টার ব্যানার্জি?

—সেই জন্যেই তো সাত সকালে আপনার কাছে আসা।

—বেশ তো, বলুন, আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি?

—আমার জন্যে কিছু করতে হবে না, যা করবেন সব আপনাদের নিজেদের জন্যেই। তবে এই মুহূর্তে আপনার কাছে আসার আমার একটাই উদ্দেশ্য। কয়েকটা ছোটখাটো ইনফরমেশান আমার দরকার।

--কোথাও একটু বসলে হত না?

—কিছু দরকার নেই। দু' একটা প্রশ্ন। মালতি মেয়েটা কেমন?

প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে আমি স্পষ্ট দেখলাম, সুতনুবাবুর সুশ্রী মুখে কে-যেন কালি লেপে দিল। হঠাৎ হতচকিত এবং বিব্রত হয়ে পড়লে যেমন দেখায়। কিন্তু চতুর এবং বুদ্ধিমান সুতনু নিজেকে নিমেষে সামলে নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, —কেন বলুন তো, হঠাৎ এ সময়ে এই প্রশ্ন?

—কারণ আছে। বলছি। কিন্তু মেয়েটা কেমন?

--মানে, ইয়ে তেমন সুবিধের নয়।

—ওকে বিশ্বাস করা যায়?

—কি ব্যাপারে?

—তাহলে আপনাকে খুলেই বলি, আজ রাত্রে ও আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

একরাশ বিস্ময় নিয়ে সুতনু প্রশ্ন করল,—সে কি! কেন?

—ও নাকি জানে কে খুনি? সেই নামটা আমাকে আজ রাত্রেই জানাবে। আরও অনেক কিছু পারিবারিক কথা ও জানাতে চায়।

--ও কি করে জানল?

—ও দেখেছে খুনিকে খুন করার সময়।

—তাহলে এতদিন বলেনি কেন?

—পুলিসের ভয়ে।

—অথচ আপনাকে বলতে পারছে?

—আমি তো পুলিস নই।

—ও! তা রাত্রে কেন?

—হয়তো ওটাই ওর পক্ষে সুবিধে। কিন্তু আমি ভাবছি, অত রাত্রে একজন যুবতী মেয়ের কাছে আসা কি উচিত হবে?

নীল যেন বড্ড ভয় পেয়ে গেছে এই রকম ভাব করে বলতে থাকল, —বুঝতেই তো পারছেন ব্যাচিলার ছেলে। অজানা, প্রায় অচেনা একজন সোমত্ত মেয়ের কাছে রাত একটার সময় বাড়ির পেছনের বাগানে, মানে ঐ যে আপনার খিড়কির দরজাটা যেখানে রয়েছে, সেখানে আসাটা কি ঠিক হবে? আপনি কি বলেন? তার ওপর বলছেন, মেয়েটা ঠিক সুবিধের নয়।

কথাগুলো নীল বলে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু ওর স্থির দৃষ্টি আটকে ছিল সুতনুবাবুর মুখের ওপর। সুতনু সহসা কোন উত্তর দিতে পারছিল না। তারপর একসময় বল,—আমার তো মনে হয় না, এতটা রিস্ক নিয়ে এভাবে একটি নিম্ন রুচির মেয়ের সঙ্গে দেখা করা আপনার পক্ষে শোভন হবে। বরং আপনি কাল সকালের দিকে এসে ওকে আলাদা ডেকে প্রশ্ন করুন, তাতে অন্তত আপনার ওপর কোন কলঙ্ক-টলঙ্ক পড়বে না।

মাথা নেড়ে নীল বলল,— হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। বরং ফোনে ওকে জানিয়ে দিই যে আমি কাল সকালে আসছি। আচ্ছা, আজও তো বলে যাওয়া যায়।

—হ্যাঁ, তা যায়। কিন্তু আজ কি আর ওকে পাবেন?

—কেন, বাড়ি নেই?

—সকাল থেকে তো দেখছি না। আজকাল কোথায় যে কখন হুটহাট করে বেরিয়ে যায়। পাপড়ি মারা যাবার পর বাড়ির সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে। বাবাও কেমন হয়ে গেছেন। কোনদিকে নজর দেন না। আর আমিও কোনদিন বাড়ির কিছু দেখতে পারিনি। পাপড়ি ছিল, ওই সব দেখাশুনা করতো।

—কেন, আপনার স্ত্রী তো আছেন?

—ইদানীং শর্মিও বড্ড ভেঙে পড়েছে। আফটার অল পাপড়ি ওর ইনটিমেট ফ্রেন্ড ছিল তো। ঠিক আছে, এক কাজ করুন। আমি বরং মালতিকে বলে দোব কাল সকালে আপনি আসবেন। ও যেন সেই সময় দেখা করে।

—ওহ্, তাহলে তো খুবই ভালো হয়। কিন্তু দেখবেন কথটা যেন আর কেউ জানতে না পারে। ইভ্ন ইওর ওয়াইফ। তাহলে কিন্তু মালতির মুখ আর খোলানো যাবে না। এই ক'দিন অনেক চেষ্টা করে তবে ওকে মোটামুটি রাজি করিয়েছি।

—আপনার সঙ্গে এর মধ্যে মালতির দেখা হয়েছিল নাকি?

—হয়েছিল। প্রায়ই তো আমি ওকে একলা ঘরে ইন্টারোগেট করতাম।

—ও, আচ্ছা।

বাস স্ট্যান্ড এসে গিয়েছিল। দূরে একটা বাস আসতে দেখে সুতনুবাবু বলে উঠলেন,—আমার বাস এসে গেছে। তাহলে কাল সকালেই আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

—ঠিক আছে। মালতিকে বলতে ভুলবেন না কিন্তু। না হলে বেচারিকে এই শীতের মধ্যে রাত একটার সময়ে ঝোপে-ঝাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

—না না, এসব ব্যাপারে আমার ভুল হয় না। খুনি তাহলে খুব শীঘ্রই ধরা পড়ছে বলছেন?

ঘাড় নিচু করে হাত কচলাতে কচলাতে নীল বলল,—আশা তো করি।

—উইশ ইউ বেস্ট অব লাক, চলি।

সুতনু বাসে উঠে পড়তেই নীল বলে উঠল --তাড়াতাড়ি চল। আরেকজনের বেরুবার সময় হল। প্রশ্ন করা নিষেধ। অবাক হওয়া বারণ। এমন কি বিস্ময় প্রকাশ করাও চলবে না। বোবার মত ওর সঙ্গে চললাম।

কিন্তু মনে আমার অসংখ্য প্রশ্ন। নীল কি করতে চাইছে? এ কি সামান্য বোড়ের দান, না কিস্তি মাতের চাল? তবে কি সুতনুই খুনি। লোকলজ্জা এবং কলঙ্কের ভয়ে নীল একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা করবে কি করবে না, তার জন্য সে সুতনুর পরামর্শ নিতে এসেছে। এও আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে শুনে যেতে হল। বাহ্, কি গোয়েন্দার শাগরেদি করছি আমি। ঠিক আছে, যখন কথা দিয়েছি প্রশ্ন তুলব না। দেখি ওর খেলার ধরনটা।

আবার সেই গলির মোড়। সেই অপেক্ষা। সাড়ে নটা নাগাদ বাড়ি থেকে বের হলেন অতনু লাহা। মাত্র এই ক'দিনেই চেহারাটা একটু দুমড়েছে বলে মনে হল। একটা শিথিল শ্লথ ভঙ্গি। বোধহয় ভাইঝির মৃত্যুতে এই বিমর্ষতা। একটু অন্যমনস্কতা। কিন্তু ডাক্তারের কাছে এঁর সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম, তা যদি সত্য হয় তাহলে তো ভাবার কথা। নীলও নাকি জানে, ভদ্রলোক মরফিনে অ্যাডিকটেড। কিন্তু দেখলে তেমন কিছু মনে হয় না। রঙটা দাদার মত নয়। একটু মাজা মাজা। কিন্তু আজ যেন একটু বেশি কালচে ছাপ পড়েছে বলে মনে হল। অবশ্য এটা আমার সাইকোলজিক্যাল ইলিউশন হতে পারে। যেহেতু ওনার সম্বন্ধে ঐ সব কথা শুনেছিলাম, তাই হয়তো আজ মনে হচ্ছে মরফিনের অ্যাকশনে রঙটায় কালচে ছোপ ধরেছে। সেটা নাও হতে পারে। এত বড় ফ্যামিলির লোক হয়েও চেহারাটায় একটা বিষণ্ণতার ছায়া লুকিয়ে আছে। সেটা আমার প্রথম দিনই মনে হয়েছিল। বংশগত একটা আভিজাত্য থাকা সত্ত্বেও দুঃখী দুঃখী ভাবটা রয়ে গেছে। সেটার কারণটাও মোটামুটি বুঝতে পেরেছি। পারিবারিক জীবনে ভদ্রলোক সত্যিই হেল্পলেস। মানুষ সারাদিন অন্নের জন্যে বাইরে বাইরে ঘুরে এসে বাড়িতে অন্তত একটু সুখ আশা করে। এটুকু যে পায় সে বাইরের জগতের অনেক অপমান বা অবমাননা সহ্য করতে পারে। আর যে সেটুকুও পায় না, সে সত্যিই দুঃখী। সেদিক দিয়ে অতনুবাবু তো রীতিমত অসুখী। ওনাকে দেখে আমার খুব খারাপ লাগে। একমাত্র পাপড়ি যেদিন মারা গিয়েছিল সেদিনই ওকে খানিকটা উত্তেজিত হতে দেখেছিলাম। সেটা খুবই স্বাভাবিক। ভাইয়ের মেয়ে হলেও সে তো মেয়েরই মতো। ছোট থেকে তাকে বড় হতে দেখেছেন। তার আকস্মিক মৃত্যুতে নিশ্চয়ই মনে লাগবে। সেখানে উত্তেজিত হওয়া মোটেই বেমানান কিছু না। তারপর মাত্র একদিন ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন অত্যন্ত স্বাভাবিক আর করুণ মনে হয়েছিল ওনাকে। আমার মনের কোথায় যেন একটা নরম স্থান উনি দখল করে বসে আছেন। জামাকাপড়ের খুব এটা বাবুয়ানি নেই। সাধারণভাবে মালকোঁচা দিয়ে একটা ধুতি পরেছেন। পায়ে একটা বাটা কোম্পানির সাধারণ চটি। ফুল হাতা শার্টের ওপর কালো জহর কোট পরেছেন। ঠাণ্ডাটা বড় বেশি। তাই গলায় একটা মাফলার জড়িয়েছেন। মাফলারটা অবশ্য বেশ দামি, কিন্তু পুরনো। হাতে একটা বড় মাপের পোর্টফোলিও ব্যাগ।

কাছাকাছি আসতেই নীল এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়ালো। অন্যমনস্কের মতো মাথা নিচু করে আসছিলেন। আমাদের হঠাৎ ঐ ভাবে সামনে এসে দাঁড়াতেই একটু চমকে দু'পা পিছিয়ে গেলেন। চকিতে একটা অজানিত ভয় মুখের ওপর দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, —আরে গোয়েন্দাসাহেব যে? কি খবর?

নীলও ততোধিক বিনয় প্রকাশ করে বলল,—বেরুচ্ছিলেন নাকি?

—হ্যাঁ ভাই, একটু বেরুতে হচ্ছে। ধান্দায়।

—আজ কোন্ দিকে?

—কলকাতার বাইরে; বর্ধমান। কিছু একস্ট্রা অর্ডার এসেছিল। সাপ্লাইটা আজই করতে হবে।

—আপনার বিজনেসটা যেন কিসের?

—নানা রকমের। কোন ঠিক নেই। তবে মোটামুটি অর্ডার সাপ্লাইটাই মেইন।

মুখে একটা চুকচুক শব্দ করে নীল বলল,—তাহলে তো আপনাকে আটকানো যাচ্ছে না। অথচ

আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম।

—বেশ তো, বলুন না। দু'পাঁচ মিনিট দেরিতে কি এসে যায়। বলে উনি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন। চারমিনার। আমার দিকে এগিয়ে দিতে যথারীতি না বললাম।

নীল একটা তুলে নিয়ে বলল,—চা খাবেন নাকি?

—না, এইমাত্র তো খেয়ে এলাম। তা কি বলবেন বলুন?

—ব্যাপারটা বুঝলেন অতনুবাবু, বেশ গোপনীয়। আমি চাই না আর কেউ এসব জানুক।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমায় যা বলবেন আর কেউ তা জানবে না।

—আপনার বাড়ির ঐ কাজের মেয়েটা, কি যেন নাম?

—মালতি।

—হ্যাঁ, মালতি। মেয়েটা বোধ হয় খুব একটা ভাল নয়। তাই না?

—জঘন্য, জঘন্য, একেবারে নষ্ট মেয়েছেলে?

—তাই নাকি? নীল যেন আকাশ থেকে পড়ল।

—খবরদার, ওর পাল্লায় পড়বেন না, একেবারে উচ্ছন্নে যাবেন। মোস্ট্ ঢলানি মেয়ে।

—আমারও সেই রকম মনে হয়েছিল। আরো কি জানেন, মেয়েটার লাগানি-ভাঙানির একটা স্বভাব আছে।

—থাকবেই। ঝি ক্লাসের মেয়ে, ওদের আবার ভদ্রতা অভদ্রতা।

—ভাবিয়ে তুললেন তো মশাই।

—কেন, কেন? কি হয়েছে বলুন না। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—আজ রাত একটায় ও আমায় গোপনে দেখা করতে বলেছে।

—কি আস্পর্ধা! ভদ্রলোক যেন বোমাফাটার মতো ফেটে পড়লেন, আপনাকে গোপনে দেখা করতে বলেছে? কেন?

—ইদানীং আপনাদের সঙ্গে কি ওর কোন রকম বচসা-টচসার ব্যাপার ঘটেছে?

—ঝিয়ের সঙ্গে আবার বচসা করব কি?বলতে পারেন ধমক ধামক। তা যে রকম ঢলানি মেয়ে, ধমক তো খাবেই।

—আপনার সঙ্গে কিছু হয়নি?

—নাহ্। ও তো আমাদের ঝি নয়।

—বড় গোলমেলে ঠেকছে ব্যাপারটা।

—কেন, কেন? আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছে নাকি?

—ঠিক সে রকম খোলাখুলি কিছু বলেনি। তবে আজ রাত একটার সময় এই বাড়ির পিছনে যে বাগানটা আছে সেখানে ও আসতে বলেছে। এ বাড়ির ভেতরের অনেক গোপন খবর নাকি ও দিতে চায়। ওর ধারণা হয়েছে, সেই সব খবর জানতে পারলেই আমার পক্ষে পাপড়ির হত্যা রহস্য সমাধান করা সহজ হবে।

—এতদুর আস্পর্ধা মাগীর! বলেই থেমে গেলেন। বুঝতে পারলেন, 'মাগী' বলাটা বোধ হয় ঠিক হয় নি। সুর পাল্টে বললেন, ব্যানার্জি বাবু, গোয়েন্দাগিরিই করুন আর যাই করুন, ঢলানি মেয়েদের কাছে আপনারা শিশু। ওরা আপনাদের এক হাটে কিনবে, অন্য হাটে বেচবে। ওই সব গুল-তাপ্পি মেরে আপনাকে ফাঁসাতে চাইছে। দেখেছে আপনাকে অল্পবয়েসি লালটু মার্কা ছেলে, পয়সা-কড়িও আছে, টোপটা ফেলে দিয়েছে। খবরদার ও রাস্তায় পা দেবেন না। মেয়ে ভালো নয়। একেবারে শয়তানীর আড়কাঠি।

—তা হলে বলছেন দেখা করা উচিত হবে না?

– আলবাত নয়। দেখা করুন। অন্য সময়ে। রাত্রে কেন?

—কিন্তু এত বড় একটা সুযোগ কি হাতছাড়া করা ঠিক হবে?

—আরে মশাই, ও তো দু'দিনের ছুক্‌রি। ও কি জানে আমাদের ফ্যামিলির হিস্ট্রি? কি বলবে ও আপনাকে?

—কে খুন করেছে তা নাকি ও জানে।

—গুষ্টির মাথা জানে। জানলে এতদিন চুপ করে বসে থাকতো? দেখতেন এতদিনে কি রকম ব্ল্যাকমেল শুরু করে দিয়েছে।

খুব খাঁটি কথা শুনেছে, এইভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে নীল বলল, —কারেক্ট, এদিকটা তো আগে ভাবি নি। ঠিকই তো, তুই যদি জানবিই, তাহলে তো ব্ল্যাকমেলই কববি। নাহ্ মশাই, আপনি ভালোই বলেছেন, এভাবে রাত দুপুরে বাগানে দেখা করা উচিত হবে না। তার ওপর সাপ-খোপও থাকতে পারে।

—না, সাপখোপ নেই। তবে বিছে আছে অনেক।

—ওরে বাবা, বিছের ব্যাপারে আমার ভীষণ অ্যালার্জি। মিস্টার লাহা, দয়া করে আমার হয়ে একটা কাজ করবেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন।

—আপনি আজ ফিরছেন কখন?

—এই ধরুন, রাত ন'টা সাড়ে ন'টা।

পকেট থেকে একটি চিঠি বার করে অতনুবাবুর হাতে দিয়ে বললেন,—আমি ভেবেই এসেছিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা না হলে চিঠিটা কাউকে দিয়ে মালতির হাতে পাঠিয়ে দোব। দয়া করে যদি এটা ওর হাতে দিয়ে দেন।

চিঠিটা হাতে নিয়ে বললেন,—কি লেখা আছে এতে?

—ঐ আর কি। পড়ুন না।

চিঠিটা তাড়াতাড়ি করে খুলে উনি পড়লেন,—আজ দেখা করা সম্ভব হল না, কাল সকালে আসব।

মুড়ে পকেটে রাখতে রাখতে অতনুবাবু বললেন,—আমি তো আর মালতির সঙ্গে কথা বলি না। ঠিক আছে, কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দোব'খন। তাহলে কাল সকালে আসছেন?

—হ্যাঁ।

—নাহ্, দাদাকে বলে এর একটা বিহিত করতে হবে। মাগীর আস্পর্ধা দিন দিন বেড়েই চলেছে। শেষকালে একজন ভদ্রলোকের ছেলেকে ট্র্যাপ করার ধান্দা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। তাহলে আমি চলি? কেমন?

ভদ্রলোক হন্‌হন্ করে চলে গেলেন। তবে মনে হল, যেন একটু খোঁড়াচ্ছেন। সেটা কেন, বুঝলাম না। হয়তো পায়ে চোট-টোট লাগতে পারে।

উনি চলে যেতেই নীলের দিকে তাকিয়ে দেখি, ও মিটিমিটি হাসছে। প্রশ্ন করা বারণ। হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। নীল বলল,—কি রাগ দেখলি? একেই বলে ভদ্রতার আঁতে ঘা। বাড়ির ঝি। ঝিয়ের মতো থাকবে। তা নয়। চাঁদে হাত দেওয়া! মিড্‌ল্ ক্লাস ইগো। ঝাঁঝ দেখ। মালতি লিখতে পড়তে জানে না। সেটা জেনেও চিঠিটা নিয়ে বেমালুম গায়েব করে দিল! ওহ্, রাগ কি সর্বনাশা!

গাড়িটা স্টার্ট করে আমহার্স্ট স্ট্রিটের রাস্তা ধরল। বুঝতেই পারলাম, এবার ও কোথায় যেতে চায়। চুপ করে বসে বসে ভাবতে লাগলাম, একই কায়দায় দু'জনের কাছে গিয়ে বলে এল, কাল সকালে মালতির সঙ্গে দেখা করবে। একই ভনিতায় দু'জনকে বলল, মালতি আজ রাত একটায় ওকে কিছু গোপন কথা ফাঁস করে দেবে। এইসব কায়দা করে নীল যে ঠিক কি করতে চাইছে, সেটাই ভেবে উঠতে পারলাম না। ও ঘুঘু ধরার জন্যে ফাঁদ পাতছে। কিন্তু ফাঁদটা কি, তা বুঝতে পারছি না। দেখতে দেখতে গাড়ি এসে থামল ডাক্তার বাসুর চেম্বারের সামনে। তখন প্রায় দশটা দশ। চেম্বারে মোটামুটি কয়েকজন রুগী ছিল। আমাদের দেখে ডাক্তার বাসু কিন্তু আজ খুব একটা খুশি হলেন না। একটু ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন। অন্যমনস্কের সুরে ভদ্রতা করে বসতে বললেন।

আমরা বসলাম। প্রায় মিনিট পনের পর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—একান্তই দরকার?

নীল বোধহয় ডাক্তারের ব্যবহারে একটু বিরক্ত হয়েছিল। বলল,—একটু নিশ্চয়ই দরকার। নইলে আর আপনার সময় নষ্ট করতে আসব কেন?

খোঁচাটা ডাক্তার বুঝলেন। বললেন,—আপনারা পাশের ঘরে বসুন, এঁকে ছেড়ে দিয়ে আসছি।

আরো মিনিট পাঁচেক পর উনি এলেন। পূর্বের সেই অবাঞ্ছিত উৎপাতের বিরক্তিটা ঠিক এখন নেই। কিন্তু অন্যমনস্ক ভাবটা রয়ে গেছে। পাশের বেসিনে থেকে হাত ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে, সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন,— হাতকড়ি নিয়েই এসেছেন তাহলে? কিন্তু প্রমাণ ছাড়া কি অ্যারেস্ট করা যায়?

নীল প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলল,—ও দায়িত্বটা ঠিক আমার না। ওটা পুলিসের কাজ। আর আপনিও জানেন, আমি পুলিস নই। তাছাড়া আপনি নিছক ভয় পাচ্ছেন কেন? খুন যদি আপনি না করে থাকেন, তাহলে ভয়টা কোথায়?

—দিনকে রাত করতে আপনারা সবকিছুই করতে পারেন। আর এই সামান্য কাজটা করতে আপনাদের কতটুকুই বা বেশি সময় লাগবে?

ডাক্তারের মেজাজ আর শরীর ভালো নেই তা তাঁর কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে। একটু বিরক্ত, একটু অন্যমনস্ক আর সহ্য না করতে পারার মতো মনোভাব। তবু শিক্ষিত লোক। যতদূর সম্ভব ভদ্রতা বজায় রেখেই কথা বলছিলেন। তবে উনি চাইছিলেন যেন ওঁর সঙ্গে বেশিক্ষণ না বসে থাকি। কিন্তু প্রয়োজনে নীল অত্যন্ত নাছোড়বান্দা এবং ছ্যাঁচড়া। দরকার পড়লে রাউণ্ডুলেদের সঙ্গে র স্টার ধাবে বসে বাংলা মদ খেতে পারে। তেমন তেমন প্রয়োজনে বেশ্যাকে মা বলে পুজোও করতে পারে। আজ ও ডাক্তারকে ও সহজে ছাড়ান দেবে বলে মনে হল না। ডাক্তারের বিরক্তিকে কোন মূল্য না দিয়ে বলল,—আপনি ঠিকই ধরেছেন ডাক্তার বাসু। প্রয়োজনে আমরা রাত দিন এক করতেও পিছপা হই না। তবে সে-সব কিছু না। আপনাকে একটা খবর দিতে আসা।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে উনি বললেন,—খবর, আমাকে? কি খবর?

এর পর নীল ঠিক যে কায়দায় আর যে ভঙ্গিমায় কিছুক্ষণ আগে অতনুবাবু আর সুতনুবাবুর কাছে মালতি প্রসঙ্গ পেড়েছিল, ঠিক সেইভাবে ডাক্তারের কাছেও ওর বক্তব্য রাখল।

সব শুনে ডাক্তার বলল,—তা এসব কথা আমায় বলে কি হবে? মালতি ভালো বুঝেছে, তাই আপনার কাছে কনফেস করবে।

—সে তো বটেই. কিন্তু আপনার কি মত?

—আমি কি মালতির লিগ্যাল গার্জেন না আপনার পরামর্শদাতা? বোথ অব ইউ আর অ্যাডল্ট ইনাফ। আপনারা কি করবেন, সেটা আপনাদের বোঝার ব্যাপার।

বেশ বুঝতে পারলাম, নীলের কায়দাটা ডাক্তারের ক্ষেত্রে ঠিক প্রযোজ্য হচ্ছে না। ডাক্তার নীলকে কোন রকম পাত্তাই দিচ্ছেন না। কিন্তু নীলও পিছিয়ে যাবার ছেলে নয়। ও বলল, —সে তো একশো বার। তবে আপনি ও-বাড়ির সঙ্গে পরিচিত, মালতিকে চেনেন, তাই জিজ্ঞাসা করলাম। মেয়েটার অনেক বদনাম শোনা যায়। এতে এতো রাগ করার কি থাকতে পারে?

—আমি তো রাগি নি। সে বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেছে, তাই আপনাকে ডেকেছে, আর আপনি একটা বিশেষ প্রয়োজনে তার সঙ্গে দেখা করবেন। এতে নাম আর বদনামের কি থাকতে পারে, আমি বুঝি না। তবে একান্তই যদি আমার মতামত শোনার প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে আজ রাত্রে দেখা না করে, সকালেই করতে পারেন। আপনার পক্ষে তো তার সঙ্গে দেখা করার কোন অসুবিধা নেই। ইচ্ছে করলেই যখন খুশি দেখা করতে পারেন।

নীল যেন সব কথা বুঝতে পেরেছে এমনিভাবে ঘাড় নাড়ল,—ঠিক আছে, সেই ভাল। তাহলে আজ আমরা উঠি।

আমরা উঠে পড়লাম। হঠাৎ ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন,—রাত ক'টায় দেখা করতে বলেছে?

চকিতে নীল ঘুরে দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক ডাক্তারকে দেখে নিয়ে বলল,—রাত একটায়।

—অত গভীর রাতে? বাবা, সাহস আছে। তা মিস্টার ব্যানার্জি, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

—হ্যাঁ, করুন।

—শুধু কি এই কথাটা আমাকে জানাতে এসেছিলেন, না আসার অন্য উদ্দেশ্য ছিল?

নীল হাসতে হাসতে বলল,—ডাক্তার, আপনি সত্যিই বুদ্ধিমান। আমি শুধু এই মামুলি কথাটা জানাবার জন্যেই আসি নি। আপনাকে জানাতে এসেছিলাম, পুলিসের বিনা অনুমতিতে এ শহর ছেড়ে আপনি কোথাও যাবেন না।

ডাক্তারও হাসতে হাসতে বললেন,—ইয়েস, তাই বলুন। তারপর একটা 'কমার' মতো বিরতি দিয়ে বললেন,—না, আপাতত কোথাও যাচ্ছি না। আর উপযুক্ত প্রমাণ না নিয়ে আশা করি এর পর থেকে আমাকে বিরক্ত করতে আসবেন না।

—মনে থাকবে। বলেই আর আমরা দাঁড়ালাম না।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে বারণ থাকা সত্ত্বেও বলে ফেললাম,—খুব খচেছে।

—হ্যাঁ, খুব। আর সেটাই তো আমার লাভ। বেশি না রাগলে কি আর ওঠার মুখে জিজ্ঞাসা করতেন, কত রাত্রে মালতি আমাকে দেখা করতে বলেছে? তাড়াতাড়ি চল্ লোকটা যা দেরি করিয়ে দিল। আবার না মালতি মিস্ হয়ে যায়।

আর আমি চুপ থাকতে পারছিলাম না। আমার যেন প্রশ্নের ধাক্কায় দম আটকে আসছিল। বারণ থাকা সত্ত্বেও নীলকে জিজ্ঞাসা করলাম,—কয়েকটা প্রশ্ন ছিল।

—উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছে।

—সে তো বরাবরই। মালতি কি সত্যিই তোকে ডেকেছে?

—না। বরং উল্টো। আমিই ওকে রাত একটায় যেতে বলেছিলাম।

—কি করতে চাইছিস বল্ তো?

—এখন এর বেশি, কিছু বলা যাবে না।

—তুই এত মালতিকে নিয়ে পড়লি কেন?

—উপস্থিত বুদ্ধি অ্যাপ্লাই কর।

—তার মানে, মালতিই খুনি?

—সব বলব, শেষ দৃশ্যে। কেন না অদ্যই নাটকের শেষ রজনী। আর একটু ধৈর্য ধর।

ওকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা বৃথা। এখন আর কিছুই বলবে না। গাড়ি আবার শ্রীধর বাই লেনে এসে থামল। বলতেই হল,—আবার এখানে এলি?

—ভাল করে চার না ছড়ালে মাছ আসবে কেন বল? এত সব দামি দামি মাছ।

—এবার কার সঙ্গে?

—আমার শ্রীরাধিকার সঙ্গে। ঐ দেখ লন্ড্রিতে দাঁড়িয়ে আছে। কাল বলেছিল, ঠিক এগারোটায় জামা-কাপড় নিতে আসবে লন্ড্রিতে। এখন এগারোটা দশ। কি রকম প্রাণের টান দেখছিস? এখনও অপেক্ষা করছে। বোস, আসছি।

ও চলে গেল। দেখা করল। দু' মিনিটের মধ্যে কথাবার্তা শেষ করে ফিরে এল। ও বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করলাম না। করে লাভ নেই বলে। কেবল বললাম,—এবার কোথায়?

—তোর স্ট্রেইট লায়নের কাছে।

খুব দ্রুত আমরা থানায় পৌঁছে গেলাম। এবং আমাদের ভাগ্য ভাল, সিংহীমশাই তখন নিজের খাঁচাতেই ছিলেন।

থানায় ঢোকার মুখে নীল বলেছিল,—আজ রাগাবি না। রাগলে স্ট্রেইট লায়নের যেটুকু বুদ্ধি আছে সেটাও লোপ পেয়ে যাবে। কাজের কাজ কিছু হবে না।

নীলই প্রথমে ঢুকল। ওকে দেখে বেশ খুশির ছোঁয়া লাগল সিংহীমশাই এর মুখে। কিন্তু চোরের

মন বোঁচকার দিকে থাকেই। সঙ্গে সঙ্গে নীলের পেছনে ওর দৃষ্টি চলে এল। এবং আমাকে দেখে যথারীতি পেঁচার মতো মুখ করে নীলকে বসতে বললেন।

—তারপর নীল, কতদূর এগুলে বল?

—পাপড়ির হত্যাকারীকে ধরতে চান?

—হেঃ, কি যে বল? এই কেসটার ব্যাপারে আমি কত ওরিড জান?

মনে মনে ভাবলাম, একজন খেটে মরছে। আর একজন চেয়ারে বসে ওপরের চেয়ারের স্বপ্ন দেখছে।

—তাহলে আজ রাত্রেই ব্যাপারটা সেরে ফেলা যাক।

—মানে, মানে?

মানে মানে করতে করতে উনি চেয়ারে সাঁটা পাছাটা কোন রকমে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন। হাত নেড়ে নীল ওকে বসতে বলল,—এক্ষুণি ওঠাউঠির কোন প্রয়োজন নেই। তার আগে দরকারি কথাগুলো শুনে নিন। বেশ কয়েকজন আরমড্ কনস্টেবল নিয়ে রাত ঠিক সাড়ে বারোটায় লাহা বাড়ির পেছনের বাগানে খিড়কি ঠেলে, বাগানে অনেক ঝোপঝাড় আছে, সেখানে অপেক্ষা করবেন। কোন রকম জানাজানি না হয়। পারলে সবাইকে প্লেন ড্রেসেই নিয়ে যাবেন।

—কিন্তু খিড়কির দরজা তো বন্ধ থাকে।

—সে ব্যবস্থা করা আছে। রাত দশটার পর খিড়কির দরজা খোলা থাকবে। ছবি তুলতে পারেন?

—ঐ একটা জিনিস মাইরি ঠিক ম্যানেজ করে উঠতে পারলুম না। ছবি তুলতে গেলেই আমার হাত কেঁপে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে আমার বলতে ইচ্ছে করছিল, কোন্ জিনিসটা যে তোমার হাত না কেঁপে হয়ে যায় মাইবি, সেটাই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু নীলের বারণ। আজ ওনাকে খ্যাপানো চলবে না। তাই চুপ করেই গেলাম।

— ঠিক আছে, নীল বললে, ছবি-টবি তুলতে হবে না। আপনি আপনার প্রয়োজন মতো অ্যাকশান নেবেন। তবে কোন রকমেই যেন আসামি পালাতে না পাবে। আর পালানো মানেই আপনার ক্যারিয়ার ডুমড্!

—আরে রাম রাম। আসামি আমার হাত থেকে পালাবে? সে গুড়ে নুড়ি। ওসব নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। পুরো ব্যাপারটা আমার হাতেই ছেড়ে দাও। কিন্তু আসামি কে?

—এখন না জানলেও চলবে। ওখানে গেলেই বুঝবেন।

—তুমি কখন যাবে?

—ঠিক সময়ে ঠিক জায়াগায় আমি থাকব। তবে একটা কথা বলে যাই, দয়া করে অযথা গুলি-ফুলি চালিয়ে একটা প্যানিক ক্রিয়েট করবেন না।

—পাগল হয়েছো? পাকা ঘুঁটি কেউ নষ্ট করে?

—স্পষ্টেই বোঝা যাবে। এখন চলি।

—একটু চা খেয়ে যাবে না?

—না। সকাল থেকে পেটে তেমন কিছু পড়ে নি। অযথা লিভার খারাপ করতে রাজি নই।

বেরিয়ে এসে গাড়িতে বসলাম। গাড়ি ছুটে চলল সোজা দক্ষিণে। নামতে নামতে শুনলাম, নীল বলছে,—ঠিক রাত এগারোটায় আসব। একদম রেডি হয়ে থাকবি, বলেই হুস করে বেরিয়ে গেল।

কথায় বলে, মাঘের শীত বাঘের গায়ে। হাড়ে হাড়ে তা টের পাচ্ছি। তাও দেশ পাড়াগাঁ নয়। খাস কলকাতা শহর। উত্তর কলকাতার জনবহুল বসতি। কোন বারেই শীতটা এ রকম গা কেটে বসে না। অন্তত আমি কোনদিনও কলকাতা শহরে এ রকম হাড় কাঁপানো শীত পাই নি। কিন্তু এ বছরে শীতটা সত্যিই জম্পেস হয়ে পড়েছে। নীল বলেছিল, তৈরি হয়ে থাকতে। একে শীতকাতুরে। ও না বললেও বেশ কয়েকটা গরমের জামা গায়ে চাপাতাম। চাপিয়েছিও। হাতকাটা দুটো সোয়েটার। তার

ওপব মোটা পুলওভার। এ বছরই এসপ্ল্যানেড থেকে কিনেছি। ভুটিয়া মেড। তাতেও যেন শীত যায় না। লাহা বাড়ির পেছনে ডুমুর গাছটার নিচে আমাকে বসিয়ে দিয়ে নীল কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল।

বসে আছি তো আছিই। সময় যেন আর কাটতে চায় না। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। তার ওপর মাঝে মাঝে উত্তুরে হাওয়া এসে হি-হি কবা ভাবটা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। একটা সিগারেট খেতে পারলে ভাল লাগল; কিন্তু সিগারেট খাওয়া বারণ। আসামি নাকি বুঝতে পারবে আমাদের অবস্থান।

মাথায় একটা মঙ্কি ক্যাপ পরেছিলাম। তার কারণ আছে। ক' দিন আগেই ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠেছি। মঙ্কি ক্যাপটার গায়ে হাত বুলোতেই টের পেলাম শিশিরে ভিজে গেছে। কে জানে, আর কতক্ষণ এ ভাবে কাটবে?

মাটিতে উবু হয়ে বসে আছি ইটের ওপর। এমনি কোন ভূতটুতের ভয় আমার নেই। কিন্তু সকালেই অতনুবাবু বলেছিলেন, বাগানে সাপ-খোপ নেই। কিন্তু বিছে আছে। যদিও হাতে একটা চার সেলের টর্চ বয়েছে, তবু টর্চ এখন জ্বালানো চলবে না। নীলের দিক থেকে টর্চের সংকেত না পেলে আমাকে টর্চ নিভিয়েই বসে থাকতে হবে। বিছের কামড় খেলেও না।

খেয়াল নেই কতক্ষণ কেটেছে। অন্ধকারটাও এত গভীর যে, হাতঘড়ির রেডিয়ামেও সময় নির্দেশ পাচ্ছি না। দূরে কোথাও দুটো কুকুর থেকে থেকে পরিত্রাহি ঘেউ ঘেউ করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে শিয়ালদহর দিক থেকে ট্রেনের শব্দ ভেসে আসছে। একটাও জোনাকি নেই। ঝিঁঝির একটানা আওয়াজও নেই। মনে হচ্ছে, সবাই যেন একসঙ্গে শীতের আমেজে ঘুমিয়ে পড়েছে।

অথচ আমি জানি, আজ এ নিশুতি রাতে কয়েকটা প্রাণীব চোখে ঘুম নেই। চারজন কনস্টেবল। আমি, নীল আর মোটা সিংহী। আর কেউ কি জেগে আছে? নাকি নীলের সব অনুমানই মিথ্যে? চার ফেলা পুকুরে মাছ কি আসবে না? বৃথাই যাবে এই জাল ফেলা? তাহলে তো সিংহীমশাই-এর কাছে মুখই দেখানো যাবে না। কে জানে, আরো কতক্ষণ এইভাবে অপেক্ষা করতে হবে।

বসে বসে পায়ে ঝিঁঝিঁ লাগা সত্ত্বেও একটা ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ কে যেন কানের পাশ থেকে ফিসফিস করে বলে উঠল,—বি রেডি অজু। বললেই আলো জ্বালাবি।

যত ফিসফিসে আওয়াজই হোক, এ কণ্ঠস্বর নীলের। তার মানে, নীল আমার পাশেই ছিল। চোখ রগড়ে অন্ধকারে ঠাহর করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু প্রায় কিছুই দেখতে পেলাম না। এমন সময় লাহা বাড়ির পিছনের দরজায় অতি সন্তর্পণে একটা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ। মনে হল, একটা দরজা যেন একটু খুলল। পরক্ষণেই সেটা বন্ধ হয়ে গেল ঐ রকম ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করে।

যতদূর সম্ভব চোখ আব কান সজাগ রেখে অন্ধকারে আমাদের বিশেষ অতিথিব অপেক্ষায় প্রহর গুনছি। হঠাৎ, স্পষ্টই মনে হলো, এক নারীমূর্তি ধীবে পায়ে এসে দাঁড়ালো ঐ বাগানের টগরগাছের নিচে। গাছটাব নিচে বেশি অন্ধকার। অন্ধকার সর্বত্রই। তবে কিছুক্ষণ অন্ধকারে থাকলে সেটা ক্রমশ চোখে সয়ে আসে। তখন অন্ধকারের নিজস্ব আলোয় অনেক কিছু চোখে ধরা পড়ে।

এই রাত্রে, এই পরিবেশে একটি মেয়ে! তবে কি ও মালতি? নীলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে? কিন্তু নীল আসবে না, এ বকম একটা চিঠিও তো পাঠিয়েছে। তাহলে?

নাবীমূর্তির চলার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছি না, এ মালতি, না অন্য কেউ? খুব সম্ভবত ও কোনো ধূসব অথবা কালো রঙের শাড়িটাড়ি পবেছে। বোধহয় গায়ে একটা কালো রঙের চাদরও আছে। আসলে বঙ-টঙ চেনার তো কোন উপায় নেই।

আবার সব কিছু পূর্বের মতো অন্ধকাবে ডুবে গেল। কোন শব্দ নেই। কোন মূর্তির অস্পষ্ট আনাগোনাও না। টগব গাছের নিচে গভীর অন্ধকারে একজন দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে যে কেউ দাঁড়িয়ে বয়েছে তা বোঝারও উপায় নেই।

আমি বুঝতে পারছি না এর পরে ঘটনা কোন্ দিকে মোড় নেবে? কি ঘটতে চলেছে তাও আমার বোঝার বাইরে। আসলে নীল যে কি কবতে চাইছে তাও আমার জ্ঞানে আসছে না।

সকালে তিনজনের কাছে গিয়েই মালতির আসার সংবাদ জানিয়ে এল। আবার তিনজনকেই বলে এল, আজ রাত্রে ও মালতির সঙ্গে দেখা না করে কাল সকালে দেখা করবে। এদিকে নিজে এসে ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কারো প্রতীক্ষায়। কার প্রতীক্ষায়? নিশ্চয়ই খুনির। কিন্তু খুনি এখন এখানে আসবেই বা কেন? এদিকে এ মেয়েটা কে? মালতি? কিন্তু অতনুবাবু আর সুতনুবাবুর মারফত নীল জানিয়ে দিয়েছে, ও আজ রাত্রে আসছে না। তাহলে এই অস্পষ্ট নারীমূর্তি কোত্থেকে এল? মালতি ছাড়া এই হত্যাকাণ্ডে আর কোন মেয়ে জড়িত আছে নাকি? শর্মিষ্ঠা না মালবিকাদেবী? নাকি মঞ্চের অন্তরালে থাকা দেবতনুর উন্মাদ স্ত্রী? কি যে ছাই হতে চলেছে ভাবতে গেলে মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সমস্ত পরিবেশটা কিছু একটা ঘটবার পূর্বলক্ষণ। ঝড়ের আগে যে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে আসে, ঠিক সেই রকম।

হঠাৎ, চিন্তায় যখন অন্যমনস্ক, ঠিক তখনি প্রায় মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল এক পুরুষ মূর্তি। কোথা থেকে এল, কেমন করে এল কিছুই বুঝতে পারি নি। অল্পক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মূর্তিটা একবার এদিক একবার ওদিক ঘুরে ক্রমশ আমি যে গাছটার নিচে বসে আছি সেদিকেই আসতে শুরু করল। বোধহয় কোন কিছুতে আঘাত পেয়ে ছায়ামূর্তি হোঁচট খেল। উঠে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে মুখ করে হাতের টর্চটা একবার জ্বালিয়েই উলটো দিকে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে গেল। ঐ দিকেই সেই টগর গাছটা। অর্থাৎ মেয়েটি ওখানে আছে।

কি করব না করব বুঝতে পারছি না। কোন নির্দেশও পাই নি। ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে যখন প্রায় টগর গাছটার কাছাকাছি গেছে, সেই মুহূর্তেই অন্ধকার থেকে নারীমূর্তি এগিয়ে এসে পুরুষটির সামনে দাঁড়ালো। মাত্র কয়েক লহমা। তারপর ঠিক কি যে ঘটে গেল কিছুই বোধগম্য হল না। নারীকণ্ঠের প্রচণ্ড আর্তনাদ,—ওরে বাবারে, মেরে ফেল্লরে। পরক্ষণেই ক্যামেরার ফ্লাশবাল্ব জ্বলে উঠল। নীলের চিৎকার শুনতে পেলাম,—অজু, আলো জ্বালা।

সঙ্গে সঙ্গে আমার চার সেলের টর্চ অন্ধকারে ছিঁড়ে আলোর রোশনাই ছুঁড়ে দিল। উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, পূর্বের ছায়ামূর্তি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে স্পাইরালটার দিকে পালাচ্ছে। নীলের ব্যস্ত সমস্ত কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, –মিস্টার সিন্‌হা, ওকে পালাতে দেবেন না। ও স্পাইরালটার দিকে গেছে। অজু আলো দিয়ে ওকে ফলো কর।

নীলের চিৎকার শুনেই বিশালবপু সিংহীমশাই উদ্যত রিভলবার হাতে কোত্থেকে বেরিয়ে এসে চেঁচাতে আরম্ভ করলেন,—হল্ট, হল্ট।

ছায়ামূর্তি ততক্ষণে স্পাইরাল বেয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করেছে। পরক্ষণেই এই প্রচণ্ড শীতের ঘুমন্ত রাত্রের নিস্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে সিংহীমশাই-এর রিভলবার আওয়াজ তুলল—গুড়ুম্ গুড়ুম্।

ধপ করে একটা শব্দ করে ছায়ামূর্তি সেখানেই পড়ে গেল। আর গাছে গাছে ভেসে উঠল ঘুমন্ত পাখিগুলোর রাতজাগা কোলাহল।

নীলের চিৎকার, স্ট্রেইট্‌লায়নের রিভলবার আর পাখিদের কোলাহল, এই সব মিলিয়ে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। আশপাশের বাড়ি থেকে লোকজন উঠে পড়েছে। লাহাড়িবাড়ির ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছে আলোর রেখা।

আর কোথায় কি হচ্ছে, এসব কিছু না দেখে আমি প্রথমেই ছুটে গেলাম টগর গাছের নিচে, যেখানে নীল তখনও বসে আছে। টর্চের আলো জ্বালিয়ে দেখি, মালতির রক্তাক্ত দেহটা মাটিতে পড়ে আছে। যন্ত্রণায় সে মাঝে মাঝে কুঁকড়ে উঠছে। আর তার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছে নীল। মালতির পেটে একটা গভীর ক্ষত। অজস্র রক্ত বেরিয়ে আসছে সেখান দিয়ে।

নীলকে তখন বলতে শুনলাম,—চিনতে পেরেছ মালতি, কে তোমাকে মেরেছে?

অতি কষ্টে মালতি উত্তর দিল—হ্যাঁ, মেজোবাবু।

চমকে উঠলাম। মেজোবাবু? মানে অতনু লাহা। নীলের মুখের দিকে তাকালাম। ও বলল, —পরে সব শুনিস। এক্ষুণি গিয়ে সুতনুবাবুকে বল্ অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করতে।

মালতি বাঁচল না। বাঁচলেন না অতনু লাহা। সিংহীমশাই-এর দুটো গুলিই তাঁর দেহে লাগে। গুলিতে তাঁর এত বাঘমারা টিপ আগে জানতাম না। নাহ্, লোকটার এই গুণটা অস্বীকার করা যায় না। একটা লেগেছিল উরুতে আর একটা পাঁজবার ঠিক নিচেই। মালতি মারা গিয়েছিল ভোররাত্রে। অ্যাব্ডোমেন পুরো ওপন্ হয়ে গিয়েছিল। তবে অধিক রক্তপাতই হয়তো মৃত্যুর কারণ। একমাত্র অতনু লাহা নামটুকু ছাড়া সে আর কিছুই বলে যেতে পারেনি।

সেই দিনই বেলা দুটো নাগাদ মারা গেলেন অতনু লাহা। তবে মৃত্যুর আগে নিজের স্টেটমেন্ট দিয়ে গিয়েছিলেন। নীল সেটা টেপ করে নেয়।

ববিবার বিকেলে এক ঘরোয়া বৈঠকের আয়োজন করেছিল নীল। বাইরের লোক বলতে একমাত্র ডাক্তার অরিন্দম বাসু আর সিংহীমশাই। আমি আর সত্যেনদা তো ঘরের লোক।

সিংহীমশাই এসেই হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে দিলেন। প্রথমেই ঐ বিশাল শরীর নিয়ে আচমকা নীলকে জড়িয়ে ধরে গালে একটা ঠাস্ করে চুমু খেয়ে বললেন,—তুমি মাইরি একটা চিজ। তোমার মা মাইরি যাকে বলে একেবারে রত্নগর্ভা। উঃ, কি বুদ্ধি মাইরি তোমার। আমি হলে তো শালা জীবনেও এ কেস ক্লিয়ার করতে পারতুম না।

এখন আর আমার সিংহীমশায়ের পিছনে লাগতে বাধা নেই। তাই সত্যেনদাকে বললাম,—আচ্ছা সত্যেনদা, এই কেসের পর একটা প্রমোশন আশা করা যায়! কি বলেন?

—তাতে তোমার কোন্ পাকা ধানে মই লাগছে শুনি? আর প্রমোশন হবে না কেন? আলবাত হবে। যার এমন সোনার টুকরো ভাই রয়েছে তার প্রমোশন হবে না তো কি তোমার হবে?

সত্যেনদার দিকে চেয়ে বললাম,—বটেই তো বটেই তো!

কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে সিংহীমশাই বললেন,—ডেঁপো ছোকরাদের আমি দু'চোক্ষে দেখতে পারি না। তা নীল এবার ভাল করে বুঝিয়ে বল তো, কী থেকে কী করলে। এখনও তো আমার মাথায় মাইরি কিচ্ছুই ঢুকছে না।

সিগারেট ধবিয়ে ডাক্তার অরিন্দম বাসুও বললেন,—নীলাঞ্জনবাবু, আপনার মুখ থেকে সব কথা শুনব বলে আমার অনেক কাজ ফেলে রেখে ছুটে এসেছি। কাইন্ডলি আর উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখবেন না।

স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় নীল মৃদু হেসে বলল,—আমি জানি আপনাদের অনেক প্রশ্ন। সব আপনাদের খুলে বলব বলেই তো ডেকে পাঠিয়েছি। তার আগে আজ দুপুরে আমি নিজে হাতে কয়েকটা জিনিস রান্না করেছি। খুব একটা খারাপ লাগবে না। খেতে খেতেই শোন যাক।

সিংহীমশাই তো আগেই লাফিয়ে উঠলেন,—এ তো ভয়ংকর উত্তম প্রস্তাব।

আমার কিন্তু একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। তবু মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—এখানেও ভয়ংকরটা চলে না।

চোখ কটমটিয়ে সিংহীমশাই তাকিয়ে ছিলেন, ম্যানেজ করলেন সত্যেনদা,—আরে নীল, দীনুকে ওগুলো নিয়ে আসতে বল। ঠাণ্ডা হলে ভালো লাগবে না।

—আমি যেন এসে গেছি, বলেই দীনু দু' প্লেট ভর্তি প্রন পকৌড়া আর চিলি-চিকেন নিয়ে ঢুকল। তখনও খাবারগুলো থেকে গরম ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

সিংহীমশাই-এর দিকে তাকিয়ে দেখি ওনার রাগ-টাগ সব কোথায় উবে গেছে। তড়াক করে একটা পকৌড়া নিয়ে মুখে ফেলেই বললেন,—যদিও খাওয়ানোটা আমারই উচিত ছিল তবু নীল ইজ নীল। ওর তুলনাই হয় না।

খাওয়া-দাওয়া চলতে লাগল! নীল বলতে শুরু করল,—আমি বলে যাব, না আপনারা এক এক করে প্রশ্ন করবেন?

ডাক্তার অরিন্দম বাসু বললেন,—এমন ডিলিসিয়াস রান্না যে করতে পারে তাব গল্প পরিবেশনটাও

নিঃসন্দেহে হবে সুইট-টু-হিয়ার। আপনি বলুন, আমরা শুনব।

—বেশ, আমিই বলছি। তার আগে এই টেপটা শুনুন।

একটা গরম চিলি-চিকেনের ঠ্যাং মুখের মধ্যে পুরে 'আঃ' 'উঃ' করতে করতে সিংহীমশাই জড়িয়ে জড়িয়ে একটা খিচুড়ি ল্যাংগোয়েজ উচ্চারণ করলেন, যেটা শোনালো এইরকম—আগেই—শ্-শ্—নেছি।

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। সিংহীমশাই-এর ল্যাংগোয়েজটা ঠিক কোন্ দেশের ধরতে পারলাম না।

ব্যাখ্যা করে দিল নীল,—উনি বলতে চাইছেন উনি 'আগেই শুনেছেন।' কিন্তু এদেরকে শোনানো দরকার, বলেই ও টেপের নবটা টিপল। যন্ত্র মাধ্যমে প্রথমে নীলের গলার আওয়াজ ভেসে এল, অতনুবাবু, আমি নীল ব্যানার্জি বলছি, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? এর পর খানিকটা হিস্ হিস্ শব্দ। তারপর খুব ধীরে এবং অতি কষ্টে উচ্চারিত একটি শব্দ, 'হ্যাঁ'। আবার নীলের স্বর, আপনার কি কিছু বলার আছে? খানিকটা হিস্‌হিস্ শব্দ। তারপর প্রায় পাঁচ থেকে সাত মিনিট ধরে যন্ত্রটা মাত্র কয়েকটা কথা বলল থেমে থেমে, অতি কষ্টে, তার সম্পূর্ণ বয়ানটা হল,—আমি আমার ভাইঝি পাপড়িকে খুন করেছি। কারণ সে যা করতে চাইছিল তা আমার কাম্য নয়। এ-ব্যাপারে আর কেউ দোষী নয়। মালতীকেও আমি খুন করেছি। কেননা, মেয়েটা বদ।

টেপটা বন্ধ করে দিল নীল। তারপর বলতে শুরু করল, —মৃত্যুকালীন জবানবন্দী থেকে জানা যাচ্ছে যে অতনুবাবুই তাঁর একমাত্র ভাইঝি পাপড়িদেবীকে সজ্ঞানে এবং সুপরিকল্পিত উপায়ে খুন করেছেন। অর্থাৎ খুনি ধরা পড়ল। অবশ্য এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে একজন মুমূর্ষ ব্যক্তির এই ধরনের স্টেটমেন্টের ওপর নির্ভর করে কি আমরা ডিসিশানে আসতে পারি যে তিনিই সত্যিকারের খুনি? এমনও কি ভাবা যেতে পারে না যে অন্য কাউকে বাঁচাবার জন্যে মৃত্যুর আগে নিজের কাঁধে সব দোষটা চাপিয়ে আসল খুনিকে আড়াল করে গেলেন? জগতে এমন ঘটনা তো ঘটেই। কিন্তু আমি বলব 'না'। অতনুবাবুর মৃত্যুকালীন জবানবন্দীই একমাত্র সত্য। অর্থাৎ তিনিই তাঁর ভাইঝিকে খুন করেছেন। আর তার প্রমাণও আমার কাছে আছে এবং কেন খুন করেছেন আপনাদের কাছে ব্যক্ত করছি।

—বাংলা ভাষায় কুলাঙ্গার বলে একটা শব্দ আছে। যার আভিধানিক অর্থ হল, যে ব্যক্তির অকীর্তির জন্য বংশ কলঙ্কিত হয়। কথাটা নিশ্চয়ই অতনুবাবুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সত্যিকার অর্থে তিনি কুলাঙ্গারই বটে।

রামতনু লাহা, দেবতনু লাহা আর অতনু লাহা, এঁরা ছিলেন তিন ভাই। বয়সের পার্থক্য তিনজনের মধ্যে খুব বেশি নয়। দেবতনু আর অতনু ছিলেন যমজ ভাই। আর রামতনু ওঁদের দুজনের থেকে বছর পাঁচেকের বড়। তিন ভাইয়ের মধ্যে রামতনুই ছিলেন সজ্জন এবং ধার্মিক। কিন্তু বাকি দুজন কি স্বভাব কি চরিত্রে এবং আচারে রামতনুর বিপরীত। অত্যন্ত ছোট বয়েস থেকেই দুজনে অসৎ সঙ্গে পড়ে নেশার দাস হয়ে পড়েন। মদ এবং অন্যান্য নেশায় দুজনেরই বিশেষ আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে নারীঘটিত দোষটা রপ্ত করেন দেবতনুবাবুই বেশি।

একজন আইন পড়তেন, একজন ডাক্তারি। লেখাপড়া শিকেয় তুলে দিয়ে বাবা শুভ্রতনুর সিন্দুক ভেঙে বা দোকানের ক্যাশ সাফ করে দুজনেই যথাসম্ভব টাকা ওড়াতে শুরু করেন। দু' ভাই-এর মতিগতি দেখে শুভ্রতনুবাবু প্রমাদ গুণলেন। তিনি ঠিক করলেন, মৃত্যুর আগেই উইল করে বেশিরভাগ সম্পত্তিই বড় ছেলের নামে করে দেবেন। করেওছিলেন তাই।

দুই যমজ ভাইয়ের নামে নগদ কিছু করে টাকা আর কলকাতায় একখানা করে বাড়ি রেখে স্থাবর অস্থাবর আর পৈত্রিক ব্যবসা সবকিছুই দিয়ে গিয়েছিলেন রামতনু লাহাকে।

পাপড়ি হত্যার ক্ষীণ সূত্রপাত এখানেই। অর্থাৎ রামতনু এবং রামতনুর দুই ছেলে মেয়ের ওপর পারিবারিক কারণে রাগ জমে থাকার কথা অতনু এবং দেবতনুর।

কিন্তু অতনু হিংসা চরিতার্থের সুযোগ পাননি। বলতে গেলে সুযোগ দেননি দেবতনুই। সে আর এক বিরাট রহস্য। বলতে পারেন পাপড়ি রহস্য ঘাঁটতে গিয়ে বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে বেরিয়ে এসেছে উনত্রিশ বছর আগের আর এক হত্যা রহস্য। হ্যাঁ, সেটাও একটা হত্যা। একটা ক্রাইম। কিন্তু সে রহস্য কোনদিনও সমাধান হয়নি। হতও না, যদি না উনত্রিশ বছর পর আবার খুন হত এই বংশের আর একটি মেয়ে, যার নাম পাপড়ি।

অবশ্য ঈর্ষা এবং হিংসাজাত কারণে যে পাপড়িকে হত্যা করা হয়েছে তা নয়। পাপড়ি হত্যার কারণ সম্পূর্ণ আলাদা। সে কথায় পরে আসছি। শুভ্রতনু লাহা মারা যাবার পর উইল দেখে দু' ভাই-এর চক্ষুস্থির। কিন্তু কোন উপায় নেই। তখন তো যা হবার হয়ে গেছে। কাঁচা টাকা পাবার পর দুভাই টাকা ওড়াতে শুরু করলেন। ওড়াতে আরম্ভ করলে টাকা আর কতদিন থাকে। কিছুদিন পরই দুভাই নিজেদের ভাগের বাড়ি বিক্রি করার মনস্থ করলেন। জানতে পেরে রামতনু ন্যায্য দামের অতিরিক্ত টাকা দিয়েই সব কিছু কিনে নিলেন। কিন্তু ভায়েদের একেবারে তাড়িয়ে দিতে পারলেন না। শ্রীধর লেনের বাড়িতে বিনা ভাড়ায় আজীবন থাকার অলিখিত নির্দেশ দিয়ে দিলেন। পরবর্তী কালে ছেলেকেও বলে রেখেছিলেন, অতনু আর তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে না দিতে।

এই সময় আমি একটা কথা না বলে পারলাম না,—কিন্তু দেবতনুবাবুর কি হল?

—হুড়োহুড়ি করিস না। গুলিয়ে যাবে। সব বলছি। দেবতনুর অ্যাকসিডেন্ট মারা যাবার ব্যাপারটা সর্বৈব মিথ্যা। কারণ লোকের চোখে ঘটনাটা দাঁড় করানো হয়েছিল ঐ ভাবেই। আসলে বংশের মর্যাদা রাখতে গিয়ে দেবচরিত্রের রামতনুও জীবনে একটা মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তা হল দেবতনুর রহস্যময় অন্তর্ধানের মিথ্যা এবং সাজানো ব্যাখ্যা করা।

আপনারা কেউ চমকে উঠবেন না। কারণ এটা ঘটনা। ঘটনা মানেই সত্য। এবং সত্যের মতো চমকপ্রদ আর কিছু নেই। আজ আপনারা যাঁকে অতনু লাহা বলে চেনেন, তিনি আদপেই অতনু নন। আজ থেকে উনত্রিশ বছর আগে অতনু লাহাকে খুন করা হয়েছিল।

নীলের বলা সত্ত্বেও আমরা সবাই চমকে উঠেছিলাম। এমন কি ডাক্তারও। বোধহয় তিনিও এসব কিছু জানতেন না। সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম,—তাহলে এই অতনু লাহা কে?

অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে নীল বলল,—ইনিই দেবতনু লাহা ওরফে সুরঞ্জন মিত্র।

ঘরের মধ্যে দেওয়াল ভেঙে পড়লেও আমরা কেউ এতটা চমকাতাম না। প্রায় কিছুক্ষণ সবাই নীরবে ওর বক্তব্যের মানে বুঝতে সময় নিলাম। সত্যেনদা নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন,—নীল, একটু বুঝিয়ে বল। ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছি না।

—হ্যাঁ, বলছি। টাকাপয়সা হাতে পেয়ে দু'ভাই ওড়াতে শুরু করলেন। আগেই বলেছি, দেবতনুর বিশেষ দুর্বলতা ছিল মেয়েদের ওপর। থিয়েটারের এক সুন্দরী অভিনেত্রীকে দেখে ওঁর মাথা ঘুরে যায়। সেই সময় তাকে পাবার জন্যে উনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। অজু, বুঝতে পেরেছিস কে তিনি?

আমি বললাম,—পারছি, অনিন্দিতাদেবী, তাই না?

নীল বলল,—হ্যাঁ। সুরঞ্জন মিত্রের ছদ্মনামে তিনি অনিন্দিতা দেবীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে তাকে গোপনে বিয়ে করেন। ইচ্ছে ছিল, অভিনেত্রী হিসেবে নাম করলে তার টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করা।

আমি বললাম—তাহলে তো

নীল বলল,—ইয়েস, পাপড়িকে হত্যা করার প্রধান কারণ এটাই। উদ্দালক মিত্র দেবতনু লাহার ছেলে। যা উদ্দালক আজও জানে না। হয়ত কোনদিনও জানবে না।

ডাক্তার বললেন,—তাই জন্যেই কি?

—হ্যাঁ, অনিন্দিতাদেবী দেবতনু ওরফে সুরঞ্জনের কোন খবর না রাখলেও দেবতনু সব খবর রাখতেন। আর এখানে একটা কথা বলে রাখি, জগতের সব থেকে বিচিত্র হচ্ছে মানুষের মন। কখন যে সেই মনে কি বিচিত্র ভাবের উদয় হয় তা বোঝা সত্যই দুষ্কর। নইলে দেবতনুর মতো বিবেকহীন,

চরিত্রহীন পাষণ্ডের মনে উদ্দালক আর পাপড়ির বিয়ে অসামাজিক, এ-চিন্তা আসতো না। অথচ সেই লোক নিজেই সারাজীবন অসামাজিক কাজ করে গেছেন। সে কথা পরে, তবে তিনি যখন দেখলেন, তাঁরই ভাইঝি তাঁরই ছেলের সঙ্গে প্রেমে লিপ্ত, আদি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গোঁড়া সংস্কার তাঁর মতো নৃশংস পুরুষেরও মনের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁরই ছেলে তাঁরই ভাইঝিকে বিয়ে করবে, এটা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না। প্রথম প্রথম পাপড়িকে অনেক বুঝিয়েছিলেন। যখন দেখলেন কিছুতেই কিছু হবার নয়, তখন বাধ্য হয়েই পাপড়িকে সরিয়ে দিলেন।

সিংহীমশাই জিজ্ঞাসা করলেন,—তা অত কষ্ট করে অত বিস্ক্ নিয়ে মারতে গেল কেন? সোজাসুজি মালতির মতো নামিয়ে দিলেই তো হোত?

সিংহীমশাই-এর কথা শুনে নীল একটু হাসল। তারপর বলল,— এককালে দেবতনুবাবু ডাক্তারি পড়েছিলেন। সেটাই কাজে লাগিয়ে দিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, এটা আদপেই খুন নয়, এভাবে সমস্ত ঘটনাটা সাজাতে। ছোরাছুরি মেরে খুন করলে তার অনেক ঝামেলা। আর এইভাবে খুন করলে সহজে কারো চোখে পড়বে তা তিনি বুঝতে পারেন নি। ভেবেছিলেন, এই সামান্য ব্যাপারটা নজর এড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা গেল না। আমার চোখে ধরা পড়ে গেল। অবশ্য ডাক্তার বাসুর চোখেও ধরা পড়েছিল।

আমি বললাম,—ভুলে যাব, তাই প্রশ্নটা এখনই করে রাখছি। বেছে বেছে বিয়ের দিনটাই বাছা হল কেন?

নীল বলল, —প্রথমত বিয়ের দিনে লোকে নানান কাজে ব্যস্ত থাকে। অন্য দিন কেউ দেবতনুকে পাপড়ির ঘরে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখে ফেললে তাঁকে অনেক কৈফিয়তের মুখে পড়তে হত। দ্বিতীয়ত, শেষ পর্যন্ত উনি চেষ্টা করেছিলেন যদি পাপড়ির মত পালটায়। কিন্তু তা পালটালো না। আর তৃতীয় কারণ, পাপড়িকে হত্যা করতে গেলে বিয়ের আগেই করা উচিত! তারও আবার দুটো কারণ। বিয়ের পর হত্যা করার অনেক অসুবিধা। আর যে কারণে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া, সেটার তখন আর দরকার থাকে না। চতুর্থত, পাপড়ির বিয়ে হয়ে গেলে সম্পত্তির অর্ধেক বেহাত হয়ে যায়। দেবতনু তো আর কোনদিন উদ্দালককে নিজের ছেলে বলে দাবি জানাতে পারতেন না।

ডাক্তার বললেন,—দেবতনুবাবু যদি ধরা না পড়তেন, তাহলে তাঁর লাভ কি হত? পাপড়ির মৃত্যুর পর সবই তো সুতনুর ভাগে পড়তো।

রহস্যময় কণ্ঠে নীল বলল,—কে বলতে পারে যে, পাপড়ির মতো একদিন সুতনুও খুন হতেন না? তবে তাতেও খুব লাভ হত না। কারণ, রামতনুবাবু দেবতনুকে ভালভাবেই চেনেন। পাপড়ির পর সুতনুর কিছু হলে উনি সঙ্গে সঙ্গে উইল চেঞ্জ করতেন।

আমি বললাম,—তুই কিন্তু দেবতনু আর অতনুর আসল রহস্যটা পাশে সরিয়ে রেখে গেছিস।

—বলতে আর দিচ্ছিস কোথায়? ক্রমাগত সাইড প্রশ্ন তুললে ঐ রকমই হবে।

—বেশ, আর এ নে প্রশ্ন করব না। ওই রহস্যটা কি তাই বল।

—এক ভাই, মানে দেবতনু যখন অনিন্দিতাকে ফেলে রেখে কাটবার মতলব খুঁজছেন, সেই সময় হঠাৎ একদিন ভাই অতনুর সঙ্গে দেখা। অতনু তখন একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছেন। মানে, সিরিয়াসলিই করছেন। যদিও অতনুর চরিত্রে অনেক দোষ ছিল তবুও এই প্রেমের ব্যাপারে বোধ হয় উনি খুব সিনসিয়ার ছিলেন। ভাই-এর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হতে খুব সরল মনেই আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে। মেয়েটি ছিলেন সত্যিকারের সুন্দরী। চিরকালের নারীলোভী পুরুষটি ভাইয়ের প্রেমিকাকে দেখে চনমন করে উঠলেন। ঈর্ষায় জ্বলে গেলেন, যখন শুনলেন মেয়েটি এক বিরাট ধনী বাপের একমাত্র মেয়ে। তার অর্থ রাজ্য আর রাজকন্যা। তখনই তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, এই মেয়েটির সঙ্গে কিছুতেই অতনুর বিয়ে হতে পারে না। অতনুর ছিল একটাই দোষ। নেশা। মদের। কিন্তু দেবতনুর ছিল মদ, আর মেয়েছেলে। আর চরিত্রে ছিল লোভ, হিংসা এবং পরস্ব অপহরণের খিদে।

মনে মনে তিনি ভাবতে শুরু করলেন, যেমন করেই হোক, অতনুর প্রেমিকাকে পেতে হবেই। কারণ ওদিকে অনিন্দিতা তখন পুরনো হয়ে গেছে। তার ওপর তার গর্ভে এসেছে সন্তান। অবশ্য সে সমস্যার সমাধান তিনি তখন করেই ফেলেছিলেন। রতন হালদারের কাছে দশ হাজারে বিক্রি করে দিয়েছেন অনিন্দিতাকে।

জীবনটা তখন তাঁর ফাঁকা। কোন মহিলা নেই। সব লোভ গিয়ে পড়ল অতনুর প্রেমিকার ওপর। দুজনের চেহারায় ছিল আশ্চর্য রকমের সাদৃশ্য। দেবতনু আর অতনুকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিলে অত্যন্ত চেনা লোকেরও সহসা বুঝতে অসুবিধা হোত, কে কোন্‌জন। স্বয়ং রামতনুও গণ্ডগোল করে ফেলতেন। সুযোগটা নিলেন দেবতনু। ভাইয়ের ছদ্মবেশে মাঝে মাঝেই অতনুর প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতেন।

ব্যাপারটা আন্দাজ করেই হোক, অথবা অন্য কারণেই হোক, অতনু মনস্থির করলেন, বিয়েটা খুব শীঘ্রই সেরে ফেলবেন। দাদা রামতনুকে এসে সব বললেন। রাজি হয়ে গেলেন রামতনু।

তারপর এক শুভ লগ্নে আর একটি মেয়ে দেখে দেবতনু আর অতনুর বিয়ে দিলেন। দেবতনুর ইচ্ছে ছিল না। কারণ তাঁর লোভ অতনুর ভাবি স্ত্রীর ওপর। তবু অর্থের লোভে রামতনুর দেখে দেওয়া এক ধনী পিতার সুন্দরী মেয়েকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেই বসলেন।

কয়েকদিন পর নতুন বৌয়ের নেশা কেটে যেতেই তাঁর আগের লোভ ফিরে এল। চোখের সামনে তাঁর বৌ-এর থেকেও অনেক সুন্দরী অতনুর বৌ ঘুরে বেড়ায়। অথচ ইচ্ছে থাকলেও কিছু করতে পারেন না। মুখে কিছু প্রকাশ না করে মনে মনে এক বীভৎস প্ল্যান করলেন।

মনে হয় দেবতনুর হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই অতনু তাড়াতাড়ি বিয়ে করেছিলেন। ভেবেছিলেন বিয়ের পর দেবতনু নিশ্চয়ই আর তার বৌ-এর উপর নজর দেবে না। যতই হোক, ভাই-এর বৌ তো। কিন্তু দেবতনু কুটিল আর শঠ। অতনুর মানসিক ধারণা অনুযায়ী তিনি অত্যন্ত ভালমানুষের ছল গ্রহণ করলেন। ভুলেও তখন ফিরে তাকাতেন না অতনুর স্ত্রীর দিকে।

কিছুদিন পর বিশ্বাসটা ফিরে এলে ভাইকে বাইরে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব দিলেন। একটা জিনিস প্রায়ই দেখা গেছে, যারা অত্যধিক মদ্যপান করে তাদের মনটাও খুব খোলামেলা হয়। অতনুর ছিল তাই। মদ আর রেস নিয়ে তিনি ব্যস্ত থাকতেন। কূটবুদ্ধিগুলো তাঁর মাথায় খেলত কম। ভাই-এর কথায় সরল বিশ্বাসে দুই ভাই আর তাঁদের দুই বউ বেড়াতে গেলেন উটি।

তারপর যখন ফিরে এলেন, দেখা গেল চারজনের বদলে ফিরেছেন তিনজন। অতনু, অতনুর স্ত্রী মালবিকা আর দেবতনুর পাগল বৌ নন্দিতা।

—বড় গোলমেলে, বড় গোলমেলে বলে চিৎকার করে উঠলেন স্ট্রেইট লায়ন, এটা কি রকম হোল? এটা তো ঠিক বুঝতে পারলুম না।

নীল হেসে বলল,—আপনি কেন, প্রথমে অনেকেই বুঝতে পারেন নি। রামতনুবাবুও না, মালবিকাদেবীও না।

অস্বস্তি আর অধৈর্যে আমি বলে উঠলাম,—কি হচ্ছে নীল? ব্যাপারটা ক্লিয়ার কর। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না।

—শীতের এক বিকেলে দুই ভাই আর তাদের দুই বৌ উটির পাহাড়ি পথ ধরে অনেক দূর বেড়াতে বেড়াতে চলে গিয়েছিলেন। স্বভাবতই পুরুষরা একটু দ্রুত হাঁটেন। ফলে দুই বৌ একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন। আগেই বলেছি অতনু প্রচণ্ড মদ্যপান করতেন। সর্বদাই ওঁর পকেটে থাকত রুপোর তৈরি মদের হিপ্ প্যাক্। সেদিনও তিনি মদ খেতে খেতে ভাই-এর সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিলেন। বোধ হয় ওঁরা দৃষ্টির আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। তার ওপর সন্ধে নেমে আসার দরুন কুয়াশা আর অন্ধকারে দুই বউ তাঁদের স্বামীদের ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলেন না।

হঠাৎ এক প্রচণ্ড আর্তনাদে পাহাড়ের নির্জন আকাশ বাতাস যেন কেঁপে উঠল। মালবিকা আর নন্দিতা ভয় পেয়ে সামনের পথ ধরে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখেন, এক ভাই মাথায় হাত দিয়ে বসে

আছেন। আর একজন নেই।

ওঁদের দু'জনকে ওখানে পৌঁছতে দেখে যে ভাই মাথায় হাত চেপে বসে ছিলেন, তিনি মালবিকার কাছে ছুটে এসে বললেন—সর্বনাশ হয়ে গেছে মালবি, দেবু মদের ঝোঁকে পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে ঝাঁপ দিয়েছে। কি হবে মালবি?—বলেই হাউ হাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করেছিলেন।

সব শুনে নন্দিতা সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। জ্ঞান ফিরলে দেখা যায়, তাঁর মাথার গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে।

সত্যেনদা বললেন,—তার মানে,

কথা কেড়ে নিয়ে নীল বলল,—মানেটা সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে নি। রামতনুবাবুর কাছেও নয়। ধরা পড়ল মালবিকাদেবীর কাছে। কিন্তু ধরা যখন পড়ল, তখন মালবিকার আর কিছু করার ছিল না।

ডাক্তার বাসু বললেন,—অর্থাৎ ঘুরিয়ে বলি, দেবতনুই অতনুকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন। মেয়েরা পৌঁছতেই দেবতনু নিজেকে অতনু বলে চালিয়ে দেন।

হঠাৎ আমি প্রশ্ন করি,—তুই এত সব জানলি কেমন করে?

—মালবিকাদেবীর কাছ থেকে। মালবিকাদেবীর যে স্বভাবটা তুই দেখেছিস, সেটা তাঁর মুখোশ। আসলে ভদ্রমহিলা অত্যন্ত ভাল। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর আসল নারীসত্তাটা বেরিয়ে এসেছিল। কাঁদতে কাঁদতে সবই তিনি আমাকে বলেছিলেন।

—কিন্তু দেবতনুবাবু যে অতনুবাবু নন, এটা উনি স্ত্রী হয়েও বুঝতে পারলেন না?

—কেন পারবেন না। স্ত্রী কখনও তাঁর স্বামীকে না চিনে থাকতে পারেন? যতই চেহারার মিল থাক, স্ত্রীর চোখে নকল স্বামী ধরা পড়বেই। কিন্তু ধরা যখন পড়ল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রথমত, সেই সময় সারা বাড়িতে হুলুস্থূল কাণ্ড। এক ভাই মারা গেছেন। আর এক বৌ পাগল হয়ে গেছেন। তার ওপর থানা পুলিস ডাক্তার। চারিদিকে নানান ঝামেলায় কি রামতনু, কি মালবিকা, কেউই তখন দেবতনুর আসল-নকল নিয়ে চিন্তা করার অবসর পাননি। তারপর ঘটনার রেশ যখন একটু কমে এল, সেই সময় একদিন মালবিকার কেমন যেন দেবতনুকে হঠাৎই সন্দেহ হল। স্বামীদের কিছু বিশেষ বিশেষ স্বভাবের সঙ্গে স্ত্রীরা অত্যন্ত পরিচিত হন। অথচ বর্তমান অতনুর সঙ্গে পুরনো অতনুর সেই স্বভাব গুলোর মিল তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ইতিমধ্যে একদিন দেবতনু অনেক রাত্রে মদ্যপান করে এসে মালবিকার সঙ্গে দৈহিক মিলনের চেষ্টা করেন। সমস্ত গণ্ডগোল বাধে এখানেই। দেবতনু ও অতনু উভয়েই মদ্যপান করতেন। কিন্তু দেবতনু জানতেন না অতনুর চরিত্রের আর একটা বিরাট দিক ছিল। স্ত্রীকে তিনি প্রচণ্ড ভালবাসতেন। কোনদিনও তিনি মদ্যপান করে তাঁর স্ত্রীর গায়ে হাত দিতেন না।

সঙ্গে সঙ্গে মালবিকা দেবী তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। এক ধাক্কায় দেবতনুর শিথিল দেহটা ফেলে দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আর সেই রাত্রেই এক এক করে তাঁর সব কথা মনে পড়েছিল।

দুর্ঘটনার দিন অতনু প্রথমে কালো প্যান্ট আর সাদা ট্যুইড কোট পরেছিলেন। আর দেবতনু পরেছিলেন ব্ল্যাক স্যুট। কিন্তু দেবতনুর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত অতনুকে সাদা কোট ছেড়ে কালো কোট পরতে হয়েছিল। হাসতে হাসতে সেদিন বেরুবার সময় দেবতনু অতনুকে বলেছিলেন—নয় আজ দুই ভাই একই রকম ড্রেস করলাম। তোর কি ভয় হচ্ছে, আমাদের বৌরা আমাদের চিনতে পারবে না?

এ ছাড়া আরো একটা মারাত্মক জিনিস প্রমাণ হিসেবে সংগ্রহ করতে দেবতনু ভুলে গিয়েছিলেন। সেটাও ঘটনার আকস্মিকতায় মালবিকা দেবীর তখন মনে পড়েনি। কিন্তু পরে খতিয়ে দেখতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, অতনুর ছদ্মবেশী দেবতনুর মুখে সেদিন মদের কোন গন্ধ পাননি, আর অতনুর কাছে দেখতে পাননি রুপোর হিপ্‌প্যাকটা। দেবতনু ভুল করে ভাইকে ঠেলে ফেলে দেবার আগে হিপপ্যাকটা সংগ্রহ করে নেননি। অবশ্য পরে সন্দেহভঞ্জনের জন্যে দেবতনু একই রকম একটা

হিপ্‌প্যাক তৈরি করেছিলেন। কিন্তু আসল নকলেব পার্থক্য তখন ধরা পড়ে গেছে মালবিকা দেবীর কাছে।

—তা মালবিকা দেবী যখন সব জানতেই পারলেন, তখন তিনি ফাঁস কবে দিলেন না কেন? জিজ্ঞাসা কবলাম আমি।

—কি হবে ফাঁস করে? এক ভাইকে খুন করার অপরাধে আর এক ভাইয়ের ফাঁসি? এবং খুন কবাব কাবণ কি? ভাইয়ের বৌকে আত্মসাৎ করা। বনেদি বংশের মর্যাদা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

—তাই বলে এত বড় মিথ্যেটাকে উনি মেনে নিলেন?

—উপায় কি, গোঁড়া বাঙালি পরিবারের বৌ। নিজের কাছে নিজে সাচ্চা থাকলেও দুনিয়ার মানুষ তো চুপ করে থাকবে না। নানান লোকে মিথ্যে কলঙ্ক রটাবে। মালবিকাদেবীর তখন আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য উপায় থাকতো না।

—এ সব কিছু রামতনুবাবু জানতেন? আবারও আমি প্রশ্ন করলাম।

—মালবিকাদেবীই সব জানিয়েছিলেন। অনেক পরে। তখন তো আর কিছু করার নেই। সেদিন থেকেই রামতনুবাবু আর দেবতনুর মুখ দেখতেন না। আর মালবিকার ওপর নির্দেশ দিয়েছিলেন, এ কলঙ্কেব কথা যেন বাইরের লোক জানতে না পারে। মালবিকা কথা রেখেছিলেন। একমাত্র নীল ব্যানার্জি ছাড়া বাইরের কোন লোক আসল দেবতনুর মৃত্যুব আগে পর্যন্ত এ সবের কিছুই জানতে পাবে নি। লোক দেখানো স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করা ছাড়া কোন ভাবেই দেবতনুকে কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। এমন কি লক্ষ্য করলেই তুই দেখতে পেতিস, শাঁখা-সিঁদুর কোন কিছুই উনি পরতেন না। খুব সাধারণ আটপৌরে শাড়ি পরেই কাটাতেন। অজু, একটা জিনিস বোধ হয় এখনও মনে করতে পারবি, যে ঘরটায় আমরা সেদিন গিয়েছিলাম, মেয়েদের কোন ব্যবহৃত জিনিস সেখানে ছিল না। সেদিন আশ্চর্য হলেও এখন কিছু বুঝতে অসুবিধে হয় না। ওঁবা এক ঘরে থাকতেন না। দু'জনেব ঘব আলাদা। সামনে এলে দেবতনুকে কুকুরের মত লাথি-ঝাঁটা মারতেও দ্বিধা করতেন না।

সত্যেনদা জিজ্ঞাসা করলেন,—নন্দিতাদেবীর কি হল?

এক ট্র্যাজেডির নায়িকা। আজও তিনি উন্মাদ হয়ে ও বাড়িতে মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছেন। তবে এখনও তাঁকে যদি উপযুক্ত চিকিৎসা কবা যায়, হয়ত ভালো হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু রামতনু লাহা তা চান না। যে আঘাত নিয়ে তাঁর ভাই-এর স্ত্রী সেদিন পাগল হয়েছিলেন, আরো এক কলঙ্কময় নতুন আঘাতে তিনি ক্ষত-বিক্ষত হোন, এটা তাঁব কাম্য নয়। তার চেয়ে এই বরং ভাল। অন্ধকারের জগতেই তাঁর জীবন শেষ হোক। কিন্তু আলোর জগতে ফিরিয়ে এনে নতুন করে আঘাত দিতে তিনি আর চান নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—আর সে রাত্রে ওনারই কান্নার আওয়াজ আমরা পেয়েছিলাম?

ঘাড় নেড়ে জবাব দিল,—হ্যাঁ। আজও উনি কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন। আমার কথা শেষ। এবার আপনাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে করতে পারেন।

আমি বললাম,—তাহলে আমিই প্রশ্ন করি। কেন না, আগাগোড়া আমিই তো তোর সঙ্গে ছিলাম।

—বেশ, প্রশ্ন কব।

—দেবতনুবাবু মালতিকে খুন করলেন কেন?

—ভয়ে। পাছে ও সেদিন রাত্রে সব কথা বলে দেয়।

—কিন্তু তুই তো সেদিন সকালে বলে এলি, পরের দিন সকালে গিয়ে মালতির সঙ্গে দেখা করবি।

—সেটা আমার একটা চাল। আসলে আমি খুনিকে জানাতে চেয়েছিলাম, মালতি যা জানে, সেটা আমাকে গোপনে বলতে চায়। আর রাতের অন্ধকারই সব থেকে গোপনীয় পরিবেশ। দেবতনু যখন জানতে পারলেন, সেদিন রাত একটায় মালতি বাগানের পিছনে যাবে, তখন তিনি আমাকে অন্যভাবে কল্পিত বিপদের কথা পেড়ে ওর সঙ্গে দেখা কবতে দিতে চাইলেন না। আমিও ভান করলাম, অত রাতে দেখা করা সত্যিই আমার পক্ষে অনুচিত। তাই পরের দিন আসব, এই কথাটা ওঁকেই বলে

দিতে বললাম। আমি জানি, খুনি এ সুযোগ কখনোই ছাড়বে না। আমাকে আসতে বারণ করল বটে, কিন্তু মালতিকে কিছুই বলল না। ঠিকই করে নিল মালতিকে সেই রাতেই খুন করবে।

আমার দুর্ভাগ্য, মালতিকে বাঁচাতে পারলাম না। তবে এ একদিকে ভালই হল। বেঁচে থাকলে ওকে পুলিসের হাতেই যেতে হোত।

—কেন? ও কি সত্যিই এই খুনের সঙ্গে ইনভলভড্ ছিল?

—না। ঠিক ইনভলভড্ না। তবে খুনিকে সাহায্য করার অপরাধে শাস্তি পেত।

—ও কিভাবে সাহায্য করেছিল?

—দেবতনুর পাপড়ির ঘরে যাওয়া নিষেধ ছিল। রামতনুবাবুর কড়া নিষেধ ছিল, উনি কখনোই কোন কারণে তিনতলায় আসবেন না। তাই মালতিকে দেবতনু হাত করেছিলেন অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে। মালতির টাকার নেশা চিরদিনের। কোনদিনই ও বিশ-পঁচিশের বেশি টাকা একসঙ্গে হাতে পায় নি। বিয়ে করেও না। দেবতনু সামান্য একটা কাজের জন্যে পাঁচ হাজার টাকার লোভ দেখিয়েছিলেন। টাকার অঙ্ক শুনেই ওর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। কিন্তু বুঝতে পারেনি, পাঁচ হাজার টাকা দেবার ক্ষমতা দেবতনুর নেই।

—কিন্তু সাহায্যটা কি?

—বলছি। প্রথম যেদিন পাপড়ির ঘরে গিয়েছিলাম সেদিন অ্যাকোয়ারিয়ামটা দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম। অ্যাকোয়ারিয়ামের গাছগুলো ঘাঁটা ছিল। কিছু জলে ভাসছিল। কেন? এই কথাটা ভাবতে গিয়ে আমার হঠাৎই মনে হল ওখানে কি কেউ কোন কিছু লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে? এমন কোন জিনিস যা অত্যন্ত দামি, অথচ লুকিয়ে রাখার একটা প্রকৃষ্ট জায়গা। তাই যদি হবে তাহলে কি সে মূল্যবান বস্তু? পাপড়ির ঘরে একা বসে একদিন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল চাবির কথাটা। তবে কি চাবিটা ওখানেই। হ্যাঁ, চাবিটা ওখানেই রাখা হয়েছিল। অবশ্য খুনের পরদিন সে চাবি চলে যায় রামতনুবাবুর কাছে। সুদাম বাগানে কুড়িয়ে পায়। এখন সে চাবি পুলিসের জিম্মায়। চাবির ফুটোয় কিছু বালি পাওয়া গিয়েছিল, প্রমাণ হিসেবে। আসলে মালতি এক সময় চাবির গোছাটা সরিয়ে ফেলে অ্যাকোয়ারিয়ামের বালির মধ্যে লুকিয়ে রাখে। বিয়ের দিন পাপড়ি চাবিটা ভালো করে খুঁজে দেখার সময় পায়নি। বাবার কাছ থেকে ডুপ্লিকেট চাবি এনে তাই দিয়ে সেদিনের মত কাজ চালিয়েছিল। মালতির চাবি সরানোর একটা উদ্দেশ্য, দেবতনুকে বাথরুমের দরজা খুলে দেবার জন্য। কারণ সোজা রাস্তায় পাপড়ির ঘরে দেবতনুর যাবার হুকুম ছিল না। অথচ ঘরে ঢুকতে হবে। এবং পাপড়িকে খুন করতে হবে। তাই মালতিকে হাত না করে কোন উপায় ছিল না। মালতি সেদিন ঠিক সন্ধের আগেই অ্যাকোয়ারিয়ামের বালির মধ্যে লুকিয়ে রাখা চাবি বার করে বাথরুমের দরজাটা খুলে চাবির গোছা বাগানে ফেলে দেয়। এবং ইশারায় ডুমুরগাছের তলায় অপেক্ষমাণ দেবতনুকে কাজ হাসিল হওয়ার কথা জানিয়ে দেয়। তবে সে জানতো না দেবতনু পাপড়িকে খুন করতে চাইছে। সে ভেবেছিল, হয়তো দেবতনু কিছু টাকাকড়ি বা গয়নাগাটি সরাবে পাপড়ির দেরাজ ভেঙে।

—কিন্তু দেবতনুবাবু এইভাবে খুন করলেন কেন? এত পরিশ্রম ও রিস্ক্ নিয়ে। ভেইনে বাব্‌ল ঠিকমত না গেলে পাপড়ির মৃত্যু নাও হতে পারত।

—ওটা নিজের ওপর ওভার কনফিডেন্স বলা যায়। দেবতনু নিজে ডাক্তারি পড়েছিলেন। তিনি জানতেন, ঐভাবে একজনের মৃত্যু ঘটানো যায়। এবং খুনটা হবে খুব রেয়ার। সহসা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। দ্বিতীয়ত, খুনের অস্ত্র সর্বদাই তাঁর কাছে থাকত। কারণ তিনি ছিলেন মরফিন অ্যাডিকটেড। নিজেই নিজের ইনজেকশন নিতেন। ইনজেকশনে ওনার হাত পাকা। হাতের কাছে যার খুনের অস্ত্র রেডিমেড থাকে, সে স্বভাবতই সেই অস্ত্র আগে ব্যবহার করতে চাইবে।

—ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বলে আবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সিগারেটের প্যাকেটের রহস্যটা ক্লিয়ার হল না। ওটার ব্যাপার কী?

—ওটা ডাক্তারকে ঝোলানোর তাল। দেবতনুবাবু ধারণা করেছিলেন, এই ধরনের মার্ডারের কথা

সাধারণত কেউ ভাববে না। কিন্তু অপরাধীর মন অনেক কিছু সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে। যদি কেউ খুনটা ধরেও ফেলে, তাহলে সব থেকে সুবিধা হবে দোষটা অন্য কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে কার ঘাড়ে চাপানো যায়? দেবতনুবাবু জানতেন, খুনের প্রক্রিয়া বিচার করার টেন্‌ডিন্সি পুলিসের আছে। খুনের ধরণ দেখে সহজেই অনুমান করবে, এটা কোন ডাক্তার বা কম্পাউন্ডারের কাজ হতে পারে। এখন এই পরিবেশে কোন্ ডাক্তার সব থেকে ক্লোজে আছে? ডাক্তার অরিন্দম বাসু। দেবতনুবাবু নিজে চারমিনার খেতেন। সেদিন কিনলেন রয়্যাল সাইজের ফিল্টার উইল্‌স্। যেটা ডাক্তারের নিজস্ব ব্র্যান্ড। দুটো সিগারেট গোটাটাই খেলেন। তৃতীয় সিগারেটটা অর্ধেক খেয়ে ফেলে দিলেন। যাতে ব্র্যান্ডের নাম শেষ পর্যন্ত পুড়ে না যায়। প্রমাণ আরো নিশ্চিত করার জন্যে ডাক্তারের বিশেষ হ্যাবিটের নমুনাটাও সঙ্গে রেখে দিলেন। কাটা রাংতা সমেত প্যাকেটটা ফেলে দিয়ে এলেন, যাতে পুলিসের নজরে এলে, ডাক্তারকেই প্রথম সন্দেহ করে। আর এর সঙ্গে একটা পুরনো রাগের ব্যাপারও জড়িয়ে ছিল। ডাক্তার ওনার মরফিন পারমিটের যোগানদার হননি বলে।

এ ছাড়াও ডাক্তারের দিকে পুরোপুরি সন্দেহটা চালান করার জন্যে আমার কাছে বানিয়ে পাপড়িকে নিয়ে একটা কল্পিত কাহিনী বলে গেলেন। যাতে করে আমি সন্দেহ করতে পারি, প্রেমের ঈর্ষার জন্যেই ডাক্তার এ খুন করেছিল। তাই তো ডাক্তার বাসু? আমি ঠিক বলছি তো?

ডাক্তার মৃদু হেসে বললেন,—আমি আর কি বলব বলুন? আপনি না হয়ে অন্য কেউ হলে হয়ত এতদিনে আমি শ্রীঘরে।

—নীল, তোকে আর একটা প্রশ্ন করব, আচ্ছা, মালতি তোর কাছে সারেন্ডার করল কেন? ও কি তোর প্রেমে পড়ে গিয়েছিল?

—দূর, প্রেম-ট্রেম সব বাজে কথা। এ ধরনের মেয়েরা সাধারণত প্রেম-ট্রেমের গভীরতা বোঝে না। ওর কাছে টাকাটাই সব থেকে বড়। খানিকটা ভয়ে এবং আশাহত হওয়ার জ্বালায় আমার কাছে কনফেস করেছিল। ওর ভয় হয়েছিল, হয়ত পুলিস একদিন সব টের পাবে। আর যখন দেখল, দেবতনুর কাছ থেকে পয়সাকড়ি পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই, তখন বাধ্য হয়েই আমার কাছে সারেন্ডার করল। অবশ্য বিনিময়ে আমাকে শ'তিনেক টাকা বলতে পারিস মালতিকে ঘুষ দিতে হয়েছিল। টাকাপয়সার লোভ না দেখালে মালতিকে কাবু করা যেত না।

—খিড়কির দরজা কে খুলে দিয়েছিল? সুদাম?

—সুদাম নয়। ও বোকা কালা এবং চোখে কম দেখার ভান করে থাকত কারণ রামতনুবাবুর সেই রকমই নির্দেশ ছিল। অতনু দেবতনুর ঘটনাটা আন্দাজ করেছিল লোকটা। তবে এসব ব্যাপারে ও কিছুই জানত না। হয় সেদিন খিড়কির দরজা দেওয়া হয়নি, নয়ত মালতিই এক সময় খুলে দিয়েছিল।

হঠাৎ সত্যেনদা একটা প্রশ্ন করলেন,—তুমি কি করে ডেফিনিট হলে, দেবতনুবাবু আর সুরঞ্জনবাবু একই লোক?

ড্রয়ার থেকে দুটো ছবি এনে সবাইকে দেখালো নীল। তারপর বলল,—এই দুটো ছবি দেখলেই বুঝতে পারবেন। এই পুরনো লালচে ছবিটা পেয়েছি অনিন্দিতাদেবীর কাছ থেকে। মাত্র একটা কপিই ছিল ওনার কাছে। আর এটা তো সেদিনের বাগানে তোলা নিকন এফ্ টু ক্যামেরায় ধরা মার্ডার করা অবস্থায় তোলা। অবশ্য মার্ডার করা ছবিটা থেকে বুঝতে অসুবিধা হলেও, চেহারা যতই খারাপ হয়ে যাক, একটু খুঁটিয়ে দেখলেই সবাই বুঝতে পারবেন অতীতের সুরঞ্জন মিত্র আর বর্তমানের দেবতনু লাহা একই লোক। অনিন্দিতাদেবীও আইডেনটিফাই করেছেন। ব্যস, নিশ্চয়ই আর কারো কিছু জানবার নেই।

আমি বললাম,—আছে।

—এখনও আছে? কি বল্?

—মালতি চাবিটা বাগানে ফেলে দিয়েছিল কি দেবতনুর জন্যেই।

—হ্যাঁ। কিন্তু চাবি তো দেবতনুর উদ্দেশ্য না। ওইভাবে মালতিকে বোঝানো হয়েছিল, যে চাবিটা

পেলে উনি পাপড়ির আলমারি থেকে কিছু টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করবেন। আসলে দেবতনু নিজেব উদ্দেশ্য মিটিয়ে নেবার পব বাথরুম থেকে বেরিয়ে সোজা ছাদে চলে গিয়েছিলেন। তারপর একসময সবার অলক্ষ্যে ভিড়ের মধ্যে মিশে যান।

—তবে যে মালতি বলল, ছাদ থেকে সে সুতনুকে নামতে দেখেছিল?

—দেখে থাকতে পারে। সেটা তো খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। আরও কি প্রশ্ন আছে?

—তুই তো জানতেই পেবেছিলি, কে খুনি, তাহলে সেদিন সবার কাছে, আই মিন, সুতনু আর ডাক্তাব বাসুব কাছে একই প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলি কেন?

—খুব ভালো প্রশ্ন। দেবতনুবাবুর বিরুদ্ধেব সব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ওঁকে হাতেনাতে ধরা বা কোন বকমে ওঁকে দিয়ে কনফেস করানো ছাড়া অন্য কোনভাবেই প্রমাণ করানো যেত না যে পাপড়িকে উনি হত্যা কবেছেন। নট ইভ্‌ন্ দ্যা ফিঙ্গাব প্রিন্ট। তা ছাড়াও মোটিভেব দিক থেকে আবো দুজন অর্থাৎ সুতনু বা ডাক্তার বাসু ফেলনা নন। আমি তো আর ভগবান নই। আমার মনেও কিছু সন্দেহ ছিল। কোথাও ভুল কবছি না তো? তাই টোপটা তিন জায়গায় ফেলেছিলাম। সত্যিকাবের যে খুনি, একমাত্র সে-ই সেদিন বাত্রে আসবে, তাব শেষ শত্রুকে খতম করতে। অন্য দুজন আসবেই না। আব ঘটনা তো তাই ঘটল। আব এক বাউন্ড চা হবে নাকি?

সমস্বরে সবাই বললাম,—হয়ে যাক।

নীল বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিলাম,—নীল, তোর আব একটা প্রেডিকশন কিন্তু মিলে গেছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বলল,—তোর ভুবনবাবু কেন একটা মোরগ কিনেছেন? এই তো? সে তো আমি আগেই বলে দিয়েছি।

নীল আব দাঁড়াল না। গট্‌গট করে বেরিয়ে গেল।

যশোদা আশ্রমের হত্যাকাণ্ড

যুবনাশ্ব সেনের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয় ট্রেনে। উনি আমাদের সঙ্গে একই কামরায় ফিরছিলেন লখনউ থেকে। ভদ্রলোকের নামটা আমাদেব শোনা ছিল। ব্যাপক জনখ্যাতি না থাকলেও ধ্রুপ-দাঙ্গেব গানে ওঁব নামযশ মোটামুটি বিদগ্ধজনের পরিচিত। গানটানের ব্যাপারে আমার অরুচি না থাকলেও বিশেষ আগ্রহের তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু আমার বন্ধু নীল, মানে শখের গোয়েন্দা নীলাঞ্জন ব্যানার্জিব প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দিকে ঝোঁক প্রবল। নিজে ও তেমন গাইতে পারে না। কিন্তু ওব মতো বসিক শ্রোতা পাওয়া শিল্পীর পক্ষে সৌভাগ্য। মনে রাখার মতো কোন গান একবার শুনলে সে কণ্ঠস্বব ও কোনদিনও ভুলে যায় না। গায়ক যতই অখ্যাত হোক, নীলের কাছে মর্মস্পর্শী হলে সে কণ্ঠ ওব মনের টেপবেকর্ডারে চিরদিনের মতো ধরা হয়ে থাকে।

যুবনাশ্ব সেনও নীলের কাছে আত্মগোপন করে থাকতে পারলেন না। প্রথম শ্রেণীর কামরায় আমরা ফিবছিলাম। উনি ছিলেন আমাদের সামনেই। এর আগে আমি কোনদিনও ওঁকে চাক্ষুষ দেখিনি। নীলও না। হঠাৎ গুনগুন করে একটা সুব ভেসে এল। নীল এতক্ষণ সায়ান্স ফিকশনে তন্ময় হয়ে ছিল। গানের আওযাজে ও চকিতে সামনের সিটে বসা ভদ্রলোকের দিকে তাকালো। ভ্রূ কুঁচকে দু'তিন মিনিট কি যেন চিন্তা কবল। তাবপর আমাকে কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে বলল,—কি গাইছে বলতো?

আগেই বলেছি আমি অত গানেব সমঝদার নই। ঠোঁট উল্টে বললাম, —কে জানে।

—এই সহজ সুবটা ধরতে পাবলি না। মালকোষ।

—হুঁ,বলে একটু আগে যে গল্পের প্লটটা ভাবছিলাম তারই মধ্যে ডুব দেবার চেষ্টা করলাম। প্রায় মিনিট দশেক পব ভদ্রলোক ওঁর গুনগুনানি থামিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। সিগারেটের নেশা বড় সংক্রামক। নীলও একটা সিগাবেট ঠোঁটে চেপে বলল,—এক্স্‌কিউজ মি, আপনার দেশলাইটা যদি,

আমাব একটু আশ্চর্য লাগল। নিজের পকেটে ব্রনিকা থাকা সত্ত্বেও অপরিচিত একজনের কাছে আগুন ভিক্ষে কবছে!

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, বলে ভদ্রলোক ওর দেশলাইটা এগিয়ে দিলেন।

আগুন জ্বালিয়ে দেশলাইটা ফেরত দিতে দিতে নীল বলল, —আপনি মালকোষের ওপর আলাপ কবছিলেন, না?

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন,—ঐ আব কি!

—আপনাব গলার সঙ্গে বড় আশ্চর্য রকমের মিল আছে আর একজনের গলার।

—কাব বলুন তো?

—যুবনাশ্ব সেন বলে এক বাঙালি গায়কের।

—আশ্চর্য! বলে ভদ্রলোক এবাব অনেকখানি বিস্ময় নিয়ে নীলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—আমাব ভুল হতে পারে, নীল ওর সিগারেটে টান দিয়ে বলল, যুবনাশ্ব সেনের গান শুনলে আমাব মত আপনারও তাই মনে হতো।

—আশ্চর্য।

—এই নিয়ে আপনি দুবার আশ্চর্য বললেন। আমি কি কিছু ভুল বলেছি?

—আশ্চর্য হবার মতো কথা বলছেন বলেই বলছি। যুবনাশ্ব সেনকে আপনি চেনেন?

—নাহ্, চিনব কোত্থেকে? ভদ্রলোককে কোনদিন চোখেই দেখিনি।

—না দেখা এবং না চেনাই স্বাভাবিক। অথচ আপনি তার গলার স্বর মনে রেখে দিয়েছেন। এটা

আশ্চর্যের না?

—বোধহয় না। কারণ আমি যতদুর জানি ভদ্রলোক এ পর্যন্ত একখানি মাত্র রেকর্ড করেছেন। একদিকে আশাবরী অন্যদিকে বেহাগ। গান দুটো আমি শুনেছি।

—কবাব শুনেছেন?

—একবাবই শোনাব সৌভাগ্য হয়েছিল। আমাব পরিচিত এক বেকর্ডেব দোকানে।

—আশ্চর্য।

—তিনবার হলো কিন্তু, বলেই নীল হেসে উঠল। ভদ্রলোকও হাসতে হাসতে বললেন,—আপনি তো মশাই সাংঘাতিক লোক, মাত্র একবাব শুনে একটা গলাব আওযাজ আপনাব মনে থাকে? আশ্চর্য। তাহলে সত্যি কথাটা বলেই ফেলি, এই অধমের নাম যুবনাশ্ব সেন।

এবাব আমি ভদ্রলোককে ভাল কবে না দেখে থাকতে পাবলাম না। গাইয়ে বলে মনেই হয় না। চেহাবায় কোন বৈশিষ্ট্য নেই। শুধু বৈশিষ্ট্য কেন, সাধারণ ভাবে তাঁকে সুশ্রীও বলা যায় না। মাথার সামনের দিকে বেশ খানিকটা টাক। গালে দুএকদিনেব দাড়ি জমেছে। সামান্য চাপা নাক। পুরু ঠোঁট। গায়ের বঙটা কালোর দিকে। তবে পবিধেয বস্ত্রগুলো সচ্ছলতাব আভাস দেয়। বেঁটেখাটো হলেও পুরু লেন্সের চশমাব মধ্য দিয়ে যুবনাশ্বের চোখেব তীক্ষ্ণত্ব ম্লান হযনি। আর হাসিটা প্রাণবন্ত। বৈশিষ্ট্যবিহীন চেহাবার সব ত্রুটি ঢাকা পড়ে যায় চোখেব দ্যুতি আর মুখের হাসিতে। বেশ দামি ব-সিল্কের পাঞ্জাবি এবং একইবঙেব সিল্ক চোস্তায় খুব একটা খাবাপ লাগছিল না। যুবনাশ্ব তখনও বলে চলেছেন,— একজন অখ্যাত অনামী গাযকের মাত্র একখানা রেকর্ডের গান একবাব শুনেই আপনি .., আপনি তো আসল জহুবী মশাই।

—না, না ওসব কিছু না। গানের প্রতি যাদেব ইনটারেস্ট বেশিমাত্রায় থাকে, তাবা একবার শুনেই গায়কেব কণ্ঠস্বব চিনে রাখতে পারে।

—হবেও বা। আমাব ঠিক জানা নেই। তবে আমি খুব সাধাবণ গাইয়ে। বেকর্ডটাও নিজের ইচ্ছেতে করিনি। এক বন্ধুর পীড়াপীড়িতে কবতে বাধ্য হই।

—কিন্তু, নীল দ্বিধাহীনভাবে বলল, আপনার গাযকী খুব ভালো। আপনি আবো রেকর্ড করুন। নাম করবেন, এটা বলতে পারি।

উত্তরে যুবনাশ্ব সহসা কোন জবাব দিলেন না। বেশ কিছুক্ষণ নীবব থাকাব পর বললেন,—যুবনাশ্ব কে ছিল জানেন?

—হ্যাঁ, সূর্যবংশীয় বাজা মান্ধাতার বাবা।

—ভাগ্যেব কি পরিহাস দেখুন, আমাব এই কদাকার চেহাবার সঙ্গে আমাব পিতৃদেব এমন একজনেব নাম জুড়ে দিয়েছেন যে তাব ধাক্কাতেই সর্বদা লজ্জিত হয় থাকি। আসলে আমাকে ওসব মানায় না। গাইযেটাইয়ে হবার স্বপ্নও দেখি না। ভাল লাগে গান গাই। ব্যস ঐ পর্যন্ত। আমাকে দেখে বড়জোর মনে হবে বস্তি অঞ্চলে কোন চাযেব দোকানেব মালিক।

ভদ্রলোকেব দিকে আর একবাব তাকালাম। বুঝলাম ওঁব ব্যথাটা কোথায় চাপা আছে। একটা উত্তর হঠাৎ মনে পড়ে গেল। কিন্তু নীল ঠিক আমাব কথাটাই বলে ফেলল,—কিন্তু যুবনাশ্ববাবু চেহারাটাই সব নয়। আপনি তো আর ফিল্ম আর্টিস্ট হতে যাচ্ছেন না। তাও এখন ফিল্মের ধাবা পাল্টাচ্ছে। আজকাল পরিচালকেবা সুন্দর অভিনেতাকে মেকআপ দিয়ে কুৎসিত করেন না। প্রয়োজনে তাঁরা কুৎসিত চেহারাব অভিনেতাকে খুঁজে নেন। গাইয়েব কণ্ঠস্বরটাই আসল, চেহারায় কি আসে যায়!

হঠাৎ যুবনাশ্ব হো হো করে হেসে উঠলেন,—তারপব বললেন, এবপর নিশ্চয়ই আপনি তুলনা টানবেন? ভ্যানগঘটঘেব নাম কববেন। আপনাব মুখে এসব মানায। রমণীরঞ্জন করার মত চেহারা আপনাব। কিন্তু, যাক সে কথা, এবাব আপনার পরিচয়টা একটু পাওযা যাক। 'আশ্চর্য' শব্দটা তিনবার,

নীল শুধবে দিল, —না, চাববাব

—অ্যাঁ, চারবার? হ্যাঁ হ্যাঁ চারবাবই বলেছিলাম বটে। তবেই দেখুন, এরকম একজন প্রতিভাধর

লোকেব পরিচয়টা পাওয়া দরকার।

তাবপর নীলের পরিচয় পেতেই ভদ্রলোক হাঁই হাঁই করে উঠলেন. —বলুন, ঠিক বলেছি কি না? বতনে বতন চেনে।

—তাহলে নিজেই স্বীকার করছেন, আপনি একটি রত্ন?

আবার সেই বেঁটে মানুষটির উচ্ছ্বসিত হাসি,—না, মিস্টার ব্যানার্জি, আপনার সঙ্গে কথায় পারা কঠিন।

সেই শুরু। সাধারণত ট্রেনের আলাপ বা বন্ধুত্ব ট্রেনেই শেষ হয়ে যায়। বড়জোর, অতি উৎসাহীর ক্ষেত্রে, দু-একবার এ ওর বাড়ি যাতায়াত করেন। তারপর দৈনন্দিন জীবনে ঘটনার চাপে উৎসাহ নিভে যায়। ক্রমশ দেখা সাক্ষাতের শেষ রেশটুকুও শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু যুবনাশ্বের ক্ষেত্রে তা হলো না। উনি রীতিমতো নীলের ভক্ত হয়ে উঠলেন। বোধহয় দুটি কাবণে। নীলের অতিরিক্ত পেশাটি বেশ রোমাঞ্চকর। খুব একটা স্নায়ুদৌর্বল্যঘটিত কারণে না ভুগলে এই বোমাঞ্চকব পেশাটিতে অনেককেই আসক্ত হতে দেখেছি। যুবনাশ্বও হয়েছিলেন। প্রায়ই তিনি এসে নীলের গোয়েন্দা জীবনে দেখা নানান ক্রিমিন্যালদের সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে কৌতূহল নিবৃত্ত কবতেন। আর দ্বিতীয় কারণ ওঁর গানের এমন রসজ্ঞ শ্রোতা পাওয়া। অবসর থাকলে নীলকে উনি গান শোনাতেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে গানের বিশেষ ভক্ত না হলেও বলতে পারি যুবনাশ্ব সত্যিই ভালো গাইয়ে। অন্তত গলাটি বড় মধুর।

এই আসা যাওয়া এবং ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে ভদ্রলোকের অতীত এবং বর্তমান জীবনের অনেক কিছুই আমবা জেনেছিলাম।

বেঁটেখাটো লোকটির আসল বয়েসটা অনুমান করা কঠিন। তার ওপর মাথার চুল একটাও পাকেনি। যেটুকু বযেস বোঝা যায় তা ঐ সামনের অংশের বিরল কেশের জন্যে। ভদ্রলোকের বয়েস পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। অকৃতদার। ভবিষ্যতে আর বিবাহ করবেন এমন কোন বাসনাও নেই। তাঁর এই বয়েস পর্যন্ত অবিবাহিত থাকার আদি এবং অকৃত্রিম কারণ একটাই। যৌবনে এক যুবতীকে ভালবাসেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক সে ভালবাসায় ছেদ পড়ে। তারই সম্ভাব্য পবিণতি তিনি চিরকুমাব। পৈতৃক সূত্রে কিছু টাকাপয়সা পেয়েছিলেন। নেশাভাঙ অথবা অন্য কোন বদঅভ্যেস না থাকায় পিতৃদত্ত অর্থের সুদেই তাঁর জীবিকা নির্বাহ হয়ে থাকে। ফোর্থইয়ার পর্যন্ত ডাক্তারি পড়তে পড়তে খেয়ালবশে পড়াশুনা বাতিল করেন। গানটা পেশা নয়, সামান্য নেশা বলা যায়। ব্যবসা বাণিজ্য অথবা চাকরি, কোনটাই ওঁব ধাতে পোষায় না। সারাজীবন বাউন্ডুলের মতো ঘুরেই বেরিয়েছেন। ইদানীং প্রায় বছর পাঁচেক যাবৎ তিনি একটি বাসস্থানে আটকে গেছেন। বাসস্থানটি একটি আশ্রম। যশোদা আশ্রম। আশ্রমের মালিক সুবর্ণ ঘোষাল যুবনাশ্বের বাল্যবন্ধু। ঘুরতে ঘুবতে একদিন যুবনাশ্ব বন্ধুর আশ্রমে গিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আর বেরিয়ে আসতে পারেননি। ভালবাসাব বন্ধনে সেখানেই তিনি বন্দী।

একদিন হাসতে হাসতে নীলকে উনি বলেছিলেন,—পারলাম না মশাই, পারলাম না। সুবর্ণকে বিমুখ কবতে পারলাম না। ও যখন বলল, এতদিন পর তোকে পেয়েছি, বাউন্ডুলের মতো তোকে আর ভেসে যেতে দিতে পারব না, তোকে এখন থেকে এখানেই থাকতে হবে।

প্রথমটা আমি খুবই আপত্তি করেছিলাম। আপনিই বলুন না মিস্টাব ব্যানার্জি, কারো আশ্রয়ে থাকা কি খুব সম্মানের?

উত্তরে নীল বলেছিলেন, —না তা হয়তো নয়। তবে আশ্রয় বলছেন কেন?

—বলব না? তিনি তাঁর আশ্রমের একটি বাংলো আমার জন্যে ছেড়ে দিলেন, এমনকি খাওয়াটুকুও তাঁব ওখানে গিয়েই প্রতিদিন সারতে হয়।

—এ ব্যবস্থাটা আপনি মেনে নিলেন কেন?

—না নিয়ে কোন উপায় ছিল না। যশোদা, যাব নামে আশ্রম, মানে সুবর্ণর স্ত্রী, আমার কোন ওজব-আপত্তিতে কানই দিল না। তবে, একদিন দেখবেন, পাখি ঠিক ফুড়ুৎ। শেকল কেটে একদিন

ঠিক কাটব।

—হুঁ। তা পুরো আশ্রমের মালিক কি আপনার বন্ধুই?

—হ্যাঁ, অবশ্য আশ্রম অর্থে যা বোঝায় এ ঠিক তা নয়। বেশ কয়েক বিঘে জমি নিয়ে গ্রামের প্রান্তে একটি নিরিবিলি বসতি। প্রায় পঁয়ত্রিশটি পরিবার ঐ আশ্রমের বাসিন্দা। আশ্রমের সব কথা বলতে গেলে এক ইতিহাস। পরে একদিন বলব। কিন্তু শহর থেকে একটু দূরে, এমন শান্ত নির্জনতা আপনি চট করে পাবেন না। আর আমিও ঐ মায়ায় জড়িয়ে পড়লাম। চলুন না একদিন আমাদের আশ্রমে, ভাল লাগবে, আমি গ্যারান্টি দিতে পারি। আর কিছু না হোক সবুজ গাছপালা দেখলেও আপনার দিন কেটে যাবে।

যশোদা আশ্রমের সবুজ শান্ত পরিবেশ আর নির্জন কলুষহীন জীবনের অনেক গল্পই যুবনাশ্ব আমাদের কাছে করতেন, আর বারবার ওঁদের ওখানে বেড়িয়ে আসার আমন্ত্রণ জানাতেন। নীল বা আমি অনেকবারই যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। কিন্তু এক বিশেষ সঙ্কোচের কারণে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যুবনাশ্ব ওখানকার আশ্রিত। আশ্রিতের আমন্ত্রণে মালিকের বাড়ি গিয়ে ওঠা নীল ঠিক মন থেকে মেনে নিতে পারেনি বলেই এতদিন যাওয়া হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের যেতে হল। সেই অনিবার্য আকর্ষণ। যে আকর্ষণ নীলের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যশোদা আশ্রমের বাসিন্দা, রামলোচন আহিরের রহস্যময় মৃত্যু দিয়ে যার শুরু।

এক রবিবারের দুপুরে যুবনাশ্ব নিয়মমত আমাদের আড্ডায় এসেছিলেন। আড্ডা বলতে আমার আর নীলের সঙ্গ। এমনিতে ভদ্রলোক প্রাণোচ্ছল। সর্বদাই গুনগুন করা গানের সুর নিয়ে বিভোর। উনি পাশে এসে বসলেই মনে হবে একটা ভ্রমর গুঞ্জন করতে করতে এসে বসল। সেদিন কিন্তু ঠিক উল্টোটাই ঘটল। নীলের ছোট্ট ঝুলবারান্দার একটা বেতের চেয়ারে গিয়ে ঝুপ্ করে বসে পড়লেন। ভদ্রলোককে সেদিন ভীষণ অন্যমনস্ক মনে হলো। চশমার ভিতর থেকে ভাসা ভাসা দৃষ্টি যেন কোথায় হারিয়ে গিয়ে এক অন্যতর গভীর চিন্তায় ডুব দিয়েছে। নীল আর আমি একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। কিন্তু ওর দূরমনস্ক ভাবটা আমরা নিজে থেকে ভেঙে দিলাম না। জানি, এক সময় উনি নিজেই মুখ খুলবেন। এবং খুললেনও।

—কোথাও শান্তি নেই, না নীলাঞ্জনবাবু?

নীল সিগারেট টানতে টানতে ওঁর দিকে একবার তাকাল। তারপর অলস ভঙ্গিতে বলল, —হঠাৎ একথা কেন বলছেন?

—পৃথিবীতে সব সুখের মধ্যেই একটু না একটু অসুখের ছোঁয়া যেন থাকতে হবে। তাই না?

দার্শনিকের মতো নীল বলল, —জগতের এইতো নিয়ম। কিন্তু আপনার হোলটা কি?

—বেশ ছিলাম জানেন, ছন্নছাড়া জীবনের মধ্যভাগে এসে, মনে হয়েছিল যশোদা আশ্রমেই বুঝি জগতের সব সুখ লুকিয়ে আছে। কিন্তু তা থাকে না। থাকতে বুঝি পারে না।

এবার আমি কিছু না বলে থাকতে পারলাম না,—আশ্রমে খারাপ কিছু ঘটনা ঘটেছে নাকি?

চট্ করে এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উনি দু-তিন মিনিট চুপ করে বসে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন,—একটা মৃত্যু। অবশ্য মৃত্যুর গতি পৃথিবীর সর্বত্র, তা নিয়ে আমার কোন বক্তব্য নেই। কিন্তু সেই মৃত্যু যদি স্বাভাবিক না হয়?

নীলই জিজ্ঞাসা করল,—আপনার এ কথার অর্থ?

—একটা জলজ্যান্ত লোক, বলা নেই কওয়া নেই দুম করে মরে গেল!

—কিন্তু সেটা তো অস্বাভাবিক নয়। এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে।

—হ্যাঁ, ঘটে। কিন্তু মনের থেকে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না যে রামলোচনের মৃত্যুটা স্বাভাবিক। আমি ঠিক আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না মিস্টার ব্যানার্জি, কিন্তু কোথায় যেন একটা খট্‌কা,

—কিসের খটকা? আপনি কী কিছু সন্দেহ করছেন?

—আমার কেবলই মনে হচ্ছে লোকটাকে কেউ মেরে ফেলেছে।

—মেরে ফেলেছে? মানে খুন?

—জোর করে কেউ কাউকে মেরে ফেললে সে তো খুনই হয়। আগে হলে হয়তো এসব নিয়ে কিছুই ভাবতাম না। কিন্তু ইদানীং আপনার সঙ্গে থেকে থেকে

ওঁকে বাধা দিয়ে নীল বলল,—আমাকে সব খুলে বলুন। রামলোচন কে? তাব মৃত্যু কি ভাবে ঘটল? তাহলে আপনার সন্দেহের কারণটা বোঝা যাবে।

বেতের চেয়ারের ওপর পা মুড়ে বেশ গুছিয়ে বসলেন যুবনাশ্ব। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন,—বামলোচন কে, এ প্রশ্নের জবাব দেবার আগে একটু অতীতের কথা বলে নেওয়া ভাল। কলকাতা থেকে মাইল সত্তর দুরে যশোদা আশ্রম। আগেই বলেছি আশ্রম বলতে যা বোঝায় এ ঠিক তা নয়। কয়েক বিঘা ঘেরা জমির মধ্যে কয়েক ঘর লোক একসঙ্গে বাস করে। এর মালিক সুবর্ণ ঘোষাল। আমার কলেজ জীবনের বন্ধু বলতে পাবেন। আমার একমাত্র সুহৃদ। স্ত্রীর নামেই আশ্রমের নাম বাখেন যশোদা আশ্রম।

সুবর্ণর এই আশ্রম করার পিছনে একটি কাবণ আছে। সুবর্ণ অত্যন্ত ধর্মভীরু লোক। ওর মুখেই শোনা, ওর বাবা হারাধন ঘোষালের যৌবনের কোন এক দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত নাকি ওব এই আশ্রম গড়ে তোলার মুল কাবণ।

নীল জিজ্ঞাসা করল, —দুষ্কর্মটা কী?

—ঠিক বলতে পারব না, তবে শুনেছিলাম হারাধনবাবু স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় বার বিবাহ কবেন, তাঁরই এক বিধবা বন্ধুপত্নীকে। সেই মহিলার নাকি একটি পাঁচ বছরের সন্তানও ছিল।

—তা এতে অন্যায়েব কী হলো? চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছর আগে বহু লোকেই দুটো বিয়ে করতো।

—অন্যায় সেখানে নয়, সুবর্ণর মতে অন্যায়টা অন্য জাযগায। বিয়েব পরই নাকি সেই স্ত্রী রহস্যজনক ভাবে আগুনে পুড়ে মারা যান এবং তার শিশুসন্তানটি নিরুদ্দেশ হয়ে যায। আর কেউই তার কোন খবর পায়নি। অ্যাকচুয়ালি যশোদা আশ্রমের এই জমিটা কেনা হয়েছিল হারাধন বাবুর দ্বিতীয়া স্ত্রীর জন্যে। ভোগ তাঁরা করতে পারেননি। তাই মৃতা সেই মহিলার আত্মার তৃপ্তি সাধনেই এই আশ্রম।

—বুঝলাম। তারপর?

—বাবার মৃত্যুর পর সুবর্ণ বিরাট পাঁচিল দিয়ে সমস্ত জমিটাকে ঘিরে, বনজঙ্গল সাফ করে তৈবি কবল যশোদা আশ্রম। যে বাসিন্দাদের নিয়ে ও আশ্রম সাজালো এককথায তারা সবাই দরিদ্র এবং ওর আশ্রিত।

—কিন্তু সবাই যদি দরিদ্র এবং আশ্রিত হয় তাহলে তাদেব ভরণ-পোষণও কি আপনার বন্ধুর দাযিত্ব?

—সেটা একটা নিয়মে চলে। ওখানে প্রত্যেককেই কিছু না কিছু কাজ করতে হয। একটা বিরাট পোলট্রি আছে। কযেকজনের ওপর সেটা দেখাশুনোব ভার রয়েছে। আছে একটা হর্টিকালচার। সেটা নিয়ে কেউ কেউ ব্যস্ত। এছাড়া আছে পুকুর, ক্ষেতের ফসল। আসলে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কাজ করে। উৎপন্ন ফসল বা মাছ বা হাঁস মুরগি সবই বাজারে বিক্রি হয়। লভ্যাংশ থাকে সুবর্ণর হাতে। বিনিময়ে সে দেয় তাদের ভরণপোষণ এবং থাকার বাসস্থান।

নীল মৃদু হেসে বলল,—বাহ্, সুবর্ণবাবু তো পাকা ব্যবসাদার!

—না, না ক্রুড় অর্থে তাই মনে হলেও, ও খুব সজ্জন লোক। যৎসামান্য কাজেব বিনিময়ে এতগুলো লোকের দায়িত্ব নেওযা কি চাট্টিখানি কথা?

—আপনি তো দরিদ্র নন। আপনি থাকেন কেন? আপনার কাজটা কি?

একটু চুপ করে থেকে যুবনাশ্ব বললেন,—আমার কোন কাজই নেই। ওখানে একটা লাইব্রেরি আছে। দুবেলা বই পড়ে আর সঙ্গীতচর্চা করে কেটে যায়। আমি উড়ো পাখিব মত এসে জুটেছি, সংসার বন্ধন আমার কোনদিন ভালো লাগেনি। ডাক্তারি পড়তে পডতে শেষ না করেই বোহেমিযানের মতো

বেরিয়ে পড়েছিলাম। পনের বছর পর ঘুরতে ঘুরতে যখন ওর আশ্রমে এলাম তখন ও বিয়ে থা করে সংসারী। আমাকে যেতে দিল না। আর ওর চমৎকার আশ্রমটা দেখে ভালোও লাগলো। থেকে গেলাম।

যুবনাশ্ব ক্রমশ অন্য কথায় চলে যাচ্ছেন দেখে আমি বললাম,—রামলোচন কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে।

চটকা ভেঙে যুবনাশ্ব বললেন,—ওহ্ তাইতো। রামলোচনের কথাতেই আসা যাক। রামলোচনের বাবা ছিল সুবর্ণর বাবা হারাধনবাবুর নিজস্ব দারোয়ান কাম ভৃত্য। খাস-ভৃত্যও বলা যায়। ওর বাবার মৃত্যুর সময় রামলোচন দেশেই থাকত। আহির পদবিতেই বোঝা যায় ওরা গরু-মোষের কারবারি। এ ছাড়াও কিছু ক্ষেত-খামারও ছিল। দু তিন বছর পরপর খবার প্রকোপে পড়ে ও প্রায় দৈন্যদশায় পড়ে। শেষমেশ দেশ ছেড়ে এসে একদিন গিয়ে ওঠে যশোদা আশ্রমে। নিজের পরিচয় এবং দুরবস্থা জানিয়ে একটা চাকরি প্রার্থনা করে সুবর্ণর কাছে। সুবর্ণ ওকে আশ্রয় দেয়। আশ্রমের গরু মোষ সামলাবার দায়িত্ব ছিল রামলোচনের ওপর।

যুবনাশ্বকে বাধা দিয়ে নীল জিজ্ঞাসা করল,—রামলোচনের মৃত্যু আপনার অস্বাভাবিক বলে কেন মনে হচ্ছে? ডাক্তারি রিপোর্ট কী?

ডাক্তার শিবতোষ বাঁড়ুজ্যে হচ্ছেন আমাদের আশ্রমেরই ডাক্তার। তাঁর রিপোর্ট অনুযায়ী রামলোচনের মৃত্যু ঘটেছে করোনারি অ্যাটাকে।

—তাহলে আপনি এটাকে হত্যা বলে সন্দেহ করছেন কেন?

—রামলোচনের চরিত্রে একটা বড় দুর্বলতা ছিল ওর অত্যধিক নেশা। গাঁজা এবং সিদ্ধি, দুটোই সমান তালে চলত। যার ফলে গবাদি পশুর দেখাশুনো ঠিকমত করতে পারত না। এই নেশা এবং কর্মে গাফিলতির ব্যাপার নিয়ে প্রায়শই সুবর্ণর সঙ্গে ওর খিটিরমিটির লেগেই থাকত। সুবর্ণ এসব মনেপ্রাণে ঘৃণা করত। বিশেষ করে কাজে গাফিলতি। মৃত্যুর আগের দিন সন্ধেবেলা সুবর্ণর সঙ্গে ওর বেশ জোর বচসা হয়।

—প্রভু-ভৃত্যে বচসা?

—হ্যাঁ বচসাই। সুবর্ণ ওকে সাফ জানিয়ে দেয় পরবর্তী কালে ওকে কাজে ফাঁকি দিতে অথবা নেশাসক্ত অবস্থায় দেখলে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দেবে। তার উত্তরে রামলোচনও সুবর্ণকে অনেক কটু কথা শোনায়।

—কটু কথা মানে?

রামলোচন বলে,—এটা নেশা নয়। এ শিউজিকা পরসাদ। আর তার ধর্ম নিয়ে বিশেষ ঝামেলা পাকালে সেও সুবর্ণকে ছেড়ে দেবে না। দরকার পড়লে সেও সুবর্ণর সব নোংরা কথা ফাঁস করে দেবে।

—নোংরা কথা? সুবর্ণবাবুর? সে রকম কি কিছু আপনার জানা আছে?

—না। সুবর্ণ বেশ ভদ্র এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের। তার জীবনে কোন কলঙ্ক আছে বলে আমার জানা নেই।

—তার উত্তরে সুবর্ণবাবু কি বলেছিলেন?

—স্বল্পভাষী এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ সুবর্ণের চরিত্রে অজস্র গুণের মধ্যে একটা ইগো সর্বদা কাজ করে যায়। সে নিজেকে অত্যন্ত ধার্মিক মনে করে এবং তার প্রতি ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহ আছে এমন একটা বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করে। যার ফলে তাকে একটা কথা প্রায়ই বলতে শোনা যায়, কোনো লোক যদি ওকে হেনস্থা করে তাহলে স্বয়ং ঈশ্বর তার হয়ে সেই অপরাধীকে শাস্তি দেন। আর সব থেকে আশ্চর্যের কি জানেন, অতীতে দু-একটা ঘটনা ওর ধারণার সত্যতা প্রমাণ করেছে।

—কি রকম?

—একবার সনাতন নামে আশ্রমের একটি লোক তার সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে কিছু সন্দেহ প্রকাশ করে, এবং সুবর্ণর চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষ করে। ঠিক সেই রাত্রেই লোকটির ঘরে অসাবধানে আগুন লেগে যায়। তাতে সনাতন সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়ে মারা যায়। এরপরেও আর একটি ঘটনা ঘটেছিল, মাধব বলে

অল্পবয়েসী এক মালিকে চুরির দায়ে ধরা হয়। সে নাকি সুবর্ণর অজান্তে, বাগানের অধিকাংশ ফলমুল বাজারে বিক্রি করে দিত। কথাটা সুবর্ণর কানে যেতেই সে মাধবকে সামান্য তিরস্কার করে এবং বলে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে মাধবকে আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু মাধব, অল্পবয়েসী উঠতি ছেলে। উল্টে সে সুবর্ণকেই শাসায়। তার বক্তব্য, সুবর্ণ নাকি জোর করে তাদের দিয়ে খাটায়। সমস্ত লাভের টাকা নিজের ঘরে তোলে তাদের ঠকিয়ে। এ একধরনেব দাসপ্রথা। সমাজ পাল্টাচ্ছে। সামান্য থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে এখানকার সমস্ত লোককে দিনের পর দিন সুবর্ণ শোষণ করে চলেছে। তাদেব নাকি আরো অনেক বেশি পাওয়া উচিত। এটা চলতে দেওয়া উচিত না। ভবিষ্যতে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করলে সুবর্ণকে তারা ছেড়ে দেবে না, ইত্যাদি।

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, —এতো দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষা বলুন?

স্মিত হেসে যুবনাশ্ব বললেন,—বলতে পারেন। আবার যুগধর্মকেও অস্বীকাব করতে পারেন কি অজেয়বাবু? মাধবের দাবিটা খুব একটা অমূলক বোধহয় ছিল না। একদিকে বিচার করলে ঘটনাটা তাই। সামন্ততান্ত্রিক জুলুম। সামান্য থাকা খাওয়ার বিনিময়ে শ্রম কেনা। এও এক ধবনের শোষণ। তবে মাধব আর বেশিদূর এগোতে পারেনি। দিনতিনেক পর দেখা যায় আশ্রমের একটা কুয়োব মধ্যে মাধবের লাশ ভাসছে।

নীল কোন কথা বলছিল না। সে একমনে সব শুনে যাচ্ছিল। আমিই বললাম, —কুয়োর মধ্যে লাশ? তা এ নিয়ে কোন পুলিসি তদন্ত হয়নি?

—না, হয়নি। সবাই বলল মাধব নাকি মদের ঝোঁকে কুয়োয় পড়ে যায়। তাছাড়া ওখানে কেউই পুলিসি ঝামেলায় যেতে চাইল না। গ্রামের ব্যাপার। ডাক্তাব সার্টিফিকেট দিয়ে দিল। লাশ পোড়ানো হয়ে গেল।

এবার নীলের প্রশ্ন,—ভারি মজাব ব্যাপার তো? তা মাধবেব মৃত্যু নিয়ে আপনার বন্ধু, আই মিন, সুবর্ণবাবু কিছু বলেননি?

—কি আর বলবে? দুঃখ পেয়েছিলো। যতই হোক মাধব ওর আশ্রিত। সন্তানতুল্য।

—মাধবের সঙ্গে সুবর্ণবাবুর কোন্ সম্পর্কে যোগাযোগ?

—মাধবের মা সরলা সুবর্ণর ঘরের কাজকর্ম, বান্নাবান্না এইসব করে।

—আশ্রমের সব লোকই এরকম নেশাটেশা কবে নাকি?

—সবাই না করলেও কেউ কেউ কবে।

—অথচ তাতে মালিকের একান্তই অনীহা।

যুবনাশ্বের মিষ্টি হাসিটা আবার দেখা গেল। হাসতে হাসতেই বললেন, —বাবা মা তো ছেলেমেয়ের অনেক কিছুই পছন্দ করেন না। তা ছেলেমেয়েরা কি সব সময় মা বাবার বাধ্য হয়?

—হুঁ, বলে অনেকক্ষণ বেশ গম্ভীর হয়ে নীল কিছু চিন্তা করল তারপর বলল, ঠিক আছে রামলোচন সম্বন্ধে বলুন।

—আগের দুটো ব্যাপার ছেড়ে দিলেও, রামলোচনের মৃত্যুটা আমার ঠিক স্বাভাবিক মনে হয়নি। সনাতন মদ খেতো। তার ঘরে অসাবধানে আগুন লেগে যেতে পারে। শুনেছি মাধবও মদ খেতো। নেশার ঝোঁকে সে কুয়োর মধ্যে পা পিছলে পড়ে যেতে পাবে। রামলোচনও সারাদিন গরু-মোষ সামলে রাত্রে ঘরে ফিরে শিউজীর পুজো করে গাঁজা বা সিদ্ধি খেতো। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম সে সেদিন একটু বেশি করেই নেশা করেছিল। কিন্তু যতো অপ্রকৃতিস্থই সে হোক না কেন, মৃত্যুর পর তাব সারা মুখে খড় বিচুলি আর ভুষি লেগে থাকবে কেন?

নীল চকিতে যুবনাশ্বের দিকে তাকিয়ে বলল, —আপনার এ কথার অর্থ?

—ভোর বেলায় সবার চিৎকারে আমি যখন রামলোচনের ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম, দেখলাম ওর মৃতদেহটা চিত হয়ে পড়ে আছে। চোখে মুখে একটা অস্বাভাবিক যন্ত্রণার ছাপ। আব ওব মাথার শুকনো চুলে, গোঁফে এবং মুখের নানা জায়গায় শুকিয়ে যাওয়া খড় ভুষি আটকে আছে।

—শুকিয়ে যাওয়া খড়ভুষি?

—হ্যাঁ। ছোট ছোট খড়ের টুকরো আর ভুষির দানা।

—তা সেটা খুব একটা অস্বাভাবিক নাও হতে পারে। খড় ভুষি তো গরু মোষের খাবার। হয়তো ও পশুগুলোব জন্যে খাবার ঠিক করছিল, সেই সময়,

—না মিস্টাব ব্যানার্জি, গরু মোষের জাবনা তৈরি করতে গেলে হাত দিয়ে করতে হবে। মুখ আব মাথা দিয়ে নিশ্চয়ই নয়। আমার মনে খটকা লাগায় আমি ওর হাত পা ভালো করে লক্ষ্য কবেছিলাম। হাতে বা পায়ে কোন খড় বা ভুষির চিহ্নই ছিল না।

—ওব মৃত্যুটা কিভাবে হতে পারে এ সম্বন্ধে আপনি কোন কিছু ধারণা করেছেন?

—না। আপনি হলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন। আমার বিদ্যে বুদ্ধি খুবই অল্প।

—এছাড়া আর কোন অস্বাভাবিক কিছু আপনাব চোখে পড়েছে?

—সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত রামলোচনের ঘবে হারিকেন জ্বলতে দেখেছি।

—নেভাতে হয়তো ভুলে গিয়েছিল।

—তাহলে তো পবের দিন সকাল পর্যন্ত সেটা জ্বলতো।

—তেল ফুবিয়ে যেতেও পাবে। আচ্ছা যুবনাশ্ববাবু, আপনি সেদিন কত রাত পর্যন্ত জেগেছিলেন?

—সাধারণত আমি একটার আগে শুই না। কাবণ গানটান গাইতে বসলে আমার সময়ের হিসেব থাকে না।

—সেদিন আপনি কটাব সময় শুতে যান?

—ঠিক ঘড়ি দেখিনি। তবে বাত দুটো তো হবেই।

—ঐ সময়ে আব কোন অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছিল কি?

—শুতে যাবার আগে সাধাবণত আমি চোখে মুখে জল দিয়ে শুই। আমার ঘরেব দাওয়ায় বালতিতে জল ভবা থাকে। সেদিনও চোখেমুখে জল দিচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হলো কে যেন রামলোচনের ঘব থেকে চুপিসাড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

—স্পষ্ট দেখেছিলেন?

—তাই তো মনে হলো।

—লোকটাকে চিনতে পেবেছিলেন?

—নাহ্! যা অন্ধকাব! আমার কেবল ছায়ামূর্তিটাই নজরে এসেছিল।

—আপনাব কি মনে হয় বামলোচনকে কেউ হত্যা করেছে?

—কি করে বলব? তবে সব মিলিয়ে ব্যাপাবটা অস্বাভাবিক এবং রহস্যময়।

—কোন পোস্টমর্টেম হয়েছে?

—কোথায় আব হল? ডাক্তাব দেখে বললেন হার্ট দুর্বল ছিল। প্রথম স্ট্রোকেই গেছে। ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন। বডি পুড়িয়ে ফেলা হল।

এ ব্যাপাবে সুবর্ণবাবুব মতামত কি?

সুবর্ণ কেমন যেন বোবা হয়ে গেছে। অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে তিন তিনটে মৃত্যু। ও বেশ খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে।

—আপনাব কাউকে সন্দেহ হয়?

—যে তিনজন মাবা গেছে প্রায় সবারই অপঘাতে নয়তো হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে। অযথা আমি কাউকে সন্দেহ কবতে যাব কেন? তবে বামলোচনের মৃত্যুটা আমার কাছে অ্যাবনরম্যাল লেগেছে বলেই আপনাকে বললাম।

—বুঝলাম। কিন্তু এ ব্যাপাবে আমাব তো কিছু কবার নেই।

—ঠিকই। তবে আপনি একবাব গেলে ভালোই হতো। বথ দেখা কলা বেচা, মন্দ কি? তাছাড়া আপনাব চোখে নিশ্চয়ই আবো বেশি কিছু দেখা দিত।

—কি লাভ? উপযাচক হয়ে নাক গলানোর?

—আমি কিছু জোর করছি না। আর কে এক রামলোচনের মৃত্যু নিয়ে মালিকের বিনা আমন্ত্রণে আপনি যাবেনই বা কেন? তবে আপনাকে বলা এই কারণে, এ লাইনে আপনার ইনটারেস্ট রয়েছে। হয়তো দেখা গেল কেঁচো খুঁজতে খুঁজতে সাপের হদিশ পেয়ে গেলেন।

—যুবনাশ্ববাবু, এ ব্যাপারে আমাকে একটু ভাবতে দিন। সত্যিই আমার নাম গলানোর কোন প্রয়োজন আছে কিনা সেটাও তো চিন্তা করতে হবে।

—সে তো নিশ্চয়ই, তাহলে আজ আমি উঠি।

যুবনাশ্ববাবু চলে গেলেন। নীল কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে বলল, —এটা কেমন করে হয়?

আমি বললাম, —কি বলছিস তুই? কী কেমন করে হয়?

—যুবনাশ্ববাবুর একটা কথার সঙ্গে যে একটা অঙ্ক মিলছে না।

—কি কথার সঙ্গে কি অঙ্ক মিলছে না?

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হঠাৎ নীল গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসতে বসতে বলল, —দূর ছাই, আমার অত মাথা ঘামাবার কি দরকার? চল, আজ দুপুরে একটা ছবি দেখে আসি। বহুদিন কোন ভালো ফিল্ম দেখা হয়নি।

যুবনাশ্ববাবু সেই যে গেলেন, তারপর প্রায় মাসখানেক নিপাত্তা। হঠাৎ একদিনে সকালের কাগজ দেখে চমকে উঠলাম, "যশোদা আশ্রমে নৃশংস খুন।" কলকাতা থেকে প্রায় সত্তর মাইল দূরে রায়পুর গ্রামের শেষ প্রান্তে যশোদা আশ্রমের অধিবাসী জনৈক কৃপাসিন্ধু দাস অদৃশ্য আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। মৃতের বয়েস আনুমানিক পঞ্চান্ন। এই ঘটনায় বাসিন্দাদের মধ্যে বেশ ত্রাসের সঞ্চার হয়। পুলিশি তদন্ত চলছে।

খবরটা পড়ে নীলের দিকে এগিয়ে দিতে ও বলল খবরটা ওর আগেই পড়া হয়ে গেছে। কিন্তু খবরটা যে ওর মনে কোনরকম প্রতিক্রিয়া এনেছে এমন কিছু নজরে পড়ল না। তখন বাধ্য হয়েই জিজ্ঞাসা করতে হল, —কি ব্যাপার বলত?

ঔদাসীন্য বজায় রেখেই নীল বলল, —কিসের কি ব্যাপার?

—যশোদা আশ্রম তোর মনে কিছু রিঅ্যাক্ট করছে না?

—কেন, রিঅ্যাক্ট করার কি আছে? খুন জখম কি গ্রামে বা শহরে আজকাল কোন নতুন ঘটনা?

—না তা নয়। তবে যশোদা আশ্রম বলেই বলছি। কিছুদিন আগেই ওখানে পরপর কয়েকটা কথা শেষ করতে না দিয়েই নীল বলল,—কয়েকটা কি? খুন?

—খুনের কথা তো বলিনি। বলছিলাম রহস্যজনক মৃত্যু।

—সেটা কে বলছে? যুবনাশ্ব সেন? কিন্তু সেটা তো যুবনাশ্বের ব্যক্তিগত ধারণা। সেগুলোকে খুন বা রহস্যজনক বলে বেড়ানোর কোন যুক্তি নেই।

—আর আজকের কাগজের এই ঘটনা?

—তাতে তোর আমার মাথা ঘামানোর কি প্রয়োজন?

—ভূতের মুখে রামনামের মত শোনাচ্ছে কিন্তু।

—হতে পারে। বলে ও সিগারেট ধরিয়ে জানলার বাইরে মুখ করে বসে রইল। শীত চলে গেছে। আস্তে আস্তে গরম পড়তে শুরু করেছে। কলকাতা শহরে বসন্ত কালটা টেরই পাওয়া যায় না। গাছের ডালে ডালে নতুন পাতা গজাতে শুরু করেছে। আর মাঝে মাঝে কখনও-সখনও দু-একটা নাছোড়বান্দা কোকিল স্থান কাল ভুলে ডেকে উঠে জানিয়ে দেয় বসন্তকাল বলে কিছু একটা আছে। নীলের বর্তমান হাবভাব ঠিক বুঝতে পারছি না। রহস্যের সামান্য গন্ধ পেলে যে লোক নাওয়া খাওয়া ভুলে যায় তার আজ হঠাৎ এ কি দুর্মতি। রহস্যের প্রতি ওর হঠাৎ এত অনীহা কেন তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ওকে ঐ ব্যাপারেই কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম এমন সময় দীনু, মানে

নীলের বহুদিনের পুরনো ভৃত্য ওর চিরপরিচিত ভঙ্গিতে 'যেন'-র মুদ্রাদোষ সমেত দু পেয়ালা চা হাতে ঘরে ঢুকল, —দাদাবাবু, দুজন ভদ্দরলোক নিচে তোমাকে যেন ডাকতেছেন।

—দুজন ভদ্রলোক? কে?

—তা যেন আমি কি করে বলব? তবে যেন একজন এ বাড়িতে আগে অনেক দিনই আসতো।

—কে, যুবনাশ্ববাবু?

—তা যেন হবে।

—ঠিক আছে, নিচে বসা। আমি আসছি।

দীনু চলে গেল। আমি আর নীল মুখ চাওয়া চাওযি করলাম। তারপর বললাম, —কি রে, যশোদা আশ্রমের ব্যাপার নয় তো?

—হতে পারে। সঙ্গে যখন যুবনাশ্ব হাজির। চ, দেখি।

বৈঠকখানায় গিয়ে দেখি এক অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে যুবনাশ্ব নিম্নস্বরে কি যেন কথা বলছেন। আমরা যেতেই যুবনাশ্ব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রতা করলেন। নীল মৃদু হেসে সামনের সোফায় বসতে বসতে বলল, —না হয় এক মাস পর এ বাড়িতে এলেন। তা উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রতা করতে হবে?

যুবনাশ্বের হাসিটা খুবই মিষ্টি আগেই বলেছি। মিষ্টি করে হেসেই উনি বললেন, —না ঠিক তা নয়। তবে,

—তবে, যদি, কিন্তু, এগুলো বাদ দিয়ে এখন যশোদা আশ্রমের সমাচার বলুন। আমার মনে হয় আজ সেই জন্যেই আপনার আগমন।

—আপনি ঠিকই ধরেছেন। নিশ্চযই কাগজে সব পড়েছেন?

—কাগজ যতটুকু খবর দিয়েছে ততটুকু পড়েছি।

—তা বটে, তবে এবার যে সাহেবকে একেবারে পাকড়াও করে নিয়ে যেতে এসেছি। আর তো না বললে চলবে না। আপনিই বলুন না, অবস্থাটা কি দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে না?

—কেন?

—এখনও আপনি কেন বলছেন? সনাতন বা মাধবের কথা ছেড়েই দিলাম। ওগুলো অ্যাকসিডেন্ট। রামলোচন, সেটাও নাকি অ্যাকসিডেন্ট। কিন্তু একমাত্র আমিই বলেছিলাম রামলোচনের মৃত্যুটা অস্বাভাবিক। সেটা তখন কেউ শুনল না। তারপর এক মাস যেতে না যেতেই, এবার তো আর অ্যাকসিডেন্ট বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

—আচ্ছা আচ্ছা, সে সব শোনা যাচ্ছে, কিন্তু ইনি? এঁকে তো ঠিক,

—ওকে আর আপনি চিনবেন কি করে? ও আমাদের সুবর্ণর দূর সম্পর্কের ভাই। নীহার মুখার্জি। প্রফেসর। আমাদের যশোদা আশ্রমের বলতে পারেন স্থায়ী বাসিন্দা। আমার মতো উড়ো পাখি নয়।

নীহারবাবুর সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করে নীল বলল, —আপনি অধ্যাপক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে খুব নামকরা কোন কলেজে পড়াই না। বারুপুরের কাছে একটা ছোটখাটো কলেজে আছি।

নীলের সঙ্গী হয়ে থাকতে থাকতে আমার একটা অভ্যেস বেশ পাকাপোক্ত ভাবে পেয়ে বসেছে। যে কোন নতুন মানুষকে আগাগোড়া খুঁটিয়ে দেখা। ভদ্রলোকের চেহারাটির সঙ্গে পেশার খুবই মিল। ব্যাকব্রাশ করা চুল। এখন সামান্য এলোমেলো। গায়ের রঙটা মোটামুটি ফরসাই বলা যায়। তীক্ষ্ণ নাক। দৃঢ় চিবুক। বয়েস চল্লিশের মধ্যে। চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা। চশমার নিচে উদাস চাহনি। আধময়লা গেরুয়া পাঞ্জাবি আর পাজামা। একটা শান্তিনিকেতনের কাজ করা কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ। নীহারবাবু তখনও বলে চলেছেন,—আপনার অনেক কথাই যুবনাশ্ববাবুর কাছে শুনেছি। আপনার সঙ্গে আলাপ করারও ইচ্ছে অনেকদিনের। এবার কিন্তু শুধু আলাপ নয় একেবারে পাকড়াও করে নিয়ে যেতে এসেছি।

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু যাঁর সব থেকে বেশি চিন্তার ব্যাপার, এবং মাথাব্যথা তিনি তো আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন না।

উত্তরে নীহারবাবু বললেন,—আপনি সুবর্ণদার কথা বলছেন? উনিই আসতেন। কিন্তু বিশেষ একটা জরুরি কাজে ওকে ওঁর অফিসে যেতে হয়েছে। তাই আসতে পারলেন না। কিন্তু বারবার অনুরোধ করেছেন আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে। সঙ্গে একটা চিঠিও দিয়ে দিয়েছেন। পড়ে দেখুন।

নীহারবাবুর বুকপকেট থেকে একটা চিঠি বার করে দিলেন। নীল চিঠিটা পড়ে আমাকে এগিয়ে দিল। সরাসরি আমন্ত্রণ। চিঠির বক্তব্য আশ্রমের লোকের ধারণা কৃপাসিন্ধুর মৃত্যু নাকি খুন। এবং এই খুনকে কেন্দ্র করে যশোদা আশ্রমের শান্ত জীবন অশান্ত হয়ে উঠেছে। তাই সুবর্ণবাবু চান এই রহস্যের কিনারা হোক। পুলিসের থেকে গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জির ওপর উনি বেশি ভরসা করেন। এর জন্যে ন্যায্য পারিশ্রমিক দিতে সুবর্ণবাবু কোন রকম কার্পণ্য করবেন না, ইত্যাদি। চিঠিটা পড়া শেষ করে নীলের দিকে তাকালাম। দেখি ও গম্ভীর মুখে কি যেন ভাবছে। এবার যুবনাশ্ববাবু বললেন, —অ্যাতো কি ভাবছেন মশাই? কতো বড় বড় কেস আপনি জীবনে সল্‌ভ্‌ করলেন। আর এ তো অত্যন্ত সামান্য ব্যাপার,

এ ধরনের কথায় নীল বোধহয় বিরক্তই হলো, বলল,—আপনি কি করে বুঝলেন মশাই, যে কেসটা খুব সাধারণ?

যুবনাশ্ব বললেন, —আমাদের কাছে ধাঁধা হলেও আপনার কাছে কিছুই নয়।

—ওভাবে বলবেন না। ওটা ঠিক সায়েনটিফিক কথা নয়।

এই সময় হঠাৎ নীহারবাবু পকেট থেকে কয়েকটা একশো টাকার নোট বার করে বললেন, —কিছু মনে করবেন না ব্যানার্জি সাহেব, আপনাকে অপমান বা ছোট করার জন্যে নয়। আজকাল সব কাজের মধ্যেই একটা অ্যাডভান্স বলে ব্যাপার এসে গেছে। সুবর্ণদা এটুকু আপনাকে গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

নীল কিন্তু টাকাটা ছুঁলো না। বলল, —ওটা আপাতত থাক। আগে আমি যশোদা আশ্রম এবং আপনাদের কৃপাসিন্ধু সম্বন্ধে ভালো করে সব জানি, তারপর, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই অ্যাডভান্স নেব। আপাতত আমার কয়েকটা প্রশ্নের যে জবাব দিতে হবে।

—বেশ তো বলুন, নীহারবাবুই বললেন, আমাদের জানা থাকলে নিশ্চয়ই বলব।

—আশ্রমের ইতিহাস যুবনাশ্ববাবুর কাছে মোটামুটি শুনেছি। বাকিটা গিয়ে শুনব। এখন বলুন, কৃপাসিন্ধু দাস অর্থাৎ যিনি নিহত হয়েছেন তিনি কে? তাঁর সঙ্গে আশ্রমের সম্পর্ক কি?

—কৃপাসিন্ধু বাবু আমাদের ওখানকার ওভারঅল কেয়ারটেকার কাম হিসাব রক্ষক।

—কিসের হিসেব?

—আশ্রমের আয়-ব্যয়ের।

—উনি ওখানে কতদিন আছেন?

—তা বছর পাঁচেক তো হবেই।

—সুবর্ণবাবুর সঙ্গে ওনার কোন রিলেশান আছে নাকি?

—তেমন কিছু না। আগে উনি ঘোষাল ইন্ডাস্ট্রির শহুরে অফিসে কাজ করতেন। তারপর সুবর্ণদাই ওকে আশ্রমে নিয়ে যায়।

—ইন্ডাস্ট্রির অফিসে কি কাজ করতেন?

—ওখানে ছিলেন ক্যাশিয়ার।

—ব্যাপারটা একটু খট্‌কা লাগছে।

—কেন? এতে খট্‌কা লাগার কি আছে?

—শহরের ইন্ডাস্ট্রি অফিস থেকে কাজ ছাড়িয়ে শহরতলির এক আশ্রমে সামান্য কেয়ার টেকার? উনি কি রিটায়ার করেছিলেন?

—আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন মিস্টার ব্যানার্জি। কৃপাসিন্ধু বাবুকে ওখানে নিয়ে যাবার পিছনে একটা কারণ আছে। ঘোষাল ইন্ড্রাষ্ট্রিব ক্যাশে একবার বেশ মোটারকম টাকার হেরফের হয়ে যায়। কৃপাসিন্ধু বাবু তখন ওখানকাব হেড ক্যাশিয়ার। তছরুপ হওয়া টাকার কোনবকম হিসেব দিতে না পারায় ওঁর চাকরি যায়। তারপর বেশ কিছুদিন বাদে যশোদা বৌদির হাতে পায়ে ধরে পড়েন। শেষকালে যশোদাবৌদিব অনুরোধে সুবর্ণদা ওঁকে আশ্রমের কাজ দেয়।

—কিন্তু আপনি তো বললেন উনি আশ্রমেবও হিসাবরক্ষক ছিলেন।

—হিসেবেব ব্যাপারটা উনি ভালো বুঝতেন। তাই হিসাব বাখাই ওনার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু টাকাপযসাব সঙ্গে ওঁব কোন সম্পর্কই ছিল না।

—বুঝলাম। তা মার্ডারবটা কি ভাবে হয়েছে?

—ওর বাড়িব ঠিক সামনেই গোটা তিনেক তেঁতুলগাছ আছে। একটা তেঁতুলগাছেব তলাতেই উনি মুখ থুবড়ে পড়ে ছিলেন। মাথাব পেছনটা একেবারে থেতলানো। বক্তে চারদিকে ভেসে যাচ্ছিল।

—অর্থাৎ পেছন থেকে কেউ তাঁকে অতর্কিতে আঘাত করেছিল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই বকমই মনে হয়।

—আপনি নিজে বডি দেখেছিলেন?

—হ্যাঁ সবাই দেখেছে। যুবনাশ্ববাবুও দেখেছিলেন। বলুন না যুবনাশ্ববাবু।

যুবনাশ্ববাবু অনেকক্ষণই চুপচাপ বসেছিলেন। ওঁকে বলতে বলায উনি সজোরে মাথা নেড়ে বললেন, —আপনিই বলুন মশাই, আমি অত খুঁটিযে দেখিনি। রক্ত টক্ত দেখলে আমাব শরীব খারাপ লাগে। আমি অ্যাট আ গ্লান্স দেখেই পালিয়ে গিয়েছিলাম।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, নীহারবাবু আপনিই বলুন যতটা জানেন। আঘাতটা কি দিয়ে করা হয়েছিল বলে আপনাব মনে হয়?

—কিছু ভারী জিনিস, যেমন শাবল, অথবা ভাবী পাথব, এই বকম একটা কিছু হতে পাবে।

—ওরকম কোন জিনিস কি কাছাকাছি ছিল? বিশেষ কবে শাবল?

—আমি ঠিক খেযাল কবিনি। তবে লোকাল দাবোগা গোপাল সাহা এ ব্যাপারে ডিটেল্‌স আপনাকে বলতে পাববেন।

—খুনটা কখন হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোন আইডিয়া আছে?

—আজ্ঞে না। তবে গতকাল সকালে কৃপাসিন্ধুবাবুর একমাত্র মেয়ে বমাই ওঁকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার কবে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু কবে দেয়।

—বডি নিশ্চয়ই পোস্টমর্টেমে গেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুনেছি আজ বিকেলেই বডি ছেড়ে দেবে। মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি আর না বলবেন না। এই ভাবে একটা জলজ্যান্ত লোক, দুম কবে খুন হয়ে গেল, তার ওপর ট্রেনে আসতে আসতে যুবনাশ্ববাবু আগের মৃত্যুগুলো সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করছিলেন। সত্যিই যদি এই মৃত্যু বা এর আগের মৃত্যুগুলোব মধ্যে কোন রহস্যজনক যোগাযোগ থাকে তাহলে সেগুলোরও একটা ফয়সল' হওয়া উচিত। আশ্রমেব মালিক ছাড়াও, আমরা মানে আব সব অধিবাসীরাও এটা চাইছি। প্লিজ।

নীহারবাবুব মুখেব দিকে তাকিয়ে দেখলাম। সত্যিই সেখানে একটা মিনতির ছাপ ফুটে উঠেছে। আব যুবনাশ্ববাবু তো মুখিয়েই আছেন। অগত্যা নীল রাজি হয়ে গেল। বলল, —বেশ, সত্যি যদি আপনাবা আমাকে চান আমি যাব। দিন আপনার অ্যাডভান্সের টাকা।

টাকাটা নিয়ে পকেটে পুরতে পুবতে নীল বলল, —একটু তো আপনাদের বসতে হবে।

নীহারবাবু যেন হাতে স্বর্গ পেলেন,—আপনি এখুনি যাবেন?

—নিশ্চয়ই। অকুস্থলকে বেশি পুরনো হতে দিতে নেই। তাহলে অনেক দেখাব জিনিস হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। আব একটা কথা, আমার বন্ধুও সঙ্গে থাকবে কিন্তু। আপত্তি নেই তো?

যুবনাশ্বই উত্তর দিলেন, —আপত্তি মানে, এ তো রাজযোগ মশাই। যান যান আর দেরি করবেন

না, চট করে তৈরি হয়ে আসুন।

পনের মিনিটের মধ্যে দুজনে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম চারজনে।

রায়পুর স্টেশনে যখন নামলাম তখন ঠিক দশটা। চৈত্রের গোড়ায় রোদ এখন বেশ চড়া। স্টেশন রোডের ওধারেই সার সার সাইকেল রিকশা। একটায় আমি আর নীল, অন্যটায় ওঁরা দুজন উঠে বসলেন।

রিকশাওলাদের সবাই যশোদা আশ্রম চেনে। তাই আমাদের নতুন করে কিছু বলতে হলো না। কিছু দূর যাবার পর আমিই প্রথম মুখ খুললাম, —হ্যাঁরে নীল, কি রকম বুঝছিস ব্যাপারটা।

—এখন থেকে কি করে বলব? কিছুই দেখলাম না, কিছুই জানলাম না।

—তবু শুনে কি বুঝলি? মানে কৃপাসিন্ধুর খুনের কোন মোটিভ খুঁজে পাচ্ছিস?

নীল একটু চুপ করে থেকে বলল,—আমার একটা নিজস্ব থিওরি আছে তুই নিশ্চয়ই জানিস?

—হ্যাঁ, সেই এইচ, ডাবলু, ডাবলু মানে, হাউ, হোয়াই অ্যান্ড হু?

—অতএব বৎস, আগে হাউটা উদ্ধার করি তারপর তোমার হোয়াই, মানে মোটিভ। কিন্তু এ'তো দেখছি বেশদূর মনে হচ্ছে। যাচ্ছি তো যাচ্ছি হ্যাঁ ভাই, বলে ও রিকশাওলাকে জিজ্ঞাসা করল, —যশোদা আশ্রম এখনও কতদূর হবে?

—তা আপনার অনেকটা পথ। চারক্রোশ তো বটেই, এরপর রাস্তা আরো খারাপ। যেতে ট্যাম লাগবে বাবু।

সামনে তাকিয়ে দেখি যুবনাশ্বরবাবুদের রিকশাটা বেশ খানিকটা এগিয়ে চলছে। দু পাশে ফাঁকা মাঠ শুরু হয়ে গেছে। চৈত্রের গোড়া, কিন্তু এরি মধ্যে সব হু হু করছে। নীলের দিকে তাকালাম। সেখানে চিন্তার ক্ষীণছায়া। অগত্যা একটা সিগারেট ধরিয়ে রুক্ষ মাঠ, বন বাদাড় দেখতে দেখতে এক সময় এসে পৌঁছলাম যশোদা আশ্রমে। ঘড়িতে তখন পৌনে এগারোটা।

পাঁচিলের সীমানা ডিঙিয়ে যখন ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম, সত্যি বলতে কি অবাক না হয় পারলাম না। মনে হলো কেউ যেন আমাদের হঠাৎ রুক্ষ মরুভূমি থেকে একরাশ সবুজের মধ্যে ফেলে দিল। যেদিকে তাকাই কেবল সবুজ আর সবুজ। চারিদিকে ঘন গাছপালা আর জঙ্গল। কলকাতায় আজকাল আর অ্যাতো সবুজ চোখে পড়ে না। সবুজ রঙে আশ্চর্য নরম জাদু আছে। মন আর চোখে একটা স্নিগ্ধ আবেশ মাখিয়ে দেয়। গ্রীষ্মের শুরুতেই এই। এরপর বর্ষায় না জানি যশোদা আশ্রম কত মনোরম হয়ে উঠবে। রিকশা ছেড়ে দিয়ে আমরা সবুজ ঘাসের জাজিম মাড়িয়ে ভেতর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। নীলের কি মনে হচ্ছিল জানি না কিন্তু আমার কেবলই মনে হচ্ছিল এত সুন্দর সবুজ সবুজ প্রকৃতির মধ্যে থেকেও রক্তের বিভীষিকা দেখতে ভালবাসে এমন পাষণ্ড কে আছে? কৃপাসিন্ধুবাবুকে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ হত্যা করেছে। কিন্তু প্রকৃতির এমন নরম স্নিগ্ধতার মধ্যে মানুষ যে কিভাবে খুনি হতে পারে তা আমার বোধগম্য হয় না।

দুপাশে ঘন গাছাগাছালি রেখে আমরা ক্রমশ ভেতর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল ছবির মতো সুন্দর ছোট ছোট বেশ কয়েকটা কুঁড়েঘর। বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে কমলা রঙের টালির ওপর রোদ পড়ে দেখাচ্ছিল দারুণ।

এতক্ষণ প্রায় নীরবে চারজন হেঁটে চলছিলাম। হঠাৎ যুবনাশ্ব বললেন, —আমরা এসে গেছি। ঐ দেখুন, দূরে ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। আগে কোথায় যাবেন, কৃপাসিন্ধুর বাড়ি না সুবর্ণর ওখানে?

নীল বলল,—কোনটা আগে পড়বে?

—কৃপাসিন্ধুর ঘরটাই আগে পড়বে। কিন্তু, ওকি, ওখানে অত জটলা কিসের? নীহারবাবু, কি ব্যাপার বলুন তো? আবার কিছু ঘটনা ঘটলো নাতো?

আমরা তখন একটা পুকুরের পাশ দিয়ে চলেছি। যুবনাশ্বের কথায় মুখ তুলে দেখি পুকুরের ওপারে সত্যি বেশ একটা বড় জটলা। নীহারবাবু সেইদিকে তাকিয়ে বললেন, —কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে কৃপাসিন্ধুবাবুর বাড়ির সামনেই জটলাটা রয়েছে। আমার মনে হয় ওর বডিটা মর্গ থেকে নিয়ে এসেছে।

চলুন, তাড়াতাড়ি পা চালাই।

নীহারবাবুর ধারণাই ঠিক। বেশ কিছু নানা বয়েসের আবালবৃদ্ধবনিতা মাছির ঝাঁকের মতো একটা জায়গায় গোল হয়ে ঘিরে আছে। আমরা পৌঁছতেই জনতার মধ্যে সামান্য গুঞ্জন উঠল।

একটা খাটিয়ার ওপর কৃপাসিন্ধু নামে এক প্রৌঢ়ের দেহ শয়ান। আপাদমস্তক সাদা চাদরে মোড়া। আঠাশ উনত্রিশ বছরের একটি মেয়েকে দেখলাম মৃতদেহটিকে জড়িয়ে অনুচ্চস্বরে কাঁদছে।

নীল প্রায় ফিসফিস করে নীহাববাবুকে বলল, —এই সীসেব মতো ভাবি জনতা কি একটু হাল্কা করা যাবে না? অ্যাট লিস্ট মুখটা একবাব দেখাব দরকাব ছিল।

—কিন্তু এবা কি যাবে? দেখি একবার চেষ্টা কবে, বলে তিনি জনতার উদ্দেশে বললেন, শোন তোমরা এখানে আর ভিড় কবো না। এঁবা লালবাজার থেকে এসেছেন। বুঝতেই পারছ কেসটা খুনের। তাই এঁদের এখন অনেক কাজ করতে হবে। তোমরা এরকম ভিড করলে এঁদের তো কাজের অসুবিধা হবে।

নীহারবাবুর কথায় কিছু কাজ হলো। জনতা একেবারে সবে না গেলেও একটু দূরে ছড়িযে ছিটিয়ে ছোট খাটো জটলায় ভাগ হয়ে গেল।

হঠাৎ নীল বলল,—দিলেন তো সব বাবোটা বাজিয়ে।

—কেন?

—দুম করে ওদেব বলে বসলেন আমি পুলিসেব লোক। লালবাজাব থেকে আসছি!

—কথাটা মিথ্যে জানি মিস্টার ব্যানার্জি। কিন্তু ঐ সব কথা না বললে ওদেরকে সরানো যেত না।

—আব কি হবে? এক কাজ করুন মৃতদেহেব মুখেব ঢাকনাটা একটু খুলে ফেলুন।

যুবনাশ্ববাবু একটু উসখুস কবে বললেন, —আপনি এখনই মুখের চাদব সবাবেন নাকি?

—কেন, আপনার আপত্তি আছে?

—না, ঠিক তা নেই। তবে আমার পক্ষে আব এখানে থাকা সম্ভব না। কাবণ, ঐ সব রক্তটক্ত দেখলে আমার শরীর খারাপ করে। আপনারা দেখুন, আমি ববং ততক্ষণে সুবর্ণকে খবরটা দিই।

—বেশ তাই করুন। নীহারবাবু আপনারও তেমন কিছু উইকনেস আছে নাকি?

—নাহ্, আপনি আমার সামনেই বডি দেখতে পারেন।

—ঐ মেয়েটি নিশ্চযই

—হ্যাঁ, কৃপাসিন্ধু বাবুরই মেয়ে। ঐ একটিই মেয়ে।

যুবনাশ্ববাবু চলে গেলেন। নীল ধীবে ধীরে মেয়েটির কাছে গিয়ে বেশ কোমল স্বরে বলল, —ভাই আমরা যে একবার ওনার বডিটা দেখব। আমাদেব একটু সাহায্য করবেন না।

কান্নাভেজা চোখ তুলে মেয়েটি একবার তাকাল নীলেব দিকে। তারপর মেয়েটি আর কিছু না বলে একপাশে সরে দাঁড়াল। মেয়েটি যে বুদ্ধিমতী এবং শিক্ষিতা তা ওর হাবভাবে বোঝা যায়। নীল নিজেই এগিয়ে গিয়ে মৃতের মুখেব ঢাকনা সরালো। আধবোজা চোখ। দুটো চোখই কালচে লাল। সারা মুখে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের কালো কালো ছোপ। দাঁতগুলো সব বেবিয়ে পড়েছে। স্কালটা ওপ্‌ন্ করা হয়েছিল। এলোপাথাড়ি সেলাই করে বাখা হযেছে। কানের লতি বেযে রক্তের শুকনো ধারা। এই সময় পাশ থেকে নীহারবাবু বললেন,—আঘাতটা মাথার পিছনেই বেশি। জায়গাটা একদম থেঁতলানো।

—হুঁ, বলে নীল আরো মিনিট দুয়েক মুখটা দেখে চাপা দিযে দিল। তারপব নীহাববাবুকে জিজ্ঞাসা করল,—ঠিক কোনখানে বডিটা পাওয়া গিয়েছিল?

অদূরে কয়েকটা তেঁতুলগাছ দেখিয়ে দিয়ে বললেন,—ঠিক ওই জায়গাটায়।

নীল বলল,—মৃতের আপাতত আর কিছু দেখার নেই। আচ্ছা নাকটা ওভাবে ছড়ে গেল কেন?

—মাটিতে মুখ থুবড়ানো অবস্থায় ওঁকে পাওয়া গিয়েছিল। আমার মনে হয় সজোরে আঘাত খাবার ফলেই উনি মাটিতে ছিটকে পড়েন। তাই হয়তো?

—ঠিক আছে, আপনি শবদাহের ব্যবস্থা করতে বলুন। বলেই ও তেঁতুলগাছগুলোর নিচে চলে গেল। জায়গাটাকে অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। কিন্তু হত্যার কোন হাতিয়ার নজরে পড়ল না। এমনকি আশে পাশে তেমন কোন ভারি পাথরও দেখা গেল না। এদিক ওদিকে কোন বিশেষ পায়ের ছাপও নেই। না থাকারই কথা। কারণ দু একদিনের মধ্যে বৃষ্টি হয়নি। হঠাৎ আমাদের তিনজনেরই নজরে এল নিকটবর্তী সবুজ ঝোপের পাশে একপাটি চটি। শুঁড় গোটানো চটি। নীল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নীহারবাবুর দিকে তাকালো। নীহারবাবু বুঝতে পেরে বললেন,—খুব সম্ভবত ওটা কৃপাসিন্ধুবাবুরই চটি।

—পুলিস কি এটা দেখেনি?

—তা বলতে পারব না। তবে বড় বড় ঘাস আর ঝোপের আড়ালে ছিল বলে হয়তো তাদেরও নজর এড়িয়ে গেছে।

—চটিটা যে কৃপাসিন্ধুবাবুরই তাতে বোধহয় আপনার কোন সন্দেহ নেই। তাই না নীহারবাবু?

—আমি না বলতে পারলেও, ওর মেয়ে নিশ্চয়ই বলতে পারবে। ওকে কি একবার ডাকব?

—নাহ্, থাক। তবে একটা জিনিস আপনি খোঁজ নিন, এখানে ওই ধরনের শুঁড় গোটানো বিদ্যাসাগরী চটি কে কে পরেন?

—বিশেষভাবে খোঁজ নেবার তেমন কিছু নেই। কৃপাসিন্ধু ছাড়াও আর একজন ঐ ধরনের চটি পরেন।

—কে তিনি?

—যশোদা আশ্রমের মালিক সুবর্ণ ঘোষাল।

নীল ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকালো। তারপর বলল,—এঁরা দুজন ছাড়া আর কেউ, মনে করে দেখুন, আর কেউ?

—নাহ্, আমি আর কারো পায়ে দেখিনি।

—যুবনাশ্ববাবু কি গোঁফ রাখেন? ফস্ করে নীল একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন করল, চট করে বলুন?

—অ্যাঁ, মানে, গোঁফ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন, একটু আগেই তো উনি আপনার সঙ্গে ছিলেন।

—ইয়ে, মানে, রাখেন বোধহয়।

—বোধহয়? অর্থাৎ সঠিক বলতে পারছেন না। তেমনি এত ডেফিনিট হয়ে কি করে বলছেন এখানে আর কারো পায়ে আপনি ঐ ধরনের বিদ্যাসাগরী চটি দেখেননি?

নীহারবাবু বোকা বনে চুপ করে গেলেন। নীল আবহাওয়া পাল্টে বলল, —চলুন, এখানে এক্ষুনি আর কোন কাজ নেই। পরে আসা যাবে। ওদের বলুন লাশ নিয়ে যেতে।

—এখন নিশ্চয়ই সুবর্ণবাবুর ওখানে যাবেন?

—নিশ্চয়ই, যাঁর আমন্ত্রণে এখানে আসা, তাঁর ওখানেই তো আগে যাওয়া উচিত ছিল। চলুন।

যশোদা আশ্রমের আর পাঁচটা বাড়ির থেকে সুবর্ণ ঘোষালের বাড়ি নিঃসন্দেহে বেশ আধুনিক এবং সাজানো গোছানো। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। মডার্ন বাংলো টাইপের একতলা বাড়ি। কিন্তু ছাদ আছে। বারান্দাগুলো সুন্দর গ্রীল দিয়ে সাজানো। আমরা ঢুকতেই দেখি প্রশস্ত বারান্দায় একটি ইজি চেয়ারে বিরস বদনে বসে আছেন সৌম্য দর্শন এক পুরুষ। বয়েস যুবনাশ্বের কাছাকাছিই হবে। লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ চেহারা। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। রগের দুপাশে জুলপিসমেত চুলগুলি চকচকে সাদা। ব্যাকব্রাশ করা চুল। চোখে সরু সোনালি ফ্রেমের চশমা। সাদা কেমব্রিকের পাঞ্জাবি এবং পাজামা। এবং খুব স্বাভাবিক কারণেই আমার ভদ্রলোকের পায়ের দিকে নজর পৌঁছল। হ্যাঁ, তাঁর পায়ে শুঁড় গোটানো বিদ্যাসাগরী লাল চটি। আমাদের দেখেই উনি উঠে বসলেন। নীহারবাবুই আলাপ করিয়ে দিলেন,—সুবর্ণদা, ইনিই নীলাঞ্জন ব্যানার্জি। আর ইনি অজেয় বসু। ওঁর বন্ধু।

—আসুন, আসুন মিস্টার ব্যানার্জি, আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম। বসুন।

সামনেই আরো দুটো বেতের চেয়ার ছিল। আমরা দুজনেই বসলাম। হঠাৎ নীহারবাবুর দিকে তাকিয়ে সুবর্ণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—কৃপাকে কি ওরা নিয়ে গেল?

—না। এবার যাবে।

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উনি বললেন, —আর মিছিমিছি দেবি করে কি হবে? তাড়া দিয়ে ওদের বেরিয়ে পড়তে বল। যুবনাশ্ব গেল কোথায়?

—এখানেই তো আসাব কথা।

—আফটার অল ওরই সাজেশানেই তো মিস্টাব ব্যানার্জিকে ডাকা। দেখতে পেলেই পাঠিয়ে দিও। আর শ্যামাপদকে বল, এঁদেব চা জলখাবারেব ব্যবস্থা করতে।

নীহার চলে গেলেন। ওব গমন পথেব দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সুবর্ণবাবু বললেন,—আপনি নিশ্চয়ই এখানকাব সব কথা শুনেছেন?

—হ্যাঁ, নীল বলল, যুবনাশ্ববাবুর মুখে আমি কিছু কিছু শুনেছি বটে!

—অনেক আশা করে শহর ছেড়ে গ্রামের একেবারে প্রান্তে এই আশ্রমটা তৈরি করেছিলুম। শহরের সব কলুষতা থেকে দূরে থাকব বলে। কিন্তু কি যে সব ছাইপাঁশ হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না। কৃপাসিন্ধু যে হঠাৎ এভাবে মরে যাবে বুঝতে পারিনি।

এতক্ষণ নীল সুবর্ণ ঘোষালকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। হঠাৎ সুবর্ণবাবুর কথাব মধ্যেই প্রশ্ন করল, —কৃপাসিন্ধুবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

—সবাই তো বলছে ওকে নাকি খুন করা হয়েছে। কাগজও তাই লিখেছে। কিন্তু আমি এখনও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না।

—কেন?

—এই কেনটাই তো আমাব চিন্তায় ফেলেছে। কৃপাসিন্ধুর মত ওরকম একজন নিরীহ লোককে, বলা নেই, কওয়া নেই খুন? নাহ্, আমার বিশ্বাস হয় না।

—আপনার অবিশ্বাসের হেতু?

—আপনি গোয়েন্দা মানুষ, এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, যে কোন খুনের পেছনে একটা কারণ থাকবে।

—নিশ্চয়ই। মোটিভ ছাড়া খুনি কেনই বা রিস্ক্ নেবে, এত বড় অপরাধের?

—কিন্তু কৃপাসিন্ধুর কি ছিল বলুন? না আছে তার অর্থ, না আছে তার কোন শত্রু।

—তার শত্রু নেই এটা আপনি জানলেন কি ভাবে?

—আরে মশাই, শত্রুটা জিনিসটা এমনই, তার জন্যে মিনিমাম একটা যোগ্যতা থাকা দরকার। কৃপাসিন্ধু যে কারো শত্রু হতে পারে এটা আমার চিন্তার অতীত।

নীল অকারণ তর্কে গেল না। কারণ এই টপিকস্-এর ওপর ও অন্তত আধঘণ্টা ওর অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে তর্ক চালাতে পারতো। কে কখন কেমন করে একজনের শত্রু হতে পাবে সে সম্বন্ধে নীলের থেকে বেশি নিশ্চয়ই সুবর্ণবাবু জানেন না। নীল প্রসঙ্গ পাল্টাল, বলল, —তাহলে কি আপনি বলেন স্বাভাবিক কারণেই কৃপাসিন্ধুবাবুর মৃত্যু হয়েছে?

—না, তাও বলছি না। মৃত্যুটা অপঘাতেই হয়েছে।

—যেমন?

—আপনার জানা নেই, ও ছিল হার্টের পেশেন্ট। একবার স্ট্রোকও হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর— বলেই হঠাৎ সুবর্ণবাবু চুপ করে গেলেন।

নীল একটু সময় দিয়ে বলল,—থামলেন কেন মিস্টার ঘোষাল? কি তার ওপর?

—কথাটা বলতে আমার খুবই খারাপ লাগছে। এ যেন দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির মত ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ আমি তো এর জন্য দায়ী নই।

—আপনি যদি একটু খুলে বলেন তাহলে আমার পক্ষে বোঝা সুবিধের হতো।

—লোকে বিশ্বাস করবে না। করতে পারে না। কিন্তু আমি দেখেছি, প্রতি ক্ষেত্রেই আমার জীবনে এই ঘটনা ঘটেছে। জানি না ভবিষ্যতে কী হবে।

—মিস্টার ঘোষাল!

—হ্যাঁ, বলছি। ছোটবেলা থেকে আমি লক্ষ্য করেছি, কেউ যদি অকারণে আমার মনে আঘাত দেয়, আমাকে গালি-গালাজ করে, অথবা আমাকে অপমানিত করে, তাব ফল আখেরে ভালো হয় না। ছোটবেলায় একবার আমার বাবা, আমার অজান্তেই আমার মনে আঘাত দিয়েছিলেন। তারপরই একটা বিবাট দুর্ঘটনায় তাঁর জীবনে দুর্বিপাক নেমে এসেছিল। কলেজ লাইফেও আমার এক বন্ধু একবার আমাকে সামান্য কাবণে অপমান কবেছিল একঘর লোকের সামনে। আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না ব্যানার্জি সাহেব, ঠিক তার তিনদিনের দিন আমার সেই বন্ধুটি ট্রেনে কাটা পড়ে। পারতপক্ষে তাই আমি মানুষেব সঙ্গে দ্বন্দ্বকলহ এড়িয়ে চলি। চেষ্টা করি মানুষের সঙ্গে যথাসাধ্য সৌহার্দ্য বজায় রাখতে। মানুষের ভালো করতে। আমার এই আশ্রম তৈরি করাব উদ্দেশ্যও তাই। এখানে সবাই আমার আশ্রিত। সামান্য পবিচয়েব সূত্র নিয়েও কোন মানুষ আমার কাছে হাত পাতলে তাকে ফিরিয়ে দিই নি। ভেবেছিলুম এতেই আমার সব সুখ। এতেই আমাব শান্তি খুঁজে পাব। কিন্তু কি হল? কি হচ্ছে?

কথা বলতে বলতে সুবর্ণবাবু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। নীল ওঁর অন্যমনস্কতা ভাঙালো,—আচ্ছা, মিস্টাব ঘোষাল, আমি যশোদা আশ্রমে ঘটে যাওয়া আবো কয়েকটা অপঘাত মৃত্যুব কথা শুনেছিলাম। সেগুলো কি সব সত্যি?

—হ্যাঁ ব্যানার্জি সাহেব। আমি সেই কথাই বলতে চাইছি। সনাতন, আমার এখানে সামান্য কাজকর্ম কবতো। লোকটা এমনিতে বেশ ভালোই ছিল। কিন্তু ওব বদরোগ ছিল নেশাভাঙ করার। এসব আমি একদম সহ্য করতে পারি না। একদিন অবস্থা এমন চবমে তুলল, বাধ্য হয়ে ওকে কিছু কটু কথাও বলতে হয়েছিল। কিন্তু সে, সবকিছু কৃতজ্ঞতা ভুলে, একটা মোটা লাঠি নিয়ে আমাকে মারতে এল। বড় ব্যথা পেয়েছিলুম সেদিন, কিন্তু পরিণাম? সেই বাতেই সে আগুনে পুড়ে মরে গেল।

—এ ব্যাপারে কোন তদন্ত হয়নি?

—তদন্তেব কি আছে? নেশার ঝোঁকে কখন যেন হারিকেনের গায়ে লাথি মেরে দিয়েছিল। জ্বলন্ত হারিকেন উল্টে খড়েব গাদায় আগুন ধবে যায়। তারপর সেই মাধব, কোথাও তার কোন জায়গা ছিল না। আশ্রয় দিয়েছিলুম। বাগান দেখাশোনা করার। কিন্তু অকৃতজ্ঞ ছেলেটা চুরি করা শুরু করল। ধরা পড়তে ধমক দিলুম। উল্টে আমায় সাম্যবাদের বুলি শেখাতে এল। আমাকে শাসালো। সর্বসমক্ষে করল অপমান। ভয় দেখালো যশোদা আশ্রমের মধ্যে বিপ্লব আনবে। ফল কি হল? তেবাত্তির পোয়ালো না। কুয়োয় পা পিছলে পড়ে শেষ। তারপব গেল বামলোচন। গেল কৃপাসিন্ধু,

—কৃপাসিন্ধুর সঙ্গেও কি কোন রকম বচসা হয়েছিল আপনাব?

—হ্যাঁ, হযেছিল। লোকটা এমনিতে নিরীহ। কাবো সাতে পাঁচে থাকতো না। মুখ তুলে কারো সঙ্গে জোবে কথাও বলতো না। কিন্তু ওর ছিল হাতটানের রোগ। আগে আমার অফিসের ক্যাশিয়ার ছিল।

—হ্যাঁ, শুনেছি।

—শুনেছেন? কার কাছ থেকে?

—যুবনাশ্ববাবুই বলেছিলেন কথায় কথায়।

—আপনি যখন সবই শুনেছেন তখন আর নতুন করে কি বলব? একবাব তাড়িয়ে দিয়েছিলুম। ফের এসে হাতেপায়ে ধরল। চাকরি দিলুম। কিন্তু পুবনো বোগ ও ছাড়তে পারেনি, এখানেও হিসাবের কারচুপি শুরু কবেছিল।

—কিন্তু, নীল বাধা দিল, যতদূর শুনেছি ওঁর হাতে তো নগদ টাকার ভার ছিল না।

—আরে মশাই গাই বাছুরে ভাব থাকলে বনে গিয়েও দুধ দেয়। বীরেন, মানে এখানকার ক্যাশিয়ার। তার সঙ্গে কৃপাসিন্ধুর গলায় গলায় ভাব। যাক যে সব কথা। মাবা যাবাব আগের দিন সন্ধেবেলা

ওকে ডেকে বেশ করে সাবধান করে দিই। কিন্তু তার উত্তরে ও আমাকে কী বলেছিল জানেন?

—কি?

বলতে গিয়েও হঠাৎ থেমে গেলেন সুবর্ণবাবু, তারপর অবশ্য বললেন,—যাক সে সব পারিবারিক ব্যাপাব। আমার পরিবারের প্রতি নোংরা ইঙ্গিত। সে সব শুনে কাজ নেই। কিন্তু বিশ্বাস করুন ব্যানার্জি সাহেব, বড় লেগেছিল। নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বললেন, এইখানে। আর তখনি আমি টেব পেয়েছিলুম, আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন আমকে বলে দিয়েছিল, ওর দুঃসময় এসে গেছে।

সুবর্ণর ভাবাবেগে কোন রকম কর্ণপাত না করে নীল বলে উঠল,—উত্তেজনায় বা রাগে আপনি ওকে কিছু বলেননি?

—হ্যাঁ বলেছিলুম। দুজনকেই বলেছিলুম। এখন মনে হচ্ছে, ওকে কিছু না বললেই ভালো হত। ওকে আমি আশ্রম ছেড়ে তিনদিনের মধ্যে চলে যেতে বলেছিলুম।

—শুনে উনি কি বলেছিলেন?

—কিছুই না। কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে আমাব দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর হঠাৎ বুকে হাত চেপে আমার ঘর থেকে চলে গিয়েছিল।

—কেন?

—বোধহয় ওর হার্টের যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল।

—এ ঘটনাটা কখন ঘটে?

—সন্ধে সাতটা সাড়ে সাতটা হবে।

—উনি মারা গিযেছিলেন কখন?

—পরের দিন ঘুম থেকে উঠে শুনি কৃপাসিন্ধু নেই।

—আচ্ছা, আপনি কি দেখেছিলেন, কৃপাসিন্ধুবাবুর মাথার পিছন দিকে গভীব ক্ষতের চিহ্ন!

—আমি ওর ডেডবডি দেখিনি।

—এটা অনেকেই দেখেছেন। এবং লোকের ধারণা কেউ তাকে পিছন থেকে অতর্কিতে কোন ভারী কিছু দিয়ে, যেমন হাতুড়ি বা শাবলেব আঘাত ওঁকে হত্যা করেছে।

—আমি তো আগেই বলেছি, আমার এ সব বিশ্বাস হয় না। তবে আপনি গোয়েন্দা মানুষ। আপনি সত্য উদ্ঘাটন করুন।

—কৃপাসিন্ধুবাবুর একটি মেয়ে আছে, তাই না?

—হ্যাঁ, কপাল পোড়া মেয়ে। না, ওকে ভাসিয়ে দেব না। লেখাপড়া শিখেছে। আমার লাইব্রেরি দেখাশুনো করে। এখন থেকে অ্যাকাউন্টস্‌টাও ওই দেখবে।

মাঝে মাঝে আলটপ্‌কা, এক প্রসঙ্গ থেকে এনা প্রসঙ্গে লাফ দিতে নীলের জুড়ি নেই। এখানেও তাই করল, ফস করে জিজ্ঞেস করল, —আপনি কলকাতা থেকে তো আজই ফিরলেন?

—হ্যাঁ, কোম্পানির কয়েকটা সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে যেতে হয়েছিল। দুচারদিন থাকাব কথাও ছিল। কিন্তু এদিকে এই সব দুর্ঘটনা। বাধ্য হয়েই ফিরে আসতে হল।

—চটিটা কি কালই কিনলেন?

—মানে?

—একবারে আনকোরা দেখছি। তলায় এখনও ভাল করে ধুলোও লাগেনি। তাই মনে হলো আর কি?

বিস্ময়ে ভ্রূকুঞ্চন এবং সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার নীলের দিকে তাকিয়ে ঘোষাল বললেন,—হঠাৎ জুতোর প্রসঙ্গ কেন?

সে কথার জবাব দেবার আগেই এসে পড়লেন যুবনাশ্ব আর নীহারবাবু। পিছনে এক ট্রে বোঝাই নোন্‌তা আর মিষ্টি নিয়ে প্রবেশ করল একজন ভৃত্য শ্রেণীর লোক। যুবনাশ্ব বললেন, —মিস্টার ব্যানার্জি, নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়ে গেছে। সামান্য কিছু জোগাড় করতে পেরেছি। চটপট হাত লাগিয়ে ফেলুন।

আব শ্যামাপদ, এঁদের চা নিয়ে এস।

শ্যামাপদ ট্রে নামিয়ে রেখে চলে গেল। অবেলায় এত নোন্‌তা আর মিষ্টি খাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। নীল সামান্য আপত্তি করে দু একটা তুলে নিল। আমিও তাই।

জুতোর প্রসঙ্গই হোক আব যে কোন কারণেই হোক সুবর্ণবাবু সামান্য গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো অবস্থার মোড় ঘোরাতে নীল কিছু একটা বলতে চাইছিল, কিন্তু তার আগেই যুবনাশ্ব বললেন, —কৃপাসিন্ধুর বডি দেখলেন মিস্টার ব্যানার্জি?

—হ্যাঁ, দেখলাম।

—কি মনে হল?

—এখুনি চট করে কি কিছু বলা যায়? আচ্ছা লোকাল থানাটা কতদূর?

—তা এখান থেকে মাইল পাঁচেক তো হবেই। যাবেন নাকি?

—হ্যাঁ, যেতে তো হবেই।

হঠাৎ নীহাববাবু বললেন,—কিন্তু সুবর্ণদা, এঁদের থাকার ব্যবস্থা কি হবে?

অনেকক্ষণ পর সুবর্ণবাবু মুখ খুললেন,—নিমন্ত্রণ করে যখন ডেকে এনেছি, তখন সেটা কি আর ঠিক করে রাখিনি ভাবছ? কৃপাসিন্ধুব পাশের কোয়ার্টারটাই খালি আছে। ঘরটাও ভাল। মনে হয় না এঁদেব কোন অসুবিধা হবে। ব্যানার্জি সাহেব,

—হ্যাঁ বলুন।

—আমি আপনাকে একটু আগেই বলেছি, কৃপাসিন্ধুর মৃত্যুটা যদিও সবাই খুনটুন বলছে, আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। কিন্তু মানুষ অবস্থাব দাস। এখানকাব সবারই ধারণা এটা মার্ডার কেস। যুবনাশ্ব বা নীহারের একান্ত আগ্রহেই আমি আপনাকে ডেকে এনেছি। আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন। আপনাব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে যা সত্যি তাই খুঁজে বার করুন। সত্যি বলতে কি পুলিসের কথাবার্তা এবং আচাব। ব্যবহার আমাব ঠিক ভালো লাগে না। সত্যিই যদি এর মধ্যে কোন রহস্যের ব্যাপার থেকে থাকে অথবা কৃপাসিন্ধুকে কেউ হত্যা করে থাকে, সে তো ভালো কথা নয়। সে লোকটাকে ধরা দরকার। কাবণ এব সঙ্গে আমার আশ্রমেব যশ অপযশের প্রসঙ্গ জড়িয়ে আছে। আচ্ছা ব্যানার্জি সাহেব, ঠিক কতদিন আপনি সময় নেবেন এব জন্য?

—মিস্টাব ঘোষাল!

—হ্যাঁ বলুন।

—আপনার কথাগুলো আমি আপনাব মনের কথা বলেই কি ধরে নিতে পারি?

—এ কথা কেন বলছেন?

—কারণ আপনি তো বিশ্বাসই করেন না কৃপাসিন্ধুবাবুকে কেউ হত্যা করেছে বলে।

—আপনি কি তাই বিশ্বাস করছেন?

—প্রমাণ বা সূত্র না পেলে আমি কিছুই বিশ্বাস কবি না। এক্ষেত্রে মৃত্যুটা অস্বাভাবিক, এটাই বলতে পাবি।

—কাবেক্ট। এবং আসল সত্যটাকে খুঁজে বার কববেন, এটাই আমার মনের কথা। এবার বলুন কতদিন সময় লাগবে আপনার তদন্তের জন্যে?

—এই মুহূর্তে তা বলা সম্ভব না। তবে অনন্তকাল নিশ্চয়ই নয়।

—নীহার, তুমি এদের থাকার ঘরটা দেখিয়ে দাও, বলেই সুবর্ণবাবু হাত বাড়িয়ে দিলেন, উইস ইওর কুইক সাকসেস।

করমর্দন করতে কবতে নীল বলল, —ধন্যবাদ।

আমরা বেরিয়ে আসছিলাম, হঠাৎ যুবনাশ্ব একটা কথা বলে ফেললেন,—মিস্টার ব্যানার্জি, নীহারের মুখে শুনলাম, আপনি নাকি একপাটি বিদ্যাসাগর চটি পেয়েছেন ঝোপের আড়াল থেকে?

ঘুরে দাড়িয়ে নীল বলল,—হ্যাঁ কেন বলুন তো, ওটা আপনার?

—আমার হবে কেন? আমি কোনদিনও ঐ চটি পড়িনি। তবে সুবর্ণর নাকি একপাটি চটি গত তিন দিন হলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওটা হয়তো ওরই হবে।

নীলের ভ্রু কোঁচকাল আর আমি স্পষ্ট দেখলাম সুবর্ণবাবুর উজ্জ্বল এবং মসৃণ কপালে দুটো ভাঁজ পড়ল। ভ্রু কুঁচকে নীল জিজ্ঞাসা করল,—ওটা যে সুবর্ণবাবুর হবেই এটা আপনি বুঝলেন কি করে? শুনেছি কৃপাসিন্ধুবাবুও ঐ একই ধরনের চটি পরতেন। তাঁর যে নয় তাই বা আপনি জানলেন কি করে? চটিটা কি আপনি দেখেছেন?

—দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান। এতগুলো প্রশ্ন করলে ঘাবড়ে যাব। চটিটা আমি দেখিনি। তবে সুবর্ণর মুখে শুনেছিলাম ওর একপাটি চটি হারিয়ে গেছে। তাই ভাবলাম, ওটা ওর হতে পারে। তাছাড়া,

—তাছাড়া কি?

—আমি তো ডেফিনিট কিছু বলতে চাইনি। চটিটা কৃপাসিন্ধুরও হতে পারে। আপনি খোঁজ নিলেই সব জানতে পারবেন।

—হুঁ। আসুন নীহারবাবু। চলি মিস্টার ঘোষাল। আবার বিকেলে দেখা হবে।

—আসুন। যুবনাশ্ব, এঁদের দুপুরের খাওয়া দাওয়া,

—সে তোকে কিছু চিন্তা করতে হবে না। শ্যামাপদ ভাত আর মুরগির মাংসের জোগাড় করছে।

খাওয়া দাওয়া শেষ করতে প্রায় বিকেল তিনটে বেজে গেল। বাইরে চড়া রোদ। ইচ্ছে থাকলেও তখন আর আমরা কেউই বেরোলাম না। আমাদের বাড়িটা অনেকটা হালফ্যাশানের বাংলোর মতো। অবশ্য সুবর্ণবাবুরটাও তাই। অন্যগুলো কেমন তা এখনও দেখা হয়নি। এক কামরার স্বয়ং সম্পূর্ণ কোঠা। একটা শোবার ঘর। একটা রান্নাঘর। একটা বাথরুম। শোবার ঘরের ঠিক সামনেই চারফুটের চওড়া বারান্দা। ঘরগুলো ইটের গাঁথুনি হলেও চালা টালির। কিছুক্ষণ আগে শ্যামাপদ বারান্দায় আমাদের বসার জন্যে দুটো বেতের চেয়ার দিয়ে গেছে। বাইরের সবুজ প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নীল একমনে কি যেন ভাবছিল। চিন্তা আমিও করছিলাম। বিশেষ করে কয়েকটা কথা আমার মাথার মধ্যে বেশ পাক খাচ্ছিল। নীলকে তাই জিজ্ঞাসা করলাম, —তুই কি সিরিয়াসলি কিছু চিন্তা করছিস?

—কেন বলত?

—কয়েকটা প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরছে।

—কি রকম?

—সুবর্ণবাবুর নিজের সম্বন্ধে যে ধারণা সেটা কি ঠিক? অর্থাৎ কেউ ওঁকে আঘাত দিলে অথবা কেউ ওর বিরুদ্ধাচরণ করলে তার অনিষ্ট হবে?

—দেখ, পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষেরই নিজের সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকে। সুবর্ণবাবুর এরকম একটা ধারণা থাকতে পারে। তাতে কি কারো কোন ক্ষতি হচ্ছে?

—হ্যাঁ, আমার প্রশ্ন সেটাই। যখনই ওঁর সঙ্গে কারোর কোন রকম সংঘর্ষ হয়েছে, দেখা যাচ্ছে দিন কয়েক আগে পরে তার মৃত্যু হচ্ছে। যে কোন ভাবেই হোক তাকে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয়েছে। এটা কি ঠিক সাধারণ ঘটনার পর্যায়ে পড়ছে।

—ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে।

—তা হতে পারে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই কাকতালীয়ের পুনরাবৃত্তি কি রহস্যময় নয়?

—দেখ অজু, ব্যাপারটা যে আমি ভাবিনি তা নয়। বা আমার মাথায় আসেনি তাও না। কিন্তু কাউকে সন্দেহ করতে হলে তার সম্বন্ধে কিছু ডেফিনিট সূত্র পাওয়া দরকার, তাই নয় কি?

—নিশ্চয়ই দরকার। আর সেটার জন্যেই আমার মন বলছে গত কয়েক মাসের মধ্যে এখানে যে কটা অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে সে সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। তাছাড়া আরো একটা ঘটনা,

—কি?

—সবাই যেখানে বলছে কৃপাসিন্ধুর মৃত্যুটা নরম্যাল নয়, সুবর্ণবাবু ঠিক তার উল্টোকথা বলছেন।

কেন?

নীল কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল আমার কথার উত্তর না ,দিয়ে। কপাল কুঁচকে ঘনঘন কয়েকবার সিগারেট টানল। তারপর ধীরে ধীরে বলল,—হয়ত সুবর্ণবাবু তাঁর নিজের হাতে গড়া যশোদা আশ্রমের জল ঘোলা করতে চাইছেন না।

—মানে?

—মানে কৃপাসিন্ধুকে যদি কেউ হত্যা করেও থাকে সেটা নিয়ে ফারদার ঘাঁটঘাঁটিতে ওর আপত্তি থাকতে পারে।

—কিন্তু পুলিস কি ছেড়ে দেবে?

—পুলিস? নীল সামান্য হাসল, পুলিস বর্তমানে এত সব সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত, চারদিকে এত রাজনৈতিক খুন নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে, সেখানে সামান্য এক যশোদা আশ্রমের সামান্যতম কৃপাসিন্ধুর মৃত্যু রহস্য নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামবে বলে মনে হয় না।

—তাই যদি হবে তাহলে উনি তোকে ডাকলেন কেন?

—আমাকে ডাকার কোন ইচ্ছে ওঁর ছিল না। এখনো নেই। নেহাত যুবনাশ্ব আর নীহারবাবুর পীড়াপীড়িতে ডাকতে বাধ্য হয়েছেন। এমন কি আমাকে বেশিদিন সময় দেবেন না, এমন একটা খোঁচাও দিয়ে রেখেছেন।

—তবে কি?

—কী তবে?

—সুবর্ণবাবু ভালোকরেই জানেন এটা মার্ডার কেস। এবং জেনেশুনেই উনি সব কিছু ধামাচাপা দিতে চাচ্ছেন?

—এখনই এ সম্বন্ধে ডেফিনিট কিছু বলতে পারছি না।

—বলতে চাচ্ছিস না বল!

—যা মনে করিস।

—এখন কি করবি?

নীল আবার কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, —প্রথম দিকে যশোদা আশ্রমের ব্যাপার নিয়ে আমার খুব একটা মাথা ঘামাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু যুবনাশ্ব এমন ভাবে চেপে ধরলেন, আর তুই তো জানিস রহস্যের গন্ধ পেলে আমি ঠিক থাকতে পারি না। দোনামনা করে এখানে চলে এলাম। কিন্তু,

—কিন্তু কি?

—মনে হচ্ছে কোথায় যেন এটা একটা জট পাকিয়ে আছে। জটটা খুব সাধারণ নয়। হয়ত দেখা যাবে কেঁচো খুঁজতে কেউটে বেরিয়ে আসবে। এখুনি খালি চোখে যা দেখা যাচ্ছে না, পরে হয়ত এর মধ্যেই বিরাট রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

—তার মানে তুমি ইতিমধ্যেই চিন্তা শুরু করে দিয়েছো?

—এর কেন্দ্রবিন্দুটা দেখতে ইচ্ছে করছে। মাত্র দুমাসের মধ্যে চারটে অপঘাত মৃত্যু। একজন আগুনে পুড়ে মরল, একজন জলে ডুবল, একজন মরল ঘুমের ঘোরে। আর সব শেষে কৃপাসিন্ধু দাস। কেউ তাকে অতর্কিতে একটা শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করে, মাথার খুলি ফাটিয়ে দিল এবং তাতেই তার মৃত্যু হল। অবশ্য এখনও পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেখিনি। তবে সেটাই অনুমান করছি। এবং তা যদি সত্যি হয় তাহলে এটা হত্যা। কেন এতগুলো অ্যাবনর্ম্যাল মৃত্যু ঘটবে? এর পেছনে সত্যিটা কি সেটা আমার জানতে হবে।

—অর্থাৎ তুমি এখন থেকে গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জি এবং একান্তই সিরিয়াস।

—ব্যাপারটা কি জানিস, রহস্যের ক্ষেত্রে যত বেশি জটিলতা থাকবে তত বেশি সেটা একজন রহস্যসন্ধানীর কাছে আকর্ষণীয় উঠবে। এবং যত বেশি জটিলতা তত বেশি সিরিয়াসনেস্। এটা নিশ্চয়ই তুই স্বীকার করবি?

আমি উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম যে তোর সঙ্গে থেকে সেটা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছি। কিন্তু তার আগেই হঠাৎ বাইরে থেকে ডাক পড়ল,—ভেতরে আসব নাকি মিস্টার ব্যানার্জি?

তাকিয়ে দেখি যুবনাশ্ব গ্রিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। নীল তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

—বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছিল খুব গভীর আলোচনায় মগ্ন। নিশ্চয়ই যশোদা আশ্রম না অন্য কিছু? বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন যুবনাশ্ব।

নীল বলল,—যশোদা আশ্রমে বসে আর অন্য কিই বা ভাবা যায়?

—তা কি বুঝছেন?

—এখন ঠিক বোঝা এবং বুঝির পর্যায়ে এসে পৌঁছই নি। আচ্ছা এখানকার থানা ইনচার্জের কি যেন নাম বলেছিলেন?

—গোপাল সাহা। দেখা করবেন নাকি?

—ইচ্ছে তো আছে। তারপর কৃপাসিন্ধুবাবুর ময়নাতদন্তের রিপোর্টটা পাওয়া দরকার। তার আগে একবার আপনার যশোদা আশ্রমটা ঘুরে দেখতে চাই।

—সে তো বটেই। তা কবে যাবেন বলুন?

—কবে কি মশাই? আজই। এখুনি।

—অশুভস্য কালহরণম্ বলছেন? তাহলে উঠে পড়ুন। আমি রেডি।

তিনজন বেরিয়ে পড়লাম। রোদের তেজটা ততক্ষণে কমে এসেছে। প্রথমেই আমরা গেলাম কৃপাসিন্ধুর বাড়িতে। ওটাই আমাদের সব থেকে নিকটবর্তী বাড়ি। বাড়িতে তালা ঝুলছে। সেটাই স্বাভাবিক। আশ্রমের যুবকেরা কৃপাসিন্ধুর মৃতদেহ নিয়ে গেছে দাহ করতে। একমাত্র মেয়ে, সেও গেছে শ্মশানে। তাকেই তো মুখাগ্নি করতে হবে। বিনাবাক্যব্যয়ে নীল কৃপাসিন্ধুর বাড়ির চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখল। বাড়ি মানে সামান্য ইটের দেওয়ালের ওপর টালির আটচালা। ঘরের সংলগ্ন একটি রান্নাঘর। খুব সম্ভবত একটা বাথরুম রয়েছে। ঘরের সামনে খানিকটা দাওয়া মত জায়গা। দড়িতে একটা ছেঁড়া শাড়ি ঝুলছে। এছাড়া নজরে পড়ার মত আর কিছু নেই। তীক্ষ্ণ এক জোড়া চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ নীল প্রশ্ন করল,—কৃপাসিন্ধুবাবুর বডিটা ঐ তেঁতুল গাছগুলোর নিচেই পড়েছিল, তাই তো?

যুবনাশ্ব বললেন,—হ্যাঁ আমরা এসে তাই দেখেছি।

—উনি মারা গিয়েছিলেন পরশু মানে বুধবার রাতে?

—তা বলতে পারব না। তবে বৃহস্পতিবার সকালে আমরা মৃতদেহ আবিষ্কার করি।

নীল গভীর মনোযোগ দিয়ে মাটি পরীক্ষা করতে করতে তেঁতুল গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ালো। সামান্য দূরে একটা টিউবওয়েল ছিল। সেখানে গিয়ে একবার টিউবওয়েলের হাতলে চাপ দিল। খানিকটা জল উঠে এল। আপন মনেই সে বিড় বিড় করল, অত রাতে, ঘর ছেড়ে এখানে আসা? কেন? জল নেবার জন্যে?

—তা হতে পারে।

—উঁ, বলে নীল মুখ ঘুরিয়ে অন্যমনস্কের ভঙ্গিতে বলল, জল নেবার পাত্রটা গেল কোথায়?

—এ ব্যাপারে আমার মনে হয় ওঁর মেয়ে আপনাকে হেল্প করতে পারবে।

—হুঁ, বলে নীল এগিয়ে গেল সেই ঝোপটার কাছে। যেখানে একপাটি চটি পাওয়া গিয়েছিল। তারপর হঠাৎই প্রশ্ন করল,—আচ্ছা যুবনাশ্ববাবু, আপনি বলছেন সুবর্ণবাবুর চটি হারিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

—কবে?

—বুধবার সন্ধেবেলা ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তখনই একবার ওকে বলতে শুনেছিলাম যে ওর বাড়িতে পরার চটিটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—ভারি গোলমেলে কাণ্ড তো?

—কেন, এর মধ্যে গোলমালের কী আছে?

নীল সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল,—সুবর্ণবাবু গিয়েছিলেন বৃহস্পতিবার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বৃহস্পতিবার সকালেই।

—তখন তো এখানে কৃপাসিন্ধুবাবুর বডি নিয়ে হইচই পড়ে গেছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা সত্ত্বেও উনি চলে গেলেন। এবং আসার সময় এক জোড়া জুতোও কিনে নিয়ে এলেন?

—হ্যাঁ চটি ছাড়া ও বাড়িতে একপাও চলতে পারে না।

—যে চটিটা পাওয়া গেছে সেটা কার খোঁজ নিয়েছেন?

—নাহ্, সময় আর পেলাম কোথায়?

—আর একটা কথা যুবনাশ্ববাবু, সুবর্ণবাবু কি পুলিসকে জানিয়ে কলকাতা গিয়েছিলেন, নাকি পুলিস আসার আগেই চলে গিয়েছিলেন?

—যদ্দুর মনে পড়ছে, পুলিস আসার আগেই, হ্যাঁ, হ্যাঁ আগেই গিয়েছিল।

—একজন দায়িত্ব-সম্পন্ন লোকের পক্ষে এটা ঠিক যুক্তিগ্রাহ্য কথা হল না। ওঁর কলকাতায় সেদিন যাওয়াটা কি আগে থেকেই ঠিক ছিল?

—ঠিক বলতে পারব না। তবে যশোদা হয়তো বলতে পারবে।

—ওবেলা যশোদা দেবীকে দেখলাম না? উনি কি বাড়ি ছিলেন না?

—না। ও তো কৃপাসিন্ধুর বাড়ির কাছে মেয়েরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই ছিল। এখন বাড়ি আছে। দেখা করবেন নাকি?

—এক্ষুণি দরকার নেই। সন্ধেবেলা যাব।

কথা বলতে বলতে আমরা পুকুরধারে চলে এসেছিলাম। হঠাৎ নীল জিজ্ঞাসা করল,—আচ্ছা সনাতন, মানে সেই যে আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিল, সে কোথায় থাকতো?

—ঐ যে দূরে; একটা বড় আমগাছ দেখতে পাচ্ছেন, ওরই কাছে।

—ঘরটা কি এখন ফাঁকাই পড়ে আছে?

—না, ফাঁকা থাকবে কেন? ওর তো বউ আছে। সেই থাকে।

কথা বলতে বলতে আমরা সনাতনের ঘরের কাছে চলে এলাম। সনাতনের আস্তানা কিন্তু তেমন চোখে পড়ার মত না। অথবা বলা যায় সুবর্ণবাবুর নিজের বা আমাদের জন্যে যে বাংলোটি দিয়েছেন তার তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট মানের। সামান্য ইটের দেওয়ালের একখানা ঘর। টালির চালা। ঘরের দাওয়ায় একটি যুবতী বধূকে দেখা গেল। আমাদের তিনজনকে সহসা ঐভাবে আসতে দেখে মেয়েটি ত্বরিতে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। যুবনাশ্ব বললেন,—সনাতনের বিধবা।

নীল বলল,—তা বুঝেছি। কিন্তু ওর সঙ্গে যে দু-একটি কথা বলার দরকার ছিল।

—বলুন। আটকাচ্ছে কে? দাঁড়ান ওকে ডাকি। বলেই যুবনাশ্ব ওখান থেকেই ডাকলেন, চাঁপা, এঁরা বড়বাবুর কাছ থেকে আসছেন। তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।

বলার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চাঁপা বেরিয়ে এল না। প্রায় মিনিট তিনেক পর ধীরে ধীরে দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াল। বাঙালি ঘরের অল্পবয়েসী সদ্য বিধবা। একেবারে নিম্নশ্রেণীর না হলেও উচ্চবংশজাত নয় তা দেখলেই বোঝা যায়। চোখ নাক মুখ সাধারণ। কিন্তু দেহের রঙটা উজ্জ্বল বলেই সুন্দরী মনে হয়। বয়েস আটাশ উনত্রিশের মধ্যেই। মাথায় ঘোমটা। দৃষ্টি চটুল এবং চনমনে।

যুবনাশ্ব বললেন,—এঁরা কলকাতা থেকে কৃপাসিন্ধুবাবুর মৃত্যুর তদন্ত করতে এসেছেন। তোমাকে কিছু কথা জিগ্যেস করতে চান।

খুব ধীর ও নম্র স্বরে চাঁপা বলল,—আমি কি জানি বলুন?

এবার নীলই বলল,—যা জানেন তাই বলবেন। না জানলে বলবেন না।

চাঁপা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। ওদের দাওয়াটা পরিষ্কার ছিল। নীল ধুপ করে সেখানেই বসে পড়ে

বলল,—আপনি বসুন।

সামান্য কুণ্ঠা নিয়ে মেয়েটি দরজার গোড়াতেই বসল। কোনরকম ভূমিকা না করেই নীল বলল —কৃপাসিন্ধুবাবুর ব্যাপারে আমি কিন্তু আপনার কাছে আসিনি। আমি আপনার স্বামীর মৃত্যুর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই। আচ্ছা আপনার স্বামী ঠিক কি ভাবে মারা যান?

—ঘরে আগুন লেগে গিয়েছিল। তাতেই।

—আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

—কেন ঘরেই।

—আপনার বোধহয় তেমন কিছু হয়নি?

—নাহ্। আমার ঘুম খুব সজাগ। আমি আগুন দেখেই বাইরে চলে গিয়েছিলুম।

—উনি যেতে পারলেন না কেন?

—সে রাত্রে উনি একটু বেশি নেশা করেছিলেন। কোন জ্ঞানই ছিল না।

—তা আপনি আপনার অচৈতন্য স্বামীকে ফেলে রেখে একাই ঘরের বাইরে চলে গেলেন কেন?

—কি করব, আমি একা তো আগুন নেভাতে পারতুম না। তাই চেঁচামেচি করে লোক জাগাচ্ছিলুম

—তখন রাত কটা মনে আছে?

—নাহ্। আমাদের তো ঘড়ি নেই।

—আমি শুনেছিলাম খড়ের গাদায় নাকি আগুন লেগেছিল। কিন্তু আপনার ঘরের মধ্যে খড় কি ভাবে গেল?

—ও এখানে গরু মোষের দেখাশুনো করত। তখন পুজোর আগে। বৃষ্টির সময় খালি মেঝেতে শোয়া যায় না। তাই কিছু খড় বিছিয়ে তার ওপর বিছানা পাতা হত।

—হ্যারিকেন উল্টে গিয়ে আগুন লেগেছিল, তাই না?

—হ্যাঁ।

—সে রাত্রে কি হ্যারিকেন জ্বেলেই আপনারা শুয়েছিলেন?

—আমি আগেই শুয়ে পড়েছিলুম। উনি বিছানায় ওপর বসে একা ওই সব ছাইপাঁশ খাচ্ছিলেন।

—উনি কি প্রায়ই ঐ ভাবে মদ খেতেন?

—হ্যাঁ। অনেক রাত পর্যন্ত মদ খেতে খেতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়তেন।

—আচ্ছা, একটা কথা আপনি খুব ভালোভাবে মনে করে বলতে পারবেন? হারিকেনটা পরদিন কি অবস্থায় ছিল?

—হারিকেনটা একেবারে দুমড়ে গিয়েছিল।

—হুঁ, বলে একটু থেমে নীল বলল, আমি আর একটা কথা শুনেছিলাম, যেদিন উনি মারা যান সেদিন আপনাদের বড়কর্তার সঙ্গে ওনার নাকি বচসা হয়।

চাঁপা নীরবে ঘাড় নাড়ল।

—বচসাটা কি নিয়ে হয়?

এ প্রশ্নের সহসা কোন উত্তর চাঁপা দিতে পারছিল না। দেখলাম ওর ঠোঁটটা সামান্য কাঁপছে। আগ বাড়িয়ে যুবনাশ্ব কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। নীল হাতের ইশারায় ওঁকে চুপ করতে বলল। প্রশ্নটা নীল আরো একবার করল, — বচসা কি নিয়ে তা আপনি জানেন?

ধীরে ধীরে এবং থেমে থেমে চাঁপা বলল,—উনি বড়বাবুকে সন্দেহ করতেন।

—কেন? কিসের সন্দেহ?

—বড়বাবু নাকি,

—হ্যাঁ বলুন।

—আমাকে কুনজরে দেখেন। আমার সঙ্গে নাকি

—এরকম সন্দেহ হবার কারণ?

—আমি বড়বাবুর ঘরের কাজকর্ম করতুম। মাঝে মাঝে ফিরতে সন্ধে পেরিয়ে যেত। তাই ওর এরকম একটা ধারণা হয়েছিল।

—আপনাদের বড়কর্তা কি সত্যিই ওই ধরনের লোক না এটা নিছকই আপনাব স্বামীর ধাবণা?

—বড়বাবুর চবিত্তির আমি কেমন করে জানব বলুন?

—আপনাকে উনি সত্যিই কি কোনদিন কোন কুপ্রস্তাব দিয়েছিলেন?

আবার নীরবতা। চাঁপা চুপ। নীল আবার বলল,—বলুন, চুপ কবে রইলেন কেন?

হঠাৎ যুবনাশ্ব বলে উঠলেন, —ওঁকে লুকোবাব কিছু নেই। তুমি না বললেও উনি জানতে পাববেন।

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চাঁপা চকিতে একবার যুবনাশ্বেব দিকে তাকালো। তাবপর নীলেব দিকে তাকিয়ে মাথা হেঁট কবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

—কি বলেছিলেন?

—সে কথা বলাও পাপ।

—তবু শুনি।

—আমাব স্বামী নেশা কবে ঘুমিয়ে পড়লে আমাকে বাতে ওঁব ঘবে যেতে বলতেন।

—ব্যাপাবটা নিশ্চয আপনি আপনাব স্বামীকে বলেছিলেন।

—শেষ দিকে বডবাবু বাড়াবাড়ি কবতে লাগলেন তাই একদিন বাধ্য হয়ে আমার স্বামীকে বলতেই হয়েছিল।

—তাবপব?

—সব শুনে উনি আমাকে খুব মাবধব কবেন। তাবপব একটা বড লাঠি নিয়ে বডবাবুকে মাবতে যান।

—সুবর্ণবাবুব স্ত্রী এ সব কথা জানেন?

—জানে বোধহয়।

—এখন এখানে আপনাকে কী কবতে হয?

—ছাগল মুবগিব দানাপানিব জোগাড় বাখি।

—ঠিক আছে। আর আমার কিছু জানাব নেই। যদি ভবিষ্যতে দরকার পড়ে আবার আসব।

আমবা আবার বাগানে চলে এলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। প্রায় সাড়ে চার। হঠাৎ যুবনাশ্বর দিকে নজর পড়তে দেখলাম উনি কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসা কবলাম, —কী ব্যাপাব আপনি হঠাৎ চুপচাপ?

—এ আমি বিশ্বাস করি না। কিছুতেই না। চাঁপা মিথ্যে কথা বলছে।

—কি?

—সুবর্ণব চরিত্র। অসম্ভব। ওকে আমি ভালো ভাবে চিনি। আজ নয। ছোট থেকে। মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। বেইমান।

—কিন্তু মিথ্যে বলে চাঁপাব লাভ?

—লাভ লোকসান ঐ ভাল বোঝে। কিন্তু সুবর্ণব মতো চবিত্রবান লোকেব পক্ষে এ সম্ভব নয। তার ওপব ঘবে যাব সুন্দবী বিদুষী স্ত্রী।

নীল কোন কথাই বলছিল না। আমিও কেমন ধন্দে পড়ে গেলাম। নীল এখন অনেক কিছু ভাবছে তাই ওব পক্ষে এখন কথা না বলাই স্বাভাবিক। আব যুবনাশ্ববাবুরও সুবর্ণর চবিত্রেব প্রতি চাঁপার উক্তিতে ব্যথিত হওয়া স্বাভাবিক। যুবনাশ্ব উদাব শিল্পী মন। তাঁর পক্ষে অকৃত্রিম এবং আশ্রয়দাতা বন্ধুর নিন্দা শোনা নিশ্চয়ই কাম্য না। কিন্তু ব্যাপারটা আমাব কাছে বেশ জটিলতব হতে শুরু কবেছে। সুবর্ণবাবুর সমস্ত কিছুই কেমন যেন হেঁয়ালিতে ভরা। তদন্তেব কাবণে নীলকে ওঁব ডাকাব কোন ইচ্ছেই ছিল না। অথচ ডাকতে বাধ্য হয়েছেন। আশ্রমেব মধ্যে পব পব কয়েকটি বহস্যময মৃত্যু নিয়ে উনি তেমন মাথাই ঘামাচ্ছেন না। তাব ওপর নিজেব প্রতি ওনাব একটা অদ্ভুত ধাবণা, যাব কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

নেই। সবাই যেখানে বলছে কৃপাসিন্ধু খুন হয়েছেন, উনি বেমালুম নস্যাৎ করে দিচ্ছেন। সব থেকে মারাত্মক কথা বলেছে সনাতনের বৌ চাঁপা। চাঁপার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে সুবর্ণবাবুর চরিত্র রীতিমত দোষযুক্ত। অন্তত যুবনাশ্বের ধারণা মত তিনি প্রায় মহাপুরুষ নন। এবং চাঁপা মিথ্যা না বললে সনাতনের মৃত্যুকে একেবারে স্বাভাবিকের পর্যায়ে ফেলে রাখা যাচ্ছে না। আর যদি স্বাভাবিক না হয়, অর্থাৎ কোনরকমভাবে যদি কেউ লোক দেখানো দুর্ঘটনার আড়ালে ওর মৃত্যু ঘটিয়ে থাকে তাহলে জোরালো মোটিভের দিক থেকে সুবর্ণ ঘোষালকে প্রথমেই সন্দেহের মধ্যে রাখতে হচ্ছে। অর্থাৎ সনাতনকে মারার পেছনে সুবর্ণর জোরালো মোটিভ আছে। অবশ্য এখনো রামলোচন আহির বা মাধব সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায়নি। তাহলে সুবর্ণবাবু সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য পাওয়া যেতো।

ভাবতে ভাবতে আমরা অন্যমনস্কের মতো তিনজনেই খানিক এগিয়ে এসেছি। হঠাৎ নীল বলল, —রামলোচন আহির কোথায় থাকতো?

বাগানের উত্তর-পশ্চিমদিকে বেশ খানিকটা জঙ্গলমত জায়গার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যুবনাশ্ব বললেন, —ঐদিকটায়। তবে ওখানে গিয়ে তেমন কোন লাভ হবে বলে তো আমার মনে হয় না।

— কেন?

—কার সঙ্গেই বা কথা বলবেন? কেউ তো নেই। রামলোচন একাই থাকতো।

—রামলোচনের ঘরে এখন কে থাকে?

—কেউ না। ফাঁকাই পড়ে আছে। তাছাড়া ঘর বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু না। এদিকটা খাটাল। খাটালের পাশে কাঁচা দেওয়ালের একটা ছাউনি মত ঘর। রামলোচন ঐ ঘরেই থাকতো। অবশ্য গরমকালে বাইরে খাটিয়া পেতেই শুতো।

—রামলোচন মারা গেছে মাসখানেক আগে। মানে শীতকালে। ন্যাচারালি ও ঘরেই শুয়েছিল।

—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—আপনি সে রাত্রে ওর ঘরে আলো জ্বলতে দেখেছিলেন, এবং কোন একটি ছায়ামূর্তিকে ওর ওখানে থেকে বেরিয়ে যেতেও দেখেছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা, বর্তমানে সুবর্ণবাবুর গোয়াল দেখাশুনো করে কে?

—দিন পনেরো হলো ভৈরব বলে একটি লোককে সুবর্ণ ঐ দুধ দোয়া ইত্যাদির ভার দিয়েছে।

—সে থাকে কোথায়?

—রামলোচনের ঘর থেকে একটু দূরে ঐ রকমই আর একটা ঘরে।

—ঠিক আছে। চলুন একবার ঘরটা ঘুরে দেখা যাক।

কিন্তু বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না ঘরের মধ্যে। মাসাধিক কাল অব্যবহৃত। ঘরের এককোণে একটা দলা পাকানো ময়লা ফতুয়া। একটা ছেঁড়া ছেঁড়া মাদুর। একটা কাঠের বাক্স, তালাবন্ধ। একটা চিমনি কালো হয়ে যাওয়া হারিকেন। এক জোড়া শুকনো গোবর মাখানো কম দামি নাগরা। সব কিছু মিলিয়ে নিতান্তই সাদামাঠা ব্যাপার। বেশ বোঝা যায় মৃত রামলোচন ছিল খুবই সাধারণ এবং দরিদ্র লোক। তালাবন্ধ বাক্সটা দেখতে দেখতে নীল বলল, —এটার চাবি কার কাছে?

যুবনাশ্ব বললেন, —তা তো বলতে পারব না।

—রামলোচনের মৃতদেহটা ঠিক কোনখানে পাওয়া যায়?

—ঐ বাঁদিকটায়। ওখানেই একটা বিছানা পাতা ছিল। ডেডবডি চিত হয়ে বিছানায় পড়েছিল।

—ওর মৃত্যুর পর এ ঘরে কি আর কেউ থাকে না?

—কে আসবে বলুন? একি আর থাকার মত ঘর? ভৈরবও এ ঘরে থাকতে চাইল না।

নীল মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, —আপনি বলছেন ওর মাথায় মুখে শুকনো খড়ভুষি বিচুলি লেগেছিল?

—আমি নিজে খুব ভালো করে লক্ষ্য করেছিলাম।

—হোয়াই? কি কারণ? এ ঘরে তো কোথাও খড় বিচুলির চিহ্নও নেই। আপনি বলছেন ওর মৃত্যুর পর কেউ আর এখানে আসেনি বা পরিষ্কারও হয়নি। তাহলে ওগুলো এলো কি ভাবে? যতই নেশা করুক, খড়ভুষি বিচুলির টুকরো মাথায় মুখে মেখে নিশ্চয়ই সে ঘুমতে যায়নি।

যুবনাশ্ব উৎসাহ পেয়ে বললেন, —এইজন্যেই না আপনাকে বলেছিলাম, রামলোচনের মৃত্যুটা আমার কাছে ঠিক স্বাভাবিক মনে হয়নি। কোথাও যেন কিছু একটা জট পাকানো ব্যাপার রয়ে গেছে।

—রামলোচন লোকটার ব্যবহার-ট্যবহার কি রকম ছিল?

—অতি সাধারণ লোক। সাধারণভাবেই থাকতো। ঝগড়াঝাটিও তেমন কারো সঙ্গে করতে দেখিনি। এবং বলা যায় ও বেশ শান্তশিষ্ট, সাতে পাঁচে না থাকা লোকই ছিল। তার ওপর ছিল প্রচন্ড শিবভক্ত।

—কিন্তু ও সুবর্ণবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করেছে। যেটা ঐ ধরনের একটা টেম্পারামেন্টের লোকের পক্ষে ঠিক স্বাভাবিক নয়।

—নেশার ঘোরে, বলে যুবনাশ্ব কিছু বলতে চাইছিলেন। নীল বাধা দিয়ে বলল, —ব্যাপারটা ঐখানেই সব থেকে মজা এবং রহস্য তৈরি করেছে। আদার দ্যান কৃপাসিন্ধু, যে কজন লোক মারা গেল তারা সবাই নেশাসক্ত। এবং তাদের সঙ্গে ঐ নেশা করা নিয়েই মালিকের সঙ্গে ঝগড়া এবং পরিণতিতে সেই লোকটির মৃত্যু। মৃত্যুগুলো আপাতদৃষ্টিতে দুর্ঘটনা বলে মনে হলেও শেষ পর্যন্ত ঠিক দুর্ঘটনা বলে ভাবতে অসুবিধা হচ্ছে। এবার চলুন, একটু মাধবের ঘটনাটা নেড়ে চেড়ে দেখা যাক।

আবার আমরা বাগানে নেমে এলাম। খানিকটা গিয়ে যুবনাশ্ব বললেন, —কিন্তু মাধবের সব কিছু জানতে গেলে আপনাকে পরে আসতে হবে।

—কেন?

—মাধবের মা, মানে সরলা এখন সুবর্ণর ওখানে। বিকেলে কাজকর্ম সেরে ওর ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে যায়। ওকে পেতে গেলে দুপুরবেলাটাই বেষ্ট টাইম।

—আপনাদের এখানকার ডাক্তারের নামটা যেন কি?

—ডাক্তার ভবতোষ বাঁড়ুজ্যে।

—ওঁকেও কি এখন পাওয়া যাবে না?

—কি করে পাবেন? উনি যশোদা আশ্রমের বাসিন্দা ঠিকই। তবে সর্বদাই তো উনি থাকেন না। স্টেশন রোডের কাছে একটা ডিস্পেন্সারিতে সকালে বিকালে রুগী দেখতে যান। অবশ্য রাত আটটা নাগাদ ফিরে আসেন।

—ক্যাশিয়ার বীরেন?

—ও বোধহয় শ্মশানে গেছে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মৃত্যু বলে কথা!

—তাহলে আর কি হবে, চলুন সুবর্ণবাবুর বাড়িই যাওয়া যাক। হ্যাঁ, আর একটা কথা, সুবর্ণবাবু সম্বন্ধে চাঁপার কথাবার্তা ওঁদের কাছে বলার দরকার নেই।

—ঠিক আছে। আমিও সেই রকম ভেবেছিলাম। অপ্রিয় প্রসঙ্গ যতটা পারা যায় এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। তাছাড়া চাঁপার কথা আমি নিজেও বিশ্বাস করি না। মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমি কিছুই বলব না।

পুরো আশ্রমটা একবার চক্কর দিয়ে আমরা যখন সুবর্ণবাবুর বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম তখন সন্ধে নেমে এসেছে। দূরে কারো ঘর থেকে শাঁখের আওয়াজ ভেসে এল। সুবর্ণবাবুর বাড়িতে ঢোকার মুখেই হঠাৎ যুবনাশ্ব কি যেন দেখে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর নিজের মনেই বিড় বিড় করলেন, এসব ব্যাপার ঠিক বুঝি না। লোকেই বা কি ভাবে? তার ওপর আশ্রমের মধ্যে এমন দুর্যোগ চলছে।

নীল একবার তীর্যক দৃষ্টিতে যুবনাশ্বকে দেখে বলল, —আপনি কিছু বলছেন নাকি মিস্টার সেন?

—অ্যাঁ, না কিছু না। এক কাজ করুন মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি বরং সুবর্ণর সঙ্গে কথাবার্তা সারুন। আমার হঠাৎ একটা কাজ মনে পড়ে গেল। বাড়ি যেতেই হবে। আমি রাত্রে আপনার সঙ্গে দেখা করব। বলেই আমাদের সম্মতির অপেক্ষা না রেখে হনহন করে চলে গেলেন। আমি আর নীল যুগপৎ বিস্মিত

হলাম যুবনাশ্বর এই ধরনের ব্যবহারে। সেই ট্রেনে আলাপের পর থেকে আজ পর্যন্ত এ রকম ব্যবহার কোন দিনই পাইনি। বরং ওর আলাপি ব্যবহার, এবং শিল্পীসুলভ মার্জিত মাধুর্য আমাদের বরাবরই ভালো লেগেছে। সুবর্ণবাবুর দরজায় আমাদের এমন ভাবে দাঁড় করিয়ে চলে যাওয়ার ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ একটি দৃশ্যে আমি এবং নীল দুজনেই অবাক না হয়ে পারলাম না।

আগেই বলেছি এখানে একমাত্র সুবর্ণবাবুরই বাড়ির ছাদ আছে। মাধবীলতার একটা পত্রবহুল ঝাড় সোজা ছাদে উঠে গেছে। সেটা যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক সেখানেই এক যুগল নবনারীর আবছা এবং শরীরী ঘনিষ্ঠতা আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। ওরা দুজন কে তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিন্তু দাঁড়াবার বিশেষ ভঙ্গিটি খুব যে একটা অশালীন তাও না। কি এমন দৃশ্য যা দেখে যুবনাশ্ব তড়িঘড়ি স্থানত্যাগ করলেন? ব্যাপারটা ঠিকমত বোঝার আগেই সহসা ছাদের সেই স্থান থেকে একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, —আরে মিস্টার ব্যানার্জি না? একটু দাঁড়ান, আমরা আসছি, স্পষ্ট নীহারবাবুর কণ্ঠস্বর।

কোন কথা না বলে আমি আর নীল কেবল মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। ইত্যবসরে সুবর্ণবাবুর ঘরে আলো জ্বলে উঠল। আলো জ্বলল সকালের বসা গ্রিল ঘেরা বারান্দায়। নীহারবাবুই দরজা খুলে আমাদের আপ্যায়ন করে বারান্দায় বসাতে বসাতে বললেন, —আপনার কোয়ার্টারে গিয়েছিলাম। কিন্তু শুনলাম আপনারা যুবনাশ্ববাবুর সঙ্গে ঘুরছেন। তাই আপনার জন্যে এখানেই অপেক্ষা করছি।

—আমরা এক সঙ্গে বেরিয়েছি কার মুখে শুনলেন?

—কেন? এখানে অনেকেই সে কথা জানে।

এইসময়ে ভেতরে ঘর থেকে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। মহিলাকে এর আগে না দেখলে বা না চিনলেও বুঝতে অসুবিধা হোল না যে ইনিই যশোদা দেবী। বয়েস চল্লিশের কাছে। রীতিমত সুন্দরী এবং আধুনিকা। অন্তত আশ্রমের স্থায়ী অধিবাসী হবার মত চেহারা নয়। গায়ে রঙটি উজ্জ্বল গৌর। বয়সের জন্যেই শরীরে সামান্য মেদের প্রকাশ। কিন্তু তীক্ষ্ণ নাক, উজ্জ্বল ভাসা ভাসা চোখ আর দৃঢ় চিবুক একটা ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে। কাঁধের একটু নিচ পর্যন্ত কাটা শ্যাম্পু করা চুল। শ্যাম্পু করার জন্যেই হোক অথবা অন্য কারণেই হোক সিঁথিতে কোন সিঁদুরের চিহ্ন দেখলাম না। চোখে সরু সোনালি ফ্রেমের চশমা। ভদ্রমহিলাকে মনে হোল, এখানে ঠিক মানাচ্ছে না। যশোদা আশ্রমের গ্রাম্য পরিবেশে ইনি একেবারেই অতি আধুনিকা। তার ওপর উনি শাড়ি না পরে পরেছেন ডিপ নেভি ব্লু রঙের পা ঢাকা ম্যাক্সি। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দামি পারফিউমের মৃদু সুবাস ছড়িয়ে পড়ল। যশোদা দেবীকে দেখলে মনে হয় উনি সুবর্ণ ঘোষালের স্ত্রী হবারই উপযুক্তা। অন্তত উভয়ের চেহারার মধ্যে 'মেড ফর ইচ আদার' কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয়। ওঁকে দেখেই নীহারবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, —এসো, এঁদের কথাই তোমাকে বলছিলাম। ইনিই মিস্টার নীলাঞ্জন ব্যানার্জি, ক্রিমিন্যালদের শত্রু এবং উনি ওঁর প্রিয় বন্ধু এবং লেখক অজেয় বসু। আর মিস্টার ব্যানার্জি, ইনি হলেন, যশোদা ঘোষাল মানে,

নীল ওকে বাধা দিয়ে হাত তুলে নমস্কার করতে করতে বলল, —আর বলার দরকার নেই, উনিই যে যশোদা আশ্রমের মালকিন সেটা সহজেই অনুমেয়।

সামান্য হাসির ঝিলিক খেলা করল যশোদাদেবীর মুখে। উনিও আমাদের নমস্কার জানিয়ে বসতে বললেন। তারপর নিজেও বসতে বসতে বললেন, —নীহারের মুখে আপনার সব কথা শুনেছি। অবশ্য উনিও বলে গেছেন আপনারা এলে বসাতে।

হঠাৎ নীল বলল, —সুবর্ণবাবু কি এখন বাড়ি নেই?

—এ সময়ে উনি কোনদিনও বাড়ি থাকেন না। ব্যবসার কাজে বাইরে না থাকলে এসময়টা লাইব্রেরি ঘরে বই পড়ে কাটান। আজও গেছেন লাইব্রেরিতে। অবশ্য আপনারা আসবেন বলে তাড়াতাড়িই ফিরবেন।

হঠাৎ নীহারবাবু বললেন, —যুবনাশ্ববাবুকেও যেন আসতে দেখলাম।

—দোর পর্যন্ত এসে কি একটা কাজ আছে বলে চলে গেলেন।

এইসব মামুলি কথাবার্তা বলে নীল সময় নষ্ট করতে চাইছিল না। ও সরাসরি ওর উদ্দেশ্যে পৌঁছতে চাইল। বলল, —মিসেস ঘোষাল, আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আমি কেন এখানে এসেছি।

—হ্যাঁ, নীহার তো সবই বলেছে।

—কৃপাসিন্ধুবাবুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এখানে কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে এটা নিশ্চয়ই শুনেছেন?

—হ্যাঁ, সবাই বলাবলি করছে ওর মৃত্যুটা নাকি অস্বাভাবিক, আই মিন, লোকটাকে কেউ খুন করেছে।

—ন্যাচারালি সেই কারণে আপনার কাছে আমার কিছু জিজ্ঞাসা থাকতে পারে এটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন।

—আমার কাছে? কৃপাসিন্ধু সম্বন্ধে প্রশ্ন? আশ্চর্য। আমি তার সম্বন্ধে কি জানি? তা ছাড়া হি ওয়াজ আ পেটি ওয়ার্কার অব আওয়ার হারমিটেজ। তার বিষয়ে কোন ব্যক্তিগত সংবাদ রাখার প্রয়োজনও আমি মনে করি না। ওয়েল, আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, জানা থাকলে আই মাস্ট সার্ভ য়ু।

মহিলাকে আরো একবার দেখলাম। ব্যক্তিত্বশালিনী নিঃসন্দেহে কিন্তু দাম্ভিকও বটে। আশ্রমের সামান্য কর্মচারী সম্বন্ধে কিছু উন্নাসিক ধারণা মনে মনে পোষণ করেন। নীল কিন্তু এসব উন্নাসিকতা একদম গ্রাহ্য করে না। ও নিজেও যথেষ্ট বিত্তবান। এবং লেখাপড়া জানা আশ্চর্য রকম বুদ্ধিমান সুন্দর সুঠাম এক যুবক। তাছাড়া জীবনে ও যশোদাদেবীর মতো বহু মহিলা দেখেছে। যশোদাদেবীর কথাকে কোনরকম মূল্য না দিয়েই ও বলল, —আমি জানি মিসেস ঘোষাল, কৃপাসিন্ধু আপনার হেডেক না। তবু কর্তব্যের খাতিরেই আমাকে কয়েকটা অবাঞ্ছিত প্রশ্ন করতে হবে। উত্তর দেওয়া না দেওয়া আপনার ইচ্ছা।

—আমি তো আগেই বলেছি, জানা থাকলে আমার দিক থেকে গোপন করার কিছু নেই।

—একসকিউজ মি, বলেই ও একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, নীহারবাবু ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড আমি মিসেস ঘোষালকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

—ওহ সিওর। তাহলে আমি একটু লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছি। সুবর্ণদাকে কি পাঠিয়ে দোব মিস্টার ব্যানার্জি?

—ঠিক এই মুহূর্তে ওঁকে আমার তেমন প্রয়োজন নেই। উনি ওনার সময় মতই আসুন।

নীহারবাবু বেরিয়ে গেলেন। সিগারেটে টান দিতে দিতে নীল বলল, —আপনি বোধহয় শুনেছেন, কৃপাসিন্ধুর মৃত্যু সম্বন্ধে আপনার স্বামীর ধারণা কি?

—শুনেছি? তবে সেটা তার ব্যক্তিগত ধারণা মাত্র। কিন্তু সত্যটা সেও নিশ্চয় জানতে চায়। তাই আপনাকে ডেকেছে।

—বেশ, আপনিও কি তাই মনে করেন?

—এ ব্যাপারে আমি তেমন কিছু চিন্তা করিনি।

—সেকি, আশ্রমের মধ্যে এ রকম একটা ঘটনা

—সো হোয়াট? মানুষ জন্মালে তো মরবেই।

—কিন্তু সে মৃত্যুটা যদি অ্যাবনরম্যাল হয়, আই মিন যদি সেটা মার্ডার কেস হয়?

—পুলিস আছে কি কারণে? আর সত্যটা উদ্ঘাটন করতে আপনিও বর্তমান। মধ্যিখান থেকে আমার ভাবা বোকামি।

বুঝলাম, এই অনমনীয়া মহিলাকে এইসব প্রশ্নে কাবু করা যাবে না। নীল ওর পুরনো কায়দায় চাল দিল। এলোপাথাড়ি প্রশ্ন। হঠাৎ ও দুম করে বলল, —সুবর্ণবাবুর নাকি একপাটি চটি হারিয়ে গিয়েছিল?

—এক পাটি চটি? কেন চটি হারাবে কেন?

—কেন হারাবে তা জানি না। তবে যুবনাশ্ববাবু বলছিলেন, ওর নাকি একপাটি চটি পাওয়া যাচ্ছে না।

—কি জানি, আমার জানা নেই।

—চাঁপাকে চেনেন?

—কে চাঁপা? ও, যে মেয়েটা এখানে কাজ কবতো?

—হ্যাঁ সনাতনেব বিধবা স্ত্রী।

—চিনি।

—তার স্বামীর মৃত্যুর দিন সন্ধেবেলা আপনার স্বামীর সঙ্গে চাঁপার স্বামীর নাকি বচসা হয়েছিল একটা অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমি চাঁপাব ব্যাপারে প্রশ্নটা কবছি। তা এ ব্যাপাবে কিছু জানা আছে নাকি?

—তেমন কিছু না। তবে আমাব হাজব্যান্ডকে নিয়ে দ্যাট বাগার একটা স্ক্যান্ডাল করার চেষ্টা করেছিল। বাট আই ডিডনট মাইন্ড ফর দ্যাট। আমার স্বামীকে আমি চিনি। তাঁর পক্ষে এ সম্ভব নয়।

—আপনার কি মনে হয় চাঁপা বা তাব স্বামী এই সব স্ক্যান্ডাল রটিযে ব্লাকমেল করার চেষ্টা করছিল?

—ব্ল্যাকমেল? আমাব স্বামীকে? মনে হয় না ঐ ইললিটারেট দুটোব তেমন গাট্‌স্ আছে।

—তাহলে আর কি কারণ থাকতে পারে?

—বললাম না এসব নিয়ে আমি কিছু চিন্তা করিনি। তাছাড়া বড ওল্ড ম্যাটার। আমার তেমন কিছু মনেও নেই।

—শুনলাম কৃপাসিন্ধুবাবু এখানেও হিসেবে কী সব গন্ডগোল পাকিযেছিলেন?

—অসৎ এবং গবিব লোকেরা সুযোগ পেলেই হিসেবে কারচুপি করে। কৃপাসিন্ধু ওযাজ আ ম্যান অব দ্যাট টাইপ।

—নীহারবাবু আপনার কে হন?

—যদিও কৃপাসিন্ধুর মৃত্যু তদন্তে এ প্রশ্ন আসে না, তবুও বলছি, নীহাব আমাব স্বামীর দূব সম্পর্কে ভাই।

—যুবনাশ্ববাবুকে নিশ্চয়ই চেনেন?

—না চেনার কি আছে? সুবর্ণর ছোটবেলার বন্ধু। ভাল গানটান গায। এর বেশি জানার প্রয়োজন মনে করি না।

—আপনি কৃপাসিন্ধুর বডিটা দেখেছিলেন?

—দূর থেকে একটা সাদা কাপড় মোড়া কিছু দেখেছিলাম। সেটা কৃপাসিন্ধু না অন্য কেউ তা বলতে পারব না।

—আপনি কতদিন এখানে আছেন?

—খুব বেশিদিন আমি কোন একজায়গায় থাকতে ভালবাসি না। তবে এই আশ্রমটা আমার বেশ ভালোই লাগে। মাঝে মাঝে শহরে যাওয়া ছাড়া অধিকাংশ সময় এখানেই কাটাই।

—আব একটা জিজ্ঞাস্য আছে। ব্যক্তিগতভাবে আপনার স্বামী মনে মনে একটি ধারণা পোষণ কবেন। সেটা হচ্ছে কেউ তাঁর অমঙ্গল করতে চাইলে অথবা অন্য কোন ভাবে তাঁকে মানসিক দুঃখ দিলে তার জন্যে তার চবম শাস্তি সে পেয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে আপনি কিছু বলবেন?

—আমার বলাব কিছু নেই। এটা সম্পূর্ণই তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা।

—এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আপনার কোনদিন কোন কথাবর্তা হয়নি?

—আমি পছন্দ করি না কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা ঘামাতে। তাছাড়া তাঁর এই ধারণার জন্যে আমরা তো কোন অসুবিধা হচ্ছে না। আমার কোন ক্ষতিও তিনি করছেন না। তাহলে আমি কেন শুধু শুধু তাঁকে ডিসটার্ব কবব?

—সে তো বটেই। কিন্তু যদি কখনও এমন দিন আসে?

—আপনি কি বলতে চাইছেন, সবাসবি ভ্রূভঙ্গি কবে নীলের দিকে তাকিয়ে যশোদাদেবী প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে মারলেন।

নীল মৃদু হাসল, তারপর বলল, —যদি এমন দিন কখনো আসে, যে আপনার কোন কার্যকলাপে উনি মনে ব্যথা পেলেন, এবং তারজন্যে কোন অনুযোগ করতে গিয়ে আপনার কাছ থেকে আরো বেশি আঘাত পেলেন সেদিন

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যশোদাদেবী বললেন, —সেদিন যদি ঐ লোকগুলোর মতো আমারও মৃত্যু হয় এই তো?

নীল উত্তর না দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যশোদাদেবীকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। যশোদাদেবী একই ভাবে উত্তর শেষ করলেন, —মিস্টার ব্যানার্জি, টু স্পীক য়ূ ফ্রাঙ্কলি, এ সমস্ত কাকতালীয় ব্যাপার আমি বিশ্বাস করি না। সেরকম দিন এলে তখন ভেবে দেখব। তাছাড়া আমার স্বামীর সঙ্গে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোয়াইট ক্লিয়ার। কিন্তু আপনি হঠাৎ এ ধরনের ইঙ্গিত দিচ্ছেন কেন?

—এই আশ্রমে গত ছমাসে চার চারটে মৃত্যু ঘটেছে। সেগুলো দুর্ঘটনা অথবা প্রিমিডিটেডেড তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে মৃত্যুর পূর্বে মৃতের সঙ্গে আপনার স্বামীর কোন না কোন ভাবে একটা বিরোধ হয়েছে।

—তার অর্থ আপনি আশঙ্কা করছেন কোন না কোন কারণে আমার স্বামীর সঙ্গে আমার বিরোধ সৃষ্টি হবে এবং কাকতালীয় মতে আমার জীবন হবে বিপন্ন?

—আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। এছাড়া আর আমার কিছু বলার নেই।

—আপনার হুঁশিয়ারির জন্যে ধন্যবাদ। বোধহয় আর আপনার কিছু জানার বা বলার নেই?

—এখানেও আপনার বুদ্ধির তারিফ করছি। আপাতত আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না।

—ধন্যবাদ। একটু চা নিশ্চয়ই চলবে?

—চলতে পারে।

চা খেতে খেতেও সুবর্ণবাবু ফিরলেন না। সন্ধে পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আমরা যশোদাদেবীকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম। বাইরে এসে মাত্র একটা কথাই নীলকে জিজ্ঞাসা করলাম, —কী বুঝলি?

ভেরি হার্ড শেল টু ক্র্যাক, সংক্ষেপে নীল ওর জবাব সারল।

রাতের খাওয়া সারতে আমাদের এগারোটা বেজে গেল। শ্যামাপদ প্রায় দশটা নাগাদ আমাদের দুজনের খাবার নিয়ে এসেছিল। শ্যামাপদ লোকটা বেশ সরল আর সাদাসিধে। আমাদের খাবার বেড়ে দিয়ে ও দাঁড়িয়েছিল। সেই অবসরে নীল ওকে কয়েকটা প্রশ্ন করল, —আচ্ছা শ্যামাপদ, তুমি এখানে কতদিন কাজ করছ?

—তা বাবু বছর দশেক হবে।

—কৃপাসিন্ধুবাবুকে তো চিনতে?

—তা আর চিনবো না?

—কেমন লোক ছিল জান?

—কারো সাতে পাঁচে তো কোনদিন থাকতে দেখিনি। খুব নিরীহ আর গরিব মানুষ। আহা রে, কে যে লোকটাকে অমন করে মারল? মেয়েটার এখন কি দশা হয় কে জানে?

—তোমার ধারণা কৃপাসিন্ধুকে কেউ খুন করেছে?

—সেইরকমই তো মনে হয়। মাথার পেছনটা, আপনি তো দেখেননি, দেখলে আপনারও তাই মনে হতো।

—কিন্তু তুমি তো বললে উনি খুব নিরীহ লোক ছিলেন।

—এখানে সবাই তাই বলবে।

—তাহলে কেন ওকে ঐ ভাবে খুন করবে? তার মানে ওর কেউ শত্রু ছিল?

—কি করে বলব বাবু। আদার ব্যাপারি, কি দরকার আমাদের অত খোঁজ রাখার।

—কৃপাসিন্ধুবাবুর মেয়ে তো বেশ বড়সড়। তা ওর বিয়ে দেননি ওর বাবা?

—দেবে না কেন? ঐ মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়েই তো, থাক বাবু সে সব কথায় আমার থাকার দবকার নেই।

—আহা বলই না, আমি তো আর কাউকে বলতে যাচ্ছি না।

খানিকটা ইতস্তত করে শ্যামাপদ বলল, —একবার বাবুদের অফিসবাড়ি থেকে বেশ কিছু টাকা কড়ি চুরি যায়। সবাই বলল, সেটা নাকি কৃপাবাবুব কাজ। ঐ টাকায় মেয়েব বে দিয়েছেন। তবে বাবু সবই আমার শোনা কথা। আমি তো আর দেখতে যাইনি, কে কোথা কি করছে।

—এখানেও নাকি সেইবকম কিছু একটা করেছিল?

—অভাবের সংসাব। হাতের টান তো হবেই।

আমাদের খাওয়া হয়ে যাবাব পর শ্যামাপদ বাসনকোসন নিয়ে চলে গিয়েছিল। রাত এগারোটাব সময় আমরা বারান্দায় গিয়ে বসলাম। যশোদা আশ্রম তখন অন্ধকাবে ডুব দিয়েছে। অনেক দূর থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসছিল। চারদিক বেশ নিস্তব্ধ বলেই গানেব সুরটা স্পষ্ট এসে কানে লাগছিল। সত্যি যুবনাশ্ব বেশ ভাল গায়। হঠাৎ নীল বলল, —বেহাগ রাগটাব মধ্যে একটা করুণ ব্যাপাব আছে তাই না? যুবনাশ্বের মধ্যেও কোথাও একটা চাপা দুঃখ আছে।

—সে তো ওঁকে দেখলেই বোঝা যায়।

—কিন্তু দুঃখটা কিসেব?

—কত মানুষেব কত বকম দুঃখ থাকে। যুবনাশ্বর আমবা কতটুকুই বা জানি বল। যুবনাশ্বর কথা ছাড়। যশোদা আশ্রমের ব্যাপাব কি বুঝছিস?

—এখনও তেমন কিছু বুঝিনি। তবে একটা ব্যাপাব মোটামুটি বোঝা যায় সব কটা মৃত্যুই অ্যাবনবমাল। কোন এক অদৃশ্য সুতোয় সবকটা মৃত্যু জড়িয়ে আছে। আব আমাব ধাবণা যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে এগুলো পূর্বপবিকল্পিত। এবং সেটা যদি ঠিক হয়, তাহলে কেন এত হত্যা? কি কারণ? এবং দেখা যাচ্ছে প্রতি ক্ষেত্রেই সুবর্ণবাবুব সঙ্গে তাদেব ঝগড়া হয়েছে।

—আচ্ছা, সুবর্ণবাবু এব মধ্যে ইনভলভ্ড নন তো?

—সামান্য ঝগড়া বা বচসাব জন্য মৃত্যুদণ্ড? পবেব পব ক্রাইম? তাব ওপব তারা কোন দবেব লোক নয়।

—এমনও তো হতে পারে সুবর্ণবাবু নিজেব প্রেস্টিজ বাঁচাবার জন্যে।

—তার মানে গণ্ডগোল আবো গভীবে। কেবল মাত্র প্রেস্টিজেব ব্যাপাব বা সুবর্ণবাবুর মনে আঘাত লাগার ফলে ওদের মৃত্যু ঘটলে, আমি তো দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি যে আবো একজনেব মৃত্যু আসন্ন।

—ও হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম, তুই বোধহয় যশোদাদেবীকে ঐ রকমই একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলি।

—যশোদাদেবীব মতো ঐ রকম একজন উন্নাসিক মহিলা এবং বেশ পার্সোন্যালিটিও রয়েছে, তিনি স্বামীর অবর্তমানে, নির্জন প্রায়ান্ধকার ছাদে, মাধবীলতার কুঞ্জের আড়ালে, ঐ রকম ঘনিষ্ঠ অবস্থায় একটি পুরুষকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, না বে অজু, ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবাব নয়। তুই হযতো বলবি পরচর্চা। কিন্তু গোয়েন্দাগিরি মানেই তো পরের কাসুন্দি ঘেঁটে সত্য উদ্ধার করা। তারওপব আর একটা জিনিস নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলি, যুবনাশ্ব ওদেরকে ঐ অবস্থায় দেখে কিবকম ভাবে পড়িমরি কবে পালালেন?

—তা দেখেছি। তবে যুবনাশ্ব অত্যন্ত সজ্জন লোক বলেই হযতো,

—না বে, কোন কিছুই অত হাল্কা ভাবে উড়িয়ে দিস না। মনে হচ্ছে যশোদা আশ্রমেব গভীরে অনেক বহস্য যা খালি চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

—কি বকম?

—আগাগোড়া সমস্ত কিছু চুলচেবা করে ভাব, অনেক অসঙ্গতি খুঁজে পাবি। এখন চ, শুয়ে পড়ি। অনেক বাত হল, কাল কয়েকটা জায়গা যেতে হবে।

অর্থাৎ নীল এখন আর কিছু ভাঙবে না। ওদিকে যুবনাশ্বব গানও থেমে গিয়েছিল। ঘরে গিয়ে আলো নিভিয়ে আমবাও শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোরেই কাউকে কিছু না জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। জানাতে যাওয়া মানেই অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া। আশ্রম থেকে বেরিয়েই একটা সাইকেল রিকশা পাওয়া গেল। লোকটাকে বলতেই ও সোজা আমাদের থানায় নিজে হাজির করল। থানার তখনও ঘুম ভাঙেনি। একজন কনস্টেবল টুলে বসে ঢুলছিল। আমাদের পায়ের শব্দে ঘুম ভাঙা বিরক্তি নিয়ে তাকাল। নীল ওকে জিজ্ঞাসা করল দারোগাবাবু কোথায়? লোকটা আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, —আভি আনেকা বক্ত নেহি হুয়া।

—উনি আসেন কখন?

—আট বাজনেকা বাদ।

—উনি নিশ্চয়ই কাছাকাছি থাকেন?

—জি হাঁ। উনকি কোঠি থানাকা পিছুমেই হ্যায়।

নীল একবার ঘড়ির দিকে তাকালো। সওয়া সাতটা। মানে কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ডাকাডাকি করে দারোগাবাবুকে আনানো যেত। কিন্তু আমরা ব্রেকফাস্ট না করেই বেরিয়েছিলাম। অন্তত এককাপ চা বিশেষ করে দরকার ছিল। কনস্টেবলটিকে জিগ্যেস করতেই ও বলল মিনিট দুয়েক হাঁটলেই চায়ের দোকান পাওয়া যাবে। দোকান খুঁজে নিতে বেগ পেতে হলো না।

ডবল ডিমের ওমলেট আর দু ভাঁড় করে চা খেতে খেতে আটটা বেজে গেল। থানায় ফিরে দেখি দারোগা সাহেব তখনও আসেননি। অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। মিনিট দশেকের মধ্যেই তিনি এসে গেলেন। সাধারণত কোন বিশেষ গণ্ডগোলের ঘটনা না ঘটলে মফস্বল থানা বোধহয় খালিই থাকে। দারোগা সাহেবকে ফাঁকাই পেলাম। নীলের পরিচয় পেতেই ভদ্রলোক যেন লাফিয়ে উঠলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, — গুড মর্নিং মিস্টার ব্যানার্জি। আপনার নাম শুনেছি। কলকাতার কয়েকটা ডেঞ্জারাস কেস আপনি সল্‌ভ করেছিলেন দারুণ বুদ্ধি খাটিয়ে। বসুন। আমি গোপাল সাহা। এখানকার থানা ইনচার্জ।

মধ্যবয়েসী ভদ্রলোক। চেহারাটি সাধারণ। তবে বেশ স্মার্ট। চালচলন বা কথাবার্তায় কোন উন্নাসিকতা পেলাম না। বরং বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ ভাবেই নীলকে আপ্যায়ন করলেন, —তা হঠাৎ এরকম নামকরা লোকের এখানে আগমন?

নীল সিগারেট এগিয়ে দিতে দিতে বলল,—এখানে এসেছি যশোদা আশ্রমে।

—তাই বলুন, আমার আগেই এটা বোঝা উচিত ছিল। কৃপাসিন্ধু দাসের খুনের ব্যাপারে? তা আপনাকে ডাকল কে?

—সুবর্ণ ঘোষাল। আশ্রমের মালিক।

—আই সী, আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি? যদিও ঘটনাটা আমার এলাকায়, এবং বাইরের কারো হস্তক্ষেপ অন্য কোন অফিসারের পছন্দ হোত না, তবু আপনাকে সাহায্য করতে আমার কোন আপত্তি নেই। আপনি সব ব্যাপারেই আমার সহযোগিতা পাবেন।

— বেশ, তাহলে কৃপাসিন্ধুবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে আমি আপনার কাছে কিছু ইনফরমেশন চাইছি। আপনার কি মনে হয় ওনার মৃত্যুটা হত্যা অথবা নিছক দুর্ঘটনা?

—এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নই ওঠে না, ব্যানার্জি সাহেব। এটা মার্ডার। পোস্টমর্টেম রিপোর্টেও তাই বলছে। অতর্কিতে মাথার পিছন হতে ভারি শাবল জাতীয় কিছু দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

—মৃত্যুটা ঠিক কোন সময়ে ঘটে?

—প্রায় শেষ রাতে। সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে।

—অস্ত্রটা কি পাওয়া গেছে?

—না। কাছাকাছি কোথাও কোন শাবল বা লোহার ডাণ্ডা কিছুই পাওয়া যায়নি।

—আশপাশ ভালো করে খুঁজে দেখা হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু একটা জিনিস আপনার চোখও এড়িয়ে গিয়েছিল।

—একটা চটি তো? বিদ্যাসাগরী শুঁড়বাঁকানো চটি?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

—নীহারবাবুর সঙ্গে কাল বিকেলে দেখা হয়েছিল। উনিই বলছিলেন। কিন্তু চটিটা কার?

—বোঝা যাচ্ছে না। কৃপাসিন্ধুবাবুর মেয়ের সঙ্গেও দেখা করার সুযোগ পাইনি। তাহলেও বোঝা যেত। তবে একটা মজার ব্যাপার আরো একজনের পারটিকুলার ঐ একই ডিজাইনের একপাটি চটি হারিয়েছে। তিনি হলেন সুবর্ণ ঘোষাল।

—বলেন কি?

—সুবর্ণবাবুও তা অস্বীকার করেননি। তবে ওঁর স্ত্রী চটির ব্যাপারে কিছুই সংবাদ রাখেন না। আচ্ছা মিস্টার সাহা,

—হ্যাঁ, বলুন।

—কৃপাসিন্ধুবাবু ছাড়াও, যশোদা আশ্রমে আরো তিনটে মৃত্যু ঘটেছে গত ছ মাসের মধ্যে। সেগুলো সম্বন্ধে আপনি কোন সংবাদ রাখেন?

—শুনেছিলাম। তবে আমার থানায় কোন লিখিত রিপোর্ট নেই।

—এটা কি রকম ভাবে হয়? একজন আগুনে পুড়ল, একজন জলে ডুবল, আর এ নিয়ে কোন পুলিস ইনভেস্টিগেশন হল না?

নীলের প্রশ্ন শুনে গোপাল সাহা কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বললেন,—সন্দেহের অবকাশ থাকলেও আমাদের কিছু করার নেই। আপনারা শহুরে লোক, আপনারা ঠিক বুঝবেন না। কিন্তু ইনটেরিয়ার গ্রামে এখনও এমন কিছু ঘটে বা ভাবা যায় না। উইদাউট ডেথ সার্টিফিকেটে কত দেহ দাহ হয়ে যায় তা জানেন?

আমার খুব অবাক লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, — তাহলে তো একজনকে খুন করে নিশ্চিন্তে পার পাওয়া যায়।

—যায়ই তো। দেশপাড়াগাঁয়ে এমন হামেশাই ঘটছে। লোক জানাজানি হবার আগেই মরা পোড়ানো হয়ে যায়। কৃপাসিন্ধুবাবুর কেসটাও তাই হতো। নেহাত একটা হৈচই পড়ে গেল, সবাই মিলে চেঁচামেচি শুরু করেছিল। তাই পুলিসের হাতে কেসটা চলে এল। নইলে, বডি পোস্টমর্টেম না হয়ে দাহ হয়ে গেলে, বা লোক জানাজানি না হলে এ ক্ষেত্রেও সব কিছুই ধামাচাপা পড়ে যেতো। পুলিসকে দোষারোপ করে কোন লাভ নেই।

—আপনাদের খবরটা কে দিল?

—ঐ আশ্রমেই এক ভদ্রলোক। যুবনাশ্ববাবু। লোকটি দেখলাম খুবই অনেস্ট। আগের মৃত্যুগুলো নিয়েও ওঁর মনে দ্বিধা আছে।

—কৃপাসিন্ধুর ব্যাপারে আপনি কিছু ইন্টারোগেট করেছিলেন?

—করেছিলাম। প্রত্যেকেরই উত্তর ভাসাভাসা। আসলে প্রত্যেকেই পুলিসকে এড়াতে চাইছে।

— সুবর্ণ ঘোষাল কি বললেন?

—ওঁর দেখা পাইনি। কি একটা কাজে উনি সেদিনই কলকাতা চলে গিয়েছিলেন।

—পি এম. রিপোর্টটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে?

—আছে. বলে উনি উঠে গিয়ে পিছনের লোহার আলমারি থেকে রিপোর্টটা বার করে এনে নীলের হাতে দিলেন। নীল বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রিপোর্টটা পড়ে ফেরত দিয়ে উঠে পড়ল, আপাতত আর আপনাকে বিরক্ত করবো না। পরবর্তীকালে নিশ্চয়ই আপনার সাহায্য পাব।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম। তাছাড়া ঘটনাটা আমার এলাকার। এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য পাচ্ছি তাতেই আমি কৃতজ্ঞ।

থানা থেকে যখন বের হলাম, তখন নটা বেজে গেছে। নীলকে জিজ্ঞাসা করলাম, —এবার কোথায়?

—ডাক্তার ভবতোষ ব্যানার্জির চেম্বারে। শহর ছেড়ে একজন এম. বি বি. এস ডাক্তার গ্রামে এসে

প্র্যাকটিস করছেন। এই মহানুভব ডাক্তারটিব চেম্বারটা একবার দেখা দরকার। গ্রামকে ভালবাসাই এর নেশা, নাকি অন্য কিছু সেটা তো দেখতে হবে।

হাত দেখিয়ে নীল একটা রিকশা থামালো। ওকে বলতেই ও হাজির করল ডাক্তারখানার সামনে। সাইন বোর্ডে লেখা রয়েছে ডাক্তার ব্যানার্জিস্ ফার্মেসি।

নীল সরাসরি ভেতব না গিয়ে বাইরে থেকে কিছুক্ষণ ফার্মেসিটাকে দেখল। রাস্তাব উল্টোদিকে দেখলাম পর পর আরো দুখানা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট শপ। তুলনামূলক বিচারে ব্যানার্জির চেম্বার থেকে সে দুটো বেশ জমজমাট এবং শ্রীময়। নীল ধীরে ধীরে ব্যানার্জির চেম্বারে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরের থেকে ভেতরের চেহারাটা আরো জীর্ণ এবং দীন। আলমারি, আসবাবপত্র, সব কিছুর মধ্যেই হতশ্রী ভাব। প্রায় বছর পঞ্চান্নর এক ভদ্রলোক চেয়ারে বসে সাত সকালেই ঢুলছিলেন। কোন খদ্দের নেই। কোন রুগীও না। পায়ের আওয়াজে ভদ্রলোকের ঘুম ভেঙে গেল। আরক্ত এবং বিরক্ত নয়নে আমাদের দুজনকে দেখলেন। তারপর প্রায় বিশ্রী এবং কর্কশ স্বরে বললেন,—কি চাই?

ভদ্রলোকের গলার স্বর এবং অভ্যর্থনার রীতি দেখে আমার একটি কথাই মনে হল,—ইনি যদি ডাক্তাব হন তাহলে তার চেম্বারে একটি রুগ্ণ মাছিও প্রবেশ করবে না।

নীলেব কণ্ঠস্বব শুনলাম,—আমি ডাক্তার শিবতোষ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—কোথেকে আসা হচ্ছে?

—আপনিই কি ডাক্তার ব্যানার্জি?

—ডাক্তারকে না চিনেই তাঁর সঙ্গে দেখা কবতে এসেছেন? আমিই ডাক্তার ব্যানার্জি।

—নমস্কাব। আপনাব সঙ্গে আলাপ কববার জন্যেই আমার এখানে আসা।

—কে আপনি? কি দরকার?

নীল সবাসবি ওব পকেট থেকে আইডেন্টিটি কার্ডটা বাব কবে দেখাল। ডাক্তারেব মুখে কোন ভাবান্তরই দেখা গেল না। বরং খুব বিবক্ত হয়েই বললেন,—কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ করার আমার কিসেব ঠ্যাকা?

—ঠ্যাকাটা আপনাব নয়, আমাব। এবং একটি বিশেষ প্রয়োজনেই আপনাব কাছে এসেছি।

বেশ বুঝলাম নীলের গলা ক্রমশ গম্ভীর হচ্ছে। ডাক্তার ব্যানার্জি সেই বিরক্তির সুবেই বললেন, -প্রয়োজন? কেন? আমি কি চোর না ডাকাত, না খুনি?

—আপনি একজন ডাক্তার এটাই আমি শুনেছিলাম। এবং বর্তমানে যশোদা আশ্রমে থাকেন এটা জেনেছি।

—সেটা তো মাথা কিনে নেবার মতো ঘটনা নয়। যশোদা আশ্রমে থাকা কোন্ অ্যাক্টের কোন্ অপবাধে পড়ে?

ডাক্তারের কথাবার্তা শুনতে শুনতে আমি হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখানে এসে নীলের কোন লাভ হবে বলে মনে হলো না। এই বিরক্তিকর এবং বদমেজাজি ডাক্তারের কাছ থেকে কোন সংবাদই পাওয়া সম্ভব না। কিন্তু নীলের হাল ছেড়ে দেবার মতো প্রতিক্রিয়াই দেখা গেল না। ও বলল,—যশোদা আশ্রমে বাস করা পৃথিবীর কোন আইনেই অপরাধ নয়। তবে আপনি জানেন নিশ্চয়ই, সম্প্রতি ওখানে একটা খুন হয়েছে।

—জানি। তবে তাতে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।

—কিন্তু পুলিসের মাথাব্যথা আছে। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হিসেবে আমার মাথাব্যথা আছে।

—তা আমায় কি করতে হবে? আপনার মাথা টিপে দিতে হবে?

—আমার কয়েটি প্রশ্নের নির্ভেজাল উত্তর দিতে হবে।

—যদি না দিই?

—একজন সৎ নাগরিক হিসেবে আপনি আমাব প্রশ্নেব উত্তব দেবেন বলেই আমার বিশ্বাস। তাছাড়া,

—তাছাড়া কি?

—যশোদা আশ্রমে গত ছমাসে আরো তিনটে মৃত্যু ঘটেছিল। সেগুলোব ডেথ সার্টিফিকেট আপনি দিয়েছিলেন।

—পৃথিবীতে গত ছ মাসে কয়েক হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে। কয়েক শো ডাক্তার সেইজন্য ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছে। তাদের সবার কাছে আপনাব ঘোরাঘুরি শেষ হয়ে গেছে?

—মাপ করবেন ডাক্তার ভবতোষ ব্যানার্জি, পৃথিবীতে যশোদা আশ্রম বলে একটি মাত্র জায়গা আছে, এবং সেখানে একজন ডাক্তার আছেন, তিনি ভবতোষ ব্যানার্জি। এবং তিনিই তিনটি অপঘাত মৃত্যুর ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছেন। অতএব,

—বসুন। এতক্ষণে বসাব অনুমতি পাওয়া গেল। কর্কশ গলায় ডাক্তাব বললেন, — বলুন কি আপনার প্রশ্ন? অবান্তর হলে উত্তর দেবো না আগেই বলে বাখছি।

নীল মৃদু হেসে বসল। একটা সিগারেট ধরাল। তাবপর বলল,—একটা খুনের তদন্ত করতে আপনার কাছে এসেছি সাহায্য পাবার আশায়। আপনাদেব মতো নোবেল প্রফেশানেব মানুষের কাছ থেকে তথ্য না পেলে কৃপাসিন্ধুবাবুব খুনিকে তো খুঁজে পাওয়া যাবে না।

—ভনিতা ছেড়ে আসল ব্যাপারে আসুন।

—বেশ, তাহলে বলুন, সনাতন আগুনে পুড়ে মাবা গিয়েছিল তো?

—সনাতন? মানে সেই মাতালটা? হ্যাঁ, আমাব চোখেব সামনেই লোকটা মবেছিল।

—আপনার চোখেব সামনে মানে?

—মানে ওর ঘরটা যখন জ্বলছিল, তখন আশ্রমেব সবাই সেখানে ছিল তার মধ্যে আমিও একজন

—আপনি তার মৃতদেহ দেখেছিলেন?

—শুধু মৃতদেহ কেন? আধপোড়া লোকটাকে যখন সবাই আগুন নিভিয়ে বাইবে আনল তখনও সামান্য হুঁস ছিল। তাবপর আমার চোখেব সামনেই সে মবে যায়।

—মরাব আগে সে কিছু বলেছিল?

—বলবে আবার কি? গোঁ গোঁ কবছিল।

—আর মাধব?

—সেই ডেঁপো ছোকরাটা? উঠতি কমিউনিস্ট? বেটা পাজির পাঝাড়া। স্রেফ ভড়ংবাজ এবং পাঁড় মাতাল।

—সে নাকি কুয়োয় ডুবে গিয়েছিল।

—মাতালগুলো ঐ ভাবেই মবে।

—আর রামলোচন?

—সেই গয়লাটা? সেটা তো কোন অ্যাকসিডেন্ট নয়। হার্ট ওর খুব উইক ছিল। তার ওপর বারণ করা সত্ত্বেও দিনরাত গাঁজা খেতো। একটা সিভিয়ার স্ট্রোক ব্যাস, এন্ড।

—কিছু মনে করবেন না ডাক্তারবাবু, আমাব যতটুকু জানা আছে, বা কমনসেন্স যা বলে, তাতে করে একমাত্র রামলোচন ছাড়া, আর দুটো ক্ষেত্রে আপনি তো ডেথসার্টিফিকেট দিতে পারেন না।

—তাই নাকি? আপনি আমাকে আইন শেখাচ্ছেন?

—শেখাইনি। যা সত্যি সেটাই বলছি। একটা জলে ডোবা, একটা আগুনে পোড়া দুটো কেসেই যা কিছু কবার তা পুলিস এবং পুলিস হস্‌পিটালই করবে। আপনি কেন ডেথসার্টিফিকেট দিতে গেলেন?

—আমি একজন পাশকরা ডাক্তার। যারা মরেছে তাদেব সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না, তাই আমি সার্টিফিকেট দিয়েছি।

—হসপিটাল বা পুলিসকে কিছু না জানিয়েই? জানেন এগুলো বিরাট ক্রিমিন্যাল অফেন্স?

হঠাৎ ডাক্তাব ব্যানার্জির ভ্রু কুঁচকে উঠল। কর্কশ আওয়াজটা আরো কর্কশ হলো,—আপনি কি বলতে চাইছেন?

—পুলিসকে না জানিয়ে ডেথসার্টিফিকেট দিযে আপনি আইনবিরুদ্ধ কাজ করেছেন।

—তাহলে আপনি আইনের শরণাপন্ন হন। আমাকে বিরক্ত না করে আইনমাফিক কাজ করুন।

সে কথার উত্তর না দিয়ে নীল বলল,—আপনি কি হলফ করে অথবা প্রমাণ দিয়ে দেখাতে পারেন ঐ দুটো মৃত্যু পূর্বপরিকল্পিত হত্যা নয়?

—তার মানে?

—আপনি একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার। মানেটা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?

—কিন্তু আজ কি আপনি প্রমাণ করতে পারবেন ওগুলো দুর্ঘটনা নয়, হত্যা?

—সত্যিই যদি কোনদিন হত্যা বলে প্রমাণিত হয় সেদিন আইন কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দেবে না।

—আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

—ভয় পাবার মতো কোন কাজ যদি করে থাকেন, তাহলে ভয় আপনাকে পেতেই হবে। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে আমরা উঠে বেরিয়ে এলাম। আসবার সময় আড়চোখে একবার ডাক্তারকে দেখলাম। সেখানে ভয় ছিল না। ছিল এক ক্রূর অভিব্যক্তি।

•

আশ্রমে ফিরতে ফিরতে প্রায় এগারোটা বেজে গেল। খিদেটাও পেয়েছিল বেশ। সেই কখন ভোরে একটা করে ডবল ডিমের ওমলেট আর দু ভাঁড় চা। অবশ্য ডাক্তারের ওখানে থেকে বেরিয়ে আমরা দুটো করে বসালো জিলিপি আরো এক ভাঁড় করে চা খেয়েছিলাম। চা খেতে খেতেই ওকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, —ডাক্তারকে কেমন বুঝলি?

—আনব্রেকেব্‌ল। ভাঙবেও না মচকাবেও না। লোকটা যদি একটু নিজেকে খুলে ধরতো, অনেক কিছু সহজ হয়ে যেতো।

—কিন্তু লোকটা কি ঐ রকম প্যাঁচালো স্বভাবের না কিছু লুকোতে চাইছে?

—অনেকের ওইরকম খেঁকুরে স্বভাব আছে।

বাড়ি ফিরে দেখলাম যুবনাশ্ব আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। ভদ্রলোককে সামান্য চিন্তিত এবং অন্যমনস্ক মনে হল। আমাদের দেখতে পেয়েই বললেন, —সকালে এসে আপনাদের দেখতে পেলাম না। সবাইকে জিজ্ঞাসা করলাম। কেউই কিছু বলতে পারল না। তাই ভাবলাম

—আমরা উধাও হয়ে গেছি?

—না তা নয়, তবু,

—ভয় নেই, আপনাকে না বলে যাচ্ছি না কোথাও। গিয়েছিলাম দু-একটা দরকারি কাজে।

—কাজ মিটলো?

— কোথায় আর মিটলো? আচ্ছা, আপনাদের ডাক্তারবাবু লোক কেমন?

—জঘন্য। ইতর। ডাক্তার না হাতি। লোকটার মুখের ভাষা শুনলে দ্বিতীয়বার আর কথা বলার প্রবৃত্তি হয় না। আলাপ হোক বুঝতে পারবেন।

—আলাপ হয়েছে। আচ্ছা, ওঁর পসার টসার বোধহয় তেমন নেই?

—ঐ মুখ। কোনো রুগী হাজার দরকারেও কাছে ঘেঁষবে না।

—ঐ রকম একজন লোককে সুবর্ণবাবু আশ্রয় দিলেন কেন?

—সুবর্ণর স্বভাবই তাই। কেউ এসে কেঁদে-ককিয়ে পড়লে ও আর ঠিক থাকতে পারে না।

—আশ্চর্য লাগছে।

—কেন?

—ডাক্তার কারো কাছে কেঁদে ককিয়ে পড়বে তা ঠিক বিশ্বাস হয় না।

—ডাক্তার বুঝি আপনাকে খুব যা-তা বলেছে?

এবার উত্তরটা আমিই দিলাম, — যা-তা বলে কি পার পাবে? নীলও আচ্ছা করে শাসিয়ে দিয়েছে।

—কাকে? ডাক্তারকে? বাপরে বাপ, আপনার সাহস আছে তো? ঐ ডাক্তারের মুখের সামনে ভয়ে আমরা কেউ কথা বলতে পারি না। এমন কি সুবর্ণ পর্যন্ত।

—ডাক্তারকে এত ভয় কেন?

—ঐ ব্যবহারের জন্যে।

—আপনাদের কথা বলছি না। বলছি সুবর্ণ ঘোষাল তার আশ্রয়দাতা, অথচ তিনিও ভয় পান?

—কি জানি মশাই কেন তা বলতে পারব না। তবে ডাক্তারের প্রতি ওর কোথায় একটা যেন দুর্বলতা আছে।

—কি রকম?

—একবার সুবর্ণকে নাকি কি একটা কারণে খুব বাঁচিয়ে দিয়েছিল, তাই

—কারণটা কি?

—সেটা আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে, শোনা যায় কোন একটা কারণে সুবর্ণর সামাজিক অবস্থা বিপন্ন হবার উপক্রম হয়েছিল, ডাক্তারই সেই সময় ওর সেফগার্ড হন—এই রকম আর কি? মানে কানাঘুষোয় শোনা।

তারপর সামান্য সময়ের বিরতি নিয়ে বলেন, —আচ্ছা মিস্টার ব্যানার্জি, কৃপাসিন্ধুর মার্ডার সল্‌ভ করতে আপনার কি রকম সময় লাগবে?

—হঠাৎ এ প্রশ্ন?

—আমার এখানে আর থাকতে ভাল লাগছে না। আশ্রমের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিষাক্ত পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে। আর তার পরিণতি, দেখতে পাচ্ছি, খুব খারাপ। নতুন আর কিছু খারাপ হবার আগেই আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।

– আপনি কি বিশেষ কিছু মিন করতে চাইছেন?

—অ্যাঁ, না, তেমন কিছু না, তবে,

—আমায় কিছু লুকোবেন না যুবনাশ্ববাবু। এ আশ্রমে আমি মাত্র দুদিন এসেছি। দুদিনে অনেক অসঙ্গতি আমার চোখে ধরা পড়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কারো কাছ থেকে মনখোলা ব্যবহার পাইনি। প্রত্যেকেই যেন কিছু চেপে যাবার চেষ্টা করছেন। সেটা কি তা আমি এখনও জানি না। প্র্যাকটিক্যালি আপনিই আমাকে এখানে এনেছেন।

কথা কেড়ে নিয়ে যুবনাশ্ব বললেন,—আমি তো আপনাকে কিছু লুকোইনি। তবে মানুষের কুৎসা রটাতে ঠিক আমার মন চায় না, তাই। বেশ বলছি শুনুন, নীহার আর যশোদার মেলামেশা আমার ঠিক ভালো লাগছে না।

— কেন?

— দেওর বৌদির মধ্যে একটা হাল্কা ঠাট্টার ব্যাপার থাকে আমি জানি। কিন্তু সেটা মাত্রা ছাড়ালে বোধহয় দৃষ্টিকটু হয়। অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করছি, যশোদা কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে। সুবর্ণর দিকে ওর তেমন লক্ষ্য নেই। মানুষটা কি করছে, কি ভাবছে, কি খাচ্ছে কোন কিছুই ওর যেন চিন্তার ব্যাপার নয়। অবশ্য যশোদা চিরদিনই একটু অন্য ধরনের মেয়ে। তবু ইদানীং, নাহ্ ওরা বোধহয় কাজটা ঠিক করছে না।

—আপনি স্পষ্ট করে বলুন যুবনাশ্ববাবু।

—ওদের সহজ সরল এবং মধুর দাম্পত্য জীবনে নীহার কেন এন্ট্রি নিচ্ছে? না না, এ ঠিক নয়। এ অন্যায়।

—আপনার কোন ভুল হচ্ছে না তো?

—বললাম না, মানুষকে আমি বিশ্বাস করতেই ভালবাসি। তার ওপর সুবর্ণ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। ও দুঃখ পাবে বা ওর জীবনটা তছনছ হয়ে যাবে, এ আমি চোখে দেখতে পারব না। শুধু কাল নয়, এর আগেও আরো দু-একবার ওদেরকে বিশ্রী অবস্থায় আমি নিজের চোখে দেখেছি।

-সুবর্ণবাবু ব্যাপারটা জানেন?

--খানিকটা আঁচ করতে নিশ্চয়ই পাবে।

--এ নিয়ে কোন কথাবার্তা বা তর্ক, বা মনকযাকষি?

-সে সব আমি বলতে পারব না। দাম্পত্য জীবন আমার অজ্ঞাত। তবে সুবর্ণর চাপা দুঃখটা আমি বুঝি।

--আচ্ছা যুবনাশ্ববাবু, ওদের ছেলেমেয়েকে তো দেখলাম না?

ঐ আর এক ট্র্যাজেডি। দে হ্যাভ নো ইস্যু।

—আই সী। তবে কি ফাটলের সূত্রপাত এখানেই?

-কিন্তু পৃথিবীতে বহু দম্পতি নিঃসন্তান। তাই বলে কি তারা

হঠাৎ দার্শনিকের মতো নীল বলল, —বিচিত্র মানুষের মন। কোথায় কখন কি হয় সেখানে, কেই বা আগে থেকে বলতে পারে?

এরপর দু একটা মামুলি কথার পর যুবনাশ্ব চলে গেলেন। আমরা স্নান করে উঠতে না উঠতেই শ্যামপদ খাবার নিয়ে এল। খেতে খেতে নীল একবার বলল, -- অনেকগুলো প্রশ্ন জমে যাচ্ছে রে অথচ সেগুলোর সদুত্তর পাচ্ছি না।

--কি রকম?

-গোড়া থেকেই ধর, কেন যুবনাশ্বর মতো একজন আত্মভোলা শিল্পী এখানে পড়ে থাকে?

উত্তর একটা দিতে যাচ্ছিলাম। হাত নেড়ে নীল বলল, —না, কোন উত্তর নয়। প্রশ্নগুলো শুনে নিজের মনে বৈজ্ঞানিক উত্তর ভাবার চেষ্টা কর। কেন নীহার আর যশোদার অবৈধ প্রেম যুবনাশ্বকে ভাবায়? তা কি নিছকই বন্ধুপ্রীতি? অথবা অশালীনতার কারণে পাপবোধ অথবা অন্য কিছু? তিন নম্বর, কেন সনাতন আর মাধবের মৃত্যু পুলিসের খাতায় লেখা হলো না? দুর্মুখ ডাক্তারের দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও কেন সুবর্ণ তাকে প্রশ্রয় দেন? কেন চাঁপা প্রভুর সম্পর্কে এমন কথা বলতে সাহস পায়? তার পিছনে কি সত্যিই কোন কিছু ঘটেনি এমন কথা মেনে নিতে হবে? সব জেনেও কেন যশোদাদেবী এ ব্যাপারে উদাসীন? একটা ব্যাপারে মেয়েরা বড় জেলাস। তারা স্বামীর অন্য নারীঘটিত দুর্বলতা কখনোই সহ্য করতে পারেন না। অথচ যশোদা? বুঝতে পারছি না। কৃপাসিন্ধু হত্যার মোটিভ কি? রামলোচনের মৃত্যুর পর মুখে মাথায় খড়ভূষির টুকরো লেগে থাকবে কেন? সমূহ বিঘ্ন আছে জেনেও কেন ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট দেয়? কেনই বা সে ভদ্রতা বহির্ভূত দুর্মুখ? সুবর্ণর কোন্ দুর্বলতায় ডাক্তার এত উদ্ধত?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নীলকে বললাম, -- তুই প্রশ্নগুলোর জবাব পেয়েছিস?

--আমার কথা পরে। প্রশ্ন রাখলাম। চিন্তা কর। তারপর তোর আমার চিন্তার কতটা মিল পরে মিলিয়ে দেখব। এখন চ। বেরুতে হবে।

—এই দুপুর রোদে? যাবি কোথায়?

--দুপুর না হলে মাধবের মাকে পাওয়া যাবে না। কৃপাসিন্ধুর মেয়েকেও যে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

অতঃপর দিবাবিশ্রাম ছেড়ে বেরুতে হল। ভাগ্যি ভালো জায়গা দুটোই খুব কাছাকাছি। প্রথমেই আমরা গেলাম কৃপাসিন্ধুর বাড়ি। ওটাই আমাদের নিকটবর্তী স্থান। কৃপাসিন্ধুর মেয়ে রমা বসেছিল একা, উদাস হয়ে। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়াল। রমা দেখতে খারাপ না। কিন্তু চোখে মুখে বিষণ্ণতার ছাপ। বিয়ে হয়েছিল শ্যামাপদর মুখেই শোনা। সিঁথিতে কোন সিঁদুর-চিহ্ন চোখে পড়ল না। বয়েস ত্রিশের কাছে।

—এ সময়ে? আপনারা?

নীলই উত্তর দিল, — ঠিক এই মুহূর্তে আপনাকে বিরক্ত করতে আমারও ভালো লাগছে না। তবু

ম্লান হেসে রমা বললেন — আমি জানি, বাবার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আপনাদের কিছু জিজ্ঞাস্য

থাকবেই। আর অপ্রিয় অন্তত সুখকর না হলেও আমাকে উত্তর দিতেই হবে। আপনাদের বসতে দেব মত চেয়ার টেয়ার কিন্তু আমার নেই।

নীল ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে বলল, — আমারও টেয়ারে টেয়ারে বসার মতো ইচ্ছে নেই আপনি বসুন।

তারপর আর কোন রকম ভূমিকা না করেই নীল বলল, — আপনার বাবার মৃত্যুটা অস্বাভাবিক পুলিসের মতে এটা খুন। এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্টও তাই বলছে। এখন আমার প্রশ্ন আপনার বাবাকে কে খুন করতে পারে বলে আপনার ধারণা?

—এ ব্যাপারে আমার কোন ধারণাই নেই। বাবার কোন শত্রু আছে বলে আমার মনে হয় না

—কেন?

—বাবার কি আছে? না আছে অর্থ না আছে সম্মান। চিরদিন এর-ওর কাছে হাত পেতে সংসার চালিয়েছেন। তাছাড়া তিনি অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন।

—কিন্তু মৃত্যুর আগের দিন সন্ধেবেলা সুবর্ণবাবুর সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়।

—মনিবের সঙ্গে চাকরের কি ঝগড়া হয়? মনিব ধমকান, চাকর মাথা পেতে তা হজম করে

—সুবর্ণবাবু কি রাগের মাথায় ওঁকে খুন করতে পারেন?

—কী যে বলেন? আমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া হলে তিনি বাবাকে তাড়িয়ে দেবেন, খুন করবেন কোন দুঃখে?

—পুলিস রিপোর্ট বলছে ওঁর মৃত্যু হয়েছিল শেষ রাতে অর্থাৎ ভোর সাড়ে চার কি পাঁচটার নাগাদ ঐ সময়ে উনি তেঁতুলতলায় কেন গিয়েছিলেন বলতে পারবেন?

খুব ভোরে ওঠা বাবার বহুদিনের অভ্যেস। প্রতিদিনই চারটে সাড়ে চারটের মধ্যে উনি উঠে পড়তেন, খানিকক্ষণ বাগানে পায়চারি করে বাথরুমে যেতেন। তারপর স্নান সেরে আহ্নিকে বসতেন। সেদিনও হয়ত তাই করতে চেয়েছিলেন।

—ওর এই অভ্যেসটা এখানে কে কে জানে?

—সবাই।

—উনি তো শুঁড় গুটোনো বিদ্যাসাগরী চটি পড়তেন?

—হ্যাঁ।

—ওঁর চটি জোড়া কি ঠিকমত আছে?

—ঐ তো রয়েছে, দেখুন না। দরজার সামনে।

—তার মানে ঐ একপাটি চটি মিস্টার ঘোষালের।

রমা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, —তার মানে?

—না কিছু না। আচ্ছা, ওর মৃতদেহটা কে প্রথম দেখতে পায়?

—আমি। কারণ ভোর ছটায় আমার ঘুম ভাঙে। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে দেখি বাবা বিছানায় নেই।

—আপনার বাবা যে বিছানায় তখন থাকবেন না এ তো আপনার জানা কথা।

—অন্য দিন হলে ব্যস্ত হতুম না। কিন্তু আগের দিন সুবর্ণবাবুর কাছে ধমক খাবার পর উনি বুকে ব্যথা নিয়ে বাড়ি ফেরেন। ভবতোষ ডাক্তারের পরামর্শমত ওঁর তিন সপ্তাহ বিছানায় শুয়ে থাকার কথা। তাই সেদিন বাধ্য হয়েই আমার অবাধ্য বাবাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। কিন্তু

—ঠিক আছে, আর ও সম্বন্ধে আমার কোন প্রশ্ন নেই। এবার ব্যক্তিগত দু-একটা প্রশ্ন যে আমাকে করতে হচ্ছে।

—বলুন।

—আপনি তো বিবাহিতা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তবুও আপনি বাবার আশ্রিতা কেন?

—আমার স্বামী দুশ্চরিত্র। মদ জুয়ো ছাড়াও নারীঘটিত স্ক্যান্ডাল আছে। আমি সেসব মেনে নিতে পারিনি। তাই ফিরে এসেছি বাবার কাছে।

—এখানে সবাইকেই কিছু না কিছু আশ্রমের কাজ করতে হয়। আপনার কাজ কি?

—সকাল সন্ধে আশ্রমের কিছু ছেলে মেয়ে কে পড়াতে হয়। আর বিকেলটা লাইব্রেরির কাজকর্ম

—গতকাল সুবর্ণবাবু কতক্ষণ লাইব্রেরিতে ছিলেন?

—কাল তো লাইব্রেরি খোলা হয়নি। কারণ আমি তখন শ্মশানে।

—আশ্চর্য, নীল প্রায় বিড়বিড় করে বলল, অথচ সুবর্ণবাবু তখন লাইব্রেরিতে বসে?

—তা কি করে হবে? লাইব্রেরির চাবি তো আমার কাছে থাকে?

—আপনি ঠিক জানেন কাল লাইব্রেরি বন্ধ ছিল?

—হ্যাঁ। কারণ লাইব্রেরি রুমের ডুপ্লিকেট চাবি হারিয়ে গেছে। এখনও করানো হয়নি।

—তাহলে উনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

বেশ অবাক হয়ে রমা বললেন, —আপনি কি কিছু মিন করছেন?

—না। সে আপনি বুঝবেন না। ঠিক আছে রমা দেবী, আর আপনাকে বিরক্ত করব না। পরে দরকার পড়লে আসতে পারি।

রমা ধীরে মাথা নেড়ে আমাদের বিদায় জানাল। বাগানে নেমে নীল জিজ্ঞাসা করল, —কিন্তু অজু, মোটিভটা কী? কেন? কেন? কেন কৃপাসিন্ধুকে হত্যা করা হলো?

—একটা জিনিস তুই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিস নীল, খুনি কিন্তু জানতো কৃপাসিন্ধু খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে এবং বাগানে পায়চারি করে।

—সবই বুঝলাম, প্রথম ডাবলিউ, মানে হোয়াই? হোয়াই কৃপাসিন্ধু ওয়াজ মার্ডারড? তাকে মার্ডার করার পেছনে কী অন্য রহস্য আছে? ব্যাপার তুই বলতে পারিস কৃপাসিন্ধু বোধহয় উপলক্ষ, কারণটা অনেক গভীরের ব্যাপার।

—আরো একটা ব্যাপার, হত্যার অস্ত্রটা কিন্তু লোপাট।

—তুই কি বলছিস তা বুঝতে পারছি। হত্যার অস্ত্র অনেক সময় খুনির নেচার বলে দেয়। তবে কি জানিস, এখানে অস্ত্র কোন ফ্যাক্টর নয়। তুই যদি গোড়া থেকে ধরিস, অর্থাৎ সনাতন, মাধব, রামলোচন আর কৃপাসিন্ধু,

বাধা দিয়ে বললাম, —আগের তিনটেকেও তুই মার্ডার মনে করছিস?

—সনাতন আর মাধব? আমি মনে করি এ দুটোই মোটিভেটেড। রামলোচনকেও বাদ দিতে পারছি না। ভুলে যাস না, তার সারা মুখে আর মাথায় মৃত্যুর আগে খড় ভুষি আর বিচুলির টুকরো পাওয়া গিয়েছিল। ভুলে যাস না, মৃত্যুর আগে, আগের দুজনের মতো তারও ঝগড়া হয়েছিল সুবর্ণ ঘোষালের সঙ্গে। আমি এখন ধীরে ধীরে ভাবতে পারছি চার চারটে মৃত্যুই একই মস্তিষ্ক প্রসূত হত্যার চেইন মানে ধারা।

—তার মানে কোন একজন বিশেষ লোকই এই চারটে খুন করেছে?

—আমার রিডিং, আমার ইনট্যুইশন, সাধারণত এসব ক্ষেত্রে ভুল কমই করে। আর সেই কারণে বলছি, অস্ত্র কোন ফ্যাক্টর না। খুনি যখন যেমন সুযোগ পাচ্ছে, সেই সুযোগগুলোকে সে ব্যবহার করছে। সনাতন খড়ের বিছানায় বসে মদ খায়। তার সামনে হ্যারিকেন জ্বালা থাকে। একজন মাতালকে মারার পক্ষে কি দারুণ অস্ত্র বলতো! হ্যারিকেনের কাচ ভেঙে খড়ের গাদায় উল্টে দিতে পারলেই বস। ঘর থেকে একজন বেহেড মাতালের পক্ষে বেরিয়ে আসা শক্ত ব্যাপার।

—কিন্তু ওর বৌ বেরিয়ে আসতে পেরেছিল।

—চাঁপাকে এত পতিব্রতা রমণী ভেবে নিলি কী ভাবে?

—তার মানে চাঁপা?

—ও সব মানে টানে পরে, তারপর ধর মাধব। মৃত্যুর আগে তারও সুবর্ণ ঘোষালের সঙ্গে ঝগড়া হল, শুনেছি সেও মদ খেতো. আর তারপরেই তার লাশ পাওয়া গেল কুয়োর মধ্যে। অর্থাৎ খুনি এখানে খুন করার সহজ উপায় ওটাই করে নিয়েছে। কোন প্রমাণ নেই, কোন অস্ত্রের দরকার নেই পেছন থেকে গিয়ে একজন অন্যমনস্ক লোককে সম্ভবত মদ্যপ, ধাক্কা দিয়ে কুয়োর মধ্যে ফেলে দেওয়া খুব একটা শক্ত কাজ নয়। রামলোচনের ব্যাপারটা এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু কৃপাসিন্ধুর কেসটা একেবারে জলের মতো সোজা। হার্টের অসুখের অসুস্থ লোক, প্রায় অন্ধকার বাগানে এক পেছন থেকে একটা শাবল সজোরে মাথার খুলি ফাটিয়ে দিল, তাছাড়া

-কী তাছাড়া?

খুনি একবার মারার পরও মৃত্যু সম্বন্ধে ডেফিনিট হয়নি। তাকে দুবার আঘাত করতে হয়েছিল

সেকি, এসব তুই বুঝলি কি করে?

পি.এম রিপোর্ট তাই বলছে। দ্বিতীয় আঘাত পড়েছিল ঘাড় এবং স্পাইন্যাল কর্ডের সংযোগ স্থলে। মেডুলা গুঁড়ো হয়ে গেছে।

- তার মানে খুনি খুবই শক্তিশালী।

-কতটা শক্তিশালী জানি না, তবে পুরুষ।

কি করে বুঝলি?

- মেডুলা গুঁড়ো করে দেওয়া অথবা ব্যাক স্কাল চূর্ণ করে দিতে গেলে যতটা জোর আঘাতের দরকার সেটা সাধারণ কোন মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়।

- -তুই কি কাউকে সন্দেহ করছিস?

যশোদা আশ্রমের কজনকেই বা চিনি বল?

-আমার কিন্তু কয়েকজনকে বেশ সন্দেহ হয়।

- প্রথম ব্যক্তি নিশ্চয়ই সুবর্ণ ঘোষাল?

হ্যাঁ।

কিন্তু এ ধরনের কয়েকটা সাধারণ লোককে সামান্য কারণে সুবর্ণ ঘোষাল খুন করবেন? কি জানি?

- -আমি এমনি এমনি বলছি না। মোটিভও আছে।

- কি রকম?

- -সুবর্ণ ঘোষাল নিজের সম্বন্ধে একটা অলৌকিক মিথ তৈরি করেছেন। কেন, কি জন্যে তা জানি না। তবে নিজেকে অবতার প্রতিপন্ন করার জন্যে, অথবা সেই মিথকে আরো বেশি সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই যে এইসব হত্যা নয়, তা কি তুই হলফ করে বলতে পারিস?

- -তোর যুক্তি একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি না। মানুষের ইগো এবং ইগো বজায় রাখাও হত্যার একটা মোটিভ হতে পারে বৈকি। তারপর আর কে আছে তোর লিস্টে?

ডাক্তার ভবতোষ ব্যানার্জি খুবই সন্দেহজনক। কিন্তু জোরালো মোটিভ পাচ্ছি না। চাঁপা খুনি কিনা জানি না. কিন্তু খুনির সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকতে পারে।

তার মানে যশোদা আশ্রমের হত্যা-রহস্য বেশ জটিল।

—তুই কি বলিস?

— দেখা যাক।

কথা বলতে বলতে আমরা মাধবের ঘরের কাছে চলে এসেছিলাম। এটাও কৃপাসিন্ধুবাবুর ঘরের মতোই। অতি সাধারণ এক কামরার ঘর। দাওয়ার কাছে দাঁড়িয়ে নীল হাঁক দিল, —মাধবের মা আছো নাকি?

একটু পরেই ঘরের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল এক প্রৌঢ়া। বয়েস প্রায় পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে। রোগা রোগা কালোকুলো চেহারা। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল পেছন দিকে টেনে গুটি পাকিয়ে রাখা হয়েছে

মুখ চেহাবার মধ্যে দীনতা পাকাপোক্তভাবে বাসা বেঁধেছে। অসহায় করুণ দৃষ্টিতে ফুটে উঠছে পৃথিবীর প্রতি বৈরাগ্য। নীলের দিকে খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলল, —আপনাবা কোত্থেকে আসছ?

নীল বলল, —আমাদেব তুমি ঠিক চিনতে পাববে না। আমবা তোমাব বাবুব এখানে কদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি। সরলা তো তোমাবই নাম।

—হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে তোমাদেব কী দরকার?

—তোমাব ছেলের ব্যাপারে তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন কবতে চাই।

—আমাব ছেলে? মাধব? সেতো আর নেই।

—জানি। কিছুদিন আগে সে মাবা গেছে। দেখ সবলা, তোমাকে সত্যি কথাই বলি, আমবা এখানে এসেছি একটা খুনেব তদন্ত কবতে। কয়েকদিন আগেই এখানে খুন হয়ে গেছে তা নিশ্চয়ই জানো?

—জানি, কৃপাবাবুব কথা বলছ তো? কিন্তু আমি তাব সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমি আব কারো কোনও খবরই রাখি না। যে কদিন পরমায়ু আছে কর্তাবাবুব কাজ করেই মরে যাব।

—না সবলা, আমি তোমাকে কাবো সম্বন্ধেই বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করব না। কিন্তু তুমি তোমার ছেলে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু বলতে পারবে।

—সে তো চলেই গেছে। আব তাকে নিয়ে কেন টানাটানি?

—টানাটানি কবলে আব সে ফিবে আসবে না তা জানি, তবে মৃত্যুর সঠিক কাবণটা বোধ হয় জানা যাবে।

—কাবণ আবাব কি? সে কুয়োয় ডুবে মারা গেছে।

—কিন্তু কুয়োব মধ্যে পড়ল কি ভাবে?

—জানি না। সবাই বলল বাবুব মনে কষ্ট দিয়েছে তাই ভগবান তাকে টেনে নিয়েছে।

—একথা তুমি বিশ্বাস কব?

—আমাব বিশ্বেস অবিশ্বেসে কি এসে যায়?

—নিশ্চয়ই এসে যায়। তুমি তাব মা। তুমি কি মিথ্যে কথা বলতে পাব? তুমি বল, আমি ঠিক বিশ্বাস কবব।

নীলের মুখের দিকে করুণ দৃষ্টি মেলে সরলা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তাবপব হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। নীল কিন্তু ওর কান্নায় কোন বাধা দিল না। এক সময় সবলা থামল। তাবপব ধীরে ধীরে বলল, —আমি কিছুতেই বিশ্বাস কবি না, ঐ ভাবে মাধো কুয়োয় ডুবে মবতে পাবে?

—কেন?

—মাধো আমার শক্ত সমর্থ যোয়ান ছেলে। তায় কুয়োব পাড়টা অনেকখানি উঁচু। লাফ দিয়ে না পড়লে কেউ কুয়োর মধ্যে পড়তে পারে না।

—তাব মানে তুমি বলছ কেউ ওকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল?

—জানি না, আমি কিছু জানি না। শুধু জানি সে আব নেই।

—আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে ও নেশাব ঝোঁকে টাল রাখতে না পেরে পিছলে পড়ে গিয়েছিল।

—না, হঠাৎ সরলা সব হারানো এক রোখা মানুষের মত চিৎকার করে বলে উঠল, ওবা সবাই মিথ্যে করে বলেছে। আমাব মাধোব অনেক দোষ ছিল। সে বাবুকে অনেক ধমক ধামকও দিয়েছিল, কিন্তু সে কোনদিনও নেশা কবত না।

—তুমি ঠিক বলছ মাধো কোনদিনও নেশা করেনি?

—আমার মরা ছেলের নামে দিব্যি দিয়ে বলছি বাবু। ববং সেই আমাকে কতদিন বলতো, নেশা মানুষকে ইতর করে দেয়। মানুষের নিজেব পায়ে দাঁড়াবাব পিবিত্তিব নষ্ট হয়ে যায়। সত্যিকাব মানুষ হতে গেলে মানুষকে অন্য নেশা করতে হয়। পড়াব নেশা। জানো বাবুবা, মাধো আমাব ঝিয়েব ছেলে হলেও, যখুনি সময় পেতো তখুনি বই পড়ত। দেখবে, দেখাবে সেই সব বই। এসো, আমি সব যত্ন

করে রেখে দিইচি।

বলেই সরলা ঘরে ঢুকে গেল। তারপর আমাদের হতভম্ব করে দিয়ে কয়েকটা বই ঘর থেকে নিয়ে এল। নীল সাগ্রহে সেই বইগুলো হাত বাড়িয়ে নিল। সব কটাই বাংলা বই। কিন্তু সবকটাই মোক্ষম বই, 'মানুষ এলো কোথা থেকে', ডারউইনের 'মানুষ কি করে বড় হলো', মার্কস-এর 'কেমন করে সাচ্চা কমিউনিস্ট হওয়া যায়', গোর্কির 'মা'।

বইগুলো দেখে নীল বেশ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো। তারপর সরলাকে বলল, -এ বইগুলো তোমার ছেলে পড়তো?

--হ্যাঁ বাবু। সারাদিন বাগানের দেখাশুনো করতো। আর সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে হেরিকেন জ্বালিয়ে ঐ সব বই নিয়ে তন্ময় হয়ে যেতো।

---তোমার ছেলে লেখাপড়া শিখেছিল? মানে স্কুলে পড়াশুনো করেছিল?

--সরকারী ইসকুলে আট কেলাস পর্যন্ত পড়েছিল। তখনও মাধোর বাবা বেঁচে। তারপর সেও মারা গেল, এলুম বাবুদের কাছে। তিনি আশ্রয় দেলেন। কাজ পেলুম বাবুর বাড়িতে আর মাধো পেল বাগান দেখাশুনোর কাজ।

-তোমার ছেলের কোন বন্ধু-বান্ধব ছিল না?

--ছিল। কয়েকজন মাঝে মাঝে এ ঘরে এসে বসতো।

হুঁ। বুঝলাম। কিন্তু সুবর্ণবাবু বললেন মাধব নাকি বাগানের ফলমূল চুরি করে বিক্রি করতো আর সেই পয়সায় মদে চুর হয়ে থাকতো।

--মিথ্যে কথা। বাবুর কান ভাঙানোর লোকের কি অভাব আছে?

- মাধবের কি শত্রু-টত্রু ছিল?

- কী ছিল আমার মাধোর, যে তার শত্রু হবে?

- এমনও তো হতে পারে ও হয়তো অজান্তে কারো ক্ষতি করেছিল।

-তাই বলে সে আমার মাধোকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দেবে?

---অর্থাৎ তোমার দৃঢ় বিশ্বাস কেউ তোমার মাধবকে খুন করেছে?

--আমি জানি না, আমি আর কিছু জানি না।

---আর একটা কথা সরলা, মাধব মারা যাবার পর, তোমরা পুলিসে খবর দিলে না কেন?

কে দেবে? আর পুলিস আমার মতো মেয়েমানুষের কথা শুনবে কেন? সবাই বলল ও নেশা করে ডুবে মরেছে। অপঘাত মৃত্যু।

—কে কে বলেছিল?

---ডাক্তারবাবু বলল। আমার বাবুও বলল। ডাক্তারবাবু আবার সার্টিফিট লিখে দিল।

- তোমার সন্দেহের কথা তুমি আর পাঁচজনকে বললে না কেন?

-ঐ তো বললুম, কাকে বলব? কে শুনবে?

-- তোমার বাবুকে বললে না কেন?

--বলেছিলুম। উনি বললেন এ নাকি ভগমানের মার। নিয়তি। মানুষ কিছুই করতে পারে না।

নীল সহসা এ কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। তারপর বলল, —আমি জানি না সত্যিই কেউ তোমার মাধোকে খুন করেছে কি না। তবে আসল সত্যিটাকে আমি খুঁজে বার করব।

- কী হবে তা দিয়ে?

তুমি চাও না সত্যিই যদি কেউ তোমার মাধোকে খুন করে থাকে তার মুখটা দেখতে?

--তাতে কি মাধো ফিরে আসবে?

--না আসুক। তবু সে খুনি। সে একজন নিরীহ মানুষকে নিষ্ঠুরের মত পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তাকে শাস্তি পেতেই হবে।

সরলা ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, —ঐ বাবুও ঠিক এই কথাই বলেছিল।

--কোন বাবু।

—ঐ যে, গানপাগলা বাবু।

—যুবনাশ্ববাবু?

--হ্যাঁ। আমায় আলাদা ডেকে বলেছিল, নিশ্চয়ই মাধোকে কেউ খুন করেছে। একটা জলজ্যান্ত ছেলে ঐভাবে কুয়োয় ডুবে মরতে পারে না।

—আর কী বলেছিল?

—বলেছিল, এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। ঐ বাবুই তো বারবার পুলিসে খবর দিতে চাইছিল। কিন্তু কেউই শুনল না তেনার কথা।

সবলাকে আশ্বাস দিয়ে আমরা ফিরে এলাম। আসার পথে একবার কুয়োতলায় গেলাম। সবলা ঠিকই বলেছিল. কুয়োর পাড়টা বেশ উঁচু। আর সেই কারণেই কপিকলের বন্দোবস্ত রয়েছে। অর্থাৎ কাউকে জল তুলতে হলে কপিকলের দড়ি নামিয়ে তুলতে হবে। নীল ভাল করে দেখতে দেখতে বলল, কী বুঝছিস?

বললাম, --হঠাৎ স্লিপ করে পড়ে যাবার সম্ভাবনাই নেই। যদি না কেউ পেছন থেকে ঠেলে ফেলে দেয়।

--সেটা ঠিক কী ভাবে সম্ভব?

আমি বললাম, —ধর দড়ি নামিয়ে জল তোলা হোল। তারপর নিশ্চয়ই একটু ঝুঁকে সেই দড়ি সমেত বালতিটা ধরতে হবে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কেউ যদি আচমকা হেঁচকা টানে মাটি থেকে পা দুটো তুলে সজোরে সামনে ধাক্কা দেয় তাহলে কুয়োয় তলিয়ে যেতে অসুবিধার কী আছে।

-তোর অনুমানই ঠিক। আচ্ছা, এর জন্যে কী খুব শক্তিশালী লোকের দরকার?

—শক্তিশালী লোক হলে খুবই ভাল। না হলেও চলে। কারণ বডি তখন খুবই আনব্যালেনসড থাকে। সামান্য ধাক্কাতেই কাজ হাসিল হতে পারে।

—কুয়োর মধ্যে একটা বালতি পাওয়া গিয়েছিল। মনে আছে?

—আছে। সেটা মাধবেরও হতে পারে। হয়ত খুনি কেসটাকে দুর্ঘটনা প্রতিপন্ন করার জন্যে নিজেই বালতিটা ফেলে দিয়েছিল।

—বেশ। কিন্তু ঘটনাটা কখন ঘটতে পারে বলে তোর মনে হয়?

—সেটা কেমন করে বলব বল? ভোর রাতেও হতে পারে, গভীর রাতেও হতে পারে।

—অর্থাৎ, খুনি এখানেও তক্কে তক্কে ছিল। সে জানতো, মাধব অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনো করে। সাধারণত মানুষ ঘুমতে যাবার আগে একবার বাথরুমে যায়। কেউ কেউ মুখে জলও দেয়। অর্থাৎ যে কোন কারণেই হোক মাধবকে সে রাত্রে কুয়োতলায় যেতে হয়েছিল।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, —তার মানে তুই বলতে চাইছিস খুনি সে রাত্রে সর্বক্ষণ মাধবের আশায় ওত পেতে ছিল?

চিন্তা করতে করতে নীল বলল, —সাধারণত খুনি ভোররাতের রিস্ক নেয়নি। কারণ ভোররাতে অনেককেই কুয়োতলায় যেতে হয়। যা হয়েছে তা মাঝরাতেই অথবা প্রথম রাতেই হয়েছে। হয়ত খুনিকে এর জন্যে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে। এনিওয়ে, এটাও খুন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

—পলিটিক্যাল মার্ডার হতে পারে কি? যতদূর মনে হয় ও কোন পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল।

ঘাড় নাড়তে নাড়তে নীল বলল, —যদিও একটা বিশেষ দলের প্রতি মাধবের আসক্তি ছিল, তবু মাধব সেই ধরনের কমরেড নয়, যাকে মারতে এত প্ল্যান করতে হবে। পলিটিক্যাল মার্ডার হলে আরো ওপ্‌ন হোত। ছোরাছুরি বা পাইপগানই যথেষ্ট। নাবে অজু, তোকে আবারও বলছি, সবকটা মৃত্যু কেমন যেন একটা চেইনে বাঁধা, এক ছকে তৈরি। বাট হোয়াই? তবে তোকে বলে রাখছি, দেখিস, আমার ধারণা যদি মিথ্যে না হয়, এবং কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এ মার্ডারগুলো করা হয়ে থাকে, তাহলে খুনের এখানেই শেষ নয়।

—তার মানে?

- -মানে, কৃপাসিন্ধুই শেষ নয়, আরো কিছু মৃত্যু যশোদা আশ্রমে ঘটতে পারে।

—এ কথা তুই কী করে বলছিস?

—আরো গভীর ভাবে ভাবলেই দেখতে পাবি মৃত্যুর খাঁড়া আরো কয়েক জনের ঠিক মাথার কাছে ঝুলছে।

—তুই কাদের কথা বলছিস?

—আর এখন কোন কথা নয়। চল আশ্রমটা একটু টহল দিয়ে দেখি।

দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। সরলার ঘর থেকে ফেরার পর নীল বেশ চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। সর্বদাই নিজের মনে বুঁদ হয়ে থাকতো। এর মধ্যে ও বার দুয়েক গোপাল সাহার সঙ্গে দেখা করেছে। অবশ্য আমাকে ছাড়াই। দুর্ঘটনার জায়গাগুলো অনেকবার অকারণে ঘুরেছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু লক্ষ্য করেছে। ওর গম্ভীর আর কোঁচকানো ভুরুর দিকে তাকিয়ে আমি ওকে কোন প্রশ্ন করতে সাহস পাইনি। আর এই সাত দিন আমাকে একা একাই থাকতে হয়েছে। আমি নিজে যশোদা আশ্রমের সব কটা মৃত্যুকে খুব ভেবে নিজের মনে বহু তদন্ত করেছি। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। কারণ মৃত্যুগুলোর কোনও মোটিভ খুঁজে পাইনি। যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের না ছিল বিত্ত না ছিল প্রতিপত্তি। অত্যন্ত সহজ সাধারণ আর গরিব মানুষের মৃত্যু এবং সূত্র না রেখে যাওয়া খুন তদন্তের ক্ষেত্রে বড় জটিল হয়ে দাঁড়ায়। অতএব 'নেই কাজ তো খই ভাজ' এর মত আশ্রমের অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে যেচে যেচে আলাপ করেছি। কিন্তু সন্দেহ করার মত কিছু পাইনি। সকলেই অতি সাধারণ; সকলেই সুবর্ণ ঘোষালের আশ্রিত। এর মধ্যে একদিন দেখা হয়ে গেল ক্যাশিয়ার বীরেন সরকারের সঙ্গে। উনিও কৃপাসিন্ধুবাবুর মতো একখানা ঘরেই থাকেন। অবশ্য ওঁর সংসারটা সামান্য বড়। স্ত্রী এবং দুই মেয়ে। মেয়ে দুটি নাবালিকা। বীরেনবাবু ছাপোষা গেরস্ত মানুষ। চারজনের সেই সংসারটুকু সামলাতেই বেশ হিমসিম খেতেন। শহরের কোন এক অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি ছিলেন। ক্লোজারের পর অফিসটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উনি বেকার হন। তারপর কোন এক সূত্রে সুবর্ণবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ায় উনি উপবাসে মরার হাত থেকে রেহাই পান। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের মধ্যেই। চোখে মুখে দারিদ্র্যের চিহ্ন প্রকট। মেয়ে দুটো অপুষ্টিতে রোগা। স্ত্রীরও নানান ব্যামোর উপসর্গ। কৃপাসিন্ধুবাবুর কথা উঠতেই ভদ্রলোকের চোখ ছলছলিয়ে উঠল। বললেন, —কৃপাদার মতো লোক হয় না। উনি বড় নিরীহ আর ভালোমানুষ ছিলেন। কর্তা আমাদের দুজনকেই মিছিমিছি দুষলেন। বিশ্বাস করুন আমরা টাকাপয়সার কানাকড়িও সরাইনি।

জিজ্ঞাসা করলাম মৃত্যুর আগের দিন সন্ধেবেলা কৃপাসিন্ধুবাবু কি কর্তাকে শাসিয়েছিলেন?

উত্তরে উনি বললেন, —কী যে বলেন স্যার? সব হারিয়ে আমরা এখানে খড়কুটো ধরে বেঁচে আছি। এটুকু আশ্রয় গেলে আমাদের আর কী থাকবে বলুন? আমরা কি কর্তার মুখের ওপর কথা বলতে পারি?

- -কিন্তু সুবর্ণবাবু তো সেই রকমই ইঙ্গিত দিলেন।

---আমি তো সর্বক্ষণ সামনেই ছিলাম। বলার মধ্যে কৃপাদা বলেছিলেন, —একবার ভুল করেছিলুম, তাই বলে কি আর সেই ভুল করতে পারি? মানুষ মাত্রেই ভুল করে। আপনিও তো করেছেন। ব্যস, আর যায় কোথা? এই কথা শুনেই কর্তা চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। তারপর কৃপাদাকে বলেন তিনদিনের মধ্যে আশ্রম ছেড়ে দিতে।

—এছাড়া আর কোন কথা হয় নি?

—না।

— সুবর্ণবাবুর ভুলটা কী সেটা আপনি জানেন?

---না স্যার।

ধীরেনবাবুর সব কথাই নীলকে বলেছিলাম। শুনে ও কেবল 'হুঁ' বলে চুপ করে গিয়েছিল। এরই মধ্যে আশ্রমের একটি ইনটারেস্টিং লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। নিকুঞ্জ সরখেল। আশ্রমের সিকিউরিটি অফিসার। অথবা নাইট ওয়াচম্যান। সরখেল টাইটেলের সঙ্গে নিকুঞ্জবাবুর অতীত পেশার মিল আছে। আগেকার দিনে সরখেল টাইটেল পেতো সামরিক বিভাগের লোকেরা। নিকুঞ্জ সরখেলও সামরিক বিভাগে উচ্চপদে কাজ করতেন। কিন্তু একটা দুর্ঘটনায় ওঁর বাঁ হাতটা বাদ যায়। তার ফলে সামরিক বিভাগ থেকে অবসর নিতে হয়। ভাগ্যের ফেরে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েন সুবর্ণবাবুর আশ্রমে। ভদ্রলোকের চেহারাটি সত্যিই সামরিক বিভাগের কর্মচারীর মতই। ছ ফুট দু ইঞ্চির মতো লম্বা। স্বাস্থ্যও সেই রকম। ছাতির মাপই কম করে চুয়াল্লিশ ইঞ্চি। বাঘের মত হাতের থাবা। আমাদের মত যে কোন বাঙালির ছেলেকে একটি থাপ্পড়ে খানিকক্ষণের জন্যে অজ্ঞান করে দিতে পারেন। গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। সব থেকে দেখার মত গোঁফ এবং তার প্রান্তভাগের ছুঁচলো অংশটি। আমার মনে হয় সারাদিনে ওর বেশি সময় কাটে গোঁফের তদারকিতে। যেচে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। কিন্তু উনি তো আমাকে তেমন কোন পাত্তাই দিলেন না। কথাবার্তাও কাটা কাটা, রসকষহীন। বেশির ভাগই 'হাঁ' কিংবা 'না'-এর ওপর দিয়ে সারেন। আশ্রমের সাম্প্রতিক খুন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে বললেন কারো মারা যাবার কোন হিসেব রাখার দায়িত্ব ওর নয়। উনি কেবল রাত্রে চোর ছ্যাঁচড়ের অনুপ্রবেশ যাতে না ঘটে তাই দেখবার জন্যেই নিযুক্ত হয়েছেন। আমি সেই সময় একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রাতের বেলায় যদি কেউ আশ্রমের কোন লোককে খুন করে সেটাও কি উনি দেখবেন না? উত্তরে উনি বলেছিলেন, না। চোর বা ডাকাতের মোকাবিলা করাই তাঁর ডিউটি। কে কাকে কোথায় প্ল্যান করে মার্ডার করছে তা দেখার কোন দায়িত্বই নাকি তার নেই।

এটা কী ধরনের দায়িত্বজ্ঞান আমি বুঝি না। অবশ্য একটা কথা উনি বলেছিলেন, উনি গোয়েন্দা বা পুলিস নন যে খুনির পেছনে ছুটবেন। অবশ্য সামনাসামনি পড়লে ওর বাঁহাতের জন্যে যে জিনিসটি রাখা আছে তার হাত থেকে কোন চোর ডাকাত বা খুনি রেহাই পাবে না। বলেই পাশের দেরাজে রাখা একটি কৃত্রিম হাত তুলে দেখিয়েছিলেন। সেটিকে হাত বলা ভুল হবে। স্টিলের তৈরি একটি অস্ত্র বিশেষ। নিজের নুলো হাতের মুখে সেই যন্ত্রটি লাগিয়ে বেল্ট এঁটে দিলেন। চওড়া মুখ একটি নল। নলের মুখটি হ্যাঙারের আঁকশির মতো। যন্ত্রটি সেট করার পর হঠাৎ অতি দক্ষতায় আঁকশি দিয়ে আমার হাতটা আটকে দিয়ে বলেছিলেন, —একবার চেষ্টা করে দেখুন তো পালাতে পারেন কিনা। পালাতে গেলেই বড়শির মুখে মাছের মতো আটকে যাবেন।

পালাবার চেষ্টা করিনি। তবে সুবর্ণবাবুর সিলেকশনের তারিফ করেছিলাম। নিকুঞ্জ সরখেলের কথাও নীলকে বলেছিলাম। তখনও নীল 'হু' বলে চুপ করে গিয়েছিল।

দেখতে দেখতে আরো এক সপ্তাহ কেটে গেল। নীল নিজের কাজে মগ্ন। অকাজের কাজি আমি বসে বসে যুবনাশ্ববাবুর সঙ্গে আড্ডা দিই। ইচ্ছে না থাকলেও গান শুনি। যুবনাশ্বর ঘরটি বেশ ছিমছাম। ঘরে আসবাবপত্রও বিশেষ কিছু নেই। একটা সিঙ্গল খাট। আলনায় কয়েকটি পাজামা আর পাঞ্জাবি। একটা তানপুরা। একটা হারমোনিয়াম। একটা টেপ রেকর্ডার। একটা ট্রানজিস্টার আর টেবিলের ওপর কিছু বই। হ্যাঁ, একটা ফুলদানিও আছে। তাতে কিছু সিজন্যাল ফুল। বইগুলো অধিকাংশই গান সম্বন্ধীয়। ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশনের ওপর কয়েকটা বই দেখে আমি বলেছিলাম —কী মশাই, তলে তলে এই সব হচ্ছে।

অবাক হয়ে উনি বলেছিলেন, —কী?

—আপনারও কি শখের গোয়েন্দা হবার সাধ জেগেছে?

—নাহ্, একেবারেই না। ও কর্মটি আমার দ্বারা হবে না। তবে বইগুলো খুব ইনটারেস্টিং। তন্ময় হয়ে পড়ি। জগতে যে কত কী জানার আছে। কিন্তু কিছুই জানা হলো না।

একদিন বিকেলে যুবনাশ্ববাবুর সঙ্গে আড্ডা জমিয়েছি, হঠাৎ নীল এসে হাজির। ও বোধহয় এই প্রথম যুবনাশ্ববাবুর ঘরে এল। যুবনাশ্ববাবুর এলোমেলো ছোট্ট একক সংসারটি দেখতে দেখতে ও বলল,

—একেবারে ব্যাচেলার্স ডেন করে রেখে দিয়েছেন।

যুবনাশ্ব হেসে বললেন, —কে আর সাজিয়ে গুছিয়ে দেবে বলুন?

—বিয়েটা করে ফেললেই পারতেন।

—পাগল। নিজের দায়িত্ব কোনদিনও নিতে পারলুম না আবার একটা মেয়েকে জ্বালিয়ে কী লাভ?

হঠাৎ ও টেপ রেকর্ডারটা দেখে বলল, —বাহ্ ভালো জিনিস। ন্যাশনাল প্যানাসোনিক। বাইরে থেকে আনিয়েছেন নিশ্চয়ই?

—না। একবার নেপাল গিয়েছিলাম। তখনই কিনি। এটা এখন নেশার মতো পেয়ে বসেছে।

—কী রকম?

—এমনিতে আমার তেমন কোন নিজর খরচ নেই। কিন্তু কলকাতায় গেলেই ভালো ভালো গানের ক্যাসেট কিনে আনি। অখণ্ড অবসর। সময়ে অসময়ে ঐ গুলোই শুনি।

—তার মানে আপনার অনেক গানের স্টক আছে।

—যৎসামান্য, বলে উনি দেওয়াল আলমারির র‍্যাক খুলে দেখালেন। পরপর সাজানো ক্যাসেট। কম করেও একশো দেড়শো তো হবেই। নীল সেগুলো দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেল। আর বারবারই ওর মুখ থেকে 'বাহ্', 'জবাব নেই', 'দারুণ' এই সব বিশেষণগুলো বেরিয়ে আসতে থাকল। বুঝলাম সঙ্গীত পাগল লোকটা এখন ভুলে গেছে গোয়েন্দাগিরি। কিছুক্ষণ পর নীল জিজ্ঞাসা করল,—নিজের গান কিছু টেপ করেননি?

যুবনাশ্ববাবু হো হো করে হেসে বললেন, —রাখব কোথায়? ঐ র‍্যাকে, ওদের সঙ্গে?

—হ্যাঁ, ক্ষতি কী?

—পাগল? আর নিজের গান নিজে টেপ করলে লোকে কী বলবে? না মশাই, ওসব আমার ধাতে পোষায় না। আমি জগতের নিকৃষ্ট গায়ক। এত স্পর্ধা আমার থাকা উচিত না। যাক গে মশাই, ওসব কথা ছাড়ুন, এদিকের ব্যাপার কদ্দুর কী হলো?

—কৃপাসিন্ধু? নাহ্ কিছুই হয়নি। যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি।

—এদিকে তো একটা ব্যাপার বড় চিন্তায় ফেলল।

—কী ব্যাপার?

—নীহার আর যশোদা। দিনদিন ব্যাপারটা যে রকম দানা পাকিয়ে উঠছে তাতে, না মশাই আমি ঠিক ভালো বুঝছি না।

—দেখুন সেন মশাই, নীহারবাবু এবং যশোদাদেবী, দুজনেই এমন একটা বয়েসে পৌঁছেছেন যে তাদেরকে ভালোমন্দ শেখাতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তাছাড়া এটা সুবর্ণবাবুর সম্পূর্ণ পারিবারিক ব্যাপার। আপনি আমি কী করতে পারি?

—এতে আপনার কিছু করার নেই তা জানি। কিন্তু সুবর্ণ আমার বহুদিনের বন্ধু। ভালবেসে সে আমাকে তার এখানে থাকতে দিয়েছে। সে কষ্ট পেলে সেটা কী আমার মনে লাগবে না? তাছাড়া

—কী তাছাড়া?

—সুবর্ণর মনে কেউ দুঃখ দিলে তার পরিণাম কী হয় সেটা তো অনেকেই জানে।

—তাহলে আপনিও এসব আজগুবি গপ্পো বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন?

—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয় নীলাঞ্জনবাবু। আমি ভাবছি আবার না কোন অঘটন ঘটে।

—এক কাজ করুন না। ও বাড়িতে তো আপনার অবাধ যাতায়াত। অঘটন যাতে কিছু না ঘটে তার দিকে লক্ষ্য রাখুন।

—এড়িয়ে যেতে চাচ্ছেন? ভালো। তা কৃপাসিন্ধুর হত্যাকারী বলে কাউকে কী আপনার সন্দেহ হয়?

—যতক্ষণ না কোন মোটিভ খুঁজে পাচ্ছি ততক্ষণ কাউকেই সন্দেহ করতে পারছি না। আবার নিয়মমতো সবাইকেই সন্দেহ করতে হয়।

—আপনার বন্ধু কিন্তু সুবর্ণকে সন্দেহ করে।

—আমি কিন্তু এখনও সেই অন্ধকারে। শেষ পর্যন্ত যশোদা আশ্রম আনসলভড্ হয়েই থাকবে।

—নীল ব্যানার্জি একথা বলছে?

—নীল ব্যানার্জি তো আর অতিমানব নয়।

বেরিয়ে আসার মুহূর্তে নীল একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল, —আচ্ছা সেন মশাই আপনি তো অবিবাহিত?

—সন্দেহ আছে নাকি?

—না। কিন্তু মেয়েদের চুলের কাঁটা আপনার ঘরে কেন?

—মেয়েদের চুলের কাঁটা? আমার ঘরে? মাই গড্।

—হ্যাঁ, ঐতো আপনার খাটের নিচে পড়ে আছে।

একটা কাঁটা খাটের নিচ থেকে তুলতে তুলতে যুবনাশ্ব বললেন, —আশ্চর্য, ভারি আশ্চর্য, এ কাঁটা এখানে কি ভাবে এল?

—চেনেন নাকি?

—চিনি বৈকি। এ তো যশোদার জিনিস।

—যশোদাদেবী কি দু একদিনের মধ্যে এ ঘরে এসেছিলেন?

—জীবনে কোনদিনও এ ঘরে প্যা দিয়েছে বলে তো মনে পড়ে না; তবে কী,

—তবে কী মানে? কী ভাবে আসতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

—গতকাল নীহার আমার ঘরে এসেছিল। এ কি ওর কারসাজি?

—লাভ?

—লাভ-লোকসান জানি না। তবে সুবর্ণ প্রায় আমার এখানে আসে। ওকি সুবর্ণর মনে আমার সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ ঢোকাতে চাইছে?

—আপনার এ কথার অর্থ?

—চোর যখন ধরা পড়ে সে আরো কয়েকজনকে দলে টানার চেষ্টা করে। আমাকে বোধ হয় এবার সত্যিই পাততাড়ি গুটোতে হবে।

নিজের মনে উনি আরও কিছু বিড়বিড় করছিলেন।

—আজ চলি সেন মশাই, আর একটা কথা, কাঁটার কথাটা কাউকে জানাবেন না বলে আমি আর নীল বেরিয়ে এলাম। ভেবেছিলাম ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করব। করা হয় নি। ওর চোখে মুখে তখন অজস্র চিন্তা খেলা করছে।

রাত তখন বেশ গভীর। বিছানায় শুয়ে নানান কথা চিন্তা করতে করতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ নীলের ডাকাডাকিতে উঠে পড়লাম। ও তখন বলছে, —ওঠ, ওঠ কী করে এত ঘুমোস বুঝি না।

কাঁচা ঘুম ভাঙায় বিরক্ত হয়ে বললাম, —না ঘুমোনোর কি আছে? রাতের বেলা কি জেগে বসে থাকবো?

—হ্যাঁ থাকবি। রাতের অন্ধকারে যশোদা আশ্রম কেমন দেখায় তোর দেখতে ইচ্ছে করে না, আয় বাইরে আয়।

বারান্দায় এসে দেখলাম ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। দেখার মতো কোন অপরূপ দৃশ্য চোখে পড়ল না। বেশ বিরক্ত হয়ে বললাম, —এই তোর দেখার জিনিস?

—ভাল করে দেখ। কান পেতে শোন। তুই তো লেখক। আঁধারের রূপ দেখতে তোর ভালো লাগে না? তবে যা দেখবি আর শুনবি তা সবই তোকে নীরবে করতে হবে। টর্চ জ্বালা নয়, সিগারেট খাওয়াও না।

ভুরু টুরু কুঁচকে আমি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ কানে ভেসে এল যুবনাশ্ববাবুর

গান। তার পরেই মনে হলো কে যেন পুকুরের পাড় ধরে হেঁটে যাচ্ছে। দ্রুত অথচ সন্তর্পণে। ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে চলে গেল। আম'বাগানের ওদিকে।

নীল ফিস ফিস করে বলল, —আম'বাগানের ওদিকে কে থাকে বলত?

-ওদিকে তো চাঁপার ঘর। এবং ছায়ামূর্তিটা নিশ্চয়ই ঐদিকেই গেল।

—ঠিক বলেছিস। চল, একবার দেখি।

—সে কিরে? এত রাতে বাগানে সাপটাপও থাকতে পারে।

—আর একটাও কথা না। নিঃশব্দে আমাকে অনুসরণ করবি।

দুজনে বাগানে নামলাম। কিছুদূর এগিয়েছি। সহসা কিছু চাপা কথাবার্তার শব্দ কানে এল। দুজনেই থেমে পড়লাম। আওয়াজটা আসছিল সুবর্ণবাবুর বাড়ির দিক থেকে। নীল শব্দ লক্ষ করে ওদিকেই এগিয়ে গেল। আমিও গেলাম। হ্যাঁ, সুবর্ণবাবুর একতলা থেকেই চাপা কথা কাটাকাটির আওয়াজ একটি পুরুষ ও একটি নারীকণ্ঠ। আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম একেবারে জানলার ধারে। ঘরে কোন আলো জ্বলছিল না তবে কণ্ঠস্বর চিনতে কোন অসুবিধা হল না। সুবর্ণবাবু আর যশোদাদেবী কথা বলছেন: দুজনেই উত্তেজিত। যশোদাদেবীকে বলতে শোনা গেল, —কী দিয়েছ? সারাজীবনে কতটুকু তুমি আমায় দিতে পেরেছ?

সুবর্ণবাবু উত্তর দিলেন, —আমার যা কিছু সবই তোমাকে দিয়েছি।

—টাকা? গাড়ি? বাড়ি? একটা রক্তমাংসের শরীরের মেয়েকে কি এইসব দিয়ে ভোলানো যায়?

—কিন্তু তুমি যা চাইছ, তুমি বেশ ভালো করেই জান, তা দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

—কিন্তু আমি বাঁচব কি নিয়ে?

—ঐ একটি কারণই সব?

—হ্যাঁ সব। সব জেনে শুনে তুমি আমার জীবনটা তছনছ করে দিয়েছ। যাকে আমি ভালোবেসেছিলাম, তোমার টাকার গা জোয়ারিতে তার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছ।

—কিন্তু সে সব তো অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।

-তাহলে আবার তাকে এখানে আশ্রয় দিলে কেন?

-তোমার জন্যেই। তুমি যদি শান্তি পাও, সেই কারণে।

—কিন্তু সে আমাকে ভুলে গেছে। আমার দিকে ফিরেও তাকায় না।

—সে দোষ তোমার।

—না। কক্ষণো না। আমাদের ভালোবাসাকে তুমি একদিন গলা টিপে মেরেছ। সে আজ তোমাকে দয়া করে, তাই ভুলেও তোমার বৌয়ের দিকে নজর দেয় না। সে আজ অমন হয়ে গেছে শুধু তোমার জন্যে।

—তাই বলে তুমি—।

—হ্যাঁ, নীহারকে আমার ভালো লাগে। নীহার তোমার থেকে গরিব হতে পারে, কিন্তু আর একদিকে সে তোমার থেকে ধনী। সে আমাকে সব দিয়েছে। আমার তিল তিল করে শুকিয়ে যাওয়া জীবনকে ভরিয়ে দিয়েছে। সে আমাকে ভালোবাসে।

-চুপ করো। প্লিজ তুমি চুপ করো।

—আমি চুপ করেই থাকি। কিন্তু তুমি তা চাও না। আমি অনেক সহ্য করেছি। নীহার আর আমার মধ্যে যদি আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে, আমি তোমাকে ছাড়ব না।

—কিন্তু এ বেলেল্লাপনা। ডিবচাবি। নানান লোকে নানান কথা বলতে শুরু করেছে।

—লোকের কথায় আর আমার কিছু যায় আসে না। আরো একটা কথা শুনে রাখ, তোমার সব ভণ্ডামি আমি ধরে ফেলেছি। তোমার হয়ে ঈশ্বর তোমার বিরুদ্ধাচারীকে মৃত্যুদণ্ড দেন? তাই না? বুজরুক কোথাকার?

—যশোদা।

—চেঁচিও না। তাতে তোমারই ক্ষতি। তোমার ঐসব আষাঢ়ে গল্পে আর যেই বিশ্বাস করুক, আমি করি না। তুমি ভেবেছ আমি জানি না, ওই লোকগুলো কি করে মরল?

—তুমি কি বলতে চাইছ?

—সেটা তুমিই ভালো ভাবে জান। তবে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা না করলে, আমি তোমার ব্যাপারে নাক গলাতে যাব না।

—তাহলে তুমি শেষ পর্যন্ত নীহারের সঙ্গেই--

—আমার কোন উপায় নেই।

—বেশ, চেষ্টা করে দেখতে পারো। এর পরিণাম কিন্তু ভালো হবে না।

—দেখি কতটা খারাপ তুমি করতে পারো।

হঠাৎ কারো উঠে যাওয়া, দরজা খোলা এবং দরজা বন্ধর শব্দ পাওয়া গেল। তারপরই সব চুপচাপ। বুঝলাম যশোদাদেবী ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে চলে গেলেন। নীল হাত ধরে টান দিতেই আমরা স্থানত্যাগ করলাম।

বাগানে পূর্বের নৈঃশব্দ বিরাজ করছে। ফিস ফিস করে নীলকে জিজ্ঞাসা করলাম,—আমবাগানের দিকে যাবি নাকি?

—গিয়ে কোন লাভ নেই। তবু চ।

সত্যিই কোন লাভ হল না। কারণ ওখানে বা চাঁপার ঘরের দিকে কোন ছায়ামূর্তির দেখা পেলাম না। ফিরতে ফিরতে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, — ছায়ামূর্তিটা কে বলত? চিনতে পেরেছিস?

—হ্যাঁ।

—কে?

—কেন বলব? নিজে চিন্তা কর।

—আর যশোদার পূর্বতন প্রেমিকটি কে? তাকেও নিশ্চয়ই চিনেছিস?

—হ্যাঁ।

—এবারও নিশ্চয়ই না বলবি?

—এখানে যশোদার প্রেমিক হবার মতো কে আছে?

—আমার হিসেবে তিন জন।

—যেমন?

—যুবনাশ্ব সেন, আর,

—আর?

—বলব কেন? তুই নিজেই চিন্তা কর।

—অন্ধকারে নীল হাসতে হাসতে বলল, বাঁ হাতটা না থাকলেও নিকুঞ্জ সরখেলের চেহারাটা সত্যিই পুরুষালি না?

বাড়ির কাছাকাছি এসে নীলকে বললাম,—আমার কাছে কিন্তু মোটিভটা অনেক ক্লিয়ার।

নীল কি ভাবছিল। আমার কথা শুনে বলল, —অ্যাঁ, তাই নাকি? কী বলতো?

—নিজের কানেই তো সব শুনলি। যশোদাদেবী আর সুবর্ণ ঘোষালের কথাবার্তা।

—হুঁ।

—হুঁ কিরে? আমি হলে এতক্ষণে সুবর্ণ ঘোষালকে অ্যারেস্ট করতাম।

নীল সামান্য হাসল। তারপর বলল,—যশোদা ঘোষালের কথা একেবারে উড়িয়ে না দিলেও, এবং সুবর্ণ ঘোষাল যদি সত্যিই এতগুলো খুন করে থাকতেন, তাহলেও পৃথিবীর কোন আইনেই তাঁকে অ্যারেস্ট করা যেতো না।

—খুনি জেনেও চুপ করে থাকতে হবে?

—প্রমাণ? প্রমাণটা কোথায়? রাতের অন্ধকারে স্বামী-স্ত্রীর ঘরের পাশে আড়ি পেতে তাদের নিভৃত

দাম্পত্য কলহ সবিস্তারে বর্ণনা করেও পেনাল কোডের কোন আইনেই তাঁকে খুনি সাব্যস্ত করা যায় না। চল, অনেক রাত হল, শুয়ে পড়ি।

শুতে শুতে নীল একবার বলল,—যুবনাশ্ব সত্যিই সাধক। এখনও গাইছেন। আজও বেহাগ

নীলের ধারণা অভ্রান্ত করে দিয়ে আবার একটি ঘটনা ঘটল। এবারে উত্তাল হয়ে উঠল যশোদা আশ্রম। ভোরবেলা বিশ্রী চেঁচামেচিতে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। আশ্রমের বহু বাসিন্দার গতিপথ পুকুরপাড়ের উল্টো দিকে। সবারই চোখে মুখে উত্তেজনা আর ত্রস্ত্যভাব। নীল তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবি গলিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আমাকেও বেরুতে হলো। খানিকটা যেতেই দেখি হন্তদন্ত হয়ে যুবনাশ্ব এদিকেই আসছেন। কাছাকাছি আসতেই বললেন —সর্বনাশ হয়ে গেল মিস্টার ব্যানার্জি। সর্বনাশ হয়ে গেল এমনটিই যে হবে সে আমি আগেই আপনাকে বলেছিলাম। একটু যদি সজাগ থাকতেন! অন্তত আপনি থাকতে যে এমন ঘটনা ঘটবে ভাবতে পারছি না।

উত্তেজনায় উনি হয়তো আরো অনেক কিছু বলতেন, নীল ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, — কিন্তু ঘটনাটা কী তাইতো বললেন?

—নীহার নেই। নীহার মারা গেছে।

চমকিতে আমি আর নীল পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। তারপর নীল বলল,—হঠাৎ মারা গেল মানে? কী হয়েছিল ওঁর।

—কিছু না। কাল রাতেও আমার সঙ্গে গল্প করে গেছে।

—কিন্তু মারা গেলেন কী ভাবে?

—বডি আমি দেখিনি। বলতেও পারব না। তবে ডাক্তার ওখানে আছে।

আমরা তিনজনে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললাম। আশ্রমের প্রায় সব লোকই ওখানে ভেঙে পড়েছে যেতে যেতে নীল বলল,—সুবর্ণবাবু খবর পেয়েছেন?

—জানি না। খবরটা শুনে আমি প্রথমে আপনার কাছেই আসছি।

—ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি ওখানে। আপনি বরং দেখুন সুবর্ণবাবু খবরটা পেয়েছেন কি না। আর হ্যাঁ, শুনুন একটু ভালো করে ওয়াচ করবেন তো, সুবর্ণবাবুর রি-অ্যাকশানটা কী?

—আপনি কী তাহলে ওকেই?

— এখন আর এত কথা বলার সময় নেই। আপনি এগোন।

যুবনাশ্ব চলে গেলেন। আমরা দ্রুত পায়ে এসে হাজির হলাম নীহারবাবুর বাড়িতে। যেখানে তখন বিরাট জটলা। আমাদের পরিচয় যেহেতু সবাই পেয়ে গিয়েছিলেন, সবাই আমাদের রাস্তা করে দিলেন ঘরের দরজা আগলে নিকুঞ্জ সরখেল। আমাদের দেখে রাস্তা ছেড়ে দিলেন। ষোল বাই দশের একখানা ঘর। কিন্তু যুবনাশ্বের মতো এলোমেলো না। চারিদিকেই বেশ ছিমছাম। রুচিসম্মত। সারা ঘরে অজস্র বই ছড়ান। দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের একটি অয়েল পেন্টিং। ঘরে ঢুকে দেখি একটা সিঙ্গল বেডের ওপর নীহার শুয়ে আছেন। সারা বিছানায় ধস্তাধস্তির চিহ্ন। পাশবালিশটা নিচে পড়ে আছে। নীহারবাবুর শরীরটা গেছে বেঁকে। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন সুস্পষ্ট। বেশ মনে হয় মৃত্যুর আগে ওঁকে রীতিমত যুদ্ধ করতে হয়েছে। মৃতের সামনে চেয়ারে বসে ডাক্তার ভবতোষ ব্যানার্জি। তাঁর চোখে মুখে এক অদ্ভুত বিরক্তি ছড়িয়ে আছে। ভদ্রলোক যেন সর্বদাই দুনিয়ার ওপর বিরক্ত। ধীর পায়ে নীল এগিয়ে গিয়ে বিছানার সামনে দাঁড়ালো। প্রথম প্রথম এ রকম হঠাৎ মৃত্যুতে অভিভূত হয়ে পড়তাম। এখন আকচার এই ধরনের মৃত্যু দেখে চোখ সয়ে গেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেলেও তেমন কিছু রি-অ্যাক্ট করল না। ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করল নীলই, —কি হয়েছিল ওঁর, ডাক্তার ব্যানার্জি?

বিরক্তি নিয়েই ডাক্তার মুখ তুললেন, তারপর বললেন,—কেসটা মার্ডার কেস।

নীলের ভ্রু কোঁচকালো। তারপর বলল, — কী করে বুঝলেন?

—আপনি তো গোয়েন্দা। ভালো করে দেখুন। বুঝতে পারবেন।

বিনা বাক্যব্যয়ে নীল এগিয়ে গিয়ে নীহারের মৃতদেহ পরীক্ষামূলক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তারপর প্রায় নিজের মনেই বলল,—আই সী।

আমারও নজরে পড়েছিল। চমকে উঠলাম। মেয়েদের চুলের একটা কাঁটা আমূল বিদ্ধ হয়ে আছে কণ্ঠনালী ভেদ করে। দুপাশে অতি ক্ষীণ রক্তের ধারা। রক্ত শুকিয়ে গেছে।

নীল গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, — পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে? নাকি এবারও ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দেবেন?

—মিস্টার গোয়েন্দা, সীমা ছাড়াবার চেষ্টা করবেন না। ভুলে যাবেন না আমি একজন ডাক্তার।

—না, ভুলিনি। এখন দয়া করে বলবেন পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে কি না?

—সে দায়িত্ব আশ্রমের মালিকের, আমার নয়।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা নিকুঞ্জবাবুকে উদ্দেশ করে নীল বলল, —আপনি জানেন নাকি মিস্টার সরখেল?

—না। সংক্ষিপ্ত উত্তর।

নীল আর কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে একমনে নীহারকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর সারা ঘরে ওর সন্ধানী দৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে দিল। ঘরে মাত্র দুটি জানলা। দুটি দরজা। একটি বাইরে যাবার। অপরটি দিয়ে বাড়ির মধ্যে যাওয়া যায়। সে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। ডাক্তার স্থিরপ্রতিজ্ঞ। কোন প্রশ্নের সোজা জবাব দেবেন না। তাই নীল নিকুঞ্জবাবুকেই জিজ্ঞাসা করল, —মিস্টার সরখেল, মৃতদেহ প্রথম কে দেখেছিল?

সরখেল বললেন, — তা জানি না। আমি এসে দেখি এখানে ভিড় জমে গেছে। মার্ডার কেস, তাই কাউকে ঢুকতে দিইনি।

—ভালো করেছেন। কিন্তু পুলিসে তো খবর দিতে হবে।

—মিস্টার ঘোষাল না বললে আমরা তো ডিসিশান নিতে পারি না।

বলতে বলতেই কিন্তু হন্তদন্ত হয়ে সুবর্ণ ঘোষাল এসে পড়লেন। আড়চোখে একবার সবাইকে দেখে নিয়ে ছুটে গেলেন নীহারবাবুর কাছে।

নীল বলে উঠল, — ওঁকে কিন্তু ছোঁবেন না?

ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘোষাল বললেন, — কেন?

—ওকে কেউ খুন করেছে। পুলিস আসার আগে আমার মনে হয় না কারো বডি টাচ করা উচিত।

—অ্যাঁ, কী বললেন? আবার খুন?

—হ্যাঁ। গলাটা লক্ষ্য করুন। বুঝতে পারবেন।

গলা দেখে, মাই গুডনেস বলে উনি একটি চেয়ারে বসে পড়লেন। নীল জিজ্ঞাসা করল,—যুবনাশ্ববাবু কোথায়?

—বলতে পারবনা, তবে খবরটা শুনে ও কেমন আপসেট হয়ে পড়েছে।

আর কিছু না বলে নীল বলল,—পুলিসে খবর দেবার ব্যবস্থা করুন মিস্টার ঘোষাল। এটা ফেলে রাখার কেস নয়।

—অ্যাঁ, আবার পুলিস?

—নিশ্চয়ই। আর একটা কথা। পুলিস আসার আগে, আপনারা তিনজন ছাড়া আর যেন কেউ এ ঘরে না ঢোকেন। ও হ্যাঁ, অজু, তুইও এ ঘরে থাক।

নীল বেরিয়ে গেল। বেশ বুঝলাম, আমাকে রেখে গেল গার্ড দিতে। ও বোধ হয় এখন আর কাউকেই বিশ্বাস করে না। এক্স মিলিটারি অফিসার নিকুঞ্জ সরখেলও ওর সন্দেহের তালিকায়। আমি কিন্তু কাউকেই কোন কথা জিজ্ঞাসা করলাম না। ঘরের মধ্যে তখন অখণ্ড নিস্তব্ধতা। নিকুঞ্জ নির্বাক পুতুলের মতো দরজায় পাহারারত। ডাক্তার বিশ্রী মুখে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। আর মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলেন সুবর্ণ ঘোষাল। ঠিক এই মুহূর্তে সুবর্ণ ঘোষাল আর চুলের কাঁটা আমার মাথার মধ্যে

ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। কারণ তিনদিন আগে এই চুলের কাঁটাই পাওয়া গিয়েছিল যুবনাশ্বের ঘরে। ঠিক তিনদিনের দিন সেই চুলের কাঁটা দিয়েই একটা জলজ্যান্ত লোক খুন হলো। ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই আমার মগজে ঢুকল না। কেনই বা যুবনাশ্বর ঘরে কাঁটা পাওয়া যাবে? কেনই বা সেটা দিয়ে নীহার খুন হবেন? তবে একটা কথা ঠিক, নীহারকে যুবনাশ্বর দোষারোপ করাটা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। যুবনাশ্বর ঘরে কাঁটাটা নীহার রাখেন নি। রেখেছে খুনি। তবে কী খুনি চেয়েছিল যুবনাশ্বকে ফাঁসাতে? কারণ সে জানত নীহারকে সে খুন করবে কাঁটা দিয়ে। পরে ঘর দোর সার্চ হলে যুবনাশ্বর ঘর থেকে ঐ রকম একটা কাঁটা পাওয়া গেলে পুলিস ওকেই সন্দেহ করবে। এবং তাই যদি হয় তাহলে তো জানা দরকার যুবনাশ্বের ঘরে কার কার যাতায়াত আছে। অন্য কারো কথা আমি জানি না, কিন্তু সুবর্ণর যাতায়াত আছেই। আর ছিল নীহারবাবুর। কিন্তু নীহারবাবু নিজের মৃত্যুর অস্ত্র নিশ্চয়ই নিজে ওভাবে রেখে আসবেন না। তার অর্থ সমস্ত ঘটনাই সুবর্ণবাবুর দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে। আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাই তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। এমনকি নীহারের মৃত্যুর দুদিন আগে নীহারকে কেন্দ্র করে স্বামী স্ত্রীর আসন্ন বিচ্ছেদ নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। শেষকালে সুবর্ণর শাসানি। জানি না, সুবর্ণই এই সবের মূল কিনা। তবে সুবর্ণর বিরুদ্ধে অকাট্য সব প্রমাণ বিদ্যমান। সুবর্ণর পক্ষে বাঁচা মুশকিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গোপাল সাহা এলেন। প্রায় সাড়ে নটা নাগাদ। খবরটা নিশ্চয়ই কেউ দিয়েছিল এর পর চলবে পুলিসি তদন্ত। গোপাল সাহাকে বলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। এখন আমার দরকার নীলকে। ও তো তারপর থেকে আর ঘরেই এলো না। বাইরে এসে এদিক-ওদিক দেখলাম উৎসাহী মানুষের প্রশ্ন করা চাহনি আমাকে ঘিরে ধরছিল। তাদেরকে পাশ কাটিয়ে বাগানে এলাম। নাহ্, আশেপাশে কোথাও ওকে পেলাম না। খানিকটা এগিয়ে যেতেই দেখি যুবনাশ্ব এদিকেই আসছেন। আমাকে দেখতে পেয়েই উনি এগিয়ে এলেন। চোখ মুখ থমথমে। প্রিয়জন হারালে মানুষের মুখের চেহারা যেমন হয়। সবার সামনে কাঁদতেও পারেন না। আবার দুঃখ চাপতে গিয়ে মুখে দুঃখের ভাবটাই বেশি প্রকট হয়ে পড়ে। তারওপর উনি শিল্পী মানুষ। আবেগ টাবেগগুলো শিল্পীদেরই বেশি থাকে। যেমন ঐ আবেগের বশেই ওনার ঘর থেকে যখন চুলের কাঁটা পাওয়া গেল বেমালুম বলে দিলেন নীহারবাবু ওঁর ঘরে ইচ্ছে করে কাঁটা রেখে গেছে। আসলে এই সব মানুষ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই কথা বলে ফেলেন। কাছে এসেই বললেন, —ওদিককার কী খবর অজেয়বাবু?

—পুলিস এসে গেছে। কিন্তু পুলিসকে খবরটা দিল কে?

—আমিই লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। মিস্টার ব্যানার্জি তো সেই রকমই হুকুম করলেন। কিন্তু এসব কী শুনছি মশাই?

—কি?

—মিস্টার ব্যানার্জি বললেন ওকে নাকি কেউ খুন করেছে।

—হ্যাঁ, খুনই করেছে। কিন্তু কী ভাবে জানেন? ওকে কেউ ঘুমন্ত অবস্থায় জোর করে চেপে ধরে ওর কণ্ঠনালীতে চুলের কাঁটা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

—কী বললেন? চুলের কাঁটা?

—সেদিন আপনার ঘর থেকে যেটা পাওয়া গিয়েছিল।

—ধ্যাৎ, কী বলছেন আপনি? সে কাঁটা তো আমি ঘরে রেখে দিয়েছি।

—কোথায় রেখেছিলেন?

—আমার ক্যাসেটগুলো যে র‍্যাকে থাকে সেইখানে, র‍্যাকের ওপর পাতা কাগজের নিচে।

—আপনি ঠিক জানেন, সে কাঁটাটা এখনও সেখানেই আছে?

—কী বলছেন অজেয়বাবু? তাছাড়া নীহার আর সুবর্ণ ছাড়া আর কেউ আমার ঘরেই ঢোকে না। আর তারাও তো জানে না, কাঁটাটা আমি কোথায় রেখেছি।

—আর একটা কথা যুবনাশ্ববাবু, নীহারবাবু কি রাত্রে ঘরের দরজা খুলে শুতেন?

—কী করে বলব? নীহারবাবুর সঙ্গে আমার যেটুকু অন্তরঙ্গতা, তা ঐ এক আশ্রমের বাসিন্দা বলে।

...ও ছিল শিক্ষিত লোক। সেই জন্যেই ওর সঙ্গে আমাব ঘনিষ্ঠতা ছিল। তবে ইদানিং, যশোদা ... কারণে আমি ঠিক ওকে সহ্য করতে পাবছিলাম না। সে যাই হোক, ওব বিশেষ অভ্যাস ... আমাব জানাব কথা নয়।

---বুঝলাম। কিন্তু আপনি খববটা কী ভাবে পেলেন?

--চাঁপাব কাছে। আমি তখন সবে বাথরুম থেকে এসে দাওযায বসেছি।

- চাঁপা? সে এ খবব জানল কী ভাবে?

--তা জিগ্যেস করিনি। নীহাব মাবা গেছে শুনে আমি হুড়মুড় করে ঘব থেকে বেবিয়ে আসি। ... ওব ঘবেব সামনে ভিড়। সবাই সেই কথাই বলাবলি কবছিল, কালবিলম্ব না করে ছুটলাম ...দেব বাড়িতে। কিন্তু মিস্টার ব্যানার্জি কোথায় গেলেন? তাঁকে তো দেখছি না।

--আমিও তো তাকে খুঁজছি, দেখি, ওদিকে আছে কি না।

-হ্যাঁ, দেখুন। আমিও দেখি কাঁটাটা আছে কি না। ওটা না থাকলেই আমি গেছি আর কি!

যুবনাশ্ব তড়বড় করে চলে গেলেন। আমি এখন কোথায যাই ভাবতে ভাবতেই দেখি কিছু দূরে একটা গাছতলায় নীল। আমি এগিয়ে যেতেই নীল আমাকে দেখতে পেল। হাতেব ইশাবায দাঁড়াতে বলে প্রায় মিনিট পাঁচেক পব আমার কাছে ফিবে এল। জিজ্ঞাসা কবলাম কাব সঙ্গে কথা বলছিল। ... কথা এড়িয়ে গিয়ে বলল,--চল, একবাব নীহাববাবুব ঘবে যেতে হবে।

কিন্তু তুই এতক্ষণ কোথায ছিলি?

--ঘুবছিলাম। এলোপাথাড়ি।

--মানে?

--মানে আবাব কী, যশোদা আশ্রমেব রহস্য শেষ হয়ে এসেছে, জাযগাটা শেষবাবেব মতো দেখে নিচ্ছিলাম।

অবাক হয়ে প্রশ্ন কবলাম,--যশোদা আশ্রমেব বহস্য তোব কাছে ক্লিযাব?

-- হ্যাঁ।

—কিন্তু এতগুলো খুন? মানে খুনি কে?

--জানি তো। আবো ডেফিনিট হবাব জন্যে নীহাববাবুব ঘবটা একটু খুঁটিয়ে দেখতে চাই।

---যশোদাদেবীর ওখানে গিয়েছিলি?

---হ্যাঁ। যদিও ভালবাসাব মানুষকে হাবিয়ে উনি একটু আপসেট। কিন্তু সেই দাপট আব নেই। আব ওঁব মুখে এমন সব কথা শুনলাম, শুনলে তুই চমকে যাবি।

—তা সেই চমকের খববটা জানব কখন?

—শেষ দৃশ্যে।

—শেষ দৃশ্য আসবে কখন?

---দু একদিনেব মধ্যেই।

আব কোন কথা হল না। আমবা ফিবে এলাম নীহাববাবুব ঘবে। গোপাল সাহা তখন সুবর্ণ ঘোষালকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। নীলকে দেখে উনি 'উইশ' করলেন। নীল হাত নাড়িয়ে জানালো, ক্যারি অন।

কাউকে কোন বিরক্ত না করে ও মৃতদেহ তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করল। দেখতে দেখতে হঠাৎই ও মৃতেব নখের ডগায় কি যেন দেখে বেশ ভুরু কোঁচকালো। তাবপর হঠাৎই ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল,—আশ্চর্যেব ব্যাপার কী জানেন মিস্টাব সাহা, যে কোন খুনেই খুনি একটা চিহ্ন ফেলে যাবেই।

—কিছু পেলেন নাকি?

—পেলাম। বলব সব পবে। আমি ঘবেই আছি। আপনাব সব কাজকর্ম হয়ে গেলে একবাব কী ঘুবে যাবেন?

—ওহ্, সিওর। আপনি না বললেও যেতাম।

—আমি আছে। ও হ্যাঁ, মিস্টার ঘোষাল অ্যান্ড ডাক্তাব ব্যানার্জি, আপনারা কিন্তু আপাতত কোন

কারণেই যশোদা আশ্রম ছেড়ে কোথাও যাবেন না। পুলিসের পক্ষ থেকে এটা আমার রিকোয়েস্ট
চ অজু।

বেরিয়ে এসে নীল বলল, — এক বিরাট চক্রান্ত। বহুদিন ধরে তিলতিল করে ভাবা প্রতিশোধের চূড়ান্ত রূপ।

এবার আমি রেগে গেলাম, — হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথা যদি স্পষ্ট করে বলতে পারিস বল, নইলে কিছু বলতে হবে না।

মৃদু হেসে নীল বলল,— ফ্রেন্‌জি কথার মানে নিশ্চয়ই জানিস?

—হ্যাঁ, হঠাৎ উন্মত্ততা।

—আপাত দৃষ্টিতে তেমন মনে হলেও যশোদা আশ্রমের খুনগুলো হঠাৎ উন্মত্ততা নয়। যদিও এখানে খুনি একটা উন্মাদ। প্রতিশোধস্পৃহার এক বিচিত্র আর নৃশংস হত্যা পরম্পরা।

—তার মানে বলছিস এই সব হত্যারই মোটিভ হচ্ছে প্রতিশোধ?

—বিচিত্র প্রতিশোধ। কিন্তু এই উন্মাদ লোকটিকে তো আর বাইরে ছেড়ে রাখা যাবে না। সে যতদিন বাঁচবে, যতদিন না তার প্রতিশোধ চূড়ান্ত রূপ নেবে ততদিন আরো অনেক মৃত্যু ঘটবে। হ্যাঁরে, যুবনাশ্ববাবু কোথায় গেলেন রে?

—ওঁর ঘরে।

—চুলের কাঁটাটা ঠিক আছে কিনা দেখতে?

—ঠিক ধরেছিস।

নীল হাসল। তারপর বলল, —চ, ওখানে গিয়েই বসি। ভদ্রলোককে একটা ধন্যবাদ জানানো দরকার।

—কেন?

—গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জির জীবনে এতবড় রহস্যের সন্ধান এর আগে কেউ দেয়নি বলে। ও হ্যাঁ, তোকে আর একটা কথা বলা হয়নি, যুবনাশ্ববাবু বলেছিলেন চুলের কাঁটাটি যশোদাদেবীর। কিন্তু যশোদাদেবী চুলে কোন কাটা ব্যবহার করেন না।

—তাইতো। এ কথাটা আমার খেয়াল হয়নি। ওঁর তো বয়কাটে ছাঁটা চুল। তাহলে কার কাঁটা?

—চাপার।

—চাঁপার চুলের কাঁটা যুবনাশ্বের ঘরে গেল কী ভাবে?

—সেটা বলতে পারবে সেই, যে ওর ঘরে কাঁটাটা ফেলে এসেছিল।

—আমার সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

—যাবেই তো। পুরো ব্যাপারটাই তো তালগোল মার্কা। ঐ দেখ খ্যাপা যুবনাশ্ব কী রকম ছুটতে ছুটতে আসছে। নিশ্চয়ই কাঁটাটা খুঁজে পেয়েছে।

আমাদের দেখতে পেয়েই যুবনাশ্ব চিৎকার করে উঠলেন,—মিস্টার ব্যানার্জি, দাঁড়ান, একটু কথা আছে।

বলতে বলতেই উনি এসে পড়লেন। সামান্য হাঁফাচ্ছেন, বললেন,— পেয়েছি, অজেয়বাবু ওটা পেয়েছি। এই দেখুন। বলে হাতটা মেলে ধরলেন।

নীল হাসতে হাসতে বলল, —আপনি এতক্ষণ কাঁটা খুঁজছিলেন?

—খুঁজব না! মাথার চুল সব খাড়া হয়ে যাবার উপক্রম।

নীল কাঁটাটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর ফেরত দিতে দিতে বলল, — এটা, বা যেটা দিয়ে নীহারবাবু খুন হয়েছেন, দুটোর কোনটাই কিন্তু যশোদাদেবীর কাঁটা নয়। তাছাড়া আপনি জানবেনই বা কী করে যে যশোদাদেবী চুলে কাঁটা ব্যবহার করেন না। কিন্তু আপনার চশমার কাচটা ভাঙল কী করে?

—আর বলেন কেন? সকালবেলা তাড়াহুড়ো করে বেরুতে গিয়ে চশমাটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে

গেল। আবার একগাদা টাকার ধাক্কা।

—করুন করুন। একটু টাকা-পয়সা খরচ করুন। এত পয়সা খাবে কে? নীল এখন অনেক হাল্কা সুরে কথা বলছে। আসলে প্রবলেম সলভ্ড্ হয়ে গেলেই ওকে এই রকম হাল্কা হয়ে যেতে দেখি। তেমনি হাল্কা সুরেই ও বলল,—এবার তো আমাদের ছুটি দিতে হবে যুবনাশ্ববাবু।

যুবনাশ্ব আকাশ থেকে পড়লেন,—তার মানে?

—মানে যে কারণে এখানে আসা তা যখন শেষ হয়ে গেল তখন আর থাকার কী দরকার?

—আমাকে একটু খুলে বলুন, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।

—একসট্রিমলি স্যরি যুবনাশ্ববাবু, আমার কিছু করার নেই। মনে হয়তো আপনি খুবই দুঃখ পাবেন, তবু না বলে পারছি না, আপনার আশ্রয়দাতা বন্ধুকে একটা বড় আঘাতের হাত থেকে বাঁচানোর কোন সাধ্যই আমার নেই।

—কী বলছেন ব্যানার্জি? সত্যিই কী ও?

—বুঝবেন। দু একদিনের মধ্যেই সব বুঝবেন। দুঃখ হচ্ছে আমার যশোদাদেবীর জন্যেও। বেচারি এ কুলও হারালো ও কুলও হারালো।

—আপনি ডেফিনিট প্রমাণ পেয়েছেন? যুবনাশ্বের কণ্ঠে তখনও অবিশ্বাস আর সংশয়ের মেঘ. প্লিজ বলুন কিছু।

—বললাম তো দু একদিনের মধ্যে প্রমাণ সমেত পুলিস খুনিকে অ্যারেস্ট করবে।

যুবনাশ্ববাবু কেমন যেন গুম মেরে গেলেন। অনেকক্ষণ কথাই বলতে পারলেন না। নীল বুঝতে পেরে বলল,—আমি সব বুঝি, কিন্তু আই অ্যাম হেল্পলেস। আগাগোড়া খুনি এমন সব সূত্র রেখে গেছে।

—চুপ করুন মিস্টার ব্যানার্জি, আর আমার এসব শুনতে ভাল লাগছে না। সব গেল, সব শেষ হয়ে গেল। এই আশ্রম, এই মানুষকে ভালবাসা, মানুষের বিপদে তাকে আশ্রয় দেওয়া! নাহ্ মিস্টার ব্যানার্জি, আর আমার পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়। থাকবই বা কার জন্যে? আসল লোকটাই যদি, শেষের দিকে ওঁর গলাটা ধরা ধরা হয়ে এলো, তবু বললেন, — ওকে কী কোনভাবে বাঁচানো যায় না?

—নাহ্, যায় না। পাপের বেতন মৃত্যু বলে একটা কথা আছে। দোষ করলে, মানুষ খুনের মতো অপরাধে লিপ্ত হলে, একটা নয় পরপর পাঁচজনকে যে সুস্থ মাথায় পরিকল্পিত উপায়ে খুন করে, পৃথিবীর কোন আইনই তাকে বাঁচাতে পারে না। আর সেটা উচিতও নয়।

—সুবর্ণ এখন কোথায়?

—গোপাল সাহার নজরবন্দীতে।

—আমি কী ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি?

—দারোগা সাহেব কী দেখা করতে দেবেন? মনে তো হয় না। যাইহোক চলি, বিকেলের দিকে দেখা হতে পারে। ও হ্যাঁ, আপনাদের সরলাকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?

যুবনাশ্ব বিস্মিত হয়ে বললেন,—সরলাকে? ওকে আবার কী দরকার?

—ওকেই আমার এখন ভীষণ দরকার। সামান্য কাজের লোক বলে অত নেগলেক্ট করবেন না। ও যদি আমাকে সাহায্য না করতো তাহলে খুনির হদিশ পাওয়া খুবই শক্ত হোত।

—সরলা? অ্যাবসার্ড, আকাশ থেকে পড়লেন যুবনাশ্ব, খুনের ব্যাপারে ও কী জানে?

মিটিমিটি হাসতে হাসতে নীল বলল,—জানেন তো সামান্য কাঠবিড়ালও রামচন্দ্রকে সীতা উদ্ধারে সাহায্য করেছিল।

—তা জানি, কিন্তু,

—কিন্তু সরলা নিজের চোখে দেখেছে খুনি কখন নীহারকে খুন করেছে। কেমন ভাবে করেছে। আই এভিডেন্স তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যাকগে, এসব ব্যাপার এখনই কাউকে বলার দরকার

নেই। আশা কবি অন্য কারো কানে কথাটা যাবে না।

নীলেব তাড়া ছিল। এবং বেশ বুঝতে পাবছি ওব এখন অনেক কাজ। আহত এবং দুঃখিত যুবনাশ্বকে বেখে আমরা সবলাব খোঁজে বেবিয়ে পড়লাম। কিছুদূর গিয়ে আমি একবাব নীলকে জিজ্ঞাসা কবলাম,

- তুই কি কবতে চাইছিস বলতো ?

মৃদু হেসে ও বলল,—অদ্যই শেষ বজনী হতে পারে। ধৈর্য ধব, সব জানতে পারবি।

আমাকে বাড়িতে ফেলে দিয়ে নীল উধাও হয়ে গিয়েছিল দাবোগা গোপাল সাহাকে নিয়ে। যাবার সময়ে বলে গিয়েছিল সবলাকে চোখে চোখে বাখতে। ওব লাইফ নাকি 'ইন ডেনজার'। যে কোন মুহূর্তে ও খুন হয়ে যেতে পাবে। সবলাব সঙ্গে ঝগড়া না হলেও সুবর্ণ ঘোষাল সরলাকে ছেড়ে দেবে না। পাঁচটা খুনে যা শাস্তি হবে ছটা খুনেও তাই হবে। অগত্যা সারাদিন আমাকে সরলার বডিগার্ড হয়ে থাকতে হলো। নীল যাবাব সময়ে সবলাকে বলে গিয়েছিল আজ যেন ও শবীব খারাপের অজুহাতে ঘবে শুয়ে থাকে। কোন বকম ভাবেই আজ ওব সুবর্ণবাবুব বাড়িতে কাজ করতে যাওয়া চলবে না; অতএব ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আমি সবলাব চতুর্দশ পূর্বপুরুষেব সংবাদ নিতে নিতে হাঁফিয়ে উঠলাম। একই প্রশ্ন চাববাব করে করলাম। অবশেষে ছুটি পেলাম সাত নটায। নীল ফিরে এসে বলল,—আব গার্ড দেবাব দবকাব নেই। এবাব বাড়ি চ। আজ বোধহয সাবাবাত জাগতে হবে।

সুবর্ণ ঘোষালেব বাড়িতে অতি দুঃসময চলছে। প্রেমিক হাবানোব ব্যথায যশোদা ম্রিয়মান। সুবর্ণ ঘোষাল নজরবন্দি। তাঁব শিযবে মৃত্যুদণ্ডেব খাঁড়া ঝুলছে। ডাক্তাবও নজরবন্দি। বলতে গেলে যশোদা আশ্রমেব সবাই নজরবন্দি। সাদা পোশাকেব প্রচুব পুলিস সবলাব ঘরেব চাবপাশ ঘিবে রেখেছে। নীল, আমি আব গোপাল সাহা ছাডা অবশ্য এ খববটা আব কেউ জানে না। এবই মধ্যে শ্যামাপদ আমাদেব খাবাব দিয়ে গিয়েছিল।

দেখতে দেখতে বাত গভীব হলো। এ কদিনেব তুলনায আজকেই যেন যশোদা আশ্রমের নিস্তব্ধতা অনেক প্রকট বলে মনে হলো। অন্ধকারেব দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছিল একটা ভযঙ্কব কিছু ঘটতে চলেছে। সময এগিয়ে চলেছে দ্রুত পবিসমাপ্তিব দিকে।

অন্য সব বাতেব সঙ্গে এ বাতেব একটাই মিল ছিল; প্রায় বাবোটা নাগাদ হঠাৎ যুবনাশ্বের গানেব আওয়াজে ভেসে এল। সেই বেহাগ। কিন্তু মনে হলো অন্য দিনেব তুলানয় আজ যেন বড় বেশি করুণ। বড বেশি হৃদযগাহী। গান শুনতে শুনতে নীল বলল, —নাহ্, এই লোকটাকে নিয়ে আর পাবা গেল না। সারা আশ্রমেব মধ্যে একটা কি হয় কি হয ভাব। ও দেখ, ঠিক গান নিয়ে বসেছে।

-শিল্পীবা একটু স্বার্থপব হয। নিজেকে নিয়ে নিজেই বিভোর।

--চ, বেবোই।

--আবার বেকবি?

সে কথাব উত্তব না দিয়ে নীল বলল, — একদিকে ভালোই হলো। যুবনাশ্ব গান গেয়ে সমস্ত কিছু নবমাল করে দিল। খুনি এ সুযোগ ছাড়বে না।

- কিসেব?

--আজ রাতেই খুনি একটা বিবাট ঝুঁকি নেবে। নইলে ও নিজে বাঁচতে পারবে না।

-কিন্তু পব পব দুবাত্রে দুটো খুন কবার রিস্ক্? তার ওপব যতই চেপে রাখিস না কেন খুনি জানে যশোদা আশ্রমে আজ খুন করাব চেষ্টা কবা উচিত না।

---আমাব তো মনে হয খুনি এই সুযোগটা হাতছাড়া কববে না। কারণ প্রত্যেকটা মানুষের চোখ যখন কোন বিশেষ একজনেব ওপর নিবদ্ধ, তখন, না বে আজকেব রাতটা সত্যিই কাজের রাত; তাব ওপব আকাশ একেবাবে নিকষ পাথবেব মত। দুহাত দূবেব লোকও দেখা যায় না। আমার ধারণা যদি মিথ্যে না হয

ওকে থামিয়ে দিল বললাম, — কিন্তু তুই কার খুন হবার কথা বলছিস?

—আর একটাও প্রশ্ন নয়। চল।

কুচকুচে কালো রঙে বাগানটা চাপা পড়ে গেছে। অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে আমি নীলকে অনুসরণ করে চললাম। অতি সন্তর্পণে ও ধীরে ধীরে সুবর্ণ ঘোষালের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বাড়িটা অন্ধকারে ঝিমোচ্ছে। কোথাও টু শব্দটি পর্যন্ত নেই। যে মাধবীলতার ঝাড়টা সোজা সুবর্ণবাবুর বাড়ির ছাদে উঠে গেছে তার নিচে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একবার হাত দিয়ে বাড়িতে ঢোকার দরজায় ঠেলা দিল। দরজা খুলল না। তারপর আগের মতই ধীর পায়ে সমস্ত বাড়িটাকে একবার প্রদক্ষিণ করল। কিন্তু কাউকেই আমার বা নীলের নজরে পড়ল না। অবশেষে সুবর্ণবাবুর বাড়ি ছেড়ে আমরা গাছগাছালির জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে প্রধান ফটকের দিয়ে এগিয়ে চললাম। কিছু দূর গিয়ে একটা ঝোপের মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে বার তিনেক তুড়ি দিল। একজন যণ্ডামত লোক বেরিয়ে এল। নিচু স্বরে ও কী যেন জিজ্ঞাসা করল। তারপর আবার ফিরে এল পুকুরের ধারে। তারপর আমবাগান আসতে ও চাঁপার ঘরের দিকে পা বাড়ালো। সেখানেও কোন শব্দ নেই। চাঁপার ঘরের দরজায় সামান্য চাপ দিল। খুলল না। ভেতর থেকে বন্ধ। ফিরে আসছি, হঠাৎ কোথা থেকে যেন ভূতের মতো সামনে এসে দাঁড়ালেন গোপাল সাহা। ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, — কারো কোন সাড়া শব্দ তো নেই মশাই।

—হুঁ, চারিদিকে পাহারা ঠিক মতো আছে?

—হ্যাঁ, একটা মাছিও গলতে পারবে না।

—ঠিক আছে, আপনি যেমন আছেন তেমনিই থাকুন। সঙ্গে বাঁশি আছে তো?

—হ্যাঁ।

—তেমন পরিস্থিতি হলে বুঝতেই পারছেন কি করতে হবে?

—ওকে।

আবার অন্ধকারে হাঁটা। এতক্ষণে আমাদের সাপের ছোবল খাওয়ার কথা। কিন্তু ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহে সেটি এখনও হয়ে ওঠেনি। সামনে একটা বড় নিমগাছের নিচে প্রায় বিশ মিনিটের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি মেলে। কিন্তু কোথাও বিসদৃশ কিছু নজরে পড়ল না। গাছতলায় দাঁড়িয়ে আমার করার মতো কাজই ছিল না। একমনে যুবনাশ্বের গানই শুনছিলাম। শুনতে শুনতে যখন বেশ তন্ময় ভাবটা এসে গিয়েছিল, ঠিক তখনই হঠাৎ যুবনাশ্ব গান থামিয়ে দিলেন। এত অপ্রত্যাশিত ভাবে মাঝপথে গানটা থেমে গেল তাতে সামান্য অবাক না হয়ে পারলাম না। মনে হলো কে যেন হঠাৎই মাঝপথে শিল্পীর গলা টিপে তার সুর থামিয়ে দিল। নীলের দিকে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকালাম। কিন্তু অন্ধকারে ওর কোন অভিব্যক্তি বুঝতে পারলাম না। কিছু জিজ্ঞাসা করতেও পারলাম না। কারণ এখন কোন প্রশ্নই অবান্তর।

কতক্ষণ ঐ ভাবে কেটেছিল তা জানি না। হঠাৎ নীলের মুখে বিড়বিড় করা আওয়াজ পেলাম, ও বলছিল, —তবে কী আমার ধারণা ভুল প্রতিপন্ন করে, চল তো দেখি।

আমার 'হ্যাঁ' বা 'না'র তোয়াক্কা না করে ও কিঞ্চিৎ দ্রুত এগিয়ে চলল যুবনাশ্বর ঘরের দিকে। আগের মতই ও যুবনাশ্বের শয়নকক্ষের দরজায় ঈষৎ চাপ দিল। দরজাটা খুলে গেল। ঘরের মধ্যেটা মিশকালো। কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না। নীল একবার যুবনাশ্ববাবুর নাম ধরে ডাকল। কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। এইবার ও হাতের টর্চটা জ্বালল। তিন সেলের টর্চের আলো গোলাকৃতিতে সামনের দেয়ালে গিয়ে পড়ল। তারপর টর্চের আলো ঘুরল এদিক সেদিক। সহসা একটা জায়গায় গিয়ে আলো থমকে দাঁড়ালো। দক্ষিণের জানলার সামনেই ছিল যুবনাশ্বর টেবিল চেয়ার। টেবিলের ওপর মাথা রেখে যুবনাশ্ব ঘুমোচ্ছেন। চকিতে নীল সুইচের দিকে টর্চের আলো ঘুরিয়ে বলল, — অজু আলোটা জ্বালো।

আলো জ্বলতেই নীল এগিয়ে গিয়ে যুবনাশ্বের সামনে দাঁড়ালো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওঁর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। কিন্তু একবারের জন্যেও ওঁকে স্পর্শ করল না। তারপর ধীরে ধীরে ওঁর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে হাতটা নিয়ে গেল ওর নাকের কাছে। মিনিট দুয়েক এক ভাবেই ধরে রইল, তারপর আপন মনেই ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল,—ঠিক এই ভয়টাই করেছিলাম।

বেশ আতঙ্ক আর উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—কী বলছিস তুই?

—হ্যাঁ, যুবনাশ্ব আর নেই।

চমকে উঠলাম। এতটা ভাবিনি। শেষ পর্যন্ত একজন শান্ত, ভদ্র এবং নিরীহ শিল্পীকেও খুন হতে হল। মৃত্যু নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলা হবে, এখানে আসার আগে কল্পনাও করতে পারিনি। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে দু-দুটো মানুষ চলে গেল। একজন উন্মত্ত খুনি প্রায় নীলের চোখের সামনেই আত্মভোলা এক শিল্পীকে খুন করে গেল। যে লোকটার কণ্ঠস্বর মাত্র কিছুক্ষণ আগেই এই আশ্রমের আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল। অস্ফুটে আমার মুখ থেকে কেবল একটা কথাই বের হলো,—আবার হত্যা?

নীল বলল,—হ্যাঁ, হত্যা, তবে, বলে ও থেমে গিয়ে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা একটা কাগজ তুলে নিল। নিজেই পড়ল, ভাঁজ করে পকেটে ঢোকাল। তারপর ডায়েরির মতো একটা মোটা খাতা যেটা তখনো খোলা অবস্থায় ওঁর মাথার কাছে পড়েছিল সেটা তুলে নিল। মিনিট খানেক খাতায় চোখ বোলালো। তারপর সেটা বন্ধ করতে করতে বলল,—অজু, এই বাঁশিটা নে, বাইরে গিয়ে তিনবার বাজা। এখানে এখন আমার কিছু করার নেই, যা কিছু ওই করুক।

হতভম্বের মতো বাইরে এসে তিনবার থেমে থেমে বাঁশি বাজালাম। গোপাল সাহা এবং আরো দুজন কনস্টেবল ছুটে এলেন। গোপালবাবু বললেন,—কী হল মশাই, বাঁশি কেন? এনিথিং রং?

—ইয়েস, যুবনাশ্ব ইজ ডেড।

—অ্যাঁ, কই কোথায়?

—ওঁর ঘরেই ওঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ভেতরে যান, নীল ওখানেই আছে।

আমার আর ভেতরে যাবার প্রবৃত্তি ছিল না। ট্রেনে প্রথম আলাপ হবার পর থেকে একে একে সব কথা মনে পড়তে লাগল। নীল বলতো, ভদ্রলোকের মধ্যে সম্ভাবনা প্রচুর। দশ বছরের মধ্যে উনি ভারতজোড়া নাম করবেন এমন আশাও নীল পোষণ করতো। এই লোকটাই একরকম জোর করে আমাদের নিয়ে এসেছিল। শান্তিপ্রিয় শিল্পী। খুনখারাপি আর রক্ত যে সহ্য করতে পারতো না, তাকেও শেষ পর্যন্ত অকালে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হল। নীল যেন কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, খেয়াল করিনি। হঠাৎ কাঁধে ওর স্পর্শ অনুভব করে ওর দিকে তাকালাম। অন্ধকারে ওর মুখের রেখা পড়তে পারলাম না। কেবল শুনলাম, ও বলছে, —চ, আমার কাজ প্রায় শেষ। কালই চলে যাব।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, — কী বলছিস তুই? কালই চলে যাবি মানে? এতগুলো লোকের হত্যাকারীকে বিশেষত সে যখন যুবনাশ্বকে হত্যা করেছে তাকে না ধরেই চলে যাবি?

নীল আমার কথার উত্তর না দিয়ে বলল,—একটা কাজ বাকি আছে। চল সেটাই সেরে ফেলি।

নীলের কোন কথাবার্তার মানেই বোধগম্য হচ্ছিল না। ও কিন্তু আমার কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করেই অন্ধকারে এগিয়ে চলল। তারপর এসে থামল সুবর্ণ ঘোষালের বাড়ির সামনে। দরজার সামনে গিয়ে কলিং বেল-এ চাপ দিল। এখন ওকে বেশ অবসন্ন আর ম্রিয়মাণ মনে হচ্ছিল। হওয়াই স্বাভাবিক। যুবনাশ্বের মতো একটা লোক, এইভাবে খুন হলে মনে তো লাগবেই। একটু পরেই আলো জ্বলে উঠল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে শ্যামাপদ বেরিয়ে এল। এত রাতে আমাদের এই ভাবে দেখে তার চোখে মুখে ভয় এবং উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল।

—বাবু, আপনারা, এত রাতে?

বেশ গম্ভীর হয়ে নীল বলল — তোমার বাবু কী করছেন?

—আজ্ঞে, তিনি তো ঘুমোচ্ছেন।

হঠাৎ পেছন থেকে আর একটি ভরাট এবং গম্ভীর স্বর ভেসে এল,—না, ঘুমোইনি। এতক্ষণ জেগেই ছিলাম। শ্যামাপদ ভেতরে যা।

শ্যামাপদ চলে গেল। সুবর্ণ বললেন,—অ্যারেস্ট করতে এসেছেন? ভাবলেন যদি ভোরের আগেই পালাই? ভয় নেই। পালাবো না। সবই যখন তছনছ হয়ে গেল, তখন পালিয়ে আর বাঁচব কোথায়? এই নিন, বলে হাত দুটো এগিয়ে দিলেন, হাতকড়া নিশ্চয়ই এনেছেন?

সুবর্ণ ঘোষালের চোখে চোখ রেখে নীল বলল —নীল ব্যানার্জি চট করে ভুল সিদ্ধান্তে আসে না। সে আপনাকে কোনদিনও সন্দেহ করেনি, আজও করে না। যদিও যশোদা আশ্রমের প্রতিটি ঘটনাই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্যে আঙুল তুলে বসেছিল।

—মিস্টার ব্যানার্জি!

—হ্যাঁ সুবর্ণবাবু আপনি কোনদিনও কোন খুন করেননি। আর,

—আর কী?

—আর আপনার যে বিশ্বাস আপনাকে ঘিরে একটা মিথ তৈরি করেছে, সেই বিশ্বাস আজও আপনার অম্লান, অক্ষত।

—আপনি কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।

—আপনিই তো বলতেন, এবং এটাই জনশ্রুতি, কেউ আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করলে, অথবা কেউ আপনার মনে আঘাত দিলে সে আর বাঁচে না। আরো একবার, কাকতালীয় হলেও, প্রমাণিত হল আপনার বিশ্বাস সত্য। যুবনাশ্ববাবু আর নেই।

বধির বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে সুবর্ণ বললেন,—না, না, তাহলে যে আমি একজনের কাছে দোষী হয়ে যাব চিরদিনের জন্যে।

নীল বলল,—কিন্তু এটা সত্যি।

হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল,—এবং এটাও হত্যা।

আমার কথা কেড়ে নিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে থেমে থেমে নীল বলল,—হত্যা ঠিকই। তবে আত্মহত্যা।

হঠাৎ পিছন থেকে কেউ ঘাড়ে থাপ্পড় মারলে এতটা চমকাতাম না। চমকে উঠে বললাম, —তার মানে?

—মানে, সম্পূর্ণ সুস্থ মাথায় যুবনাশ্ব সেন আত্মহত্যা করেছেন। এই দেখুন মিস্টার ঘোষাল, আমাকে লেখা তার শেষ চিঠি, বলে পকেট থেকে একটু আগে পাওয়া চিঠিটা মেলে ধরল, তাতে লেখা রয়েছে, প্রিয় নীলাঞ্জন ব্যানার্জি, আমি চললাম। আমার সব কথা লিখে গেলাম আমার ডায়েরিতে।

আঘাত সামলে সুবর্ণ বললেন,—এ সবের অর্থ কী মিস্টার ব্যানার্জি?

ম্লান হেসে নীল বলল,—খুন করতে করতে উনি টায়ার্ড হয়ে পড়েছিলেন, তাই শেষ খুনটা নিজেকে করে উনি খুনের পর্ব মেটালেন।

মুহুর্মুহু বজ্রাঘাতে আমার তখন জ্ঞান লুপ্ত হবার উপক্রম। নীল এসব কী বলছে? তাই আমিই জিজ্ঞাসা করলাম, — এ সব তুই কী বলছিস?

—যা বলছি তার এক বর্ণ মিথ্যে নয়। সনাতন থেকে যুবনাশ্ব, ছ ছটা খুন উনিই করেছেন।

—কিন্তু কেন?

প্রশ্নটা আমার এবং সুবর্ণবাবুর হলেও, প্রশ্নটা কিন্তু আমরা করিনি। সুবর্ণ ঘোষালের পিছনে এসে কখন যেন দাঁড়িয়েছিলেন যশোদাদেবী। পর্দার আড়াল থেকে দেখা যাচ্ছিল কেবল ওঁর রাত জাগা বিস্মিত মুখখানা। প্রশ্নটা আবার করলেন,—কেন, মিস্টার ব্যানার্জি?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যশোদা দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে নীল বলল,—এর উত্তর তো আপনিই দিতে পারবেন মিসেস ঘোষাল!

—কী বলছেন মিস্টার ব্যানার্জি?

—আজ সারারাত নিজের কাছে নিজেকে খুলে দিন। সব বুঝতে পারবেন। নইলে, আমি তো আছি। কাল সকালে সব প্রশ্নের উত্তর দোব। অনেক রাত হলো। আমার ঘুম পাচ্ছে।

একরকম আমাকে টানতে টানতেই নীল বেরিয়ে এল। ঘুম পাচ্ছে বলে চলে এলেও ও কিন্তু শুতে গেল না। আমার মনে হাজারো প্রশ্ন থাকলেও, এবং বারবার ওকে জিজ্ঞাসা করেও কোন উত্তর পাইনি।

ও কেবল বলল,—আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। শুয়ে পড়। চট করে ঘুম আসবে না জানি। যতক্ষণ না ঘুম আসে ততক্ষণ মনে মনে চিন্তা কর। যুবনাশ্বর অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলো এখনও যশোদা আশ্রমের চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়তো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। নইলে একটা ট্রাঙ্কুইলাইজার খেয়ে শুয়ে পড়।

বলেই ও যুবনাশ্বের ডায়েরি নিয়ে বারান্দায় চলে গেল। পরদিন একটু বেলাতেই ঘুম ভেঙে ছিল গতরাতে ট্র্যাঙ্কুইলাইজার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে উঠে নীলকে দেখতে পেলাম না। মনে পড়ে গেল গত রাতের সব কথা। দিনের আলোতে সব কিছু দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। ভাবতেই পারছিলাম না যুবনাশ্ব খুনি এবং যুবনাশ্ব আর নেই। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি যশোদা আশ্রমের লোকগুলো কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। বোকারোগা আর ভীতিবিহ্বল মুখে এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে গতকাল ভোরে উঠে ওরা শুনেছিল নীহার খুন হয়েছিলেন। আর আজ তারা শুনল যুবনাশ্ব আত্মহত্যা করেছেন। সব মিলিয়ে যশোদা আশ্রম শোকের হাওয়ায় ভারী।

আমরা ভেবেছিলাম সকাল সকালই যশোদা আশ্রম ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু তা হলো না। বেলা বারোটার সময় যুবনাশ্বর মৃতদেহ নিয়ে পুলিসের লোকেরা চলে গেল। একমাত্র সুবর্ণ ঘোষালেরই চোখদুটো দেখলাম ছলছল করছে।

মৃতদেহ চলে যাবার পর স্নান খাওয়া দাওয়া সেরে আমি আর নীল গেলাম সুবর্ণ ঘোষালের বাড়ি। ওর হাতে ছিল যুবনাশ্বর ডায়েরিখানা। সুবর্ণবাবু আর যশোদাদেবী উদ্‌গ্রীব হয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ডাক্তারও ব্যাজার ভাব ছেড়ে গুম মেরে বসেছিলেন। আমরা যেতেই সুবর্ণবাবু বললেন —আসুন, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। যে দুজন আপনাকে ডেকে এনেছিল আজ আর তারা নেই। আমাকেই তো আপনাদের বিদায় দিতে হবে।

নীল বলল, —হ্যাঁ, এখানে থাকার দরকার আমার ফুরিয়েছে। ভেবেছিলাম সকালেই চলে যাব যুবনাশ্বের ডায়েরিখানা আপনার হাতে তুলে দিয়ে। কিন্তু ডায়েরিখানা উনি আমাকেই দান করে গেছেন। তাই ওর কথা আপনাদের না জানিয়ে যেতে পাচ্ছি না। আপনাদের ইচ্ছে না থাকলেও এটা আমাকে শোনাতেই হবে। পাঁচটা খুন উনি নিজের হাতে করেছেন ঠিকই, কিন্তু কেন? এই কেন'র উত্তর যে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ঘোষালের জানা দরকার। অপ্রিয় হলেও তা করতেই হবে। নইলে যুবনাশ্ব মরেও শান্তি পাবেন না।

জানলার ধারে একটা ইজি চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় প্রায় শুকনো মুখে বসেছিলেন যশোদাদেবী। ওর চোখ দুটো লাল টকটক করছে। বেশ বোঝা যায় উনি সারারাত ঘুমোননি। হয়ত বা কেঁদেও ছিলেন। প্রায় অস্ফুটে উনি বললেন,—আপনি পড়ুন ব্যানার্জি সাহেব ওর ডায়েরিটা।

আর কোন ভূমিকা না করে নীল পড়তে শুরু করল।

১৪ই এপ্রিল। বাংলা নববর্ষ।

জীবনে আমি কোনদিনও ডায়েরি লিখিনি। নিজের অতীতটা ভাবতে শুরু করলেই মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়ি। মনে হয় নিজের কথা কাউকে খুলে বলি। কিন্তু কাকে বলব? ভাবতে গিয়ে মনে হলো নিজের কথা নিজেকেই বলা ভালো। তাই এই ডায়েরি লেখা শুরু।

জ্ঞান হবার পর থেকে আমি দেখছি আমি বড় একা। এত বড় পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। আমি একটা বোর্ডিং স্কুলে থেকে পড়াশুনো করি। এখন আমি ক্লাস টেনের ছাত্র। প্রতিবছর গ্রীষ্ম আর পুজোর ছুটিতে আমার সহপাঠীরা যে যার বাড়ি চলে যায়। কিন্তু আমার কোন যাবার জায়গা নেই। আমার মা বাবা বা কোন অভিভাবক নেই। কেউ আসে না আমাকে নিয়ে যেতে। কারণ আমার কোন নিজের বাড়ি নেই। অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম আমার পরিচয় এবং পূর্ব বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করব বোর্ডিং সুপারিন্টেন্ডেন্টকে। কিন্তু করতে পারিনি। একদিন গিয়ে তাঁকে সব কথা জিজ্ঞাসা করলাম। শুনে সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলেছিলেন আমার ছোট বেলায় আমার বাবা মারা গেছেন। আর মা মারা গেছেন যখন আমার বয়েস পাঁচ। তাঁর মৃত্যুর পর এক ভদ্রলোক আমাকে বোর্ডিং-এ রেখে যান। আমার খরচের

ব্যাপারে নাকি কোন কিছু চিন্তার ছিল না। বাবা যাবার সময় আমার আর আমার মায়ের নামে প্রচুর টাকা ব্যাঙ্কে রেখে গেছেন। মায়ের মৃত্যুর পর সেই ভদ্রলোক ব্যাঙ্কের সঙ্গে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমার প্রতিমাসের খরচ ব্যাঙ্ক নিয়মিত বোর্ডিং-এ দিয়ে দেয়। সাবালক না হওয়া পর্যন্ত এই ভাবেই চলবে। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার পর কলকাতায় এলাম কলেজে পড়তে। আর এইখানেই আমার আলাপ সুবর্ণর সঙ্গে..।

২ই ভাদ্র,

কেন জানি না সুবর্ণর সঙ্গে আমার বড় বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সুবর্ণও বেশ বড়লোকের ছেলে। কিন্তু ওর মধ্যে কোন দাম্ভিকতা ছিল না। ছিল না কোন বন্ধুত্বের ছলনা। আমি হোস্টেলে থাকি, এবং আমার কেউ নেই শুনে ও বারবার ওর বাড়িতে থাকার অনুরোধ করেছিল। কিন্তু পারিনি।

পারিনি, কারণ আমার আত্মসম্মানবোধটা ছিল ভীষণ প্রখর। কারো কাছে কোনদিন কিছু হাত পেতে চাওয়া অথবা কারো দয়ার দান গ্রহণ করার মতো কোন প্রবৃত্তি আমার ছিল না। আসলে একটা প্রচণ্ড অভিমান বোধ থেকেই যে এগুলো জমেছিল তা আমি বুঝতে পারতাম। আমার চরম একাকীত্বই আমার মধ্যে অভিমান আর মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলেছিল। তাই সুবর্ণর প্রস্তাবে আমি রাজি হতে পারিনি। কিন্তু ওর ঐকান্তিক ইচ্ছাকে মূল্য দিতে গিয়ে আমাকে একদিন ওদের বাড়ি যেতে হয়েছিল। আজ ভাবি সেদিন না গেলেই বোধহয় ভালো হত। সেদিন ওদের বাড়ি না গেলে হয়তো আমার জীবনের পরিণতি অন্যরকম হত।

ওদের বিরাট বাড়িটা দেখে প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। চিরদিন বোর্ডিং-এ মানুষ হয়েছি চারজন রুমমেট নিয়ে। আমার পক্ষে তখন কল্পনার বাইরে, এত বড় বাড়িতে ওদের মতো ছোট্ট একটা ফ্যামিলি কেমন করে থাকতে পারে। সে যাই হোক, সুবর্ণ প্রথমে ওর মা আর বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। মা একটু রাশভারী চরিত্রের হলেও বোন সুকন্যা ছিল বড় ভালো মেয়ে। নিজের কোন বোন বা ভাই ছিল না। ওদের আমি ভাই-বোন ভেবেই যাতায়াত শুরু করলাম।

৬ই আশ্বিন।

আজ আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি একটা অসুস্থ মানসিকতা আমাকে কেমন ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। আমি জানি এটা ঠিক নয়। এমনটি হওয়া উচিত নয়। তবু একটা প্রচণ্ড ঈর্ষাবোধ আমাকে যেন পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলছে। সুবর্ণকে আমি ভালবাসি। ওর বোনকে নিজের বোনের জায়গা দিয়েছি। তবু সেই ঈর্ষাটা আমাকে জ্বালায়। এই ঈর্ষার শুরু হয়েছে প্রথম যেদিন আমি ওদের বাড়িটা দেখলাম। কী পর্যাপ্ত প্রাচুর্য। চারিদিকে কী ইলাহি ব্যাপার। সুবর্ণর সব আছে। ওর বাবা আছে মা আছে বোন আছে। আছে একটা বিরাট বাড়ি। একটি ছেলে যা যা চাইতে পারে ও তার সব পেয়েছে। স্নেহ, মমতা, ভালবাসা। প্রাণ খুলে কথা বলার মতো একজন বোন। সুবর্ণর কাছে সেদিন থেকে নিজেকে বড় ছোট মনে হতে লাগল। সুবর্ণ যেন আমার থেকে সব দিক দিয়ে বড়। রূপে গুণে অর্থে। জীবনের সব কিছু চাওয়াতে। দেখতে আমি কোন দিনও ভালো ছিলাম না। বরং রূপবান সুবর্ণর পাশে নিজেকে কদাকারই মনে হত। একসঙ্গে পাশাপাশি হাঁটলে আমাকে ওর গৃহভৃত্য ছাড়া আর কিছু মনে হত না। গুণও ছিল ওর অনেক। চার চারটে সাবজেক্টে ও পেয়েছিল লেটার। আর আমি অর্ডিনারি সেকেন্ড ডিভিশন। এছাড়াও ফুটবল, ক্রিকেট, আর অভিনয়ে ও সবাইকে ছাড়িয়ে যেত। কলেজে প্রত্যেকেই সুবর্ণর রূপগুণ আর ব্যবহারের মাধুর্যে ছিল পঞ্চমুখ। অথচ আমার মতো অতি সাধারণ এক কালো কদাকার ছেলে পেতাম সহপাঠিদের অবজ্ঞা আর অনাদর। সুবর্ণর সব ভালবাসা পেয়েও ঈর্ষায় আমার বুক ফেটে যেত। কেবলি মনে হত, ঈশ্বরের পৃথিবীতে কেন এত বৈষম্য? কেন এত অবিচার? এক চোখা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগের আর শেষ ছিল না।

৭ই কার্তিক—

পুজো শেষ হয়ে গেল। গতকাল গেছে বিজয়া দশমী। আমার কোথাও যাবার নেই। নেই কাউকে

প্রণাম করাব। হঠাৎ মনে পড়ল সুবর্ণব বাবা মাব কথা। ওর বাড়িতে যাবার কথা যখন ভাবছিলাম তখনই সুবর্ণ আমাব হোস্টেলে এসে হাজিব। সুবর্ণকে কিছু বলতে যাচ্ছি সহসা ওর পিছন দিকে তাকিয়ে আমাব চোখেব পাতা যেন আটকে গেল। একটি ফুটফুটে বাবো তেরো বছরের মেয়ে। এর আগে আমি তাকে কোনদিনও দেখিনি। আব দেখিনি এমন সুন্দরী কাউকে। আমাকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকতে দেখে সুবর্ণ বলল,—কী হাঁ কবে বোকাব মত তাকিয়ে আছিস? চিনিস ওকে?

বললাম,—নাহ্ চিনব কেমন কবে? এইতো প্রথম দেখলাম।

—ও আমাদেব সুবেশ কাকুব মেয়ে। পুজোব পর আমাদেব এখানে বেড়াতে এসেছে। থাকে বাঁচীতে।

—সুবেশ কাকু কে?

—তুই চিনবি না। বাবাব ছোটবেলাব বন্ধু' কোনদিন কলকাতায় আসেনি। স্কুল না খোলা পর্যন্ত এখানেই থাকবে।

কম বয়েসী মেয়ে। তাকে তো আব 'আপনি' 'আজ্ঞে' কবতে পাবি না। জিজ্ঞাসা কবলাম, —তোমাব নাম কী?

ও বলল,—যশোদা। যশোদা চ্যাটার্জি। তোমাব নাম কী?

—যুবনাশ্ব সেন। কিন্তু তোমাব নামটা বড় সেকেলে।

আহা, তোমাব নামটা কী খুব একেলে?

সুবর্ণ হেসে উঠল। বলল,—ওব সঙ্গে কথায় পাববি না। নে নে চল্, তোকে নিতে এসেছি।

— কোথায়?

— কেন আমাব বাড়ি। বিজয়া কবতে। আমাব বাবাব সঙ্গে তোব তো এখনও পবিচয়ই হয়নি। বাবা আজ বাড়ি আছেন। দেখাও হবে, নমস্কাবও হবে।

সেই প্রথম যৌবনেব শুরুতে, নিজেব কুরূপেব কথা স্মবণ বেখেও, যশোদা আমাব মনেব মধ্যে একটা কী নতুন সুব ছড়িয়ে দিল। এ সুবটাকে আমি কোনদিন চিনতাম না। ওকে ঘিবে আমার মনেব মধ্যে একটা অদ্ভুত বিন্ বিন্ কবা আবেশ আমাকে হঠাৎ হঠাৎই দুলিয়ে দিচ্ছিল। সমস্ত জগৎ সংসাবকে কেন জানি না সেই মুহূর্তে ভীষণ ভাল লাগতে শুরু কবল। সুবর্ণ বলাব সঙ্গে সঙ্গেই চলে এলাম ওব বাড়িতে।

এই প্রথম দেখলাম সুবর্ণব বাবাকে। ওকে দেখে কেমন একটা চমক লাগল ভেতরে। ভদ্রলোক সুবর্ণব মতোই রূপবান। বিত্তশালী লোক তাঁব আচাব ব্যবহারেই প্রকাশ করছিলেন নিজেকে। কিন্তু তাঁকে দেখাব সঙ্গে সঙ্গেই, স্মৃতির আলমাবির গায়ে কে যেন ধাক্কা দিল। চেতনার মূল ধরে সহসা কে যেন দিল নাড়া। আলো অন্ধকারের জটিল আবর্ত থেকে ওঁর মুখটা আবার স্পষ্ট থেকে আবছাব আড়ালে হাবিয়ে যাচ্ছিল। কেবলি মনে হচ্ছিল কোথায় যেন দেখেছি ওঁকে। এ মুখটা যেন আমার অনেক কালেব চেনা।

ওঁকে প্রণাম কবতেই উনি আমাব নাম জিজ্ঞাসা কবলেন। বললাম। আর আমি স্পষ্ট দেখলাম, না আমাব কোন ভুল হয়নি, উনি চমকে উঠে বললেন, আশ্চর্য।

ঘবেব সবাই বেশ বিস্মিত হলেন। সুবর্ণর মা জিজ্ঞেস কবলেন, —এতে আশ্চর্যের কী আছে?

দুবমনস্কতা থেকে সম্বিত ফিরে পেয়ে উনি বললেন, —না, কিছু না। ওর নামটা বড় আনকমন্। তাই।

আব কিছু না বলে উনি ঘর থেকে বেবিয়ে গেলেন। কিন্তু আমাব মনের মধ্যে বয়ে গেল একটা জিজ্ঞাসা। কে উনি? কোথায় দেখেছি ওঁকে? মুখটা আমাব এত চেনা কেন.......

কার্তিকেব শেষ

কলকাতায় এখনও শীত পড়েনি। কিন্তু শীতেব একটা হাল্কা আমেজ ছড়াতে শুরু করেছে। সুবর্ণব বাড়িতে আমাব যাতায়াত বেড়ে গেছে। বলা বাহুল্য, যশোদা আমাকে টানে। এক অনিবার্য আকর্ষণে

আমাকে ছুটে যেতে হয়। প্রতিদিন বিকেলে আমি, সুবর্ণ, সুকন্যা আর যশোদা, ওদের বাগানে গল্প করি। গত পরশুদিন, চারজনে হাসি ঠাট্টা করতে করতে হঠাৎ সুকন্যা বলে উঠল, —যুবনাশ্বদা, যশোদা খুব ভালো গাইতে পারে। এতদিন জানতাম না। আজ বাথরুমে গাইছিল। কী মিষ্টি ওর গলা। শুনবে?

আমি বললাম, —তাই নাকি? তাহলে তো যশোদার গান শুনতেই হবে।

যশোদা কিন্তু গাইতে রাজি হল না। বলল, —ধ্যাৎ, সেতো বাথরুমে। ও আবার গান নাকি? তার থেকে বরং তুমি গাও।

বললাম, —আমি গান গাইতে পারি তুমি কি করে জানলে? আমি তো কোনদিন এ বাড়িতে গাইনি।

যশোদা বলল, —না গাইলে কী? সুবর্ণদা আমাকে বলেছে।

ধরা পড়ে গেলাম। তারপর সবার অনুরোধে আমাকে গাইতে হল। গাইতে গাইতে আমি স্পষ্ট দেখলাম যশোদা অবাক প্রশংসায় আমার প্রায় কদাকার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। এখন আমার মনে হচ্ছে ঈশ্বর আমাকে একেবারে বঞ্চিত করেননি। অন্তত সুবর্ণকে একটা বিষয়ে ছাপিয়ে যাবার মত গুণ আমার আছে.....।

১০ই অগ্রহায়ণ

যশোদা চলে গেছে। বেশ সহজ আর স্বাভাবিক ভাবেই। কিন্তু আমার চারপাশে রেখে গেছে সেই রিন্ রিন্ করা এক টুকরো ভালোলাগা। এ কাউকে বলার নয়। এমনকি সুবর্ণকেও না। তবে যাবার আগে ও আমার গানের খুব তারিফ করেছিল। বলেছিল আমি যদি গান শিখি একদিন বিরাট গাইয়ে হতে পারব! ভাবছি এবার থেকে মন দিয়ে গান শিখব।

১৫ই অগ্রহায়ণ

সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ঘুণপোকার মত একটা স্মৃতি আমার মাথার মধ্যে কুড়কুড় করে চলেছে অবিরাম। একটা মুখ। একটা মুখের অস্পষ্ট আদল। কোথায় দেখেছি, কবে দেখেছি মনে করতে পারছি না। কিন্তু আমি দেখেছি। সুবর্ণর বাবা হারাধন ঘোষালের সঙ্গে আমার মাত্র একদিনের দেখা। কিন্তু ঐ মুখ। ঐ চাহনি। অতীত হাতড়েও কূল কিনারা পাচ্ছি না। যখনই আমি সুবর্ণর বাড়ি যাই ওর ঘরে টাঙানো হারাধনবাবুর ছবিটা আমাকে অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করে। কেন?

পৌষ সংক্রান্তি

হোস্টেলে বসে পড়াশুনো করছি। হঠাৎ সুবর্ণ এসে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে গেল ওদের বাড়ি। পিঠে খাবার নেমন্তন্ন। যাবার ইচ্ছে ছিল না। যশোদা মাত্র কদিনের জন্যে এসে চলে যাবার পর ও বাড়িটা শুধুমাত্র এক আকর্ষণ ছাড়া আর কোন কিছুই আমাকে টানে না। তবু গেলাম। সুবর্ণকে দুঃখ দিতে ইচ্ছে করে না। আজ আবার হারাধনবাবুর সঙ্গে দেখা। উনি যেন কোথায় বেরুচ্ছিলেন। সহসা আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ালেন। আপাদমস্তক বোধহয় আমাকেই নিরীক্ষণ করলেন। কিছু যেন বলতেও চাইছিলেন। তারপর, হয়ত সুবর্ণ থাকার জন্যেই, কিছু না বলে চলে গেলেন। পিছন থেকে ওঁর যাবার ভঙ্গিটা দেখতে দেখতে শৈশবের স্মৃতিতে কী যেন একটা বিদ্যুৎ চমকের মতো ঘা দিল। ঠিক এমনি ভাবেই কাকে যেন আমি প্রতিদিনই চলে যেতে দেখতাম। কিন্তু কে সে? এরা কী একই ব্যক্তি? অথবা স্মৃতির বিভ্রম? আমার আর ওর বাবার ব্যবহারে সুবর্ণকে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হতে দেখলাম। অবশ্য ও আর কিছু না বলে আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।

১৩ই পৌষ

ইন্টার কলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের খেলা। মাঠে সুবর্ণ রাজা। আমার জায়গা প্যাভিলিয়নের এক

কোণে নগণ্য দর্শকের মতো। সুবর্ণর এক একটা বাউন্ডারি আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। যদিও সুবর্ণর সাফল্যে আমার আনন্দিত হবার কথা। কেন না ও আমার এক নম্বর বন্ধু। তবু ঈর্ষাপোকা আমাকে আনন্দের বদলে নিরানন্দের পচা পুকুরে ডোবাচ্ছে। এ ভালো না। কোনমতেই না।

১৫ই ফাল্গুন

আজ দোল। সারাদিন সুবর্ণর বাড়ি কাটিয়ে এইমাত্র একমাথা আবির নিয়ে হস্টেলে ফিরলাম। কিন্তু হস্টেলে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল একটি বিস্ময়। টেবিলের ওপর আমার নামে পড়ে আছে একটি খাম। আমার চিঠি। আজ পর্যন্ত আমার নিঃসঙ্গ জীবনে কেউ কোনদিনও চিঠি লেখেনি। অবাক হয়ে চিঠিটা খুললাম। আমার স্বপ্নের অতীত একটি বিস্ময়। যশোদার চিঠি। প্রথম চিঠি। না, কোন প্রেমপত্র নয়। কিন্তু তার থেকেও আরো কিছু বোধহয়। বুকের মধ্যে ভূমিকম্পের ঘোষণা। যশোদা লিখেছে, তুমি কেমন আছ? এর আগে এমন কথা কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। তবে কি পৃথিবীতে আমার থাকা না থাকার প্রশ্ন কারো মনে আসতে পারে? এ অভিজ্ঞতা কল্পনাতীত। বুকের মধ্যে চিঠিটা চেপে ধরে মুখ থেকে অজান্তে বেরিয়ে এল 'আমি ভালো নেই যশোদা। আমার ভালো থাকতে নেই!' গানের ক্লাশে ভর্তি হয়েছি কিনা জিজ্ঞাসা করেছে। ছি, ছি, যশোদা বলা সত্ত্বেও এখনও আমি গান শিখতে আরম্ভ করিনি। এর থেকে খারাপ কী থাকতে পারে।

এখানে এসে নীল একটু থামল। তারপর বলল,

এরপর আর কোন তারিখের উল্লেখ নেই। ডায়েরি লেখাও বেশ অনিয়মিত। দীর্ঘদিন পর পর হঠাৎ হঠাৎ লেখা। এরপর ও লিখছে—ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। পাশ করেছি। কিন্তু সুবর্ণর আশে পাশে যাবার কোন ক্ষমতাই আমার হয়নি। ও পেয়েছে হাই ফার্স্ট ডিভিশান। আমি সত্যিই ওর কাছে কিছু না। প্রথমে ছিল সামান্য ক্ষোভ। তারপর এল ঈর্ষা। এখন একটা চাপা জ্বালা। যশোদাকে পরীক্ষার ফল জানালাম। এই নিয়ে যশোদা আর আমার তৃতীয় পত্রসাক্ষাৎ।

প্রায় মাসখানেক পর লেখা,

দেখতে দেখতে একমাস কেটে গেল। দু'জনেই বি এস-সিতে ভর্তি হয়েছি। একদিন সুবর্ণর লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনো করছিলাম। সুবর্ণ ছিল না তখন। হঠাৎ লাইব্রেরিতে এসে ঢুকলেন হারাধন ঘোষাল। আমাকে দেখেও কিছু না বলে উনি সামনেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। তারপর একটা বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলেন। বড় অস্বস্তিকর অবস্থা। সামান্য কিছু সময়ের পর আমি সংকোচে ঘর ত্যাগ করতে চাইলাম। অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে ওনার দিকে তাকাতেই দেখি উনি একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমাকে উঠতে দেখেই বললেন,—তুমি যুবনাশ্ব সেন?

সংকোচে বললাম, — আজ্ঞে হ্যাঁ।

—রাহুল সেনের ছেলে?

—হ্যাঁ। সেই রকমই জানি, কারণ

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন,—কারণ বাবাকে তুমি মনে রাখার মতো বয়েসে কোনদিনও দেখনি।

অবাক হয়ে বললাম, — আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনি জানলেন কেমন করে?

সে কথার উত্তর না দিয়ে উনি বললেন,—তোমার মা ছিলেন রত্না সেন?

—এটাও শুনেছি।

—তুমি মিশনারি বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনো করেছ, তাই না?

—কিন্তু আপনি, আমাকে চেনেন?

মৃদু হেসে প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, —তোমার মায়ের গলা ছিল আশ্চর্য রকমের ভাল। তোমার

বাবাও ভালো গাইতেন। তুমি গাও না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—থেমো না। চালিয়ে যাও। ওটা তোমার হবে। রক্তের ঐশ্বর্য।

—কিন্তু আপনি তো আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না?

আবার মৃদু হেসে বললেন,—ধরে নাও আমি তোমার বাবা-মার বন্ধু ছিলাম। ও হ্যাঁ, ব্যাঙ্ক ঠিকমত সুদ দিয়ে যাচ্ছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ঠিক আছে, তুমি এবার এসো। আর প্রয়োজন পড়লে আমার কাছে আসতে দ্বিধাবোধ কোরো না।

হারাধন ঘোষাল উঠে চলে গেলেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই, পুরনো অস্পষ্ট ছায়াটা উজ্জ্বল আলোছবির মতো মূর্ত হয়ে উঠল। তখন আর কতই বা বয়েস হবে। হয়তো দশ এগারো। মিশনারি বোর্ডিং-এ মানুষ হচ্ছি। একদিন বিকেলে বাগানে বসে আছি একা। একটু একটু করে বুঝতে শিখছি। এটুকু বুঝেছিলাম, আমার এ সংসারে কেউ নেই। বাবা, মা কেউ না। বোধহয় আমার মতো ছেলেরা এটুকু বুঝতে পারে। হঠাৎ বোর্ডিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিসেস স্যামুয়েল আমাকে ডেকে পাঠালেন অফিস ঘরে। গেলাম। আমি ঢুকতেই বললেন, এই যুবনাশ্ব। দেখলাম মিসেস স্যামুয়েলের সামনে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। চুনোট করা ধুতি আর পাঞ্জাবিতে এক সৌম্যদর্শন ব্যক্তি। আমাকে উনি কাছে ডাকলেন। গালে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। একবাক্স মিষ্টি দিলেন। তারপর বলেছিলেন, বড় হও, ভালো করে লেখাপড়া শেখো। গান গাইতে পার?

মনে আছে, বলেছিলাম, — হ্যাঁ, একটু একটু।

—বেশ বেশ। তারপর মিসেস স্যামুয়েলকে বলেছিলেন, ছেলেটির গানের গলা থাকা উচিত। এটা ওর রক্তের ঐশ্বর্য।

'রক্তের ঐশ্বর্য' কথাটাই সব কিছুই মনে করিয়ে দিল। তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে হারাধন ঘোষালই সেদিন আমার স্কুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু কেন? হারাধন ঘোষালের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? উনি বললেন, উনি আমার বাবা-মার বন্ধু। হতে পারে। পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশুকে হয়তো দেখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু আসল সত্যটা আমার জানা দরকার। উনিই যদি সেই লোক হন তাহলে আমার বাবা-মার সব কিছুই ওঁর কাছ থেকে জানতে পারব। তার আগে একবার প্রয়োজন মিসেস স্যামুয়েলের সঙ্গে দেখা করার। উনিই বলতে পারবেন সেদিনের সেই ভদ্রলোক কে?

দু মাস পর

আমার সন্দেহই ঠিক। বোর্ডিং-এ ফিরে খবর নিলাম। সাম মিস্টার এইচ ঘোষাল আমাকে ভর্তি করিয়েছিলেন। তাঁর দস্তখত রয়েছে। সম্পর্কের উল্লেখ নেই। লেখা আছে পারিবারিক বন্ধু। ব্যাঙ্কেও যোগাযোগ করলাম। সেখানেও সেই এইচ. ঘোষাল। আমার নামে বড় অ্যামাউন্টের টাকা সেখানে জমা রয়েছে। হারাধন ঘোষাল আমার অভিভাবক হিসেবে অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এইবার বোধহয় আমার হারাধন ঘোষালের মুখোমুখি হওয়ার দরকার। আমার অজ্ঞাত অতীত একমাত্র উনিই বলতে পারবেন। আমার বাবা-মার কথা যে আমার জানা দরকার।

কয়েকদিন পর, যুবনাশ্ব আবার লিখছেন, আমি কিছুতেই সুবর্ণর বাবার সঙ্গে দেখা করতে পারছি না। উনি হঠাৎ শয্যা নিয়েছেন। হার্ট অ্যাটাক। বিছানা থেকে ওঠা বারণ। কারো সঙ্গে দেখা করাও বারণ। হঠাৎ যশোদার চিঠি পেলাম। প্রথম ডিভিসানে সে পাশ করেছে। কলকাতায় আসছে। হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করবে। এক অনির্বার্য পুলকে মনটা ভরে গেল। ওর কথামত আমি নিয়মিত গান শিখছি। এবার ওকে গান শোনাতে হবে।

অনেক আশা নিয়ে হাওড়া স্টেশনে গেলাম। কিন্তু দেখা করতে পারলাম না। দূর থেকে দেখি সুবর্ণ আর সুকন্যা অপেক্ষা করছে। যদিও যশোদা লিখেছিল স্টেশনে আসার জন্যে। কিন্তু সঙ্কোচ এসে পা দুটো আটকে দিল। আমার প্রতি যশোদার দুর্বলতা এখনই আর কেউ জানুক এ আমি চাই না। ট্রেন থেকে নেমেই যশোদা দুটি পরিচিত মুখ খুঁজে পেলো। কিন্তু ওর চাহনি ঘুরছিল এপাশ ওপাশ বেশ বুঝতে পারলাম ও কাকে খুঁজছে। নিঃশব্দে চলে এলাম। দেখা হল বিকেলে। সুবর্ণর বাড়িতে যশোদা এই ক'বছরেই অনেক লম্বা আর অনেক বড় হয়ে গেছে। দেখতেও হয়েছে দারুণ সুন্দরী ওর চেহারা দেখে এক হীনম্মন্যতা আমাকে গ্রাস করল। সেই বিউটি অ্যান্ড আগ্‌লির কথা মনে পড়ে গেল। ওর পাশে আমি সত্যই মর্কট। যশোদা যদি আর একটু সাদামাঠা দেখতে হত তাহলে বোধহয় আমিই সব থেকে বেশি আনন্দ পেতাম। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। একটা আশঙ্কা গ্রাস করতে চাইল। সে আশঙ্কা হারাবার। কিন্তু যশোদার দিকে কোন বিকার নেই। অতি পরিচিতের মত ও কাছে এল। হাসল, কথা বলল। মনটা আমার ভরে গেল।

আমাদের পরীক্ষা শেষ। সামনে এখন অনেক ছুটি। এর মধ্যে যশোদার সঙ্গে বহুবার দেখা হয়েছে। কখনো ভিক্টোরিয়ায়। কখনো লেকে। কখনো ইডেনে। কখনো সিনেমায়। আমাদের এ মেলামেশার কথা কেউ জানে না। সুবর্ণও না। যে কথা বলতে পারিনি সঙ্কোচে, যশোদা তাই আমাকে শুনিয়েছে, ও আমাকে ভালবাসে। যেদিন ওর মুখ থেকে প্রথম একথা শুনলাম, মনে হল আমি জিতে গেছি জীবনের প্রত্যেকটা খেলায় হারতে হারতে এই আমি প্রথম জেতার মুখ দেখলাম। জগতে নিজেকে বড় ভাগ্যবান আর সুখী বলে মনে হল। যশোদা বলেছে বি এস সি পাশের পর ডাক্তারি পড়তে হবে। আজও ওর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে ঘুরতে ঘুরতে ও অনেকবার মনে করিয়ে দিয়েছে সে কথা। আমার নিঃস্ব জীবনে যশোদাই একমাত্র ধ্রুবতারা। ওর নির্দেশই আমার জীবন পাথেয়।

গভীর আগ্রহ নিয়ে এই দিনটার অপেক্ষা করছিলাম। বি এস সি পরীক্ষার খবর বেরুলো। আমি পাশ করেছি। সাধারণ ভাবেই। কিন্তু সুবর্ণ? হাই ফার্স্টক্লাস। জানতাম লেখাপড়ায় সুবর্ণর পাশে আমি কোনদিনও দাঁড়াতে পারব না। কিন্তু আমার সব মন খারাপ তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিল যশোদা! একগাদা মিষ্টি আর ফুলের তোড়া হাতে ও আমার হস্টেলে হাজির। ওর কী আনন্দ। যেন পাশটা ওই-ই করেছে। মন খারাপের কারণ শুনে ও একেবারে আমার মুখের কাছে মুখ এনে বলেছিল, অতি সাধারণ মাপের ছেলেরাই জীবনে চেষ্টা থাকলে, অনেক বড় কিছু হয়, তা জান বোকা? নিজেকে আমি সেই মুহূর্তে সামলে রাখতে পারিনি। আমার সংযমের বাঁধ মুহূর্তে আলগা হয়ে গিয়েছিল। আবেগের আতিশয্যে এই প্রথম আমি সজোরে বুকের মধ্যে আটকে নিয়ে যশোদাকে চুমু খেলাম। ভেবেছিলাম ও বুঝি রেগে যাবে। কিন্তু ও কেবল কয়েক মিনিট আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, পাগল কোথাকার। আমি বুঝি সত্যিই পাগল হয়ে গেছি। যশোদাকে ছাড়া আমি বুঝি সত্যিই একদিন পাগল হয়ে যাব। আবার ওকে বুকের মাঝে চেপে ধরে বললাম, আমার বড় ভয় করে।

যশোদা বলল, —কেন? কিসের ভয়?

—তোমাকে যদি কোনদিন হারিয়ে ফেলি।

ও বলল, —পাগল কোথাকার। আমি তো তোমার কাছেই আছি। তোমার কাছেই থাকব।

—ঠিক?

—বেঠিক হতে যাবে কোন্ দুঃখে? আজ আমায় একটা জিনিস দেবে?

—কী?

—তোমার গান শুনতে ইচ্ছে করছে। শোনাবে?

—বললাম, এ একটা চাওয়া হল? বেশ, তবে শোন। তারপর গান শোনালাম। তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম. গানের শেষে দেখি ওর চোখে জল। ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে ওকে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। খুলেই চমকে উঠলাম। সুবর্ণ! ওর মিষ্টি হাসি নিয়ে ঘরে

ঢুকেই কিন্তু চমকে উঠল। যশোদাকে আমার ঘরে একা দেখে। সামান্য বিস্ময় নিয়ে ও জিজ্ঞাসা করল, —তুমি, যশোদা এখানে? আশঙ্কায় আমার বুক ঢিপঢিপ করছিল। কিন্তু যশোদা নির্বিকার। বলল, যুবনাশ্ব পাশ করেছে। অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সুবর্ণ আড়চোখে আমাকে দেখে বলল,—আমিও কিন্তু পাশ করেছি। মাথা হেলিয়ে যশোদা বলল, — জানি। কিন্তু তোমাকে বাহবা দেবার জন্যে কত লোক আছে। ও বেচারি, এসে দেখি একা একা ঘরে বসে আছে। এ বিষয়ে আর কোন কথা না বলে, সুবর্ণ বলল,—যুব, তোকে দু-একদিনের মধ্যে একবার আমাদের বাড়ি যেতে হবে।

—যাবই তো। মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

—সে যাস। তবে বাবা তোকে খুব খুঁজছেন। কয়েকদিন ধরে।

—বাবা মানে মেসোমশাই?

—হ্যাঁ। কবে যাবি বল?

—আজ, কাল যখন বলবি। কিন্তু আমাকে হঠাৎ?

—জানি না।

সুবর্ণ চলে গেল। একটু পরে যশোদাও। কিন্তু আমার সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। প্রথমত সুবর্ণ নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ করেছে। অবশ্য ও চাপা ছেলে। কাউকে কিছুই জানাবে না। তারপর হারাধন ঘোষাল আমায় ডাকছেন? কেন? বেশ কিছুদিন ধরে শয্যাশায়ী। সেকেন্ড স্ট্রোকের পর আর উঠতে পারেন না। কিন্তু কী আমায় বলতে চান? তবে কী আমার মা-বাবা সম্বন্ধে— ?

এরপর কয়েকপাতা কিছুই লেখা নেই। তারপর যুবনাশ্ব আবার লিখছেন—এ আমি কী শুনলাম। কী জানলাম। সুবর্ণ বলেছিল ওর বাবার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে উঠতে পারিনি। মেডিকেলে ভর্তি হতে, আর নানারকম তদ্বির তদারকী করতে করতেই কয়েকটা দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল। সুবর্ণ ভর্তি হল এম এস সিতে। ওর কোন অসুবিধা ছিল না। তার ওপর ছিল হাই ফার্স্ট ক্লাশ মার্ক। কলেজে ভর্তির ঝামেলা মেটার পরই গেলাম সুবর্ণর বাড়ি। সুবর্ণই নিয়ে গেল ওর বাবার কাছে। ভদ্রলোকের ওঠার কোন ক্ষমতা ছিল না। ডানদিকটা সম্পূর্ণ প্যারালাইজড্ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের দেখে বসতে বললেন। সুবর্ণ চলে আসছিল। কিন্তু ওর বাবাই আসতে দিলেন না। জিভেও জড়তা এসে গিয়েছিল। কোন রকমে জড়ানো গলায় বললেন, তুমিও থাক সুবর্ণ। আমি বুঝতে পারছি দিন আমার শেষ। তোমার কাছে আমার জীবনের কিছু গোপন কথা না বলে গেলে অন্যায় হবে। এই সময়ে আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। বাধা দিয়ে বললেন, কোন প্রশ্ন নয়। শুধু তোমরা শুনে যাও। সামান্য কিছু সময়ের বিরতি নিয়ে বললেন, সুবর্ণ, তোমার মা ছাড়াও আমি আর একটি মহিলাকে ভালবেসেছিলাম। তুমি হয়ত বলবে, তোমার মায়ের মতো রূপসী এবং বিদুষী মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েও কেন আর একজনকে ভালবেসেছিলাম। ভালবাসা নিয়মকানুন মানে না একথা যেমন সত্য ঠিক তেমনি সত্য তোমার মায়ের অনমনীয়তা। তোমার মা চিরদিনই মনে করতেন, আজও করেন, তিনি ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। এবং এই যে এতো সম্পত্তি এতো বৈভব সবই তাঁর এবং তাঁর পিতার অনুকম্পায়। অনুকম্পার দানে আর যাই আসুক ভালবাসা আসতে পারে না। তোমার মাকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েও তাঁকে আমি একটি দিনের জন্যেও ভালবাসতে পারিনি। সারাজীবন তিনি আমায় হুকুম করেছেন। আর সেই হুকুম আমায় মানতে হয়েছে। তাই, আমার স্ত্রীর থেকেও অনেক সাধারণ এক মহিলার নরম উষ্ণ সান্নিধ্য আমাকে পাগল করে দিয়েছিল। সে ছিল আমার বন্ধুপত্নী। তার ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করতো। আর সেই মুগ্ধতা থেকে এল প্রেম। তবে কোন দিনের জন্যেও শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিনি। কিন্তু নিয়তির বিধান। নইলে একটিমাত্র সন্তানের জন্মের দেড়মাস পরই হঠাৎ আমার বন্ধুর মৃত্যু হবে কেন? বন্ধুর মৃত্যুর পর বন্ধুর মতোই আমি আর একটা সংসারের দায় দায়িত্ব তুলে নিলাম। আর তখনি টের পেলাম বন্ধুপত্নী অনেকদিন থেকেই আমার প্রতি অনুরক্তা। সে সব দীর্ঘ কাহিনী। এখানে বলার কোন প্রয়োজন নেই। দেখতে দেখতে পাঁচটা বছর এইভাবে কেটে গেল।

কানাঘুষোয় অনেক কথা শুরু হয়ে গিয়েছিল। লোকেরও দোষ নেই। এক তরুণী বিধবার বাড়ি এক পরপুরুষের নিয়মিত যাতায়াত কেইবা সুনজরে দেখবেন? কথা আর বাড়তে দিলাম না। ওকে হিন্দুমতে বিবাহ করলাম। কিনলাম শহরতলিতে বেশ কিছু জমি। ইচ্ছে ছিল আমার দ্বিতীয় স্ত্রীকে ওখানে নিয়েই রাখব। কিন্তু হল না। কয়েকদিনের কাজে দিল্লী যেতে হয়েছিল। এসে শুনলাম ঘরে আগুন লেগে আমার দ্বিতীয় স্ত্রী দুদিন আগে পুড়ে মারা গেছেন। আর তার পাঁচ বছরের শিশুপুত্রটিকে এক সহৃদয় প্রতিবেশী রেখে দিয়েছেন আমার আসার প্রতীক্ষায়। ভদ্রলোক আমাদের সব কিছুই জানতেন। বলতে পার সেই শিশুপুত্রটি কে?

আমাদের কিছু বলার আগেই উনি বললেন, ঐ যুবনাশ্ব, আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর একমাত্র সন্তান।

আমার মুখে কোন কথা ছিল না। মাটির দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসেছিলাম। তারই মধ্যে শুনলাম দ্বিতীয় বজ্রপাতের সংবাদ। সুবর্ণর বাবা বললেন ঈশ্বরের কাছে আমি কোন অপরাধ করিনি। কিন্তু অনেক অপরাধ জমা হয়ে আছে। যুবনাশ্বর মা ও বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী কে জান?

এবার সুবর্ণ ও আমি যুগপৎ বিস্ময়ে তাকালাম হারাধন ঘোষালের দিকে। তিনি বললেন, দায়ী আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। হ্যাঁ তোমরা দুজনেই শোনো, তিনি আমার এবং যুবনাশ্বর মায়ের মেলামেশা ভালো চোখে দেখেন নি। আর সেই কারণেই একদিন যুবনাশ্বর বাবাকে ডেকে সব কিছু বলে তাঁর মনটা বিষিয়ে দিয়েছিলেন। পরিণামে তিনি করছিলেন আত্মহত্যা। আর আমার অনুপস্থিতির সুযোগে তোমার মা-ই এক গভীর রাতে লোক মারফত ওর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আর সেই কাজটা করেছিল নিমু বলে আমার স্ত্রীর একটি খাস চাকর। এসব জেনেছিলাম অনেক পরে। তখন আর কিছু করার নেই। যুবনাশ্ব, তোমার আর তোমার মায়ের প্রতি আমি অনেক অন্যায় করেছি। পার যদি ক্ষমা করো। যদি পার সুবর্ণর মাকেও ক্ষমা করো। আর সুবর্ণ, দেখো যুবনাশ্বর ওপর তোমার মায়ের মত তুমি যেন কোনদিনও অন্যায় করে বসো না।

পৃথিবী আমার কাছে দুলছিল। জানি এতে আমার কোন লজ্জার কিছু নেই। তবু এক অস্বস্তি আমাকে কেবলি চাবুক মারছে। সব শুনে চলে আসছিলাম। হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করে কেন জানি না শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। সুবর্ণর চোখ। এক অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায়, অথবা মারাত্মক ভাবে মানসিক আঘাত পেলে যেমন হয় তেমনি ভাবেই ওর চোখ দুটো অস্বাভাবিক হয়ে গেল। আমার ভয় পাবার আরও কারণ, সুবর্ণ একটা কথা অনেকদিনই বলেছে, এটা ওর এক ধরণের ধর্মবিশ্বাস, ও মনে করে ও অত্যন্ত সাচ্চা আর ধার্মিক। আর এই ধারণা থেকেই ওর বদ্ধমূল সংস্কার, ওকে কেউ কোন কারণে আঘাত করলে অথবা দুঃখ দিলে ঈশ্বর নিজের হাতে তার শাস্তি দেন। এরকম ঘটনা নাকি ওর জীবনে এর আগেও ঘটেছে। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমার কাছে এটা কাকতালীয় মনে হলেও শঙ্কা আসছে এই কারণে, যদি হারাধন ঘোষালের কোন অমঙ্গল হয়? যদি তাঁর কোন ক্ষতি হয়? অথচ সত্যিই তো তাঁর সঙ্গে আমার কোন রক্তের সম্বন্ধ নেই।

দেখতে দেখতে কটা দিন কেটে গেল। সেই ঘটনার পর আর আমি সুবর্ণর বাড়ি যাইনি। এক ধরনের স্থবির মানসিকতা নিয়ে নিজের মনে ক্লাশ করে যাই। মন খারাপ হলে যশোদা আমার দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। নয়ত গানের মধ্যে ডুবে যাই। এখনও পর্যন্ত যশোদাকে এসব কথা বলা হয়নি। আমার অন্যমনস্কতা ওর কাছে ধরা পড়েছে। মাঝে মাঝে সব কিছু উজাড় করে বলে ফেলার শপথ নিই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলা হয় না। ভয় করে আমার অতীত জীবনের পারিবারিক সব দুর্যোগ যশোদা যদি ভাল মনে না নেয়। একূল তো হারিয়েছি, আর কূল হারানোর ভয়ে কিছু বলা হয় না। তবু বলতে তো হবেই। সামনেই ওর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। পরীক্ষার পরই বলব।

দুঃখের দিন এমন নিখুঁত নিয়মে তাড়াতাড়ি চলে আসে আমার ধারণায় ছিল না। কলেজ যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি, হঠাৎ উস্কোখুস্কো চুল, উদভ্রান্ত অবস্থায় সুবর্ণ এসে হাজির। ওর মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম খারাপ কিছু ঘটেছে। আমার আশঙ্কাই ঠিক। হারাধন ঘোষাল গত হয়েছেন। শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম। সুবর্ণই জিজ্ঞেস করল, —এখন কি করবি?

—কিসের?

—হারাধন ঘোষালের সঙ্গে তোর রক্তের সম্বন্ধ না থাকলেও আইনত,

—এ সব কী বলছিস তুই?

—আমি কেবল তোকে ঐ কথাই জানাতে এসেছি। ডোন্ট ক্রিয়েট এনি সিন। আর আমার মনে হয় এখন কিছুদিন তোর আমাদের বাড়িতে না যাওয়াই উচিত।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, —মাসিমা কিছু জানেন এ ব্যাপারে?

—না, জানাবার চেষ্টাও করিস না।

সুবর্ণ ওর অহঙ্কার নিয়ে চলে যাচ্ছিল। ওকে বাধা দিয়ে বললাম,— কিন্তু দুটো প্রশ্নের জবাব তোর কাছে আমার পাওনা আছে।

—কিসের প্রশ্ন, কিসের জবাব?

—আমার মা বাবা কী দোষ করেছিলেন যে তাদের ওভাবে তিনি হত্যা করেছিলেন? আর, আমার জীবনটাই বা কেন তিনি নষ্ট করে দিলেন?

সহসা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারল না সুবর্ণ। একটু চুপ করে থেকে বলল,—এ সব বাবার মৃত্যুকালীন পাগলামো। আমি বিশ্বাস করি না। মাও করবেন না। এসব নিয়ে এখন কিছু বলতে যাওয়া মানেই নিজেকে ছোট করা। তোর বাবা মাকে ছোট করা।

সুবর্ণ চলে গেল আমাকে রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে। সত্যিই তো, একজন মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তিম সংলাপে পৃথিবীর কিছু যায় আসে না। এ সবের কোন প্রমাণ নেই। আমি আর সুবর্ণ ছাড়া আর কেউ হারাধন ঘোষালের কথা শোনেনি। হাজার চিৎকার করলেও পৃথিবীর কোন লোকই আমার কথা বিশ্বাস করবে না, বরং পাগল বলে চিহ্নিত করবে। সুবর্ণ ঘোষালের কাছে আবার আমি হেরে গেলাম।

অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে পনেরটা দিন কেটে গেল। হারাধন ঘোষালের সব কাজ মিটে গেছে। ওদের বাড়িতে যাওয়া চিরদিনের মতো শেষ হয়ে গেছে। যশোদার সঙ্গে দেখা হয়নি। ও এখন পরীক্ষার জন্যে ব্যস্ত। আমি আর যশোদা প্রায়ই ভিক্টোরিয়া মনুমেন্টের লাগোয়া একটি নির্দিষ্ট বাগানে গিয়ে বসতাম। একদিন বিকেলে একা একাই বসে আছি। হঠাৎ সামনে দেখি যশোদা। আমি কিছু বলার আগেই ও বলল, —আমি জানি তুমি এখানে থাকবে।

—কিন্তু তোমার না পরীক্ষা?

—পরীক্ষা বলে তুমি আর আমার সঙ্গে দেখা করবে না? তিন দিন তোমার হস্টেলে গিয়ে ফিরে এসেছি।

কিছু উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। শেষ বিকেলের সূর্যটা তখন ডুবে যাচ্ছে। রক্তলাল আভাটা যশোদার মুখের ওপর এসে পড়েছিল। কী অপূর্বই না লাগছিল ওকে। কিছুক্ষণ বিমোহিতের মতো তাকিয়ে থেকে গঙ্গার দিক মুখ ফেরালাম। আসলে ওকে সব কিছু বলতে চেয়েছিলাম। বলতে চাইছিলাম আমার ভীষণ মন খারাপ। কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না। তবু যশোদার কাছে ধরা পড়ে গেলাম। ও সরাসরি বলল,— তুমি কিছু লুকোচ্ছ আমার কাছে। কয়েকদিন ধরেই আমার মনে হচ্ছে।

—নাহ্, কিছু না।

—আমার কাছে লুকিও না। বল কী হয়েছে?

কণ্ঠে তখন ওর রীতিমত শাসন। নতিস্বীকার করে মরিয়া হয়ে বললাম,—জানি না সব কিছু শুনে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে কিনা? তবু তোমাকে সবই বলছি। তোমাকে না বলে আমার কোন উপায় নেই। তবে শোনো।

এরপর আমার জীবনের আদ্যোপান্ত সব কিছু ওর কাছে উজাড় করে দিলাম। নীরবে সব কিছু শোনার পর ভেবেছিলাম ও হয়ত যাচ্ছেতাই কিছু একটা করে বসবে। অথবা, কিছু না বলেই উঠে যাবে। বদলে ও বেশ কিছুক্ষণ ভিক্টোরিয়ার দিকে চেয়ে বসে রইল। সূর্য তখন অস্ত গেছে। চারদিক থেকে ক্রমশ অন্ধকার আমাদের গ্রাস করে নিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর বললাম, — সুবর্ণ আবার আমাকে

হারিয়ে দিল। এই নিয়ম, জানো যশোদা, ঈশ্বর যাকে দেন তাকে সব কিছু উজাড় করে দেন, আর যাকে বঞ্চিত করেন তাকে আমার মতো সবদিক থেকেই করুণার পাত্র করে রেখে দেন।

কণ্ঠে কিঞ্চিৎ শ্লেষ মিশিয়ে যশোদা বলল,—তোমার মনে হচ্ছে বুঝি সুবর্ণ তোমাকে হারিয়ে দিয়েছে নয়?

—না। বরং সুবর্ণ আর তার মা, এবার তোমার কাছেই হেরে গেল। হেরে না গেলে কি আর সাততাড়াতাড়ি তোমার কাছে এসে ঐ সব কথা বলে যায়? হেরে গেল বলেই তো তোমাকে ও বাড়ি যেতে মানা করেছে।

—তুমি কী বলছ যশোদা?

—মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখো, আমার কথাই ঠিক।

—কিন্তু এখন আমি কী করব?

—যা করছ তাই করবে। মনে রেখো তোমাকে বড় ডাক্তার হতেই হবে। সেখানে কোন রকম ফাঁকি আমি সহ্য করব না। আর,

—আর কী?

—সুবর্ণকে আরো একবার তোমাকে হারাতে হবে না?

—মানে?

—সুবর্ণ যে আমাকে বিয়ে করতে চায়।

হঠাৎ মাথার ওপর আকাশ ভেঙ্গে পড়লেও আমি এত চমকাতাম না। বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম,—কিন্তু ও তো তোমার কেমন যেন ভাই হয়?

—পাড়াতুতো ভাই। তাতে বিয়ে আটকায় না। প্রোপোজালটা সুবর্ণর মায়ের তরফ থেকে গেছে আমার বাবার কাছে। সুবর্ণ বাড়ি হলে এতদিন বিয়েই হয়ে যেত।

—যশোদা!

—বললাম না, তোমাকে জিততে হবে। ভালোভাবে ডাক্তার হওতো আগে। আমার বাপু মুখ্যু স্বামী একদম ভালো লাগে না।

এরপর যশোদা আরও অনেক কিছু বলেছিল। কিন্তু আমার কানে কিছুই যায়নি। কেবল একটা কথাই পাক খাচ্ছিল, 'সুবর্ণ বাড়ি হলে এতদিনে বিয়েই হয়ে যেত।' জীবনের এক চরম পরীক্ষায় আবার সুবর্ণ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী।

হঠাৎ নীল ডায়েরি পড়া থামাল। ঘরের মধ্যে তখন অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। সুবর্ণ ঘোষাল মাথা হেঁট করে বসে আছেন। খোলা জানলার দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে হারিয়ে গেছেন যশোদা ঘোষাল। ডাক্তার নীরব, একটা সিগারেট ধরিয়ে নীল বলল,—যুবনাশ্ববাবু ওর অটোবায়োগ্রাফিতে আর কিছু লেখেননি। শেষ যা লিখেছেন সেটি আমাকে লেখা একটি স্বীকারোক্তি। আমি পড়ছি, শুনুন,

প্রিয় নীলাঞ্জনবাবু,

ভেবেছিলাম, জীবিতকালের মধ্যে আর কোনোদিনও এ ডায়েরি ছোঁব না। কিন্তু ছুঁতে হলো। কেননা এইতো আমার শেষ লেখা। আর সেটা আমি আপনার কাছেই দিয়ে যেতে চাই। শেষ পর্যন্ত আপনার কাছে ধরা পড়ে গেলাম। বলতে পারেন, নিজের মারণাস্ত্র আমি নিজেই তৈরি করেছি। অবশ্য তাতে আমার বিন্দুবিসর্গ ক্ষোভ নেই। তার প্রমাণ তো দিয়েই গেলাম। কিন্তু একটা দুঃখ আমার রয়ে গেল আমার ব্রত আমি উদযাপন করে যেতে পারলাম না। কঠিন সংকল্পের ব্রত নিয়েছিলাম। সেদিন, যেদিন আমার শেষ হারের পরোয়ানা পেলাম। সুবর্ণর কাছে আমি প্রতি মুহূর্তেই পরাজিত হয়েছিলাম। আশা ছিল অন্তত একটি ক্ষেত্রে আমি হারিয়ে দোব। কিন্তু সেখানেও দেখলাম সে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। যশোদা আমায় কথা দিয়েছিল সে আমার। প্রাণের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ওকে আমি ভালবাসতে চেয়েছিলাম। মরু জীবনে ঐ তো ছিল একটু সবুজের আশা।

ডাক্তারি পড়ার তখন চতুর্থ বর্ষ চলছে। মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছি পড়ায়। যশোদার উৎসাহ আর নিজের

ক্রমশ আমি অতি বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু ঈশান কোণে মেঘের আনাগোনা বুঝতে পারিনি। ঝড়ের আগেই তুফান এসে ভাসিয়ে দিল আমাকে। বি এ পাশের পর যশোদা তখন এম এ পড়ছে। হঠাৎ কয়েক দিনের জন্য ও গেল রাঁচীতে। আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল ডাক্তারি পাশ করার পর আমরা বিয়ে করব। যশোদা চলে যাবার ঠিক পনেরো দিন পর হঠাৎ একদিন সুবর্ণ এসে হাজির। আমার হোস্টেলে। দীর্ঘদিন পর ওকে দেখে একটু অবাকই লাগছিল। ও চিরদিনই রূপবান পুরুষ। সেদিন ওকে দারুণ লাগছিল। এম. এ সি পাশের পর ও বাবার ব্যবসায় মেতে গেছে। আমার মায়ের জন্য কেনা ওর বাবার জমিটায় শুনলাম নাকি বিরাট একটা আশ্রম করবে। প্রথমেই আমার কুশলাদি এবং পড়াশুনার খোঁজ খবর নিল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল,—যুব, এবার যে তোকে একবার আমার বাড়ি যেতে হবে!

একটু আশ্চর্য হয়ে বলেছিলাম,—এটাও কী বড়লোকের আর এক খেয়াল?

খুব বিনীতের ভঙ্গীতে সুবর্ণ বলেছিল,—ওভাবে কেন বলছিস? সেদিন একটা বিশেষ কারণে তোকে অপমান করেছিলাম। এবার যে অন্য কারণ।

—কী রকম?

—আমার বিয়ে। মা অনেকদিন ধরেই তাগাদা দিচ্ছেন। আর না করা গেল না। অবশ্য পাত্রী খুবই ভালো। তুই তো চিনিস।

বুকটা ধড়াস করে উঠল। কোন রকমে বলেছিলাম,—তোর পাত্রীকে আমি কী ভাবে চিনব বল?

—চিনিস বৈকি। তোর বান্ধবী যশোদা। এরই মধ্যে ভুলো গেলি?

নীলাঞ্জনবাবু, ভাবতে পারেন আমার সেদিনের মনের অবস্থা! আমার পায়ের তলার শেষ মাটিটুকুও কেড়ে নিল সুবর্ণ। সুবর্ণ জানতো আমাদের প্রণয়ের কথা। তা সত্ত্বেও নির্লজ্জ পাষণ্ডের মতো আমার শোচনীয় পরাজয়ের মূর্তি দেখতে, আমাকে ব্যঙ্গ করতে এসেছে। এসব কেমন ভাবে হল, কী ভাবে হল কোন কিছু খবর নেবার মানসিকতা আর আমার ছিল না। এমনকি যশোদার সঙ্গে দেখা করবারও কোন প্রবৃত্তি ছিল না। অন্ধ আক্রোশে জগৎ সংসার তখন আমার কাছে দুলছিল। লোপ পেয়েছিল সমস্ত বিচার শক্তির। এমন কী যশোদার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোন কৈফিয়ত চাওয়ারও অবসর ছিল না। সুবর্ণ চলে যেতে ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজের হাতে এক এক করে সমস্ত ডাক্তারি বইগুলো পুড়িয়েছিলাম। তানপুরাটাকে ভেঙে তছনছ করেছিলাম। তারপর সেই শ্মশান নিস্তব্ধতার মাঝে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করব প্রতিশোধ নেবার। সুবর্ণর জীবন তছনছ করে দেবার। সুবর্ণ আমার চরম শত্রু। শুরু থেকে সে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে আমাকে পরাজিত করে ঈর্ষার জ্বালা ধরিয়েছে। শেষ পরাজয়ও তার হাতে ঘটল। সুবর্ণকে সেদিন খুন করতে পারতাম। কিন্তু তাতে শান্তি পেতাম না। ভাবলাম ওকে সমাজ আর সংসারের কাছে নৃশংস খুনি হিসাবে দাঁড় করাব। এমন চক্রান্ত করব যাতে ও বহু খুনের আসামি হয়ে চরম শাস্তি পায়। আর বৈধব্যের জ্বালা নিয়ে যশোদা সারাজীবন খুনির বিধবা হয়ে থাকুক। সেদিনই কলকাতা ছেড়ে চলে গেলাম। পাহাড়ে, জঙ্গলে আর নির্জন সমুদ্রতীরে বসে ওর শাস্তির কথা চিন্তা করেছি। তারপর সমস্ত কিছু ঠিক করে প্রায় পনেরো বছর পর ফিরে এলাম কলকাতা। উঠলাম যশোদা আশ্রমে। এসে দেখলাম সুবর্ণ কেমন যেন পাল্টে গেছে। ওর জীবনে কোন সুখ নেই। যশোদাকে পেয়েও ও অসুখী। কারণ অনুসন্ধান করে বুঝলাম, যশোদার ইচ্ছের বিরুদ্ধে একরকম জোর করেই ও যশোদাকে বিয়ে করেছিল। সে আর ইতিহাস। কিন্তু ওদের দাম্পত্য জীবনে কোন সুখের আলো ছিল না। তার একটি মাত্র কারণ সুবর্ণ ইমপোটেন্ট পুরুষত্বহীন পুরুষ। যশোদাকে ও কোনদিনও দাম্পত্য জীবনে সুখী করতে পারেনি। যশোদাও পাল্টে গিয়েছিল। নিষ্ফল পুরুষের কাছে প্রতারিত হয়ে ও তখন দ্বিচারিনী হয়ে উঠেছিল। অতি আধুনিকা হয়ে গিয়েছিল। সুবর্ণর মনে যশোদাকে নিয়ে জ্বালা থাকলেও তাকে আটকাবারও কোন ক্ষমতা ছিল না। কেবল নির্বিষ সাপের মত ভয় দেখাতো সেই কাকতালীয় প্রবাদটির ফণা তুলে। 'ওর মনে যে দুঃখ দেবে ঈশ্বর ওর হয়ে তাকে চরম শাস্তি দেবেন।' কিন্তু শিক্ষিতা যশোদা এসব বুজরুকিতে কোনদিনও বিশ্বাস করেনি।

খুনের পরিকল্পনা শুরু হল তখন থেকেই। ওরই অস্ত্রে ওকে মরণশাস্তি দিতে হবে। 'ওর ম... দুঃখ দেবে ঈশ্বর তাকে চরম শাস্তি দেবেন—'এটাই হবে ওর বিরুদ্ধে ঘটনা সাজাবার চরম ... আমি কেবল সুযোগ খুঁজতে আরম্ভ করলাম। যদিও তখন সুবর্ণ বেশ অনুতপ্ত। আমার জীবন ... করে দেবার জন্যে ওকে যথার্থই দুঃখিত হতে দেখলাম। আমাকে ওখানে থাকতে দিয়ে যেন মহাপা... প্রায়শ্চিত্ত করতে পেরেছে এমন একটা ভাবও ওর মধ্যে প্রকাশ পেল। তারপর খামখেয়ালি ও ছি... স্ত্রী যদি পূর্ব প্রেমিককে দেখে তার বর্তমান জীবন থেকে সরে থাকে সেটাই হবে সুবর্ণর উপরি পা... আমাকে বাঁধার জন্যে ও নতুন করে গানের উৎসাহ দিতে লাগল। নিজেই নানান ভাবে সাহায্য ক... করল। নানান ফাংশানে গাইবার সুযোগ করে দিতে থাকল। আমিও টোপগুলো গিলে চললাম। ... উদ্দ সুবর্ণ বুঝতে পারেনি আমার উদ্দেশ্য। আমি নির্বিকার ভাবে ওর ওখানে থেকে গেলাম

হঠাৎ সুযোগ এল। মদ্যপ সনাতনের যুবতী স্ত্রী চাঁপা। মেয়েটা সুবর্ণর কাছে কাজ করতো। ... মেয়ে রাখতে যশোদার কোন ভয় ছিল না। কারণ ও জানতো ইচ্ছে থাকলেও সুবর্ণর পক্ষে ... সম্ভোগের কোন ক্ষমতা নেই সেই সুযোগ নিলাম আমি। অবশ্য সনাতন আমার প্রথম লক্ষ্য হ... আরো একটি কারণ ছিল। সনাতনের বাবা নিমুই আমার মাকে পুড়িয়ে মেরেছিল। সনাতনের অগো... চাঁপার সঙ্গে ভাব জমালাম। চাঁপা অসুখী। কারণ স্বামী মদ্যপ। চাঁপার লোভ ছিল শক্তিমান পুরু... এবং অর্থে। আমি তাকে দু'ভাবেই সুখী করলাম আর সুখী নারী তার সুখের জন্যে সব করতে পা... আমারই পরামর্শ মতো সে সনাতনের কাছে সুবর্ণর নামে মিথ্যে কলঙ্ক আরোপ করল। বলল, স... তাকে খারাপ প্রস্তাব দিয়েছে। বাস! মাতালের রাগ। সোজাসুজি সে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুবর্ণর ওপর... সুবর্ণ তখন কোণঠাসা বেড়াল। স্ত্রীর কাছে অকর্মণ্য পুরুষ। তার পর এই মিথ্যে বদনাম। তবু নীলক... তেজ কিছু তো থাকবেই। সনাতনের সঙ্গে হল বচসা। তাকে আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে বলল। ... বলল, আমাকে আজ মনে দুঃখ দিলি। ভগবান তোকে শাস্তি দেবেন। তুই আর বেশিদিন পৃথিবী... থাকবি না। বাস, পেয়ে গেলাম প্রথম সুযোগ

ঠিক যেমন করে সনাতনের বাবা আমার মাকে পুড়িয়ে মেরেছিল তেমনি করে ওকে পুড়িয়ে মারল... ওর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে।

ডাক্তার তরফদারের কোন দোষ নেই। ও পুলিসের ঝামেলায় ঘটনাটা ফেলতে চেয়েছিল। কি... আমারই প্ররোচনায় সুবর্ণ ডাক্তারের হাতে-পায়ে ধরে সার্টিফিকেট নেয়। কারণ সুবর্ণকে আমিই বুঝিয়ে ছিলাম, এসব কেস পুলিসের হাতে যাওয়া মানেই তদন্ত। তাতে ফাঁস হয়ে পড়বে চাঁপার কথা। লোকে তোমায় নিন্দে করবে, পুলিস সন্দেহ করবে সনাতনের মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার কোন হাত আছে বলে। পুলিসের হাতে কেস গেল না ঠিকই। কিন্তু আশ্রমের অন্য লোকের মধ্যে সুবর্ণর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্যে উস্কে দিলাম মাধবকে।

মাধব রাজনীতি করা ছেলে। ওকে অন্য রাস্তায় চালান করলাম। বোঝালাম সুবর্ণ তাদের শোষ... করছে। সামান্য থাকা খাওয়ার বিনিময়ে তাদের দিয়ে একটা বড় ব্যবসা চালাচ্ছে। শোষণের সম্পত্তি নিজের ঘরে তুলেছে। মাধব খেপে গেল। এদিকে মাধবের বিরুদ্ধেও সুবর্ণর কানে কিছু কথা তুলে দিলাম। ওকে বোঝালাম মাধব চুরি করে ক্ষেতের ফসল বিক্রি করে দেয়। এক চরম মুহূর্তে লাগল বিক্ষোভ। মাধব সুবর্ণকে শাসালো। করল সামান্য অপমান। আবার সুবর্ণর পুরনো কাকতালীয় অভিশাপ বাস, মাধবের মতো একটা ছেলেকে পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে কুয়োয় ফেলতে আর কতই বা শক্ত কাজ। এবারও ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া। সার্টিফিকেট আনা। সব আগের মতোই হলো। কিন্তু তুষের আগুনের মতো সুবর্ণর বিরুদ্ধে কিছু অসন্তোষ আশ্রমে ছুঁই চাপা আগুন হয়ে রইল। ঠিক এই সময় ট্রেনে আপনার সঙ্গে আলাপ। ওদিকে অসন্তোষের ধোঁয়া উড়ছে। ঠিক করলাম এমন একজনকে এবার শেষ করতে হবে যার মৃত্যু লোকের মধ্যে আরো সন্দেহ জাগাবে, এবং সেই সন্দেহের কথা একজন প্রথম শ্রেণীর গোয়েন্দার মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে।

সুযোগ এল তাড়াতাড়িই। শিবভক্ত রামলোচন আহির। না, ও আমার কোন ক্ষতি করেনি। থাকতো

[illegible] মনে। ওর নেশা ছিল সন্ধের পর সিদ্ধি আর গাঁজা খাবার। কিন্তু লোকটা ছিল খুব সবল আর [illegible]। নিজে সবল এবং সৎ বলে অন্যের খারাপ কিছু সহ্য করতে পারতো না। সুবর্ণর বিরুদ্ধে [illegible] দেওয়ার মত আদর্শ লোক। ওর কানে বিষ ঢোকালাম। চাঁপার সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের মিথ্যা কথা [illegible] করে বলাতে লোকটা গেল রেগে। সনাতন মরার পর চাঁপা তখন আমার মুঠোয়। টাকা এবং [illegible]র সুখ দুটোই আমার কাছ থেকে নিয়মিত পাচ্ছে। আমারই পরামর্শে ও সত্যিই একদিন অনেক [illegible] সুবর্ণর বাড়ির মাধবীলতার ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। এ দৃশ্য রামলোচনকে দেখাতে সে উঠল [illegible] সর্বময় কর্তার বিরুদ্ধে তারই কাছে জানাল প্রতিবাদ। সুবর্ণ সামান্য এক আশ্রিতের এই ঔদ্ধত্য এবং [illegible] দোষারোপ সহ্য করতে পারল না। চিৎকার চেঁচামেচি করে ওকে আশ্রম ছেড়ে বেরিয়ে যেতে [illegible] এই ঝগড়াটাই আমি চাইছিলাম। কারণ আমি বারবার প্রমাণ করাতে চাইছিলাম যারই সঙ্গে সুবর্ণর [illegible] মনোমালিন্য বা ঝগড়া বচসা হবে, তারই মৃত্যু ঘটবে অনিবার্যভাবে। এতে সাধারণ বোকা মানুষ হয়তো [illegible] ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী এবং ভীত হতে পারে, কিন্তু পুলিসের খাতায় এই কাকতালীয় ব্যাপারটা [illegible] রূপ নেবে। রামলোচন প্রতিদিন রাত্রে নেশার মধ্যেও ধর্ম্মের ভাবনা মেখে রেখে দিত। [illegible] ভাবের খাটুনিটা বাঁচে। সে রাত্রে যখন ও নিজের মনে ভাবনা ভাবছিল, পেছন থেকে আমি ওর [illegible] মাথাটা অন্তত পাঁচমিনিট চেপে ধরে রেখেছিলাম ভূমি আর খোল গোলা চইচম্বুর পাত্রের মধ্যে। [illegible] ছোঁড়া ছাড়া ওর আর কিছু করারই ছিল না।

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে নীলাঞ্জনবাবু, রামলোচনের মৃত্যুর পর আমি আপনাকে রীতিমত [illegible] করেছিলাম। চেয়েছিলাম আপনি গিয়ে সুবর্ণকে সন্দেহ করুন। কিন্তু সেবার আপনি গেলেন [illegible] বাধ্য হয়ে আবার অপেক্ষা করতে হল।

এরপর আরো নৃশংস না হওয়া ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। নৃশংস মৃত্যু ছাড়া কেন পুলিসের [illegible] নড়তে চায় না। বেচারা কৃপাসিন্ধু। লোকটা একশোভাগ সৎ ছিল না। সামান্য টাকাপয়সা এদিক ওদিক করতো। কিন্তু নিয়তি যেন ওর মৃত্যুটাকে ত্বরান্বিত করে দিল। অভাবীর হাতটান লোগ সহজে [illegible] চায় না। কৃপাসিন্ধু বোধহয় কিছু টাকাপয়সা সরিয়ে ছিল। জানতাম ও প্রত্যেক দিন অতি ভোরে [illegible] পায়চারি করে। সেদিন অন্ধকারে তেঁতুলগাছের নিচে আসা মাত্রই পেছন থেকে নিখুঁত মাপে ঠিক ঘাড়ের ওপর সজোরে শাবলের আঘাত করি। লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। সামান্য পরে উঠে বসার চেষ্টা করতেই শাবলের দ্বিতীয় আঘাতে ওর মেডুলা চৌচির হয়ে যায়। ডাক্তারি পড়ার দৌলতে আমি জানতাম ঠিক কত জোরে মারলে মেডুলা ফেটে গিয়ে একজনের মৃত্যু ঘটাতে পারে। শাবলটা খুঁজে পাননি তো? ওটা পুকুরের তলায়। সুবর্ণর ওপর সন্দেহটা আর একটু বেশি করে চাপাবার জন্যে ওর একপাটি শুঁড়বাকানো বিদ্যাসাগরী চটি আমি আগেই সরিয়ে রেখেছিলাম। সেটা ঝোপের আড়ালে রেখে দিয়ে চলে আসি।

এরপর আপনারা এলেন। পুলিস এবং আপনি কিছুটা সন্দেহ করতে শুরু করলেন সুবর্ণকে। মুখে আপনাদের কাছে সুবর্ণর হাজার প্রশংসা করে কথা বললেও, মনে মনে বেশ পুলকিত হচ্ছিলাম। প্রথমে চটিটা পুলিসের নজরে আসেনি। কিন্তু আপনি তেঁতুলগাছের নিচে যাবার আগেই, কৃপাসিন্ধুর মৃতদেহ দেখতে পাবেন না, এই ভেবে ছিলাম। ওখান থেকে চলে এসে, আপনাদের অগোচরে চটিটা ঝোপ থেকে বার করে একটু উন্মুক্ত জায়গায় রেখে দিয়ে চলে গিয়েছিলাম, যাতে আপনার নজরে পড়ে। এবং পড়েও ছিল।

সুবর্ণর ওপর সন্দেহটা যখন বেশ আপনাদের মনে গেড়ে বসেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে আবার আমার হাত নিসপিস করে উঠল। অনেকদিন থেকেই নীহারের ব্যাপারটা আমি লক্ষ্য করছিলাম। লক্ষ্য পড়েছিল সুবর্ণরও। কিন্তু সুবর্ণের করার কিছু ছিল না। একজন যৌনজীবনে অক্ষম পুরুষ, যুবতী স্ত্রীকে যে একদিনের জন্যেও সুখী করতে পারেনি, স্ত্রীর চিত্তবিভ্রম মেনে নেওয়া ছাড়া সে পুরুষের আর কোন উপায় ছিল না। ব্যাপারটা অনেক দিনের। নীহার ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বছরের তরতাজা ছেলে। ওর সুন্দর চেহারা আর উজ্জ্বল যৌবনের ছটায় যশোদা ওর মোহে পড়েছিল। সুবর্ণ চেষ্টা করেও যশোদাকে ফেরাতে

পারেনি। নীহারের ইচ্ছা না থাকলেও যশোদার রূপসায়রে ডুব দিতে বাধ্য হয়েছিল। পারিবারিক কেলেঙ্কারির ভয়ে সুবর্ণ সব জেনেও চুপ করে ছিল। তারপর দীর্ঘদিন পর আবার আমাকে কাছে পেয়ে ও কিছুতেই আমাকে ছাড়তে চাইল না। ওর মনে পুরনো অনুশোচনা মাথাচাড়া দিল নীহার নামক কাঁটাটি উচ্ছেদ করতে চাইল আমাকে দিয়ে। সুবর্ণ ভেবেছিল একদার প্রেমিককে পেলে যশোদা নীহারকে ত্যাগ করবে। কিন্তু নারী চরিত্রে অজ্ঞ সুবর্ণ জানত না, মেয়েরা একবার যাকে ভুলে যেতে পারে, তাকে আর মনে ঠাঁই দিতে চায় না। তাছাড়া, যশোদার সঙ্গে কথা বলার পর এটুকু বুঝেছিলাম যুবনাশ্ব সেনকে তখন ও কাপুরুষ ছাড়া আর কিছু ভাবে না। যশোদা একদিন আমাকে ওর অতীতের কথা বলেছিল। সুবর্ণর সঙ্গে যশোদার বিয়ে ছিল পূর্বপরিকল্পিত। দু-বাড়ির মধ্যে পাকা কথা হয়েছিল ছোট থেকেই। সুবর্ণ যখন দেখল আমি ওর বাকদত্তার প্রেমিক ওর পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। ও যশোদার অলক্ষ্যে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। যশোদা দেশে ফিরেই জানতে পারে তার বিয়ের দিন পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে। যশোদা আপত্তি জানিয়ে ছিল। কিন্তু সে আপত্তি যখন টিকল না তখন ঠিক বিয়ের দুদিন আগে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় এসেছিল আমার হস্টেলে। কিন্তু তখন রাগে অভিমানে আমি, কলকাতা ছেড়ে অনেক দূরে।

যশোদা আমাকে ভুলে গিয়েছিল। সঙ্গী করেছিল নীহারকে। নীলাঞ্জনবাবু আমার পক্ষে কী সম্ভব ছিল নীহারকে সহ্য করা? তার ওপর যখন দেখতাম আমারই চোখের সামনে চলছে নীহার যশোদার গভীর প্রেমাভিসার। ইচ্ছে করেই আমি একদিন সন্ধেবেলা ওদের যুগলবদ্ধ অশালীন ছবিটি আপনাকে দেখালাম। এরপর যদি নীহারের মৃত্যু হয় সুবর্ণকে বাঁচায় কার সাধ্য? এবং নীহারের মৃত্যু মানে সুবর্ণর ফাঁসি এবং যশোদার জীবন তছনছ হয়ে যাওয়া। কৃপাসিন্ধুর থেকেও আরো নৃশংসভাবে হত্যা করলাম চাঁপার অজান্তে ওরই একটা চুলের কাঁটা আমি সরিয়ে রাখি। না, চাঁপাকে ফাঁসাবার জন্যে নয়। ও লোভী এবং কামার্ত নারী হতে পারে। কিন্তু ও আমায় যেটুকু দিয়েছে তার মধ্যে কোন ফাঁক ছিল না। তবু এমন মোক্ষম অস্ত্রটা হাতছাড়া করতে পারলাম না। একটা কাঁটা আপনি ঘর থেকে খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে আমি একটু বিপাকে পড়েছিলাম। কারণ ঠিক ঐ ধরনের একটা কাঁটা দিয়েই তো নীহারকে আমি খুন করব। সেটা আগে ভাগে আমার ঘর থেকে একজন গোয়েন্দার আবিষ্কার করা আমার পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু পরে ওটাই শাপে বর হয়। যে কাঁটাটা আমার ঘরে আপনারা পেয়েছিলেন সেটা ছিল চাঁপার। আগের দিন রাত্রে ও আমার ঘরে এসেছিল। নিজের অজান্তে কাঁটাটা ফেলে গিয়ে আমার উপকারই করেছিল। আপনার হাত থেকে কাঁটাটা নিয়ে আপনার সামনেই তুলে রেখে দিলাম এবং চাঁপার ঘর থেকে চুরি করা প্রথম কাঁটাটা নীহারের কণ্ঠনালিতে ঢুকিয়ে দিয়ে ওকে হত্যা করলাম তারপর পুলিস যখন কাঁটা নিয়ে ব্যস্ত, তখন আপনার পাওয়া দ্বিতীয় কাঁটাটা বার করে আপনাকে দেখিয়ে সন্দেহমুক্ত হই। তবু একটা সূত্র আমি রেখে এসেছিলাম, যা মৃত নীহারের নখের ডগায় দেখে আপনি আমাকে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। আমার র'সিল্কের পাঞ্জাবির কিছু সিল্ক-আঁশ। মৃত্যুর পূর্বে নীহার ছটফট করতে করতে আমার জামা খামচে ধরে ছিল।

যাইহোক নীহারের মৃত্যুর পর পুলিস সরাসরি সুবর্ণকে সন্দেহ করল। করবে তা জানতাম। আমারও কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। পাততাড়ি গুটিয়ে পালাব ঠিক করলাম। কিন্তু ততক্ষণে ধরা পড়ে গেছি আপনার কাছে। আপনার একটি কথায় বুঝতে পেরেছিলাম আপনি জেনে গেছেন কে খুনি। আপনি বলেছিলেন মাধবের মা সরলা দেখেছে নীহারকে খুন হতে। তা কী করে হয়? সরলার পক্ষে কোন মতেই নীহারের খুনিকে দেখা সম্ভব নয়। ও যে রাতকানা। নীলাঞ্জনবাবু, আপনি কি আমায় টোপ দিতে চেয়েছিলেন? সরলা পাছে বলে দেয় এই ভয়ে আমি তাকে খুন করব? আপনিও কি বুঝতে পারেননি সরলা রাতকানা? নাকি আপনি চেয়েছিলেন সব জেনেও আমি হঠাৎ উত্তেজনায় কিছু ভুল করে ফেলি? সরলার ওখানে কিছু লোক দেখানো পুলিস রেখে আপনি আমাকে পালাবার সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন? যাতে পালাবার মুখেই আপনি আমায় হাতে-নাতে ধরতে পারেন?

না, আমার মতো ঠাণ্ডা মাথার লোক কমই আছে। জীবনে একবারই রেগে ছিলাম। সেদিন ডাক্তারি

দুই পুড়িয়েছিলাম আব তানপুবাটাকে, যাক সে কথা, আমাকে সন্দেহ কবাব মতো দু একটা কাজ হয়তো ভুল কবেছি, কিন্তু এমন কোন প্রমাণ আমি বেখে আসিনি যা দিয়ে আপনি আমায় হত্যাকাবী সাব্যস্ত কবতে পাবেন। তবু আপনার প্রশ্ন হবে, কেন এই আত্মহনন? আব আমাব বাঁচাব কী দবকাব বলুন? একদিক থেকে তো আমি হেরে গেলাম। আমি চেয়েছিলাম সুবর্ণকে ফাঁসিব আসামি কবতে। কিন্তু আপনাব বুদ্ধি সে সব সন্দেহেব ঊর্ধ্বে। আপনি প্রমাণও কবে দিতে পাববেন কোন মৃত্যুব সঙ্গে সুবর্ণব যোগাযোগ নেই। সাবাটা জীবন যাব জন্যে আমাব ধ্বংস হয়ে গেল, সাবা জীবনে যাব সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জিততে পাবলাম না, শেষ বেলাতেও যখন তাব কাছে হেবে গেলাম, তখন পবাজিতেব কোন গ্লানি নিয়ে বেঁচে আমি নিজেই নিজেব মুখ দর্পণে দেখতে পাবব না। তাছাড়া কয়েকটি নিবীহেব মৃত্যুব কাবণ হয়ে আব আমাব বাঁচাবও ইচ্ছে নেই। আমি বড অনুতপ্ত।

ব্যাঙ্কে আমাব এখনও বেশ কয়েক লক্ষ টাকা মজুত। মাধবেব মা সবলা, কৃপাসিন্ধুব মেয়ে রমা আব চম্পাকে দু লক্ষ কবে টাকা দিয়ে গেছি। বাকিটা আমাব পুবনো মিশনাবি স্কুলকে। আমাব উইল কবা আছে। আপনি বিশ্বস্ত ভদ্রলোক। দাঁডিয়ে থেকে আমাব শেষ ইচ্ছাটা পূর্ণ কববেন। যাবাব আগে আপনাব কাছে এই আমাব শেষ মিনতি। ইতি— চিবহতভাগ্য যুবনাশ্ব সেন।

যুবনাশ্বেব চিঠি পডা শেষ হলে নীল উপস্থিত তিন জনেব দিকে তাকাল। কাবোব মুখে কোন কথা নেই। ডাক্তাব ভবতোষ হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পডলেন। একবাব সবাব দিকে তাকিয়ে বললেন, —লোকটা কী? ডাক্তাব জেকিল? মিস্টাব হাইড? কে জানে? আমি কি এখন যেতে পাবি?

নীল বলল, —আসুন। তবে ভবিষ্যতে সার্টিফিকেট দেবাব আগে

মুখেব কথা কেডে নিয়ে ডাক্তাব ধমকে উঠলেন, — জানি। আব জ্ঞান দিতে হবে না, বলেই উনি ঘূর্ণিয়মান লাট্টুব মতো বেবিয়ে গেলেন। ফিবে তাকালাম। সুবর্ণ ঘোষালেব দিকে। তাঁব চোখেব কোণ দুটো ছল ছল কবছে। উঠে দাঁডালেন। তাবপব নীলেব দিকে তাকিয়ে বললেন,— সব দোষ আমাব মিস্টাব ব্যানার্জি। আইনেব চোখে অপবাধী না হলেও নিজেব কাছে তো বটেই। যেদিন বুঝতে পেবেছিলাম যুবনাশ্ব আব যশোদা পবস্পবকে ভালবাসে, সেদিন নিজেকে আব ঠিক বাখতে পাবিনি। ঈর্ষা আমাকে পেয়ে বসেছিল। যুবনাশ্বর কাছে হেবে যাব এ ছিল আমাব চিন্তাব বাইবে। নিজেব পুরুষালি অক্ষমতাব কথা জেনেও শুধুমাত্র ঈর্ষাব জন্যে যশোদাকে আমি কেডে এনেছিলাম। এর মধ্যে কোন ভালবাসাব ব্যাপাব ছিল না। আই অ্যাম স্যবি যশোদা, আই কনফেস, আমি তোমাকে কোনদিনই ভালবাসিনি। এই আমাকে সাবাজীবন প্রায়শ্চিত্ত কবতে হবে।

ধীব পদক্ষেপে উনি ঘব থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফিবে তাকালাম যশোদাব দিকে। পাষাণমূর্তিব মতো জানলাব ধাবে বসে ছিলেন। জানলা দিয়ে আসা আলোয় ওঁব মুখ তখন বিষণ্ণ প্রতিমাব মতো লাগছিল। এ অবস্থায় কিছু জিজ্ঞাসা কবা উচিত হবে কি না আমাব মতো নীলও বোধহয় ভাবছিল। কিছু সামান্য বিবতিব পর নীল বলল, —মিসেস ঘোষাল, আমবা যাচ্ছি। আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি যদি আমাকে সেদিন আপনাব অতীত জীবনেব সব কথা বলে সাহায্য না কবতেন তাহলে এ বহস্য বহস্যই থেকে যেত।

আমবা বেবিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ যশোদা বিডবিড কবে উঠলেন, —কিন্তু আমি কেন এত বড ভুল কবলাম?

ফিবে তাকিয়ে দেখলাম উনি আবাব নিথব প্রতিমা। আমাদেব উত্তব দেওয়াব কিছু ছিল না। তাডাতাডি পা চালালাম ট্রেনেব উদ্দেশে. .

দুটো প্রশ্নেব মীমাংসা আমাব কাছে তখনও হয়নি। ট্রেনে বসে নীলকে বললাম, —আমাব দুটো প্রশ্নেব জবাব দিবি?

—বল্।

—তুই কখন যুবনাশ্বকে সন্দেহ কবলি? আব কী ভাবে বুঝলি ওই খুনি?

সিগারেট ধরিয়ে নীল বলল,—তোরও চোখে হাই মাইনাস গ্লাস। বলতে পারিস যুবনাশ্বর চশমার কত পাওয়ার ছিল?

—কি করে বলব? তবে মনে হয় মাইনাস পাঁচ-টাচ হবে।

—রাত দেড়টা দুটোর সময় লোকটা শুতে যাবার আগে চোখে মুখে জল দিয়ে শুত। নিশ্চয়ই চশমা চোখে লাগিয়ে কেউ মুখ চোখ ধোয় না। তাহলে মুখ ধোবার সময় কী ভাবে যুবনাশ্বর পক্ষে দেখা সম্ভব অত রাত্রে কোন একজন লোক রামলোচনের ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে? অতি বুদ্ধিমান হয়েও এরকম একটা বেফাঁস বলে আমার সন্দেহভাজন হয়েছিলেন। আরো একটা বড় ভুল করেছিলেন। আমার কানকে উনি ফাঁকি দিতে পারেননি। নীহারকে হত্যা করার কয়েকদিন আগে থেকেই উনি প্রতিদিন রাত্রে নিজে গাইতেন না। চালাতেন ওঁরই গাওয়া গানের টেপ। আমাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে। ট্রেনে বসে আমার সেনসিটিভ কানের পরিচয় পেয়েও বোকার মতো ভুল কাজ করেছিলেন। আর তোর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল, তোকে কিছু না বলে আমি একদিন যশোদাদেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ওর মুখে যশোদা যুবনাশ্বের পূর্ব প্রণয়ের কাহিনী শুনে সব কিছু জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তখনই বুঝেছিলাম সবগুলো খুনই যুবনাশ্ব করেছেন। এবং প্রত্যেকটি খুনই উনি করে একজন, অর্থাৎ ওঁর জীবনের একমাত্র শত্রুর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্যেই করে চলেছেন। মোটিভ একটাই, শত্রু নিধন। সব থেকে বড় ট্র্যাজেডি কী জানিস, যুবনাশ্ব পাগলের মতো যশোদাকে ভালবেসেছিল। কিন্তু যশোদাকে কোনদিনও বুঝতে পারেনি। বুঝতে চেষ্টাও করেনি। তা যদি পারতো তাহলে এত খুনও হত না। কারণ যশোদার জীবনে যুবনাশ্ব ছাড়া আর কোন পুরুষই আসেনি।

—কী বলছিস তুই? তাহলে নীহার?

—নীহার? আমাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলল, তুই একটা গ্রেট রামছাগল।

দম্পতি

ঝুপ করে চারদিক অন্ধকারের সমুদ্রে ডুবে গেল। ঘড়ির দিকে তাকাবার দরকার নেই। এখন ঠিক দশটা। হ্যাঁ দশটাই। পিসিমার ঘরের পুরনো অ্যাংলোসুইসের দেওয়াল ঘড়িটা দশটার ঘণ্টা দিতে শুরু করেছে। আজকাল লোকে লোডশেডিং দেখে ঘড়ি মেলাতে পারে।

হাতের বইটা মুড়ে রেখে হাতড়ে হাতড়ে টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আন্দাজে মোমবাতিটা খুঁজে নিয়ে জ্বালাতে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়তে হল। চোখ আটকে গেল সামনের তিনতলা ফ্ল্যাটবাড়ির পশ্চিম দিকের ঘরটায়।

নীলের সঙ্গে থেকে থেকেআমাকেও অনুসন্ধানের নেশায় পেয়ে বসেছে। যদিও কাজটা ঠিক শোভন নয়। অন্যের বাড়িতে আড়ি পাতা নেহাতই অভদ্রতা এবং অশালীন ব্যাপার। তবু একটা কৌতূহল আমাকে কদিন যাবৎ তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

মোমবাতি না জ্বালিয়ে ধীরপায়ে এসে দাঁড়ালাম দক্ষিণের জানলায়। এখন শীতকাল। সারা পাড়াটা কালো রঙের একটা বিরাট লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

আমার জানলা দিয়ে সামনের ঐ তিনতলার পশ্চিম দিকের ঘরটা সবটাই দেখা যায়। তার কারণ আছে। দক্ষিণ দিকটা মোটামুটি ফাঁকাই। সামনে বেশ কয়েক কাঠা জায়গা জুড়ে বস্তি অঞ্চল। বাড়িগুলো সবই মেঠো আর একতলা। যার ফলে বস্তির ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা তিনতলাটা আমার কাছে বেশ স্বচ্ছ আর পরিষ্কার।

এখন এই ঘন অন্ধকারের মধ্যে, তিনতলার ঐ ঘরখানা অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে ছোট্ট একটুকরো বাতিঘর বলে মনে হচ্ছে। ঐ ঘরটায় লোডশেডিং হতে আমি খুব কমই দেখেছি। হয় না বললেই চলে। লাইনটা এ সি। ডি সি এলাকায় এ সি লাইনের গ্রাহকেরা সৌভাগ্যবানই বলতে হবে।

হাতের আড়াল করে সিগারেট ধরিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম ঘরটার দিকে। ভদ্রমহিলা উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়ছেন। হাসির শব্দটা নিশ্চয়ই শোনা যাচ্ছে না কিন্তু বেশ বোঝা যায়। আর সঙ্গের পুরুষটি? হ্যাঁ তিনিও যেন কোন ব্যাপারে বেশ মজা পেয়েছেন। তিনিও সঙ্গিনীর সঙ্গে হাসিতে মত্ত। পুরুষটির হাতে একটি গ্লাস ধরা রয়েছে। কী আছে? মদ? শরবত? কে জানে?

যদি মদ হয় তাহলেও আমার কিছু বলার নেই। থাকতে পারে না। যে কোন মানুষ তাঁর নিজের ঘরে বসে মদ খেতে পারেন। তাঁর পরিচিত লোকের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করতে পারেন। কিন্তু?

হ্যাঁ, সেই কিন্তুটাই আমার আছে একটা বড় জিজ্ঞাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার অদম্য কৌতূহলের উৎস বলা যায়।

মহিলাটিকে আমি চিনি। ঠিক চিনি বললে একটু ভুল হবে। উনি আমার পরিচিতা নন। যেহেতু একই পাড়ার বাসিন্দা তাই ওঁকে আমি দেখেছি। পথ চলতে। আমার পিসতুতো বোন রেখার দৌলতে ভদ্রমহিলার নামটাও জেনেছি। সেই কৌতূহলের জন্যেই। মিসেস উপমা সোম। রঞ্জন সোমের স্ত্রী। হঠাৎ হঠাৎ, সামান্য দূর থেকে দেখে ওঁকে আমার সুন্দরীই মনে হয়েছে। আর মাস চারেক আগেও ওকে আমি যখনি দেখেছি, প্রতিবারই ওঁর স্বামী রঞ্জনবাবুর সঙ্গেই দেখেছি।

স্বামী ছাড়া ভদ্রমহিলাকে যেন কল্পনাই করা যেত না। কখনো নিউমার্কেটে। কখনো সিনেমা হলে। কখনও ট্যাক্সিতে। আর কী যে এক রোগ মহিলার, সর্বদাই হাসেন। ঠিক এখন যেমন হাসছেন। রঞ্জনবাবুকেও বেশ হাসিখুশি মেজাজের মানুষ বলে মনে হত।

ওঁদের যুগলকে দেখে তখন ভাবতাম পৃথিবীতে অন্তত একজন দম্পতি আছেন যাঁদের সুখী বলা

যায়। কথায় বলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হবেই। কিন্তু ওদেরকে আমি কখনই তেমন অবস্থায় দেখিনি। এমনও দেখেছি, ভদ্রলোক দেরি করে বাড়ি ফিরলে উনি জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর স্বামী ফিরলে আবার সেই হাসির তুফান।

জীবন বড় আশ্চর্য সব ঘটনার সমন্বয়। আলো আর অন্ধকারের তীব্রতায় কনট্রাস্ট এত বেশি মাঝে মাঝে ভাবতেও সব অবাক লাগে।

চার মাস আগের সেই সুখী দম্পতিকে মনে হত স্বামী স্ত্রীর জীবন এমনই হওয়া উচিত। চারদিকের অসম্ভব সব বিসদৃশ কোলাহলের মধ্যে, রঞ্জন আর উপমা আমার কাছে উপমাবিহীন মনোরঞ্জন বলেই মনে হত। অথচ মাস চারেক আগের আর এক বিসদৃশ ঘটনার সেই কনট্রাস্টের খেলা দেখেছিলাম।

প্রতিদিনের মতো ভোরবেলায় খবরের কাগজের পাতা খুলে সেদিন চমকে গিয়েছিলাম। তারিখটা আমার মনে আছে, পনেরই আগস্ট। প্রথম পাতার ডানদিকের নিচের দিকে ছাপা একটা সংবাদ আমাকে আবার কনট্রাস্টের কালো দিকটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। সংবাদটা এখনও আমার মনে জ্বলজ্বল করছে। বয়ানটা এই রকম, "ব্যবসায়ীর অপমৃত্যু। রঞ্জন সোম নামক কলকাতার এক হোটেলের মালিক অসাবধানবশত চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যান। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।" ইত্যাদি

এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন সামনের ঐ তিনতলার জানলা আর আমি খুলতে দেখিনি। সেটাই স্বাভাবিক। ওদের খবর নেবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু নিতে পারিনি। ভদ্রলোক জীবিত থাকা কালে কোনদিনও প্রতিবেশী হিসেবে আলাপ করতে যাইনি। কারণ সেটা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। তাঁর মৃত্যুর পর সেখানে যাবার কোন অর্থই ছিল না।

সময়ের বিচিত্র গতিতে একদিন সব ভুলে গিয়েছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম সামনের ঐ তিনতলার একটি কামরায় এক সুখী দম্পতি বাস করতেন। এবং তাদের সুখের নীড় একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় ভেঙে গেছে। জীবন যে দ্বন্দ্বময়। সাদা কালোর কনট্রাস্টে গতিশীল। মৃত্যু নিয়ে মানুষ বেশি দিন চিন্তা করতে ভালবাসেনা। মৃত্যু এবং দুঃখকে মানুষ যত তাড়াতাড়ি মন থেকে মুছে ফেলতে চায়।

আমার বন্ধু নীল ব্যানার্জিকে উপমা সোমের কথা বলেছিলাম। শুনে ও সামান্য একটু হেসে বলেছিল, তুই বড় সেন্টিমেন্টাল। ব্যাপারটা তোর ঘরের পাশেই ঘটেছে তাই তোকে এত ভাবাচ্ছে। জগতে এমন ঘটনা আকছারই ঘটছে। [illegible] চিন্তা করিস না।

আর চিন্তা করিনি। এবং ভুলেও গিয়েছিলাম। কিন্তু নতুন করে আবার সব কিছু চিন্তা করতে শুরু করলাম। এবং এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে চিন্তাটা মাথার মধ্যে জট পাকাতে আরম্ভ করলো।

উপমা সোম আমার কোন আত্মীয়া নন। আমার পরিচিতাও নন। দূর থেকে দেখা এক প্রতিবেশিনী মাত্র। কিন্তু আমাদের চেনাজানা পরিবেশগুলো অপ্রত্যাশিত আচরণে হোঁচট খেতে শুরু করলে সত্যিই বড় অস্বস্তি লাগে। তখনই [illegible]

তিনতলার জানলা কবে যে আবার খুলে গিয়েছিল জানি না। ঠিক আগেকার মত সপ্তাহখানেক আগের এক দশটার [illegible] আমার দৃষ্টি আটকে গিয়েছিল ঐ ঘরের জানলায়। চমকে উঠেছিলাম ভূত দেখার মতো একটি দৃশ্যে। [illegible] অনুভূতি ছানা কাটা হয়ে গিয়েছিল।

আমার তথাকথিত মধ্যবিত্ত সংস্কারাচ্ছন্ন মাথা এমন দৃশ্য দেখার কথা কল্পনা করেনি বলেই হয়তো সেদিনের দেখা সেই দৃশ্য অশালীনতার প্রশ্নে আমাকে বিব্রত করেছিল।

প্রথমে ভেবেছিলাম ব্যাপারটা হয়তো আমার দেখার ভুল। আমার অনভ্যস্ত চোখের ধন্দ। কিন্তু না। আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম। উপমা সোম আবার হাসছে ঠিক আগেকার মতো। উপমা আবার খুশির দমকে ছটফট করছেন। ঠিক আজকের মতো। আর সঙ্গের ঐ পুরুষটি, সেও ঠিক আজকের মতই, হাতে পানপাত্র ধরা অবস্থায় হঠাৎই উপমাকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তারপর গভীর আবেগে—

নাহ্ এ অসহ্য। অতি অশালীন। মাত্র কয়েক মাস আগেও ঐ মহিলা তাঁর স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের কথা চিন্তা করতে পারতেন না। স্বামী ছাড়া ঐ মহিলার একটি দিনও কাটতে চাইতো না। তাদের দাম্পত্য জীবন দেখে আমার মনে নারীপুরুষের সহজ জীবনের সুন্দর ছবিটা আঁকা হয়ে গিয়েছিল।

...কে দূর থেকে আমি নীরবে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। মাত্র কয়েকমাস পর এ পরিবর্তন কেমন করে ...?

... পাঁচমাস আগের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুরুষটির প্রতি এই মহিলার আর কোন দুর্বলতার অবশিষ্ট ... মাত্র কটি মাসের ব্যবধানে সে ভুলে গেল পুরনো সব স্মৃতি? সব ভালবাসা? হারিয়ে গেল ... প্রেমের সহস্র রোমাঞ্চ? মাত্র চারমাস পর এক পতিব্রতা নারীর তার স্বামীকে ভুলে গিয়ে ... পুরুষের কণ্ঠলগ্না হতে এতটুকুও বিবেকে বাধল না? এই প্রেম? এই প্রেমের গভীরতা? এরই ... মনুষ্যত্বের এত অহঙ্কার?

... যেন বলেছিল নারী ছলনাময়ী। এখন এই মুহূর্তে, এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে নারী-জাতিকে ... করে আমার বলতে ইচ্ছা করল, নারী কেবল ছলনাময়ী না —সে চিররহস্যময়ী। সে সব পারে। ... আবেগে কাছেও টানতে পারে। ছল প্রেমের মধুর কথায় ভোলাতেও পারে। তারপর আর ... নিষ্ঠুর আবেগে ছুড়ে ফেলে দিতেও বিন্দুমাত্র সময় নেয় না।

এখন কনট্রাস্টের কালো দিকটাই কেবল চোখে পড়েছে। পুরুষটি সেদিনের মতো আজও উপমাকে ... টেনে নিয়ে চলে গেলেন বিছানায়। নিভিয়ে দিলেন আলোটা। বাতিঘরের শেষ আলোর বিন্দুটাও ... গেল। এখন আর এক গভীর অন্ধকার।

উপমার চরিত্রহীনতার কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

নীলের বাড়িতে আসা আমার প্রতিদিনের ঘটনা। জগতে নীল ছাড়া আর আমার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ... আর একজন ছিল। সমুদ্র। সেও কয়েক বছর হল মারা গেছে। আর তার মৃত্যুরহস্যের কিনারা ... গিয়েই নীল এখন একজন নামকরা রহস্যানুসন্ধানী। অবশ্য ও বলে ও একজন সত্যপূজারি। ... ঘেরাটোপ থেকে সত্যকে খুঁজে আনার চেষ্টাটা ওর মতে একধরনের সাধনা। পূজা। এখন ... প্রায়ই একটা না একটা রহস্যময় ব্যাপার আসছেই।

বৈঠকখানার চৌকাঠে পা দিতেই দেখি দুজন ভদ্রমহিলা নীলের সামনের সোফায় বসে আছেন। ... আঙুল ছুঁইয়ে আমাকে কথা বলতে না করল। নিঃশব্দে আমি ওর পাশে গিয়ে বসলাম।

... শব্দহীন হোক, আমার উপস্থিতি ভদ্রমহিলারা টের পেলেন। এতক্ষণ নীলের সামনের সোফায় ... মাথা নিচু করে বসেছিলেন। মুখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। মনে হল যেন একটু অপ্রস্তুত ... হলেন। কারণ, চোখ দুটি ওঁর বেশ লাল। বোধহয় এতক্ষণ কাঁদছিলেন।

মহিলারা মুখ তুলে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই নীল বলল,—আমার বিশেষ বন্ধু অজেয় ... আপনারা ওর সামনে সব কথাই বলতে পারেন।

ওরা আমার দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করলেন। নমস্কার বিনিময় করে নীলকে জিজ্ঞাসা করলাম, ... এঁরা, মানে এঁদের তো ঠিক,

ইনি মিসেস রায়। গীতা রায়। বিশেষ বিপদে পড়ে আমার কাছে এসেছেন। আর উনি ওঁর ... কাবেরী সেন।

আমতা আমতা করে বললাম,—বিপদ মানে?

—বিপদ মানে বিপদ। হ্যাঁ বিপদই তো। একজন বিবাহিতা মহিলা যদি মাস চারেক তাঁর স্বামীকে ... না পান, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা বিপদের ব্যাপার। আচ্ছা মিসেস রায়,

—বলুন,

—আমি যদি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি, আপত্তি করবেন না তো?

—না না, সে কি? আপত্তি করবো কেন?

মহিলার অস্বচ্ছন্দ ভাবটা ততক্ষণে কেটে গেছে। ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে মুখটা মুছে নিয়ে ... বসলেন। সুন্দরী না হলেও বেশ সুশ্রী। বয়েস মনে হয় সাতাশ আটাশ। রঙটা মাজা। দুশ্চিন্তা ... উদ্বেগে কিছুটা ম্রিয়মান। পোশাক পরিচ্ছদেও কোন বিলাসিতার ছাপ নেই। সাধারণ ছাপা শাড়ি।

সাধারণভাবেই পরা। পায়ে কম দামি বাটার স্লিপার। বেশ ধুলো লেগেছে। মনে হয় অনেকদূর থেকে হেঁটে আসছেন। মুখে প্রসাধনের কোন চিহ্ন নেই। ছোট্ট একটা খয়েরি টিপ। মাথায় সিঁদুর। হাতে একটা রিস্টওয়াচ, শাঁখা আর একগাছা করে দুহাতে দুটো, মনে হয় সোনার চুড়ি। আপাত দৃষ্টিতে ভদ্রমহিলাকে দেখে আটপৌরে গেরস্ত বৌ ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। তুলনায় কাবেরী বেশ সৌখিন, সুন্দর এবং সচ্ছলতার ছাপ সর্বাঙ্গে। নীলের প্রশ্নে চমক ভাঙল, —আচ্ছা গীতাদেবী, আপনারা কী বরাবর ভক্তিগড়ের বাসিন্দা?

—না, আমি বিয়ের আগে কলকাতাতেই থাকতাম।

—কোথায়?

—ভবানীপুর।

—কিছু মনে করবেন না, আপনারা কি ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন?

সলজ্জ ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে গীতা বললেন, —আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনার স্বামী, আই মিন, সোমনাথ রায়ের সঙ্গে আপনার বিয়ে হয় কতদিন আগে?

—তিন বছর আগে।

—উনি কোথায় থাকতেন?

—ভবানীপুরেই। মানে, আমার বাড়ি আর ওনার বাড়ি একই পাড়ায়।

—আই সী। আপনাদের এই বিয়েতে বাড়ির মত ছিল?

—আজ্ঞে না।

—কারণ?

—ওনার কোন চাকরি বাকরির স্থিরতা ছিল না। যখন যেটা পেতেন করতেন। আর আমার বাড়ির অবস্থা বেশ সচ্ছল। কোন্ অবস্থাপন্ন বাবা, মা চায় বলুন ঐ রকম একজন ছেলের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিতে?

—বিয়েটা কী রেজিস্ট্রি করেই করেছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিছু মনে করবেন না। আপনার স্বামী মানে সোমনাথবাবুর স্বভাবচরিত্র,

—না, আমি কোনদিনও কোন ভুল বোঝার অবকাশ পাইনি। উনি আমাকে যথেষ্টই ভালবাসতেন।

—বিয়ের পরই কি আপনি ভক্তিগড়ে চলে গিয়েছিলেন?

—না, আরো বছরখানেক পর। কলকাতায় উনি যখন কিছুই করে উঠতে পারলেন না তখন হঠাৎ ভক্তিগড়ে একটা দোকানে সেলসম্যানের কাজ পান। মাইনে অবশ্য বেশি নয়, তবু, কিছু না'র থেকে তো ভাল। চাকরিটা উনি নিয়েই নেন। তারপর মাসখানেকের মধ্যে ওখানে একটা ঘরটর দেখে আমাকে নিয়ে যান।

—এই বিয়ে হওয়া এবং ওখানে যাওয়া এর মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন?

—বাঁশদ্রোণীতে আমার এই বন্ধুর বাড়িতে।

বলেই উনি কাবেরীর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। কাবেরীও বিবাহিতা। তারও বয়েস গীতারই মতো। বেশ সহজ কণ্ঠে কাবেরীই উত্তর দিলেন, —গীতা আমার ছোটবেলার বন্ধু। ওর এই আশ্রয়হীন অবস্থাটা তো আর উড়িয়ে দেবার নয়। আমার স্বামীকে বলতে উনি নির্দ্বিধায় নিচের তলার একখানা ঘর ওদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য সোমনাথ চাকরি পাবার ঠিক একমাস পরই গীতাকে নিয়ে চলে যায়।

—আচ্ছা, নীল আবার প্রশ্ন করল, ভক্তিগড় থেকে আপনি ফিরেছেন কদিন হল?

গীতা বললেন, —ফেরা ফিরির কী আছে। ভক্তিগড় এখান থেকে প্রায় ঘণ্টা ছয়ের জার্নি। যে কোন দিনই আসা যায়। গতকালই আমি এসেছি এখানে।

—আপনার বাবা মা কী বলছেন?

—ওখানে যাইনি। জানাইনিও কিছু। কী হবে? বিয়ের তিনবছরের মধ্যেও ওঁরা যখন কোন খবর

পারেন না।

—এখন খবর না নেবার কী আছে? এখন তো উনি চাকবিই করছেন।

—হুঁ, বলে ঠোঁটের কোণে অল্প হাসলেন গীতা, তারপর বললেন, জাত আব স্টেটাসেব অহংকাব ওঁদের বোধহয় আজও ভুলে যেতে পারেনি। একে আমাদেব গোঁড়া ব্রাহ্মণ পবিবাব, তাবপব ধনী। তদুপরিগত লেখাপড়াতেও সোমনাথ আমাব থেকে কম। ও সাধারণ স্কুল ফাইনাল পাশ কবা ছেলে আর আমি এম এ. পাশ করেছি। এতটা বৈসাদৃশ্য জীতেন গাঙ্গুলি মানে আমার বাবা মেনে নিতে পারেননি।

—বেশ, বুঝলাম। কিন্তু ভক্তিগড়ে উনি কী ধরনেব চাকবি নিয়েছিলেন?

—বললাম না, অর্ডিনারি সেলসম্যানের। মানে দোকানেও বসতে হত, আবার বেশি অর্ডাব থাকলে মাঝে মাঝে বাইরে সাপ্লাই দিতেও যেতে হত।

—দোকানেব নাম?

—নামটা আনকমন। 'অল ফাউন্ড।' স্টেশনাবি গুডস্ ছাড়াও টুকিটাকি দু একটা প্রোডাক্ট তৈবি করছিল ওবা।

—প্রোডাক্টটা কিসের?

—তেমন বিশেষ কিছু না। নেলপালিশ, স্নো, সিঁদুব আলতা এই সব আব কি। ভদ্রলোক সবে ব্যবসা শুরু করেছিলেন।

—আপনার স্বামী ছাড়া আর কেউ কি ওখানে কাজ কবেন?

—কবেন বৈকি। কস্‌মেটিক্‌সের কাজ জানা কিছু লোক আছে। মালিক নিজে আছেন। বোধহয় একজন দাবোয়ানও আছে।

কয়েক সেকেন্ড নীল আব কোন প্রশ্ন না কবে প্রায় নিঃশব্দে একটা সিগারেট ধবাল। ইতিমধ্যে দিনু এসে চা আর বিস্কিট দিয়ে গেল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে নীল হঠাৎ বলল,—গীতাদেবী, কিছু মনে কববেন না, এবার আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন কবব। কাবণ, সত্যিই যদি আমাকে আপনাব স্বামীকে খুঁজে পেতে হয় তাহলে আপনাব পাবিবাবিক জীবনেব কিছু আভাস পাওয়া দরকাব।

গীতা কিছু উত্তর দেবার আগেই কাবেবী বলে উঠলেন,—আপনি না বললেও ওটা আমাদের জানাই ছিল। আপনি প্রশ্ন করুন, সাধ্যমত ও নিশ্চয়ই উত্তর দেবে।

—আপনি নিশ্চিত জানেন, আপনাব স্বামীর জীবনে আব কোন মহিলাব আবির্ভাব ঘটেনি?

খুব দৃঢ় এবং স্পষ্ট জবাব পাওয়া গেল গীতাব কাছ থেকে,—না, আমাব স্বামী গবিব হতে পাবেন কিন্তু কোন মতেই অসৎচরিত্রের লোক নন।

—ইদানীং কি আপনাদের মধ্যে কোনবকম ঝগড়াঝাটি?

—একমাত্র অর্থনৈতিক কারণে মাঝে মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপাব হয়তো ঘটেছিল। কিন্তু, ওখানকার একটি প্রাইমারি স্কুলে আমি মিসট্রেসের চাকরি পাবাব পব আমাদেব মোটামুটি খেয়েপরে দিন কেটে যাচ্ছিল। এছাড়াও আমি কয়েকটা টুইশনি নেবাব কথা ভাবছিলাম। সামনেব মাস থেকে সেগুলোও করাব কথা ছিল।

—আপনার ছেলে-মেয়ে কটি?

—সোমনাথ এত তাড়াতাড়ি সংসাব বাড়াতে চায়নি।

—আচ্ছা, উনি কোথায় যেতে পাবেন বলে আপনাব মনে হয়?

—আমাকে না বলে ও কোথাও কোনদিনও যায়নি।

—কিন্তু আপনি তো বললেন ওঁকে মালপত্তব ডেলিভাবি দিতে যেত।

—হ্যাঁ। সেই জন্যেই ও মাঝে মাঝে ভক্তিগড়েব বাইবে যেত।

—তবে যে বললেন কোথাও কোনদিনও যাননি।

—আমি বলেছি আমাকে না বলে যেতেন না।

—কোথাও গেলে কতদিনের জন্যে যেতেন?

—বড় জোর দিন দুয়েক। একবার মাত্র এক সপ্তাহের মতো বাইরে ছিলেন।

—ঠিক কতদিন আগে উনি নিখোঁজ হন? আই মিন ডেটটা আপনার মনে আছে?

—আছে। এটা ডিসেম্বরের শেষ। উনি গিয়েছিলেন আগস্টের বারো তারিখে।

—ওঁর দোকানে খোঁজ নিয়েছিলেন? ওঁরা কী বলছেন?

—আমি খোদ মালিকের সঙ্গেই দেখা করি। কিন্তু উনি বললেন সোমনাথ নাকি ওঁদের ... টাকার মালপত্র নিয়ে উধাও হয়ে গেছে। নীলাঞ্জনবাবু, এ আমি বিশ্বাস করি না। সোমনাথ ... হলেও, চোর নয়।

—পুলিসে নিশ্চয়ই খবর দিয়েছিলেন?

—যা যা করার সবই করেছি। থানা পুলিস, হাসপাতাল, খবরের কাগজ, কিন্তু কেউ কোন ... দিতে পারল না।

শেষের দিকে গীতার গলার স্বরটা ধরে এল। উনি বোধ হয় আর কথা বলতে পারছিলে... অবস্থাটা কাবেরী বুঝতে পেরেই নীলকে উদ্দেশ করে বললেন,—নীলাঞ্জনবাবু, একরকম আমিই ... করে ওকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। সবার অমতে বিয়ে করে একেই তো ও সবার কাছ ... দূরে চলে গেছে। এরপর যদি ওকে সোমনাথকেও হারাতে হয়, আপনিই বলুন ও কী নিয়ে বা...

নীল হাত তুলে ওকে থামতে বলে বলল,—আমাকে এত কিছু বলার দরকার নেই। গীতা দেবী... মানসিক অবস্থাটা আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি। তাই তো আমি আপনাদের ফিরিয়ে দিইনি। ... বড্ড লেট হয়ে গেছে। চার সাড়ে চার মাস। বড় কম কথা না। আচ্ছা সোমনাথবাবুর মধ্যে ইদা... কোন হতাশা বোধ কাজ করছিল কি?

ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিয়ে গীতা বললেন,—না, বরং চাকরিটা পেয়ে ওর মধ্যে ... আরো বড় হবার বাসনা জেগে উঠছিল। শেষের দিকে প্রায়ই আমাকে বলতো লাইনটা ভালো ... বুঝে নিয়ে কিছু টাকা-পয়সা জমিয়ে একদিন নিজেই একটা ব্যবসা শুরু করবে। আসলে ও ছিল ... অপটিমিস্ট ধরনের। তাই আত্মহত্যা বা ইচ্ছে করে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া, ... নীলাঞ্জনবাবু, আমি সোমনাথকে চিনি, ও তা করতে পারে না।

হঠাৎ নীল প্রসঙ্গ পাল্টালো,—আপনি তো এখন কাবেরী দেবীর কাছেই আছেন?

—দু একদিন। তারপর ফিরে যেতে হবে। ইতিমধ্যে ও ফিরে এসে যদি আমাকে দেখতে ... পায়। তাছাড়া নতুন বছর শুরু হবে। স্কুলও খুলে যাবে। কলকাতায় এখন কী করেই বা থাকি।

—আপনার স্বামীর কোন ছবি আছে?

—সিঙ্গল পাসপোর্ট ছবি মাত্র দু'টো ছিল। একটা খবরের কাগজে দিয়ে দিয়েছি। আর একটা থানায় জমা আছে।

—আর কোন ছবি নেই? মানে যা থেকে সোমনাথবাবুকে চেনা যেতে পারে?

—আমাদের দুজনের বিয়ের পর তোলা ছবিটা পড়ে আছে। একটু থেমে গীতা বললেন, —নীলাঞ্জনবাবু?

—হ্যাঁ বলুন?

—আমি এখন কী করব?

অদ্ভুত এক দরদী গলায় নীল বলল,—সোমনাথবাবুর কী ঘটেছে বা তিনি কোথায় কেমন ভাবে আছেন তা জানি না। তবে আমি চেষ্টা করব তাঁকে খুঁজে পাবার। ধৈর্য যে আপনাকে ধরতেই হবে মিসেস রায়। সত্যকে যে সহজে মেনে নিতেই হবে। আপনি বরং আজ আসুন। খুব শিগগিরই আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

গীতা আর কাবেরী উঠে পড়লেন। বেলাও বাড়ছিল। নমস্কার জানিয়ে ওরা দরজা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। হঠাৎ কাবেরী ঘুরে দাঁড়িয়ে একটু সঙ্কোচ নিয়ে বললেন,—কিন্তু আপনার ফিজটা?

মুখের কথা কেড়ে নিয়েই নীল বলল,—পরে পরে, আগে ঘরের লোকটা ঘরে আসুক তারপর ওসব ভাবনা।

ও চলে যেতেই আমি বললাম,—এবার তাহলে ভক্তিগড়ে?

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, দেখলি না ভদ্রমহিলার কী কষ্ট।

দুই নম্বর আপ তুফান এক্সপ্রেস ঠিক দুটো কুড়ি নাগাদ ভক্তিগড়ে এসে থামল। মিনিট পাঁচেক ... কিছু না। স্টেশনে নেমে এদিকে-ওদিকে দেখছিলাম। এদিকটা আমাদের আগে আসা হয়নি। ...এর মধ্যে এরকম সাজানো-গোছানো ছোট্ট স্টেশন চট করে ভাবা যায় না। বেশ ছিমছাম। ... আমাদের কিছু ছিল না। একটা করে সাইড ব্যাগ তাতে দুটো করে পাজামা, গরমের পাঞ্জাবি ...একটা সোয়েটার আর আলোয়ান। দু-একটা টুকিটাকি জিনিসপত্র। পেস্ট ব্রাশ দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম। ...মোড়া ভেঙে একটা সিগারেট ধরিয়ে নীল বলল, - কী ব্যাপার বলত, শান্ত কী আমাদের ...ঠি পায়নি। স্টেশন যে ফাঁকা হতে চলল।

সত্যিই তাই। গাড়ি স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে। যার যেখানে যাবার তারাও মোটামুটি চলে যাচ্ছে। ... শান্তর পাত্তা নেই।

কেবল মাত্র গীতা দেবীর কথার ওপর নির্ভর করেই আমরা এখানে চলে আসিনি। আমাদের ... পুরনো বন্ধু শান্ত সেন। ও এখানকারই বরাবরের বাসিন্দা। বাড়িটাড়িও করেছে। আগে অনেকবারই আমাদের নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু কুঁড়েমিই হোক আর যাই হোক, আমরা আসার মতো সুযোগ ... উঠতে পারিনি। এবার এক ঢিলে দু পাখি মারা। ওকে আমাদের আসার কথা লিখে চিঠি দিয়েছিলাম। স্টেশনে থাকতেও বলেছিলাম। কে জানে পোস্ট অফিসের দৌলতে ও হয়তো আমাদের চিঠি পায়নি।

পায়ে পায়ে আমরা হাঁটা শুরু করলাম। লোহার গেট ঠেলে বাঁধানো লাল সিঁড়ির মুখে যেতে না যেতেই দেখি সিঁড়ির ঠিক নিচের ধাপ থেকে তড়িঘড়ি উঠে আসছে শান্ত।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক তাহলে শান্ত চিঠি পেয়েছে। আমাদের দেখতে পেয়েই হাঁই হাঁই ... উঠল।

কাছে নামতেই ও তড়বড় করে কিছু বলতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে নীল বলল, -শান্ত এখন তোর ... ভাল্লাগছে না। তাড়াতাড়ি চ। পেটে ক্যাসিয়াসের ঘুষি পড়ছে।

শান্ত আর কিছু না বলে হাত তুলতেই দুটো রিকশাওয়ালা এগিয়ে এল। আমরাও বিনা বাক্যব্যয়ে একটায় উঠে বসলাম। অন্যটায় শান্ত।

কলকাতার ঘিঞ্জি শহরটা যেন এক নিমেষে কোথায় হারিয়ে গেল। কালো চকচকে পিচ বাঁধানো ... রাস্তা দুপাশের সুন্দর মেঠো দৃশ্যাবলী চিরে এগিয়ে চলে গেছে। শীতের দুপুর। মিঠে রোদ পোয়াতে পোয়াতে আমাদের রিকশাটা শান্তর রিকশাকে অনুসরণ করে চলল। খিদে যদিও আমারও পেয়েছিল, ... এই শান্ত সুন্দর সাজানো একটা শহর, গাছে গাছে ফুটো থাকা অজস্র রং বেরং এর ফুলের বাহার ... নেশা ধরাচ্ছিল। আপন মনে দেখতে দেখতে চলেছি। হঠাৎ নীল বলল,— সোমনাথকে খুঁজে ... করতে না পারলে নিশ্চয়ই আফসোস থাকবে। তবে এখানে না এলে এমন সাজানো শহরটা দেখতে পেতাম না। ভাবাই যায় না, এটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ। রাস্তায় একটা দেশলাই-এর কাঠি পর্যন্ত পড়ে ...ই দেখেছিস?

আমি আগেই লক্ষ্য করেছিলাম। কোন উত্তর দিলাম না। আমার কেন জানি না কেবলি মনে হচ্ছিল ... সুন্দরের মধ্যেই কলঙ্কের মতো একটা মলিন কিছু লেগে থাকে। এই সুন্দর ছোট্ট শহরটার বুকে ... জানে হয়তো বা কোন মালিন্যের স্পর্শ লুকিয়ে আছে! সোমনাথ-রহস্যের কিনারা করতে গিয়ে হয়তো সেই মলিনতাই বেরিয়ে পড়বে। নীলের দিকে আড় চোখে তাকালাম। ও যেন রাস্তা ঘাট মাঠ ...ন ওর চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে।

প্রায় মিনিট দুতিন পর হঠাৎ নীল গলা তুলে প্রশ্ন করল,—হ্যাঁরে শান্ত কী মেনু করেছিস ? গিয়ে কিন্তু বসে টসে থাকতে পারব না।

শান্তও চেঁচিয়ে উত্তর দিলে,—তুই শালা রাম পেটুক।

—ঘড়ির দিকে তাকা। অজীর্ণ রুগীও পেটুক হয়ে যাবে।

শান্তর উত্তর পেলাম, —মোরগা অ্যান্ড গরম ভাত।

—ফার্স্ট ক্লাস, বলেই নীল জোরে টান মারল হাতের সিগারেটে।

—শান্ত কি সমস্ত ব্যাপারটা জানে? আস্তে আস্তে নীলকে জিগ্যেস করলাম।

—না, এখন কিছু আভাস দিইনি। তবে বেশি খোঁজাখুঁজি করতে গেলে জানাতে তো হবে।

নীল খুব নির্বিকার ভাবে কথাগুলো বললেও আমি বুঝতে পারছিলাম না ও কী ভাবে সোমনাথকে খুঁজে বার করবে। তার ওপর যে লোকটা চারমাস ধরে নিখোঁজ। এবং পাগল ছাগল নয়। সজ্ঞানে যদি কোন লোক ইচ্ছে করে হারিয়ে যেতে চায় তাকে খুঁজে বার করা বড় শক্ত।

দেখতে দেখতে শান্তদের বাড়ি এসে গেল। রিক্শা থেকে নেমে শান্তই ভাড়া মিটিয়ে দিল। পিচরাস্তা ছেড়ে একটুখানি মেঠো পথ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ও বলল,—আর তোদের কষ্ট দেবো না। ঐ যে দূরে দেখছিস হলুদ রঙের বাড়িটা, ওটাই তোদের গন্তব্যস্থল।

এই শহরটার মতো বাড়িটাও বেশ নীট। ছিমছাম ছোট্ট একতলা বাড়ি। চারপাশে ফুলের বাগান। মাঝখানে তিন কামরার ছোট্ট কটেজ। লোহার গেট ঠেলে ঢুকে পড়লাম। তপতী মানে, শান্তর বউ বাড়ির সামনে ছোট্ট লনে বেতের চেয়ারে বসে উল বুনছিল। আমাদের দেখতে পেয়েই হাসিমুখে উঠে এল।

তপতীকে দেখে পুরনো দিনের অনেক হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি ভেসে আসছিল। সেই তপতী, এককালে ছিল আমাদের সকলের বন্ধু। একই কলেজে পড়তাম। শান্তকে একদিন ভালবাসল। তারপর আমরা সবাই মিলে হই হই করে শান্ত তপতীর বিয়ে দিয়ে দিলাম। চাকরি নিয়ে শান্ত ভক্তিগড়ে চলে এল। এখন তো বাড়ি টাড়ি করে বেশ গুছিয়ে সংসার পেতেছে।

তপতী এগিয়ে এসে বলল,—উঃ বাবা, সব একেবারে ডুমুরের ফুল। ভগবানকে ডাকলেও তিনি তোমাদের আগে এসে দেখা দিতেন।

উচ্ছ্বাসে ও আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে নীল বাধা দিয়ে বলল,—দেখ্ ম্যাম্, এখন মেলা বক্‌বক্ করিস না। তাড়াতাড়ি ভাত বাড়। শেষকালে খিদের চোটে তোর সাজানো বাড়ি ঘর দোর সব খেয়ে ফেলব।

তপতীকে নীল বরাবরই ম্যাম্ বলে ডাকে। কারণ তপতীর গায়ের রঙটা মেমদের মতো ফর্সা। নীলের কথার উত্তরে তপতী বলল,—বাব্বা, এত খিদে?

—হুঁ। সাড়ে এগারোটায় বর্দ্ধমানে পেয়েছিলাম স্পেশাল সীতাভোগ অ্যান্ড মিহিদানা। তো দাদা মিহিদানা অ্যান্ড সীতাভোগ এতক্ষণে হজম হয়ে গেছে।

—তাহলে তাড়াতাড়ি জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে এস। আমারও খুব খিদে পেয়েছে। চান করবে নাকি? গরমজল হয়ে যাবে।

—নাঃ, চান করার মতো অবস্থায় নেই। তুই আগে খাবার দে।

—আচ্ছা বাবা আচ্ছা, বলেই তপতী চলে যাচ্ছিল, আমি চেঁচিয়ে বললাম, —একসঙ্গে বাড়িস। অনেকদিন আড্ডা দিতে দিতে খাওয়া হয়নি।

—ঠিক আছে, বলে ও চলে গেল।

খাওয়া দাওয়া সেরে যখন উঠলাম তখন প্রায় পৌনে চারটে। নীলের কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে বেশ আয়েসি একটা টান দিয়ে শান্ত বলল,—আচ্ছা নীল, একটা কথার সত্যি উত্তর দিবি?

—বল?

—তুই বোধ হয় ঠিক আমাদের এখানে বেড়াতে আসিস্‌নি। তাই না?

—অনুমান তোমার ঠিক বৎস।

— তোকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম। গোয়েন্দা নীলাঞ্জন ব্যানার্জি বিনা কারণে কোথাকার কবেকার বন্ধু শান্ত সেনের কাছে সময় নষ্ট করতে আসবে কেন?

মুখে বাধা দিয়ে থামাল নীল,—অভিমান?

ফস করে তপতী বলল,—সেটা কি খুবই অন্যায়?

—নারে, তোদের অভিযোগ সেন্ট পার্সেন্ট সত্যি। আসলে এমনভাবে এই লাইনটার মধ্যে ঢুকে পড়েছি যে বেরুবার কোন রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছি না। ব্যবসা ট্যাবসাও বোধহয় লাটে উঠে যাবে।

—হু, কবে তুই ব্যবসার কথা মন দিয়ে ভেবেছিস? যাক্‌গে এবার আসল কারণটা বল তো? কি জন্য এসেছিস এখানে? সম্প্রতি এখানে কোন খুন জখম হয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না।

তির্যক দৃষ্টি ফেলে নীল বলল,—তুই ঠিক বলছিস? সাম্প্রতিককালের মধ্যে এখানে কোন খুন বা হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেনি?

একটু ভেবে শান্ত বলল,—না, সেরকম কিছু মনে পড়ছে না। আর দেখছিস তো এটা একটা ছোট্ট শহর, কিছু একটা ঘটলে তা ছড়িয়ে যেতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না।

—তোদের এ জায়গাটার নাম কী রে?

— মৌটুসি। সাসপেন্সে রাখিস না। কী হয়েছে খুলে বল। তোকে আমি কিছু হেল্পও করতে পারি।

বোধহয় সেকেন্ড পাঁচেক নীল গভীর দৃষ্টি দিয়ে শান্তকে মন দিয়ে দেখল। তারপর একসময় আচমকা প্রশ্ন করল,—সোমনাথ রায় বলে কাউকে তুই চিনিস?

—সোমনাথ? কে সোমনাথ? কোথায় থাকে বল তো?

নীল হেসে ফেলল,—তাহলেই দ্যাখ, এই ছোট্ট শহরে কিছু ঘটলেই তোর পক্ষে তা জানা সম্ভব নাও হতে পারে।

—দ্যাখ, শুধু নামে একটা লোককে চেনা আর একটা বিশেষ খুন খারাপির ব্যাপার মনে রাখা, এক জিনিস নয়।

হু, মাথা নাড়তে নাড়তে নীল বলল, তার মানে তুই বলছিস সোমনাথ বলে কেউ এখানে খুনটুন হয়নি।

—আমি আবার সে কথা কখন বললাম?

—এই তো বললি খুনটুন হয়নি। যাই হোক, তাহলে সোমনাথ কোথায় যেতে পারে?

শান্ত রেগে উঠল,—দুর ছাই, কে সোমনাথ আগে তো তাই বলবি।

—গোদা বাংলায় বলা যেতে পারে সোমনাথ তোর আমার মতো একজন সাধারণ ছেলে।

—কোথায় থাকে?

—আমবাগানে।

আমবাগান? সে তো এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। হাতিয়ার কাছে।

এতক্ষণ তপতী পান চিবোতে চিবোতে আমাদের কথা শুনছিল। ওর হাত দুটো সমানে উলের কাঁটা দিতে ব্যস্ত ছিল। একটাও উত্তর বা প্রশ্ন করেনি। হঠাৎ আমবাগান আর হাতিয়ার কথা শুনে বলে উঠল,—নীল, তুমি কী গীতা রায়ের স্বামীর কথা বলছ?

চোক করে নীল যেন লাফিয়ে উঠল,—সিওর, ম্যাম্ চিনিস ওদের?

—এইবার মনে পড়েছে, হাতের কাঁটা থামিয়ে তপতী বলল, প্রায় পাঁচ ছমাস আগে গীতার স্বামী হঠাৎ একদিন নিখোঁজ হয়ে যায়।

—তুই জানলি কেমন করে?

—না জানার কী আছে, শান্তর দিকে চোখ ফিরিয়ে তপতী বলল, শান্ত, তোমায় আমি বলিনি গীতার হাজব্যান্ডকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কাউকে কিছু না বলে কোথায় যেন চলে গেছে।

শান্ত বোধহয় মনে মনে রিকালেক্ট করার চেষ্টা করল। তারপর বলল,— কে জানে বাবা, সারা

দিনরাতে তুমি প্রতিদিন অজস্র কথা বল। সব কি মনে রাখা সম্ভব?

—এই কি হচ্ছে কী?

—ও, ভুল বলেছি বুঝি? নারে, নীল, তুই কিছু মনে করিস না। আমার বউ আমার সঙ্গে সারাদিন একটাও কথা বলে না।

—ওমা, আমি আবার তাই বললাম নাকি?

সামান্য অধৈর্য হয়ে নীল বলল,—গাড়ি কিন্তু বেলাইনে চলে যাচ্ছে। হ্যারে ম্যাম্, গীতাকে কী করে চিনলি?

—ও, আমার সঙ্গে এক স্কুলে পড়ায়।

নীল অবাক হল,—তুই আবার স্কুলে পড়াস নাকি?

—কী করব বল, সারাদিন তো আর একা-একা বসে থাকা যায় না। তবে এখন আমি ছুটিতে আছি। তাই আর ওর খবর রাখতে পারি না।

—তা হঠাৎ তুই ছুটি নিলি কেন?

সহসা এই কথার উত্তর দিতে পারল না তপতী। লজ্জায় ওর গাল দুটো বেশ লাল দেখাল। নীলের এতদিকে এত দৃষ্টি থাকে অথচ সাংসারিক ব্যাপারে ও বড় অনভিজ্ঞ। যেটা আমি এসেই টের পেয়েছি সেটা যে কেন এখনও নীলের চোখে পড়েনি বুঝতে পারলাম না। একজন বিবাহিতা মহিলার ছোট্ট মোজা বোনার অলিখিত এবং অন্তর্নিহিত কারণটা নীলের মতো বুদ্ধিমান ছেলের বোঝা উচিত ছিল। তাছাড়া তপতীর শারীরিক গঠনেও সেটা বেশ প্রকট হয়ে উঠেছে। শান্তকেও অপ্রস্তুত মুখে 'ইয়ে' 'মানে' এই সব বলতে শোনা গেল। ব্যাপারটা আমাকেই ম্যানেজ করতে হল,—তুই একটা আকাট, মেয়েদের একটা সময়ে বেশি দৌড়ঝাঁপ করা উচিত নয়।

—ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি, বলেই নীল অত্যন্ত সহজ দুরমনস্কতায় বলল, কিন্তু ম্যাম্ তুই বোধহয় তারিখটা একটু ভুল করছিস।

তপতীর সলজ্জ ভাবটা তখনও রয়েছে। আস্তে আস্তে মুখ তুলে ও বলল, — তারিখ? কী তারিখ?

—পাঁচ ছয় মাস আগে নয়। বোধহয় চার সাড়ে চারমাস আগে।

—মনে নেই, হতে পারে।

—গীতা ওর স্বামী সম্বন্ধে তোর কাছে গল্পটল্প কী কিছু করেছে?

—না তেমন কিছু না।

—কোনদিন কিছু বলেনি?

—টুকিটাকি দু' একটা। যেমন সবাই বলে।

—কী রকম?

—ওরা খুব গরিব। ওর স্বামীর সামান্য আয়ে চলে না। তাই চাকরি নিয়েছে, এইসব আর কি।

—গীতা মেয়েটি কেমন?

—ভালো। বেশ মিষ্টি আর শান্ত স্বভাবের।

—অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করবার মতো স্বভাব নয়?

—হ্যাঁ, তা বলতে পার। স্কুলেও কারো সাতে পাঁচ থাকতো না। নিজের কাজ শেষ করে আপনমনে বাড়ি চলে যেত।

—অর্থাৎ আর পাঁচজনের মতো গল্পবাজ মেয়ে নয়। চাল চলনেও উগ্রতার কিছু ছিল না?

—না বরং ঠিক তার উল্টোটা। অতি সাধারণ একটা লালপাড় শাড়ি পরে স্কুলে আসতো। অথবা হাল্কা ছাপা শাড়ি। প্রসাধনের বালাই পর্যন্ত থাকতো না। কিন্তু মেয়েটির চেহারার মধ্যে বেশ আভিজাত্য রয়েছে। ওকে দেখে তাই মনে হয়।

কথা কেড়ে নিয়ে নীল বলল,— তোর কী মনে হয় বেশ বড় ঘরের মেয়ে?

—হ্যাঁ, আর কোথায় যেন একটা চাপা দুঃখ লুকিয়ে আছে। এটাও বোঝা যায়।

— ব্যাপারটা কী?

— কেমন করে বলব? আমার সঙ্গে ওর সেরকম কোন অন্তরঙ্গতা ছিল না।

— বড় গোলমেলে ব্যাপার স্যাপার।

এরপর আর তেমন বিশেষ কথাবার্তা হল না। শীতের বিকেল দেখতে দেখতে অন্ধকারে ডুবে [গেল।] [illegible] নীলের মুখেও এক অন্য ধরনের অন্ধকারের ছায়া দেখতে পেলাম।

[illegible] চেঁচামেচিতে ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বেলা প্রায় আটটা। সাধারণতঃ [illegible] দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে না। কিন্তু গত রাত্রে শুতে আমাদের একটু দেরিই হয়েছিল। [illegible] চারবন্ধু একজায়গায় জড়ো হলে মন আর প্রাণ দৌড়তে শুরু করে। তবে নীল আমাদের [illegible] কিছুক্ষণ থেকেই উঠে গিয়েছিল। জানি ওর এখন মাথায় ঠিক আড্ডার মেজাজ নেই। আমরাও [illegible] ডাকাডাকি করে বিরক্ত করিনি। প্রায় রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ আড্ডা ভেঙে ঘরে [illegible] দেখি নীল জানলার ধারে পাতা ইজি চেয়ারে বসে একমনে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। [illegible] না করে 'শুচ্ছি' বলে আমি শুয়ে পড়েছিলাম। এ সময় হাজার প্রশ্ন করলেও ওর কাছ [থেকে] কিছুই জানা যাবে না।

তবে সোমনাথ রায়ের কেসটার মধ্যে এত ভাবার কী আছে তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। [illegible] কেন এতদূর কষ্ট করে এল সে ওই জানে।

[illegible] সকালেই ডিউটিতে চলে গিয়েছিল। ওর সঙ্গে দেখা হল না। আমি আর নীল চা খেয়ে [বেরিয়ে] পড়লাম।

রিকশাওয়ালাকে আমবাগান বলতেই ও চালিয়ে নিয়ে চলল। মিনিট খানেক দুজনে নীরবে প্রাকৃতিক [শোভা] দেখতে দেখতে চলেছি। হঠাৎ নীল বলে উঠল, — [illegible], আমি তোকে কয়েকটা প্রশ্ন করব [illegible]

— বেশ তো বল না। তবে কঠিন প্রশ্ন করিস না, পারব না। এখন [illegible]

আমার কথা এড়িয়ে ও বলল,— ধরা যাক সোমনাথ সুস্থ স্বাভাবিক।

বাধা দিলাম,— অসুস্থ এবং অস্বাভাবিক কে বলল তোকে?

— কেউ বলেনি এখনও। তাই বলছি সোমনাথের মতো স্বাভাবিক একজন লোক, যে ভালবেসে বিয়ে করেছে, স্ত্রীর সঙ্গে কোন গোলমালও চলছিল না, সে হঠাৎ কেন নিরুদ্দেশ হবে? কী কারণ থাকতে পারে?

— তোর এই প্রশ্নের উত্তরের আগে কিন্তু একটা জিনিস জানতে হবে। সোমনাথ কি সত্যি হারিয়ে গেছে নাকি কেউ তাকে লুকিয়ে রেখেছে?

— অর্থাৎ?

— মোটামুটি আমাদের বয়েসী একজন লোক হারিয়ে যেতে পারে না যদি না সে নিজে থেকে হারিয়ে যেতে চায়।

— আমি তো তাই বলতে চাইছি। হয় সোমনাথ ইচ্ছে করে কোথাও লুকিয়ে বসে আছে, নয়তো কেউ তাকে লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনটা হতে পারে?

— এমন তো হতে পারে, আমি বললাম, সোমনাথের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। হয়তো [illegible] টাকা দেনা করে ফেলেছিল, তাই পাওনাদারের তাগাদার ভয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে।

— কিন্তু বৎস, এক্ষেত্রে সে সম্ভাবনাটাকে আমি একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি।

— কেন?

— কারণ সে যদি সত্যিই নিজেকে লুকিয়ে রাখে তাহলে তার স্ত্রী সে সংবাদ জানবে।

— অর্থাৎ তুই বলতে চাইছিস, চিঠি দিয়ে হোক বা যে কোন ভাবেই হোক স্ত্রীকে সে সংবাদ দেবেই?

--হ্যাঁ দেবেই।

—আচ্ছা, নিজেকে লুকিয়ে রাখাব আর কোন সম্ভাব্য কাবণ থাকতে পারে না?

---কী রকম? নীল বেশ আগ্রহ নিয়েই জিজ্ঞাসা করল।

--সোমনাথেব জীবনে অন্য কোন মহিলা থাকতে পারে না কি?

– এ ক্ষেত্রে বোধহয় তা নয়। কাবণ গীতা বা তপতীর ভাবসান থেকে যতদূর বোঝা যায় সোমনাথ ঠিক ঐ ধবনেব লোক নয়। আর যদি হয় স্ত্রীকে লুকিয়ে এক আধদিন সেই মহিলার সঙ্গে গোপন দেখা সাক্ষাৎ কবতে পারে। কিন্তু মাসেব পব মাস? নাহ? তা হয় না।

—বিদেশে চাকরি বাকরি নিয়ে চলে যায়নি তো?

—আবোল তাবোল বকছিস। এবার আয় দ্বিতীয় পয়েন্টে। কেউ কি তাকে লুকিয়ে বেখেছে?

-- মোটিভ?

একটু গম্ভীর আব চিন্তিত স্বরে নীল বলল, —ঐ মোটিভটাই তো খুঁজে পাচ্ছি না। সোমনাথের না আছে বিত্ত না আছে প্রতিপত্তি। তাকে লুকিয়ে বেখে কার কী লাভ? এমন কী সোমনাথ বাজনীতিও কবে না।

---এত ডেফিনিট হচ্ছিস কী করে, ওকে বাধা দিয়ে বললাম, গোপনে ও হয়তো কোন রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে আছে। দলেব নির্দেশে ওকে হয়তো কিছুদিনের জন্য আন্ডাব গ্রাউন্ডে চলে যেতে হয়েছে

--না বে, প্রবল ভাবে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলল, কোন রাজনৈতিক দলের স্বার্থে সোমনাথ যদি আন্ডাব গ্রাউন্ডে গিয়ে কাজ কবে তাহলে তাব স্ত্রীর সাধারণ খোঁজখবব অন্তত পার্টিব ছেলের বাখবে। নিদেন পক্ষে তাকে একটা সংবাদও দিয়ে বাখতো যে সে বেঁচেবর্তে আছে।

--তাহলে? মবে টবে যায়নি তো?

সিগাবেট ছোট্ট একটা টান দিয়ে নীল বলল, --এদিকটাও যে আমি চিন্তা করিনি তাও নয়। কিন্তু একটা লোক মবে গেলে বা কেউ তাকে খুন কবলে তাব বডিটা তো থাকবে। সেটা গেল কোথায়?

- দেখছিস তো শহবটা কেমন নির্জন আব পাড়াগাঁ টাইপের। একটু ইনটিবিযাবে গেলে বনজঙ্গল থাকাও স্বাভাবিক। একটা লোকেব বডি মাটিতে পুঁতে বাখা খুব শক্ত বোধহয় হবে না

হতে পাবে, অন্যমনস্কের সুবে নীল বলল, কিছুই বুঝতে পাবছি না।

হঠাৎ বিকশাব গতি মন্থব হয়ে এল। বিকশাওযালা গাড়ি থামিয়ে বলল,---বাবু আমাবাগান এসে গেছি। কাব বাড়ি যাবেন?

--সোমনাথ বায়ের বাড়ি কোনটা জান?

-- কে সোমনাথবাবু?

ঐ যে একজন ভদ্রলোক দোকানে সেলসম্যানেব কাজ কবতে।

--না বাবু। কেমন দেখতে তেনাকে?

সোমনাথকে কিবকম দেখতে সে তো আমবাও জানি না। গীতাদেবীব বাড়ি যাবাব উদ্দেশ্য সোমনাথেব ছবি জোগাড় কবা। নীল প্রসঙ্গ পাল্টালো, বলল,- —আচ্ছা এদিকে একজন স্কুলের দিদিমণি থাকেন, চেনো তাঁকে?

ঐ মেয়েদেব স্কুলে পড়াতে যান তো?

-হ্যাঁ।

লোকটা হাত তুলে একটু দূবে একটা একচালা ছোট্ট ঘব দেখিয়ে দিল। নীল আর কিছু না বলে ভাড়া মিটিয়ে দিতে শুরু কবল।

গীতা বায বাড়িতেই ছিলেন। আমাদেব দেখে সাদবে নিজের ঘরে নিয়ে বসালেন। ছোট্ট ঘব। ছোট্ট সংসাব। কিন্তু সবই কেমন এলোমেলো। অগোছালো। বেশ বোঝা যায় গৃহকর্ত্রীর ঔদাসীন্য ছড়িয়ে

প্রায় সবত্র।

আমাদের দেখে কেমন যেন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বোধহয় চা জলখাবারের জন্যে। কিন্তু নীল ওকে বাধা দিয়ে বলল,—ওসব এখন থাক মিসেস রায়। আপনাকে কথা দিয়েছিলাম, এসেছি।

- একটু চা বসাই।

—আপনাদের কাজটা আগে শেষ করি, তারপর ওসব আর একদিন হবে। আপনি আমার ছবি রেখেছেন?

গীতা মুখে কিছু না বলে সামনের র‍্যাক থেকে একটা অ্যালবাম নিয়ে এল। আমাদের দিকে তার একটা পাতা খুলে এগিয়ে দিয়ে বলল,—ওর আর কোন সিঙ্গল ছবি আমার কাছে নেই। আমাদের বিয়ের এই ছবিটাই একমাত্র অবশিষ্ট। দেখুন এতে কোন কাজ হবে কি না।

নীল অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে ছবিটা দেখে আমার হাতে দিয়ে বলল,—ভালো করে দেখে নে।

—দেখলাম। কোন একটা স্টুডিওতে তোলা দুজনের বাস্ট ছবি। গীতাদেবীর চেহারা একই রকম আছে। বেশ শান্ত স্নিগ্ধ। সোমনাথকে দেখলাম। হৃষ্টপুষ্ট দোহারা গড়ন। কোঁচকানো চুল। ব্যাকব্রাশ করা। তীক্ষ্ণ নাক। খুব বড় বড় আর উজ্জ্বল চোখ। গায়ের রঙটা ছবি দেখে বোঝা যায় না। তবে কালো না। খুব ফর্সাও না। হঠাৎ নীলকে বলতে শুনলাম,—আপনার স্বামীর আর কোন খবর পাননি?

- না।

—উল্লেখযোগ্য আইডেন্টিফিকেশন মার্ক কিছু ছিল? মনে আছে?

কী যেন খানিক চিন্তা করলেন গীতা। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, ওর পিঠের বাঁদিকে একটা ছ ইঞ্চি সেলাই-এর দাগ আছে।

—পিঠে? মানে সেতো ঢাকাই থাকে সব সময়। আর কিছু মানে যা চোখে পড়ে?

—কই, তেমন কিছু তো মনে পড়ছে না।

—উনি চাকরি করতেন কোথায় যেন?

—সাউথ মার্কেটে, ওখানে গেলেই দেখতে পাবেন একটা সিনেমা হল রয়েছে। রূপমহল। রূপমহলের সামনেই অল ফাউন্ড। আপনাকে বেশি খোঁজাখুঁজির ঝামেলা করতে হবে না।

—দোকানের মালিকের নামটা জানেন?

—পুরো নামটা জানিনা। তবে ওর মুখে কয়েকবার শুনেছিলাম। বোধহয় গুঞ্জনবাবু হবে।

—গুঞ্জন? অদ্ভুত নাম তো? মালিকের নাম গুঞ্জন। দোকানের নাম অল ফাউন্ড। আচ্ছা, আর দুটো প্রশ্ন করব আপনাকে। সোমনাথবাবু কি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন?

—নাহ্, কোনদিনও ওর মুখে কোন রাজনীতির কথা শুনিনি।

—এমনও হতে পারে আপনাকে লুকিয়ে,

—ও আমাকে প্রায়ই একটা কথা বলতো, গীতা, তোমাকে কিছু গোপন করা মানে নিজেকে ঠকানো। ওর সেকথা আমি বিশ্বাস করি আজও। আমাকে ও কোনদিনই কিছু লুকোয়নি।

—সোমনাথবাবুর কোন শত্রু আছে বলে আপনার মনে হয়?

—একজন গরিব হতভাগ্য লোকের সঙ্গে শত্রুতা করে বার কী লাভ বলুন? কিন্তু এসব কথা কেন বলছেন নীলাঞ্জনবাবু?

নীল কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল,—আমি ওয়ার্স্টটাও চিন্তা করছি। হয়তো আপনার স্বামীর দ্বারা কারো কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটছিল অথবা উনি নিজের অজান্তেই কারো শত্রু হয়ে পড়েছিলেন। তাই সে হয়তো

গীতা প্রায় আর্তনাদের ভঙ্গিতে ভেঙে পড়ল, —না না, নীলাঞ্জনবাবু, ওর যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমি,

অযথা নীল ওকে সান্ত্বনা দিতে চাইল না, —নিজেকে একটু শক্ত করুন গীতা দেবী। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন আপনার স্বামী নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছেন। নইলে কেউ এভাবে

দীর্ঘ কয়েকমাস লুকিয়ে থাকতে পারে না। আচ্ছা ঠিক কত তারিখ থেকে উনি বাড়ি ফিরছেন না?

ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে গীতা বললেন,—বারই আগস্ট সকালে উনি যেমন দোকান যান তেমন গিয়েছিলেন। তবে বলে গিয়েছিলেন সেদিন আর ফিরবেন না। কারণ একটা ডেলিভারি দেবার কথা আছে। পরদিন দুপুরের মধ্যে ফিরে আসবেন। কিন্তু.

নীল উঠতে উঠতে বলল,—ঠিক আছে। আর এই মুহূর্তে আমার কিছু জানার নেই। পরে দরকার হবে। আজ উঠি।

সে কী? গীতা যেন একটু অবাক হলেন, যাবেন কোথায়? এখানে এসেছেন আমার কাছে, আপনি আমার অতিথি।

মিষ্টি করে হাসল নীল। তারপর বলল, —এখানে আমার এক বন্ধু থাকেন। পুরনো বন্ধু। আপাতত আমি ওখানেই উঠেছি। আর ঠিক এই অবস্থায় আপনাকে আমি বিব্রত করতে চাই না। দরকার মত আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব। আজ চলি।

বেরিয়ে আসতে আসতে নীল আর একটা প্রশ্ন করল,—আপনি কি এখানে এখন একাই থাকছেন?

প্রায় সেই রকমই। ঠিকে কাজের জন্য একটি মেয়ে আছে। সকাল বিকেল টুকিটাকি কাজ করে দিয়ে চলে যায়।

আর কিছু না বলে আমরা বেরিয়ে এলাম। রিকশা পেতে দেরি হল না। রিকশায় উঠে নীল বলল—সাউথ মার্কেট।

আজ ছুটির দিন না। সাউথ মার্কেট বেশ জমজমাট। দোকানপাট সব খোলা। 'অল ফাউন্ড' খুঁজে পেতে একটুও অসুবিধা হল না। রূপমহলের ঠিক সামনেই। সাজানো স্টেশনারি দোকান। একটি ছোকরা বয়েসের সেলসম্যান কাউন্টারে বসে রয়েছে। আমরা যেতেই উঠে দাঁড়ালো।

কী দেব বলুন?

ব্লেড আছে?

হ্যাঁ আছে। কী ব্লেড?

—সেভেন ও ক্লক্ বা উইলকিনসন।

ছোকরা একটু হেসে বলল, —আছে স্যার। একটা দিশি কোম্পানির ব্লেড এখানে খুব চলছে। সেভেন শার্প। কামিয়ে আনন্দ পাবেন।

ঠিক আছে। তাহলে একটা সেভেন শার্প দিন।

ছোকরা ব্লেডের বাক্স বার করল। তেইশ চব্বিশের মতই বয়েস। রোগা পাতলা চেহারা। বেশ হাসিখুশি স্বভাবের। চুলগুলো মডটাইপের ছাটে কাটা। জামাকাপড় বেশ ফিটফাট। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নীল বলল, —আপনি বোধহয় রিসেন্টলি জয়েন করেছেন?

ব্লেড বাছতে বাছতেই ছেলেটি বলল,—হ্যাঁ, মাস তিনেক হবে। কেন বলুন তো?

এর আগে আমি যখন এদিকে এসেছিলাম তখন অন্য এক ভদ্রলোককে দেখেছিলাম, তিনি কি আর বসেন না?

— আপনি কার কথা বলছেন বুঝতে পারছি না?

সোমনাথবাবুকে চেনেন আপনি?

- না, আমি ঠিক বলতে পারব না। এই নিন স্যার, ব্লেড, ব্যবহার করে বলবেন কেমন জিনিস

ব্লেড নিয়ে দাম দিতে দিতে নীল বলল, —ঠিক আছে বলব। গুঞ্জনবাবু কোথায়? ওঁকে তো দেখছি না।

নীলের মুখে গুঞ্জনবাবুর নাম শুনে ছেলেটি সম্ভবত ভাবল নীল এই দোকান সম্বন্ধে অনেক কিছু খবরই রাখে। তাছাড়া নীলের হাবভাব দেখে বোঝাও যায় না ও এই প্রথম এই দোকানে এসেছে

ছোকরাটি চেঞ্জ দিতে দিতে বলল, —গুঞ্জনদা তো এখন এখানে নেই।

নেই? কোথায় গেছেন?

মাঝে মাঝেই উনি কলকাতায় যান। অর্ডার টর্ডার ধরার ব্যাপার থাকে।

এবার কদ্দিন হল গেছেন?

দিন দশেক হবে।

ফিরবেন কবে?

—বলতে পারব না। হয়তো আজই এসে পড়তে পারেন, নয়তো দু'তিন দিন পর আসবেন।

তাহলে দোকানের ভার এখন কার ওপর?

কেন, হরিদাসবাবু আছেন, ম্যানেজার। ছোটনলাল আছে।

ছোটনলাল কে?

দারোয়ান।

ওদের তো দেখছি না কাউকে।

ছোটনলাল বোধহয় বাজারে গেছে। হরিদাসবাবুকে আপনি ফ্যাক্টরিতে পাবেন।

ফ্যাক্টরি? কিসের ফ্যাক্টরি?

কেন আপনি জানেন না। গুঞ্জনবাবু তো সিঁদুর আলতা নেলপালিশ এই সব প্রোডাক্ট তৈরি করেন।

ফ্যাক্টরিটা কোথায়? একটু হরিদাসবাবুর সঙ্গে কথা বলে যেতাম।

—দোকান থেকে নেমে বাঁদিকে দেখবেন একটা গলি রয়েছে। গলির সামনে দাঁড়িয়ে একদম সোজা গেলেই যে বাড়িটা দেখবেন সেটাই ফ্যাক্টরি।

নীল এবার বোধহয় আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়ল, —কিন্তু ওটা তো গুঞ্জনবাবুর বসত বাড়ি।

হ্যাঁ, নিচের তলাটায় উনি ঐ সব করেন।

অন্য খদ্দের এসে গিয়েছিল। আর কিছু না বলে ছোকরাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নীল বাইরে বেরিয়ে এল।

ছোকরা তখন কাউন্টারে থেকে বলছে,—স্যার আপনার নামটা বললে গুঞ্জনবাবুকে বলতে পারতাম।

হাঁটতে হাঁটতেই নীল বলল,—ঠিক আছে, বলার দরকার নেই। নাম বললে উনি হয়তো আমাকে চিনবেন না।

ছোকরার নির্দেশমতো বাঁ দিকের গলিতে ঢুকে গেলাম। গলিটা খুব চওড়া নয়। আবার একেবারে সরুও না। শেষের বাড়িটার কাছে গিয়ে ফ্যাক্টরি দেখলাম। একটা গ্যারেজ মতো লম্বা চওড়া ঘর। তিন চারটে ছেলে জামাকাপড়ে লাল রঙ মেখে আলতা তৈরি করছে। একজন বোতলে পুরে ছিপি এঁটে পাশে এগিয়ে দিচ্ছে। আর একজন ছিপি আর বোতলের গায়ে লেবেলিং করছে। এরই নাম ফ্যাক্টরি।

আমাদের অযাচিতভাবে ঢুকতে দেখে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের সারা হাতে লাল রঙ মাখানো। জামাকাপড়েও সেই অবস্থা।

তর্জনি মুড়ে নাকের উপর ঝুলে পড়া চশমাটা সেট করতে করতে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, —কী? কি চাই আপনাদের?

খ্যানখেনে কাকতাড়ুয়া গলা। অভ্যর্থনা নয় বরং অনধিকার প্রবেশের জন্য যেন জবাব চাওয়া হচ্ছে।

নীল মৃদু হেসে বলল,—হরিদাসবাবুকে একটু ডেকে দেবেন?

আগের মতই উদ্ধত ভঙ্গিতে বললেন,—আমিই হরিদাসবাবু। কী দরকার?

—ও আচ্ছা নমস্কার। আপনি এখন খুব ব্যস্ত আছেন?

—নেশা করছি না বা তাস পিটছি না সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। কী দরকার বলে ফেলুন।

একটু আমতা আমতা করার ভঙ্গিতে নীল বলল,—না মানে আমরা তো অনেক দূর থেকে এসেছি।

সেই কলকাতা থেকে। তাই,

বেশ রাগত সুরে হরিদাসবাবু বললেন,—তাই? তো আমায় কী করতে হবে?

—একটা বিশেষ দরকারে আপনারা কাছে আসা।

—কিন্তু আপনাবা কে? আপনাদের তো ঠিক চিনতে পাবলাম না।

—কী কবে চিনবেন? আপনি কি আর আমায় দেখেছেন? আমার বন্ধু সোমনাথ রায় এখানে চাকরি করতেন সেই জন্যেই।

—সোমনাথ? মানে সেই কাউন্টারে যে বসতো? তা তাকে আর পাবেন কোথায়?

—কেন সে কি চাকরি ছেড়ে দিয়েছে?

—বলতে পারেন একরকম তাই।

—আপনাব কথা আমি ঠিক বুঝলাম না।

এবার আর একদফা ঝাঁঝালেন হবিদাসবাবু,—আপনি তার বন্ধু বললেন, না? কী বকম বন্ধু?

—স্কুলে একসঙ্গে পড়াশুনো কবতাম।

—অ, স্কুল ফ্রেন্ড। খুবই দুঃখেব সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি আপনাব বন্ধুটি একটি চোব।

—অ্যাঁ?

—হ্যাঁ! প্রায় পাঁচ ছমাস আগে একদিন কোম্পানিব কিছু মালপত্তব নিয়ে উনি সেই যে ডেলিভারির নাম কবে হাওয়া হয়ে গেলেন তারপব থেকে তাঁব কোন পাত্তাই নেই। তাব বৌটিব সঙ্গে দেখা হয়নি?

—হয়েছিল। কিন্তু তিনি তো এসব কিছু বললেন না।

—ও মাগী সব জানে, কিন্তু কিস্সু বলবে না। চোর কা বউ সে তো ছ্যাচবানি হবেই।

ভদ্রলোক উত্তেজিত এবং যথেষ্ট অভদ্র হয়ে উঠেছেন। নীল অন্য রাস্তায় প্রশ্ন করল,—পাঁচ ছমাস আগের কথা বলছেন?

—অত কি হিসেব কবে বেখেছি? আন্দাজে ঐ বকমই হবে।

—তা কতটাকার মাল ছিল সোমানাথের কাছে?

—হাজাবখানেক তো বটেই।

—মাত্র হাজাব টাকার জন্যে ও চাকরি ছেড়ে চলে যাবে?

—সেই কথা বলে কে? আরে শালা তোব টাকাব দরকার পড়েছে মালিকেব কাছে চা। অমন সজ্জন মালিক। চাইলেই পেতিস। তা নয় একেবারে সব শুদ্ধ হাপিস। ছ্যা ছ্যা ছ্যা।

—চুবি করেছে এরকম ভাবছেন কেন? তাব কোন বিপদ আপদও হতে পারে তো?

—গুষ্টির মাথা হয়েছে। বিপদ আপদ হলে একটা খবব দিত। না খবব না মাল। একেবারে বামাল সমেত হাওয়া।

প্রশ্ন পাল্টালো নীল,—আপনিই তো এখানকার ম্যানেজার?

—কেন আপত্তি আছে?

—না। আচ্ছা, দোকান বা ফ্যাক্টবিব এই সব জিনিসপত্র ইনসিওর কবা নেই?

—ইনসিওব কবা থাকলে কী হবে? টাকা কি কখনও পুরো পাওয়া যায়? তাবপব লোকটাবই তো কোন হদিস নেই। আমবা তো প্রমাণ কবতে পাবছি না যে সোমনাথ মাল চুবি কবে হাওয়া হয়ে গেছে?

—কেন? সোমনাথকে দিয়ে আপনাবা কোন গুড্স বিসিভিং চালানে সই কবিয়ে নেননি?

দুম্ কবে এ বকম একটা টেকনিকাল প্রশ্ন শুনবেন, হবিদাসবাবু বোধহয় সেটা আন্দাজ কবতে পারেননি। আবাব ঝুলে পড়া চশমাব ওপব দিয়ে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে নীলকে বললেন, —ঠিক কবে বলুন তো আপনাবা কে? কোত্থেকে আসছেন?

নীলেব মুখটা নিমেষে পাল্টে গেল। সে সোজা নিজেব পার্স থেকে আইডেনটিটি কার্ডটা বাব কবে হবিদাসবাবুব চোখেব সামনে মেলে ধবল। হরিদাসবাবু হঠাৎই কেমন যেন মাটিব মানুষ হয়ে গেলেন।

গলার সুর গেল পাল্টে, বললেন,—অ, তাই বলুন স্যার। ছি ছি, আপনারা আগে বলবেন তো। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বসুন স্যার।

নীলের গলা কিন্তু একই রকম। ও বলল,—আমরা বসতে বা আপনার সঙ্গে খোসগল্প করতে আসিনি হরিদাসবাবু। একটা জলজ্যান্ত লোক প্রায় চার সাড়ে চার মাস আগে থেকে নিখোঁজ। আপনার কথা অনুসারে সে কোম্পানির কাজে আউট স্টেশন ডিউটি দিতে গেল। আর আপনারা তার কোন খবর রাখার প্রয়োজন মনে করছেন না। এটাই ভাববার ব্যাপার।

—আপনি ভুল বুঝছেন স্যার। আমরা সোমনাথের অনেক খোঁজ করেছি। ওর বাড়িতেও বারবার লোক পাঠিয়েছি। কিন্তু কোথাও ওকে খুঁজে পাইনি।

—পুলিসকে খবর দিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ স্যার। কিন্তু তারাও আজ পর্যন্ত কোন খবরাখবর করতে পারেনি।

—সোমনাথ যে চুরি করে মাল নিয়ে সরে পড়েছে এ রকম ধারণা হল কেন?

—এ ক্ষেত্রে আর কী বলা যায় আপনিই বলুন? গরিব মানুষ, হয়তো অতগুলো টাকার লোভ সামলাতে পারেনি। তাই আমাদের ঐটাই ধারণা হয়েছে।

—আপনাদের মালিক কোথায়?

—আজ্ঞে কলকাতায় গেছেন অর্ডার সিকিওর করতে। আগে সোমনাথ যেত, এখন ওঁকেই যেতে হচ্ছে।

—মালিকের নামটা কী?

—আজ্ঞে গুঞ্জন সোম।

—কবে ফিরবেন?

—দু-একদিনের মধ্যেই। মানে সেই রকমই কথা আছে।

—ঠিক আছে। উনি ফিরলেই আবার আসব।

কারখানা থেকে বেরিয়ে এলাম। একটা রিকশায় উঠে বলল,—থানায় চল। প্রথমে লোকটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর কী মনে করে সোজা প্যাডেলে চাপ দিল।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে নীল বলল,—কেসটা জটিল মনে হচ্ছে। ম্যানেজার হরিদাস হয়তো সোমনাথ সম্বন্ধে আরো খবর রাখে। কিন্তু ভাঙল না। কারখানার কিছু তৈরি প্রোডাক্ট নিয়ে সোমনাথ ট্রাকে গুড লোড করল। যাবে কলকাতায়। কিন্তু তারপর থেকে তার আর কোন হদিশ নেই। এমন কিছু বেশি টাকার মাল ছিল না। মাত্র হাজার টাকা। তার জন্য এরা তাকে চোর বলে। সেই মর্মে খুব সম্ভবত পুলিসের ডায়েরি করিয়েছে। এবং ইনসিওরেন্স ক্লেমও করেছে। কিন্তু ইনসিওরেন্স ক্লেম করতে গেলে গোডাউনের খাতায় সোমনাথের রিসিভিং সিগনেচার থাকা প্রয়োজন। হয়ত সেটাও করানো আছে। কিন্তু লোকটা কোথায়? লোকটা যদি একা হত ভাবা যেত সে হাজার টাকার লোভ সামলাতে না পেরে সরে পড়েছে। কিন্তু ঘরে তার বিয়ে করা বউ আছে। বউকে সে ভালবাসে। অভাবের সংসার হলেও লোকটা তার স্ত্রী কাছে ছিল বিশ্বস্ত। অসহায় স্ত্রীকে ফেলে রেখে মাসের পর মাস লুকিয়ে থাকা, না রে কোথাও না কোথাও একটা গণ্ডগোল রয়েছে।

থানা এসে গিয়েছিল, আমরা সটান গিয়ে থানা অফিসারের খোঁজ নিতে একজন কনস্টেবল আমাদের নিয়ে অফিস ঘরে বসালেন।

ছোট্ট থানা। আর পাঁচটা থানার মতই। একটু পরেই অফিসার ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন। বেশ লম্বা ছিপছিপে ইয়াং ম্যান। বছর চল্লিশের মধ্যে বয়েস হবে। ব্যাকব্রাশ করা চুল। হ্যাণ্ডসাম। ভদ্রলোক বাঙালি।

চেয়ারে বসতে বসতে উনি বললেন, —হ্যাঁ, বলুন কী করতে পারি আপনাদের জন্য?

বিনাবাক্যব্যয়ে নীল আইডেনটিটি কার্ডটা দেখালো। ভদ্রলোকের সুন্দর মুখে সামান্য হাসির ঝিলিক দেখা গেল। বললেন,—আই সি। দেন ইউ আর দি ফেমাস প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর নীলাঞ্জন ব্যানার্জি?

আপনার নাম আমি কাগজে দেখেছি। বলুন, হঠাৎ এই অধমের আস্তানায় কী মনে করে? নট্‌ ..
রাইট, আমার নামটা বোধ হয় আপনার জানা নেই। আমি শ্যামল লাহিড়ী।

বলেই উনি হাত এগিয়ে দিলেন। নীলও আন্তরিকতার সঙ্গে ওর হাতে হাত মেলালো। তারপর বলল, —একটা দারুণ রহস্যজনক সমস্যায় পড়ে আপনার দ্বারস্থ হয়েছি মিস্টার লাহিড়ি। আপনার একটু সময় নষ্ট করব।

শ্যামল লাহিড়ী বেশ অপ্রস্তুতের সুরে বললেন,—না, না মিস্টার ব্যানার্জি, এসব আপনি কী বলছেন! আপনার মতো একজন লোক বিনা কারণে বা অযথা আমার কাছে সময় নষ্ট করতে আসবেন, আমি ভাবতে পারি না। বলুন আপনার রহস্যজনক প্রবলেমটা। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাকে সাহায্য করতে।

শ্যামলবাবুর কথায় সরল আন্তরিকতার সুর স্পষ্ট। নীল কোন রকম ভূমিকায় সময় নষ্ট না করে সোমনাথ রায়ের ঘটনাটা আদ্যোপান্ত খুলে বলল।

মাথা নিচু করে শ্যামলবাবু সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। নীল ওর বক্তব্য শেষ করতেই হাতে টেবিলঘণ্টি বাজালেন শ্যামল লাহিড়ী। একজন কনস্টেবল এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াতেই উনি চায়ের ফরমাস করলেন। তারপর নিজের নিভন্ত চুরোটে অগ্নিসংযোগ করতে করতে বললেন, —মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি হয়ত প্রথমেই প্রশ্ন করবেন, সোমনাথ রায়ের কেসটা নিয়ে আমরা কোন ইনভেস্টিগেশন করেছি কিনা? হ্যাঁ করেছি। দাঁড়ান, পুরনো ডায়েরিটা বার করি।

ফাইল কীপার কনস্টেবলকে ডেকে উনি আগস্টের ডায়েরি বই আনালেন। পাতা খুলে বললেন, এই দেখুন, মিসিং সোমনাথ রায়ের জন্য দুজন খোঁজ চেয়েছেন। একজন ওর স্ত্রী গীতা রায়। দ্বিতীয় ব্যক্তি মিস্টার গুঞ্জন সোম। ওর দোকানের মালিক। আপনার কাছে মিথ্যে বলে লাভ নেই কেসটা এখনও আনসলভড্ হয়েই আছে। কারণ মিসিং সোমনাথের কোন ট্রেসই এখনও পাওয়া যায়নি।

নীল বলল, আপনারা হসপিটালে নিশ্চয়ই খবর নিয়েছিলেন?

অফকোর্স। কিন্তু লোকাল হসপিটাল এই নামে কোন মিসিং অর ডেড পার্সনের খবর দিতে পারেনি।

লোকাল হসপিটালে কোন রেকর্ড নাও থাকতে পারে। কিন্তু ডাক্তিগাড টু হাওড়া দেয়ার আর সো মেনি হসপিটালস্।

হাসলেন শ্যামল লাহিড়ী। বললেন, সেটা কি আর আমার পক্ষে সম্ভব? আমার নিজের এলাকা নিয়েই আমি এত ব্যস্ত।

--কিন্তু ঘটনাটা আপনারই এলাকার।

- মানছি। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে উঠতে পারি না। আমার এই চেয়ারটা এমনিই। তার ওপর নিত্যি নতুন উৎপাত লেগেই আছে।

চা এসে গিয়েছিল। খেতে খেতে নীল হঠাৎ প্রশ্ন করল, -সেইদিন, মানে বারোই আগস্টের দিন বা তার দু একদিনের মধ্যে আশে পাশে কোন খুন জখম বা অ্যাকসিডেন্টের খবর আছে?

একটু চিন্তা করে শ্যামল লাহিড়ী বললেন,---খুন জখম ঐ দু-একদিনের মধ্যে এই এলাকায় ঘটেছে এমন রেকর্ড আমার খাতায় নেই তবে রানিগঞ্জের কাছে একটা অ্যাকসিডেন্টের খবর আছে।

- অ্যাকসিডেন্ট? কী রকম?

- রানিগঞ্জ স্টেশন ছাড়িয়ে প্রায় দুতিন কিলোমিটারের মধ্যে একটা ডেড বডি পাওয়া গিয়েছিল।

--করে?

--প্রায় আপনার সোমনাথবাবু নিখোঁজ হবার সময়েই। সোমনাথবাবু তো বারই আগস্ট এখান থেকে চলে যান। তের তারিখ দুপুরে রেললাইনের ধারে একটা জলা জায়গায় কয়লা খনির এক কুলির ছেলে থেৎলানো একটা মৃতদেহ আবিষ্কার করে।

- -তারপর?

—তারপর অবশ্য কেসটার কী হয়েছিল সে খবর আমি রাখিনি। কারণ ওটা আমার এলাকার

...নয়।

এই খবরটাই বা আপনি পেলেন কী ভাবে?

রানিগঞ্জের স্টেশনমাস্টার আমার ভগ্নিপতি। ওর কাছেই খবরটা পেয়েছিলাম। আচ্ছা, মিস্টার ...আপনি কী মনে করেন সেই ঘটনার সঙ্গে সোমনাথের নিখোঁজ হওয়ার কোন যোগসূত্র আছে?

এ কী কখনও বলা যায়? ডিটেলস্ না জেনে কিছুই বলা সম্ভব নয়। আপনার ভগ্নিপতির নামটা ...?

কেন? আপনি সেখানে যাবেন নাকি?

যেতে ইচ্ছে করছে। অনেক সময় ছাইগাদায় সোনার টুকরো পড়ে থাকলেও থাকতে পারে।

তা ঠিক। দেখুন কী হয়। ভদ্রলোকের নাম দিবাকর ভট্টাচার্য। ভদ্রলোক এমনিতেই মাই ডিয়ার ...। আমার নাম বললে সে সাগ্রহে আপনাকে সাহায্য করবে।

ধন্যবাদ, বলে নীল উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, অল ফাউন্ডের মালিক গুঞ্জন সোমের হোয়ার ...অ্যাবাউটস্ কিছু জানা আছে?

তেমন কিছু নয়। তবে প্রয়োজন পড়লে নিশ্চয়ই জোগাড় করতে পারি।

থ্যাঙ্কইউ, বলে নীল আর দাঁড়ালো না। কারণ ঘড়ি তখন একটার কাঁটা ছুঁই ছুঁই করছে। রাস্তায় ... নীল বলার আগেই ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, —তোর একটা ঘটনা মনে আছে নীল?

—বুঝেছি কী বলবি। উপমা দেবীর গল্প তো? তুই বোধহয় উপমার প্রেমে পড়েছিস।

—না ঠিক উপমার গল্প নয়। শ্যামলবাবুর মুখে অ্যাকসিডেন্টের কথা শুনে হঠাৎ একটা খবর মনে পড়ে গেল।

কী খবর?

গত পনেরই আগস্ট সকালের কাগজে উপমার স্বামী রঞ্জনের অ্যাকসিডেন্টের খবর বেরিয়েছিল।

তার সঙ্গে এর কী সম্বন্ধ?

না বলছিলাম, যদি কোন সূত্র পাওয়া যায়।

তোর চিন্তাটা যে একেবারে অমূলক তা বলছি না। তবে এ পাড়ায় কাঠাল পাকলে ও পাড়ার ...র একাদশীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবেই এমন গ্যারান্টি নেই, দেখা যাক।

রানিগঞ্জ ছুটবি কখন?

পারলে আজই যাব। শান্তর কাছ থেকে ট্রেনের টাইমটা জেনে নিতে হবে।

গাড়ি যেতে যেতে আর কোন কথা হল না। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা মৌটুসি পৌঁছে গেলাম। প্রায় ...টো নাগাদ শান্ত বাড়ি ফিরল। হালকা হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়েই বিকেলটা কেটে গেল। মাঝে একবার ...তো সোমনাথের কথা তুলেছিল। কিন্তু নীল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে শান্তকে প্রশ্ন করল, ...রে, রানিগঞ্জে যাবার কোন ট্রেন আছে আজকে?

শান্ত যেন আকাশ থেকে পড়ল, —রানিগঞ্জ? সেকিরে? তোর আবার সেখানে কী দরকার পড়ল?

—আছে পরে বলব। আজ কোন ট্রেন আছে কিনা বল? রাতের দিকে?

—রাত্রে। হ্যাঁ আছে ৩২০ ডাউন মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার। ৮টা ৪৬-এ ভক্তিগড়ে থামে।

—পৌঁছতে কতক্ষণ লাগে?

—প্রায় সাড়ে এগারোটা বেজে যাবে।

পৌনে বারোটার মধ্যেই রানিগঞ্জে পৌঁছে গেলাম। শীতের রাত। স্বভাবতই যাত্রীর ওঠানামা কম। ট্রেনটা ছেড়ে দিতেই স্টেশনটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। আমরা গুটি গুটি পায়ে স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে এগোলাম।

মাস্টার মশাই মানে দিবাকর ভট্টাচার্য তখন বাড়ি যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। নীল গিয়ে ...জের পরিচয় দেবার আগেই ভদ্রলোক একগাল হেসে বলে উঠলেন, —শ্রী নীলাঞ্জন, তাইতো?

আমি অবাক হলেও নীলকে কিন্তু তেমন অবাক হতে দেখলাম না। সেও পাল্টা হেসে বলল —শ্যামলবাবু বোধহয় ফোন করেছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। শ্যামলদার মুখে আমি আপনার এখানে আসার কারণ কিছুটা শুনেছি। চলুন

—কোথায়?

—পাশেই আমার কোয়ার্টার। জমিয়ে বসা যাবে আর আপনার সব কথা শোনা যাবে।

—কিন্তু আজ রাতের মতো একটা হোটেলের ব্যবস্থা তো আগে করতে হয়।

—এতটা অভদ্র আমায় ভাবলেন কী করে মশাই? একে আপনি নামকরা গোয়েন্দা। তার ওপর শ্যামলদার কাছ থেকে আসছেন। চলুন মশাই চলুন। এখানে এত রাতে ঠাণ্ডায় জমার থেকে বাড়ি গিয়ে জমিয়ে বসে শোনা যাবে।

কথাটা সত্যি। ডিসেম্বরের শেষ। রানিগঞ্জের ঠাণ্ডাও বেশ জমাট। নীল দ্বিরুক্তি করল না দিবাকরবাবুর সঙ্গে ওর বাড়ি গিয়ে উঠলাম।

দিবাকরের সংসার বড় নয়। স্ত্রী আর একটি মেয়ে। আমাদের সঙ্গে ওঁর স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিলেন মহিলা সত্যিই সুন্দরী। বয়েসও বেশি নয়। ত্রিশের কাছে। দিবাকরের মতই ওর স্ত্রী রুমা দেবীও হাসিখুশি আর মিশুকে স্বভাবের।

আমাদের বসতে বলে অত রাত্রেও উনি চলে গেলেন চা করতে। ইতিমধ্যে দিবাকর বাঙালির অতি অকৃত্রিম লুঙ্গি আর আলোয়ান মুড়ি দিয়ে এসে বসলেন চৌকিতে। আমরা ওর সামনে ছোট্ট সোফাটায় বসে ছিলাম।

জমিয়ে বসে ভদ্রলোক শুরু করলেন, —এবার বলুন নীলাঞ্জনবাবু, কী আপনি জানতে চান? তবে আগে বলুন, আগে খাওয়া দাওয়া করবেন, না কাজের কথা সারবেন?

—তার মানে? নীল অবাক হয়ে বলল, আপনি কী করতে চাইছেন?

—দেখুন মশাই, চিরকাল কলকাতায় মানুষ হয়েছি; এখানে থাকি প্রায় নির্বান্ধব পুরীতে। আপনাদের মতো রোমাঞ্চকর লোককে সামনে পেলে আপনি কী ভেবেছেন সহজে ছেড়ে দোব?

— কিন্তু আমি তো একটা বিশেষ কাজে আপনাকে বলতে গেলে বিরক্তই করতে এসেছি।

প্রাণখোলা দরাজ হাসিতে ভদ্রলোক হেসে উঠলেন, —আরে মশাই, আমি তো বিরক্ত হতেই চাইছি এরপর দেখুন না আপনার একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত, হ্যাঁ মশাই ভক্তের ফেমিনাইন কী? ভক্তা? কে জানে বাংলায় আমার জ্ঞান কম। সে যাই হোক, সেই গুণমুগ্ধাটি এবার আসছেন।

—আমার গুণমুগ্ধা? এখানে? কে তিনি?

—এলেই বুঝবেন। নিন মশাই শুরু করুন। আপনারাও ভেতো বাঙালি। জিজ্ঞাসা না করেই রুমাকে ভাতের অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। নিন নিন স্টার্ট করুন।

—কিন্তু, এত রাত্রে, আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ জানালাম, কাল সকালে হলে হত না?

দিবাকরবাবু আমাদের নিমেষে নস্যাৎ করে দিলেন, —দেখুন মশাই, ডাক্তার আর স্টেশন মাস্টার এদের কাছে অধিক রাত বলে কিছু নেই। নিন স্টার্ট করুন।

অগত্যা নীল ওর কাহিনী শুরু করল। দিবাকরবাবু এমনিই একজন লোক যার কাছে নীল বোধহয় ইচ্ছে করেই কিছু গোপন করল না। সোমনাথের নিরুদ্দেশ হবার ঘটনা থেকে শুরু করে রানিগঞ্জে দিবাকরবাবুর কাছে আসা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই খুলে বলল।

দিবাকরবাবু এমনিতে প্রাণখোলা লোক হলেও সিরিয়াস কিছু সিরিয়াসলি নিতে জানেন। মাথা নিচু করে কথার মধ্যে একটাও কথা না বলে, এক মনে নীলের সব কথা শুনছিলেন। আমিও বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ঘটনার পুনরাবৃত্তি শুনছিলাম। হঠাৎ চুড়ির ঝিমঝিম শব্দে তিনজনেরই চমক ভাঙল।

নিঃসন্দেহে রুমা দেবী সুন্দরী। ওঁর দাদা শ্যামলবাবুও সুপুরুষ। কিন্তু এ মহিলা কে? হাতে ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ঘরের রঙটাই যেন নিমেষে পাল্টে গেল। ঘোর লাল রঙের লেডিজ শাল। চাঁপা রঙের

একদম কালোর বুটি দেওয়া সিল্কের শাড়ি। কিন্তু এসব কিছু না। হাতের কিছুটা অংশ আর মুখটুকুই ঘোমটার বাইরে দৃশ্য-গ্রাহ্য। ঐটুকুই যথেষ্ট ঘরের রঙে পরিবর্তন আনতে। এত উজ্জ্বল গৌরবর্ণের মহিলা খুব সম্ভবত আমি এর আগে দেখিনি। আর রূপ! সে বর্ণনা এখন থাক। তবে আমি ওঁর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবার মতো সংযম দেখাতে পারলাম না।

হঠাৎ দিবাকরবাবু অবস্থার মোড় ঘোরালেন। আবার সেই প্রাণখোলা হাসি।

—এসো এসো, ফাউ গিন্নী এসো। ছি ছি তোমার দিদির কোন আক্কেল বিবেচনা নেই। রাজনন্দিনীর হাতে ট্রে ধরিয়ে দিয়েছে। বলেই উনি উঠে গিয়ে ট্রেটা নামিয়ে নিলেন। তারপর আমাদের উদ্দেশ করে বললেন, —ঐ যে একটু আগে বলছিলাম আপনার একজন গুণমুগ্ধা আছেন, ইনিই তিনি। শ্রীমতি নন্দিনী মুখার্জি। আমার একমেবাদ্বিতীয়ম্ শ্যালিকা মানে মাসতুতো ফাউগিন্নী।

নন্দিনী বোধহয় লজ্জা পেলেন, —আঃ, জামাইবাবু!

আমার মুগ্ধতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। নন্দিনী কেবল রূপেই রাজনন্দিনী নন। ওঁর কণ্ঠস্বরটাও অনেকটা জলতরঙ্গের সুরে বাঁধা।

হঠাৎ নীলের দিকে আমার নজর পড়ে গেল। সাধারণত মেয়েদের ব্যাপারে ও একটু উদাসীন থাকে। কিন্তু এবারে আমাকে অবাক হতে হল। এ কোন নীলকে আমি দেখছি। বিনা প্রয়োজনে ও কখনই কোন, যত সুন্দরীই হোক তার দিকে তাকিয়ে থাকে না। কিন্তু এ যে প্রায় বিভোরের মতো তাকিয়ে থাকা। ওর অদ্ভুত সুন্দর ভাসাভাসা চোখদুটো পলকহীন। নির্বাক হয়ে যেন এক সুন্দর প্রতিমাকে প্রাণ ভরে দেখছে। ওর দৃষ্টিতে কোন অশোভনের ইঙ্গিত নেই কিন্তু যা আছে তা হল মুগ্ধতার বিস্ময়।

আমাদের দুজনের ধ্যান ভাঙল দিবাকরের গলা খাঁকারিতে, —নন্দিনী ইনিই হচ্ছেন নীলাঞ্জন ব্যানার্জি যার কথা তুমি এই ভদ্রলোক মানে অজেয় বসুর গল্পে পড়েছ। তোমার অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল আলাপ করার। এবার আলাপ করে নাও।

নন্দিনী হাত তুলে আমাদের নমস্কার জানালেন। আমরাও প্রতি নমস্কার করলাম। নন্দিনীকে যতটা সলজ্জ হতে দেখেছিলাম কথাবার্তায় উনি কিন্তু ততটা সলজ্জ নন। বরং বেশ সপ্রতিভ। কোন রকম কুণ্ঠা না করেই বললেন, —জামাইবাবু, ওঁরা একটা বিশেষ দরকারে আপনার কাছে এসেছেন। এই সময় আমি যদি আলাপ করতে বসি তাহলে ওঁদের কাজের কাজ কিছুই হবে না। কী বলেন, নীলাঞ্জনবাবু, তাই তো?

হায় বিধাতা। যে চৌকস ছেলেটি জীবনের যে কোন সাংঘাতিক বিপদের মুহূর্তে নিজের কাণ্ডজ্ঞান হারায় না, হারায় না তার সহজাত উপস্থিত বুদ্ধি, যাকে আমি এই বয়েসের আর পাঁচজন ছেলের তুলনায় বুদ্ধিমান বলে ভাবি, আজ তার একি লোপবুদ্ধির বিড়ম্বনা। এই কি তবে, মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম? নীল কোন কথা বলতে পারছে না কেন? ওর তাৎক্ষণিক দুর্বলতা চাপা দিতে আমিই বলে উঠলাম, —না না, আপনি ইচ্ছে করলেই আমাদের এই আসরে থাকতে পারেন। আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

অদ্ভুত এক রহস্যময় হাসির স্বল্প ইঙ্গিত ছড়িয়ে পড়ল নন্দিনীর সারা মুখে। দরজার দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বললেন, —দিদি একলা সব খাবার যোগাড় করছেন। আজ কাজের লোক আসেনি, আমি যাই।

চলে গেলেন নন্দিনী। নাঃ, নীলটা ডোবালো। মনে মনে যখনি এই কথা ভাবছি তখনই দেখি নীল আবার নীলাঞ্জন ব্যানার্জি হয়ে গেছে। সব জড়তা কাটিয়ে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, —সবই তো শুনলেন দিবাকরবাবু। এবার আপনার কাছে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

—বেশ তো করুন।

—আমার এতদূরে আসার কারণ একটাই। বারোই আগস্ট সোমনাথ ভক্তিগড় ছেড়ে চলে যায়। ওদের কারখানার ম্যানেজার হরিদাসবাবুর উক্তি অনুসারে সোমনাথের সেদিন কলকাতায় আসার কথা। সোমনাথের স্ত্রীর জবানবন্দি অনুসারে সোমনাথ সেদিন রাতের ট্রেনে কলকাতা আসছিল। কিন্তু তারপর থেকে তাকে আর পাওয়া যায়নি। এদিকে তেরই আগস্ট আপনারা এই রানিগঞ্জ স্টেশনে কাছাকাছি

একটি মৃতদেহ আবিষ্কার করলেন। মৃতদেহটা কার?

—আমাদেব পবিচিত কেউ নয়। মানে এর আগে লোকটাকে আমি দেখিনি।

—ঠিক কী অবস্থায় তাকে আপনারা আবিষ্কার করেন?

—একেবাবে দোমড়ানো মোচড়ানো এবং থ্যাঁৎলানো অবস্থায় বডিটা পাওয়া যায়।

--কাবণ কিছু অনুমান কবতে পারেন? মানে ঠিক কী ভাবে তার মৃত্যু হয়েছে?

– ঠিক কী ভাবে মৃত্যু হয়েছে তা বলতে পাবব না। তবে মনে হয় চলন্ত ট্রেনের ধাক্কা লেগে ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে তাব মৃত্যু হতে পারে।

—আচ্ছা দেখুন তো, বলে নীল পকেট থেকে সোমনাথ আর গীতার যুগ্ম ছবিটা বার করে দিবাকর হাতে দিয়ে বলল, ছবিব এই ভদ্রলোকের সঙ্গে মৃতদেহের কোন মিল খুঁজে পাচ্ছেন কিনা।

দিবাকববাবু ছবিটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, —নাহ্, মশাই, এ তো দিব্যি চিমছাম ভদ্রলোকেব ছবি। আব যে বডিটা পাওযা গিয়েছিল তার তো কিছুই চেনা যাচ্ছিল না। মুখটা থেঁতলে বীভৎস আকাব ধাবণ করেছিল। মাথার খুলি গিয়েছিল উড়ে। তাবপর দেহেব নানান জায়গায় কেরো পাথুবে খোয়া ঢুকে গিয়েছিল।

—অ্যাকসিডেন্টটা কতক্ষণ আগে ঘটেছিল বলে আপনাব মনে হয়েছিল?

—সঠিক বলতে পাবব না। তবে পুলিসেব ডাক্তাব নাকি বলেছিলেন পনের ষোল ঘন্টা আগে তাব মৃত্যু ঘটেছিল।

—বডিটা কে প্রথম দেখেছিল?

—স্থানীয এক কুলিব ছেলে।

--লোকটিব সঙ্গে কোন জিনিষপত্র পাওযা যায? এই ধরুন স্যাটকেস বা ঘড়ি আংটি?

- আমি ঠিক বলতে পাবব না। কাবণ পুলিস কেস টেক আপ করাব পব আমাদের আব কিছু কবাব থাকে না। তবে এই ব্যাপাবে আমি হয়তো আপনাকে কিছু হেল্প কবতে পারি। কেসটা তো এখন পুলিসেব আন্ডাবে। আমি খবব যোগাড় কবে দিতে পাবি।

--বেশ তাই করুন। আমাব দুটি জিনিস জানাব আছে। ডেড বডি কি শেষ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছিল আব যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটি কাব? ও হ্যাঁ, আবো একটা প্রশ্ন, মৃতেব সঙ্গে কী কী জিনিস পাওয়া যায়।

-খববটা কখন চান?

– আজ পেলে কালেব কথা ভাবতাম না।

দিবাকববাবু ঘড়িব দিকে তাকালেন। বাত তখন প্রায় সাড়ে বাবোটা। হতাশভাবে তিনি বললেন —আজ থাক নীলাঞ্জনবাবু। কাল ভোব পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এতদিন যখন কেটেছে

—ঠিক আছে। তাই হবে। সবাই কি আমাদেব মতো নিশাচব?

মিষ্টি একটা গানের আওযাজে ঘুমটা ভেঙে গেল। ধীবে ধীবে চোখ খুলতে দেখলাম দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে ভোবেব আলো এসে পড়েছে ঘবেব মধ্যে। ডানদিকে মুখ ঘোবাতেই দেখি একটি বছর চাবেকেব ফুটফুটে মেয়ে অবাক দৃষ্টিতে আমাব দিকে চেয়ে আছে। কালবাত্রে এব সঙ্গে দেখা হয়নি বুঝলাম এ দিবাকবতনযা। হাত বাড়িয়ে কাছে ডাকলাম। মেয়েটি ছুটে ঘর থেকে পালালো। কিন্তু পবক্ষণেই ফিবে এল, বলল, —কী বলছ?

--তোমাব নাম কী?

—মুনমুন।

—তুমি বুঝি এই বাড়িতেই থাকো?

--বাবে, এটা তো আমাদেব বাড়ি। তাহলে থাকব কোথায?

- তা তো বটেই। তুমি বুঝি খুব ভোবে ঘুম থেকে ওঠো?

—হ্যাঁ। তুমি কে?

—আমি কে? বড় সাংঘাতিক প্রশ্ন। এই মেয়েকে আমি কী করে বোঝাবো। এ জগতে 'কে আমি'র ঠিক ব্যাখ্যা কেউ করতে পারেনি। তবু সংক্ষেপে বললাম, আমি তোমার এক কাকু।

—ধ্যাৎ আমার কোন কাকুই নেই।

মুনমুন বোধহয় আরো কিছু বলতো। কিন্তু তার আগেই ঘরে ঢুকলেন রুমা দেবী, —মেয়ে বুঝি খুব বিরক্ত করছে?

—না না, বিরক্ত করবে কেন? গল্প করছিলাম।

—নিন, এবার উঠে পড়ুন, অনেক বেলা হয়ে গেছে। বেডটি খাবেন তো।

—পাগল? বলেই আমি বিছানা ছাড়লাম। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পারলে ভাল হোত। মুনমুন বলে উঠল, —আমি যাব মা?

—না, তুমি পারবে না। মাসিমণিকে বল এনে দেবে। মুনমুন চলে গেল।

রুমা দেবী বললেন, —আপনার বন্ধু তো সকালে উঠেই বেরিয়ে গেছেন।

—ঐ ওর স্বভাব। যে কাজটা হাতে নেবে সেটার জন্যে নাওয়া খাওয়া সব ভুলে যায়।

রুমা দেবী হাসলেন। তারপর বললেন, —হ্যাঁ গুণী লোকের স্বভাবই তাই।

জলের গ্লাস হাতে নন্দিনী ঘরে ঢুকলেন। কাল রাতের রজনীগন্ধাকে আজ ভোরের মালতী বলে মনে হল। বোধহয় একটু আগে স্নান সেরেছেন। মিষ্টি সাবানের হালকা গন্ধ এখনও ছড়িয়ে পড়ছে। গতরাত্রের আমার বিহ্বল অবস্থাটা এখন অনেকটা কেটে গেছে। বেশ সহজ ভাবেই বললাম, —আপনার গানের গলাটাও বেশ মিষ্টি।

আমার হাতে গ্লাসটা দিতে দিতে বললেন, —কী করে বুঝলেন আমি গাইছিলাম?

—সাধারণত সুন্দর কিছু আমি একবার দেখলে বা শুনলে ভুলি না। আপনার কণ্ঠস্বর কাল রাতে আমি শুনেছিলাম। আজ গানের কলি শুনেই মনে হল এ আপনি না হয়ে যায় না।

হাসতে হাসতে রুমা দেবী বললেন, —হ্যাঁ ভাই, গান ও খুব ভালোই গায়। এ মাসেই তো ওর একটা টিভি প্রোগ্রাম ছিল।

—তাই নাকি? অবশ্য টিভি আমি ঠিক অ্যাটেণ্ড করতে পারি না। তবে জানা রইল এবার দেখে শুনব।

—তোরা গল্প কর। আমি জলখাবারের ব্যবস্থা করি, বলেই রুমা দেবী বেরিয়ে গেলেন।

ঘরের মধ্যে এখন আমি আর নন্দিনী একা। তিনজন থাকতে আমার যে সহজ ভাবটা এসেছিল রুমা দেবী চলে যেতেই আবার পুরনো সঙ্কোচটা ফিরে আসতে চাইল। সেটা কাটালেন নন্দিনী, —এখন কী লিখছেন? নতুন কোন নীল গোয়েন্দার কাহিনী?

—না, একটা সিরিয়াস লেখায় হাত দেবার আগে একটু মগজ সাফাই করছি।

—সিরিয়াস মানে সিরিয়াস উপন্যাস না অন্য কিছু।

—হ্যাঁ উপন্যাসই। তবে সিরিয়াস। হাল্কা গোয়েন্দা নীলের কাণ্ডকারখানা নয়।

—গোয়েন্দা নীল বুঝি খুব হাল্কা লোক?

—না, মোটেও না। কারণ নীল নিজেই অত্যন্ত সিরিয়াস। তবে এ উপন্যাসটা আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে নিয়ে লেখা।

—বই বের হলে কিন্তু আমাকে এককপি পাঠাতে হবে।

—নিশ্চয়ই।

—আচ্ছা অজেয়বাবু, আপনার বন্ধু কী খুব অহংকারী?

—না, কে বললে আপনাকে?

—কেউ না। মনে হল তাই বলছি।

—ভুল। ওর সঙ্গে আলাপ হলে বুঝবেন, তারুণ্যের আবেগে ওর প্রাণ সর্বদাই টগবগ করে ফুটছে।

—আমার তো ভীষণ গম্ভীর বলে মনে হল।

—দুদিন থাকলেই বুঝতে পারবেন ধারণাটা একদম ভুল।

—দুদিন কি আপনারা থাকবেন? যান, মুখ হাত ধুয়ে আসুন। চা নিয়ে আসছি।

বলেই নন্দিনী চলে গেলেন। আমাকে রেখে গেলেন এক ধাঁধায়। তবে কী?

স্নানটান সেরে গরম গরম লুচি বেগুনভাজা খেয়ে মুনমুনকে মাঝে রেখে আমি আর নন্দিনী কোয়ার্টারের সাজানো বাগানে ঘুরছি। হঠাৎই হুড়মুড় করে এসে পড়ল নীল। দিবাকরবাবু ফেরেননি। সকালের একটা ট্রেন পাস করিয়েই উনি ফিরবেন।

নীল একবার আড়চোখে আমাদের দেখে ক্ষণিক অন্যমনস্ক হয়েছিল। তবে তা মুহূর্তের জন্যে। সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ও বলল, —অজু রেডি হয়ে নে, পরের গাড়িতেই ভক্তিগড় ফিরতে হবে।

—এখানকার কাজ শেষ?

—আপাতত, বলেই ও এক লহমার জন্যে নন্দিনীকে দেখল। নীলের সঙ্গে কথা বললেও দৃষ্টি আমার নন্দিনীর দিকেই ছিল। কারণ, নন্দিনী, নীল আসার পর একবারের জন্যেও নীলের মুখের থেকে চোখ সরায়নি। নীল ওর দিকে তাকাতেই, আমি স্পষ্ট দেখলাম নন্দিনী ওর দৃষ্টি সরালোই না। আমার একবার মনে হল ও যেন কিছু বলতে চাইছিল নীলকে। কিন্তু নীল ততক্ষণে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

এরপর আমরা দিবাকরের বাড়ি ছিলাম আরো ঘণ্টা দুয়েক। এই দু ঘণ্টায় সোমনাথের রহস্যজনক অন্তর্ধানের বিন্দুবিসর্গ চিন্তা আমার মাথায় ছিল না। আমি কেবল নানান ছুতোয় দুটি নারী-পুরুষের বিচিত্র না বলা কথার খেলা লক্ষ করে গিয়েছি।

দিবাকর আর তাঁর স্ত্রীর অতুলনীয় আতিথ্য, দুজন প্রায় অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে তাঁদের ভদ্রতা এবং অন্তরঙ্গতা সত্যিই ভোলার না।

বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ ভক্তিগড়গামী একটা ট্রেন এসে থামল রানিগঞ্জে।

স্টেশনে এসেছিলেন দিবাকর, মুনমুন আর নন্দিনী। ট্রেন ছেড়ে দেবার মুহূর্তে আমি যদি মানব চরিত্রের বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারি তাহলে বুঝেছিলাম এক অব্যক্ত সূচনার বিচিত্র খেলা।

ট্রেন ছাড়তেই ওঁরা তিনজনেই হাত নেড়েছিলেন। নন্দিনীর সঙ্গে নীলকে আমি কোন কথা বলতে দেখিনি। নন্দিনীও না। তবু বোধহয় নীরবে অনেক কথা হয়ে রইল ওদের। সাক্ষী আমি।

দু ঘণ্টা ট্রেনে বসে থেকেও নীলকে আমি একটাও প্রশ্ন করিনি। কেননা ও চুপচাপ। আমি জানি ওর মাথায় এখন দুটো গভীর চিন্তা। এ আমি হলফ করে বলতে পারি। তবু ভক্তিগড়ে নেমে রিকশায় উঠে একটা কথা না বলে পারিনি, —শেষ কালে রানিগঞ্জেই রানি খুঁজে পেলি?

নীল সিগারেট ধরিয়ে গভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে ফিরে বলল, —তুই একটা শয়তান।

বিকেলের দিকে শান্ত আর তপতীকে নিয়ে অজয়ের ধারে গেলাম। এমনিতেই একমাত্র বর্ষাকাল ছাড়া অজয় জলহারা হয়ে থাকে। এখন শীতকাল। বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে সোনালি বালির চর ছড়িয়ে রয়েছে। এতক্ষণ চারজনেই একসঙ্গে হাঁটছিলাম। বোধহয় তপতীর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। এই সময় সবারই হয়। ওরা দুজনে বালির ওপরেই বসে পড়ল। তাদের রেখে খানিকটা এগিয়ে গিয়েই নীলকে জিজ্ঞাসা করলাম, —কিন্তু কী হল বললি না তো?

—কিসের কী হল?

—সকালে যে অতক্ষণ ঘুরে এলি দিবাকরবাবুকে নিয়ে, কাজ কিছু হল?

নীল সরাসরি সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আমাকেই পাল্টা প্রশ্ন করল, —পনেরই আগস্টের কাগজে তোদের পাড়ার রঞ্জনের মৃত্যু সংবাদ বেরিয়েছিল তাই না?

—হ্যাঁ, তোকে তো খবরটা বলেছিলাম।

—হয়তো বলেছিলি। কিন্তু তখন ঠিক ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিইনি। রঞ্জনবাবু সম্বন্ধে তুই কী জানিস?

—এমন কিছু নয়। জাস্ট পাড়ার লোক। তাও ওদের বাড়ির সদর দরজা সম্পূর্ণ উল্টো দিকে

অর্থাৎ বাড়ির পিছন দিকটাই আমাদের নজর পড়ে।

—ভদ্রলোক কী করতেন?

—সঠিক জানি না। তবে কাগজে লিখেছিল উনি নাকি কোন একটা হোটেলের মালিক ছিলেন।

—আচ্ছা রঞ্জনের মৃত্যুটা কিভাবে হয়েছিল?

—কাগজের রিপোর্ট অনুযায়ী, অ্যাকসিডেন্ট।

—অ্যাকসিডেন্ট? কিন্তু কী ধরনের অ্যাকসিডেন্ট?

—চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে ওনার নাকি মৃত্যু হয়।

শুনলে ব্যাপারটা তোর হয়তো কাকতালীয় মনে হবে। রেল স্টেশন ছাড়িয়ে যে মৃতদেহটা পাওয়া গিয়েছিল সেটা রঞ্জনেরই মৃতদেহ।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, এবং ওঁর স্ত্রী আই মিন উপমা দেবীই তাঁর স্বামীকে শনাক্ত করেন।

—কিন্তু রঞ্জনবাবু এখানে কেন এসেছিলেন?

—ভক্তিগড়ে নাও আসতে পারেন। হয়তো অন্য কোন জায়গা থেকে ফিরছিলেন।

—মৃত্যুর কারণ কী?

—মৃতের স্টমাকে পাওয়া গিয়েছিল অত্যাধিক পরিমাণে অ্যালকোহল। তার মানে একটাই। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে ভদ্রলোক বেসামাল অবস্থায় ট্রেনের কামরা থেকে গড়িয়ে পড়ে যান অথবা ঐ অবস্থায় ওঁকে কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়।

একটু চুপ করে থেকে আমি বললাম, —তা না হয় হল। কিন্তু তুই এখন রঞ্জনবাবুকে নিয়ে পড়লি কেন? ওটা তো আর তোর ব্যাপার না। সোমনাথের কেস কতদূর এগুলো বল?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নীল বলল, —না রে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। একটা আশা নিয়ে গিয়েছিলাম রানিগঞ্জে। কিন্তু সেখানেই কোন আলোর রেখা দেখতে পেলাম না।

—তাহলে তুই বলছিস রানিগঞ্জ গিয়ে তোর কোন লাভই হল না?

—জায়গাটা কেবল ঘোরা ছাড়া কিছুই হল না।

—কোন লাভ হল না বলছিস?

এতক্ষণে আমার ইঙ্গিতটা নীল ধরতে পারল। ঠাঁই করে একটা চাঁটি কষিয়ে বলল, —আমি মরছি আমার জ্বালায় তুই এখন উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করলি, এই রে,

—কি হল?

—সিগারেট নেই। দে একটা।

বুঝলাম ও এখন নন্দিনী প্রসঙ্গ এড়াতে চাইছে। আমি মৃদু হেসে সিগারেট এগিয়ে দিলাম।

সন্ধে হয়ে আসছিল। ঠাণ্ডাও বাড়তে শুরু করছে। ওপাশ থেকে শান্ত আর তপতী হাত নেড়ে ফিরে আসার জন্যে তাগাদা লাগাচ্ছিল। অতঃপর ফিরতেই হল। দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। নীলের কোঁচকানো ভ্রু কুঁচকেই রয়েছে। ওর মুখটা বর্ষার আকাশের মতো থমথম করছে। বেশ বুঝতে পারছি নীল এখন বেশ ফাঁপরে পড়েছে। প্রথমে কেসটা যতটা সহজ হবে ভেবেছিল এখন বোঝা যাচ্ছে ঘটনাটা বেশ জটিল। পাগলের মতো ও দিনরাত কোথায় কোথায় যেন ঘুরে বেড়ায়। আমাকেও সঙ্গে নেয় না। বললেই বলে, তুই একটা ডিসটার্বিং এলিমেন্ট। তোকে নেওয়া মানে বোঝার ওপর কুমড়োর বস্তা চাপানো।

নীল আমাকে ঘোরাঘুরির হাত থেকে বাঁচিয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমার তো অবস্থা সঙ্গীন। বলতে গেলে চিরকালই কলকাতায় থেকেছি। আর কলকাতার মানুষ যতই কেন নির্জনতা পছন্দ করি কিছুদিন নির্জনতায় থাকলেই প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। আমার আর ভাল লাগছিল না। কেবলি মনে হতে লাগল করে কলকাতায় ফিরে যাব। নীলকে কিছু বলতে গেলেই ও বলে উঠবে —একান্তই যদি তোর খারাপ লাগে তবে ফিরে যা। সেটাও পেরে উঠি না।

মাঝে মাঝে তপতী ঠাট্টা করে। আমার মুখ থেকে নন্দিনীর ঘটনাটা শোনার পর থেকে ও প্রায়ই নীলকে খেপায়, তদন্ত করছে না ছাই করছে, দেখ ও এখন নন্দিনীর রূপসাগরে ডুবে হাবুডুবু খাচ্ছে।

নীল কিছু বলে না। হেসে নিজের কাজে বেরিয়ে যায়। ঠিক তিনদিন পর কোত্থেকে যেন হন্তদন্ত হয়ে এল। হাঁক ডাক করে তপতীকে ডেকে বলল, —ম্যাম, আজ রাতের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।

তপতীর মতো আমিও অবাক হয়ে বললাম, —সে কিরে আজ রাতেই চলে যাবি?

—হ্যাঁ যেতেই হবে। কলকাতা আমায় ভীষণভাবে টানছে।

—কিন্তু এদিকে?

—হল না। পারলাম না। সোমনাথকে খুঁজে বার করা আমার সাধ্য নয়।

ভূতের মুখে রামনাম শোনার মতো আমি চমকে উঠলাম। নীল বলে কী? শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়ে ও হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে? কল্পনাও করতে পারি না নীলের মুখে এমন কথা আমায় কোনদিন শুনতে হবে। তবু বললাম, —কিন্তু তুই গীতাদেবীকে কথা দিয়েছিলি।

একটু ঝাঁঝিয়ে উঠে নীল বলল, —না, আমি কোন কথা দিইনি, বলেছিলাম চেষ্টা করব। করেছি, পারিনি। ডিসক্রেডিট আমার। আর কিছু বলার আছে?

এরপর আর কোন তর্ক করা চলে না। নীলের বর্তমান অ্যাটিটিউড দেখে শান্ত ব তপতীও অন্য প্রসঙ্গে ঠাট্টা করতে আর সাহস পেল না।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে ও ওর নোটবুকে অনেকক্ষণ ধরে হিজিবিজি কাটল। একমনে পরের পর সিগারেট খেল। ঠিক চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, —চল একটু বেরুতে হবে।

কোথায় কেন জিগ্যেস করার সাহস হল না। ওর গায়ের রঙের মতই ওর মেজাজটা এখন গনগনে হয়ে আছে। পাঞ্জাবি পরাই ছিল। শালটা গায়ে মুড়ি দিয়ে ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

তপতী জিজ্ঞাসা করল, —কোথায় যাচ্ছ নীল?

—স্টেশনের দিকে। সামান্য কিছু খাবার করে রাখিস। সাতটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব।

ব্যস। আর কোন উত্তর না দিয়ে ও রাস্তায় নামল। রিকশায় উঠেই বলল, —সাউথ মার্কেট।

বুঝলাম। ও এখন চলেছে 'অল ফাউন্ড'। আবার কী দরকার পড়ল কে জানে, তবে সোমনাথ যে ওর মগজ থেকে সরে যায়নি এটা নিশ্চিত।

দোকান থেকে একটু এগিয়ে গিয়ে গাড়িটা দাঁড় করাল। ভাড়া মেটাল। তারপর হন্‌হন্ করে দোকানের পাশে সেই গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ম্যানেজার হরিদাসবাবু আজও আলতা মেখে একটা টেবিলের সামনে মোটা খাতা খুলে ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখছিলেন। নীল প্রায় নিঃশব্দে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎই বলে উঠল, —হিসেব দেখছেন নাকি?

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে চশমার ওপর দিয়ে তাকালেন। নীলকে দেখেই শশব্যস্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, —স্যার আপনি?

—কেন। আসতে বারণ নাকি?

—কী যে বলেন? তবে কিনা, মালিক তো এখন নেই।

—নেই মানে, আবার কী ভক্তিগড় ছেড়ে চলে গেছেন?

—না স্যার। একটু আমবাগানের দিকে গেছেন।

—আমবাগান? কেন?

—ঐ আপনার গীতাদেবীর হাজব্যান্ড ফিরেছেন কি না তাই দেখতে।

—গীতাদেবীর হাজব্যান্ড ফিরেছেন কি না তাই দেখতে স্বয়ং মালিককে যেতে হবে?

—না স্যার। দারোয়ান ব্যাটা কদিন ধরে জ্বরে পড়ে আছে। এদিকে আমরাও সব ব্যস্ত। তাই উনি নিজেই চলে গেলেন।

—হাজার টাকার শোকে?

—না স্যার। শুধু হাজার টাকা হবে কেন? দোকানের স্টক নিতে গিয়ে এখন অনেক জিনিস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মানে হিসেব মতো মাল নেই ঘরে।

—এতদিন পরে হিসেব নেবার সময় হল?

—হবে না? সামনেই ইয়ার এন্ডিং। ছমাস অন্তর আমাদের স্টক চেকিং হয়।

—সোমনাথবাবুই সব নিয়ে কেটে পড়েছেন, এই আপনার ধারণা?

হাত কচলে হরিদাস বললেন, —অযথা কেন আমাকে দোষারোপ করছেন স্যার। আরে ঐ তো উনি এসে গেছেন, বলেই দরজার দিকে চোখ ফেরালেন।

যুগপৎ আমি আর নীল দরজার মুখে আগন্তুককে দেখলাম। এবং প্রায় আমার অজান্তেই আমার মুখ থেকে এটা শব্দ বেরিয়ে এল, 'আরে এ কিরে?'

কিন্তু ঐ টুকুই। নীল একটা চিমটি কেটে আমাকে বুঝিয়ে দিল আর কোন রকম কোন অবাঞ্ছিত শব্দ যেন আমার মুখ থেকে না বের হয়। আমি চুপ করে গেলাম। আগন্তুক ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বললেন, —হরিদাসবাবু, এঁদের তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

—ঐ যে স্যার আপনাকে সেদিন সকালে বললাম।

—ও, আই সী। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর নীলাঞ্জন ব্যানার্জি, বলেই হাত বাড়ালেন।

নীল ওর হাত এগিয়ে বলল, —অসময়ে আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম।

—না না ঠিক আছে। আমার বিরক্ত হবার কিছু নেই। কারণ যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি কলকাতা ছেড়ে এখানে এসেছেন মনে মনে আমারও ঠিক একই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বাই হুক অর ক্রুক সোমনাথকে আমার খুঁজে পেতেই হবে। হি ইজ আ চিট্। আমার অনেক টাকা সে লোকসান করে দিয়ে গেছে। আসুন আসুন ভেতরে আসুন। হরিদাসবাবু তিনকাপ চা পাঠিয়ে দিন।

বাক্স পেটরা আর শিশিবোতলের স্তূপ ডিঙিয়ে উনি আমাদের নিয়ে গেলেন সংলগ্ন একটি ঘরে। বোধহয় অফিস ঘর। টেবিল চেয়ার, আলমারি, খাতাপত্তর, টেলিফোন সব কিছুই আছে।

টেবিলের ওপাশে একটা গদি-আঁটা চেয়ারে উনি বসলেন। ওঁর সামনের পাতা দুটো চেয়ারে আমরাও বসলাম।

কোটের পকেট থেকে সিগারেট বার করতে করতে বললেন, —গরিব মানুষকে চাকরি দোব কী? এই তো দেখুন না, এসে হাতে পায়ে ধরল, ভদ্রলোকের মতো চেহারা। যাহোক লেখাপড়াও কিছু জানতো। ভাবলাম শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে আমারও কাজ চলবে ছোকরারও একটা হিল্লে হবে। দেখুন এখন আমাকেই বাঁশ দিয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল। তা খোঁজ-টোজ কিছু পেলেন?

খুব গম্ভীর হয়ে নীল বলল, —না, আর বোধহয় তাকে পাওয়াও যাবে না।

—কেন? হঠাৎ এরকম কথা বলছেন কেন?

—না এমনই। আচ্ছা গুঞ্জনবাবু সোমনাথবাবুর কী নেশাটেশা করার অভ্যাস ছিল?

বেশ বিরক্ত হয়ে গুঞ্জনবাবু বললেন, —ছিল না আবার? গরিবের ছেলের ঘোড়া রোগ হলে যা হয়। কতদিন দিনদুপুরে মদ খেয়ে কাউন্টারে বসতো। ডিসগাস্টিং। আমি তো শেষের দিকে ঠিকই করেছিলাম ওকে টাকা-পয়সা দিয়ে ছাঁটিয়ে দোব। আরে মশাই ওর জন্যে আমার বাণিজ্য খদ্দের নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

—আর কোন ব্যাড হ্যাবিট?

—কী করে বলব মশাই? নিজের ব্যবসা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। তার ওপর আবার কর্মচারীদের ব্যক্তিগত জীবনের হিসেব রাখা কী পোষায়?

হঠাৎ নীল প্রসঙ্গ বদলালো, —আচ্ছা আপনি কি প্রায়ই কলকাতায় যান?

—হ্যাঁ, কাজের জন্যে যেতে হয় বৈকি।

—কোথায় ওঠেন?

—হোটেলে-টোটেলে।

—ওখানে আপনার কোন আত্মীয় স্বজন নেই?

—না।

—আপনার স্ত্রী কি এখানেই থাকেন?

—এখনও ওপাটটি সেরে উঠতে পারিনি।

—তারমানে আপনি মুক্ত পুরুষ?

—একরকম তাই বলতে পারেন। তবে একটি মহিলাকে বেশ পছন্দ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত হয়তো-

চা এসে গিয়েছিল। খেতে খেতে নীল বলল, —সোমনাথবাবু কত টাকার মতো জিনিস নিয়ে গিয়েছিলেন আন্দাজ আছে?

—প্রায় হাজার দশেকের মতো।

—সেকি! হরিদাসবাবু বললেন যে হাজার খানেকের মত।

—ও একটা আকাট। দিনরাত আফিম খেয়ে থাকে, ওটাকেও তাড়াবো।

তদন্তের ক্ষেত্রে নীলের একটা স্বভাব আমি প্রায়ই লক্ষ করেছি ও দুমদাম প্রসঙ্গ পাল্টায়। এবারও পাল্টালো। বলল, —গুঞ্জনবাবু আপনার ব্যক্তিগত ইনসিওরেন্স কত টাকার মতো হবে?

আচমকা এই বিদঘুটে প্রশ্নে গুঞ্জনবাবু হঠাৎ কেমন যেন থতমত খেলেন। তারপর মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, —হঠাৎ কেন এই প্রশ্ন?

নীল হেসে বলল, —না না, ভয় নেই। একটা ছোকরা আমাকে অনেকদিন থেকে ইনসিওর করবার জন্যে জ্বালাচ্ছে। ওর মতে সারাদেশের অন্তত শতকরা আটানব্বই জন পলিসি হোল্ডার। ব্যাপারটা যাচাই করবার জন্যে আমি সামান্য পরিচিত লোককেও প্রশ্নটা করি। কিছু মনে করবেন না। এটা এখন আমার প্রায় মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে।

গুঞ্জনবাবু নীলের কথা কতটা বিশ্বাস করলেন জানি না কেবল সংক্ষেপে জানালেন ওঁর নিজের ব্যক্তিগত ইনসিওরেন্স নেই। তবে কোম্পানির আছে।

এরপর মামুলি দু-একটা কথার পর আমরা উঠে দাঁড়ালাম। ঠিক বেরুনোর মুখে আবার নীলের ছন্নছাড়া প্রশ্ন, —সোমনাথের মার্ক অব আইডেন্টিফিকেশানের কিছু আপনার জানা আছে?

একটু ভেবে গুঞ্জনবাবু বললেন, —না তেমন কিছু মনে পড়ছে না। তবে খুব সম্ভব ওর বাঁ হাতে একটা উল্কির দাগ ছিল।

—দাগটা কী রকম, পাল্টা প্রশ্ন করল নীল।

—ওর নামের প্রথম দুটো অক্ষর 'সোম' এই কথাটা মনে হচ্ছে যেন দেখেছি।

থ্যাঙ্ক, তাহলে আজ চলি।

-মিস্টার ব্যানার্জি, আপনার কি মনে হয় সত্যিই সোমনাথকে খুঁজে পাওয়া যাবে না?

নীল কয়েক সেকেন্ডের জন্যে সরাসরি গুঞ্জনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, —মনে হচ্ছে পেয়ে গেছি।

- এই একটু আগে বললেন পাওয়া যাবে না আবার বলছেন পেয়ে গেছি!

—দুটোই কারেক্ট।

শীতের রাতের কুয়াশা ভেদ করে ৩২০ ডাউন মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ছুটে চলেছে। নীল ওর স্বভাব অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর টিকিটই কেটেছে। কামরার স্বল্প নীলচে আলোয় ওর মুখের গতি প্রকৃতি বোঝা যাচ্ছিল না। তবে ও যে বেশ চিন্তিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কামরায় লোকজনের সংখ্যাও কম। যারা ছিলেন তাঁরাও প্রায় ঘুমন্ত।

চিন্তার উইপোকাটা আমার মাথাটাও কুরে খাচ্ছিল। মাত্র একটা প্রশ্ন আমার মগজে তোলপাড় কাণ্ড বাঁধিয়েছে। ভেবেছিলাম 'অল ফাউন্ড' থেকে বেরিয়ে নীলকে প্রশ্নটা করব। কিন্তু কিছুতেই ওকে যুৎসই

েকলা পাইনি।

'আল ফাউন্ড' থেকে বেরুতেই দেখা হয়ে গেল শ্যামল লাহিড়ীর সঙ্গে। উনি কিছুতেই ছাড়লেন না. আসলে বোধহয় ওঁর ভালো লেগে গেছে নীলকে। আর সোমনাথের রহস্যময় অন্তর্ধানের একটা সঠিক সমাধান পুলিস হিসাবে বোধহয় ওর কাম্য। কেননা ঘটনাটা ওঁরই এলাকায়। ভদ্রলোক টেনে নিয়ে গেলেন একেবারে ওঁর কোয়ার্টারে। নীলকে কোন রকম আপত্তি করতে দেখলাম না। একবার বলল 'তুই বরং বাড়ি ফিরে যা অজু, আমি শ্যামলবাবুর সঙ্গে দু একটা কথা সেরেই আসছি' বলেই ও চলে গিয়েছিল।

মাধ্যাকর্ষণের প্রবল আকর্ষণের থেকে কোনমতেই প্রিয়সন্দর্শনের আকর্ষণ কম নয়। তার প্রমাণ স্বয়ং নীল। শ্রীমতি নন্দিনীও কোন এক দুর্বোধ্য আকর্ষণে বানিগঞ্জ ছেড়ে এখন ভক্তিগড়ে ওঁর মাসতুতো দাদার কাছে অবস্থান করছেন। অতএব, নীল যেহেতু সংযমী মহামুনি নন, তিনিও যৌবনের অনিবার্য আকর্ষণে অকৃত্রিম বন্ধুকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। একেই বলে ভাগ্য।

ট্রেনে ওঠার আগে পর্যন্ত ও নানান ভাবে ব্যস্ত ছিল। এখন যখন ট্রেন হু-হু করে ছুটে চলেছে সময় নষ্ট না করে প্রশ্নটা করেই ফেললাম, —এটা কী করে সম্ভব হয় নীল?

—কোন্‌টা?

—তোর মনে আছে 'আল ফাউণ্ডে' একবার আমি 'একিরে' বলে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলাম।

—কী বলতে চাইছিস?

—রঞ্জনবাবুর মৃত্যুসংবাদ যদি আমি জানতে না পারতাম তাহলে গুঞ্জনবাবুকেই রঞ্জন বলে ডেকে ফেলতাম। অর্থাৎ দুজন মানুষের মধ্যে এত সিমিলারিটি আসে কিভাবে?

—কেন জগতে প্রায় একই রকম দেখতে দুজন লোক হতে পারে না?

—প্রায় একই রকম, আর হুবহু এক, দুটোর মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই অনেক।

—তা বটে, কিন্তু রঞ্জনবাবুকে তুই কতটুকু চিনতিস?

—এমন কিছু নয়। ওই দূর থেকে দেখা আর কী?

—দূর থেকে দেখেই তুই দুজনের চেহারা এক বলে দিলি? তাও মাত্র কয়েকবারের জন্য দেখা এবং তোর চোখে হাই মাইনাস। তোর ভুলও হতে পারে।

নীলের যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারছি না। আমি গোয়েন্দা নীল না হতে পারি, আমার চোখে হাই মাইনাস পাওয়ার থাকতে পারে, তাই বলে এতটা ভুল হবে? কে জানে?

বাইরের অন্ধকারে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেছে। হঠাৎ নীল জিজ্ঞাসা করল, —তোর উপমার খবর কিরে?

—আমার উপমা মানে?

—ঐ হল আর কী? সেদিন যেন কী একটা কথা বলব বলব করছিলি,

একটু থেমে ধীরে ধীরে বললাম, —বড় নোংরা কথা রে? বলতেও ইচ্ছে করে না। আসলে মানুষের চরিত্র বোঝা বড় শক্ত। আজ যাকে মনে হয় তার মতো ভাল জগতে আর কেউ নেই, পরবর্তী কালে সে এমনই একটা কাজ করে ফেলে তখন তার ওপর থেকে সব বিশ্বাস কেমন যেন হারিয়ে যায়।

—ভ্যান ভ্যান করিস না। আসল কথাটা বল্‌।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ মৌন হয়ে রইলাম। তারপর আমার জানালা দিয়ে দেখা সামনের বাড়িতে তিনতলার ঘরে যা যা দেখেছিলাম সব ওকে খুলে বললাম। পরিশেষে যোগ করলাম, —এবার তুইই বল, যে উপমাকে আমার মনে হয়েছিল কতকি, তার কাছ থেকে এই ধরনের ব্যবহার আশা করা যায়?

নীল কিন্তু সব শুনে চট্ করে কোন উত্তর দিল না। তারপর কী ভেবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, —উপমার দ্বিতীয় পুরুষটাকে তুই দেখেছিস কোনদিন?

—না, জানলা দিয়ে যতটুকু দেখা যায় আর কি।

সিগারেটে কয়েকটা হুসহাস টান দিয়ে নীল অন্যমনস্কের ভঙ্গিতে বলল, —বড় গোলমালে ফেলে দিলি তো?

—কেন?

—উপমাদেবীর ঘটনাটা শুনিয়ে। একদা দাম্পত্যজীবনে সে ছিল এক সুখী স্ত্রী। মানে তোর দেখা অনুসারে আদর্শ দম্পতি। তারপর কয়েকমাস আগের একটা অ্যাকসিডেন্টে সে তার স্বামীকে হারাল। আরো কয়েক দিন পর সে আর একজন পরপুরুষের সঙ্গে প্রায় অবৈধ এক জীবন কাটাচ্ছে। এদিকে সোমনাথ হারিয়ে গেল ভক্তিগড় থেকে। তার দুতিনদিন পর কাগজে রঞ্জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেল ভক্তিগড় থেকে কয়েকটা স্টেশন ছাড়িয়ে। এদিকে আবার তুই গুঞ্জনকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলি। অ্যাজ ইফ তুই রঞ্জনকেই যেন চোখের সামনে দেখছিস। ওদিকে গুঞ্জন বলল সোমনাথ বেহেড মাতাল হয়ে থাকে। সোমনাথের স্ত্রী মানে গীতাদেবী বললেন তার স্বামী সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সৎ চরিত্রের লোক। অথচ ডেড বডির স্টমাকে পাওয়া গেল হেভি লিকার। গুঞ্জন বলল তার দশহাজার টাকার মাল হাফিশ। অথচ ওর ম্যানেজার বলল হাজার টাকার ডিসপিউট। নাহ্, শালা কোথায় যে সব জট পাকিয়ে রয়েছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। একটার সঙ্গে আর একটার কোন লিঙ্ক নেই। অথচ মনে হচ্ছে কী এক অদৃশ্য সূত্রে এইসব ঘটনার মধ্যে একটা যোগাযোগ রয়ে গেছে। ছোটবেলায় ক্লাশে সিম্পলিফাই-এর অঙ্ক কষতে দিত। কতগুলো নিরীহ সাজানো সংখ্যা দেখে মনে হত যোগবিয়োগ-গুণ-ভাগ করলেই বুঝি অঙ্কটা মিলে যাবে। কিন্তু কষতে গিয়েই বুঝতে পারতাম সরল মোটেই সরল নয়। ওটাই সব থেকে শক্ত অঙ্ক। সোমনাথের নিরুদ্দেশ হওয়া, রঞ্জনের অ্যাকসিডেন্টে মৃত্যু গুঞ্জনের চেহারার সঙ্গে রঞ্জনের মিল, মাত্র কয়েকমাসের ব্যবধানে আপাত সাধ্বী এক মহিলার নবপুরুষ নির্বাচন। বড় জটিল সরল অঙ্ক। নে রাত হয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়। কলকাতা না গেলে এ প্রবলেম সল্‌ভ হবে না।

শুয়ে পড়েছিলাম। জানি এত চিন্তার মধ্যে ভালো ঘুম হবে না। একটা ট্রাঙ্কুইলাইজার খেয়ে নিয়েছিলাম। ওটা এখন অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। ঘুম না আসার সম্ভাবনা দেখলেই একটা বড়ি। ব্যস, নিশ্চিন্ত আরামে রাত্রিপার। গাড়ির দোলানিতে চোখের পাতা জড়িয়ে এসেছিল। হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় আসতেই শুয়ে শুয়ে নীলকে জিজ্ঞাসা করলাম, —নীল একটা কথা বলব?

—ছোট্ট কথা হলে বলতে পারিস। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। সারাদিন খুব ঘোরাঘুরি গেছে।

—সোমনাথই বোধহয় ভক্তিগড় থেকে পালিয়ে গিয়ে উপমার ঘরে লুকিয়ে বসে আছে।

—কী করে বুঝলি?

—গুঞ্জনবাবু তো বললেন, সোমনাথ মদ খায়। উপমার ঘরে যে লোকটা রয়েছে সেও বেশ মদখোর।

—এত বুদ্ধি কোথায় রাখিস বলতো, বলেই ও পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

কলকাতায় ফিরে নীল প্রায় ডুমুরের ফুল হয়ে গেল। কিছুতেই দেখা পাওয়া যায় না। একা একা কোথায় ঘোরে কী করে কিছুই বলে না। এদিকে আমিও প্রতি রাত্রে আমার নির্দিষ্ট জানলায় এসে অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে থাকি। উদ্দেশ্য উপমার গতিবিধি লক্ষ করা। মহিলা বোধহয় কদিন একাই আছেন। আমার বিশ্বাস অনুযায়ী আশা করেছিলাম সোমনাথকেও দেখতে পাব। আর এবার সোমনাথকে দেখলেই চিনতে পারব। কারণ সোমনাথের ছবি আমি দেখেছি। কিন্তু বৃথাই অপেক্ষা করা। সোমনাথকে দেখতে পাইনি। তবে মহিলা সংসারের নানা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন, তার পর একসময় আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েন।

চার-পাঁচ দিন এই ভাবেই কেটে গেল। হঠাৎ একদিন নীল এসে হাজির। বলল, — চল্ অজু একটু ঘুরে আসি?

—যাবি কোথায়?

—তোর উপমার সঙ্গে আলাপ করব।

—উপমার বাড়ি যাবি তুই? কেন, কী দরকারে?

—চল না গেলেই বুঝবি।

—কিন্তু তোকে যদি অ্যালাউ না করে। তাছাড়া এখন তো সেই লোকটাও নেই।

—থাকবে না জানি। তাই যাচ্ছি।

— লোকটা যে নেই তুই কী ভাবে জানলি?

—সিম্পলিফাই এর অংকটা তিন চার ধাপ এগিয়ে গেছে কিনা? নে নে চল্।

অগত্যা উপমা দেবীর বাড়ি যেতে হল। আমার সঙ্গে ওঁর কোন মৌখিক পরিচয় ছিল না আগেই বলেছি। নীলের সঙ্গে তো নয়ই। কিন্তু নীল ওসবের ধারে ধার না। বাড়িটা ফ্ল্যাট সিস্টেমে বানানো। উনি তিনতলায় একখানা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকেন। দরজার গায়ে নাম পড়ে বেল টিপলাম। একটু পরেই একজন ঘোড়ামুখো ছোকরা চাকর এসে দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল কাকে চাই।

নীল জিজ্ঞাসা করল,—উপমাদেবী আছেন?

ছোকরা বলল,—হ্যাঁ আছে।

—একবার ডেকে দাও।

—আপনারা বসুন, বলে ও আমাদের বৈঠকখানায় বসিয়ে ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই উপমা এলেন। সাজপোশাক খুব উগ্র না হলেও বেশ ফ্যাশানেব্ল্। পরনে দামি প্রিন্টেড শাড়ি। হলুদ রঙের লেডিজ শ'ল জড়ানো রয়েছে গায়ে। শীতকাল হলেও হয়তো বা কিছু আগে উনি স্নান সেরে এসেছেন। এখনও একটা বিলিতি দামি সাবানের সুবাস বেরুচ্ছে। এ সাবানের গন্ধটা আমার চেনা। অরিজিনাল ক্যামি। সদ্য স্বামীহারা হলেও মুখে বা চেহারায় কোন ক্লিন্নতার ছাপ দেখতে পেলাম না। খুব সম্ভবত মুখে হাল্কা পেন্টস্ রয়েছে। ঠোঁটে আবছা রডি কালারের লিপস্টিক। কিন্তু সিঁথিতে কোন সিঁদুরের ছায়া দেখলাম না।

আমাদের দেখে মহিলার মুখে কিঞ্চিৎ শঙ্কা কিঞ্চিৎ অজানা ঔৎসুক্য ফুটে উঠল। ভ্রূতে সামান্য বঙ্কিম রেখা। তবে সে স্বল্পকালের জন্যেই। নিমেষে মুখের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এল। মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে বললেন,—কাকে চান?

—আপনি নিশ্চয়ই উপমা সোম?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমি নীলাঞ্জন ব্যানার্জি। এই আমার কার্ড।

কার্ডটা পড়ে ফেরত দিতে দিতে বললেন,—কিন্তু আমার কাছে একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কেন? আমি তো কাউকে খুন করিনি বা কোন চুরি-ডাকাতির সঙ্গে জড়িত নই।

নীল হেসে বলল,—না না সে সব কিছু না। আপনার স্বামী রঞ্জন সোমের মৃত্যু সংক্রান্ত ব্যাপারে কয়েকটা কথা জানার জন্যে এসেছি।

মহিলার ভ্রূ আবার কোঁচকালো, — কেন? এতদিন বাদে আবার সে সবে কী প্রয়োজন? তাছাড়া আপনি তো পুলিস নন।

নীল পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে ওঁর হাতে দিয়ে বলল, -এই চিঠিটা পড়লেই বুঝতে পারবেন কলকাতা পুলিস আমাকে আপনার স্বামীর মৃত্যু সংক্রান্ত ব্যাপারে তদন্তের আদেশ দিয়েছেন।

চিঠি না পড়ে ফেরত দিতে দিতে উপমা বললেন,- তদন্ত? কেন? কিসের তদন্ত?

—পুলিস মনে করে আপনার স্বামীর মৃত্যুর কারণ সাধারণ একটা ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট নয়।

—সে কী? কী বলছেন আপনি?

—হ্যাঁ মিসেস সোম।

—কিন্তু ওর মৃত্যুর পর এ নিয়ে তো বহু তদন্ত হয়েছে।

—সেটা পর্যাপ্ত নয় বলেই পুলিসের বিশ্বাস।

—আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আমি বুঝিয়ে বলছি, আমাদের ধারণা আপনার স্বামীকে কেউ খুব ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে।

চমকে উঠলেন উপমা দেবী। বললেন,—কী বলছেন মিস্টার ব্যানার্জি?

—ঠিক বলছি। অনেক দিন ধরে অনেক পরিকল্পনা করে আপনার স্বামীকে কেউ খুন করেছে

শুনে উপমা দেবী খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন,— সে সব ঘেঁটে কী লাভ হবে নীলাঞ্জনবাবু?

— জানি না আপনার কোন লাভ হবে কি না? রঞ্জনবাবু আর ফিরেও আসবেন না এটাও ঠিক তবে আমার মনে হয় সত্য প্রকাশ হওয়াটা নিশ্চয়ই উচিত। তাছাড়া আপনারও তো জেনে রাখা উচিত কে আপনার স্বামীকে হত্যা করেছে? সে যে একদিন আপনাকেও হত্যা করবে না তারই বা কী নিশ্চয়তা আছে?

একটু চিন্তা করে উপমাদেবী বললেন,— বেশ আমাকে আপনি কী করতে বলেন?

—আপাতত আমি আপনার কাছ থেকে কয়েকটা ব্যক্তিগত প্রশ্নের সঠিক উত্তর চাইছি।

—বেশ, প্রশ্ন করুন।

—রঞ্জনবাবুর সঙ্গে আপনার কত দিন বিয়ে হয়?

—সাত বছর।

—উনি কি কোথাও চাকরি করতেন?

—না, ওনার ব্যবসা ছিল।

—কিসের ব্যবসা?

—হোটেলের।

—হোটেল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। চৌরঙ্গীতে মনোরমা হোটেলের মালিক ছিলেন আমার স্বামী।

—আই সী। তা হোটেলের আর কোন অংশীদার আছেন নাকি?

—না।

—তার মানে আপনিই এখন হোটেলের মালিক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা আপনি তো মোটামুটি বাড়িতে থাকেন। তাহলে রঞ্জনবাবুর অবর্তমানে হোটেল দেখাশুনা করেন কে?

—হোটেলের ম্যানেজার শ্রীমন্তবাবু আমাদের খুব বিশ্বস্ত। তিনিই দেখাশুনো করেন।

—হোটেল ছাড়া আর আপনার কোন আয়ের ব্যবস্থা নেই?

—আজ্ঞে না।

—রঞ্জনবাবুর কোন শত্রু ছিল বলে আপনার মনে হয়?

—তেমন তো কারো কথা ওঁকে বলতে শুনিনি কখনো। তাছাড়া উনি খুব নির্বিবাদী লোক ছিলেন।

—ওঁকে খুন করলে কারো কোন লাভ হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

কী যেন উনি চিন্তা করলেন, তারপর বললেন,—একমাত্র আমি ছাড়া আর কারো কোন লাভ হবে বলে তো মনে হয় না।

—কীরকম?

—ওঁর স্ত্রী হিসেবে আমি ওঁর যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হব। অর্থাৎ হোটেলটা আমার হবে। একটা ইনসিওর ছিল। সেটারও নমিনি আমি।

একটু পরে সামান্য ব্যঙ্গের সুরে বললেন,—তাহলে হয়তো আমিই ওনাকে খুন করেছি।

—মোটিভের দিক থেকে আপনাকে সন্দেহ করা যেতে পারে। কিন্তু একজন শক্ত সমর্থ লোককে ঐ ভাবে ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া ঠিক মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া,

—থামলেন কেন মিস্টার ব্যানার্জি, তাছাড়া কী?

—না কিছু না। ওনার ইনসিওরেন্স ছিল বললেন? ইফ য়ু ডোন্ট মাইন্ড কত টাকার মতো হবে?

—বেশি না। এক লাখ টাকা।

—টাকাটা ক্লেম্ করেছেন?

—হ্যাঁ। ইনসিওর কোম্পানি এখনও নাকি খোঁজখবর করছে। অপঘাত মৃত্যু তো।

—আচ্ছা, রঞ্জনবাবুর মৃতদেহ নিশ্চয়ই আপনি শনাক্ত করেছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কী ভাবে চিনলেন? পুলিস রিপোর্ট অনুযায়ী যতদূর জানা যায় ওঁর মৃতদেহ সম্পূর্ণ বিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মুখটুকু তো চেনাই যায়নি।

—নিজের স্বামীকে শনাক্ত করতে কী একজন মেয়ের খুব অসুবিধা হয়? তাছাড়া, সমস্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত হলেও, ওঁর হাতে একটা বিশেষ চিহ্ন ছিল যা থেকে আমার পক্ষে ওঁকে চিনে নিতে একদম অসুবিধা হয়নি।

—কিসের চিহ্ন?

—ওর নাম রঞ্জন হলেও ছোটবেলা থেকে সবাই ওকে সোম বলে ডাকত। এমনকি বন্ধুরাও। হাতে সোম লেখা উল্কি দেখে আমি নিঃসন্দেহ হই যে ঐ মৃতদেহ আমার স্বামীর।

—চিহ্নটা কী বাঁহাতে ছিল?

—না ডানহাতে।

হঠাৎ নীল বসার ঘরের সামনে একটা বড় বাঁধানো ছবির দিকে আঙুল তুলে বলল,—ওটাই নিশ্চয় আপনার স্বামী রঞ্জনবাবুর ছবি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা ওনার কি কোন ভাইটাই আছে?

—আমি ঠিক জানি না মানে কোনদিন দেখিনি, তবে শুনেছি ওঁর এক যমজ ভাই আছে।

—তাঁর নাম কি গুঞ্জন সোম?

—না, অঞ্জন সোম।

—কোথায় থাকেন তিনি?

—বলতে পারব না।

আচমকা নীল একটা প্রশ্ন করল,— সোমনাথ রায় বলে কাউকে চেনেন?

আমি স্পষ্ট দেখলাম, হ্যাঁ স্পষ্টই, আমার ভুল হয়নি, সোমনাথের নামটা শোনামাত্র উপমার সারা শরীর দমকা হাওয়ায় মোমের শিখা যেমন কেঁপে ওঠে তেমনি ভাবেই কেঁপে উঠল। তারপর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পাকা অভিনেত্রীর মতো নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন,—এরকম নাম এই প্রথম শুনলাম। কে সোমনাথ রায়?

নীল উঠতে উঠতে বলল,—তার নামটাই যখন শোনেননি তখন আর তার পরিচয় শুনে কী লাভ? ঠিক আছে মিসেস সোম আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম। আজ উঠি।

—দেখলি?

—কী দেখব?

—আমি বলেছিলাম না ঐ লোকটা সোমনাথ না হয়ে যায় না। সোমনাথের নাম শুনে কী রকম চমকে উঠল উপমা। আজকাল মানুষেরদের কী যে ভালবাসার ছিরি, ভাবলে পর্যন্ত গা ঘি ঘি করে। একজন স্বামী মরতেই আর একজনের সঙ্গে ভালবাসার খেলা শুরু করে দিল। আর একজন ভালবেসে বিয়ে করা বৌকে ফেলে রেখে অন্যের বিধবাকে হাত করবার ফিকিরে ফেউয়ের মতো লেগে রয়েছে। ঘেন্না ধরে গেল মাইরি প্রেমে।

নিজের মনেই বকবক করে যাচ্ছিলাম। নীল আমার কোন কথা শুনছিল কিনা কে জানে। হঠাৎ ও পাড়ার মোড়ে পোস্ট বক্সের কাছে গিয়ে মাথা নিচু করে কী যেন দেখতে থাকল।

ওর অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপারগুলো এখন আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

—অত খুঁটিয়ে কী দেখছিস?

—এই মুহূর্তে আমার কাছে পৃথিবীতে সব থেকে দরকারি লোক কে জানিস?

—নিশ্চয়ই আমি।

— তোর মাথা। বঙ্কিম। বঙ্কিমকে এখন আমার ভীষণ দরকার।

এখানে বঙ্কিমের একটা পরিচয় দিয়ে রাখা দরকার। জ্যাক অব অল ট্রেড্‌স বলে ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, বঙ্কিম তাই। ওর কোন নির্দিষ্ট পেশা নেই।

খেটে সৎপথে রোজগার করার জন্য ও যে কোন কাজই করতে পারে। এবং করেও। ইনসিওরেন্স পিয়ারলেস, ইউনিট ট্রাস্ট, সঞ্চয়ন ইনভেস্টমেন্ট। ফরেন গুডস্ সাপ্লাই, প্লেনের টিকিট বুকিং টেলিফোনের লাইন বার করা অথবা কেউ হস্‌পিটালে সীট পাচ্ছে না তার তদবির করা, ট্রেনের রিজার্ভেশন, কী না? দরকার পড়লে মেয়ের বিয়ের মাছ সাপ্লাই দেওয়া। এককথায় বঙ্কিম চলমান 'হোয়াট নট'। বঙ্কিমের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একটা জাপানি স্পেশাল টাইপ টেপরেকর্ডার কেনা নিয়ে নীলের ফরমাস মতো ও নীলকে একটা পকেট টেপরেকর্ডার জোগাড় করে দেয়। টেপরেকর্ডার গছিয়ে ও সঞ্চয়নের ফাঁদ পেতে বসেছিল। নীলও টাকা রাখবে না বঙ্কিমও ছাড়বে না। সে সব অনেক বড় গল্প। এখানে তা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু নীল সঞ্চয়নে টাকা না রাখলেও বঙ্কিমকে সে উচিত দক্ষিণায় অনেকবার নিজের কাজে লাগিয়েছে। কাউকে ফলো করা, কী কারো খোঁজ খবর জোগাড় করে দেওয়া, এ সবে বঙ্কিম সিদ্ধহস্ত। সেই বঙ্কিমের প্রসঙ্গ উঠতেই নীলকে জিজ্ঞাসা করলাম,—কাউকে ফলো করতে হবে বুঝি?

কথাটা নীল যেন শুনতেই পেল না। আপনমনেই বিড় বিড় করতে লাগল, — সেভেন ফরটি ফাইভ এ এম। কোনমতেই মিস করা চলবে না। বাট হাউ? বঙ্কিমকে এখন পাই কোথায়? ঠিক আছে একটা কাজ কর, তুই এক্ষুনি বঙ্কিমের বাড়ি চলে যা।

—তারপর?

—দোহাই তোর, তোকে আর কিসস্যু ভাবতে হবে না। ওকে পেলে হিড়হিড করে টেনে নিয়ে আসবি। নইলে খবর দিয়ে আসবি ফিরলেই যেন এখানে চলে আসে।

—আর তুই?

—আবার বাজে বকছিস। যা পালা।

বঙ্কিমকে সঙ্গে নিয়ে যখন ফিরলাম তখন প্রায় রাত নটা। আমাদের প্রায় নির্জন গলিটা খাঁ খাঁ করছে কেউ কোথাও নেই। কেবল কোন এক বাড়ি থেকে ট্রানজিস্টারে বাজছে, হাম তুম এক কামরেমে বন্ধ হো আউর চাবি খো যায়।

কাউকে দেখতে না পেয়ে বঙ্কিম জিজ্ঞাসা করল,—একি দাদা, সব যে সুনসান। আপনি যে বললেন নীলদাকে এখানেই পাওয়া যাবে।

—হ্যাঁ, ও তো সেই রকমই বলেছিল। গেল কোথায়?

কোথায় ছিল নীল কে জানে, প্রায় মাটি ফুঁড়ে উঠে এল,—এই যে বঙ্কিম এসে গেছ। রাতের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে তো?

—হ্যাঁ দাদা।

—একটা টাফ্ কাজ দিলে করতে পারবে?

—একটা কেন? দশটা দিলেও করে দেবো। আপনার কাজ বলে কথা।

—আপাতত আজ রাতে একটা কাজ। ডিউটি আগামি কাল সকাল পৌনে আটটা পর্যন্ত আর দু-একদিনের মধ্যে একটা খবর। ব্যস তোমার ডিউটি শেষ। পার্স খুলে নীল দুটো পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে ওর হাতে দিয়ে বলল,—এবার শোনো তোমায় কী কী করতে হবে।

নোট দুটো নিতে নিতে বঙ্কিম বিনয় দেখালো,—আবার এগুলো কেন?

—কাজ করলে তার পারিশ্রমিক নিতেই হয়। না নিলে যে কাজ করায় তার অসম্মান হয়। অজু।

—হাঁ বল।

—চট্ করে তুই তোর ঘরে চলে যা। আমি আসছি।

বিনা বাক্যব্যয়ে আমি চলে এলাম। নীল বঙ্কিমকে নিয়ে পড়ল। আধঘণ্টা পর ও যখন আমার ঘরে এল তখন যথারীতি লোডশেডিং শুরু হয়ে গেছে।

আমাকে অন্ধকারে জানলার ধারে বসে থাকতে দেখে বলল,—কিরে এখনও শবরীর প্রতীক্ষায়?

—সোমনাথকে তো দেখতে পাচ্ছি না?

—তুই সিওর যে লোকটা সোমনাথ?

—আমি হলফ করে বলতে পারি।

—তাহলে গীতাদেবীকে খবরটা দিয়ে দে, সে এসে তার স্বামীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাক।

অন্ধকারে নীলের মুখ দেখতে পাচ্ছি না। ও ঠাট্টা করছে না সত্যিই আমার কথায় সায় দিচ্ছে কিছুই বুঝতে পারলাম না। চেয়ার টানার আওয়াজ পেলাম। অর্থাৎ নীল চেয়ারে বসল। একটু বাদে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল,— লোকটা সোমনাথ তো নাও হতে পারে? ওর হোটেলের ম্যানেজার নয় এটাই কী হলফ করে বলতে পারিস?

—তুই সিওর যে লোকটা সোমনাথ নয়?

—আমার কথা বলার দিন এখনও আসেনি। তবে লোকটা সোমনাথই হোক আর ওর ম্যানেজারই হোক, বা অন্য আর যে কেউ হোক, পাখি ফুরুৎ।

—তার মানে?

—মানে আর হয়তো লোকটাকে যে অবস্থায় এতদিন দেখেছিস নাও দেখতে পারিস।

—কেন?

—কেননা লোকটা আর আসবে না তাই। তুমি ব্যাটা আড়ি পেতে অন্যের বউ-এর অভিসার দেখবে, আর সেও তোমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে লীলাখেলা করবে, এতো আর হতে পারে না।

—আমি ওদের লক্ষ্য করছি, এটা ওরা বুঝবে কেমন করে?

—বুঝবে নয়, বুঝে গেছে। যাকগে তোর সঙ্গে আর ভ্যান ভ্যান করতে ভাল লাগছে না। কাল থেকে অনেক কাজ, চলি এখন। আর শোন্, মিনিমাম দিন পনের তোর সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না।

—পনের দিন তুই আমাকে ছেড়ে একা একা থাকবি?

—থাকতে হবে বৎস। তুমি যে রকম ভুষিমাল তোমার সঙ্গে এখন দেখা না হওয়াই ভালো।

নীল চলে যাচ্ছিল। ওকে ডাকলাম,—সত্যি করে একটা কথা বলে যাবি?

—কী?

—সোমনাথের এই কেসে তুই কদ্দুর এগিয়েছিস?

—বললাম না মিনিমাম দিন পনের সময় লাগবে। লাগবেই। মনে হয় না তার আগে পাখি খাঁচায় ফিরবে। একটা টোপ ছাড়তেই হবে। নইলে সবটাই ধরাছোঁয়ার বাইরে।

—তার মানে সোমনাথ আবার খাঁচায় ফিরে আসবে?

—এই মুহূর্তে আর কিছু বলতে পারছি না। তবে জেনে রাখ এ একটা বিরাট ষড়যন্ত্র। কিন্তু মোটিভটা কী?

—তার মানে এই মিসট্রিয়াস ব্যাপারটা তোর কাছে মোটামুটি ক্লিয়ার?

—আগেই তো বলেছি সিমপ্লিফিকেশনের কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছি। এখন মোটামুটি একটা স্টোরি তৈরি করতে পেরেছি। আমার অনুমানে যদি কোথাও কোন ভুল না হয়ে থাকে, মানে অঙ্কটা যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে বলা যেতে পারে আমি বোধহয় সবটাই জেনে ফেলেছি।

—এবং পনের দিনের মাথায় জট ক্লিয়ার। নীল, প্লিজ, সামান্য একটু আলোকপাত করে যা। নইলে

এই পনের দিন কী নিয়ে থাকব বল?

—মনে মনে উপমাকে ধ্যান কর।

—বাজে বকিস না। ওর মতো নষ্টা মেয়েছেলেকে আমি র‍্যাদার ঘেন্না করি।

—অজু, আমি তোর মতো লিখতে টিখতে পারি না। মানব চরিত্রের গতিবিধির হিসেব তুই আমার থেকে বেশি রাখিস। তবে তোকে একটা কথা বলে যাচ্ছি, উপমার মতো মেয়ে এ জগতে পাওয়া খুব দুষ্কর।

—তুই ঠিকই বলেছিস। উপমার মতো মেয়ে চট্ করে হয় না। কমাস আগে স্বামীর জন্যে যে ছটফট করতো, স্বামী ছাড়া যার একটা দিনও কাটতো না। ক মাস পরই, সেই স্বামী মরতে না মরতেই, হাতে পেল বেশ কিছু টাকা, একটা হোটেলের মালিকানা, আর সঙ্গে সঙ্গে জোগাড় করে নিলো অন্য এক পুরুষ। সত্যিই ওর মতো মেয়ে হয় না।

অন্ধকারে দেখতে না পেলেও বুঝতে পারলাম, নীল বোধহয় একটু হাসল। তারপর বলল —তথাকথিত সংস্কারের একটা ঠুলি চোখের উপর এঁটে রাখিস না। উপমার কতই বা বয়েস? বড় জোর উনত্রিশ-ত্রিশ। স্বামী মারা যাবার পর সে যদি আর একটা বিয়ে করতে চায়, বা আর একজন পুরুষকে যদি তার ভালো লাগে, সেটা কী খুবই অন্যায়?

জোর প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, — না নীল, সংস্কারই বল আর যাই বল, আমি তোর মতামত মেনে নিতে পারছি না। মনে-প্রাণে আমি উপমার এই ব্যবহারকে স্বেচ্ছাচারিতা এবং চরিত্রহীনতা বলেই মনে করি। যাইহোক এ নিয়ে তোর সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। তোকে আমি যা জিজ্ঞাসা করলাম সে সম্বন্ধে কী কিছু বলবি?

—কী বলব? নিজেই এখনও আমি সবালের শেষ উত্তর হয় এক নয়তো শূন্যতে আসতে পারিনি তবে ঐ যে বললাম, সংস্কারের ঠুলি চোখের উপর থেকে সরিয়ে আগাগোড়া সবটা বেশ ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা কর। একেবারে গোড়া থেকে ভাব। গীতা এল সোমনাথের নিরুদ্দেশের খবর নিয়ে। সে বলল, তার স্বামী খুব ভাল। ঠিক যেদিন থেকে সে হারিয়ে গেল তার পরদিনই ভক্তিগড় থেকে কয়েকটা স্টেশন পরই অ্যাকসিডেন্টে মারা গেল কলকাতার এক হোটেল-মালিক রঞ্জন সোম। রঞ্জনের স্ত্রী রঞ্জনের মৃতদেহ শনাক্ত করল তার হাতের উল্কির চিহ্ন দেখে। রঞ্জন সোম মারা যাবার কমাস বাদেই তার স্ত্রী বেশ কিছু সম্পত্তি হাতে পেল। হল অন্য পুরুষে আসক্তা। হোটেলের সামান্য ম্যানেজারের উপর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে মালকিন নির্বিকার চিত্তে বসে আছেন। কেন বসে আছেন? কর্মচারীকে বিশ্বাস করা উচিত তাই বলে আয়-ব্যয়ের হিসেব পর্যন্ত রাখবেন না? এ কখনও হয়? নাবে, ভালো করে চিন্তা কর, অনেক অসংগতি চোখে পড়বে। আবার ওদিকে সোমনাথের মালিক সোমনাথকে চোর এবং মাতাল বলছে অথচ তার স্ত্রী বলছে তার স্বামীর মতো ভালো লোক হয় না। গুঞ্জনবাবু বলছেন তিনি বিয়ে করেননি, তবু হাতে রয়েছে ম্যারেজ রিং। সেটা কি তিনি শখ করে পরেছেন? না গোপনে কাউকে বিয়ে করেছেন, জানাতে চাইছেন না; মালিক হয়েও তিনি সামান্য এক কর্মচারীর খোঁজে মাঝে মাঝেই সেই কর্মচারীর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যান। কেন যান? তাঁর তো একজন দারোয়ান রয়েছে। তাকে পাঠালেই পারেন কেন পাঠান না? টাকার শোকে? সেখানেও এক গরমিল। গুঞ্জন বলছেন তাঁর দশহাজার টাকা চোট গেছে। আর সব কিছুর হিসাব রাখে যে ম্যানেজার সে বলছে একহাজার। কোথায় দশ, কোথায় এক। কিন্তু একটু চোখ খুলে যদি সঠিক চিন্তা করতে পারিস দেখবি জল ক্লিয়ার। তাও যদি না পারিস, শেষ দৃশ্যের জন্যে অপেক্ষা কর। পনের দিনের মধ্যেই তোকে আমি একেবারে স্পটে নিয়ে যাব। রেডি থাকিস।

ও চলে যাচ্ছিল আমাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল,—উপমার ভালবাসার মানুষ যদি ফিরে আসে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দিবি। এটাই তোর ডিউটি। এ কেসে তোর অন্য কোন কাজ নেই।

—তুই কিন্তু আর একটা কথা চিন্তা করতে বললি না।

—কী?

কেনই বা একজন মহিলা তড়িঘড়ি করে রানিগঞ্জ থেকে ফিরে এসে তাঁর দাদার আস্তানায় উঠল
আর কেনই বা একজন ছলছুতোয় সেই বাড়ির আনাচে কানাচে ঘোরাঘুরি শুরু করল?
—সেটা তুই আমার থেকে ভালো বলতে পারবি। লেখক তো। বলেই নীল হাওয়া।

নীল আমাকে ভাবতে বলেছিল। আমি ভেবেছি। আমার উর্বর মস্তিষ্কের কোষে কেবল একটা জট পাকানো এবং রাত্রে সুনিদ্রার ব্যাঘাত হওয়া ছাড়া আর কিছুই হয়নি। নীল সময় দিয়েছিল দশের দিন। কিন্তু শেষ দৃশ্যের যবনিকা উঠল তার আগেই। দশদিনের দিন। অবশ্য প্রতি রাত্রেই আমি উপমার জানলায় লক্ষ্য রেখেছি। কিন্তু বাঞ্ছিত লোককে দেখতে পাইনি। মাঝে মাঝে ওদের খোকনা চাকরটাকে শুধু দেখেছি। উপমাকেও দেখতে পেয়েছি সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকতে। বাস ঐ পর্যন্তই।

তার ওপর ইতিমধ্যে একটা নতুন উপসর্গ আরম্ভ হয়েছে। হয়তো কোন পর্ষদের অনুযোগেই পাড়াতে আজ দিনকয়েক হল একই সঙ্গে এ. সি ডি, সি দুটো লাইনই চলে যাচ্ছে। রাত দশটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত সমস্ত পাড়ায় নিশ্ছিদ্র অমাবস্যা নেমে আসে।

দশদিনেরদিন দুপুরে নীলের ফোন পেলাম। বলল,—পাখি ফিরেছে। আজ সন্ধে থেকে তৈরি থাকিস। সময় মতো ডেকে নেব।

একবার জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, সোমনাথকে কি হাতেনাতে ধরা যাবে? কিন্তু তার আগেই ওপাশ থেকে লাইনটা কেটে গেল।

অগত্যা সন্ধে থেকে নিজের ঘরেই গৃহবন্দি হয়ে রইলাম। ও বলছে আজ সন্ধেবেলায় সব রহস্যের সমাধান হবে। কী সমাধান হবে? নিরুদ্দিষ্ট সোমনাথ কি ফিরে আসবে? ফিরবে কোথায়? ভাঁড়গড়ে না কলকাতায়? যদি কলকাতাতেই আসে তাহলে সেই কারণে এত নাটকীয় প্রস্তুতি কেন? কে জানে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে গড়ায়।

এদিকে উপমাদেবীর ঘরটাও অন্ধকার। যদিও এখন লোডশেডিং নেই। তবুও এখন অন্ধকার। মনে হয় ওরা এখন কেউ নেই। নয়তো ইচ্ছে করেই আলো জ্বালায়নি।

দেখতে দেখতে সন্ধে পেরিয়ে গেল। নীল ফিরলো না। ও অবশ্য কোন নির্দিষ্ট সময় দেয়নি। এদিকে দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে লোডশেডিং শুরু হয়ে গেল। আমি একেবারেই ভুলেও ঘরের বাইরে যাইনি। নীল বলে গেছে ঘরেই থাকতে। মনে মনে একটা চাপা উত্তেজনাও রয়েছে। কী হয় কী হয় ভাব। উপমাদেবীর মুখটা মনে পড়ল। বেচারি ভালবেসে বিয়ে করে জীবনে একটা বিরাট রিস্ক নিয়েছে। সুখের জন্য। নিজের এবং আর একজনের। কিন্তু স্বামীটা ছন্নছাড়া। ভালবাসার মূল্য না দিয়ে অসহায় স্ত্রীকে ফেলে পালিয়ে গেল। এবং আমার স্থির বিশ্বাস ও উপমার কাছেই আসে। নইলে সোমনাথের নাম শুনেই উপমা ঐ ভাবে চমকে উঠত না। কিন্তু কেন যে উপমা এই ভুল করল? সোমনাথের সুন্দর মুখ দেখে কি বা হয়তো সোমনাথের বাইরের সুন্দর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গীতার মতই ভুল করে বসেছে। সোমনাথের মতো শয়তানদের সত্যিই বিশ্বাস করা উচিত নয়।

হঠাৎ দরজায় টুকটুক করে একটা শব্দ হল। খুলে দেখি নীল। আমাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বলল,—এক্ষুনি চ। আর বোধহয় বেশি সময় পাওয়া যাবে না। উল্টোপাল্টা কিছু করবি না। স্রেফ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সমস্ত কিছু দেখে যাবি।

—তাহলে আর আমাকে নিয়ে যাচ্ছিস কেন?

—লিখিস তো! লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা উচিত।

ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে যখন গলির সামনে এসে দাঁড়ালাম দেখি সে এক ইলাহি কাণ্ড। গলির ঠিক মুখেই কালো হাতির মতো একটা বিরাট পুলিস ভ্যান। ছড়ানো ছিটনো কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিস এদিক ওদিক ঘোরা ফেরা করছে। দু একটা আশপাশের বাড়ি থেকে উৎসাহী মুখ উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পুলিসের ভয়ে তারা আবার দরজা বন্ধ করে দিল। নীল একটু এগিয়ে গিয়ে অফিসারের সঙ্গে কী যেন চুপিচুপি কথা বলল, তারপর আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির দরজায়

গিয়ে দাড়াল। কোথায় যেন ছিল বঙ্কিম। ওকে দেখেই নীল বলে উঠল,—আছে তো? না ফুড়ুৎ

না দাদা এক মুহূর্তের জন্যেও আমি নড়িনি। আছে।

ঠিক আছে তুমি আমার জায়গায় চলে যাও। আসুন অফিসার। অজু আয়।

ফ্ল্যাট বাড়ি। সব দরজাই বন্ধ। প্রায় নিঃশব্দে আমরা তিনজনে ওপরে উঠে গেলাম। প্যাসেজে কোন আলো জ্বলছিল না। কারণ এখন লোডশেডিং চলছে।

নির্দিষ্ট রুমের দরজায় গিয়ে নীল টুকটুক করে তিনবার টোকা দিল। খুট্ করে একটা শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল। সেই ঘোড়ামুখের মতো মুখ উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল।

প্রায় নিঃশব্দে নীল দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল। ওর পেছন পেছন পুলিস অফিসার মিস্টার বাহার (নামটা নীল পরে জানিয়েছিল) তারপর আমি ঢুকে গেলাম। কোথাও কোন আলো নেই। নীলকে অনুসরণ করে একটু এগিয়ে যেতেই, একদম শেষের দিকের একটা ঘর থেকে স্বল্প আলোর আভাস পাওয়া গেল।

ঘরের সামনে গিয়ে নীল দাঁড়িয়ে পড়ল। দরজাটা খোলাই ছিল। তবে স্বল্প ভেজানো। একবার কান পেতে শুনতে চাইল ভেতরের কোন কথাবার্তা শুনতে পাওয়া যায় কিনা।

ওর পেছন থেকে আমরাও উঁকি দিয়ে দেখলাম। একজন পুরুষ আর একজন মহিলা প্রায় মুখোমুখি বসে আছেন। হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় ওদের সিল্যুটটাই চোখে পড়ছিল। ওদের দেখে মনে হল খুব কিছু গভীর বিষয়ে ওরা আলোচনায় ব্যস্ত।

নীল বোধহয় আর সময় দিতে চাইল না। বলতে গেলে একরকম হঠাৎই দড়াম্ শব্দে দরজাটা খুলে ভেতরে গিয়ে দাড়ালো। ওর হাতের বড় চার সেলের টর্চটা জ্বালিয়ে দিল। মিস্টার বাহার হাতেও টর্চ ছিল। উনিও ওর টর্চ জ্বালিয়ে দিলেন।

আচমকা হুড়মুড় করে তিনজনে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তেই ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা যুগপৎ বিস্ময় এবং বিরক্তিতে উঠে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোক যেন খেঁকিয়ে উঠে তেড়ে এলেন,—কী, কী, ব্যাপারটা কী? আপনারা মানে কী চাই? এখানে এলেন কী করে?

এতক্ষণে ভদ্রলোকের মুখটা স্পষ্ট করে দেখতে পেলাম। নীলের টর্চটা সরাসরি ওর মুখখানা আলোকিত করেছে। আমার মুখ দিয়ে চরম বিস্ময়ে একটা শব্দ বেরিয়ে এল,—এ কি রে?

আমার কথা কেড়ে নিয়ে নীল বলল,—হ্যাঁ ইনিই তিনি।

হাতের চেটো দিয়ে নিজের মুখটাকে ঢেকে নিয়ে লোকটি বললেন,—কে আপনারা?

চিনতে পারলেন না, মিস্টার ... কি নামে ডাকব আপনাকে? অঞ্জন সোম? না গুঞ্জন সেন?

মহিলা, মানে উপমা সোম হঠাৎ যেন মুখিয়ে উঠলেন,—এটা ভদ্রলোকের বাড়ি? আপনারা সব পেয়েছেন কী? পুলিসের লোক বলে কী মাথা কিনে নিয়েছেন? এই সেদিন এসে জ্বালাতন করে গেলেন আজ আবার রাত দুপুরে, যান, বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে?

কিন্তু মিসেস সোম, আমরা তো চলে যাব বলে আসিনি। ধীরে ধীরে কথা দোলাতে দোলাতে নীল বলল, আমরা যে বিশেষ কারণেই এত গভীর রাতে আপনাদের একটু বিরক্ত করতে এসেছি।

আগুনের মতো গনগনে গলায় ভদ্রলোকটি বললেন,—কে আপনাদের দরজা খুলে দিল?

আপনার বাড়িতে যে লোকটি কাজ করে, টুকটুক করে একটু টোকা দিতেই খুলে দিয়েছে।

লোকটা একটা রাস্কেল। বড্ড হোয়াই? জানেন এটা লিগ্যাল অফেন্স। আমি আপনাদের নামে কেস করতে পারি।

এতক্ষণে মিস্টার বাহার বললেন,— চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তবে বোধহয় বিশেষ সুবিধে হবে না এক্ষেত্রে। কারণ আপনার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ নিয়েই এত রাত্রে আপনার বাড়িতে হানা দিয়েছি।

—কেন? কী অপরাধ করেছি আমি যে পুলিস এসে যখন তখন উৎপাত করবে আমার বাড়িতে?

নীল যেন প্রশ্ন করল,—তাহলে স্বীকার করছেন এ ফ্ল্যাটটা আপনার নামেই আছে? কিন্তু ভক্তিপদকে বলেছিলেন কলকাতা এসে হোটেলে ওঠেন কারণ এখানে আপনার কোন পরিচিত লোক থাকে না

—সেটা আমার খুশি। আপনার কাছে আমার হোয়্যার অ্যাবাউটস্ জানাতে আমি বাধ্য নই।

চাপা আর দৃঢ়স্বরে নীল বলল,—নিশ্চয়ই নয়। তবে আপনার সমস্ত হোয়্যার অ্যাবাউটস আমার জানা হয়ে গেছে। আপাতত মিস্টারবরাহা, ভক্তিগড় নিবাসী শ্রীমতী গীতা রায়ের স্বামী সোমনাথ রায়কে খুব ঠাণ্ডা মাথায় পূর্ব পরিকল্পনামতো খুন করার অপরাধে গুঞ্জন সোমকে অ্যারেস্ট করতে পারেন।

চমকে উঠলাম আমি আর বুনো মোষের মতো গর্জন করে উঠলেন গুঞ্জন সোম,—ইউ র‍্যাস্টার্ড, কী প্রমাণ আছে আপনার হাতে?

—যথা সময়েই জানতে পারবেন।

—নো, প্রমাণ না দিয়ে আপনি আমার গায়ে হাত দিতেই পারেন না।

—কিন্তু আমি প্রমাণ করে দিতে পারি আপনিই সোমনাথবাবুকে খুন করেছেন।

—বাজে কথা। সোমনাথবাবুকে আমি খুন করিনি। সে মারা গেছে অ্যাকসিডেন্টে।

—কোথায়?

—রানিগঞ্জে।

—না—না—না। ভুল কথা।

প্রাণপণ চিৎকারে গুঞ্জন সোমের কথা চাপা দিতে চাইলেন উপমা সোম,—উনি জানেন না, উনি ভুল বলছেন। সেদিন অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছিলেন আমার স্বামী। সোমনাথ আমাদের টাকা চুরি করে পালিয়ে গেছে।

হাসতে হাসতে নীল বলল,—আর কোন লাভ নেই মিসেস সোম। মুখ ফস্কে উত্তেজনার মাথায় উনি যে সত্য কথাটা বলে ফেলেছেন তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। আপনার ওই চিৎকারে মিস্টার সোমের কথাগুলো আমার বুক পকেটে রাখা স্পেশাল টেপ রেকর্ডার থেকে ইরেজ করা যাবে না। উনি ঠিক কথাই বলেছেন। সে রাত্রে রঞ্জন সোম মারা যাননি, মারা গিয়েছিলো একটা নিরীহ লোক, যার নাম সোমনাথ রায়। এবং সেটা অ্যাকসিডেন্ট নয়। খুন। ডেলিবারেট মার্ডার।

ততক্ষণে মাথার চুল খামচে গুঞ্জন সোম বসে পড়েছেন নিজের চেয়ারে। তবু বাঁচার শেষ চেষ্টা হিসেবে বললেন,— সে রাত্রে যে খুশি মারা যাক, বা খুন হোক, তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? সোমনাথকে মেরে আমার কী লাভ?

—আছে আছে। বিরাট সম্পর্ক আছে। সোমনাথকে মারতে পারলেই তো আপনাদের লাভ। আর প্রমাণ? প্রমাণ হাতে না রেখে নীল ব্যানার্জি কোন ডাইরেক্ট অ্যাকশানে নামে না।

—কী প্রমাণ?

—প্রমাণ আছে, বারোই আগস্ট রাত ৮-৪৬ এর গাড়িতে ভক্তিগড় থেকে দুজন ভদ্রলোক ৩২০ আপ টুউন মোগল সরাই প্যাসেঞ্জারে ফার্স্ট ক্লাস কামরায় ওঠেন। তাদের দুজনকে স্টেশনমাস্টার চেনেন। তাদের একজন হলেন গুঞ্জন সোম অন্য জন সোমনাথ রায়। সেরাত্রে স্টেশনমাস্টার বনোবাবু বোধহয় একটু বিস্মিত হয়ে আপনাকে প্রশ্ন করেছিলেন, হঠাৎ কী এমন জরুরি দরকার পড়ল যে ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কেটে কলকাতা যেতে হচ্ছে? গুঞ্জনবাবু, আপনি তার উত্তরে কী বলেছিলেন সেটাও কী আমি বলে দেব?

—বাজে কথা, সে রাত্রে আমি ভক্তিগড় ছেড়ে কোথাও যাইনি। ম্যানেজার হরিদাসবাবু জানেন গোটা আগস্ট মাসই আমি ভক্তিগড়ে ছিলাম।

—ম্যানেজার নিশ্চয়ই জানেন। তবে সে ম্যানেজারের নাম হরিদাসবাবু না। তিনি হলেন আপনার কলকাতার মনোরমা হোটেলের ম্যানেজার শ্রীমন্ত সরকার। কেননা ঠিক তের তারিখেই আপনি হোটেল অ্যাকাউন্টের চেক বইএ কয়েকটা চেকে সই করেন। তার একটা চেকের টাকার অ্যামাউন্ট ছিল আট হাজার টাকা। সে টাকাটা খরচ হয়েছিল একটা নতুন ফ্রিজের জন্য। ফ্রিজটা ছিল অলউইন কোম্পানির। কোম্পানির ডিলার মেসার্স প্রেমজী অ্যান্ড কোম্পানি সেদিন মাত্র একটা ফ্রিজই ডেলিভারি দিয়েছিল। বিলটা হয়েছিল মনোরমা হোটেলের নামে। এর সব নথিপত্র কিন্তু পুলিসের জিম্মায় আছে।

আপনাদের ম্যানেজার শ্রীমন্ত সরকার পুলিসের চাপে সব কথাই স্বীকার করেছেন। তিনিও এখন পুলিসের কাস্টডিতে।

—শ্রীমন্তটা একটা পাঁঠা। আপনাদের চাপে পড়ে মিথ্যে কথা বলেছে।

—তাছাড়া, ফুঁসিয়ে উঠলেন উপমা, রঞ্জনের সই ছাড়া হোটেলের কোন চেকই অনারড্ হবে না। ধরা গেল গুঞ্জন তের তারিখে কলকাতায় এসেছিল, তা রঞ্জনের বদলে গুঞ্জন সই করলে ব্যাঙ্ক টাকা দিয়ে দেবে?

নীল এবার একটু হাসল। পরে বলল —কিন্তু চেকে সেদিন রঞ্জনের সই ছিল। চেষ্টা করলে এখনও সেই চেক ব্যাঙ্ক থেকে জোগাড় করা যায়। এত তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্ক চেক নষ্ট করে না। তা যে লোকটা বার তারিখ রাত্রে মারা যায় বলতে পারেন সে কি ভাবে তের তারিখে চেকে সই করে?

— চেকগুলো উনি বাইরে যাবার আগেই সই করে গিয়েছিলেন।

—কিন্তু উনি তা করেননি। সেদিন মানে তেরো তারিখে তিনি যথারীতি হোটেলে গিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় সব চেকেই সই করেছিলেন। আগেই বলেছি শ্রীমন্ত সরকার সব কিছুই কনফেস করেছেন হ্যাঁ মিস্টার সোম সই আপনি তার সামনেই করেছেন। শুনুন উপমা দেবী, অপরাধী এখানেই সব থেকে বড় ভুল করেছিল। পৃথিবীর সব অপরাধীই একটা না একটা সূত্র রেখে যায়। তেরো তারিখে গুঞ্জনবাবু ছিলেন অত্যন্ত উত্তেজিত। তাঁর সেদিন মাথা ঠাণ্ডা থাকলে সই তিনি করতেন না, করতেন আপনি কারণ কোম্পানির চেকে ওনার বদলে আপনার সইও ভ্যালিড। কিন্তু, ঐ যে বললাম, আগের রাতের একটা বীভৎস খুনের প্রতিক্রিয়ায় উনি ছিলেন টোটালি অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড।

হঠাৎ মিস্টার রাহা বললেন,— তাহলে আপনি বলছেন গুঞ্জনবাবু রঞ্জনবাবুর নামে সই করেছিলেন?

— হ্যাঁ।

কিন্তু সই মিলবে কী ভাবে? তবে কি উনি সই জালেও এক্সপার্ট?

-এইবার সেই প্রশ্নেই আসছি, বলে নীল পকেট থেকে একটা হাফসাইজ ফোটোস্ট্যাট্ ব্রোমাইড বার করে আনল। তারপর বলল, এখন অন্ধকার। ঠিক বোঝা যাবে না। আলো ফিরলে দেখতে পাবেন। ভক্তিগড় থেকে মাত্র পনেরো দিন আগে গুঞ্জনবাবুর লেখা একটা চিঠি। স্থানীয় পিওনকে একটু অসৎ উপায়ে ম্যানেজ করে চিঠিটা আমি জোগাড় করেছিলাম। অবশ্য ফোটোস্ট্যাট্ তুলে নিয়ে যাঁর চিঠি তাঁর কাছেই আমি পাঠিয়ে দিই। চিঠিতে আপনি কী লিখেছেন মনে আছে গুঞ্জনবাবু? না থাকে তো বলে দিচ্ছি। আপনি লিখেছেন 'উ, একটা গোয়েন্দা পিছনে লেগেছে। এখন যেতে পারছি না। সুযোগ বুঝে যাব। সাবধানে থেকো--ইতি র। তাই না?

নীল প্রশ্ন রেখে থামল বটে, কিন্তু সকলেই নির্বাক। ঘরের মধ্যে তখন অখণ্ড নীরবতা। নীল আবার প্রশ্ন করল,—উপমা দেবী, আপনি বলতে পারেন এই 'র'টি কে?

ঝাঁঝিয়ে উঠলেন মহিলা, --আমি জানি না, এরকম কোন চিঠি আমি পাইনি।

--অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু আমি জানি, চিঠি আপনি পেয়েছেন, আর এও জানি এই 'র' টি কে?

ঘরের মধ্যে আচমকা একটা হাতি ঢুকে পড়লে আমি বা মিস্টার রাহা এতটা চমকে উঠতাম না। যতটা চমক এল নীলের পরের কথায়,—এই 'র' টি আর কেউ নন, স্বয়ং রঞ্জন সোম। উপমা দেবীর স্বামী।

যুগপৎ মিস্টার রাহা এবং আমি বলে উঠলাম, —কিন্তু উপমা দেবী নিজেই তো তাঁর স্বামীকে শনাক্ত করেছেন। একটু আগেই বলেছেন তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে।

—উনি মিথ্যে বলেছেন একথা আমি বলব না, আমি বলব উনি সত্য গোপন করেছেন। কারণ উনি চেয়েছিলেন পৃথিবী থেকে রঞ্জন সোমের নয় 'রঞ্জন সোম' এই নামটার মৃত্যু হোক।

—তাহলে রঞ্জন সোম গেলেন কোথায়? জিজ্ঞাসা করলেন মিস্টার রাহা।

সোজা তর্জনি নির্দেশ করে নীল বলল, —এই সেই রঞ্জন সোম। তাই না উপমা দেবী? বিশ্বাস

ওঁর ডান হাতের পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে দেখুন, লেখা আছে 'সোম'। উনি চেষ্টা করেও উল্কির দাগটা এখনো তুলে ফেলতে পারেননি।

এতক্ষণ বেশ চলছিল। একপক্ষের অন্যপক্ষকে কোণঠাসা করে চেপে ধরা। অন্যপক্ষের বাঁচার জন্যে প্রাণপণ প্রচেষ্টা। হঠাৎ কী যে হল, নিমেষের মধ্যে এমন একটা কাণ্ড ঘটে যেতে পারে তা বোধহয় আমি বা মিস্টার রাহা কেউই আঁচ করতে পারিনি। এমন কী স্বয়ং নীলও না।

দরজার ঠিক মুখে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। আমার ডান দিকে মিস্টার রাহা। বাঁ দিকে নীল। ঘরের ঠিক মাঝখানে ছোট রাউন্ড সেন্টার টেবিলের ওপর জ্বলছিল হারিকেনটা। উপমা দেবী দাঁড়িয়েছিলেন সেন্টার টেবিলের একদিকে, অন্যদিকে রঞ্জন সোম।

আমাদের তিনজনকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত করে দিয়ে হঠাৎ উপমাদেবী ছুটে গিয়ে রঞ্জনবাবুকে সজোরে আঁকড়ে ধরলেন। রঞ্জনবাবুও উপমাকে বাহুবন্ধনে নিবিড় ভাবে আটকে নিলেন। আর আমাদের তিনজোড়া চোখের ওপরেই গভীর আবেগে উভয়ে উভয়ের ঠোঁটে ঠোঁট মেলালেন।

কী রোমহর্ষক সিনেমাটিক দৃশ্য। মুহূর্তের জন্য আমরা তিনজনেই বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। জীবনে অনেক বার অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছি কিন্তু চোখের ওপর লজ্জাহীন জীবন্ত চুম্বন দৃশ্য এর আগে আমাদের জীবনে আসেনি। এমন কী ঐ বাঘা নীলও কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল এমন দৃশ্যে।

আমাদের দুর্বলতার চরম সুযোগে ঘটে গেল চরম অঘটন। আমাদের অন্যমনস্কতার সুযোগে কখন যেন নিজের পকেট থেকে ছোট্ট পিস্তলটা টেনে নিয়েছেন রঞ্জন সোম। কোনরকম বাধা দেবার আগেই, সে চুম্বনরত অবস্থায়, উপমার মাথায় নলটি ঠেকিয়ে টেনে দিলেন ট্রিগার। মাত্র এক লহমা। উপমার দেহটি আরো বেশি করে আঁকড়ে নিয়ে নিজের মাথায় ছোঁয়ালেন নলটি। চড়াৎ করে একটা শব্দ হল। দুটি দেহ সশব্দে লুটিয়ে পড়ল মাটির ওপর। আর ঠিক সেই মুহূর্তে টের পেলাম মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। ঝলমল করে উঠল চারদিক, টিউব ল্যাম্পের আলোয়।

সারা ঘরে তখন রক্তের বন্যা। একজন্মের প্রেমিক-প্রেমিকা তখনও আলিঙ্গনাবদ্ধ।

ভাই অজু,

কবিগুরুর সেই লাইনটা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে। 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে' তোর কাছে লুকোবার কিছু নেই। এবার বোধহয় আমি ধরা পড়েছি। কী করব বল? নীল ব্যানার্জিও তো একটা মানুষ। তার মধ্যেও অনুভূতির অভাব নেই এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবি। প্রেম বড় মারাত্মক। সন্ন্যাসীর হৃদয়েও আগুন জ্বলে যায়। আমি তো কোন ছার। অদৃশ্য এক সুতোর টানে আমাকে কিছুদিনের জন্যে তোর কাছ থেকে একটু দূরে চলে যেতে হচ্ছে।

আমি জানি সোমনাথ রহস্যের অনেক কিছুই এখন তোর মনকে দোলাচ্ছে। অনেক প্রশ্ন তোর মাথার মধ্যে ঝড় তুলেছে। সংক্ষেপে আমার ধারণা মতো তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা করছি।

একেবারে গোড়া থেকে বলি তাহলে তোর বুঝতে সুবিধে হবে।

গীতা রায়ের মুখে সোমনাথ নিরুদ্দেশের কাহিনী শুনে প্রথমটা আমি প্রায় হাল ছেড়েই দিয়েছিলাম। জগতে কোটি কোটি মানুষ আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিখ্যাত। তেমন কেউ বিখ্যাত লোক হারিয়ে গেলে মোটামুটি একটা মোটিভ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সোমনাথের মতো একজন অখ্যাত এবং অতি সাধারণ নিম্নবিত্তের মানুষ, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ হারিয়ে গেলে তাকে আর খুঁজে পাওয়া সত্যিই বেশ কষ্টকর। খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মতো অবস্থা হয়ে গিয়েছিল আমার। কোন ভাবেই কোন জোরালো মোটিভ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কেন? কী জন্যে? সম্ভাব্য কারণগুলো ভাবতে শুরু করলাম ওর স্টেটাসকে সামনে রেখে।

ওর পারিবারিক চিত্রটা প্রথমেই যা চোখে পড়ে তা হল ও নেহাতই একজন গরিব লোক। তবে

কি ও নিদারুণ অর্থকষ্টে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণায় বিবাগী হয়ে গেছে? কিন্তু খোঁজ খবর নিয়ে জা গেল তা নয়। ইদানীং স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মোটামুটি চাকরি করছিল। তাতে বলা যেতে পারে ভালো মন্দয় খারাপ ছিল না। অর্থাৎ অর্থনৈতিক অসঙ্গতিতে এই নিরুদ্দেশ নয়।

তবে কি হঠাৎ ওর মাথার গোলযোগ দেখা দিয়েছিল? না তাও নয়। বরং সম্প্রতি ও ছিল বে সুস্থ এবং স্বাভাবিক। স্ত্রীকেও ভালোবাসতো যথেষ্ট। সেটা গীতা রায়ের ভার্সান থেকেই জানা যায়। অ মানে ও নিজে থেকে কোথাও পালায়নি।

তাহলে ও কী কোন অপরাধ করেছিল? অর্থাৎ চুরি ডাকাতি বা খুন? কিন্তু এর কোনটাই যে করেনি তার প্রমাণ আমি পরে পেয়েছি। স্থানীয় পুলিস অফিসার শ্যামল লাহিড়ীও সোমনাথ সম্বন্ধে কোন অবৈধ কীর্তিকলাপের নজির দেখাতে পারেননি।

এর পর যে ব্যাপারটা মনে আসতে পারে তার হল কিড্‌ন্যাপিং।

এই পয়েন্টটা নিয়ে আমি বেশ গোলমালে পড়েছিলাম। এমনও হতে পারে, ও নিজের অজান্তে কারো শত্রু হয়ে গিয়েছিল। তারাই হয়তো সোমনাথকে সরিয়ে দিয়েছে। তাহলে তারা কারা? হয় তারা কোন রাজনৈতিক দলের নয়তো কোন গুণ্ডা দল।

কিন্তু এর কোনটার সঙ্গেই সোমনাথের কোন সংশ্রব ছিল না। রাজনীতি সোমনাথ করতো না। শুধু গীতা নয় আশেপাশের কোন প্রতিবেশীই সোমনাথকে রাজনীতি করতে দেখেনি। ওখানকার কোন রাজনৈতিক দলই সোমনাথ রায়ের নামও শোনেনি।

তাহলে আর কী হতে পারে? খুন? অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে সে কারো শত্রু হয়ে উঠেছিল, যা তাকে মারতে পারলে কারো লাভ হবে এই কারণে ওকে কেউ হত্যা করেছে। যদি তাই হয় লাশটা গেল কোথায়? সেটা কী গুম করা হয়েছে? তদন্তটা শুরু করলাম ঐ রাস্তায়। আসলে এইরকম একটা আপাত উদ্দেশ্যহীন রহস্যের ব্যাপারে যে কোন একটা পয়েন্টকে বেস্ করে এগোতে হয়। আমি ওয়ার্স্টটাই ধরে নিয়েছিলাম কেউ ওকে খুন করেছে।

কিন্তু কে? কে ওর শত্রু হতে পারে? শ্বশুরবাড়ির অমতে ও বিয়ে করেছিল। তবে কি তারাই? কিন্তু না, তা হতে পারে না। আগেকার কালে রাজামহারাজার ক্ষেত্রে অনেক সময় এমন ঘটনা শোনা গেছে। কিন্তু এই বিংশশতাব্দীতে সাধারণতঃ কোন বাবা-মাই তার মেয়ের বৈধব্য দেখতে চান না। এর অর্থ বাইরের কেউ। তাহলে ওর শত্রু হোতে পারে এমন কাছের লোক কে?

অর্থনৈতিক কারণে কেউ সোমনাথকে খুন করবে না এটা গ্যারান্টি দেওয়া যেতে পারে। কারণ ও দিনআনা দিনখাওয়া দলের লোক। শ্যামল লাহিড়ীর স্টেটমেন্ট অনুসারে কোন গোপন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল না, কোন গুণ্ডাদলের সঙ্গেও আটাচড্ না। এমন কী ও পুলিসের ইনফর্মারও নয়। বাকি থাকছে ওর কর্মস্থল। দিনের অধিকাংশ সময় যেখানে ওর কেটে যেত।

সেখানে দেখলাম ওর সুহৃদের অভাব। ম্যানেজার ওকে চোর বলছে। মালিক বলছে, সোমনাথ চোর ও মাতাল দুইই। ওদিকে গীতা দেবী বলছেন ও মদ খেত না। গণ্ডগোলে পড়লাম। তবে কি সব জট এখানেই? রহস্যের শুরু হয়েছে কি এখান থেকেই?

তুই মাঝে মাঝে আমাকে রঞ্জন সোম আর উপমা সোমের দাম্পত্য প্রেমের গল্প শোনাতিস। সেসব ঠিক মন দিয়ে শুনতাম না। তোর হয়ত মনে আছে হঠাৎ ভক্তিগড়ে গুঞ্জন সোমকে দেখে তোর মুখ থেকে একটা শব্দ বেরিয়েছিল 'একি রে'? সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে খটকা লাগল। একটু চিন্তা করতেই মনের মধ্যে গুঞ্জনের গুঞ্জন শুনতে পেলাম। দেখতে পেলাম তাকে কেন্দ্রবিন্দুর মধ্যমণি হিসেবে। অবশ্য তখনও কোন প্রমাণ পাইনি। কেবল একটা সন্দেহের পোকা মাথার মধ্যে বিজবিজ শুরু করে দিয়েছিল নামেতে মিলটা বোধহয় সব থেকে বেশি কানে বেজেছিল। রঞ্জন সোম আর গুঞ্জন সোম। যদিও রঞ্জন সোম ইতিমধ্যেই ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন। আর তার বিধবা, স্বামীর মৃত্যুর মাস চারেক পরই অন্য পুরুষে আসক্তা।

ব্যাপারটা বেশ ভাবিয়ে তুলল। মেয়েরা অনেক সময় দ্বিচারিণী হয়। স্বামী মারা যাবার পর অন্য পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ জগতে নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু তুই যে একনিষ্ঠ প্রেমের কথা বলেছিলি তার সঙ্গে একটা মিলছিল না। পুরুষের ক্ষেত্রে এরকম হলে আশ্চর্য হতাম না। কিন্তু সাধ্বী স্ত্রী হিসেবে উপমা এত তাড়াতাড়ি আর এক পুরুষের সঙ্গে রীতিমত ব্যভিচারে লিপ্ত, এটা আমার কাছেও স্বাভাবিক মনে হয়নি।

শ্যামল লাহিড়ীর কাছে খবর নিতেই জানা গেল তেরই আগস্ট বানিগঞ্জের কাছে থেঁৎলানো একটা বডি পাওয়া গিয়েছিল। শনাক্ত করেছিল মৃতের স্ত্রী উপমা। ছুটলাম বানিগঞ্জ। খবর নিয়ে জানলাম মৃতের ডান হাতে উল্কির চিহ্ন দেখেই তাঁর স্ত্রী তাঁকে সনাক্ত করেছেন। উল্কিতে লেখা ছিল 'সোম'।

সাধারণত লোকে হাতের উল্কিতে সারনেম ব্যবহার করেন না। কিন্তু রঞ্জন সোম নাকি তাই করেছিলেন, উপমাদেবীর স্টেট্‌মেন্ট অনুযায়ী। তবে মতলবটা কী জানিস, স্বামী স্ত্রী বেশ প্ল্যান করেই খুনের পরিকল্পনা করেছিলেন। বাট ক্রাইম ডাজ নেভার পে। রঞ্জন সোম চাকরিপ্রার্থী সোমনাথের হাতে 'সোম' লেখা দেখেই তাকে বলির পাঁঠা হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। ওঁদের পরিকল্পনা মতো সব কাজই ঠিক হয়েছিল। কিন্তু একটা জায়গায় দুজনের ভুল হয়েছিল। সেটা ওঁদের কারো পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। একমাত্র জানতেন গীতা রায়। সোমনাথের পিঠে ছিল একটা ছ'ইঞ্চি সেলাই এর দাগ। অপারেশন মার্ক। বানিগঞ্জে পুলিস রিপোর্ট দেখেই আমি সন্দেহমুক্ত হলাম লোকটা সোমনাথ। গীতা দেবীর হতভাগ্য স্বামী। গীতা দেবীর কাছেও পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম সোমনাথের ডানহাতেও উল্কির চিহ্ন ছিল। ছোটবেলার খেয়াল আর কি।

নিহত ব্যক্তিই যে সোমনাথ তার আরো বড় একটা প্রমাণ পেয়েছিলাম।

খড়্গপুরের স্টেশন মাস্টার রমেনবাবুর কাছে খবর নিতেই জানা গিয়েছিল বারই আগস্ট রাতের ট্রেনে সোমনাথ আর গুঞ্জন সোম ফার্স্ট ক্লাশে উঠেছিলেন একই সঙ্গে। এবং রমেনবাবু নাকি আশ্চর্য হয়েছিলেন সোমনাথকে ঈষৎ মত্ত দেখে। যা তিনি এর আগে কোনদিনও দেখেননি। সোমনাথের মাঝে মধ্যে সামান্য যে মদ্যপানের অভ্যেস ছিল গীতা দেবী একথা আমার কাছে স্বীকার করেননি। হয়তো স্ত্রী হিসেবে স্বামীর দুর্বলতা প্রকাশ করতে চাননি। কিন্তু তিনি যদি প্রথম থেকেই এ কথাটা স্বীকার করতেন তাহলে আমার খানিকটা সুবিধা হত। কারণ পুলিস রিপোর্টে আর সোমনাথের সঙ্গে অন্য সব কিছু মিলে গেলেও পোস্টমর্টেমে মৃতের পাকস্থলীতে পর্যাপ্ত মদের উপস্থিতি আমাকে আর একটা ধন্দের মধ্যে ফেলেছিল।

সে যাইহোক, এরপর সোমনাথকে খুন করতে গুঞ্জন ওরফে রঞ্জনের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। তার মদ্যপানে শিথিল এবং বেহুঁশ দুর্বলতার সুযোগে তাকে ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দিতে মিস্টার সোমের পক্ষে এমন কিছু শক্ত ছিল না।

গুঞ্জন যে খুনি এটা মাথায় ঢুকিয়েছিল গুঞ্জন নিজেই। খুনির স্বভাব দেখাবি সুযোগ পেলেই তদন্তকারীকে মিস্‌গাইড করা। সে ইচ্ছে করেই বলেছিল সোমনাথের বাঁ হাতে উল্কি আছে। রিপোর্টে যখন দেখলাম মৃতের ডান হাতে উল্কি। তখনই বুঝেছিলাম গুঞ্জন আমাকে মিসগাইড করছে। তখন থেকেই ওর উপর আমার সন্দেহটা বদ্ধমূল হল। তার ওপর গুঞ্জন সোমনাথের ওপর এলোপাথাড়ি নিন্দা করেছিল। যা আশপাশের কোন লোকের বক্তব্যের সঙ্গে মিল খায় না। আর একটা গণ্ডগোল করেছিল গুঞ্জন। হিসেবের গণ্ডগোল। বোঝাপড়ার গণ্ডগোল। সে বলছে দশহাজার টাকার জিনিস নিয়ে সোমনাথ উধাও হয়েছে। আর ম্যানেজার বলছে একহাজার টাকা। ছেলেমানুষি ভুল সব।

এ তো গেল খুন হওয়া এবং খুনির খোঁজ পাওয়া। কিন্তু মোটিভ? মোটিভ না পেলে তো প্রমাণ করা যাবে না যে গুঞ্জনই সোমনাথকে খুন করেছে। এ কেসে ঐ মোটিভটাই হচ্ছে বড় গোলমেলে। বড় গোলকধাঁধার ব্যাপার। যে দুর্ঘটনার মধ্যে প্রথমেই মোটিভটা খুঁজে পাওয়া যায় সে রহস্য সমাধান করতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু সোমনাথ হত্যার রহস্য খুঁজে বার করতে আমাকে হিমসিম খেতে

হয়েছিল। সাদা চোখে তুই কিছুতেই খুঁজে পাবি না কেন গুঞ্জন অথবা রঞ্জন সোমের মতো একজন লোক নির্বাহ সোমনাথকে খুন কবল?

সোমনাথ ভুলেও কোনদিন গুঞ্জন ওবফে রঞ্জনের কোন ক্ষতিসাধন করেনি। তার টাকাপয়সাও তছরুপ করেনি। তাব কোন দুর্বলতাব কথাও সে জানতে পারেনি। এমন কী নারীঘটিত কোন ব্যাপারও না। বঞ্জনেব স্ত্রীব প্রতিও সোমনাথেব কোন দুর্বলতা ছিল না। হয়ত কালেভদ্রে মনিব গিন্নীকে সে চোখের দেখা দেখেছে। কিন্তু অতি সচ্চবিত্র এবং সজ্জন সোমনাথ মুখ তুলে তার সঙ্গে কোন দিনও কথা বলেনি। তাহলে?

আসলে নিজেব অজান্তেই সোমনাথ হয়ে পড়েছিল বঞ্জনেব শিকাব। এ খুনেব চক্রান্ত অনেক দিনের। চৌরঙ্গীতে বঞ্জন বেশ ভালোই ব্যবসা কবছিল। ওবকম একটা জায়গায় অমন একটা হোটেল ভালো চলাবই কথা। কিন্তু তৃতীয় বিপু। বড মাবাত্মক। আব এই মাবাত্মক বিপুটিব দাস হয়েছিল স্বামী স্ত্রী উভয়েই।

আসলে কী জানিস অজু, মেড ফর ইচ আদার বলে একটা কথা আছে। রঞ্জন আর উপমার ক্ষেত্রে ঐ ফ্রেজটা ব্যবহাব কবা যায়। কী স্বভাবে, কী চবিত্রে, কী অপবিসীম দাম্পত্য প্রেমে ওবা সত্যিই আইডিয়াল। মিল প্রচুব। বিশ্বগ্রাসী টাকাব নেশা ছিল উভয়েরই। খবচের ক্ষেত্রেও উভয়েবই সমান উড়নচণ্ডী স্বভাব। একটা চালু হোটেলেব আয় যত ভালো হক, আয়েব তুলনায় ব্যয় যখন ডাবলে দাঁড়ায় তখন দেনা ছাড়া আব কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। দামি দামি মদ, প্রসাধন আব বিলাসীতায় অন্তহীন পয়সা এবং বেসের মাঠ, সব কিছুতেই দুজনে সমান আগ্রহী। স্বামীরা অনেক সময় এবকম হন কিন্তু স্ত্রীও যদি সেই তালে তাল দিয়ে চলতে থাকেন তাহলে কুবেরের ভাণ্ডারও শেষ হতে বেশি সময় লাগে না। তাবওপব ভক্তিগড়ে আব একটা নতুন ব্যবসা। সেখানেও প্রচুব ইনভেস্টমেন্ট। সব মিলিয়ে ওদের ডাইনে আঁয়ে করে সংসাব চলছিল। অনেকদিন থেকে স্বামী স্ত্রী ভাবছিল কীভাবে একসঙ্গে অনেক টাকা হাতে পাওয়া যায়। হঠাৎ ওদেব মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। সেটা হল মোটা টাকা ইনসিওব করে ইনসিওর কোম্পানিকে চিট কবা। অর্থাৎ বঞ্জনবাবু যদি নিজেব নামে ইনসিওর কবিয়ে হঠাৎ মাবা যেতে পাবেন তাহলে ওঁব স্ত্রী সেই সব টাকাব মালিক হতে পাবেন।

ফন্দিটা অনেকদিন থেকেই মাথাব মধ্যে ঘুবছিল। কিন্তু বাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কাবণ বঞ্জনবাবু না মবলে তো আব টাকাব ক্লেম্ কবা যায় না। অথচ রঞ্জন সত্যি সত্যি মরতে পাবেন না। তাহলে আব টাকা দিয়ে কী হবে? তাব মানে বঞ্জনেব বদলে অন্য কাউকে মবতে হবে এবং সেই লাশকে তাঁর স্ত্রী বঞ্জন বলে শনাক্ত কববেন। কিন্তু সেটা কী ভাবে সম্ভব—?

সম্ভব হল। ঘুবতে ঘুবতে সোমনাথ একদিন ভক্তিগড়ে চাকবিব উমেদাবি নিয়ে হাজির হয়েছিল গুঞ্জনেব কাছে। গুঞ্জনেব নতুন কবে লোক বাখাব কোন দবকাবই ছিল না। কিন্তু সোমনাথকে দেখেই গুঞ্জন চমকে উঠেছিলেন। অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল দুজনেব আকৃতিতে। মাথায় প্রায় দুজনেই সমান লম্বা দুজনেবই মাথায় কোঁকড়ানো চুল। চোখ নাক মুখেবও ধরন অনেকটা মিলে যায়। আর সব থেকে বড মিল যা ছিল, অর্থাৎ যেটি দেখে সোমনাথকে গুঞ্জনেব শিকাব হোতে হোল তা হোল, সোমনাথের ডান হাতে উল্কি চিহ্ন। যেখানে লেখা ছিল 'সোম'। কাবণ ঐ একই কথা গুঞ্জনেরও ডান হাতে লেখা ছিল। একজনেব নাম অন্য জনেব পদবি, এক। অতএব সোমনাথকে খুন হতেই হবে।

সোমনাথকে চাকবি দিয়েই গুঞ্জন আব একদিনও দেরি কবেননি ইনসিওব কবাতে। তারিখটা মিলিয়ে দেখে নিয়েছি। সোমনাথের চাকবি পাওয়া এবং রঞ্জন সোম নামে পলিসি করাব দিনগত পার্থক্য ছিল মাত্র ছদিনেব।

হ্যাঁ, আব একটা কথা। উপমা সোম মিথ্যে কথা বলেছিলেন। ইনসিওরেন্সের অ্যামাউন্ট ছিল দশ লক্ষ টাকা। এক লক্ষ নয়। চৌরঙ্গীব কাছে মনোরমা হোটেলের মালিক দশ লক্ষ টাকার ইনসিওর করলে খুব একটা জবাবদিহি বা সন্দেহেব অবকাশ থাকে না। কবাটাই স্বাভাবিক।

আর একটা প্রশ্ন বোধহয় ঠিক এই মুহূর্তে তোর মনে জাগছে। কলকাতার রঞ্জন সোম কেন ভক্তিগড়ে গুঞ্জন সোম নামে ব্যবসা ফাঁদলেন? তারও কারণ আছে। আগেই বলেছি সোমনাথ খুন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং পূর্বপরিকল্পিত। অনেক আঁটোসাটো ফন্দিতে ওঁরা কাজে নেমেছিলেন। রঞ্জন সোম মারা গেলে তো আর পৃথিবীতে রঞ্জন সোমের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। অথচ রঞ্জন সোমকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতেই হবে। তাই কলকাতার রঞ্জন সোমকে ভক্তিগড়ে গুঞ্জন সোম নামে ব্যবসা ফাঁদতে হয়েছিল। মৃত্যুর পর রঞ্জন সোমকে বেঁচে থাকতে গেলে চেনাজানা অনেকের কাছেই কৈফিয়ত দিতে হয়। সবার জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে হত। সবাইকে বারবার বলে বোঝাতে হত যে সে রঞ্জন সোম নয়। তার যমজ ভাই গুঞ্জন সোম। তাই কলকাতার পরিচিত জগৎ থেকে যতটা দূরে সরে থাকা। কম প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার জন্যই ভক্তিগড়ে ব্যবসা ফাঁদা। ভক্তিগড় একটা নয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট। ব্যবসা দাঁড়িয়ে যেতে খুব অসুবিধা হবার কথা নয়।

তারপর একদিন সব কিছু ঝঞ্ঝাট মিটে গেলে, টাকা-পয়সা হাতে চলে এলে পাকাপাকি ভক্তিগড়ে এসে বাস। এরপর 'বুড়ো বয়েসে বিয়ে করেছি' এমন একটা লোক দেখানো অনুষ্ঠান করে একদিন নিজের পুরনো স্ত্রীকে নতুন করে বিয়ে করে ভক্তিগড়ে স্থায়ী বসবাস শুরু করতেন। কলকাতার হোটেল দেখার জন্য শ্রীমন্ত সরকারের মতো বিশ্বাসী লোক তো আছেই। তেমন তেমন হলে অনেক টাকা সেলামি নিয়ে একটা চালু হোটেল বিক্রি করতে কতক্ষণ?

এরপর শুরু হল সোমনাথ হত্যার পরিকল্পনা। এবং পরিকল্পনাটা একদিন কার্যকরী হল। একটা মাতাল লোককে ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া খুব শক্ত কাজ নয়। সোমনাথকে মদের নেশাটা আমার যতদূর মনে হয় গুঞ্জন ওরফে রঞ্জনই ধরিয়েছিলেন। কিন্তু আর একটা ব্যাপার এখনও আমার কাছে অজানা থেকে গেছে।

চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দিলে একটা লোক ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় মারা যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই পতনে তার মুখবিকৃতি ঘটবেই এমন কথা কেউ হলফ করে বলতে পারে না। অথচ মুখের বিকৃতি আনতেই হবে। নইলে সোমনাথ কিছুতেই রঞ্জন সোম হতে পারবে না। এক্ষেত্রে, আমার অনুমান, সে রাত্রে ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে যাত্রী ছিল না বা কম ছিল। আর প্রথম শ্রেণীর আরামপ্রিয় যাত্রীরা রাতের জার্নিতে সাধারণত ঘুমিয়েই থাকেন। সেই সুযোগে গুঞ্জন সোমনাথের অতিরিক্ত মদাপানে বেহুঁশ এবং শিথিল দেহটা বগির দরজা দিয়ে নিচে ঝুলিয়ে দিয়েছিল ওপর থেকে পা দুটো শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে। তারপর যখন মনে হয়েছিল অবিরাম ছেঁচড়ানির ফলে মুখের আর কিছু অবশিষ্ট নেই তখন একসময় টুক করে পায়ের দড়ি খুলে দিতেই সব শেষ। বডিটা গড়িয়ে গিয়ে একসময় পড়বে রেল লাইনের ধারে।

এ সবই আমার অনুমান। নাও মিলতে পারে। তবে পি এম রিপোর্টে মৃতের পায়ের গোছে চেপে বসা দড়ির দাগ ছিল। রিপোর্ট আমি দেখেছি। তুই এক্ষেত্রে বগির কনডাক্টর গার্ডের ফাঁকবা তুলতে পারিস। তবে দশ লক্ষ টাকা থেকে কনডাক্টর গার্ডের বাবদ কিছু খরচ তো করতেই হবে। আসলে কী যে সে রাতে ঘটেছিল তা একমাত্র রঞ্জনই বলতে পারতেন, বেঁচে থাকলে।

বাস্ আর বোধহয় তোর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। থাকলে ফিরে এসে উত্তর দোব। উপমার ক্ষেত্রে তোর প্রথম ধারণাটাই ঠিক। দাম্পত্য প্রেমের এমন অসাধারণ নজির চট করে দেখা যায় না। ওরা যত খারাপ লোকই হোক, ভালবাসার ক্ষেত্রে পরম ঐকান্তিক, কী জীবনে কী মরণে।

বঙ্কিমকে বলিস এবারও ও আমার জন্যে অনেক করেছে। পুরো একরাত্তির ভোরো পোস্ট বক্সটার পাশে বসেছিল। উপমার বাড়ির খোঁড়ামুখো চাকরটাকে টাকা খাইয়ে রঞ্জনের কাছে সে রাত্রে উপমার লেখা সাবধান বাণীর চিঠিটা হস্তগত করেছিল। বঙ্কিমের বাহাদুরির জন্যেই সে রাত্রে চাকরটা দরজায় 'টুকটুক' আওয়াজ পেতেই দরজা খুলে দিয়েছিল। বঙ্কিমকে বলিস, আমি ফিরে এসে ওর উপযুক্ত পারিশ্রমিক দোব।

দুটি কারণে আমার খুব খারাপ লাগছে। যে তদন্তের কাবণে ভক্তিগড়ে যাওয়া অর্থাৎ গীতাদেবীর স্বামীকে খুঁজে পাওয়া। খুঁজে তো পেলাম। কিন্তু যা পেলাম তা নিয়ে গিয়ে গীতাদেবীর সামনে কি দাঁড়ানো যায়? নীল ব্যানার্জি অনেক কিছু পারে না যার একটি হল গীতা দেবীকে গিয়ে বলা যে আজ আমি নিঃস্ব। আসলে কিছু অপ্রিয় সত্য যে বলে ওঠা যায় না বে। নীল ব্যানার্জি আবও একটা জিনিস পারে না। বিশ্বাস কর তোকে এবারে আমাব সঙ্গী করতে পাবলাম না বলে। কী করব বল? লাভ সীনে সাঁকো বাখা যায়? তুই বল। বুকে হাত দিয়ে। ভালবাসা বইল।

তোব নীল

চিঠিটা পড়লাম। নীলেব বাড়িতে বসেই। পড়া শেষ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। মনটা বড় খাবাপ লাগছিল। অনেকেব জন্যেই। সোমনাথ গীতা রঞ্জন উপমা। এরা সবাই অদৃশ্য নির্যাতনের শিকাব। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে আব একটা কাবণেও মনটা বিশেষ ভাব ভার। নীল ভালবেসেছে তার জন্যে নয়। সে তো সুখেব কথা। কিন্তু ও যদি নন্দিনীকে পেয়ে আমাকে ভুলে যায়? নীলকে হারালে আমার আব কী বইল?

ব্ল্যাকপ্রিন্স

ফোনটা বাজতেই আমি আর নীল পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। এ তাকানোর অর্থ একটাই, সত্যি ফোন বাজে। কলকাতা শহরে বাস করে কেউ বুকে হাত দিয়ে হলফ করে বলতে পারবে না গত একবছরের মধ্যে তার ফোন একবারও বিকল হয়নি। এ শহরে অনেক কিছুই সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। আমি অন্তত কোনদিনও দেখিনি ধুতি-পাঞ্জাবি পরা কোনো চীনেম্যানকে। কোনো কাবুলিওয়ালাকে কখনো গঙ্গাস্নান করতে কেউ দেখেছে কি না জানি না। আজ পর্যন্ত কোনো জাপানি ফুচকাঅলা আমার চোখে পড়েনি। এ সবই দুর্লভ ঘটনা। এর থেকেও দুর্লভ ঘটনা বছরের পর বছর ফোন সচল থাকা। প্রায় দিন দশেক নীলের ফোন খোঁড়া হয়ে বসে আছে। ইলেকট্রনিক্‌স্ হওয়া সত্ত্বেও। এবং আমাদের ধারণা যখন বদ্ধমূল হয়ে গেছে ফোন নামক যন্ত্রটি নিতান্তই একটি অচল আসবাবমাত্র ঠিক তখনই বেজে উঠল একটি মধুর শব্দ, ক্রিরিং... ক্রিরিং...।

ফিসফিসিয়ে নীলকে বললাম,—ওটা বাজছে।

—তুই বড় অল্পেই অধৈর্য হোস, বলেই নীল উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল। তারপর ওকে বলতে শুনলাম,—হ্যাঁ.....কথা বলছি...... বেশতো বলুন.....কী বললেন, খুন? কে..আই সী. হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চযই যাব.....ঠিকানাটা বলুন।

পাশে রাখা রাইটিং প্যাডের ওপর খস-খস করে ঠিকানা লিখল, তারপর বলল,- ঠিক আছে, এখুনি আসছি।

ফোনটা রেখে দিয়ে ও আমার মুখোমুখি চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল। দীনু একটু আগেই চা দিয়ে গেছিল। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। অবশ্য নীলের ঠাণ্ডা চা-ই ফেবারিট। চায়ে চুমুক দিতে দিতে নীল বলল,—এও এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

আমার হাতে তখন সেদিনের স্টেট্‌স্‌ম্যান। কাগজ থেকে চোখ না তুলেই ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, -অপ্রত্যাশিত বলতে?

—লোকে ভুল করে আজও আমাদের ডেকে পাঠায়।

—না পেঁচিয়ে সোজা করে বল।

—খুন জিনিসটা বড় সহজ হয়ে গেছে আজকাল। সাধারণ মানুষের কাছে বোধহয় এর কোনো গুরুত্বই নেই। রাজনৈতিক খুন তো লেগেই আছে আকচার। কেউ কেউ বড়জোর পুলিসকে খবর দেয়। কিন্তু গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে শখের গোয়েন্দাকে ডেকে পাঠানো

—যাক, অ্যাদ্দিন পর তোর একটা হিল্লে হল—তা কে তিনি, স্বনামধন্য কেউ?

—না, নিতান্তই এক সাধারণ অবলা।

—আবার বধূহত্যা?

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে নীল বলল,—ইনি বধূ নন। সদ্য যুবতী এবং কুমারী। ফোনটা করেছিলেন মেয়েটির দাদা। একটু আগেই তিনি বোনের মৃতদেহ আবিষ্কার করেছেন।

—তা, বসে রইলি কেন, যা।

—যাব তো বটেই, ভদ্রলোক যখন এখনও আমাদের সম্মান দেন তখন—, যাবি তো?

—কবে আর না বলেছি। যা ড্রেসটা পাল্টে আয়। তা কদ্দুর যেতে হবে?

—শ্যামপুকুর, বলেই নীল চলে গেল।

কাগজ পড়া হয়ে গিয়েছিল। নতুন কোনো উত্তেজক সংবাদ নেই। সেই খালিস্তান, গোর্খাল্যান্ড,

পশ্চিমবঙ্গে বন্যা, প্রধানমন্ত্রীর সফর। সবই নিয়ম-মাফিক। সবই বাঁধাধরা ফর্মুলায় চলছে। কিন্তু আমার বন্ধু নীল ব্যানার্জির উৎসাহিত হবার মতো খুনটুন আজকাল আর তেমন ঘটছে না। বধূহত্যা পুরনো হয়ে গেছে। ওর মধ্যে রহস্যের যা কিছু থাকে তা পয়সায় চাপা পড়ে যায়। এক অর্থে নীল এখন বেকার। গতানুগতিক নিজের ব্যবসা দেখে। রাত্রে বাড়ি ফিরে কোনদিন বিদেশী উপন্যাস আবার কোনদিন ক্রস ওয়ার্ড পাজল্। নিদেনপক্ষে, মন ভালো না থাকলে, রেকর্ডে পুরনো গানটান শোনা। এখন আবার রেকর্ড টেকর্ডও পুরনো আর বাতিল বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এখন ক্যাসেটের যুগ। সিডি'র যুগ। সময় বিশেষে নীল প্রাচীনপন্থী। রেকর্ড ছাড়া ও গান বা বাজনা শুনতে ভালোই বাসে না। ও বলে দুধ থাকতে ঘোল দিয়ে স্বাদ মেটানোর কোনো মানেই হয় না। তবে ইদানীং সিডি ওকে টানছে টেকনিক্যালি অনেক পারফেক্ট। অনেক শ্রুতিমধুর।

আমি একটা কলেজের অধ্যাপক। আমার ছাত্রটাত্র নিয়ে সময় কেটে যায়। কিন্তু নীলের বড় করুণ অবস্থা। রহস্য ছাড়া যে লোকটা মোটেও থাকতে পারে না, তার হাতে এখন আর কোনো জটিল রহস্যভেদের জট নেই। মনে মনে ভাবলাম অ্যাদ্দিন পর ও একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই নীল এসে পড়ল। ছুটির দিন। ওর মরিস মাইনরে শ্যামপুকুর পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না।

আমরা বুঝতে পারিনি, রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার আগেই রহস্য শুরু হয়ে গিয়েছিল। অকুস্থলে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা টের পেলাম। এখন পুজোর মুখ। আর ক'দিন পরেই বেজে উঠবে বোধনের বাজনা। কিন্তু এবারের পুজো ঠিক জমবে বলে মনে হয় না। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের ফলে আকাশ ভেঙে সমানে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। টানা এগোরো দিন সমানে বৃষ্টি। পশ্চিমবাংলার গ্রামগুলো জলে ভাসছে কলকাতাও বাদ যায়নি। বৃষ্টি থামলেও একটু নিচু এলাকায় এখনও জল দাঁড়িয়ে। এভাবে আর কিছুদিন চললে কলকাতা কোথায় দাঁড়াবে বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক জমা জল আর এবড়ো-খেবড়ো কলকাতা মাড়িয়ে আমরা যখন শ্যামপুকুরের ফোন নির্দিষ্ট বাড়িতে পৌঁছলাম তখন ঘড়িতে বাজে দশটা। সেদিন দিনটা ছুটির দিন তার ওপর ঝিপঝিপে বৃষ্টি, রাস্তাঘাট এমনিতেই ফাঁকা।

নম্বর মিলিয়ে যে বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম সেটিকে কোনোমতেই একালের বাড়ি বলা যায় না। উত্তর কলকাতায় এখনও কিছু বনেদি বাড়ি আছে। যদিও এখন অনেক বনেদি বাড়ি ভেঙে-চুরে আধুনিক করা হচ্ছে। পরিত্যক্ত অংশে ফ্ল্যাট সিস্টেমে বাড়ি বানিয়ে মোটা সেলামিতে ভাড়া দেওয়ার চল এসেছে। অথবা সেগুলো চলে যাচ্ছে বাঘা-বোয়াল সব প্রোমোটারদের হাতে। তবুও এ বাড়িটায় তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। গৃহস্বামীর নিশ্চয়ই অর্থাভাব ঘটেনি। বাড়িটি এখনও প্রাচীন কৌলিন্য বজায় রেখেই দাঁড়িয়ে আছে। এবং ফিটফাট অবস্থায়। বেশ বোঝা যায় বাড়িটি কিছুদিন আগেই রঙটঙ করা হয়েছে। বাড়ির সামনে ছোটখাটো একটা লন। আগেকার দিনের টানা রেলিং দরজা। লনটিতে বেশ কিছু ফুলগাছ। পাতাবাহারি গাছও আছে। এ ধরনের গেটওয়ালা বাড়ির গেটে একজন সাজগুজ করা দরওয়ানের অবস্থান আশা করা যায়। কিন্তু কোনো রক্ষীর দেখা পেলাম না। হয়ত বা বৃষ্টির কারণেই সে নেই। গেটের মুখে দাঁড়িয়ে নীল বার দুই হর্ন বাজাল। কিন্তু শশব্যস্তে কাউকে বেরিয়ে আসতে না দেখে বাধ্য হয়েই গাড়িটা ওখানে রেখে আমরা নেমে পড়লাম। রেলিং-দরজা ঠেলতেই সেটা খুলে গেল। গাড়িতে আসার জন্যে আমরা কেউই ছাতা-টাতা আনিনি। বাধ্য হয়েই আমাদের ভিজতে হচ্ছিল। চট্ করে তো কারো বাড়িতে ঢুকে পড়া যায় না। যদি কাউকে দেখতে পাওয়া যায় এই আশাতেই আমাদের দাঁড়িয়ে থাকা এবং ভেজা। কয়েক সেকেন্ড পর নীল বলল,— কী ব্যাপার বলতো? খুন জখমের ব্যাপার, অত্যন্ত জরুরি বলে ডেকে পাঠালো, অতবার হর্ন দিলাম কারো কোনো পাত্তাই নেই। বাড়িতে লোকজন আছে তো?

আমার সাদর ধাতে বেশিক্ষণ ভিজতেও পারছিলাম না। বললাম, — নিশ্চয়ই আছে, দেখ হয়তো গাড়ি বারান্দার নিচে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চ. আগে তো শেলটার নিই, তারপর দেখা যাবে।

ছুটতে ছুটতে গাড়ি বারান্দার নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম। এদের পয়সা আছে বেশ বোঝা যায়। একটা অ্যামবাসাডার, একটা মারুতি। কিন্তু আশ্চর্য, সেখানেও কোনো লোকজন নেই। আরো একবার নিজেদের মুখ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। তারপর নীলই এগিয়ে গিয়ে ভেজানো বড় দরজার সামনে গিয়ে কলিং-বেলে চাপ দিল।

রুমাল দিয়ে মাথার জল শুষে নিতে নিতে নীল বলল,—এরকম তো হয় না। ভদ্রলোক বললেন, উনি দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে থাকবেন,

বাধা দিয়ে বললাম, —দুর্ঘটনার বাড়ি। হয়তো সবাই ভেতরেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

মাথা নাড়তে নাড়তে নীল বলল,—হবে হয়তো।

অবশ্য আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। মিনিট খানেকে মধ্যেই একজন মধ্যবয়েসী লোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালো।

নীলই বলল,—এটা কী শিশির মল্লিকের বাড়ি?

আমাদের দু'জনকে একবার অপাঙ্গে দেখে নিয়ে লোকটি বলল, — আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনারা?

- আমাদের আপনি চিনবেন না। ওনাকে গিয়ে বলুন নীলাঞ্জন ব্যানার্জি এসেছেন।

--কিন্তু, ছোটবাবু তো কলকাতায় নেই।

আমার থেকে বেশি অবাক হল নীল। ভুরুটাও সামান্য কুঁচকে উঠল। সেইভাবেই ও প্রশ্ন করল, - শিশিরবাবু কলকাতায় নেই? আপনি ঠিক জানেন?

বোধহয় লোকটা সামান্য বিরক্ত হোল। মুখে সে-ভাব প্রকাশ না করে বেশ গম্ভীর হয়েই বলল, -ছোটবাবু প্রায় দিনদশেক ব্যবসার কাজে মুম্বাই গেছেন। ওই তো দেখুন না ছোটবাবুর মারুতি ওখানেই রয়েছে।

--আশ্চর্য, নীল আমার মুখের দিকে তাকাল।

এবার আমিই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম,—এমনও তো হতে পারে, উনি এসেছেন অথচ আপনি জানেন না।

চাপা বিরক্তিটা এবার প্রকাশ পেল,— ছোটবাবুর ফিরতে এখনো চারদিন বাকি। স্টেশনে আমিই বাবুকে আনতে যাব ওনার গাড়ি নিয়ে।

এবার আমারই যেন কেমন সন্দেহ হল নীলের ওপর। রহস্য পাগল ছেলে ও। রহস্য-টহস্য না পেয়ে পেয়ে বোধহয় মনে মনে হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই এক মনগড়া রহস্য তৈরি করে নিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়েছে। হয়তো এ এক ধরনের মানসিক তৃপ্তি অথবা বিকৃতি। তবু নীল যে এ ধরনের পাগলামি করবে সেটা ভাবতেও মন চাইছিল না। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম এক অদ্ভুত মজা পাওয়া মুখে ও লোকটিকে নিরীক্ষণ করে চলেছে। আমিই বাধ্য হয়েই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম,—কিন্তু উনি আজ সকালে আমাদের ফোন করেছিলেন।

--বিরাট টেকনিক্যাল ফল্ট। প্রায় দিনসাতেক আগে ডকেট করা হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও আমাদের ফোন চলছে না।

হঠাৎ নীল প্রশ্ন করল,--মীনাক্ষী মল্লিক বলে এ বাড়িতে কেউ আছেন?

সাতসকালে এত প্রশ্ন হয়তো লোকটির ভাল লাগছিল না। সে বলল,—হ্যাঁ আছেন। দিদিমণি। মানে ছোটবাবুর বোন।

—তিনি কোথায়?

—কোথায় আবার? তাঁর নিজের ঘরে।

—আপনি ঠিক জানেন?

লোকটি বোধহয় আর ধৈর্য রাখতে পারল না। ফস করে বলে ফেলল,—'আপনারা কে? কোত্থেকে আসছেন? ঠিক কাকে আপনারা চাইছেন বলুন তো?

—বলছি। তার আগে একটা প্রশ্ন করি। আপনার দিদিমণি কি বেঁচে আছেন? মানে আপনি কি

তাঁকে আজ সকালে জীবিত দেখেছেন?

সকালে উঠেই আমরা নির্ঘাৎ গাঁজা খেয়েছি, এমনি একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে লোকটি বলল,— দিদিমণি এখুনি কোথাও বেরুবেন। তাই একটু আগেই আমি তেনাকে চা জলখাবার দিয়ে এসেছি।

বোকার বেহদ্দ হয়ে নীল বলতে বাধ্য হল,—একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করা যাবে?

—পর্দানশীন নন। এখনি বেরুবেন। একটু অপেক্ষা করুন। দেখা হয়ে যাবে।

পাগলদের সঙ্গে বেশি ভ্যান ভ্যান করা ভাল নয় এমন একটা ভঙ্গিতে লোকটা চলে গেল। নীলকে ক্যাবলা হতে কখনো দেখিনি। অদ্ভুত বোকা বোকা আর ফ্যালফেলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল,—কী রকম হল ব্যাপারটা? আজ তো পয়লা এপ্রিল নয়।

তুই ঠিক শুনেছিলি?

—বাজে বকিস না। কিন্তু এ কী নিছক রসিকতা? ওয়েল, আগে মহিলার সঙ্গে দেখা করে নিই।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দরজা ঠেলে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। হ্যাঁ, তাকিয়ে থাকার মত রূপসী নিঃসন্দেহে। বছর বাইশ-তেইশের বেশি বয়েস হবে না। পুরনো কলকাতার ইতিহাসে বনেদি জমিদার বাড়ির মেয়ে বৌদের একটা টিপিক্যাল সৌন্দর্য আছে। দেখলেই বোঝা যায় এ মেয়ে কিন্তু সাধারণ বাড়ির সুন্দরী নন। বনেদি আভিজাত্য সর্বাঙ্গে জড়ানো। অবশ্য একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে দাঁড়িয়ে নারীরা আরও অনেক বেশি রূপ সচেতন হয়েছেন। পোশাকে-আশাকে বিলাস-বসনে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বড় বাড়ির বৌ মেয়েদের মতো চিকের আড়ালে থেকে জীবনকে উপভোগ করার পরাধীনতা কেটে গেছে। আজ এঁরা অন্দরমহল ছাড়িয়ে প্রকাশ্য রাজপথে এসেছেন। দিব্যি নিউমার্কেটে বাজার করছেন। এসি মার্কেটে গাড়ি পার্ক করে প্রসাধন সামগ্রী কিনতে কোনো অসুবিধা নেই। আজ এঁরা যথেষ্ট আলোকপ্রাপ্তা। তথাকথিত কৌলিন্যের বেড়াজাল কাটিয়ে স্ত্রী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন।

মীনাক্ষীকে দেখলেই বোঝা যায় ইনি কেবল সুন্দরী নন, যথেষ্ট বিদুষী। তবুও, ঐ যে বললাম বনেদি সৌন্দর্য, সেটি কিন্তু মুখে প্রকট। রঙটি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। একরাশ কোঁচকানো কালো চুল, যদিও তা বিউটি পার্লারে বিশেষ ছাঁদে ইউ সেপে কাটা। মসৃণ কপাল। দীর্ঘায়ত নয়ন। তীক্ষ্ণ নাসিকা, আর দৃঢ় চিবুক এনেছে চারিত্রিক গভীরতা। বৃষ্টির কারণেই একটি লাল বর্ষাতিতে আগাগোড়া ঢাকা। আমাদের দুজনকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেয়েটির মুখে চোখে সামান্য বিস্ময় ফুটে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনারা?

উত্তরটা নীলই দিল, —নিশ্চয়ই আপনি মীনাক্ষীদেবী?

—হ্যাঁ, কিন্তু?

বিনা বাক্যব্যয়ে নীল পকেট থেকে ওর কার্ডটা এগিয়ে ধরল। কার্ডটি হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে ভ্রূ যুগলে ভেসে উঠল কুঞ্চন রেখা। মুখের সে-ভাবটি বজায় রেখেই মীনাক্ষী বললেন,—প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর? বাট হোয়াই? ইজ দেয়ার এনিথিং রং?

—ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না, অথচ একটা অদ্ভুত মজার ব্যাপার ঘটেছে।

—মানে?

—আচ্ছা শিশির মল্লিক?

আমার দাদা। মানে, ছোড়দা।

—সম্ভবত তিনি এখন কলকাতায় নেই, মানে এখানে এসেই শুনলাম। অথচ একটু আগে তিনিই নাকি আমাকে ফোন করেছিলেন?

—করতে পারেন। তিনি তো মুম্বাই গেছেন। হয়তো এস টি ডি।

—না, এস টি ডি নয়। ফোন কলকাতা থেকেই করা হয়েছিল।

—যদিও আমি ঠিক আপনার কথাবার্তা বুঝতে পারছি না, তবু এ ব্যাপারে আমি কী করতে পারি?

ব্যাপার,

—না মীনাক্ষীদেবী, আপনাকে বাদ দিয়ে ঘটনাটা নয়। প্লিজ, ইফ য়ু ডোন্ট মাইন্ড, আপনি কী সময় আমাকে দিতে পারেন? হয়তো আপনি কোথাও বেরুচ্ছিলেন,

—হ্যাঁ টেনিস ক্লাবে একটা জরুরী মিটিং আছে। আরও আগেই যাওয়া উচিত ছিল। এনিওয়ে আপনি কতক্ষণ সময় নেবেন?

—ধরুন দশ থেকে পনেরো মিনিট।

মীনাক্ষী একবার হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বললেন,— বেশ ভেতরে আসুন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো কথা হয় না।

আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম। আধুনিকতার ছোঁয়া থাকলেও বনেদিআনার প্রায় ষোল আনাই রয়েছে। দেওয়ালে বড় বড় সব অয়েল পেন্টিংস। পুরনো আমলের ওয়েস্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানির দেওয়াল ঘড়ি। দুদিকে দুটো বাঘের মাথা মাস্ক করা হয়েছে। মেঝেটা পুরো কালো দামি পাথরে বাঁধানো। বড় বড় সোফা কৌচ। ঢাউস কাচের আলমারিতে ঠাসা বই। একটা বড় সোফায় দুজনে গিয়ে বসলাম। মীনাক্ষী আমাদের সামনে অন্য সোফায় বসতে বসতে বললেন,—নিশ্চয়ই চা চলবে?

নীল সামান্য মাত্র দ্বিধা না করে বলল,—এর থেকে সুপ্রস্তাব আর কীই বা হতে পারে?

নীলের কথা বলার ধরনে মীনাক্ষী হেসে গলা তুলে ডাকলেন, —শঙ্করদা, শঙ্করদা.।

পূর্বোক্ত লোকটি ধীরে ধীরে ঘরে এসে দাঁড়াল। ঈষৎ বিরক্ত দৃষ্টিতে আমাদের দুজনকে একবার আড়চোখে দেখে নিল। তারপর বলল,—কিছু বলবে দিদি?

—এঁরা ভিজে এসেছেন। একটু চায়ের ব্যবস্থা কর।

কিছু না বলে শঙ্কর নামক ব্যক্তিটি চলে গেল। মীনাক্ষী আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল,—এবার বলুন মিস্টার ব্যানার্জি, আপনার মজার ঘটনাটা কী?

—প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, বলে নীল একটা সিগারেট ধরাল। তারপর সরাসরি মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আজ সকালে আমার কাছে একটা ফোন এসেছিল। যিনি ফোন করেছিলেন তিনি জানালেন তাঁর নাম শিশির মল্লিক। ঠিকানা দিলেন এই বাড়ির।

—বেশ, তারপর?

—ফোনে আমাকে জানানো হল মানে সেই অদৃশ্য ব্যক্তিটি আমাকে বললেন, আজ সকালে তাঁর একমাত্র বোনকে মৃত অবস্থায় তাঁর বিছানায় পাওয়া গেছে।

—মাই গড, বলে মীনাক্ষী বেশ মজার চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি মারা গেছি।

—তা যে যাননি সেটা এখানে এসে বুঝতে পারলাম। কিন্তু এ মিথ্যে সংবাদ কেন, তা এখনও বোধগম্য হচ্ছে না।

—আর কী বললেন তিনি?

—বললেন, এটা ঠিক স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। কেউ একজন আপনার গলায় নাইলন দড়ির ফাঁস লাগিয়ে খুন করেছে।

এবার মীনাক্ষী হো হো করে হেসে ফেললেন। যাকে দেখতে ভাল তার বোধহয় সবটাই ভাল। এমন মনোরম, ঝকঝকে এবং সরল হাসি আমি বহুদিন দেখিনি। হাসতে হাসতেই মীনাক্ষী বললেন, —শুনেছি জীবিত কারও মৃত্যু-সংবাদ বা মৃত্যু-স্বপ্ন দেখলে তার আয়ু বেড়ে যায়। তার মানে আমি এখনও অনেকদিন বাঁচছি।

নীল কিন্তু হাসিতে যোগ দিতে পারল না। সে সামান্য গম্ভীর হয়েই বলল,—তাই যেন হয়। তবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এ কী নিছকই রসিকতা অথবা অন্য কিছু?

—অন্য কিছু বলতে?

—না, কিছু না। আচ্ছা মীনাক্ষী দেবী, আমি যদি আপনার পারিবারিক ব্যাপারে কয়েকটা ছোটখাটো প্রশ্ন করি, উত্তর পাব?

মীনাক্ষী সামান্য সময় চুপ করে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন,—এর আগে আমি আপনার কোনো নাম শুনিনি। শখের গোয়েন্দা শব্দটা ডিটেকটিভ বইয়ে পড়েছি। আজ সামনাসামনি দেখছি। যদিও বাধ্যতামূলকভাবে আপনার কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই, তবু আপনি যেহেতু ভদ্রলোক, সেই যুক্তিতেই আপনার 'অবাঞ্ছিত নয়' এমন কিছু প্রশ্নে জবাব আমি দিতে চেষ্টা করব।

—আপনাদের বাড়িটা তো বিশাল। বাইরে থেকেই বোঝা যায়। এতবড় বাড়িতে আর কে কে আছেন?

—লোকজন এ বাড়িতে খুবই কম। বাবা মারা যাবার পর বাড়িটা দুভাগ হয়ে যায়। এক বড়দা, দ্বিতীয় ছোড়দা। বড়দা থাকেন পিছনের দিকে, ছোড়দা এদিকে। আমরা দুভাই এক বোন। মা থাকেন বড়দার কাছে। আমি ছোড়দার সঙ্গে।

—এ বাড়িতে আপনার বা আপনার মায়ের কোনো অংশ নেই?

—পুরোটাই আমার মায়ের নামে। বড়দা ছোড়দার মধ্যে খুব একটা সদ্ভাব না থাকায় মা-ই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

—আর আপনার অংশ?

—আপাতত তেমন কিছু আমার জানা নেই। তবে আমার তো থাকা খাওয়ার কোন অভাব নেই। বড়দার অংশেও আমার ঘর আছে। এ অংশেও আছে। আর খাওয়া-দাওয়া? যখন যেখানে খুশি। আমার অবারিত দ্বার। তাছাড়া আমার নিজের অ্যাকাউন্টেই অঢেল টাকা।

—বুঝলাম। আচ্ছা, ব্যক্তিগতভাবে কি আপনার কোনো শত্রু আছে?

—শত্রু? আমার? ধ্যাৎ, কী যে বলেন?

—বড়দার সংসারে কে আছেন?

বড় বৌদি, আর দুই ছেলেমেয়ে, টুকাই, বুবাই।

—আর ছোড়দা?

—ছোটবৌদি, আর ওদের একমাত্র ছেলে অন্তু।

—চাকর বাকর কজন আছে?

বড়দার সংসারে রাঁধুনি সমেত তিনজন। আর ছোড়দার দুজন। শঙ্করদা আর বনমালি।

ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছিল। সঙ্গে সামান্য স্ন্যাক্স। চা খেতে খেতে নীল বলল,—কিছু মনে করবেন না, কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করছি না, আপনাদের তো ব্যবসা। তো এ ব্যবসা কী পৈত্রিক

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের বংশের ব্যবসা। পাটের ব্যবসা। তবে সম্প্রতি ছোড়দা ব্যক্তিগতভাবে ইলেকট্রনিক্সের ওপর ঝুঁকেছেন। ওটা ওর নিজস্ব ব্যাপার।

—বড়দা এবং ছোড়দার তো বনিবনা নেই, তাহলে ব্যবসা?

মা তো এখনও মাথার ওপর আছেন। তেমন অসুবিধা হয় না। অ্যাকচুয়ালি এ যা কিছু দেখছেন গাড়ি বাড়ি ব্যবসা, সবই আমার মায়ের নামে। মা যাকে যা দেবেন সে তাই পাবে।

শুনতে শুনতে নীল বলল,—এ পর্যন্ত সবই স্বাভাবিক। তাহলে, ঠিক আছে মীনাক্ষী দেবী, আর আপনাকে বিরক্ত করব না, যদি তেমন কিছু প্রয়োজন পড়ে—

—প্রয়োজন মানে, আমার মৃত্যুসংবাদ?

—বালাই ষাট।

বেরিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ মীনাক্ষী প্রশ্ন করলেন, —মিস্টার ব্যানার্জি, এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

—একটা কেন, যত খুশি।

—আপনি কি কোনো মতলবে, অথবা ছলছুতোয় এ বাড়িতে এসে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে গেলেন?

নীল চকিতে ঘুরে তাকালো মীনাক্ষীর দিকে। মীনাক্ষীর চোখে স্পষ্ট অবিশ্বাসের ছায়া। অর্থাৎ নীলের কথাবার্তা বানানো এবং আজগুবি বলেই তার মনে হয়েছে।

নীল বলল,—আপনার সন্দেহ সত্যিই যুক্তিগ্রাহ্য। এটা সবাই মানবে। এমনকি আমি নিজেও নিজের ... রইল। এনি ওয়ে, আমার কার্ড রইল। লালবাজারে আমার সম্বন্ধে ইনফরমেশন নিতে পারেন। নমস্কার

গাড়িতে উঠতে উঠতে নীলকে বললাম,—মীনাক্ষী দেবীর জায়গায় অন্য কেউ হলে তোকে আরও ... হতে হতো। গোমড়ামুখে স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে নীল বলল,—ঠিকই বলেছিস।

দেখতে দেখতে দিন পনেরো কেটে গেল। মীনাক্ষীদের বাড়ি থেকে ফেরার পর নীল বেশ আঘাত ... পেয়েছিল। আসলে ঠিক এই ধরনের বোকা বানানো অদ্ভুত ব্যাপার এর আগে ওর জীবনে ঘটেনি। ঘটনাটাকে আমিও ভুলতে চেয়েছিলাম। হাসতে হাসতে ওকে একদিন বলেছিলাম, তোর ওপর ... চোর-ছ্যাচোড় কিংবা খুনে-বদমাইসের রাগ আছে। এমনিতে তোর কিছু অনিষ্ট করতে না পেরে ... খানিকটা হ্যাবাস করে রাগ উশুল করল। ব্যাপারটা ভুলেই যা।

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে নীল বলেছিল, —ভোলাটা সব দিক থেকেই ভালো। কিন্তু অনেক কিছুই তো ... ভুলতে পারি না, তাই কষ্ট পাওয়া আমাদের বাঁধা।

শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু নিয়তি অনিবার্য কারণে আমাদের ভুলতে ... ঠিক পনেরো দিন পর আবার এল সেই ফোন। ফোনটা তোলার আগে নীল কয়েক সেকেন্ড ... ফোনটার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর প্রায় আত্মস্থের ভঙ্গিতে বলল, —বোধহয় মীনাক্ষীদের বাড়ি থেকেই ফোনটা এল। আমি এই আশঙ্কাই করছিলাম। ফোনটা তোল তো। ... আমার বকলমে তুই কথা বল।

পাশের সোফায় গিয়ে নীল বসে পড়ল। ফোন তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল ... পুরুষ কণ্ঠ। কণ্ঠস্বর বেশ ভরাট এবং গম্ভীর। বললেন,—হ্যালো, আমি একটু নীলাঞ্জন ব্যানার্জির ... কথা বলতে চাই।

পাল্টা প্রশ্ন করলাম,—কিন্তু আপনি কে বলছেন?

—আমার নাম শিশির মল্লিক। উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর থেকে বলছি। আপনিই কী প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর নীলাঞ্জন ব্যানার্জি?

—হ্যাঁ, বলুন।

—খুব বিপদে পড়ে আপনাকে একটু বিরক্ত করছি।

—বিপদটা কী?

—আমার বোন খুব সম্ভবত খুনই হয়েছে।

—আপনার বোন খুন হয়েছেন? আশ্চর্য, এই তো সেদিন

হঠাৎ নীল আমাকে সজোরে চিমটি কাটল। তারপর ফিস্ ফিস্ করে বলল, সেদিনের কথা ... তোলার কোন দরকার নেই। যা বলছে শুনে যা। অগত্যা, নীলাঞ্জন ব্যানার্জির ভূমিকায় বলতে হল, —খুন হয়েছেন এতটা ডেফিনিট হলেন কীভাবে?

—ফোনে তো সব কথা বলা যাবে না। আপনি দেখলেই বুঝবেন।

—কিন্তু এ ব্যাপারে তো সর্বপ্রথম পুলিসে খবর দেওয়া দরকার।

—জানি। যথারীতি ওখানেও খবর পৌঁছে যাবে। তবে,

—থামলেন কেন?

—অপ্রত্যাশিতভাবে মীনাক্ষী, আই মিন আমার বোনের ভ্যানিটি ব্যাগে আপনার একটি কার্ড থাকায় এবং আপনার নাম আমার আগেই শুনে থাকার ফলে আমি আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। অবশ্য আপনার উপযুক্ত পারিশ্রমিক,

ওঁকে বাধা দিয়ে বললাম, — ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। আর একটা কথা, বডি যেমন আছে সেইভাবেই

রাখবেন। দেখবেন অযথা কেউ কোন জিনিসপত্রে হাত না দেয়। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা, পুলিশে এক্ষুণি খবরটা দেবেন না। ওটা আমরা গিয়েই করব।

ফোনটা নামিয়ে রেখে নীলের দিকে তাকালাম। খুব আশ্চর্য হলাম, এতদিন, মানে গত পনের দিন ওর যে বিষণ্ণ মুখ আমি দেখেছিলাম, আজ হঠাৎ সেখানে আলোর রেখা। বোধগম্য হল না একজন মানুষের মৃত্যু সংবাদে ওর মুখ উদ্ভাসিত হয় কীভাবে? অবশ্য আমি এখনও জানি না ঘটনা কতটা সত্য, কারণ পনেরো দিন আগের তিক্ত অভিজ্ঞতার এটি পুনরাবৃত্তিও হতে পারে। জিজ্ঞেস করলাম, —তুই যেন কোন ব্যাপারে বেশ তৃপ্তি পেয়েছিস মনে হয়?

—ভুল করলি। কারো মৃত্যু-সংবাদে কি কেউ তৃপ্ত হতে পারে? তার ওপর ফোটা ফুলের মত মেয়েটাকে মাত্র পনেরোদিন আগে দেখেছি, কথা বলেছি। আসলে আমার অঙ্ক কষাটা মিলে গেল বলে মনে মনে একটু আনন্দ পেয়েছি ঠিকই কিন্তু দুঃখও পেয়েছি। নে, আর দেরি নয়। এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে।

—তা না হয় হল, কিন্তু আবার বোকা বনতে হবে না তো?

—বোধহয় না। তাহলে যে অঙ্ক মেলে না।

—অঙ্কের ব্যাপারটা বুঝছি না।

—পরে বলব। আচ্ছা আর একটা কথা, যিনি ফোন করেছিলেন তাঁর গলার আওয়াজটা কী রকম

—বেশ গম্ভীর আর পুরুষালি।

—হতেই হবে।

আজ বৃষ্টি ছিল না। রাস্তাঘাট বেশ খটখটে তাই রাস্তায় বেশ ভিড় ছিল। পৌঁছতে বেশ দেরি হল। মল্লিকবাড়ির গেটের সামনে পুলিসের ভ্যান। দুজন কনস্টেবল প্রহরারত। রাস্তাদাগাড়ি থেকে নামতে নামতে নীল বলল, —পুলিসে খবরটা দিল কে? শিশিরবাবু?

বললাম,—এসব খবর কতক্ষণই বা চাপা থাকে? পাড়ার থেকেই হয়ত কেউ জানিয়ে দিয়েছে।

নীল কিছু মন্তব্য করল না। গেটের সামনে অধীরচিত্তে পায়চারি করছিল সেদিনের শঙ্করদা। আমাদের গাড়ি দাঁড়াতেই শঙ্কর শশব্যস্তে এগিয়ে এল। আজ তার চোখে-মুখে কোন অবজ্ঞার ভাব ছিল না। বেশ উদ্বিগ্ন স্বরে বলল,—আপনাদের জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

গাড়ির দরজায় লক করতে করতে নীল বলল,— শিশিরবাবু কোথায়?

—উনি দিদির ঘরেই আছেন।

—পুলিস কতক্ষণ এসেছে?

—আজ্ঞে, কিছুক্ষণ আগে।

বাড়িতে ঢোকার সময় পুলিস আমাদের আটকালো। সাব-ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। শঙ্কর কিছু বলতে যাচ্ছিল। নীল ওকে থামিয়ে পকেট থেকে ওর আইডেন্টিটি কার্ডটা এগিয়ে ধরল। কার্ডে চোখ বোলাতে বোলাতে এস আই. ভদ্রলোকের কপালে সামান্য কুঞ্চন রেখা দেখা দিল। অপ্রসন্ন স্বরে বললেন—কিন্তু ব্যাপারটা তো পুলিস টেক-আপ করেছে।

নীল সামান্য হেসে বলল,—পুলিসই তো টেকআপ করবে। তবে মৃতার অভিভাবক চান ব্যক্তিগতভাবে কেসটার তদন্ত আমি করি। অবশ্য পুলিসের আপত্তি থাকলে অন্য কথা।

—ঠিক আছে। বড়বাবু ওপরেই আছেন। তাঁদের আপত্তি না থাকলে, আমার কী?

উনি পথ ছেড়ে দিলেন। বৈঠকখানা পার হয়েই বিশাল ঠাকুর দালান। আগে নিশ্চয়ই পুজো-টুজো হত। ইদানীং হয় বলে মনে হয় না। এখানে সেখানে ধুলোময়লা জমে আছে। ঠাকুর দালান পার হয়েই চওড়া শ্বেতপাথরের সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। দোতলাটা বেশ ঝকঝকে। এখানেও শ্বেতপাথরের মেঝে। ডানদিকে সার সার কয়েকখানা ঘর। লম্বা টানা বারান্দা। বারান্দায় একটা ছোট ঝাড় ঝুলছে। কিছু লতানে পাতাবাহারি গাছ বারান্দাটাকে ঘিরে রয়েছে। বারান্দার একেবারে শেষ মাথায় বেশ বড় আকারের একটা খাঁচা। খাঁচায় টিয়াপাখি। শঙ্কর আমাদের আগে আগে গিয়ে মধ্যিখানের একটা ঘরের সামনে

সুন্দরলাল আমরা পৌঁছতেই বলল,—আপনারা যান। ওঁরা ভেতরেই আছেন।

শঙ্করের চোখ দুটো বেশ ছল ছল করছিল। ভাল করে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারছিল না। কোনরকমে আমাদের এগিয়ে দিয়ে লোকটা চলে গেল। বুঝলাম তার দিদিমণির আকস্মিক মৃত্যুতে সে বেশ মর্মাহত হয়েছে।

ভারী সিল্কের পর্দা ঠেলে আমরা ভিতরে গেলাম। সমস্ত পরিবেশটা বেশ থমথমে। খুব মোটাসোটা, বোধহয় ও সি-ই হবেন বেশ মনোযোগ দিয়ে খাটের ওপর ঝুঁকে পড়ে কিছু দেখছিলেন। আমাদের শব্দে ফিরে তাকালেন,— কে? কে আপনারা?

ঘরে তখন মোট পাঁচজন লোক। তিনজনকে চেনা গেল। ও সি ভদ্রলোক তো আছেনই। এছাড়া একজন কনস্টেবল। একজন পুলিস ফটোগ্রাফার। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে তিনি স্ন্যাপ নিচ্ছিলেন। এছাড়াও আরও দুজন ভদ্রলোক বসেছিলেন চেয়ারে।

বুঝতে অসুবিধে হল না এদের মধ্যে একজন, যেহেতু তাঁর বয়েস কম, তিনিই শিশির মল্লিক। অন্যজন প্রায় একই রকম মুখাকৃতি, নিশ্চয়ই তাঁর দাদা।

নীল ও সি-র প্রশ্নের উত্তর দিতে যাবার আগেই কমবয়সী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, নিশ্চয়ই নীলাঞ্জন ব্যানার্জি? আমি শিশির মল্লিক।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বলে নীল ও সি-র সামনে নিজের কার্ডটা তুলে ধরল।

ও সি ভদ্রলোকের মুখে অবশ্য তেমন কোন ভক্তিশ্রদ্ধা বা আপ্যায়নের ভাব ফুটে উঠল না। গম্ভীর মুখে তিনি বললেন, —আমি লোকাল থানার অফিসার ইনচার্জ বিভাস মজুমদার। তা আপনাকে কে কল দিলেন?

শিশিরবাবুই বললেন,—আজ্ঞে আমি ওঁকে ডেকেছি। আমি চাই কেসটা উনি একটু প্রাইভেটলি খতিয়ে দেখুন।

—কেন, আমাদের ওপর বিশ্বাস নেই?

তা না, তবে,

—হুঁ, বলে বিভাসবাবু নিজের কাজে মন দিলেন।

বিভাসবাবুর ব্যবহারে আবাহন নেই বিসর্জনও নেই। নীল খুব সহজ ভঙ্গিতে বলল,—আমি পার্সোনালি ইনভেস্টিগেট করলে আপনার দিকে কি খুব আপত্তির কিছু থাকবে?

—যদি না আমাদের ডিস্টার্ব করেন।

—সে-রকম কোন বাসনা আমারও নেই। আমি নিশ্চয়ই বডিটা একটু দেখতে পারি।

নির্লিপ্তের ভঙ্গিতে বিভাসবাবু বললেন,— দেখুন।

বিছানার ওপর ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা ছিল একটা দেহ। নীল ধীরে ধীরে সেটি সরাল।

চমকে উঠলাম। মাত্র পনেরো দিন আগের এক উচ্ছল স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী মহিলার একী পরিণতি? বিস্ফারিত চোখ। জিবটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। লালরঙের একটা নাইলন কর্ড গলার সঙ্গে পেঁচিয়ে বসে আছে।

নীল ধীরে ধীরে সমস্ত চাদরটা সরিয়ে দিল। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এবং প্রায় নগ্ন এক যুবতী শরীর। বেশ বোঝা যায় মৃত্যুর পূর্বে মহিলা কারও দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছেন। অন্তর্বাস ছিন্ন ভিন্ন। আততায়ী নিশ্চয়ই শক্তিমান। কারণ ব্রেসিয়ারটি পিছনের হুক সমেত উপড়ানো অবস্থায় পাশেই পড়ে আছে। নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ নগ্ন। স্বচ্ছ নাইটি কোমরের কাছ বরাবর গুটানো।

দমকা ঝড়ের চিহ্ন সারা দেহে। বেশ বোঝা যায় মৃত্যুপূর্বে মহিলা নিজেকে বাঁচানোর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সব অবরোধ হারিয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিলেন। সে ঝড়ের চিহ্ন বিছানাতেও স্পষ্ট। মাথার বালিশটি একপাশে দলামলা। পাশবালিশ মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

যদিও নগ্ন নারীদেহ। তায় সে সুন্দরী। কিন্তু মৃত্যু বোধহয় কোন ভেদাভেদ রাখে না। মীনাক্ষীর সবকিছু ছাপিয়ে যেটি সব থেকে বেশি প্রকট তা হল সে বড় অসহায়ের মতো মৃত্যুকে মেনে নিয়ে

এখন প্রাণহীন একটি অবয়ব মাত্র।

এ দৃশ্য কোন কামোত্তেজনা আনে না। আনে পশুত্বের প্রতি ঘৃণা। নীল গভীর মনোযোগে খুঁটিয়ে দেখছিল। দেখছিলাম আমিও। স্তনবৃন্তে স্পষ্ট দংশনের চিহ্ন। উত্তেজিত পশুটির ... বৃন্তাগ্রে রক্তচিহ্ন প্রকট। সারা দেহে নখের আঁচড়। ফালা-ফালা টানা লম্বালম্বি দাগ। কোথাও ... কোথাও প্রকট।

নীলের যা কিছু দেখার বোধহয় শেষ হয়ে গিয়েছিল। সাদা চাদরটা ও যখন পুনরায় চাপা দিচ্ছে হঠাৎই বিভাসবাবুর গলার স্বর শোনা গেল,—আর কতক্ষণ দেখবেন মশাই?

নীল একবার তীক্ষ্ণ ধিক্কার মিশ্রিত দৃষ্টিতে বিভাসবাবুকে দেখে চাদরটা সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে ... বোধহয় ও বিভাসবাবুর অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ কথার জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। সম্পূর্ণ ... করে ও শিশিরবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

শিশিরবাবু তখন দুহাতে মুখ ঢেকে বসে ছিলেন। সহোদরার এ হেন মৃত্যু দৃশ্য বোধহয় আর ... দেখার কোন বাসনাই ছিল না। নীল খুব কোমল স্বরে ডাকল, — মিস্টার মল্লিক।

ভদ্রলোক বোধহয় কাঁদছিলেন। নীলের ডাকে তিনি সামান্য সময় নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে তুলে বললেন,—কী বুঝলেন মিস্টার ব্যানার্জি?

— সেটা পরের কথা। তাছাড়া আমার থেকেও একজন অভিজ্ঞ পুলিস অফিসার এখানে ... তিনি নিশ্চয়ই আমার থেকে আরও ভাল বুঝবেন। তবে এই মুহূর্তে আমার দুটো প্রশ্ন আছে।

— বলুন।

— আপনার বোন, আই মিন মীনাক্ষী দেবী কি গোলাপ ফুল খুব ভালবাসতেন?

— গোলাপ?

— হ্যাঁ। অনেক সময়ে মেয়েরা খোঁপায় গোলাপ বা রজনীগন্ধার বেল, যুঁইগোড় এইসব ... তা ওনারও কী?

— বিশেষ কোনো ফুলের ওপর মীনুর কোনো টান ছিল কি না বলতে পারব না। তবে ... কোনো দিন খোঁপা করতে দেখিনি। চুলই তো ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। ফুল লাগাবে কোথায়?

হঠাৎ বিভাসবাবুর গলা পেলাম, — এতক্ষণ লাশ দেখে শেষ পর্যন্ত গোলাপ নিয়ে পড়লেন ... গোলাপ আবার পেলেন কোত্থেকে?

— ও সি সাহেবের লজ্জাটা বোধহয় একটু বেশি। তাই একটা ভাইট্যাল জিনিস উনি ... মিস্ করছেন।

— কিছুই মিস্ করিনি। যা দেখার আমার সবই দেখা হয়ে গেছে। এরকম রেপড্ কেস ... অনেক দেখা আছে।

— আপনার অভিজ্ঞ চোখ বোধহয় একটা জিনিস এড়িয়ে গেছে। মৃতার ডানদিকে ঠিক কনুইয়ের নিচে একটা গোলাপ প্রায় থেৎলানো অবস্থায় আছে। খুব রেয়ার পীস। ব্ল্যাকপ্রিন্স। কালো গোলাপ ... থাকতে পারে। বড়লোকের মেয়ে। গোলাপ-টোলাপের শখ বিচিত্র নয়। ত এই ক্লু দিয়ে ... খুনি ধরবেন?

— আরও একটা ক্লু আমি পেয়েছি।

— তাই? তা সেটি কোন্ মহামূল্যবান বস্তু?

— দামের দিক থেকে অতি নগণ্য। আচ্ছা শিশিরবাবু, মীনাক্ষীদেবী কী ধরনের টিপ ব্যবহার করতেন?

প্রায় গণ্ডারের মত নাক এবং মুখ দিয়ে একটি বিচিত্র ধরনের 'ধোস্' শব্দ বার করে বিভাসবাবু বললেন,— এ না হলে আর শখের গোয়েন্দা। ওহে সরকার তোমার ছবি-টবি তোলা শেষ হল? ... এবার এদের একটু ক্রস করব।

সরকার পদবিধারী ক্যামেরাম্যানটি এগিয়ে এসে বলল,—ইয়েস স্যার, সব অ্যাঙ্গেল থেকেই ... নেওয়া হয়েছে।

—অল রাইট। তুমি এখন যেতে পার। ছবিগুলো আজ বিকেলেই পাঠিয়ে দিও। বডির ছবিটা একটু বড় করেই এনলার্জ করো। আর তেওয়ারী, নিচে গিয়ে এস. আই-কে বল বডি বিমুভ করার ব্যবস্থা করতে। ও হ্যাঁ, মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি কি মেয়েটির আর কিছু দেখবেন?

আবার সেই অশ্লীল বঙ্কিম ইঙ্গিত। নীল কিন্তু এবার আর চটল না। বেশ সলজ্জ ভঙ্গিতে বলল, —না স্যার। আমার যা দেখার সব দেখা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, শিশিরবাবু আমার প্রশ্নের জবাবটা পেলাম না।

—মীনুকে জ্ঞানত কোনো টিপ পরতে দেখিনি।

—মানে শখ করেও কোনো দিন পরেননি।

—কী জানেন মিস্টার ব্যানার্জি, মীনু এ বাড়ির মেয়ে হয়েও খুব আপ-টু-ডেট ধরনের ছিল। শাড়ির বদলে ও বেশিরভাগ সময় ডেনিম বা শালোয়ার কামিজ পরে কাটাতো। খেলাধুলো, সাঁতার, টেনিস এইসব নিয়েই থাকতো বলে মার সঙ্গে ওর প্রায়ই খিটিমিটি লাগতো। কোনো অকেশনেও শাড়ি পরতে দেখিনি। হয়তো পরতো তবে ওর নেচার অনুযায়ী ও টিপ পরবে এটা ভাবাই যায় না।

—অথচ, যাক সে কথা। এ বাড়িতে কাজের মেয়ে নিশ্চয়ই আছে?

এতক্ষণ শিশিরবাবুর পাশে বসা ভদ্রলোকটি কোনো কথা বলেননি। এবার তিনি বললেন, —আছে। ময়না। আমার কাজের মেয়ে।

—সে নিশ্চয়ই টিপ পরে?

—বোধহয় পরে। অত কি আর লক্ষ্য করা যায়।

—তা বটে। তা ময়নার কি এঘরে আসা-যাওয়া আছে?

—ও এখানে আসবে কেন? অবশ্য মেয়েদের ব্যাপার, আসতেও পারে।

—হুঁ। ঠিক আছে, এই মুহূর্তে আর আমার কোনো প্রশ্ন নেই। বোধহয় বিভাসবাবু আপনাদের কিছু প্রশ্ন করবেন। আমি ততক্ষণে চারপাশটা একটু দেখে নিই। আপনাদের নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি নেই তো?

—কী যে বলেন? আমি কী শঙ্করদাকে আপনাদের সঙ্গে দিয়ে দোব?

—কোনো দরকার নেই। যা দেখবার আমিই দেখে নোব। প্রয়োজন পড়লে তখন জানাব। মিস্টার মজুমদার, আমি আর আপনাকে ডিস্টার্ব করব না।

বিশাল ঘর। নীল নিজের মতো সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল। ঘরটি বোধহয় একান্তভাবেই মীনাক্ষীর। ঘরের স্ট্রাকচারে বনেদিআনা থাকলেও সেসব ধীরে ধীরে পাল্টানো হয়েছে। ঝাড় টাড় সরিয়ে পরে উজ্জ্বল টিউব লাগানো হয়েছে। যেহেতু ঘরটা বিশাল, দু'মাথায় দুটো মডার্ন শিলিং ফ্যান ঝুলছে। আসবাবপত্রও সব আধুনিক। পালঙ্কের বদলে বক্সবেড। ঘরের একপাশে ছিল একটা মস্ত ওয়াড্রোব। খুলে ফেলল। জামা-প্যান্টের কোনো শেষ নেই। বরং বলা যায় ঠাসা। নানান ধরনের টি-সার্টস, গেঞ্জি। এছাড়া জিনস্ থেকে আরম্ভ করে অনেক রকমের প্যান্ট। নানা রঙের বেশ কিছু নাইটি, হাউসকোটও রয়েছে। তবে শাড়ি যে একেবারে নেই তা নয়। খান চার-পাঁচ শাড়িও ঝুলছিল। খুব সম্ভবত আর উল্লেখযোগ্য কিছু না পেয়ে নীল ওয়াড্রোবটা বন্ধ করে দিল। ঘরের এককোণে ছিল ড্রেসিংটেবিল। কত যে পারফিউম আর কসমেটিক্স তার ইয়ত্তা নেই। বেশ বোঝা যায় মেয়েটি সাজে এবং পোশাকে বেশ আধুনিকা। ঘরের অন্য কোণে ছিল একটা কালার্ড টি-ভি। জিনিসটা বিদেশী। দেওয়ালের মাঝবরাবর একটা ছোট্ট একপাল্লার দরজা। দরজা ঠেলতেই দেখা গেল সেটি অ্যাটাচড্ বাথ। ও সটান ভিতরে চলে গেল। বেরিয়ে এল মিনিট তিনেক পর। ঘরের মধ্যে আর তেমন দেখার কিছু ছিল না। দুজনেই বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। বারান্দার বর্ণনা আগেই দিয়েছি। নীলের মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল বাঞ্ছিত কোনো সূত্রই ও এখনও পায়নি। একমাত্র সেই কালো গোলাপ আর স্টিকার টিপ ছাড়া। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলম না এগুলো রহস্য সমাধানে কোনো সাহায্য করবে কি না। অবশ্য অকুস্থলে পাওয়া সামান্য জিনিসও পরে বেশ মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায়। বহুবার এমন ঘটনা ঘটেছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনেই দুজনের মতো করে অনেক কিছুই ভাবছিলাম। হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে

শঙ্করকে উঠে আসতে দেখলাম। নীল ইশারায় ওকে কাছে ডাকল। সারা বাড়িতে তখন মৃত্যুর নিস্তব্ধ
শঙ্করের মধ্যে আজ তেমন ঔদ্ধত্য বা অবজ্ঞা ছিল না। খুব সম্ভবত নীলের পরিচয়ে ও শিশিরদের কাছ থেকে পেয়েছে। শঙ্করের বয়েস আনুমানিক পঞ্চাশ। মাথার চুলে সামান্য পাকও ধরেছে। রোগা চেহারা। মুখচোখ বেশ থমথম করছে। পরনে একটা হাত কাটা শার্ট আর উঁচু করে পরা ধুতি পা। নীলের ডাকে ও সামনে এসে দাঁড়াল। আপনি ছেড়ে আজ তুমি দিয়ে শুরু করল,— তুমি তো শঙ্করদা?

—আজ্ঞে।

—এ বাড়িতে কতদিন আছো?

—পনেরো বছরে এসেছিলুম। এখন পঞ্চাশ পেরিয়েছে।

—তার মানে দিদিমণিকে জন্মাতে দেখেছ।

শঙ্কর কিছু বলতে পারল না। বুঝতে পারলাম ওর উদ্‌গত কান্না কণ্ঠরোধ করছে। যথাসম্ভব কোমল স্বরে নীল বলল—আমি জানি শঙ্করদা, মনে মনে তুমি খুবই কষ্ট পেয়েছ। তবে তোমার দিদিমণিকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মতো কেউ খুন করেছে। তাকে তো ধরা দরকার।

প্রায় স্বগতোক্তিতে শঙ্কর বলল,—হ্যাঁ, তাকে তো ধরাই দরকার, তার ফাঁসি হওয়া উচিত

—আমাকে যে তাহলে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

—বেশ বলুন।

—তোমার দিদিমণির কি কোনো পুরুষ বন্ধু ছিল?

—অনেক। দিদিমণি তো খেলাধুলো করেই সময় কাটাতেন। অনেক বন্ধুই ছিল। বেশির ভাগ ছেলেবন্ধু।

—এ বাড়িতে তাদের যাতায়াত ছিল?

—অনেকেই আসতো। তবে ঐ বৈঠকখানা পর্যন্ত। ঐখানেই সব হই-হল্লা হত, তারপর যে যার চলে যেতো।

—মেয়ে বন্ধুরাও নিশ্চয়ই আসতো?

—বললুম তো, দিদিমণির বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা গুনে শেষ করা যায় না। তবে বেশিদিন কারো সঙ্গে মাতামাতি করতে দেখিনি। অধিকাংশই উড়োপাখি।

—এ নিয়ে বাড়িতে কেউ কিছু বলতো না?

—ঐ বড়মা-ই মাঝে মাঝে বকা-ঝকা করতেন। তবে সে স্নেহের শাসন। বড় আদুরে মেয়ে ছিল তো।

—তোমার দিদিমণির কোনো বিশেষ বন্ধু কেউ ছিল?

—বিশেষ?

—হ্যাঁ, এমন একজন, যার সঙ্গে দিদিমণির অন্যরকমের ঘনিষ্ঠতা। তুমি বুঝতে পারছ আমি কী বলছি

—ভালবাসা-টাসার কথা বলছেন? দিদিমণিকে বোঝা বড় দায়। বড় খামখেয়ালি ছিল তো। অত কারো সঙ্গে গলায় গলায় তারপর দেখা গেল তার সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগই নেই। ইদানীং একজন খুব যাতায়াত করতো।

বেশ ব্যগ্র হয়ে নীল জিজ্ঞাসা করল,—কে সে? কী নাম তার?

—কে সে তা বলতে পারব না। সে দিদিমণির বন্ধু এটাই জানতুম।

—নামটা জান?

—তাও বলতে পারব না। তবে মেয়েটা প্রায়ই আসতো।

—মেয়ে বন্ধু? আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম কোনো পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে কী ইদানীং কোনো ঘনিষ্ঠতা হয়ে ছিল?

—তেমন তো মনে পড়ে না।

—গতকাল এ বাড়িতে কারা কারা এসেছিল?

—গতকাল তো দিদিমণি ফিরলেন সন্ধে নাগাদ। হ্যাঁ তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে অবশ্য দুজন বন্ধু ছিলেন। একজন ঐ মেয়েটি। আর একজন, তার নাম জানি না, তবে বেশ দেখতে শুনতে ভালো, লম্বা চওড়া একটা ছেলে।

—পুরুষ বন্ধু? লম্বা চওড়া, দেখতে শুনতেও ভালো? তা তারা কতক্ষণ ছিলো?

—তাও ঠিক বলতে পারবো না। তবে রাত নটা নাগাদ গিয়ে দেখি ঘর ফাঁকা কেবল তিনটে কাপডিস পড়ে আছে।

—বাড়িতে আর কেউ বলতে পারবে না ওরা কখন চলে গিয়েছিল?

—সে তো ঠিক বলতে পারবো না।

—ওরা এসেছিল সন্ধেবেলা। বলছ তখন বেশ অন্ধকার। ধরা যাক সাড়ে ছ'টা কী সাতটা। ন'টায় তুমি বলছ কেউ ছিল না, মানে এই দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা তুমি বাড়ি ছিলে না এই তো?

—হ্যাঁ, মানে ছোটবৌদি বললেন ওঁর সঙ্গে যেতে হবে, টুকিটাকি বাজার করার ছিল। তাই,

—ঠিক আছে শঙ্করদা, তোমাকে আর বিরক্ত করব না। আর একটা কথা, তোমার ছোটবাবুর দিকে আর কে কে আছেন, মানে যারা বাড়ির কাজ করে,

—বনমালী আছে।

—তাকে একবার ডেকে দিতে পারবে?

—এখনি ডাকছি, বলে শঙ্করদা চলে গেল। যথারীতি বনমালী আসতে নীল ওকেও নানাভাবে প্রশ্ন করল। তেমন নতুন কিছু সংবাদ ওর কাছে পাওয়া গেল না। কেবল গতকাল সন্ধেবেলা যে দুজন অতিথি এ বাড়িতে এসেছিল, সেটা সঠিক। কারণ তিনকাপ চা ও-ই বৈঠকখানায় দিয়ে এসেছিল।

ইতিমধ্যে ও সি. বিভাস মজুমদারের জেরা-টেরা শেষ হয়ে গিয়েছিল। একজন কনস্টেবল আর সাব ইন্সপেক্টরের জিম্মায় ঘড়ি রেখে ভদ্রলোক চলে গেলেন। যাবার সময় সৌজন্যবশতঃ একবার নীলের দিকে ফিরেও তাকালেন না।

ফালতু সেন্টিমেন্টকে প্রশ্রয় না দিয়ে নীল ওর নিজের কাজগুলো করে গেল। শিশির মল্লিক, ওর দাদা সন্তোষ মল্লিক থেকে শুরু করে বাড়ির সবাইকে ও পৃথক পৃথক ভাবে জেরা করল। বিশেষ নতুন কোনো সংবাদ কারো কাছ থেকেই পাওয়া গেল না। সন্তোষবাবু বা তাঁর স্ত্রী এঁরা কেউই তেমন ভাবে মীনাক্ষী সম্বন্ধে কোনো খোঁজ রাখতেন না। তবে মা বিজয়াদেবীর প্রচণ্ড ক্ষোভ তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের ওপর। বার বার তিনি মীনাক্ষীর বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন, কিন্তু শিশিরের আদরেই মেয়েটা নাকি উচ্ছন্নে গিয়েছিল আর তারই পরিণতি এই চরম হত্যাকাণ্ড। মেয়েকে হারিয়ে বৃদ্ধা বেশ ভেঙে পড়েছেন।

একটু আলাদা রকমের দুটি সংবাদ পাওয়া গেল দুজনের স্টেটমেন্টে। এক, ছোটবৌদি বন্দনা দেবী। দুই, সন্তোষবাবুর কাজের মেয়ে ময়নার কাছ থেকে।

ননদ-বৌদির সম্পর্ক কোনকালেই তেমন মধুর হয় না। এটা তার জের কি না জানি না, তবে বন্দনাদেবীর মতে মীনাক্ষী নাকি ইদানীং বেশ ফাস্ট লাইফ লিড করতে শুরু করেছিল। বর্তমানে সে মাঝে মাঝে ড্রিংকও করতো। ফিরতো অনেক রাত্রে। অবশ্য গভীর রাত্রে কোনো পুরুষ বন্ধুকে সে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছিল এবং তারই দ্বারা রেপড্ হয়েছিল এমন কথা তিনিও ঠিক বিশ্বাস করেন না।

কিন্তু ময়নার বিবৃতি একটু অন্যরকম। আমি ময়নার স্টেটমেন্টটা তুলে ধরছি।

ময়নার বয়েস খুব বেশি নয়। বোধহয় পঁচিশ-ছাব্বিশের মধ্যেই। বিয়ে টিয়ে হয়নি। দেখতেও সাদামাঠা। ও আসতে নীল প্রশ্ন করল, —এ বাড়িতে তুমি কতদিন আছ?

—পাঁচ-ছ'বছর হবে।

—মীনাক্ষীদির সঙ্গে তোমার কথাবার্তা হতো কখনো?

—আজ্ঞে আমরা ঝি। দিদিমণিদের ফাইফরমাস খাটা ছাড়া তাদের সঙ্গে আমাদের আর কী-ই বা সম্পর্ক?

—বটেই তো। তা কাল তুমি এদিকে এসেছিলে? মানে দিদিমণির ঘরে?

—না, তবে,

—থেমো না বলো।

—অনেক রাতে আমি একবার এদিকে এসেছিলুম।

—কেন এসেছিলে?

—বনমালীদাকে একটা কথা বলার জন্যে।

—রাত তখন কটা?

—তা বারোটা হবে।

—অত রাত্রে?

—অত আর কী? এ বাড়ির সবই দেরিতে! কাজ-কম্ম মিটিয়ে শুতে শুতে দেড়টা বাজে।

—বেশ, তারপর?

—দিদিমণির ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় কীরকম যেন একটা আওয়াজ পেয়েছিলুম।

—কী রকম আওয়াজ?

—ঘুমের ঘোরে খুব ভয়ের স্বপ্ন-টপ্ন দেখলে মানুষ যেমন গোঁ গোঁ করে, অনেকটা তেমন।

—তা তুমি তখন কিছু করলে না?

—পাগল নাকি? দিদিমণি মদটদ খেতো। ভাবলুম হয়তো বেশি খেয়ে-টেয়ে অমন করছে।

—ঘরের দরজা বন্ধ ছিল?

—ঠেলে দেখিনি। আমি ভয়ে তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিলুম।

—এ কথা আর কেউ জানে?

—বনমালীদাকে বলেছিলুম। তা ও বলল, তোর অত খোঁজে কী দরকার? বাবুদের ব্যাপার-স্যাপার তারাই বুঝবে। আমিও আর কাউকে কিছু উচ্চবাচ্য করিনি।

এরপর ময়না চলে গিয়েছিল। বেলাও বাড়ছিল। আমরা উঠব উঠব করছি এমন সময় শিশিরবাবু এলেন। ভদ্রলোক খুবই ভেঙে পড়েছেন।

বোনকে খুবই ভালবাসতেন। বললেন, —জানেন মিস্টার ব্যানার্জি, মীনুর নামে অনেকেই অনেক কিছু বলতো। আমি সেসব গ্রাহ্য করতুম না। মা-ও বিয়ের ব্যাপারে অনেক তাগিদ দিয়েছেন। কিন্তু ও বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা মেয়ে, ওর তো বিয়ের ব্যাপারে পছন্দ-অপছন্দর দিক আছে।

—উনি কি কাউকে ভালবাসতেন?

—সম্ভবত না। আমাকেই ও সব কথা বলতো। তেমন কিছু ঘটে থাকলে নিশ্চয়ই আমাকে জানাতো।

—উনি ড্রিঙ্ক করতেন আপনি জানতেন?

—জানতুম। খেলাধুলা করে ও খুব ক্লান্ত হতো। টেনিসে ওর আশ্চর্য দখল। স্পোর্টসম্যান যদি নিয়ম করে সামান্য মদ্যপান করে সেটাকে আমি দোষনীয় মনে করি না।

—ওর কী কোনো বদ সঙ্গ হয়েছিল, ইদানীং?

ঘাড় নাড়তে নাড়তে শিশিরবাবু বললেন, — আমার তো তা মনে হয় না।

—বাট শী ওয়াজ ক্রটালি রেপড অ্যান্ড মার্ডারড।

—সেটাই তো আমার কাছে আশ্চর্য লাগছে।

—মৃতদেহ প্রথম কে আবিষ্কার করে?

—শঙ্করদা!

—দরজা নিশ্চয়ই খোলা ছিল?

—হ্যাঁ ভেজানোই ছিল। ঠেলতে খুলে যায়।

—তার মানে হত্যাকারী সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এবং নিশ্চয়ই সেটা দেড়টা-দুটোর পর, চাকর-বাকরেরা শুয়ে পড়লে। আচ্ছা আপনার ঘর তো মিস মল্লিকের ঘরের পাশে। আপনি রাত্রে কোনো অবাঞ্ছিত শব্দ শুনেছিলেন?

—না। আমার সব থেকে আশ্চর্য লাগছে পাশের ঘরে থেকেও আমি কিছু জানতে পারলাম না। তবে লোকটা এলো কখন, গেলই বা কেমন করে? রাত দুটোর সময় তো মেন গেটে তালা পড়ে যায়।

—শিশিরবাবু, আপনার বাড়িটা এত বড় আর লোকজন এতই কম যে কোনো মানুষ ইচ্ছে করলে সকলের চোখ এড়িয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারে। তার ওপর কাল সন্ধেবেলা আপনার স্ত্রী ছেলে এবং শঙ্করদা ছিলেন না। গিয়েছিলেন বাজারে। আপনিও ফিরছেন রাত ন'টার পর। হত্যাকারীর পক্ষে ঐ সময়ে, একদম ফাঁকা এদিকটায় এসে ওর ঘরে আত্মগোপন করা অস্বাভাবিক নয়। তার ওপর ওর ঘরে অ্যাটাচড বাথ। অবশ্য বাথরুমে কোনো পায়ের ছাপ-টাপ পাওয়া যাবে না। কারণ সারারাতই কল খোলা ছিল। জলের স্রোতে পায়ের ছাপ ধুয়ে গেছে। আচ্ছা, আপনাদের শঙ্করদার মুখে শুনলাম, কাল সন্ধেবেলা মীনাক্ষীদেবীর সঙ্গে দুজন বন্ধু এসেছিলেন। একজন পুরুষ, একজন মহিলা। তাঁদের আইডেন্টিফাই করা যাবে?

—প্র্যাকটিক্যালি আমি ওর কোনো বন্ধুবান্ধবকেই চিনতাম না। তবে বেঙ্গল টেনিস ক্লাবের সঙ্গে ও অ্যাটাচড্ ছিল।

—ওখানে আমি খোঁজ নিয়ে নেব। তবু আপনার স্ত্রীকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখবেন।

—বেশ, আমি ওকে আজই জিজ্ঞাসা করে আপনাকে জানিয়ে দেব।

নীল একটু চুপ করে থেকে তারপর বলল,—আসলে কী জানেন, ঐ মেয়েটি বা ছেলেটির নাম বা পরিচয় জানা দরকার। এই দুজনের যে কোনো একজনকে পাওয়া গেলে ওঁর ফ্রেন্ড সার্কেল সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যেত।

ঘাড় নেড়ে সায় দিতে দিতে শিশির বললেন, — বটেই তো। আচ্ছা আপনার কী মনে হয় যে এ কাজ করেছে সে মীনাক্ষীর পরিচিত?

—ঠিক বলা যাচ্ছে না। পি এম রিপোর্ট না পেলে এও বলা যাচ্ছে না আগে মার্ডার না আগে রেপ।

শিশিরবাবু সামান্য আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—আগে মার্ডার তারপর রেপ হয় নাকি?

—জগতে এমন অনেক পারভার্টেড আছে যারা সদ্য মৃতা রমণীর ওপর পাশবিক অত্যাচার করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। এমন অনেক লোক আছে যারা মৃতা বা উন্মাদ রমণীর ওপর বলাৎকার করে বেশি তৃপ্তি পায়। এদেরকে বলা হয় স্যাডিস্ট. পারভার্সানের কী কোনো নিয়ম আছে? তাই যে এসেছিল সে মীনাক্ষীদেবীর পরিচিত না অপরিচিত সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়। এমনও হতে পারে মীনাক্ষীদেবীই তাকে ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই যদি হয় নিশ্চয়ই মীনাক্ষীদেবীর পরিচিত কেউ। নইলে শোবার ঘরে সে যাবে কেমন করে? এর পর সম্ভবত অতর্কিত আক্রমণে তিনি নিজেকে বাঁচাতে পারেননি। নিজেকে না চেনানোর জন্যেই হয়তো বা খুনের মতো অপরাধেও আততায়ী বিরত হয়নি। তবে একটা কথা মোটামুটি জোর দিয়ে বলা যায়, খুনি এক্ষেত্রে খুনের উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিল।

—কী করে বুঝলেন?

—ঐ নাইলন কর্ড। ওটা নিশ্চয়ই আপনার ঘরে এলোমেলো পড়ে থাকে না। আসলে এ খুনটা মোটিভেটেড। তাই জানা দরকার মীনাক্ষীদেবীর ফ্রেন্ড সার্কেলকে। নিশ্চয়ই কেউ ওর গোপন শত্রু ছিল। এনিওয়ে, পি. এম রিপোর্টটা আগে পাওয়া দরকার। ও হাঁ, আর একটা কথা, ময়না মেয়েটা কেমন?

—আমি ঠিক বলতে পারব না। ও দাদার কাছে কাজ করে। ভাল করে মেয়েটাকে দেখিওনি।

—হুঁ। দরজা-টরজা খুলে দেওয়ার ব্যাপারে কোনো চাকর-বাকরের হাত থাকলেও থাকতে পারে।

যে এসেছিল তাকে তো বেরিয়ে যেতে হয়েছে। মেইন গেটটা তাহলে কে বন্ধ করল অত রাত্রে?

আমরা প্রায় বাইরের লনে এসে পড়েছিলাম। সূর্যটাও তখন বেশ প্রখর। অধোবদনে আসতে আসতে হঠাৎ শিশিরবাবু নীলের হাত চেপে ধরল, —প্লিজ মিস্টার ব্যানার্জি, মীনাক্ষীর এ ধরনের কলঙ্কিত মৃত্যুতে মল্লিক বাড়িতে একটা দুর্নাম পড়বে। আত্মীয়স্বজনেরা অনেকেই অনেক কটু মন্তব্য করবে তবু আমি চাই খুনি ধরা পড়ুক। আসলে কী ঘটেছিল আমি জানতে চাই। মেয়েটাকে আমি বিশ্বাস করতুম। সে কোনো গর্হিত কাজ করবে তা আমি ভাবতেই পারি না। এখনও নয়। আর যদি করেও থাকে সে সত্যটুকুই আমার জানা দরকার। বিশ্বাস যদি ভাঙে তা যেন সত্যের আঘাতেই ভাঙে।

বাড়ি ফিরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে যখন আমরা নীলের ঘরে এসে বসলাম তখন আড়াইটে বেজে গেছে। মীনাক্ষী মল্লিকের হত্যাকাণ্ড আমার কাছে খুব মামুলি মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল খুব সহজে ব্যাপারটি ঘটেনি। নীলের দিকে একবার তাকালাম। ও চোখ বুজে শোফায় হেলান দিয়ে গভীর মনোযোগে সিগারেট টেনে চলেছে। ও ভাবছে, নাকি তন্দ্রার ঘোরে ভাতঘুম সারছে কিছুই বোঝা যায় না। আমি কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। মীনাক্ষী উগ্র আধুনিকা, শিক্ষিত, তদুপরি খেলাধুলায় পটু। বিশেষ লনটেনিস। সাধারণত যারা টেনিস খেলে তাদের কব্জির জোর একটু বেশিই থাকে। ওর মতো একটি মেয়েকে অতর্কিতে আক্রমণ করে হয়তো সাময়িক কাবু করা যেতে পারে, তাই বলে তার অনিচ্ছায় বলাৎকার করা কি সম্ভব? সে তো চিৎকারও করতে পারতো। তাছাড়া সে যদি অচেনা কেউ হবে তাহলে সে কখন ঘরে এসেছিল? এসে লুকিয়েই বা ছিল কোথায়? ওঘরে ঠিক লুকনোর মতো জায়গা নেই। এক বাথরুম। নীল একবার বাথরুমে গিয়েছিল। জানি না সেখান থেকে ও কোনো সূত্র পেয়েছে কি না। যদি কোনো চেনা লোক হয় তাহলে তার পক্ষে অযাচিত আক্রমণে একটি মেয়েকে কাবু করে তাকে জোর করে বলাৎকার করা কী সম্ভব? ধরা যাক মীনাক্ষীর প্রতিপক্ষ বেশ বলশালী. সে মীনাক্ষীকে সম্পূর্ণ দখল করতে সক্ষম হয়েছিল, তারপর নিজের পরিচয় গোপন রাখবার জন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর তাকে ফাঁস দিয়ে হত্যা করেছে। এত কিছু করার পর সে সবার অলক্ষ্যে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। এত সব করা কি সম্ভব? নাকি মীনাক্ষী স্বেচ্ছায় দেহ দিয়েছে? তাহলে তো তার খুন হবার কোনো কারণ নেই।

নীল তখনও ধ্যানমগ্ন। তবু ওকে জিজ্ঞাসা করলাম,—কিছু সিদ্ধান্তে এলি?

মৃদু হেসে ও বলল, দূর বোকা, আদি অন্ত কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মোটিভটাই বা কী? টাকা পয়সা নয় খুব সম্ভবত। যদিও ওর মৃত্যুতে দু'ভাই কিছু লাভবান হবে, তবুও আপাতত অর্থকরী লাভালাভির ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়েই এগনো যাক। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে টাকাকড়ির থেকে অন্য কিছু ব্যাপার থাকে। খুনের ধরন অনেক সময় খুনিকে চেনায়। দুই দাদা নিশ্চয়ই বোনকে ভোগ করতে আসবে না। অথচ বেশ বোঝা যাচ্ছে খুনি বেশ হিংস্র, উন্মত্ত এবং ক্রোধী।

—তাহলে তোর ধারণা বাইরের কেউ?

—সেটাই সম্ভব। গতকালের সন্ধ্যার দুই আগন্তুকের খোঁজ পাওয়া দরকার। বিশেষ করে ছেলেটির। ওদের দুজনের আসাটা সবাই জানে। কিন্তু কখন গেছে কেউ জানে না।

- আচ্ছা, কোন প্রতিহিংসা বা জেলাসির ব্যাপার হতে পারে না?

কেন পারে না। নিশ্চয়ই পারে। অমন ডাকসাইটে সুন্দরী মেয়ে। কোথায় কখন কার মনে আগুন জ্বালিয়েছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

- তুই টিপ আর কালো গোলাপের ওপর অত জোর দিচ্ছিলি কেন? ওগুলো তো খুব কমন জিনিস।

- এখানে বড়ই আনকমন। একটা মাত্র ব্ল্যাকপ্রিন্স। তাও মেয়েটির মৃত্যুশয্যায় কেন? কোন বিশেষ কেউ ওকে প্রেজেন্ট করেছিল? মধুর স্মৃতি বুকে নিয়ে সে কি বিছানায় শুতে গিয়েছিল? আর টিপ? টিপটা এলো কোত্থেকে? খুবই সাধারণ একটি ভেলভেট টিপ। যা নাকি মীনাক্ষীর মতো মেয়ে পরবে

ন, বাথরুমে আরও একটা ব্যাপার নজরে এল। মীনাক্ষীর শয্যার পাশে রাখা টিপয়ে একটা সুদৃশ্য কাচের গ্লাস ছিল। বোধহয় লক্ষ করেছিলি। ঠিক তেমনি, মানে তারই জোড়া আর একটি গ্লাস বেসিনে কলের মুখে পাতা। খোলা কল। সারা মেঝেতে বেসিন উপচানো জল, কেন?

নানান চিন্তায় প্রায় দিন আষ্টেক কেটে গেল। ইতিমধ্যে আমরা মীনাক্ষীর বাড়িতে আসা দুই বন্ধুর খুঁজ করবার চেষ্টা করেছিলাম। শিশিরবাবুর কাছ থেকে পাওয়া সংবাদের ভিত্তিতে ওর টেনিস ক্লাবেও খোঁজ নিয়েছিলাম। ওর বন্ধুরা কেউই সঠিকভাবে ছেলেটির বা মেয়েটির হদিস দিতে পারেনি। আর আশ্চর্য, একটা মেয়ে রহস্যজনকভাবে খুন হল। খবরের কাগজে সে সম্বন্ধে বিবৃতি প্রকাশিত হল, অনেক বন্ধুই মীনাক্ষীর বাড়িতে খোঁজ নিতে এল, কিন্তু শঙ্করদা তাদের মধ্যে থেকে আগের সন্ধ্যার সেই রহস্যময় দুই বন্ধুকে আবিষ্কার করতে পারল না। তবে কি সেই ছেলেটিই মীনাক্ষীর হত্যাকারী? কিন্তু মেয়েটি এল না কেন? এটা যে ধরনের খুন তাতে একটি মেয়ের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকতে পারে না। অথচ সেই মেয়ে খুনের আগে ঘন ঘন আসতো মীনাক্ষীর সঙ্গে দেখা করতে।

জটপাকানো, তালগোল হওয়া পরিস্থিতিটা আরও জটিল হল, পরবর্তী কয়েকটা ঘটনায়। প্রথম পি এম রিপোর্ট। রিপোর্টটা পেতে আমাদের প্রায় দিন কুড়ি দেরি হল। সেটা বিভাস মজুমদারের কেরামতি। কী যে এক দুর্বোধ্য হীনম্মন্যতায় ভদ্রলোক ভুগছেন। গোড়া থেকেই উনি নীলকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে নিয়ে অসহযোগিতার খেলা খেলছিলেন। রিপোর্ট উনি দেখাতে চাইছিলেন না। পরে লালবাজারের স্পেশাল অর্ডার নিয়ে নীল পি এম রিপোর্ট দেখতে পায়। বড় অদ্ভুত এক রিপোর্ট। মৃতার স্টমাকে পাওয়া গেছে হুইস্কি। হত্যাকাণ্ডের পরেই বলাৎকার করা হয়েছে। ফলে মৃতার দেহে কোন শারীরিক টেনশানের উল্লেখ ছিল না। তবে সব থেকে অদ্ভুত এবং রহস্যজনক ব্যাপার, শৃঙ্গারজনিত কার্যকলাপের ছাপ সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট হলেও মেয়েটির কুমারীত্ব সম্পূর্ণ অটুট। অর্থাৎ হত্যাকারী যদিও তার বিকৃত কাম-লালসার ইঙ্গিত রেখে গেছে তবুও সম্পূর্ণ অজানিত কারণে ধর্ষিতা হয়েও সে অযোনিসম্ভোগা।

রিপোর্ট পড়ার পর নীলকে বললাম, লোকটা হয় পাগল নয়তো ইম্পোটেন্ট। বিকৃত এবং উদগ্র কামনায় মৃতা মেয়েটির দেহ সে ভোগ করে অথচ সহবাস না করেই চলে যায়। আমার মনে হয় লোকটা একটা সাইকিক পেশেন্ট এবং সহবাসে অক্ষম।

কিছু না বলে নীল খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর পি. এম এর জেরক্স কপিটা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। যাবার সময় একবার জিজ্ঞাসাও করল না আমি যাব কি না।

কিন্তু দ্বিতীয় এবং মারাত্মক ঘটনা ঘটল তার পরেই। নীল বেরিয়ে যাবার কিছু পরেই এল এক অজ্ঞাত কণ্ঠস্বরের ফোন। কেমন যেন ভাঙাচোরা গলা। ফোন তুলেই বলল, নীলাঞ্জন ব্যানার্জি বলছেন?

নীলের পূর্বনির্দেশ থাকার কারণে আমাকে নীল ব্যানার্জি সাজতে হোল, হাঁ বলুন, নীল ব্যানার্জি বলছি।

—বড় বিপদে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। আমার ভাইঝি অত্যন্ত নৃশংসভাবে খুন হয়েছে।

—খুন? কিন্তু আমি তো পুলিস নই।

—জানি, কিন্তু আমি চাই আপনি এ খুনের তদন্ত করুন, অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে। আর এলেই সব বুঝতে পারবেন।

—পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে?

—না, এখনও ঠিক দেওয়া হয়নি।

—ওদের আগে খবর দিন, তারপর আমরা আসছি। ও হ্যাঁ ঠিকানাটা বলুন।

—লিখুন, ..মহিম হালদার স্ট্রিট। কালীঘাট।

আরো কিছু হয়তো বলার ছিল। কিন্তু লাইনটা কট করে কেটে গেল। বাড়িতে নীল নেই। অথচ ওদের যাব বলে দিলুম। কী করব ভাবছি, এমন সময়ে নীল কী কারণে যেন আবার ফিরে এল। ফোনের

কথা ওকে সব জানাতেই ও হঠাৎ কেমন উদাস গলায় বলল,—গলাটা ভাঙা ভাঙা আর ফ্যাঁস-ফ্যাঁসে, তাই না?

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—হ্যাঁ, কিন্তু তুই কী করে বুঝলি?

—প্রথম দিন, যেবার মীনাক্ষীদের বাড়িতে গিয়ে আমি বেকুফ বনে যাই, সেদিনও এমনি ভাঙা আর ফাঁসফেঁসে কণ্ঠস্বর শুনেছিলুম। আমার বদ্ধমূল ধারণা এ মেয়েটির আজ কিছু হয়নি তবে দিন পনেরোর মধ্যে খুন হলে অবাক হবো না।

—তাহলে তো এখনি ওদের বাড়ি যাওয়া প্রয়োজন।

—তাড়াহুড়ো না করলেও চলবে। বলছি তো আজ কিছুই হয়নি। কিন্তু ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? খুনি কি আমাকে চ্যালেঞ্জ করছে? মৃত্যুর আগে মৃত্যুসংবাদ পরিবেশন করে জানিয়ে দিচ্ছে, যে এবার ঐ মেয়েটিই খুন হবে? কিন্তু কেন? খুনি চাইছে কী? এ তার নিছক পাগলামি না, অতিরিক্ত স্পর্ধা?

—সেই আগেকার দিনে সময় দিয়ে ডাকাতি করার মতো, তাই না?

উত্তরে আমার দিকে একবার তাকিয়ে নীল বলল,—এক কাজ কর অজু, বরং আমার হয়ে আজ তুই-ই ঘুরে আয়। পারিস তো এই মেয়েটির ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবের কিছু ঠিকানা সংগ্রহ করার চেষ্টা করিস। আর যদি সম্ভব হয় মেয়েটিকে কিছু সঙ্কেতও দিয়ে আসতে পারিস। দুটো ঘটনাই যদি চেইন এর ব্যাপার হয় তাহলে হয়তো কিছু আলোর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। মীনাক্ষী কেসে তো কোন হদিসই পাওয়া যাচ্ছে না। তুই ঘুরেই আয়।

নীল আবার বেরিয়ে গেল। অগত্যা আমিও বেরিয়ে পড়লাম কালীঘাটের নির্দিষ্ট ঠিকানায়। বাড়িটি মীনাক্ষীদের মতো না হলেও বেশ অবস্থাপন্ন পরিবেশ। বোঝা যায় এরা কেবল ধনী নন, বেশ রুচিবানও বটে। বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা লন। কিছু ফুলটুলও ফুটে আছে। কোমর বরাবর মাপের ছোট্ট গ্রিল দরজা। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেলাম। চওড়া গাড়িবারান্দা। দু-তিন ধাপ সিঁড়ির ওপরেই সেগুন কাঠের বিশাল দরজা। পেতলের বড় কড়া। কড়া নাড়ার দরকার হল না। কারণ দরজার পাশেই কলিং বেল। বেল টিপতেই বেশ বোঝা গেল ভেতরে ডিংডং শব্দের মিষ্টি বেশ ছড়িয়ে গেল।

এবারও এক পরিচারক শ্রেণীর লোক দরজা খুলে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল,—কাকে চাই?

গৃহকর্তার নাম আগেই জেনেছিলাম ফোনে। অতনু বিশ্বাস। বলতেই সে বলল,—আপনার কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল?

—আঁা, হ্যাঁ,একটু আগেই উনি আমায় ফোন করেছিলেন আসার জন্যে, এই আমার কার্ড।

—ও, ঠিক আছে, আপনি ভেতরে এসে বসুন। কার্ড নিয়ে লোকটি ভেতরে চলে গেল।

দর্শনীয়ভাবে সাজানো বৈঠকখানা। লক্ষ্মীর প্রসাদ সবত্র ছড়ানো। দামি সোফায় গা এলিয়ে বসতে বসতে একটা কথাই মনে হচ্ছিল, এদের দেখে কে বলবে দেশের শতকরা নব্বইজন মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে। বেশিক্ষণ বসতে হোল না। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই নেমে এলেন এক ভদ্রলোক। খুঁটিয়ে দেখতে থাকলাম ভদ্রলোককে। বয়েস প্রায় পঁয়তাল্লিশের মতো। কিন্তু সুখে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে থাকায় তা বোঝা যায় না। গায়ের রঙটি বেশ চকচকে এবং ধবধবে। চোখে বিদেশী ফ্রেমের চশমা। একজিকিউটিভ ফিফটি-ফিফটি বাইফোকাল লেন্স। সাদা গরদের পাঞ্জাবি আর দামি রঙিন কাজ করা লুঙ্গি। সমস্ত চেহারার মধ্যে সুখ-সমৃদ্ধি আর প্রতায় উপচে পড়ছে। ভদ্রলোক আমার সামনের সোফায় বসতে বসতে বললেন,—আমিই অতনু বিশ্বাস। কিন্তু এই কার্ডে যে-নাম লেখা রয়েছে, তাঁকে তো আমি ঠিক চিনি না।

বুঝলাম, এটি ঠিক আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ভদ্রলোক আমাদের কোনো ফোন করেননি। তিনি এসবের বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানেন না। তবু আরো একবার তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—আজ কিছুক্ষণ আগে কি আপনি কোনো কারণেই ফোন করেননি?

—বিনা কারণে একজন প্রোফেশনাল প্রাইভেট ডিটেকটিভকে, আমি মনে করি আপনি একজন ব্যস্ত মানুষ, কেন আপনাকে বিরক্ত করব? আপনার নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে।

সামান্য সময় চুপ করে রইলাম। ভদ্রলোককে আশু বিপদেব কথাটা জানানো দবকাব। নীলেব নির্দেশও সেইরকম। তাই ওঁকে বললাম, —দেখুন বিশ্বাস মশাই, ঠিক এইবকমই একটা ব্যাপাব যে ঘটতে পারে সেটা অনুমান করেই আমি আপনার সঙ্গে দেখা কবতে এসেছি। ফোনটা ফল্‌স্ এটাও আমাব অনুমান ছিল। আপনাকে একটা ব্যাপারে সামান্য সজাগ কবা, আমি মনে করি আমাব সামাজিক দাযিত্ব, আর সেই কারণেই আমার আসা।

ভদ্রলোক একটু নড়েচড়ে বসলেন। তারপর বললেন,—ঠিক কোনো ক্রাইম আমি কবেছি বলে মনে পড়ে না। অথচ সজাগ হওয়ার প্রশ্ন কেন সেটাই বুঝতে পাবছি না।

—না, আমার বক্তব্য একটু অন্যরকম। দিন কুড়ি-পঁচিশ আগেব কাগজে নিশ্চযই মীনাক্ষী মল্লিক হত্যাকাণ্ডেব সংবাদ পড়েছেন?

—হ্যাঁ পড়েছি। প্রায় হেড লাইন নিউজ ছিল। তবে তেমন মন দিয়ে পড়িনি। এসব তো আজকাল হামেশাই হচ্ছে।

—হচ্ছে, তবে ঐ খুনের ইঙ্গিত আমরা আগেই পেয়েছিলাম। যেমন আজ পেয়েছি।

—আমাকে খুলে বলুন, ঠিক বুঝতে পারছি না।

অতএব আমাকে মীনাক্ষী মল্লিকের ঘটনার আনুপূর্বিক সবকিছু খুলে বলতে হল। একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। শোনার পর অতনু বিশ্বাস বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন, —তার মানে আপনি বলতে চাইছেন আমার ভাইঝি, আই মিন শ্রীমতীব জীবনসংশয় দেখা দিয়েছে?

—জানি না। ভবিষ্যতের কথা কিছুই বলতে পাবি না। তবে ঐ যে বললাম, একই ঘটনাব পুনবাবৃত্তি হোক তা চাই না, তাই আপনাকে বলতে আসা ভাইঝিকে সাবধানে রাখবেন। অচেনা কোনো মানুষকে,

আমাকে থামিয়ে অতনুবাবু বললেন,—বুঝেছি, কিন্তু শ্রীমতীকে এখুনি পাচ্ছি কোথায়?

—তার মানে?

—বর্তমানে সে তো কলকাতার বাইরে।

—বেড়াতে গেছেন?

—হ্যাঁ, একরকম তাই।

—কোথায় গেছেন?

—শিমুলতলা। আমার বৌদি মানে শ্রীমতীব মা ওখানেই থাকেন। মাঝে মাঝেই ও শিমুলতলা যায়।

—একাই, না সঙ্গে কেউ গেছেন?

—ও আব ওর এক বান্ধবী।

—কবে ফিরবেন?

—দু-তিনদিনের মধ্যেই ফেরার কথা।

—বেশ। আপনার ভাইঝি সম্পর্কে দু'একটা তথ্য কি পাওয়া যেতে পাবে, আই মিন ওব ব্যক্তি জীবন সম্বন্ধে।

— যতদূর জানা আছে বলতে পারি।

—শ্রীমতী দেবী তো আপনার ভাইঝি বললেন, কিন্তু আপনাব কাছে থাকাটা--

—আমার নিজের কোনো ছেলে-মেয়ে নেই, তাছাড়া আমার দাদা মারা যান ওব জন্মেব পরই। বৌদির কেমন যেন সংসার থেকে ছাড়া ছাড়া ভাব এসে যায়, ভাইঝি হলেও ও আমাব মেয়ে। তাই আমার কাছে আছে।

—ভাইঝি কী করেন?

—সিক্সথ্ ইয়ার চলছে। এম. এ-টা পাশ কবাব পবই ওর বিয়ে দোব ঠিক আছে। পাত্র আমার বন্ধুবই ছেলে।

—কিছু মনে করবেন না, ওদেব মধ্যে নিশ্চয়ই আলাপ-পবিচয় আছে?

—দে লাভ ইচ আদার।

—শ্রীমতী দেবীর বন্ধু-বান্ধব কেমন? মানে বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা কি প্রচুর?

—হুল্লোড়বাজ মেয়ে নয় এটা বলতে পারি। তবে যে মেয়ে ইউনিভারসিটিতে গিয়ে পড়াশুনো করছে সে তো পর্দানসীন হতে পারে না, বন্ধু-বান্ধব তো থাকবেই।

একশোবার। এটা বলা শুধু বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার কথা ভেবে। যাইহোক, আপনাকে শুধু এইটুকুই বলা, যতটা সম্ভব ওঁর বন্ধু-বান্ধবের ঠিকানার সন্ধান রেখে দেবেন।

এরপর তেমন আর বিশেষ কথাবার্তা হল না। সামান্য চা জলখাবার খেয়েই উঠে পড়লাম।

কিন্তু ঘটনার যে এত দ্রুত পটপরিবর্তন ঘটবে বুঝতে পারিনি। ঠিক পাঁচদিন পরেই নীলের ফোন এল, অতনু বিশ্বাসের কাছ থেকে। শ্রীমতী খুন হয়েছেন।

সময় নষ্ট না করে ছুটে গেলাম বিশ্বাস বাড়িতে। সেখানে রীতিমত শোকের ছায়া। অতনু বিশ্বাসের কাছে এবার সত্যিকার নীলের পরিচয় দিলাম। ভদ্রলোক তখন ওসব নিয়ে মাথাই ঘামাচ্ছিলেন না। তাঁর কেবল একটাই কথা, ওর মার কাছে আমি মুখ দেখাব কী করে?

এবারে অবশ্য তদন্ত করা নিয়ে তেমন বেগ পেতে হল না। স্থানীয় অফিসার রুদ্রাক্ষ সেনগুপ্ত নীলের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি।

সেই একই প্রক্রিয়া। সেই একই খুনের ধরন। একই অবস্থায় মৃতা মৃত্যুপূর্বে আততায়ীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং লাল রঙা নাইলন কর্ডের ফাঁসে মরেছে। এবারও সেই ব্ল্যাকপ্রিন্স। পড়ে আছে মৃতার শয্যাপার্শ্বে। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নীল অনেক কিছু দেখল। এবারে অবশ্য কোনো টিপের দেখা ও পেল না। তবে একটা না একটা সূত্র পাওয়া যায়, প্রায় সব ক্ষেত্রেই। এখানে অতি সামান্য হলেও একটা সূত্র হাতে এল। একটা সোনার আংটি। অর্ডিনারি এ.ডি. পাথরের ছোট্ট রিং।

আংটিটা হাতে নিয়ে ও খানিকটা নাড়াচাড়া করে মৃতার আঙুলে পরাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো আঙুলেই তা লাগল না। অতনুবাবুকে জিজ্ঞাসা করেও কোনো হদিশ পাওয়া গেল না, আংটিটা কার? শ্রীমতীর নয়। বাড়ির কারোর নয় এ ব্যাপারেও ভদ্রলোক নিশ্চিত।

মোটামুটি সকলকে জেরা করে জানা গেল গতকাল সন্ধের পর শ্রীমতী আর বাড়ির বাইরে যায়নি। সারা সন্ধে সে নিজের ঘরেই ছিল। তার তখন একমাত্র সঙ্গী ছিল তার ভাবী স্বামী। প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত ওখানেই ছিল। তারপর সে চলে যায়। রাত এগারোটায় রাতের খাওয়া শেষ করে শ্রীমতী নিজের ঘরে শুতে চলে যায়। অবশ্য বিনোদ মানে বাড়ির একজন কাজের লোকের জবানবন্দি থেকে জানা যায় রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায় দিদিমণির একটা ফোন আসে। দিদিমণিকে ফোন ধরিয়ে দিয়ে সে চলে যায়। ফোনটি ছিল একটি মেয়ের। এরপর প্রায় রাত একটা পর্যন্ত শ্রীমতীর ঘর থেকে ভিডিও ফিল্মের সাউন্ড শোনা গেছে। যদিও তা খুবই নিম্ন স্বরে। অবশ্য এ কিছু নতুন ব্যাপার নয়। ওদের দিদিমণি প্রায়ই বেশি রাত করে হয় পড়াশুনো করেন নয়তো ক্যাসেটে ছবি দেখেন। তারপর আজ সকালে দরজায় ধাক্কা দিয়েও যখন কোনো সাড়া পাওয়া যায় না তখন সে গিন্নীমা'কে খবর দেয়। শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙে দেখে এইসব কাণ্ড।

তদন্তের প্রাথমিক কাজটুকু সেরে নীল বেরিয়ে এল। আসার সময়ে সে শ্রীমতীর ভাবী স্বামী অলংকারের ঠিকানাটা নিয়ে নিল।

সূত্র সন্ধানে আমরা একদিন গিয়ে হাজির হলাম অলংকারের অফিসে। উনি একটা মার্কেন্টাইল ফার্মের উঁচুদরের চাকুরে। ওঁকে চেম্বারেই পাওয়া গেল। ভদ্রলোক তখন গভীরভাবে নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। নীলের পরিচয় পেয়ে উনি কলম থামিয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন। তারপর বললেন,

—নিশ্চয়ই শ্রীমতীর ব্যাপারে কিছু জানতে এসেছেন?

উত্তরে নীল বলল,—আপনার অনুমানই ঠিক।

—আর মিনিটদশেক বাদে আমার লাঞ্চ ব্রেক। যদি একটু অপেক্ষা করেন।

—ওহ্ সিওর, আমি অপেক্ষা করছি।

রিসেপশন রুমে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেই বেয়ারা এসে আমাদের নিয়ে গেল ওঁর ঘরে। বছর ত্রিশের মধ্যেই বয়েস। সুদর্শন। লম্বায় প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি। স্বাস্থ্যটিও বেশ মজবুত। চোখে রিমি ফ্রেমের চশমা। সুদর্শন পুরুষটির মুখে স্পষ্ট বিষণ্ণতার ছাপ। বসতে বসতেই আমাদের সামনে সিগারেট এগিয়ে ধরলেন। নীল বরাবরই নিজের ব্র্যান্ড পছন্দ করে। ও ওর সিগারেট ধরালো। আমি অলংকারের দেওয়া সিগারেট ধরিয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম।

ক্লান্ত হতাশার স্বরে বললেন,—আর কতবার আপনারা আমাকে বিরক্ত করবেন বলুন তো? এখনও কি আপনারা বুঝতে পারছেন না শ্রীকে আমি খুন করতে পারি না।

নীল বলল,—মিস্টার রায়, আমি বুঝতে পারছি পুলিস ইতিমধ্যে আপনাকে অনেকবারই জেরা-টেরা করে গেছে। কিন্তু আমি পুলিস নই, তাদের পক্ষ থেকেও আসিনি। মিস্টার বিশ্বাস, আই মিন শ্রীমতী দেবীর কাকাই আমাকে প্রাইভেটে কেসটার তদন্তের ভার দিয়েছেন। আর সেই কারণেই আপনার কাছ থেকে কিছু সূত্র পেতে চাইছি। আপনাকে বিরক্ত করার বিন্দুবিসর্গ ইচ্ছে আমাদের নেই।

মুখে সেই হতাশার ভাব বজায় রেখেই অলংকার বললেন,—সবই তো সেই একই প্রশ্ন করবেন। বেশ প্রশ্ন করুন, জানা থাকলে জানাব।

—শ্রীমতী দেবীর ফ্রেন্ড সার্কেল সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা আছে? আপনি তাঁর নিকটতম মানুষ হতেন। সেই কারণেই আশা করতে পারি যে আপনি তাঁর অনেক ব্যক্তিগত খবরই রাখতেন বা রাখার সুবিধা ছিল।

নীলের প্রশ্নটা অলংকার ভালভাবে শুনলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন,—খুব যে একটা মিশুকে মেয়ে ছিল তা বলা যায় না। তবে বন্ধুবান্ধব বা চেনাজানা একেবারে ছিল না তাও নয়।

—আমি তা বলছি না, আমার বক্তব্য ওর ঘনিষ্ঠ কে কে ছিলেন?

—খুব ঘনিষ্ঠ তেমন কাউকে মনে পড়ছে না।

—ভালবাসার ক্ষেত্রে আপনার কি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল?

খুব প্রত্যয় নিয়েই বললেন,—অ্যাবসার্ড। ওর মৃত্যুর আগের সন্ধ্যাতেও আমাদের ভাবী জীবন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। না, ওসব কথা ভাবাও পাপ।

—আমি কিন্তু শ্রীমতী দেবীর বিশ্বস্ততা নিয়ে কোনো কথাই বলছি না। আমার জিজ্ঞাস্য অন্য কেউ কী আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন?

—বলতে পারব না। শ্রী-র দিক থেকে তেমন কোনো আভাসও পাইনি।

—বাট ইট ওয়াজ আ রেপড্ কেস। এবং রেপিং হয়েছে তাঁর নিজের শোবার ঘরে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আমাকে ভাবতে বাধ্য করাচ্ছে যে ব্যক্তি সে রাত্রে শ্রীমতী দেবীর ঘরে গিয়েছিল সে খুবই পরিচিত। নিছক বলাৎকার করাই যদি তার উদ্দেশ্য হত তাহলে সে তার কর্ম সমাধা করেই চলে যেত, অযথা খুনের মত ব্যাপারে নিজেকে জড়াতো না। খুন করতে বাধ্য হয়েছে, নিজের আইডেন্টিটি বিলোপ করার কারণেই। সেই জন্যই বলছি, একটু ভাল করে মনে করার চেষ্টা করুন, ওর ঘনিষ্ঠ অথবা ওর শোবার ঘরে যাবার মতো আর কোনো মানুষকে মনে পড়ে কি না?

কিছুক্ষণ চিন্তা-টিন্তা করে মাথা নাড়তে নাড়তে আবার হতাশায় ডুব দিল। হঠাৎ নীল পকেট থেকে শ্রীমতীর ঘরে পাওয়া আংটিটা বার করে বলল,—দেখুন তো মিস্টার রায়, এ আংটিটা চিনতে পারছেন কিনা?

আংটিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে উনি বললেন,—না এ আংটি আমার আগে দেখা নেই। শ্রীমতীকে এ আংটি আমি আগে কোনো দিনও পরতে দেখিনি।

—উনি কোন্ ফুল বেশি ভালবাসতেন?

—সব ফুলই ওর প্রিয় ছিল।

—ব্ল্যাকপ্রিন্স আই মিন কালো গোলাপ?

—হতে পাবে।

আবো কিছুক্ষণ দুএকটা মামুলি প্রশ্ন করার পর আমরা উঠে পড়লাম। চেম্বারের দরজার কাছে এসেছি এমন সময় অলংকার বললেন,—কথাটা অবান্তর মানে এ ধরনের খুনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই তবু আপনি বন্ধুবান্ধব প্রসঙ্গ তুললেন বলেই বলছি,

ঘুবে দাঁড়িয়ে নীল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল, বলল,—হ্যাঁ বলুন, আপনার কাছ থেকে কিছু শুনব বলেই তো আসা।

—প্রায় বছবখানেক হল এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে ওব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল খুব বেশি বকম।

—কী রকম?

—শ্রী-ব গানেব গলাটা ছিল খুবই ভালো। ইউনিভারসিটিতে ওর গানের জন্যেই এক নামে পবিচিত ছিল। গত বছব বি-ইউনিয়ন ফেস্টিভ্যালে ওব গান সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। সেদিন আমি ওখানেই ছিলাম। গান শেষ কবার পর আমরা যখন গ্রিনরুমে বসে আছি এমন সময় মহিলা নিজে থেকে এসে আলাপ কবলেন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বললেন উনি একটা ফিল্ম প্রোডিউস করতে চলেছেন। ছবিটা গানেব। শ্রী-ব মতই একটি গলা ওব প্রয়োজন। আপত্তি না থাকলে উনি শ্রীকে ওঁর ছবিতে নেপথ্য গাযিকা হিসেবে নিতে ইচ্ছুক।

—বেশ, তাবপব?

—তারপব আব কি। ভদ্রমহিলা ঘন ঘন আসতে শুরু করলেন। শ্রী-র আপত্তি ছিল না প্রফেশনাল গায়িকা হতে। আব সেই স্বল্প পবিচয় পবে ঘনিষ্ঠতায় রূপান্তবিত হয়।

—কোন বেকর্ড কি করা হয়েছিল?

—নাহ্, সে বই আব শেষ পর্যন্ত ফ্লোরে যাযনি। মহিলা এখন অন্য ছবির কথা ভাবছেন।

—মহিলাব সঙ্গে আপনাবও নিশ্চযই আলাপ হযেছিল?

—সে তো হবেই।

—তিনি যখন ফিল্ম প্রোডিউস কবতে চান, নিশ্চযই তাঁব পয়সাকড়িও প্রচুর?

—সে বকমই তো মনে হয।

—খুব এজেড মহিলা?

—না, শ্রীর থেকে দু'চার বছবেব বড হতে পাবেন।

—মহিলাব নামটি নিশ্চযই আপনাব জানা।

—মিস অর্চনা সেন।

—নিশ্চয়ই খুব সুন্দবী?

—কোনোভাবেই সুন্দরী বলা যায় না। তবে বেশ স্মার্ট। ড্যাশিং। কথাবার্তায় যে কোনো মানুষের মন জয় কবে নিতে পাবেন। শ্রী তো বেশুলাব ওব ভক্ত হযে উঠেছিল।

—আর আপনি?

অলংকার বেশ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে ভ্রূ তুলে তাকালেন, তাবপর উদাস ভঙ্গিতেই বললেন —ভক্ত হতে যাব কী জন্যে? আমার ভাবী স্ত্রীর বন্ধু। ন্যাচারলি আমার সঙ্গেও সামান্য পরিচয় হয়েছিল তাছাড়া আব কিছু নয়।

—ওনার ঠিকানাটা বোধহয জানা আছে?

হঠাৎ অদ্ভুত একটা জেদি মনোভাব নিয়ে অলংকার বললেন,—না। অবিবাহিতা কোনো মহিলার ঠিকানা বা ফোন নাম্বার রাখার অভ্যেস আমার নেই। শ্রীর কাছে হয়তো ছিল। আমার পক্ষে কিন্তু আব বেশি সময় দেওয়া সম্ভব নয়। আপনাদের কি আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?

বেশ বুঝতে পারলাম ভুলবশত উনি অর্চনা সেনের প্রসঙ্গ টেনে বিব্রত বোধ করছেন। এখন আমাদের এড়িয়ে যেতে পাবলে বোধহয় স্বস্তি পান। নীলও আর তেমন কিছু প্রশ্ন না করে বিদায় নিযে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম ওর মুখ চোখে বেশ চিন্তার ছাপ। কিছুক্ষণ পর এক সময় আমিই জিজ্ঞাসা করলাম,—ব্যাপারটা কী হল বলতো?

—কিসেব কী ব্যাপার?

—এই অর্চনা সেন। ইনি আবার কিনি?

—একটা মেয়ে।

—দুব, তা বলছি না। বলছি অর্চনা সেনের কথায় উনি অমন বিব্রত আব কাঢ় হয়ে পডলেন কেন? কিছু লটঘট নেই তো?

—কে জানে? ত্রিকোণ প্রেমের ব্যাপার তো হামেশাই ঘটছে।

—শ্রীমতী বিশ্বাসের খুনের বীজ এখানে লুকানো নেই তো?

—কী বকম?

—অলংকাব রায় হঠাৎ মনে করলেন অর্চনা সেনই তাঁব একমাত্র কাম্য মহিলা। অথচ শ্রীমতীকে কথা দেওয়া আছে। বিয়েও ঠিকঠাক। কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলারও হয়তো উপায় ছিল না। তাই,

—কিন্তু তার জন্যে বলাৎকারের কী প্রযোজন? আব ঠিক এই একই ধবনেব ব্যাপাব এব আগেও ঘটেছে। মীনাক্ষী মল্লিক। ঠিক একই ভাবে, একই পবিণতিতে তাকেও আমরা দেখেছি। এবং দুটো খুনেব চেহারা একই। বুঝতে অসুবিধে হয় না খুনি একই ব্যক্তি। একই বকম লাল নাইলন কর্ড। একই রকম ব্ল্যাকপ্রিন্স। ব্যতিক্রম, এক জায়গায় পাওযা যায় ছোট একটি মেরুন রঙের ভেলভেট টিপ। অন্য জায়গায় একটি সোনাব আংটি। তুই যদি বলিস অলংকার শ্রীমতীকে খুন করেছে তাহলে সে মীনাক্ষীকেও খুন কবেছে এটাই বলতে হয়। অন্তত খুনের ধরন দেখে যে কোনো লোকই এটা স্বীকার করবে। আবও একটা ব্যাপার আছে, দুটি ক্ষেত্রেই কিন্তু খুনি আগেই সজাগ করে দিয়েছে, মৃত্যুর খাঁডাটা কার মাথাব ওপব নেমে আসতে চলেছে।

আমি বললাম,—অলংকারকে উড়িয়ে দেবারও তো কোনো কাবণ দেখছি না। হয়তো সে মীনাক্ষীর সঙ্গেও প্রেমের খেলা খেলেছিল। উদ্দেশ্য ছিল একটা রমণীর দেহ ভোগ। তাবপর শ্রীমতীব সঙ্গেও প্রেম কবেছে। শ্রীমতীর পর এখন ধরেছে অর্চনাকে। হি ইজ ভেবি হ্যান্ডসাম। ঝকঝকে তকতকে মার্জিত পুরুষ। শাঁসালো চাকরি। যে কোনো মেয়েই ওর প্রেমে পড়তে পারে। আর ও সেই সুযোগগুলো নিয়ে যাচ্ছে।

—কথাগুলো তোর একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি না। সন্দেহের তালিকা থেকে বাদও দিচ্ছি না। তুই যা বললি তা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট হতে পাবে। অর্চনা সেনেবও হোযাব অ্যাবাউটস্ জানা দবকার। তোব ধাবণা যদি ঠিক হয় তাহলে অর্চনা সেনের জীবনও বিপন্ন হতে পারে। আবও একটা কথা, মীনাক্ষী মল্লিক হত্যাকাণ্ডের কিছুক্ষণ আগে তার আশেপাশে ছিল একজন পুরুষ আর একজন মহিলা। এ ক্ষেত্রেও, যদিও শ্রীমতীর হত্যাকাণ্ডেব আগে আমবা দেখতে পাচ্ছি কেবলমাত্র অলংকাবকে তবুও মনে বাখিস, সে রাত্রে শ্রীমতীর কাছে রাত প্রায় সাড়ে এগারোটাব সময় একটা মেয়েব ফোন এসেছিল।

—এ দিয়ে তুই কী বলতে চাইছিস? এই দুটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে যুক্ত আছে? ছেলের মোটিভ নয় বোঝা যায়। কিন্তু মেয়ে? তাব ফাংশানটা কী? খুনেব সঙ্গে তাব কী সম্পর্ক?

—ইয়েস। আসল কথা হচ্ছে মোটিভ। ওটা বুঝতে পারলে খানিকটা এগুনো যেতো। কিন্তু চারিদিকেই ভোঁ ভা—। তবে একটা কথা অত্যন্ত স্পষ্ট, কেসটা খুবই ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ডিফিকাল্ট টু সলভ্। খুনি যেই হোক, সে অত্যন্ত চালাক। কোথাও কোনো প্রমাণ বাখছে না যা দিয়ে তাকে আইডেন্টিফাই করা যায়।

নীলের কণ্ঠে রীতিমত হতাশার সুর। আমি অবশ্য এইসব তদন্তেব ব্যাপাব নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করতে পারি না। বেশিক্ষণ ভাবতে গেলেই আমাব ঘুম পেয়ে যায়। নীরবে সিগারেট টানতে টানতে আমরা বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

গড়িয়াহাট ব্রীজে ওঠার আগেই বাঁ দিকে পঞ্চাননতলা রোড। নম্বর মিলিয়ে কিছুটা এগিয়ে যেতে পেয়ে গেলাম অর্চনা সেনের বাড়ি। বেশ ঝকঝকে তিনতলা বাড়ি। ঠিকানাটা পেয়েছিলাম শ্রীমতীর কাকা অতনু বিশ্বাসের কাছেই। শ্রীমতীব পার্সোনাল টেলিফোন ইনডেক্সেই লেখা ছিল নম্বরটা।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বেল টেপবার আধ মিনিটের মধ্যেই একটা বছর বারো তেরো ছোট্ট কাজের মেয়ে এসে দাঁড়াল।

নীলই জিজ্ঞাসা করল,—অর্চনা দিদিমণি আছেন?

—বোধহয় আছেন। আপনাবা কোত্থেকে আসছেন?

—সে তুমি বুঝতে পাববে না, বল দু'জন বাবু দেখা করতে এসেছেন।

মেয়েটা চলে গেল। প্রায় মিনিটখানেক পর পঁচিশ-ছাব্বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে এক যুবতী এসে দাঁড়ালেন,—কাকে চান?

—আজ্ঞে, আমরা অর্চনাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—আমিই অর্চনা সেন। আপনারা?

কিছু না বলে নীল নিজের কার্ডটা এগিয়ে ধবল।

কার্ডটা পড়ে ফেবত দিতে দিতে অর্চনা বললেন,—ইজ দেয়ার এনিথিং রং উইথ মী?

—ঠিক তা নয়। কয়েকটি ব্যাপাবে আপনার সঙ্গে কথা বলা উচিত মনে করেই আমরা এসেছি।

—গোয়েন্দা মিনস্ বদারেশান। হুইচ আই ডোন্ট লাইক। আব আমি এমন কিছু অপরাধ করিনি যে আমাকে গোয়েন্দাব জেরা ফেস করতে হবে।

নীল হাসল। তাবপর বলল,—ঠিক বলেছেন ম্যাডাম। যে কোন ভদ্রলোকই গোয়েন্দাদের আভয়েড কবতে চান। কিন্তু গোয়েন্দারা বড় পা চাটা। তাড়ালেও যেতে চায় না। তবে আপনি যখন কোন অন্যায় করেননি তখন আব ভযটা কোথায়?

বেশ অবজ্ঞার স্বরে অর্চনা বললেন,—ভযটয় আমি একটু কমই পাই মিস্টার। আসলে আমি আপনাদেব সঙ্গে কথা বলতে বিশেষ ইন্টারেস্ট পাচ্ছি না।

নীল আবাব হাসলো। বললো,—আজ আপনি আমাকে না করে দিলে আমাকে নিশ্চযই ফিরে যেতে হবে। তবে পুলিসের বিশেষ নির্দেশ-নামা থাকলে এই আপনিই হয়তো কথা বলতে ভালোবাসবেন ইচ্ছে না থাকলেও ভালবাসতে বাধ্য হবেন। বিচিত্র এই জগৎ, বুঝলেন কিনা?

ভ্রু কুঁচকে অর্চনা আমাদেব দুজনকে ভাল কবে দেখতে থাকলেন।

নীল হাসি বজায় রেখেই বলল,—এতোটা রাফ হবেন না ম্যাডাম। সত্যিই কয়েকটা দরকারি কথা ছিল। আপনি সহযোগিতা কবলে একটি মেয়েব মৃত্যু বহস্যের কিনারা করা যেতো।

—মৃত্যু রহস্য? কার মৃত্যু?

—শ্রীমতী বিশ্বাসকে বোধহয় আপনি চিনতেন?

—হ্যাঁ চিনি, খুব ভাল করেই চিনি। গানের গলাটা খুবই ভাল।

—আপনি কি জানেন তিনি কয়েকদিন আগে খুন হয়েছেন?

—ওহ্ মাই গড! বলছেন কী আপনি?

—ইযেস ম্যাডাম। আপনি কী রিসেন্টলি তাঁর বাড়ি যাননি? বা কাগজে পড়েননি?

—নো, বিকজ আই ওয়াজ নট ইন কলকাতা।

—কদ্দিন আপনি কলকাতার বাইবে?

—নিযাব অ্যাবাউট ওয়ান মনথ্।

—আই সি! তা বাইরে বলতে কদ্দুব? আই মিন কোথায় গিয়েছিলেন?

—মুম্বাই। একটা ডাবল ভার্সান ছবি করার কথা ভাবছি। তারই প্রিপারেশনের জন্যে। ভেবি স্যাড নিউজ টু মি! যাবার আগেও শ্রীমতীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমার খুবই ইচ্ছে ছিল ওকে দিয়ে গানগুলো গাওয়াব। সি ওয়াজ নো ডাউট আ ট্যালেন্টেড সিঙ্গার। গায়িকা হিসেবে ওকে আমি

...স্ট ইনট্রোডিউস করতে চেয়েছিলাম। আমার সমস্ত প্ল্যানই ভেস্তে গেল।

অলংকার ঠিকই বলেছিল। অর্চনা সেন সত্যিই কথাবার্তায় বেশ চটপটে। দেখতে মোটেও সুন্দরী ...ন। মহিলাসুলভ কমনীয়তাও কম। কিন্তু খুব স্মার্ট। কোথায় কোন জড়তা নেই। ছিপছিপে চেহারা। ...ন্ডটাভগুলোও বেশ মজবুত। মুখে একটা পশ্চিমী রুক্ষতা থাকা সত্ত্বেও একটা আলগা গ্ল্যামার এসে ...স রুক্ষতাকে খানিকটা ঢেকে দিয়েছে। পরনে মেরুন রঙের সিল্ক শাড়ি। একই রঙের ব্লাউজ। ঠোঁটে ...ঙ্কা রঙের ছোঁয়া। কপালে মেরুন রঙের ভেলভেট টিপ। পায়ে চপ্পল। দেখলেই মনে হয় অর্থাভাব নেই। ডান হাতের অনামিকায় একটা হীরের আংটি ছাড়া আর কোন অলঙ্কার নেই শরীরে। এমন কি মেয়েদের পরম প্রিয় সোনার গহনাও নেই দুহাতের কোনখানে। কেবলমাত্র বাঁ হাতের কব্জিতে একটি ফিনফিনে গোল্ডেন কালার টাইটান কোয়ার্জ।

নীল কিছু বলতে যাচ্ছিল। অর্চনা সেন নীলকে বাধা দিয়ে বললেন,—আসুন ভেতরে বসা যাক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণই বা কথা বলা যায়। আমি আবার বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। মনটা ...ও খারাপ করে দিলেন মিস্টার ব্যানার্জি। ভাবতেও পারছি না যে শ্রীমতী নেই।

অর্চনা আমাদের নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসালেন। সাজানো ছিমছাম ঘরখানি। মাঝে সেন্টারটেবিল। টেবিলের চারদিকে চারটে শরীর ডুবে থাকার মতো সোফা সেট। দুজন দুটোয় গিয়ে বসলাম। অর্চনাদেবী বসলেন আমাদের মুখোমুখি। কয়েক সেকেন্ড নীরবে মাথা নিচু করে কাটালেন। তারপর বললেন, কিন্তু —শ্রীমতী খুন হবে কেন? কে করল এ কাজ?

—সেটাই তো আমাদের সবার শেষ জিজ্ঞাসা। আর সেই কারণেই আপনার কাছে আসা। যদি কিছু হদিশ পাওয়া যায়। আচ্ছা মিস সেন, অলংকার রায় নামে কি আপনি কাউকে চেনেন?

—অফকোর্স। উই আর ইন লাভ উইথ ইচ আদার। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা বিয়ে করছি।

আমরা দুজনেই আকাশ থেকে পড়লাম। নীল বলল, —সে কী? আমি তো শুনেছিলাম,

—শ্রীমতীর প্রসঙ্গ তুলবেন? ওটা রিউমার। আসলে ওর মতো ব্রাইট ছেলে পেয়ে শ্রীমতীর কাকা ...র লোভ সামলাতে পারেননি। উনি চেয়েছিলেন ওদের বিয়ে দিতে। কিন্তু আমি জানি ওরা পরস্পরের ...ন্ধু ছাড়া আর কিছুই নয়। প্র্যাকটিক্যালি শ্রীমতী ওর কেরিয়ার নিয়েই ব্যস্ত। ওর স্বপ্ন ছিল মস্ত গায়িকা ...বার। বিয়ে টিয়ের কথা ও চিন্তাই করতো না।

—কিন্তু অলংকারবাবু যে বললেন,

—কী বললেন, শ্রীমতীকে বিয়ে করবেন? আমার মনে হয় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই ও আপনার কাছে সত্যি কথা বলেনি।

—সেই বিশেষ উদ্দেশ্যটা কী?

—জানি না, আমার সঙ্গে দেখা হলেই বুঝতে পারব। তবে না ভেবেচিন্তে ও কিছু করে না।

—আপনাদের ব্যাপারটা কি শ্রীমতীর কাকা জানতেন?

—হাউ কুড আই সে?

—আপনার সঙ্গে অলংকারবাবুর শেষ কবে দেখা হয়েছিল?

—মাসখানেক আগে। মানে মুম্বাই যাবার আগে।

—শ্রীমতীদেবীর আর কোন অ্যাফেয়ার্স সম্পর্কে আপনার কিছু জানা আছে?

—না নেই। তবে এটুকু বলতে পারি, মানে গেইস করতে পারি, অলংকারের ওপর যে শ্রীমতীর সামান্য দুর্বলতা ছিল না তা নয়। তবে ঐ যে আগেই বললাম লাভের থেকে কেরিয়ার ওর কাছে অনেক বড় ছিল। ও প্রায়ই বলতো, বাবার অকালমৃত্যুতে মা বড় কষ্ট পেয়েছেন, ওকে বড় হতে হবে। মায়ের দুঃখ ঘোচাতে হবে। না, শ্রীমতীর পক্ষে অন্য কোন অ্যাফেয়ার্সে জড়িয়ে পড়া অসম্ভব।

—বাট সি ওয়াজ ব্রুটালি রেপড অ্যান্ড মার্ডারড।

—হোয়াট? আপনি বলছেন কী?

—একজ্যাক্টলি সো। আর সেই জন্যেই তো ভাবতে বাধ্য হচ্ছি ওঁর জীবনে অন্য কোন পুরুষের

আবির্ভাব ঘটেছিল।

অর্চনা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন,—আমার কিছু বলার নেই। প্র্যাকটিক্যালি মানুষের মনের খবর কেইবা বলতে পারে? তবে রেপের সঙ্গে কিন্তু অ্যাফেয়ার্সের কো. সম্পর্ক নাও থাকতে পারে।

—আপনার কথা উড়িয়ে দিচ্ছি না। আচ্ছা মিস সেন, আপনার আপত্তি না থাকলে সামান্য কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব।

—করুন। আমার লুকোবার মতো কিছু নেই।

—আপনার আত্মীয়স্বজন?

—আমি আর আমার বাবা। এই নিয়ে আমার সংসার।

—মা?

—নেই?

—ভাই বোন?

—কেউ নেই। শুধু আমি আর বাবা। সমর সেন।

—বাবা কী করেন? মানে আপনি তো ফিল্ম প্রোডিউস করার কথা চিন্তা ভাবনা করেন।

—বুঝেছি আপনি কী বলতে চাইছেন। আমার বাবা ফিল্মেরই লোক। অন্নপূর্ণা ডিস্ট্রিবিউশন এবং এছাড়াও কিছু হিট্ বাংলা ছবি উনি এর আগে করেছিলেন। এখন বয়েস হয়েছে। আমিই ওঁর ছেলে এবং মেয়ে। আমাকেই সব দেখতে হয়। ন্যাচার‍্যালি আই ড্রীম ফর আ কমার্শিয়াল ফিল্ম। পুত্রের অভাবে তো পৈত্রিক ব্যবসা তুলে দেওয়া যায় না।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তাহলে আজ আমরা উঠি।

আর তেমন বিশেষ কথাও ছিল না। আমরা উঠে পড়লাম। বাইরে বেরিয়ে এসে নীল বলল —কে সত্যি বলছে? অর্চনা না অলংকার?

বললাম,—তুই প্রেমের কথা বলছিস? সাধারণত মেয়েরা প্রেমের ব্যাপারে এত সোচ্চার হয় না।

মাথা নাড়তে নাড়তে নীল বলল,—ভুলে যাইনা অর্চনা নামের মেয়েটি আর পাঁচটা মেয়ের থেকে আলাদা। তাছাড়া এখনকার ছেলেমেয়েরা ভালবাসার কথা জানাতে দু সেকেন্ড সময় নেয়। প্রেম খুব ইজি ব্যাপার এখন। কিন্তু পরস্পরের ভার্সানটা সম্পূর্ণ বিপরীত। অলংকার বলছে তার সঙ্গে অর্চনার কোন সম্পর্কই নেই। আর অর্চনা বলছে অলংকার আর শ্রীমতীর এপিসোডটাই রিউমার।

—তার সঙ্গে শ্রীমতী হত্যার কী সম্পর্ক?

—ঘটনাটা যদি ত্রিকোণ প্রেমে সীমাবদ্ধ হয় তাহলে মোটিভ ক্লিয়ার। শ্রীমতীর মৃত্যুটা উভয়ের যে কেউই ঘটাতে পারে। কিন্তু যেভাবে খুনটা হয়েছে সেটা কি অর্চনার পক্ষে করা সম্ভব? ওদিকে মীনাক্ষী মল্লিকের ঘটনাটাও একই রকম। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এই দুই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কোথাও একটা যোগসূত্র আছে। আবার হয়তো দেখা যাবে শেষপর্যন্ত এমন একজন হত্যাকারী বলে প্রমাণিত হল যাকে আমরা এখনও চোখেই দেখতে পাইনি। হয়তো দেখা গেল আমাদের চিন্তার অতীত এমনই একটা মোটিভে এই দুই হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। সব ব্যাপারটাই এখন কেবল ধোঁয়া ধোঁয়া।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা কথা এল। নীলকে বললাম, —অর্চনা সেনের যা কাঠ কাঠ চেহারা, শ্রীমতীকে ছেড়ে অলংকার কী সত্যিই ওর প্রেমে পড়বে?

নীল হেসে বলল,—যৌবন বড় সর্বনাশা সময়। প্রতি পদে তখন ভুলের খেলা। আর সেই খেলা খেলতেই তো ভালবাসে যুবক-যুবতীরা।

শহর কলকাতায় ঘটনার কোনো শেষ নেই। বিচিত্র ঘটনার প্রবাহ থাকেই। কখনও রাজনৈতিক অস্থিরতা, কখনও সাম্প্রদায়িক জটিলতা। কখনও হগমার্কেট পুড়ে যাওয়ার মত ঐতিহাসিক ঘটনা, কখনও বউবাজার ব্লাস্টিং। আবার কখনও ঐতিহ্যশালী স্টার থিয়েটারের রহস্যময় ধ্বংসলীলা। এ

...ও আছে এইড্‌স্ ভীতি, হেরোইন কবলিত যুবকদের আত্মহত্যা অথবা উন্মাদ হওযাব সংবাদ। ...ছে বধূহত্যা, আছে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল। এরই মধ্যে শহর উত্তাল কবাব মতো ঘটনা ঘটতে ...গল পব পব। এক উন্মাদ খুনি, নামকরা বাড়ির সুন্দরী মেয়েদের গলায় লাল নাইলন কর্ডের ফাঁসে ...ন কবছে। তারপর বিকৃত রুচিতে, তাদেব ধর্ষণ করে রেখে যাচ্ছে নিজের পবিচয়, মৃতার পাশে, ...কপ্রিন্স। কালো গোলাপ।

প্রথমে মীনাক্ষী মল্লিক। তারপর শ্রীমতী বিশ্বাস। নীল যখন মীনাক্ষী আব শ্রীমতী হত্যাকাণ্ডেব বহস্য ...য় হিমসিম খাচ্ছে ঠিক তখনই পুলিসেব খাতায় একে একে যুক্ত হয়েছে বমা মণ্ডল, পিউ দত্ত, ...সেন, নন্দিতা বসাকের নাম।

পব পব এতগুলো খুন হবাব পর স্বাভাবিকভাবেই সাধাবণ মানুষেব মধ্যে চাঞ্চল্যেব সৃষ্টি হল। ...শেষ কবে যে সমস্ত ধনী গৃহে সুন্দবী কন্যা আছে। খববের কাগজে, পাড়ায় পাড়ায়, বেডিও টি-...র সংবাদে পুলিসের ব্যর্থতাব কথা সবিস্তাবে আলোচিত হতে লাগল।

কম কথা নয়। আধডজন মেয়ে খুন হয়ে গেল পরপর। অথচ খুনিব টিকিরও সন্ধান পাওয়া যায়নি। ...ভাবিক কাবণেই সবাই শান্তিবক্ষককে বদনাম করবেই। পুলিস অবশ্য বসে ছিল না। খুন যখন দুটি ...নায় সীমাবদ্ধ ছিল তখন ভাবনা এক খাতে বইছিল। কিন্তু এতগুলো মেয়েব খুন হবাব পব তাবা ...নভাবে চিন্তা শুরু করল। মোটামুটি তারা খুনির একটি চারিত্রিক বিশ্লেষণ করল। খুনি নিঃসন্দেহে ...ক্তসমর্থ যুবক। মেয়েদের মন জয় কবার মতো রূপ বা গুণ তাব আছে। প্রতিটি মেয়েব কাছেই ...স অতি প্রিয় এবং পরিচিত। কিন্তু সে মনোবিকারগ্রস্ত এক উন্মাদ ছাড়া আব কিছুই নয়। কাবণ, ...বিত নয় মৃতা মহিলাকে ধর্ষণ কবেই তৃপ্তি পায়। প্রতিটি পোস্টমর্টেম বিপোর্ট একই কথা বলছে। ...নেব সম্ভাব্য মোটিভও তারা একটা খাড়া করেছে। তাদেব ধাবণা খুনিব মনে যে কোনো কাবণেই ...ক প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি রয়েছে। এবং সেটি সুন্দবী মহিলাদেব ওপব। এ তার সাময়িক উন্মত্ততা নয়। ...বং বলা যায় মোটিভেটেড। খুনি সম্বন্ধে তাবা এমনও ভেবেছে, সে কোনো বিপ্লববিলাসী বেকাব ...বক। হয়ত শ্রেণীসংগ্রামের নতুন রাস্তা বেছে নিয়েছে ধনী কন্যাদেব হত্যা কবার মাধ্যমে।

বিশ্লেষণ যাইহোক। খুনি ধবা পড়েনি। এটাই বড় সত্য। এখন প্রত্যেকেব ধাবণা খুন এখানেই শেষ ...। আবো অনেক খুন এভাবে চলতেই থাকবে।

নীলেব মতো কলকাতার আরো কিছু শখের গোয়েন্দা এ নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু কবে দিয়েছেন। ...লকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ও যেমন মুড-এ থাকে সেইভাবেই আছে। কেবল মাঝে মাঝে বেশ ...অন্যমনস্ক আর গম্ভীব হয়ে যায়। ওকে 'ব্ল্যাকপ্রিন্স' বহস্য সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা কবলেই পাশ কাটায়, ...লে,—আমাব থেকেও অনেক রথী-মহারথী মাথা ঘামাচ্ছে। ওবাই ঘামাক।

ওকে তাতাবার জন্যে বলি,—ব্যক্তিগত অনুরোধে অন্তত দুজন লোক কিন্তু তোব কাছে তদন্ত ...য়েছিল। শিশির মল্লিক আর অতনু বিশ্বাস।

—মনে আছে। তবে ঘটনা এখন সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুতে ছড়িয়ে পড়েছে।

—তা হলেও তুই কিছু করছিস না কেন? পারবি না ব্ল্যাকপ্রিন্স রহস্য ভেদ কবতে?

—কে জানে? তবে দুটো জিনিস আমাকে বড ধাঁধায় ফেলেছে। যদিও সমস্ত ব্যাপারটাই খড়ের ...দায় ছুঁচ খোঁজার মতো। বিশাল একটা শহর। কয়েক লক্ষ লোক এখানে বসবাস করে। অত্যন্ত ...খুলি কয়েকটা সূত্র। একটা মোস্ট অর্ডিনারি টিপ, একটা সোনাব আংটি, লাল নাইলন কর্ড, আর ...একটা করে ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপ। কিন্তু সবকটা খুনেব মধ্যে একটা অদ্ভুত যোগসূত্র রয়ে গেছে।

—কী রকম?

— প্রত্যেকটা মেয়েই সুন্দরী, প্রত্যেকেই রেপ্‌ড্ এবং সেটি ঘটেছে তাব নিজের শয়নকক্ষে। বাইরের ...কটা উটকো লোকের পক্ষে সবার চোখ এড়িয়ে একটি মেয়েব শোবার ঘরে লুকিয়ে থাকা এবং ...রে তাকে হত্যা কবা এবং বেপ করা, ভাবতে অসুবিধা হচ্ছে।

—তাব মানে তুইও বলতে চাইছিস খুনিকে প্রত্যেকটি মেয়েই চিনতো?

—অঙ্ক তো তাই বলছে?

—লোকটা কি লেডি কিলার?

—জানি না, তবে মেয়েদের দুর্বল করার মত কিছু গুণ তার আছে! লোকটা নিঃসন্দেহে খুব চালাক এমন কিছু প্রমাণ সে রেখে যায়নি যাতে করে তাকে ট্রেস্ আউট করা যায়।

—তাহলে কী এইভাবেই চলবে? মডার্ন গোয়েন্দারা সব হার মেনে যাবে? আর একের পব এক মহিলা নিধন চলবে?

—তা কি হয়? ধরা তাকে পড়তেই হবে। তারপর নিজের মনেই বলল, বাট হাউ?

বুঝলাম গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জি এবারে বেশ বেকায়দায় পড়েছে। এখন ও নিরেট কালো অন্ধকাবের জটে পথ হারিয়েছে। এমন কোনো সূত্র ও পায়নি যাতে করে বলা যায় ও খুনির কাছাকাছি পৌছাবার সুযোগ পেয়ে যাবে।

অবশ্য ইতিমধ্যে ও কিছু কাজ কবেছে। মীনাক্ষীদের শঙ্করদাকে সঙ্গে নিয়ে ও একদিন অলংকারের অফিসের সামনে প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা কবেছে। সেদিন সন্ধ্যায় মীনাক্ষীদের বাড়িতে একজন পুরুষ আব একজন মহিলাব আগমন ঘটেছিল। যদি তাদেব মধ্যে পুরুষটি অলংকার হয় সেটা শঙ্কবদাব আইডেন্টিফিকেশান থেকে জানা যাবে। কিন্তু হতাশ হতে হয়েছে। অলংকার সে লোক নয়। অর্চনা সেনের বাড়িতেও শঙ্কবদাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু শঙ্করদার বক্তব্য অনুযায়ী সে মহিলার অর্চনাব মত এবকম বযকাট চুল ছিল না। তার চুল ছিল কাঁধ ছাপানো এবং কোঁচকানো। আর গায়ের রঙটাও ছিল এ মেয়েটার থেকে কালো। অবশ্য সে মেয়েটা প্যান্ট শার্ট পরতো। এ মেয়েটা শাড়ি বা শালোযার পরে। অর্থাৎ অর্চনা এবং সেই নাম না জানা মেয়েটা এক নয়।

অর্চনার একমাসের গতিবিধি জানাবও চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানে কিন্তু অনেক গলতি আছে। অর্চনা অবশ্য প্রায়ই কলকাতা মুম্বাই করে। কিন্তু শ্রীমতীর মৃত্যুর সময ও কলকাতাতেই ছিল। তাব মৃত্যুব দিন দুয়েক পরই ও মুম্বাই বওনা হয়। এ ব্যাপাবে নীল এখনই অর্চনাকে তেমন কিছু ঘাটায়নি। ও আরও প্রমাণেব অপেক্ষায় আছে। কিন্তু পব পব যে ধরনেব খুন হচ্ছে তাতে অর্চনাব ভূমিকা কী? শ্রীমতীব মৃত্যুব দিন অর্চনা যদি কলকাতায় থেকেও থাকে তা দিয়ে তো আর প্রমাণ করা যাবে না যে শ্রীমতী হত্যাব সঙ্গে অর্চনাব কোনো যোগাযোগ ছিল বা থাকতে পারে। এমনও হতে পারে অযথা কোন খুনটুনের মধ্যে নিজেকে জড়াতে না চাওয়ার জন্যে মুম্বাই যাবার নামে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে। আমার যতদূব মনে হয় অর্চনাকে ও মাথা থেকে সবিযে দিয়েছে। তাছাড়া অলংকার অর্চনাব কল্পিত প্রেমকাহিনীর (অর্চনার বক্তব্য অনুসারে) কোনো সত্যতা প্রমাণিত হয়নি। অলংকারের সঙ্গে অর্চনাব তেমন কোনো দেখা সাক্ষাতও হয় না। অলংকাব নিজের অফিস নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অবসরে থাকে নিজের বাড়িতেই। আব অর্চনাব গতিবিধি সবই ডিস্ট্রিবিউশন অফিস কেন্দ্রিক। আমার মাথায় একটা জিনিস ঢুকছে না, অর্চনা অত গদগদ হয়ে অলংকাবকে নিয়ে প্রেমের গল্প ফাঁদল কেন? সত্যি কথা বলতে কী শ্রীমতীব মৃত্যুর পব ওদের দুজনেব মধ্যে কোনো যোগাযোগই নেই। বিশ্বাস হয না অলংকাবেব মতো ছেলে শ্রীমতীব মত সুন্দরী শিক্ষিতা মেযে ফেলে সত্যই অর্চনার মতো কেঠো মেয়ের প্রতি আসক্ত হবে। অবশ্য প্রেমেব ক্ষেত্রে কে কোথায় ধরা পড়ে বলা শক্ত। অথবা, কে জানে, সবটাই অর্চনার মনোবিকার হতে পারে। জীবনে যাবা প্রেমের ধারে কাছে যেতে পারে না অনেক সময়ে দেখা গেছে তাদের কেউ কেউ অলীক প্রেমের গল্প শুনিয়ে এক ধরনের মানসিক তৃপ্তি পায়। এও হয়তো সেইরকম। সে যাই হোক, নীল অথৈ জলে। পুলিসও তাই। অন্য গোয়েন্দারাও তাই। ব্ল্যাকপ্রিন্স রহস্য এখনও রহস্যই রয়ে গেছে। এদিকে শীত পড়তে শুরু করে দিয়েছে। বাতাসে এখন উত্তরে হাওয়াব দাপট। কখনো কুয়াশা, কখনো আকাশ ঝকঝকে। আকাশের দিকে তাকালাম। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় চারদিকে ভেসে যাচ্ছে। এমন সুন্দব সময়ে আমরা বড় বিশ্রী একটা তদন্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। আমাদের মনেব আকাশ এখন মেঘে ঢাকা। এই আপাত দুর্বোধ্য এবং হদিশ না পাওয়া কেসের যে কীভাবে সমাধান হবে তা আমাব মাথায় কোনো দিনও ঢুকবে না। বাঘা নীল প্রথম দিন থেকেই কেবলি

চকে চলেছে। নিঃসন্দেহে বলতে হবে খুনি অত্যন্ত চালাক। ক্রাইমকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হতে দিচ্ছে না। আজ যদি ঘটনা ঘটে শ্যামবাজারে কাল ঘটবে টালিগঞ্জে। এরপর হয়তো দেখা যাবে বেলেঘাটায় মঞ্চের পর্দা উঠেছে। দুর্ঘটনা কোনো বিশেষ এক জায়গায় বা বিশেষ কোনো বাড়িকে কেন্দ্র করে ঘটলে তার তদন্তের অনেক সুবিধে। কিন্তু যেখানে ঘটনাস্থল একটা বিরাট শহর, সেখানে যে কীভাবে কী হবে তা বুঝতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত একদিন ওকে জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না, —হ্যাঁরে, তুই কি এখনও কাউকে সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারছিস না?

হাসতে হাসতে নীল বলল,—সারা কলকাতার তাবৎ হৃষ্টপুষ্ট যুবকদেরই আমি সন্দেহ করছি। পারবি ওদের মধ্যে থেকে সত্যিকার খুনিকে খুঁজে বার করতে?

চুপ করে গেলাম। আমার বলার কিছু ছিল না। ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত দশটা। ভাবনা-চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়ে অর্ধসমাপ্ত একটা উপন্যাস টেনে নিলাম। অনেক রাত পর্যন্ত না পড়লে আমার ঘুম আসে না। সম্প্রতি নীল একটা ছোট চেজ বোর্ড কিনেছে। ও কাউকে নিয়ে খেলে না। নিজেই সাদা কালো দু'ঘরেরই চাল দেয়। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—তুই একা একা খেলিস কেমন করে?

ও বলেছিল,—একা একা তো খেলি না। খেলি দুজনে। সাদা ঘুঁটির চাল দেয় নীল ব্যানার্জি আর কালো ঘুঁটির চাল দেয় অপরাধী।

—অপরাধী আবার পাচ্ছিস কোথায়?

—আসলে আমি নিজেই তখন অপরাধী হই। আমি চাল দিই কেমন করে নীল ব্যানার্জিকে জব্দ করা যায় আর নীল ব্যানার্জি চাল দেয় কেমন করে অপরাধীকে ফাঁদে ফেলবে।

এখনও দেখি ও চেজ সাজিয়ে বসেছে। আসলে ও রাস্তা খুঁজে পেতে চাইছে। এমন সময় ফোন বেজে উঠল। আজকাল ফোন এলেই ভয় লাগে। কে জানে আবার না ব্ল্যাকপ্রিন্স ফোন করে কারও মৃত্যু পরোয়ানা শোনায়।

ফোনটা তুলতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠ,—নীলাঞ্জনদা আছেন?

—হ্যাঁ আছেন। কী নাম বলছেন? ও আচ্ছা ধরুন।

দাবার চালে মন থাকলেও কানটা এদিকেই ছিল, জিজ্ঞাসা করল,—কী নাম বলছে?

—মিস রণিতা বসু।

দাবা ফেলে তড়াক করে লাফিয়ে ও রিসিভারটা আমার কাছ থেকে একরকম ছিনিয়ে নিল। ওকে বলতে শুনলাম,—তাই? একটু হতাশ হতে হচ্ছে? না না নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই। কী বললে? বেশ তো, উপসর্গ ছেঁটে দিতে বেশি সময় লাগবে না। আসল উদ্দেশ্য ভুলো না··· ওকে, উইশ ইউ বেস্ট অব লাক··· রাখলাম।

ফোনটা নামিয়ে রেখে ও কিছুক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নিজের মনেই বলল, —আসতে হবে, আসতেই হবে।

—কী ব্যাপার? কাকে আসতে হবে?

—না কিছু না। তা কাল তোর কী কাজ আছে?

—তেমন কিছু নয়।

—ব্ল্যাকপ্রিন্স তো খুব রেয়ার, তাই না?

—সব সময় যে জিনিস হাতের কাছে পাওয়া যায় না সেটাকেই তো রেয়ার বলে। লাল গোলাপ, সাদা গোলাপ, পিঙ্ক বা ইয়ালো গোলাপও সচরাচর দেখা যায়। কিন্তু ব্ল্যাক মানে ডিপ রেডিস্ ব্ল্যাক একটু রেয়ার বৈকি?

—কাল একবার নিউমার্কেটে যাব। চক্রবর্তীর দোকানে একটু খোঁজ নিতে হবে।

—মেয়েটা কে?

—কোন্ মেয়ে?

—রণিতা বাসু।

—খুব নামকরা বাড়ির মেয়ে। জাস্টিস ইন্দ্রনীল বাসুর একমাত্র কন্যা, অসাধারণ সুন্দরী।

—তোর সঙ্গে কী সম্পর্ক?

—হিংসে হচ্ছে নাকি?

—ওসব ছাড়। ব্যাপারটা জানতে চাইছি।

—মেয়েটা খুব ভাল। ও যে রাজি হবে ভাবতেই পারিনি। তবে খুব রিস্কি গেম।

—বড্ড হেঁয়ালি করছিস কিন্তু?

নীল হেসে বলল,—এবাবের গেমটাই তো হেঁয়ালিতে ঠাসা।

সে রাতে আব কোনো কথা হল না। নীল বসল দাবায়। আমি বই নিয়ে।

নিউমার্কেট পুড়ে যাবাব পব পুড়ে যাওয়া অংশেব দোকানিবা এদিক সেদিক নানা জায়গায় নতুন করে নিজেদের দোকান সাজিয়েছে। সাময়িক ছাউনি ফেলে বহু দোকান নিউমার্কেটের বাইরে গজিয়ে উঠেছে। নিউ মার্কেটের দক্ষিণ-পশ্চিমে ছোট গেট দিয়ে আমরা ঢুকে পড়লাম। একদিকে খান্নার বইয়ের দোকান। অন্যদিকে ফরেন গুডস। একদম সোজা এগিয়ে গেলাম। ফুলপট্টির দিকে। চক্রবর্তীর দোকানে গিয়ে দাঁড়াতেই খোদ চক্রবর্তীকে পাওয়া গেল। নীলের সঙ্গে ওর বহুদিনের আলাপ। ও একটা বোকে সাজাচ্ছিল। নীলকে দেখেই একগাল হেসে উঠে এল,—কী খবর ব্যানার্জিদা, এবার অনেকদিন পরে এলেন? নিশ্চয়ই কোন জরুরি ব্যাপাব?

চক্রবর্তীবাবু নীলের থেকে বয়েসে বেশ বড়। তবুও উনি নীলকে ব্যানার্জিদা বলেই ডাকেন। কে জানে কেন? তবে এটাকেই বোধহয় খেজুরে পীরিত বলে। কিংবা সম্মান জানানোর রীতিও হতে পারে। চক্রবর্তীকে একপাশে ডেকে এনে নীল বলল,—চক্রবর্তীবাবু সত্যিই আমি একটা জরুরি কাজে এসেছি।

গাল এঁটো করা হাসি বজায় রেখেই চক্রবর্তী বলল,—সে আপনাকে দেখেই বুঝেছি। বলুন আমি কী ভাবে আপনাকে হেল্প করতে পাবি?

—একটা ইনফরমেশান চাই।

—কী বকম?

—এখানে ব্ল্যাকপ্রিন্স কার কাছে পাওয়া যায়?

—কালো গোলাপ। আমার কাছে তো নেই। আমি বাখিও না। অন্য কোন খদ্দেব হলে ডাইরেক্ট না বলতাম। তবে আপনার ব্যাপার। আমায় একদিন সময় দিতে হবে। আসলে এখনও তো ঠিক জম্পেস শীত পড়েনি। আমদানি একটু কম।

—না না, আপনার অত ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আসলে আমি জানতে চাইছি ওটা কী যখন তখন পাওয়া যায়? নাকি আগে থাকতে বলে রাখতে হয়।

—ওই যে বললাম এটা সম্পূর্ণ আমদানিব ওপর নির্ভব করছে। সাধারণত শীতকালেই আমদানি বেশি হয়।

—বুঝলাম। তা এ ধরনেব গোলাপের খদ্দেব কী বকম?

—অন্য গোলাপেব তুলনায় দাম বেশি। তাই খদ্দেবও কম।

—গত কয়েক মাসের মধ্যে কোন বিশেষ একটি লোক বেশ কয়েকবার আপনার কাছ থেকে কি কোন ব্ল্যাকপ্রিন্স কিনেছে?

—ব্ল্যাকপ্রিন্স আমি বাখি না। ওটা আমার একটা প্রেজুডিস বলুন কুসংস্কার বলুন, সেই জন্যেই আমি দেখেছি, যতবারই ঐ মালটা এনেছি, আমার কিছু না কিছু ক্ষতি হয়েছে।

—এখানে আব কে কে বাখে?

—অনেকেই বাখে। পেলেই বাখে। আমদানি থাকলেই নিয়ে আসে।

—চক্রবর্তীবাবু, একটু খোঁজ নিয়ে কী বলতে পারেন, গত কয়েক মাসের মধ্যে নিয়মিতভাবে কে

ক ব্ল্যাকপ্রিন্স কিনেছেন?

চক্রবর্তী ঘাড় দোলাতে দোলাতে বললেন,—খুব শক্ত। কোন দোকানদারের পক্ষেই নিখুঁতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবু, চলুন দেখি।

পাশাপাশি আরও কয়েকটা দোকান আছে। খুব একটা মনোমত বা আশাব্যঞ্জক জবাব কেউই দিতে পারল না। তবে একেবারে শেষের দিকে 'গুলবাগিচা'র সফিসাহেব সামান্য কিছু আশার বাণী শোনালেন। তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল একজন মুসলমান ভদ্রলোক, নাম নূর আলি, নিয়মিতভাবে গোছা গোছা ব্ল্যাকপ্রিন্স জাতীয় গোলাপ কিনে থাকেন। এটা ওঁর পার্মানেন্ট অর্ডার। তিনি বেশ রহিস আদমি। কোন নবাবের নাকি বংশধর। আমির আলি অ্যাভিনুতে বিশাল বাড়ি। এছাড়া বেশির ভাগই হঠাৎ আসা খদ্দের।

—রেগুলার খদ্দের আর তেমন কেউ নেই বলছেন? নীলই জিজ্ঞাসা করল।

সফি সাহেব বাঙালি মুসলমান। ম্লান হেসে বললেন,—আমাদের জীবনে খুব একটা বেশি ফুলের দরকার পড়ে না। মানুষ মরলে নয়তো বিয়ে বা অন্নপ্রাশনে। বাড়িতে ফুল সাজানোর মতো মন আর কজনের আছে? অবশ্য ইদানীং একটু সভাসমিতির চল বেড়েছে। কিছু কিছু লোক মাঝে মাঝে তোড়া কিনে নিয়ে যান। ও হ্যাঁ আর একজন মাঝে মাঝে ঐ ব্ল্যাকপ্রিন্স কিনতেন। তা তিনিও তো প্রায় মাসখানেক হল আর আসেননি।

—তাকে চেনেন?

—নাহ্ সাহেব। কী করে চিনব বলুন? এরা সব উড়ো খদ্দের। কালেভদ্রে আসে।

—দেখলে চিনতে পারবেন?

—তা হয়তো পারব।

—চেহারার একটা আভাস দিতে পারবেন?

—এই ধরুন সাধারণ বাঙালির মতো হাইট। কথাবার্তায় খুবই কর্কশ। গলার আওয়াজ মেয়েদের মতো সরু। যে কদিনই এসেছেন চোখে কালো চশমা ছিল। আজকালকার ফ্যাসানে চুল। ঢোলা ঢোলা শার্ট, ডেনিমের প্যান্ট। এই আর কী?

এই মুহূর্তে নিউমার্কেটে ঠিক এই বর্ণনার অন্তত সত্তর আশিজনকে খুঁজে পাওয়া যাবে। নীল আর ও প্রসঙ্গে না গিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—তার মানে আপনার পার্মানেন্ট শাঁসালো খদ্দের হচ্ছেন নূর আলি?

—হ্যাঁ সাহেব, খুব রহিস আদমি।

—ঠিকানাটা পাওয়া যাবে?

—যাবে। বলে ভদ্রলোক একজন ছোকরাকে ডেকে নূর সাহেবের ঠিকানাটা এনে দিলেন।

ঠিকানাটা নিতে নিতে নীল বলল,—দিন পনেরো কুড়ি বা মাসখানেকের মধ্যে নূর আলি ছাড়া অন্য কেউ যদি ব্ল্যাকপ্রিন্স কিনতে আসেন, কৌশল করে তার বাড়ির ঠিকানাটা রেখে দিতে পারবেন?

সামান্য একটু ম্লান হেসে সফি সাহেব বললেন,—চক্রবর্তীবাবু আমায় বলেছেন, আপনি গোয়েন্দা মানুষ। আমি বুঝতে পারছি আপনি কারও তল্লাশি করছেন। আপনার কাজে কিছু হেল্প করতে পারলে আমার বেশ ভালই লাগবে। তবে ব্যানার্জি সাহেব, কাজটা শুনতে ইজি হলেও ব্যাপারটা বেশ শক্ত। দুম করে একজন খদ্দেরের কাছে কি তার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করা যায়?

—নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করা যায় না। তবে কৌশলে বা কথার ফেরে খানিকটা আভাস অন্তত পাওয়া যায়।

—ঠিক আছে, যখন আপনার বিশেষ দরকার, তখন চেষ্টার কসুর করব না।

নীল পকেট থেকে নিজের একটা কার্ড এগিয়ে দিয়ে বলল,—এটা রাখুন। যদি সম্ভব হয় একটু চেষ্টা করবেন ফোনে খবর দেবার। নইলে আমি মাঝে মাঝে লোক পাঠিয়ে খবর নিয়ে নোব। আর একটা কথা মনে রাখবেন সফি সাহেব, কাজটা খুব জরুরি এবং গোপনীয়।

নিউমার্কেট থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক এলোমেলো খানিকটা ঘুরলাম। হঠাৎ নীল বলল,— চ

অজু, পাশেই একটা নতুন চীনে খাবারের দোকান হয়েছে। একটু খেয়ে নিই। খাওয়া-দাওয়া পর তুই বাড়ি চলে যাবি। ফোনের কাছাকাছি থাকবি। ইম্পর্ট্যান্ট্ কোন খবর এলে নোট করে নিবি।

—আর তুই?

—একটা ঘোরাঘুরিব ব্যাপাব আছে। আমার হয়তো ফিরতে রাত হতে পারে।

খেতে খেতে প্রায় বিশেষ কোন কথা হল না। আমিও আব নীলকে ঘাঁটাচ্ছিলাম না। কারণ বেশ বোঝা যায় ও বেশ চিন্তামগ্ন। খাওয়ার একেবারে শেষ পর্বে এসে নীলকে জিজ্ঞাসা কবলাম,—মনে হচ্ছে তুই অনেকটা এগিয়েছিস?

ফিকে হাসি হেসে ও বলল,—না, কিছুই এগোইনি, তবে এটা টোপ ফেলেছি।

—টোপটা কী?

—সে আছে। তবে আমি যা সন্দেহ করছি, তা যদি সত্যি হয তাহলে হয়তো টোপটা সে গিললেও গিলতে পারে। আগে লাক বিশ্বাস কবতাম না। এখন কবি। লাক ফেবার করলে মনে হয় একটা জায়গায় পৌঁছতে পারব।

—খুনি সম্বন্ধে কোন আইডিয়া নিশ্চয়ই পেয়েছিস?

—বললাম না একটা অনুমানকে ভিত্তি কবেই এগোচ্ছি। দেখা যাক কী হয়?

বিল-টিল মিটিয়ে বেবিয়ে পড়লাম হোটেল থেকে। সামনেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। হাত দেখিয়ে ট্যাক্সিটাকে থামতে বলে নীল বলল, —তুই এবাব কাট। আমি চলি।

জিজ্ঞাসা করলাম,—এখন কোথায যাবি?

—বুনো হাঁসেব সন্ধানে, বলেই ট্যাক্সিটায় উঠে পড়ে ড্রাইভারকে কিছু নির্দেশ দিল। তাবপর শীতের বোদে আমাকে দাঁড় করিয়ে ও হাওয়া হযে গেল।

দেখতে দেখতে আরো দিন পনেবো কেটে গেল। শীতটাও জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। আমায একাই থাকতে হচ্ছে। কারণ নীলবাবুব কোনো পাত্তাই নেই। মাঝে মাঝে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করে কোনো ফোন-টোন এসেছিল কিনা? আমি স্রেফ 'না' বলে চুপ কবে যাই। এবকম ঘটনা এব আগেও অনেকবার ঘটেছে। রহস্য যতই শেষের দিকে আসে ততই নীলেব সঙ্গ আমায় হাবাতে হয়। কিছুতেই শেষের পর্যায়ে ও আমাকে সঙ্গে নেয না। বলে দ্বিতীয কেউ থাকলে ওব নাকি তদন্তে ব্যাঘাত ঘটে।

আমি জানি না এই আপাদমস্তক না বুঝতে পাবা হত্যাকাণ্ডগুলোব কতটা ভেতবে ঢুকতে পেরেছে গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জি। হত্যাকাবী প্রথম দিন থেকেই নীলেব উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। খুন কবার আগেই জানিয়ে দিয়েছে সে খুন করতে যাচ্ছে। খুনের পব বেখে গেছে নিজের ছোট্ট পরিচয কালচে লাল গোলাপ। ব্ল্যাকপ্রিন্স। খুনেব ধরন দেখে মনে হয, সে যে কটি মেয়েকে খুন কবেছে সব কটার পেছনেই আছে নৃশংস প্রতিহিংসা। আর যে কটা মেয়ে খুনির নৃশংসতার বলি হয়েছে তাবা প্রত্যেকেই ধর্ষিতা হযেছে। কিন্তু কেউই তাদেব কুমাবিত্ব হাবাযনি। অনেক ভেবেও আমি খুনিব এই মনোবৃত্তিব কারণ বুঝতে পারিনি। খুনি যে কী চায তাব কোনো সঠিক ব্যাখ্যা নেই। কোনো খুনেব সঙ্গেই অর্থের কোনো সম্পর্কে নেই।

এদিকে গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জি সমেত তাবৎ পুলিস মহল খুনির কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ কবতে পারেনি। ছ'টা খুন হয়ে গেছে। আবো কত হবে কে জানে? খুনেব আশেপাশে যে কটি লোককে আমি দেখেছি তাদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর যদিও বা বাখা হয়েছে খুনি হিসেবে তাদেব বিরুদ্ধে কোনো অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় নি। অবশ্য মীনাক্ষীব সেই বন্ধুদ্বয়ের আব কোনো খোঁজ পাওয়া সম্ভব হয়নি।

স্বীকাব করতে লজ্জা নেই, আমাদেব রহস্য ঘাঁটা জীবনে এরকম সূত্রহীন রহস্য এর আগে আমি পাইনি। নূব আলি সাহেবের বাড়িতে নীল একদিন হানা দিয়েছিল। কিন্তু সত্তব বছরের এক পক্ককেশ বৃদ্ধ একের পর এক এই ধরনের হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাবেন তা ভাবা যায় না। সন্দেহের তালিকা থেকে বৃদ্ধ নূর আলিকে নীল বাদ দিয়েছে কি না জানি না, তবে আমি বাদ দিয়েছি। নিউমার্কেটের সফি

সাহেব বা চক্রবর্তীর কাছ থেকে আজও কোনো ফোন আসেনি। অতএব সব রাস্তাই বন্ধ।

কিন্তু ব্ল্যাকপ্রিন্স রহস্য যে ধীরে ধীরে শেষের দিকে এগিয়ে গেছে তা আমি বুঝতে পারিনি। তা বুঝতে গেলে যে ধরনের বুদ্ধি এবং মানসিকতার প্রয়োজন তা আমার নেই। হঠাৎ একদিন নীল এসে বলল,—একটা অতি সহজ ব্যাপার যে কেন এতদিন আমার মগজে আসেনি তাই বুঝতে পারি না। অথচ এটা যদি আগে মাথায় আসতো তাহলে এতগুলো খুন কিছুতেই হত না।

—তার মানে তুই বলতে চাইছিস আর খুন হবে না।

—মনে হয়, না।

—অর্থাৎ ফগ্ কেটে গেছে। হত্যাকারী তোর কাছে ক্লিয়ার অবজেক্ট।

—আমি জানি, খুনির সব বৃত্তান্ত জেনে গেছি। কৃতিত্বটা রণিতারই। ও না থাকলে বোধহয় মোটিভটা এখনও আমার কাছে ক্লিয়ার হোত না।

—কী মোটিভ?

—বলব। সব পরে জানতে পারবি। কিন্তু আমি ভাবছি এ ধরনের মোটিভের পিছনে আরো একটা বড় কারণ আছে। খুনি যদি নিজে থেকে সে কারণ না জানায় তাহলে আমাদের কোনো মনস্তাত্ত্বিকের কাছে যেতে হবে।

—খুনির নাম তো নিশ্চয়ই এখুনি জানবি না। তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, যদি জানতেই পেরেছিস তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করছিস না কেন?

—আমি জানি খুনগুলো কে করছে। আমি জানি খুনগুলো কিভাবে হয়েছে। এও জানি এই মুহূর্তে খুনি কোথায় আছে। শুধু জানি না, সে কেন একের পর এক নিরীহ মেয়েদের মেরেছে। ক্যানসার রোগটা সেরে যেতো, যদি জানা যেতো রোগটা হচ্ছে কেন? আর এই কেন'র উত্তর পেলে খুনির বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করার মতো অনেক প্রমাণই পাওয়া যাবে। কিন্তু সেটা যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

—এভাবে কতদিন অপেক্ষা করবি?

—খুব বেশিদিন নয়। নীল ব্যানার্জির হাত থেকে সে এবার আর বাঁচতে পারবে না। আসলে আমি এখন একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছি, ওনলি ফর ওয়ান অপারচুনিটি।

—খুনি সুযোগ দেবে তারপর তুই তাকে ধরবি?

—দেবে, দেবে। দিতে সে বাধ্য। তবে কতদিনে দেবে সেটা তারই ওপর নির্ভর করছে। খুনি যে ধরনের ডেসপারেট, উত্তেজনার খেলা খেলতে সে যেরকম ভালবাসে তারপক্ষে বেশিদিন চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়। তবে একটা জিনিস মাথায় ঢুকছে না, রিস্ক আছে জেনেও সে কেন প্রতিবারেই আগে ভাগে সম্ভাব্য খুন সম্বন্ধে আমায় সজাগ করতে চেয়েছে?

—অতি আত্মবিশ্বাস?

—আত্মবিশ্বাস ভালো। কিন্তু প্রতিপক্ষকে অবজ্ঞা করাটাই যে পতনের মূল একথাটা এরকম একজন বুদ্ধিমান খুনির কাছে আশা করা যায় না। অপরাধী এক্ষেত্রে উন্মাদও হতে পারে।

—এ একধরনের উন্মত্ততা তো বটেই।

সময় বসে থাকে না। নিয়তি অবধারিত নিয়মে নিজের লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলে। নীলের প্রত্যাশিত মুহূর্তটি যে এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসবে তা আমি বুঝিনি। ইতিমধ্যে একদিন সফিসাহেবের দোকান থেকে ফোন এসেছিল। একজন-ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের যুবক, এর আগে সে অবশ্য কোনদিনও আসেনি, ব্ল্যাকপ্রিন্সের খোঁজে এসেছিল। সফি সাহেবের কাছে কোনো ব্ল্যাকপ্রিন্স স্টকে না থাকায় যুবকটি ফিরে যায়। অবশ্য সে বলে গেছে ব্ল্যাকপ্রিন্সের তার খুবই দরকার। পরে আসবে।

সেদিনই আমরা সফি সাহেবের দোকানে যাই। সফি সাহেবের মুখে তার চেহারার যে আদল পাই তা আগেও পেয়েছি। সারা কলকাতায় ঠিক ঐ ধরনের ছেলে কিছু না হলেও বিশহাজার তো আছেই। রঙবেরংয়ের ঢাউস সার্ট। জিন্স্ প্যান্ট। মাথায় ঝাঁপান চুল, ঘাড় পর্যন্ত নামানো। চোখে

কালো চশমা। গোঁফ আছে। সফি সাহেব ঠিকানা জানতে চাওয়ায় ছেলেটি বেশ ঝাঁঝালো স্বরে বলেছিঃ

---ঠিকানাব কোনো প্রয়োজন নেই, সে নিজেই যোগাযোগ করে নেবে।

—ছেলেটির স্বাস্থ্য কী বকম, নীলই জিজ্ঞাসা কবে।

একটু ব্যঙ্গের সুরে প্রবীণ সফি সাহেব বলেন, —বোঝাই যায় না স্যার। আজকালকার ছেলেমেয়েরা যা ঢোলা ঢালা জামা প্যান্ট পবতে শুরু কবেছে, আসল স্বাস্থ্যটাই বোঝা মুশকিল। বোঝা যায় না সে ছেলে না মেয়ে?

— ঠিক আছে, আপনি কেবল কষ্ট কবে একটা কাজ করবেন, ঐ ছেলেটি ঠিক যেদিন এসে আপনার কাছ থেকে ব্ল্যাকপ্রিন্স কিনবে, যেমন করেই হোক আমাকে তক্ষুণি খবব দেবেন।

এই ঘটনাব ঠিক পাঁচদিনের দিন সকালে, সেই মাবাত্মক ফোনটা এল। এবাবে ফোনটা তুলেছিলাম আমি। কাবণ নীল কী বিশেষ কাজে দুদিন কলকাতায় নেই। ফোনে গলার আওযাজটা পেয়েই চমকে উঠেছিলাম, সেই চাপা ঘ্যাঁসঘেঁসে আওযাজ, বলল,—নীল ব্যানার্জিব সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।

আবাব আমাব বকলমে কথা, ---বলুন, ব্যানার্জি বলছি।

---বড বিপদে পড়ে আপনাব শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। প্র্যাকটিক্যালি আই নিড ইওর হেল্প।

---বেশ তো, কী হয়েছে আগে তাই বলুন।

—আজ, এইমাত্র আবিষ্কাব কবলাম, আমাব একমাত্র মেয়ে তাব নিজের বিছানায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

—আপনি কে বলছেন?

—আমি জাস্টিস ইন্দ্রনীল বাসু।

চমকে উঠলাম। ফস করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—আপনাব মেয়ে মানে রণিতা বাসু?

---আপনি আমাব মেয়েকে চেনেন?

---অ্যাঁ, না মানে, আপনাব মেয়ের সঙ্গে আমাব পবিচয আছে। কিন্তু আপনি সিওব যে আপনার মেয়ে নিহত হয়েছেন?

---আপনি এলেই বুঝতে পাববেন।

---পুলিস এতক্ষণে নিশ্চযই খবব পেয়েছে?

---আজ্ঞে হ্যাঁ, পুলিসকে রিং কবাব পবই আপনাকে খবব দিচ্ছি। আপনি আসছেন তো?

—হ্যাঁ, এখুনিই যাচ্ছি।

ফোনটা নামিযে রেখে আযেস করে সোফায গিযে বসলাম। আবাব ব্ল্যাকপ্রিন্সেব পরোয়ানা। অর্থাৎ মৃত্যুব খাঁড়াটা এবার নামতে চাইছে রণিতা বাসুব ঘাড়ে। আজ হোক কাল হোক কী দশদিন পরেই হোক রণিতা বাসুব মৃত্যু হবে। এবং সেই একই খুনি। চাপা আর ঘ্যাঁসঘেঁসে গলাব মালিক যিনি, আবার নীলেব সামনে চ্যালেঞ্জ। কিন্তু কিছুদিন আগেই রণিতা বাসু নীলকে ফোন করেছিল। নীল বলেছিল, কোনো বকম ভয় না পেযে এগিযে যেতে। অর্থাৎ রণিতা বাসুকে দিয়েই নীল ওব টোপ ফেলেছে। নীলেব বক্তব্য অনুসাবে বণিতা বাসু ধনী কন্যা এবং সুন্দরী। ধনী এবং সুন্দরী কন্যাদেব ওপর খুনির নিক্ষিপ্ত তীর এগিয়ে যায়। কিন্তু যে লোকটা এতই চালাক, পুলিসের চোখে বার বাব ধুলো ছড়িয়ে একেব পব এক উন্মাদের মতো মেয়েদের খুন করছে সে কী এত সহজে নীলের ছড়ানো টোপ গিয়ে ফেলবে? বোকা ইঁদুবেব মতো এগিযে এসে কলে পড়বে? ঠিক বিশ্বাস হয় না। দু'তিন দশক আগের থেকে এখানকাব খুনিবা অনেক বেশি সজাগ। অনেক বেশি ডেস্পারেট। অনেক বেশি চতুব।

ব্ল্যাকপ্রিন্স বহস্যে আমাব কোনো ভূমিকা নেই। কেবল দূব থেকে দেখে যাওয়া ছাড়া। কিছুক্ষণ আগেই দীনু চা দিযে গিয়েছিল। চা খেতে খেতে ভাবছিলাম এখন আমার কাজটা কী হবে? নীল নেই। কবে ফিরবে কিছু বলে যায়নি। বণিতা বাসু মেয়েটা যে কে তাও সঠিক আমার জানা নেই। জানা থাকলে হয়তো তাকে এক উন্মাদ খুনিব সতর্কবার্তাব কথা জানিযে দিতে পারতাম। হঠাৎ কী খেয়াল

হল। চকিত মনে পড়ল টেলিফোন ডাইরেক্টরি হাতড়ে ব্যারিস্টার ইন্দ্রনীল বাসুর ফোন নাম্বার বার করা যেতে পারে। ব্যাপারটার সত্যাসত্যটা জানা যেতে পারতো। ডাইরেক্টরিতে কিন্তু চারজন ইন্দ্রনীল বসুর নাম পাওয়া গেল। চার জায়গাতেই ফোন করলাম। অন্ধকারে বন্দুক ছোঁড়ার মতো। দুজনকে পাওয়া গেল না। একটা লাইন ডেড। আর একটায় বলল দু'বছর আগে ইন্দ্রনীল নামক ভদ্রলোকটি মারা গেছেন। অতএব রণিতাকে পাবার কোনো উপায়ই নেই। উত্তেজনায় একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। যে ফোন করেছিল তার কাছ থেকে ইন্দ্রনীলবাবুর বাড়ির ঠিকানাটা জেনে নেওয়া উচিত ছিল। মজার ব্যাপার এটাই, লোকটি যে প্রতারণা করছে সেটা নিজেই বুঝিয়ে দিল। ঠিকানার কথা আমিও জিজ্ঞাসা করিনি, সেও বলেনি। অথচ তারই জানানো উচিত ছিল। যাইহোক নীল না ফেরা পর্যন্ত আমার কিছুই করার ছিল না। তবে বেশিক্ষণ নির্বাক দর্শকের ভূমিকা পালন করতে হল না। সেদিনই রাত প্রায় ন'টার সময় নীল এসে হাজির। উস্কোখুস্কো চুল। ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলাম ব্যাপারটা কী? কিন্তু আমাকে কোনো রকম সময় না দিয়েই ও বলল, --সময় পাবি মাত্র একঘণ্টা। এখন রাত সাড়ে সাট। ঠিক একঘণ্টার মধ্যেই হাওড়াতে পৌঁছতে হবে।

--সে কী, যাবি কোথায়? এইতো দুদিন বাদে ফিরলি?

-- এখন আর কোনো কথার উত্তর দেবার সময় নেই। ব্ল্যাকপ্রিন্স রহস্যের শেষ দেখতে চাস তো?

—অফকোর্স!

—তাহলে ঝপ্ করে জামা-কাপড় গুছিয়ে নে। সপ্তাখানেক থাকতে হতে পারে। একটাই লাগেজ হবে। তোর আর আমার। বলেই ও আমাকে বিস্ময়ের মধ্যে রেখে বাথরুমে ঢুকে গেল।

অতএব আর সময় নষ্ট নয়।

কথা হচ্ছিল পুরী এক্সপ্রেসের ফার্স্ট ক্লাশ এসি কামরায় বসে। সাধারণত ফার্স্ট ক্লাশে ভিড়টা কম থাকে। কামরায় আমি নীল আর সাকসেনা। সি আই ডি ব্রাঞ্চের স্পেশাল অফিসার। সাকসেনা লোকটা বেশ আমুদে। চেহারাটা বেশ গোলগাল। মাথা জোড়া মস্ত টাক। বয়েস আন্দাজ পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। কথা শুরু করেছিলেন সাকসেনা,—হ্যাঁ মশাই, মাঝপথে নেমেটেমে যাবে না তো?

বাবু হয়ে বসে সিগারেট ধরাতে ধরাতে নীল বলল,—নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন মিস্টার সাকসেনা। ওর হোটেল বুকিং হয়ে গেছে।

—হোটেলে এখন আমরা আবার জায়গা পেলে হয়!

—না পেলেও দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কমিশনার সাহেবের চিঠি তো সঙ্গেই আছে। আরে ইম্পিরিয়াল লজের ম্যানেজার আমার বিশেষ পরিচিত। এমন একটা ডেঞ্জারাস খুনির অ্যারেস্টের ব্যাপারে ভদ্রলোক নিজে থেকেই অনেক সাহায্য করবেন। ওর আবার ডিটেকটিভ হওয়ার সুপ্তবাসনা রয়েছে।

--আপনার মুখে সব শুনে তো আমি তাজ্জব হয়ে গেছি। জীবনে অনেক চোর ডাকাত খুনি নারী ধর্ষকের মোকাবিলা করেছি। কিন্তু এরকম কেস, মাইরি বলছি এই প্রথম। ভাবাই যায় না। তবে মশাই, আপনার এই মেয়েটি, কী যেন নাম, হ্যাঁ রণিতা বাসু, এসব মেয়ে যদি আমাদের পুলিসে লাইনে থাকতো, দেশের অনেক উপকার হতো। ভাবাই যায় না। তা মশাই ওকে আমাদের পুলিস লাইনে ঢুকিয়ে দিন না।

—কেন মশাই! ওর ঠ্যাকাটা কিসে?

—মানে দেশের জন্যে তার কি? ভাবাই যায় না। অন্য কোনো মেয়ে হলে এরকম রিস্ক্ নিতোই না। লাইফ ইন ডেঞ্জার। ভাবাই যায় না।

—ভ্যালেন্টিনার আগে কোন মেয়ে চাঁদে যাবার কথা ভেবেছিলো? মেয়েরা এমন অনেক কিছুই পারে যা—

মুখের কথা কেড়ে সাকসেনা বললেন,—ভাবাই যায় না।

অস্বস্তিতে আমি উসখুস করছিলাম। কি যে তখন থেকে লোকটা 'ভাবাই যায় না', 'ভাবাই যায় না' করছে বুঝতে পারছি না। কোথায় যাচ্ছি কেন যাচ্ছি কিছুই জানি না। তবে একটু বুঝতে পারছি এই একই গাড়িতে রণিতা বাসুও চলেছেন। তিনি যে কোথায় আছেন, কোন্ কামরায় আছেন তা

জানি না। অথচ এই রণিতা বাসুর কলকাতাতেই নিজের ঘরে, কোন এক রাতে খুন হবার কথা। তবে কি খুন হবার ভয়ে নীল ওকে কলকাতার বাইরে কোথাও রেখে আসতে চলেছে? না? তাই বা কেমন করে হবে? তাহলে রিস্ক্ নেবার প্রশ্ন ওঠে কেমন করে? বাধ্য হয়েই নীলকে জিজ্ঞাসা করলাম, —আমরা যাচ্ছি কোথায়?

সাকসেনা বললেন,—ভাবাই যায় না, আপনি এখনও জানেন না আমরা কোথায় যাচ্ছি?

—আজ্ঞে না।

—পুরী। পুরী। চারিদিকে নীল সমুদ্র আর সোনালি বিচ্।

—তা নয় বুঝলাম। কিন্তু,

—অজু, নীল বলল, তোর এখন অনেক কিছুই অবাক ঠেকবে। অনেক কিছুই বিস্ময়কর মনে হবে। আর এ পর্বের একেবারে শেষে গিয়ে যখন দাঁড়াবি তখন মনে হবে জগতে তোর অনেক কিছু এখনও অজানা।

—বেশ তা নয় হল, কিন্তু তোকে আমার কিছু বলার ছিল। সময়ই পাইনি বলার।

—বলে ফেল। এখন তো অনেক সময়।

—রণিতা বাসু মার্ডারের সংবাদ নিয়ে একটা ফোন এসেছিল।

—তাহলেই বুঝতে পারছিস, রণিতার লাইফ, নাউ ইজ ইন ডেঞ্জার। ওকে বাঁচাতে হবে না?

—তাই কলকাতা থেকে পালাচ্ছিস?

—আমার হাতে এখন দুটো কাজ। রণিতা বা রণিতার মতো আরো কিছু মেয়েকে এক উন্মাদের হাত থেকে বাঁচানো আর দুনম্বর সেই উন্মাদটিকে হাতে হাতে ধরা।

—কিন্তু রণিতার তো খুন হবাব কথা কলকাতায়। তাব নিজেব ঘবে।

—আসল উদ্দেশ্য খুন। সেটা তার নিজের ঘরেও হতে পাবে অথবা কোন এক হোটেলেব নির্জন কামরায়। কলকাতায় হয়তো খুনটা হতে পারতো। কিন্তু খুনি বোধহয় আব কোন ঝুঁকি নিতে চাইছে না।

—তা এত জায়গা থাকতে পুরী কেন?

—পুরী না হলে রাঁচী হতে পারতো, রাঁচী না হলে দেওঘর হতে পারতো। না হলে দেরাদুনে হলেও অসুবিধা ছিল না। ঐ যে বললাম আসল উদ্দেশ্য খুন।

—কিন্তু কেন? হোয়াই?

—হোয়াই-এর ডেফিনিট ব্যাখ্যা আমি এখনও সঠিক জানি না। তবে খুনি নিঃসন্দেহে পারভার্টেড। টাকা পয়সা নয়, চিপ স্টান্ট দেবার জন্যেও নয়, কোন বিশেষ শত্রুতাও নয়, আসলে আমার মনে হয় নারীজাতির ওপর, বিশেষ করে সুন্দরী ধনী কন্যার ওপর খুনির একটা জন্মগত আক্রোশ আছে।

—তার জন্যে বিনাদোষে নিরীহ মেয়েদের হত্যা করবে? নৃশংসভাবে?

নীল উত্তর দেবার আগেই সাকসেনা বললেন,—ভাবাই যায় না মশাই, ছ'ছটা মেয়ে পুটুস। আর একটা হতে চলেছে। তবে ব্যানার্জি যখন আছেন।

ওঁকে থামিয়ে নীল বলল, —মিস্টার সাকসেনা, একটা জিনিস মনে রাখবেন, আমাদের খুব হুঁশিয়ার হয়ে এগুতে হবে। খুনি অত্যন্ত চালাক। ওর চোখ-কান চারিদিকে খোলা। যদি কোন রকমে টের পায় যে আমরা ওর পিছু নিয়েছি তাহলে কিন্তু আমাদের সব উদ্দেশ্যই বরবাদ হয়ে যাবে। বেমালুম ভালোমানুষ সেজে আমাদেরই হয়তো ডিনার পার্টিতে ইনভাইট করবে।

—খেপেছেন মশাই! আমার নাম চিরঞ্জীব সাকসেনা। জীবনে বহু চোর ডাকাত, উঃ ভাবাই যায় না।

—এক্ষেত্রে কিন্তু অনেক কিছু ভাবার আছে। খুনি কিন্তু আপনাকেও চেনে। আমাকেও চেনে।

—আমি বুঝে নিয়েছি। ভাবাই যায় না, এমন ছদ্মবেশ নোব যে আমার মা-বাবাই আমায় চিনতে পারবেন না।

—অজু, তোকেও কিন্তু ছদ্মবেশ নিতে হচ্ছে।

—আমাকেও?

—নিশ্চয়ই বৎস। আর মেক-আপটা ট্রেনে বসেই সেরে ফেলতে হবে। কাল সকালে আমরা যখন নামছি তখন আমরা কেউ কাউকে চিনি না। যদিও আমরা একই হোটেলে উঠব, তবুও তিনজন তিনটে সঙ্গল রুমে থাকছি। তুই হবি এক বৃদ্ধ প্রফেসর। মিস্টার সাকসেনা আপনি

—ভাবাই যায় না, আমি হব শেঠ রতনলাল। পুরী বেড়াতে এসেছে। আসলে মশাই আমার এই টেকটা নিয়েই যত ঝামেলা। চট্‌ করে ধরা পড়ে যাব। মাথায় টুপি-টুপি থাকলে, ভাবাই যায় না, আর আপনি?

—সে দেখা যাবেখন। নিন এখন শুয়ে পড়ুন। সঙ্গে রিভলবার আছে তো?

—সে আর বলতে। কিন্তু মেক্‌আপ?

—আমি তৈরি হয়ে এসেছি। চিন্তার কিছু নেই।

পরদিন যখন পুরী পৌঁছলাম তখন প্রায় সাড়ে দশটা। ট্রেন প্রায় ঘণ্টা দুয়েক লেট ছিল। একই কামরা থেকে তিনজন নামলেও তিনজনের কাউকেই অতি বড় চেনা লোকও চিনতে পারতো না। লম্বা চওড়া নীল তখন এক ভবঘুরে হিপি। লম্বা লম্বা চুল। ঝুলানো গোঁফ। শর্টস, ঝোলা ঢাউস চকরা বকরা পাঞ্জাবি, মাথায় বেতের টুপি, চোখে সানগ্লাস আর কাঁধে ঝোলানো সিঙ্গল বেডিং। কে বলবে এ সেই সৌখিন নীল ব্যানার্জি। আর কে বলবে মিস্টার সাকসেনা এক ধনী মাড়োয়ারি ব্যবসাদার নন।

'ভাবাই যায় না' 'ভাবাই যায় না' করতে করতে উনি আগেই চলে গেলেন। নীল একবার ফিসফিস করে আমায় বলেছিল,— সোজা ইম্পিরিয়াল লজে চলে আয়।

এরপর তিনজন আলাদা। রাস্তায় কিন্তু কোথাও বর্ণিতা বাসুকে দেখতে পেলাম না। জানি না এও সেই বুনো হাঁসের পেছনে ছোটা কি না। তবে নীল যখন এত নিশ্চিত তখন আমার আর ভাবনা কিছুই ছিল না। গা ভাসিয়ে এসে উঠলাম ইম্পিরিয়াল লজে। স্বর্গদ্বার পেরিয়ে বাঁদিকে কিছুটা এগিয়েই বিশাল প্যালেসিয়াল বিল্ডিং। ইম্পিরিয়াল লজ। কাউন্টারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কোনো সিঙ্গল রুম আছে কি না।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে মিটি মিটি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, – প্রফেসর দাস?

সামান্য অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, —কিন্তু,

—নো কিন্তু স্যার। আমি সব জানি। আমার স্যার ডিটেকটিভ হবার খুব শখ। আপনার রুম নাম্বার ফিফটিন। এই আপনার চাবি। তারপর একটা লোককে ডেকে বললেন—গোবিন্দ, বাবুর সামান পনের নম্বরে পৌঁছে দিও।

বুঝলাম ব্যবস্থা সব আগে থেকেই করা আছে। আর নীল ঠিকই বলেছিল। ম্যানেজার বেশ তারিয়ে তারিয়ে আমায় দেখছেন আর গোঁফের ফাঁকে মুচকি দিয়ে হাসছেন। সর্বনাশ! এ যেরকম করে দেখছে তাতে করে এ যে কী করে ডিটেকটিভ হবার স্বপ্ন দেখে কে জানে! যে কোনো লোকই ওর মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারবে আমার মধ্যে কিছু গণ্ডগোলের ব্যাপার আছে। তাড়াতাড়ি করে নিজের কামরায় চলে এলাম।

কিন্তু মুশকিল হল, আমার আর দুজন সঙ্গীর কী হল তা জানি না। তারা যে কোথায় তাও বুঝতে পারছি না। অথচ নিজে থেকে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাও করা যায় না। সারারাতে তেমন ভাল ঘুম হয়নি। কস্মিনকালেও ট্রেনে আমার ভাল ঘুম হয় না। এইসব ধরাচূড়ো ছেড়ে আপাতত স্নান-টান সেরে একটা সলিড ঘুম দিতে হবে, তারপর যা হয় হবে। সমুদ্রে স্নান করতে বেশ ভালই লাগে। কিন্তু এ যাত্রায় সেটি সম্ভব হবে না। কারণ মাথায় উইগ।

কলিংবেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে চায়ের অর্ডার দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সামনেই বিশাল সমুদ্র। অনন্তকাল ধরে একইভাবে গর্জন করে চলেছে। একইভাবে ঢেউগুলো তীরে এসে আছড়ে পড়ছে। সমুদ্রে রঙের খেলা আছে ঠিকই, কিন্তু পাহাড় আমাকে টানে অনেক বেশি। খুনি যদি পুরী না এসে দেরাদুন বা মুসৌরি যেত তাহলে আমার ভাল লাগতো অনেক বেশি।

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। সেখানেও সেই অনন্তকালের একই দৃশ্যপট। হাজার হাজার মানুষ।

কেউ স্নান করছে, কেউ বালির ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। কেউ বা অতি উত্তেজনায় ছোটাছুটি করছে।

দরজায় বেলের আওয়াজ পেলাম। চা হাতে বেয়ারা হাজির। চা নিতে নিতে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম — তোমাদের রান্নাবান্না হয়ে গেছে? মানে দুপুরের খাবার এখন পাওয়া যেতে পারে?

বেয়ারা মানে গোবিন্দ স্থানীয় বাসিন্দা। বলল, 'কড় কৌছন্তি বাবু, আপন কড় খাইবে কয়ন্তু। পন্দর মিনিটের ভেতর পৌঁছি যিব।

নীল বা সাকসেনার খবর জানি না। জানলেও উপায় নেই। নিশ্চয়ই ওদের ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করা যাবে না ওরা কী খাবে, বা একসঙ্গে খাবে কিনা? খাবারের অর্ডার দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। একমুখ কাঁচা পাকা দাড়ি আর মাথায় উইগটা খুলে সোজা গা এলিয়ে দিলাম সোফায়।

ঘুম যখন ভাঙল তখন আর সন্ধে হতে বেশি দেরি নেই। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ছটা বাজে। ত্বরিতে নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। নাহ্ চেনা মুখের টিকিটিরও দেখা নেই। কোথায় নীল, কোথায় বা সাকসেনা? রণিতা বাসু? সেই বা কোথায়? অবশ্য রণিতাকে আমি এখনও চোখে দেখিনি। সামনে দেখলেও চিনতে পারব না। কী আর করা! ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বিচে এসে দাঁড়ালাম। কয়েক হাজার নরনারী অলস-ভ্রমণে ব্যস্ত। কেউ কেউ বা সদ্য বিবাহিতের দল জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে বালির ওপর। কারোরই নজর নেই কারোর দিকে। নিজেরাই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত।

আমি এখন এক প্রায়বৃদ্ধ প্রফেসর। কোনো মতেই চলনে প্রকাশ পাওয়া চলবে না নিজের যৌবনজনোচিত উচ্ছ্বাস। আমার দৃষ্টি তখন একজনকেই খুঁজে পেতে চাইছিল। এক তরুণ হিপিকে। সে এখন কোথায় আর কী কাজে ব্যস্ত তা আমি জানি না। আমাকে সে কোনো নির্দেশও দেয়নি আমায় কী করতে হবে। বিশ্রী একটা ধরাচূড়ো পরে ভূতের ব্যাগার খাটা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষাকৃত একটি নির্জন স্থান দেখে বসে পড়লাম। অবশ্য মনে মনে যে সামান্য উত্তেজনা ছিল না তা নয়। আসলে ছদ্মবেশ সর্বদাই কিছু উত্তেজনা আনে। নিজেকে একটু অন্যরকম মনে হয়। মনে হয় আমি সবাইকে লক্ষ্য করছি, কিন্তু কেউই আমার সঠিক পরিচয় পাচ্ছে না।

আকাশপাতাল অনেক কিছুই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম এই এত লোকের মধ্যে থেকে নীল যে কীভাবে আসল লোকটিকে মালসমেত ধরবে তা ওই জানে। হয়তো দেখা যাবে খুনি আগে ভাগেই আমাদের গতিবিধি টের পেয়ে গেছে। নিজে সে যথেষ্টই সজাগ আছে। একসময় নিজের কাজ শেষ করে নীল ব্যানার্জিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এই শহর ছেড়ে চলে যাবে।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন যে রাত গভীর হয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারিনি। সহসা মনে হল বেশ কিছুটা দূর থেকে এক দম্পতি প্রায় ঘনবদ্ধ হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। অন্ধকার হলেও তাদের ঘনিষ্ঠতা বোঝা যায়। অবশ্য এ দৃশ্য এমন কিছু নতুন নয়। দেখতে দেখতে ওরা প্রায় আমার কাছাকাছি চলে এল। অন্ধকারে যে আমি বসে আছি সেদিকে ওদের তেমন লক্ষ্য ছিল না। খুব সম্ভবত ওরা নবদম্পতি। এসময়ে উচ্ছ্বাস বেশি হয়। আশপাশের মানুষ সম্বন্ধে আগ্রহও থাকে কম। পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ একটি নাম শুনে চমকে উঠলাম। একজনকে বলতে শুনলাম, —অহ্ রণি, ইউ আর সো সুইট। সো লাভলি অ্যান্ড বিউটিফুল। আমি তো তোমার প্রেমেই পড়ে গেছি। তোমাকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না ডার্লিং।

উত্তরে রণি নামের মেয়েটি হাসিতে উচ্ছ্বসিত হল। যদিও সমুদ্রগর্জনে সে হাসি হারিয়ে গেল, কিন্তু বেশ বুঝলাম হাসতে হাসতেই মেয়েটি সঙ্গের পুরুষটিকে একটি চিমটি কাটল, তারপর বলল,—ইউ নটি, এক কাজ করো না, আমাকে তুমি বিয়েই করে ফেলো। তাতে তো কারো কোন আপত্তি থাকতে পারে না। মনটা ঠিক থাকলেই—

আরো কী সব বলল মেয়েটি, বোঝা গেল না। ওরা তেমনি ঘনিষ্ঠ অবস্থায় সামনের দিকে এগিয়ে চলল। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল, রণি? তবে কী এই সেই রণিতা বাসু। কলকাতায় যার খুন হবার কথা। এবং যাকে পাকেচক্রে পুরীতে এসে উঠতে হয়েছে। আর সঙ্গের ঐ লোকটি নিশ্চয়ই তার হত্যাকারী। প্রেমিকের ছদ্মবেশে?

কিন্তু। ঐ কণ্ঠস্বর! কোথায় যেন আমি শুনেছি। বেশ চেনা চেনা। কিন্তু কোথায়? কথা বলার ভঙ্গিমা, অ্যাকসেন্ট, থ্রোয়িং অব ভয়েস.. কোথায় শুনেছি? স্মৃতির দরজায় ঘন ঘন হানা দিলাম। কিন্তু কিছুতেই মনে আসছে না। তবে এ নিশ্চিত আমি ঐ কণ্ঠস্বর শুনেছি কোথাও।

বিনা বাক্যব্যয়ে আমি অতি নিঃশব্দে একটি দূবত্ব বজায় রেখে ঐ যুগলকে অনুসরণ শুরু করলাম। বৃদ্ধের বেশে থাকার একটা সুবিধে হয়েছে। ইচ্ছেমতো আস্তে হাঁটা যায়। কারো কোনো সন্দেহের থাকে না। অবশ্য সামনের ঐ পুরুষ আর মহিলাটি নিজেদের জগৎ নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিল যে ওদের অনুসরণকারী আমার দিকে তাদেব কোনো নজরই ছিল না।

আমাব ধারণাই ঠিক। ওরা হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল ইম্পিরিয়াল লজের দিকেই। অর্থাৎ নলিনের ঐ মেয়েটিই বণিতা বাসু। নীলের মুখে শুনেছি বণিতা অসামান্যা সুন্দরী। মেয়েটিকে দেখার লোভ হচ্ছিল। তার থেকেও বেশি উৎসুক হয়ে পড়েছিলাম সঙ্গের লোকটিকে দেখতে। কারণ মেয়েটি যদি বণিতা বাসু হয় তাহলে নিঃসন্দেহে লোকটি সেই প্রচণ্ডতম নৃশংস এক খুনি। এর আগে ঐ লোকটাই পর পর ছ'টি নিরীহ মেয়েকে খুন করেছে। অবশ্য বণিতাব ব্যাপারটা আলাদা। আগের মেয়েরা জানতো না প্রেমিকের ছদ্মবেশী ঐ লোকটাই তাদের মৃত্যুদূত! কিন্তু বণিতা সব জানে। এতক্ষণে নীলের চালটা বুঝলাম। বণিতা প্রেমের অভিনয় করছে। আর যে মুহূর্তে প্রেমিক পুরুষটি তার প্রেমিকার কণ্ঠে পরাবে নাইলন কর্ডের শক্ত আলিঙ্গন, সেই মুহূর্তেই—

সামান্য ভয় পেলাম। এক মুহূর্তের এদিক ওদিকে কিন্তু বণিতার জীবন বিপন্ন হতে পারে। ঠিক সময়ে ঠিক মুহূর্তে যদি নীল বা সাকসেনা ঘটনাস্থলে না পৌঁছাতে পারে তাহলে বণিতার মৃত্যু অবধারিত। তবে নীলের ওপর আমার ভরসা আছে। ওকে তো আজ দেখছি না। বহুদিন ধরেই ওর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে আমি পরিচিত।

লজ এসে গিয়েছিল। ইচ্ছে থাকলেও জোরে হাঁটার উপায় ছিল না। লাউঞ্জ পেরিয়ে ওরা দুজন দোতলায় চলে গেল। যদিও হোটেলে আলো ছিল তবু ভাল করে ওদের মুখই দেখতে পেলাম না। একটু তাড়াতাড়ি পা চালালে ওদের রুম নাম্বারটা নিশ্চয়ই দেখে নিতে পারি।

হিপি সাহেব যে এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে। হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল আমারই পাশে। আশেপাশে খুব একটা ভিড় ছিল না। আমার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ও বলল, তুই ঠিকই ধরেছিস। ওরাই তারা। রুম নাম্বার ফোরটিন। তোর ঘরের ঠিক অপজিটে। ভিউ হোলে চোখ রেখে চোদ্দ নম্বর ঘরের দিকে সর্বদাই নজর রাখবি। আমি আরো কয়েকটা কাজ সেরে আসি। তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য খবর থাকলে নিচে কফি রুমে সাকসেনা আছে। ওকে জানিয়ে দিস।

নীল আবার উধাও হয়ে গেল। নিজের ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে দিলাম। চোদ্দ নম্বর ঘরটা ঠিক আমার ঘরের প্যারালাল হওয়ায় আমার সুবিধেই হল। ভিউহোলে চোখ রাখতেই দেখলাম বন্ধ দরজার মাথায় জ্বলজ্বলে চোদ্দ কথাটা লেখা রয়েছে।

প্রতি মুহূর্তে দারুণ উৎকণ্ঠায় সময় কাটছিল। ভাবছিলাম এই বুঝি কিছু একটা ঘটবে। এই বুঝি শুনতে পাব মহিলা কণ্ঠের আর্তনাদ। অথবা শুনতে পাব বন্ধ দরজার আঘাত।

কিন্তু হা হতোস্মি! কিছুই ঘটল না। এভাবে আর কতক্ষণই বা দাঁড়িয়ে থাকা যায় ভিউহোলে চোখ রেখে। সারাদিন অত ঘুমনো সত্ত্বেও ঘুম পাচ্ছিল আবার। বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে দিয়ে খাবার আনিয়ে নিলাম। তারপর খাওয়া দাওয়া শেষে একটা সিগারেট ধরাতেই ঘুমে চোখ জুড়িয়ে এল।

কতক্ষণ যে ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ বন্ধ দরজায় দড়াম-দড়াম আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠতে যাব সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম গুলির আওয়াজ। একটা নয় পর পর দুটো। তারপরই ভারী বুটের আওয়াজ। অনেক মানুষের হইচই।

ভুলেই গেলাম মেকআপ নেওয়ার কথা। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি চোদ্দ নম্বর ঘরের সামনে একটা ছোটখাটো জটলা। উড়িষ্যা পুলিসের বেশ কয়েকজন কনস্টেবলই ভিড় জমিয়ে রেখেছে। গুলির আওয়াজে বেশ কিছু বোর্ডারও আস্তে আস্তে চোদ্দ নম্বরের দিকে এগিয়ে আসছে। গেটের মুখে আরও একজনকে দেখা যাচ্ছে। তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে ভিড় সামলাচ্ছেন। গোয়েন্দাগিরির শখ থাকলেও ঠিক এই মুহূর্তে তাঁকে বেশ ব্যতিব্যস্ত মনে হচ্ছিল।

ভিড় ঠেলে দবজার মুখে এগিয়ে যেতেই একজন কনস্টেবল আমায় বাধা দিলেন। হোটেল ম্যানেজাবের দৌলতে সে বাধা সরে গেল। ছদ্মবেশ না থাকা সত্ত্বেও উনি আমায় চিনতে পেরেছিলেন। এগিয়ে এসে আমাব পবিচয় দিতে কনস্টেবল রাস্তা ছেড়ে দিলেন।

ঘবের মধ্যে ঢুকতেই একটা ভয়ংকব বকমের বীভৎস দৃশ্য দেখে আপনা থেকেই চোখ সরে গেল। মৃত্যু, খুন, রক্তপাত এসব দেখার দুর্ভাগ্য জীবনে অনেক বাবই এসেছে। কিন্তু প্রতিবারই একটা বিশ্রী প্রতিক্রিয়া আমাব হবেই। এবাবও হলো। ধবধবে সাদা বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে এক মৃতদেহ। হাত দুটো তাব ছড়ানো। এক হাতে তখনো ধবা আছে লাল রঙের নাইলন দড়ি। অন্য হাতে দলামলা একটা ব্ল্যাকপ্রিন্স। খুব সম্ভবত গুলি লেগেছে পিঠে। জায়গাটা রক্তাক্ত। সারা বিছানায় টাটকা রক্তের দাগ। ঘরেব মধ্যে উপস্থিত সবাই কেমন যেন নির্বাক। রণিতা নামধারী সেই সুন্দবী যুবতীর পবনে এখন হাল্কা পিঙ্ক কালাবের রাত্রিবাস। বসে আছে দূরেব একটা চেয়ারে। হাতের ওপব রাখা নিচু মাথা। মুখেব পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে চুলেব বাশ। সামান্য দূর হলেও বেশ বোঝা যাচ্ছে মহিলার সাবা দেহ তখনও কাঁপছে। মৃত ব্যক্তিব দুপাশে দুজন কনস্টেবল। একজন পুলিস অফিসাব মাথার টুপি খুলে মৃতেব পানে তাকিয়ে রয়েছেন। ওপাশে জানলার ধারে কালো সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে বয়েছে নীল। খাটেব এপাশে হাতে রিভলবাব সমেত মিস্টার সাকসেনা। ঘরের মধ্যে তখন মৃত্যুব হিমেল স্তব্ধতা।

এই পরিবেশে সহসা মুখেও কোন কথা এল না। ঘটনাব আকস্মিকতায় আমিও যেন প্রশ্ন করতে ভুলে গেলাম। অবশ্য এমন যে একটা সিচ্যুয়েশন আসবে বা আসতে পাবে তেমন একটা ধাবণা ছিল। তবে ভেবেছিলাম খুনি বামাল সমেত হাতে-নাতে ধবা পড়বে। অন্তত নীল কখনই খুনিকে শেষ শয্যায় দেখতে পছন্দ কবে না। অবশ্য আমাদেব ভাগ্যে এব আগেও কয়েকবাব এমন ঘটনা ঘটেছে। শেষ মুহূর্তে খুনি হয় আত্মহত্যা কবেছে নয়তো পুলিসেব গুলিতে মাবা গেছে। তবে এবারে ভেবেছিলাম গুলিটুলি চলাব আগেই মাবাত্মক লোকটি নিশ্চয়ই ধবা দিতে বাধ্য হবে। অন্তত যে ভাবে ফাঁদ পাতা হয়েছিল।

বড় তাড়াতাড়ি সব ঘটে গেল। মাত্র আজ সকালেই আমবা পুরী এসে পৌঁছেছি। পুরো চব্বিশ ঘণ্টাও শেষ হয়নি। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও দুজনে নিচে ঘুবেছে। ছল প্রেমের অভিনয় করেছে শিকাব আব শিকাবী দুজনেব মনেব মধ্যেই তখন পবস্পবকে ফাঁদে ফেলাব ধান্দা। একজন চেয়েছিল একজনকে খুন করতে। আব একজন চেয়েছিল এক মাবাত্মক খুনিকে আইনের হাতকড়া পরাতে। কিন্তু নিয়তিই শেষ কথা। অনিবার্য পবিণতিকে মেনে নিয়ে খুনি এখন রক্ত শয্যায় চিবদিনেব মতো ঘুমিয়ে পড়েছে।

নীববতা ভঙ্গ কবলেন সাকসেনা, —ভাবাই যায় না। উফ, এবকম একটা ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল সভ্য সমাজেব বুকে, ভাবাই যায় না।

—কিন্তু, জিজ্ঞাসা কবলাম, ওকে মাবল কে?

—মাবতেই হল। উপায় ছিল না। নইলে ওই মহিলাকে এতক্ষণে ভবজীবন সাঙ্গ করে ওপবে চলে যেতে হত।

—কিন্তু লোকটা কে? মুখটাই তো দেখা যাচ্ছে না।

—লোক? লোক কোথায় মশাই? উফ্, ভাবাই যায় না, ঐ তো অর্চনা সেন।

আমাব মুখ থেকে কেবল একটাই শব্দ বেরুল, —অ্যাঁ।

কলকাতার সংবাদপত্রে বেশ ফলাও করেই খববটা ছাপা হয়েছিল। বলতে গেলে সংবাদটি ছিল সেদিনেব শিবোনাম। ছ'ছটি নিবীহ নাবী ধর্ষণ এবং হত্যাকারী কোন পুরুষ নয়। সে একজন মহিলা। পুরী হোটেলে সপ্তম হত্যাব মুহূর্তে পুলিসেব হাতে শোচনীয়ভাবে নিহত উন্মাদ খুনিটির নাম অর্চনা সেন। গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জির প্রখব বুদ্ধির প্যাঁচে ত্রাসগ্রস্ত শহর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কাগজটায় একবাব চোখ বুলিয়ে নীল ওটাকে এক পাশে সবিয়ে রাখল। খবরটা এক সপ্তাহের পুবনো। কারণ সেই বীভৎস রাতের পর সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় ফিরতে পারিনি। কোন রহস্যের

দেখা পাতের পরও গোয়েন্দা বা পুলিসের আবশ্যকীয় কিছু কাজ থাকে। তবে সে জন্যেও নয়। চিল্কাটা আমাদের যাওয়া হয়নি এর আগে। কয়েকদিন চিল্কার শান্ত নির্জনতায় কাটিয়ে আজ সকালেই শহরে ফিরেছি। সাকসেনা আগেই ফিরে এসেছিলেন। ওঁর অফিসিয়াল কাজ আমাদের থেকেও বেশি। ইতিমধ্যে চিল্কায় বসে ব্ল্যাকপ্রিন্স রহস্যের খুঁটিনাটি সব কিছুই নীলের মুখ থেকে শুনে নিয়েছি। ও একে একে বুঝিয়ে দিয়েছিল মীনাক্ষী হত্যার সময়েই ওর একটা সন্দেহ হয়েছিল যে এই খুনের এবং ধর্ষণের মধ্যে কোন মহিলার প্রচ্ছন্ন হস্তক্ষেপ রয়েছে। মীনাক্ষীর বিছানায় একটা মেরুণ রঙের টিপের অস্তিত্বই সেই ধারণাটাকে বদ্ধমূল করে তুলেছিল। পরবর্তি খুন শ্রীমতী বিশ্বাস। সেখানেও পাওয়া গিয়েছিল একটা আংটি। যে আংটি পুরুষের আঙুল অপেক্ষা কোন মহিলার আঙুলেই বেশি মাপসই হবে। কিন্তু এগুলোর থেকেও বেশি সন্দেহের উদ্রেক করেছিল পোস্টমর্টেম রিপোর্ট। রিপোর্টে বারবারই দেখা গেছে মৃতা রমণী ধর্ষিতা হয়েও তাদের কুমারিত্ব হারায়নি। কেন? আর, এই কেন'র উত্তর খুঁজতে গিয়ে ওর বারবারই মনে হয়েছিল খুনি যদি কোন পুরুষ হয় তাহলে বুঝতে হবে সে হয় উন্মাদ, নয়তো কোনো বিকারগ্রস্ত যৌন অক্ষম পুরুষ। এবং তাও যদি না হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই কোনো মহিলা হবে। কারণ বার বারই খুনের পূর্বে নিহত মহিলার কাছাকাছি সর্বদাই এক নারীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু নারী হয়ে আর এক নারীকে কীভাবে ধর্ষণ করবে? চকিতেই ওর মনে হয়েছিল, এটা হতে পারে, যদি সে হয় লেসবিয়ান টাইপ! অর্থাৎ সমকামী মহিলা। ব্ল্যাকপ্রিন্সের সন্ধানে নিউমার্কেটে গিয়েও সে এক নারীর প্রচ্ছন্ন আনাগোনা লক্ষ্য করে। নূর আলি ছাড়া অন্য এক মহিলা বারে বারেই দু'টি করে ব্লাকপ্রিন্স কিনছে। সফিসাহেব তাকে চিনতে পারেননি। কারণ খুনি তখন ছদ্মবেশে ছিল। সফিসাহেবের একটা কথা আমার এখনও মনে আছে। উনি বলেছিলেন বোঝাই যায় না মশাই ছেলে না মেয়ে। অর্চনা সেনকে নীলের সন্দেহ হবার প্রধান কারণ ছিল তার চেহারাটি। অর্চনার মধ্যে নারীকোমলতার পরিবর্তে ছিল পুরুষকাঠিন্য। যেটা আমারও মনে হয়েছিল অর্চনা মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে মানাতো বেশি।

সে যাইহোক নীল নিজের অনুমানে শেষ পর্যন্ত সঠিক হয়েছে। ওর পাতা ফাঁদে খুনি ধরা দিয়েছে। বণিতা বাসু অর্চনার সামনে মোহজাল ছড়িয়েছে। অর্চনার সমকামী চেতনা বণিতা বাসুকে টেনে নিয়ে গেছে পুরীতে। নিজের খিদে মেটাতে সে তাকে হত্যা করতেই চেয়েছিল। পারেনি। তার পূর্বেই ঘটেছে তার মৃত্যু।

সবই হল। কিন্তু কেন? কেন এত হত্যা? বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কেন এই নৃশংসতা? কেন এই জঘন্য হত্যা বাসনা? নীল বোধহয় নিজেও এই কেনর উত্তর নিজের কাছে পরিষ্কার করে নিতে পারেনি। আমাকে বা বণিতাকে কিছু বৈজ্ঞানিক আর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা শুনিয়েছে। লেসবিয়ান টাইপ কিছু মহিলা আছেন, যাঁরা পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদেরই বেশি পছন্দ করেন। নিজেকে পুরুষ ভেবে নারী শরীর ভোগ করবার অদম্য বাসনা থাকে তাদের মনে। জগতে এ ঘটনা বিরল নয়। এক্ষেত্রে কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে একটু অন্যরকম। পোস্টমর্টেম অনুসারে প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে নিহত মেয়েটি মৃত্যুর পর হয়েছে ধর্ষিতা। কিন্তু তার যৌনাঙ্গ অক্ষত। অর্থাৎ অর্চনা যদি লেসবিয়ান হত তাহলে সে হত্যা করার পূর্বেই তাকে সম্ভোগ করতো। কিন্তু সে তা করেনি। করেছে মৃত্যুর পর। আমার মনে হয় অর্চনাকে ঠিক লেসবিয়ান বলা যাবে না। জীবিত অপেক্ষা মৃতদেহের প্রতি অত্যাচার করেই সে পূর্ণ তৃপ্তি পেতো। এটাও এক ধরনের রোগ। মানসিক বিকার। চিকিৎসা শাস্ত্রমতে এটা একটা অসুস্থতা। Doriand's Medical Dictionary তে একে বলা হয়েছে NECROPHILIAC'। যার অর্থ Morbid attraction to death or to dead bodies. Sexual intercourse with a dead body। অর্চনার পাশবিক প্রবৃত্তির মধ্যে attraction to dead bodies. এটাই প্রকট। অর্চনাকে হয়তো NECROPHILIAC-ই বলা যায়।

নীল কিন্তু সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। ওর সবটাই 'হয়তো'। হত্যাকারী ধরা পড়লেও বোধহয় নীল নিজেও মনে মনে বেশ অতৃপ্ত ছিল। কারণ হত্যার কারণটুকু না জানা পর্যন্ত কোনো তদন্তকারীই সন্তুষ্ট হতে পারেন না। সব খুঁতখুঁতনি আর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটল কলকাতায় ফিরে। ওর টেবিলের ওপরেই ছিল একটি স্থূলকায় রেজিস্টার্ড লেফাফা। এসেছে সাতদিন আগে। লিখেছেন অর্চনা

সেন। পোস্ট কবা হয়েছে পুবী থেকে। খাম খুলে পাওয়া গেছে একখানি দীর্ঘ চিঠি। চিঠি নীল পড়ে বণিতা বাসু পড়েছে। সব শেষে মিস্টাব সাকসেনা পড়ে বলেছেন,—এতসব কাণ্ড? ভাবাই যায় না মশাই। উফ কী সাঘাংতিক।

নীলেব নামে আসা সেই ব্যক্তিগত চিঠিখানাকে এখন আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি করে বাখা যায় না। সর্বসাধাবণে প্রকাশিত হওয়াই তাব উপযুক্ত পরিণতি। নইলে যে আমাদের সবারই অর্চনাব প্রতি ক্ষোভ থেকে যেত। আমবা যে অর্চনাকে বুঝতেই পাবতাম না। ব্ল্যাকপ্রিন্সের শেষটুকু তাহলে অনুমান দিয়েই শেষ করে দিতে হত। অর্চনা চিরদিনই বিকৃতমনা এক ঘৃণিত খুনি হয়েই থেকে যেত। অর্চনার শেষ চিঠি হুবহু তুলে ধবলাম সবাব কাছে। সে লিখেছে,

প্রিয় গোয়েন্দা সাহেব,

এ চিঠি যখন আপনাব হাতে পৌঁছবে খুব সম্ভবত তখন আমি পৃথিবীর বাসিন্দা নই। এই পৃথিবীতে বাস কবাব কোনো প্রবৃত্তিও আব আমাব নেই। অনেক হল। অনেক খুনে রক্তাক্ত এ হাত। ছ'টি তাজা প্রাণ শেষ করেও আমার রক্ত তৃষ্ণা মেটেনি। সর্বদাই ভেতব থেকে কে যেন বলে, আরও চাই। আরও রক্ত। আবও তাজা প্রাণ।

জ্ঞান হবাব পব থেকেই সুন্দবী মেয়েদেব প্রতি কী যে অপরিসীম ঘৃণা তা আপনাকে বলে বোঝাতে পাবব না। পৃথিবীব তাবৎ সুন্দবী মহিলা আমাব চক্ষুশূল। অথচ তা তো হওযা উচিত নয়। হবার কথাও নয়। বলতে পাবেন এ এক ধবনের মনোবিকাব। তবে, যে কোনো বিকাবের পেছনেই একটু অনুসন্ধানে দেখা যাবে কিছু না কিছু অন্তর্নিহিত কাবণ আছে।

গোয়েন্দা সাহেব, আমাকে ধবতে আপনাকে বেশ কিছু মাথাব কাজ করতে হয়েছে। বুদ্ধি করে বণিতার মতো এক সুন্দবীকে আমাব নাগালেব মধ্যে এগিয়ে দিয়েছেন। আপনাব বুদ্ধির তারিফ করেই বলছি, খুন কবতে কবতে আমি বড ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। প্রত্যেকটি খুনেব পরই মনে হত, এ আমি কী কবছি? যাদেব নিহত কবছি তাদেব তো কোনো দোষ নেই। সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়েও আমাব ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাব দাবানলে তাদেব পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হচ্ছে। আসতো অনুশোচনা। তাই আমি বাব বার আপনাদেব কাছে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছি। প্রতিবাবেই নিজেকে আমি ধবিয়ে দিতে চেয়েছি। প্রতিবারেই আমি পেতে চেয়েছি আইনেব দেওয়া শাস্তি। চেয়েছি মৃত্যু। চেয়েছি একটি বিযাক্ত আব বিকৃত মনের পবিসমাপ্তি। কিন্তু বড আশ্চযেব, আপনাবা কোনো বাবেই আমাব নাগাল পাননি। হ্যাঁ গোয়েন্দা সাহেব আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি নিজেই ধবা দিয়েছি, না দিলে কোনো দিনও আমায় ধরা আপনাদের সাধ্য ছিল না। বণিতাকে খুন কবাব জন্যে আমাকে পুবী যেতে হতো না। ইচ্ছে কবলেই আমি ওকে অন্য যে কোনো স্থানেই এমন কি ওব বাড়িতে বসেও খুন কবতাম। আমি জানতাম বণিতা আপনার প্রেরিত টোপ। নিজেকে ধবা দেবাব ইচ্ছে না থাকলে আমি রণিতাকে আমার ধারে কাছেই আসতে দিতাম না। ও যে প্রতিদিন গিয়ে আমাব প্রতিটি কথা, প্রতিটি প্রস্তাব, আপনাব কানে শুনিয়ে আসতো তা কী আমি জানতাম না? পুবী যাবাব আমাব একমাত্র কাবণ, আমাব বিষাক্ত জীবনেব পবিসমাপ্তি আমি চেয়েছিলাম আমাব দুঃখী বাবাব কাছ থেকে অনেক দূবে ঘটাতে। ব্ল্যাকপ্রিন্সেব ক্রেতাব খোঁজে যে আপনি নিউমার্কেট থেকে শুরু করে কলকাতাব তাবড তাবড নার্সাবীতে হানা দিয়েছেন, তাও আমাব অজানা নয়। আমাব সঙ্গে প্রথম যেদিন আপনার দেখা হয়, আপনি কি ভাবেন আমি আপনার চোখেব ভাষা বোঝাব চেষ্টা করিনি? বাবে বাবেই আপনি আমাব আঙুলের দিকে লক্ষ্য কবছিলেন জানতে চেয়েছিলেন শ্রীমতীব ঘবে পাওয়া আংটিটা আমাব কিনা। হ্যাঁ গোয়েন্দা সাহেব, ওটা আমারই আংটি। এবং এও জানি আমাব বাম অনামিকাব ফাঁকা জায়গায় স্পষ্ট আংটির দাগ দেখে মনে মনে চমকে উঠেছিলেন।

আমি সবই জানি, এও জানি আমাব মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে আপনি খুব কমই পাবেন। ছোটবেলা থেকেই বুদ্ধিব প্রতিযোগিতায় আমি ববাববই অন্যেব ঈর্ষাব কাবণ হয়েছি। অথচ সেই আমিই ভাগ্যের নিষ্ঠুব পবিহাসে হয়ে গেলাম এক ঘৃণিত খুনি। কিন্তু কেন? এই কেন'র উত্তর পেতে গেলে আপনাকে একটু কষ্ট কবে ফিবে যেতে হবে ছোট্ট অর্চনাব ছোট্ট বয়সের জীবনে।

আমাব বাবাব সঙ্গে আমাব মাযেব বিয়েটা হয়েছিল বোধহয় এক অশুভক্ষণে। আমাব মা ছিলেন

মা বাবার ডাকসাইটে সুন্দরী মহিলা। কী অসাধারণ সে রূপ তা আপনি তাঁকে চোখে না দেখলে কল্পনাই করতে পারবেন না। অথচ আমার বাবা, নিতান্তই সাধারণ এক মানুষ। রূপ তো তাঁর ছিলই না বরং মামুলি চেহারার পুরুষ বললেই বোধহয় ঠিক বলা হবে। রূপের কথা বাদ দিলেও আমার মা বাবার মধ্যে ছিল যোজন ব্যবধান। ধনী পিতার একমাত্র কন্যা, তায় অসাধারণ সুন্দরী। রূপ আর অর্থের অহঙ্কারে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করতেন। বিশেষ করে কোনো কদাকার মানুষকে দেখলে তিনি নাসিকা কুঞ্চন করতেন। সম্ভাব্যক্ষেত্রে তাকে অপমান করতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না। অথচ আমার বাবা! তাঁর রূপ ছিল না ঠিকই। কিন্তু মানুষ হিসেবে তাঁর কোনো তুলনা নেই। অমন দয়া আর ক্ষমাশীল স্নেহপ্রবণ মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। ফিল্ম লাইনের লোক সম্বন্ধে অনেক দুর্নাম বাজারে প্রচলিত আছে। কিন্তু আমি জানি আজও কোনো মানুষ বলতে পারবে না সমর সেন কারো কাছে ঋণী। কাউকে কোনোভাবে প্রতারণা করেছে এমন বদনাম বোধহয় তার অতিবড় শত্রুও দিতে পারবে না।

তবু পৃথিবীতে অঘটন ঘটে। হ্যাঁ, অঘটনই। নইলে দুই মেরুর দুই বাসিন্দার মিলন হল কেমন করে? আসলে আমার দাদামশাই, মস্ত ব্যবসাদার হলেও, একমাত্র কন্যার প্রতি দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও, তিনি একটি বিরাট ভুল কাজ করেছিলেন। আমি তাঁর দূরদৃষ্টির অভাব আছে এমন কথা বলছি না। আসলে তিনি চেয়েছিলেন তাঁর উচ্ছৃঙ্খল আর বদমেজাজী মেয়েটিকে বাঁধতে। তাই বেছে বেছে সমর সেনকে খুঁজে বার করেছিলেন। ইউনিভারসিটির সেরা ছাত্র। এম এস সি-তে ফার্স্ট ক্লাশ করে উনি ফিল্ম টেকনলজি নিয়ে বিশেষ গবেষণা করছিলেন। নজরে পড়েন দাদামশাইয়ের। নম্র, বিনয়ী, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় ছেলেটিকে তিনি হাতছাড়া করলেন না। নিজের একমাত্র কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিলেন।

একটা চরম ভুলের খেলা সংঘটিত হয়ে গেল। দাদামশাই তাঁর মেয়েটির ফাস্ট লাইফের খোঁজ হয়ত রাখতেন, কিন্তু সেই মেয়ে যে অনেক আগেই অন্য পুরুষে আসক্তা সে খবর রাখেননি। অথবা রেখেছিলেন, কিন্তু সেই ছেলেটিকে কোনো মূল্যই দেননি। অত্যন্ত কড়া ধাঁচের মানুষ ছিলেন দাদামশাই। আমার মায়ের পক্ষে সেই সময়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা সম্ভব হয় নি। বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাটে। মায়ের মনের গভীরে অসন্তোষ থাকলেও বাবার সহিষ্ণুতায় সেটি প্রথম দিকে প্রকট হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু অশান্তি শুরু হল, আমার জন্মাবার পরই। কারণ আমার জন্মের কিছুদিন পরই আমার দাদামশায়ের মৃত্যু হয়। শাসনের গণ্ডি ভেঙে যাবার পর মা হয়ে পড়লেন আরো বেপরোয়া। আমার বাবা কোনদিনও মাকে শাসন করতে পারেননি। মায়ের অসংযত জীবনকে তিনি কোনদিনও নিয়মের গণ্ডিতে বাঁধতে পারেননি।

দাদামশাইয়ের বিশাল সম্পত্তি হাতে পাবার পরই মা হয়ে পড়লেন আরো অনমনীয়া। আরো উচ্ছৃঙ্খল। অধিকাংশ সময়েই তিনি থাকতেন বাড়ির বাইরে। ফিরতেন বন্ধু বান্ধব মিটিয়ে, অনেক রাত্রে। আর বাবা তখন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পুরোপুরি ইনভল্‌ভড। তিনি তখন নামকরা ক্যামেরাম্যান। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নিজের কাজে ডুবে থাকতেন।

এভাবেই হয়তো কেটে যেত সময়। কিন্তু তা কাটল না। বাবা মার কলহের যে একটা বিরাট অংশ জুড়ে ছিলাম আমি, সেটা টের পেলাম যখন আমার বছর পাঁচেক বয়েস। তখন আমার একটু একটু করে জ্ঞান হচ্ছে। সেদিন থেকেই বুঝতে শিখেছিলাম যে আমার গর্ভধারিণী হয়েও মা আমাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। ছোট থেকেই আমার চেহারাটা ছিল রোগা। তার ওপর আমার মায়ের কোনো রূপের ছোঁয়া ছিল না আমার মুখে অথবা সর্বাঙ্গে। বরং হয়েছিল তার বিপরীত। আমি পেয়েছিলাম আমার বাবার রূপহীনতা। আমার সর্বাঙ্গে ছিল পুরুষ কাঠিন্য। শক্ত শক্ত হাত-পা। ভাঙা চোরা মুখশ্রী। আর সেটা আরো বাড়তে লাগল যত আমার বয়স বৃদ্ধি পেতে লাগল।

তখন আমি খানিকটা বড় হয়েছি। বছর দশ-এগারো হবে। অনেক কিছু বুঝতেও শিখেছি। একদিনের কথা আজও আমার মনে আছে। বাবা-মায়ের নিভৃত আলাপ। আলাপ না বলে বচসা অথবা ঝগড়া বলাই ভাল। বাবা অনুযোগ করেছিলেন মায়ের চালচলন নিয়ে। সংসারজীবনে মায়ের ভূমিকা নিয়ে। এবং বলেছিলেন এভাবে কোনো নরনারীর দাম্পত্যজীবন কাটতে পারে না। মায়ের সেদিনের মুখটা

আমার আজও মনে আছে। রূপের অহঙ্কারে আর তীব্র শ্লেষে সে মুখে এক অদ্ভুত ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছিল মা'কে বলতে শুনেছিলাম, বাবা জোর করে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিল। তার মানে এই নয় যে তোমার সব চাওয়া আমাকে মেটাতে হবে। একবার মিটিয়েছি। পরিণাম তো দেখলে?

বিস্মিত বাবাকে বলতে শুনেছিলাম,—পরিণাম? কিসের পরিণাম?

আবার সেই ব্যঙ্গের চাবুক,— মেয়ে গো, তোমার মেয়ে, যেটাকে আমি পেটে ধরেছিলুম, ঐ মেয়েকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিতেও ঘেন্না করে। এত বিশ্রী আর জঘন্য।

আহত গলায় বাবা বলেছিলেন—কী বলছ তুমি সুরমা, অর্চি তো তোমারও মেয়ে।

—লজ্জা করে। অমন কদাকার, কুৎসিত চেহারা, অচেনা লোকের কাছে ওকে আমি ঝিয়ের মেয়ে বলি।

—মা হয়ে তুমি একথা বলতে পারলে?

— সেটাই আমার দুর্ভাগ্য আর ওর সৌভাগ্য। নইলে কবেই ওকে অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দিতুম এর পরেও তুমি কী করে আমার সঙ্গ কামনা কর? তোমার সঙ্গ মানেই তো ঐরকম আরো কটা মর্কটের জন্ম দেওয়া?

ভাবতে পারেন গোয়েন্দা সাহেব, কোন মা তার আত্মজা সম্বন্ধে এমন কথা কখনও বলতে পেরেছে? এরপরেও আমার মায়ের আরো তিনটি সন্তান হয়েছে। দুটি মেয়ে একটি ছেলে। তারা কিন্তু সকলেই আমার মার মতই সৌন্দর্যের অধিকারী। তাদের নিয়ে আমার মায়ের কত গর্ব। মায়ের কাছে তাদের কত আদর আর যত্ন। বলা বাহুল্য, তারা কেউ কিন্তু আমার বাবার সন্তান নয়। পরে জেনেছিলাম মায়ের সেই পূর্বপ্রণয়ীই তাদের বাবা।

কিন্তু মাত্র দশ এগারো বছর বয়সে যে ছোবল আমি খেয়েছিলাম তা কোনদিনই ভুলিনি। আর সেই ছোবল আমাকে বারবার দংশন করেছে বিভিন্ন সময়ে। আমাদের বিশাল হলঘরে মা তাঁর আরো তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে, অতিথিদের সঙ্গে হই-হল্লা করতেন। কোনো সময়ে যদি আমি সেখানে গিয়ে পড়তাম, আমায় শুনতে হত, এলো বাপের সুপুত্তুর এলো। যেমন বাপ তার তেমনি মেয়ে।'

মা আমাকে কোনদিনও আপন করে কাছে টেনে নেননি। বরং বরাবরই নিদারুণ অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে রাখতেন। তাঁর ধারণায় আমার মধ্যে কোনো রমণীয় কমনীয়তা ছিল না। তাঁর মতে আমার পুরুষ হয়েই জন্মানো উচিত ছিল।

কেমন করে যেন ধীরে ধীরে একটা বিদ্রোহের ভাব ফুটে উঠেছিল আমার মধ্যে। মেয়েদের আসরে আমার মা কোনদিনও বসতে দিতেন না। ব্যঙ্গ করে বলতেন, যাও অর্চি, মেয়েদের মাঝখানে ছেলেদের থাকতে নেই।

পরে আমি অনেকবার ভেবেছি, আমার প্রতি এ বিদ্বেষ, সে কি কেবলি আমার পুরুষালি চেহারার জন্যে নাকি আমার বাবার ওপর তাঁর রাগের জন্যে? সঠিক ব্যাখ্যা পাইনি। তবে ধীরে ধীরে সত্যিই আমি ছেলে হয়ে উঠতে আরম্ভ করলাম। ছেলেদের মত জামা-প্যান্ট পরতাম। ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলো করতাম। ছেলেদের মতো চুল ছাঁটতাম। এমনকি একটু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের সঙ্গে বসে একসঙ্গে সিগারেট খেতাম। মদ খেতাম। জুয়াও খেলতাম। ছেলেরাই আমার বন্ধু। এমনকি, ছেলেদের সঙ্গে থেকে থেকে কখন যেন আমি নিজেও পিছন থেকে মেয়েদের টিজ করতাম, টন্ট্ করতাম।

মায়ের প্রতি বিদ্বেষ আমার সেই দশ-এগারো বছর বয়েস থেকে। তখন থেকেই আমি চেষ্টা করতাম মা যা না চান তাই করতে। আস্তে আস্তে আমি হয়ে উঠেছিলাম বুনো, রাগী আর গুণ্ডা স্বভাবের। একদিনের কথা মনে আছে। বাড়ি ঢুকতেই দেখি দোতলার পার্লারে মা বসে আছেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অবস্থায়। তাঁর সেই প্রেমিক প্রবরের সঙ্গে। বাড়িটা ছিল আমার দাদামশাইয়ের। মা-ই সে বাড়ির মালিক। নেহাৎ সামাজিক স্ক্যাণ্ডালের ভয়ে বাবাকে তিনি বাড়িতে থাকতে দিতেন একতলায় একপেশে একটা ঘরে। বাবাও যেন কেন নির্লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি থাকতেন তাঁর মতো। মায়ের কোন ব্যাপারেই তিনি মাথা গলাতেন না। এমন কি তিনি এও জানতেন আর তিনটি ছেলেমেয়ে কার ঔরসজাত। কিন্তু ভুলেও সে কথা কোনদিনও তাঁর মুখে শুনিনি। বাড়ি ফিরে বাবার যা কিছু আদর, ভালবাসা সব তিনি আমাকে উজাড় করে দিতেন। ও বাড়িতে আমার কোন ব্যক্তিগত ঘর ছিল না। আমি আর

রকা থাকতাম একসঙ্গে। বাবা মুখ বুজিয়ে সব কিছু সহ্য করলেও আমি করিনি। আগেই বলেছি আমি হয়ে উঠেছিলাম বুনো, রাগী আর গুণ্ডা প্রকৃতির। দোতলার ব্যালকনিতে অমন ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ওদের বসে থাকতে দেখে আমার মাথার রক্ত চড়ে গিয়েছিল। নিমেষের মধ্যে কী যে হয়ে গেল, মদ না খাওয়া সত্ত্বেও মাতলামির ভান করে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে ওরা দুজনেই সামান্য চমকে উঠেছিলেন। কিন্তু সে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। তারপরই অত্যন্ত অভদ্রের মতো মায়ের সেই প্রেমিকটি, খুব সম্ভবত মদ্য পান করেছিলেন, বলে উঠলেন, কী ব্যাপার সুরমা, হিজড়েটা এখানে কেন? সামান্য এটিকেটও শেখাওনি? তারপর আমার দিকে ফিরে বলছিলেন, 'ইউ স্কাউন্ড্রেল, এখানে কী চাই? মায়ের প্রণয় লীলা দেখতে এসেছ? প্রতিবাদের আশা করিনি, তবে ভেবেছিলাম মা হয়তো আমাকে চলে যেতে বলবেন। কিন্তু না, তার বদলে মাকে বলতে শুনেছিলাম, হবেই তো, যেমন বাপ তেমনি তার অপোগণ্ড। যা এখান থেকে, এখানে কী করতে এসেছিস?

রাগী আর বুনো মেয়েটা, যে বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ছেলে হিসেবেই ভাবতে শিখেছিল, সেই মুহূর্তেই হারালো তার ধৈর্যের বাঁধ। তারপর, হ্যাঁ, বলতে কোন দ্বিধা নেই, ছেলেদের আখড়ায় আমি বক্সিংটাও শিখেছিলাম। শিখেছিলাম ক্যারাটের প্যাঁচ পয়জার। মাত্র নিমেষের ব্যবধানে একটি প্রচণ্ড ঘুষিতে শুইয়ে দিয়েছিলাম মায়ের প্রেমিকটিকে। সেই প্রথম রক্তের স্বাদ। সেই প্রথম আমার চেতনায় রক্তের ধারা বইতে শুরু করলো। ছুটে গিয়ে তার কলার ধরে দাঁড় করিয়েছিলাম। তারপর মুখখানাকে বীভৎস করে ছিবড়ের মত মাটিতে শুইয়ে দিয়েছিলাম। ততক্ষণে মার চিৎকারে সারা বাড়ির যত চাকরেরা হাজির হয়ে গেছে। কিন্তু কেউই ভয়ে এগিয়ে আসেনি। প্রথমত আমার উন্মত্ত রূপ, দ্বিতীয়ত আমার শারীরিক শক্তি প্রকাশের নমুনা। মা তখনও চিৎকার করে চলেছেন, ইউ নটোরিয়াস বীচ, গেট আউট। গেট আউট অব মাই সাইট। লীভ মাই হাউস অ্যাটওয়ানস। গুণ্ডা, বদমাস, হিজড়ে কোথাকার।

ঐ একটা মাত্র শব্দ, 'হিজড়ে'। আবার যেন নতুন করে মাথায় খুন চাপিয়ে দিয়েছিল। দূরে তাকিয়ে দেখলাম রুপোর ফুলদানিতে শোভা পাচ্ছে মায়ের প্রিয় ফুলের স্তবক লালচে কালো গোলাপ, ব্ল্যাকপ্রিন্স। নিমেষে ছুটে গিয়ে তুলে নিয়েছিলাম ফুলদানিটা। শক্ত হাতের পেষণে সমস্ত ফুলগুলো ছড়িয়ে দিয়েছিলাম সারা মেঝেতে। তারপর সেই ভারী ফুলদানিটা দিয়ে একে একে ভাঙতে শুরু করেছিলাম যত সব সাজানো দামি দামি আসবাবপত্তর। কাচের বিশাল সেন্টার টেবিল, সুদৃশ্য আয়না, সব চুরমার হতে লাগল একে একে।

চাকর-বাকরের উদ্দেশে মার তখনও চিৎকার চলছে, ইউ ব্লাডি ফুলস, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী সব, ঐ গুণ্ডা হিজড়েটাকে মেরে বাড়ি থেকে বার করে দিতে পারছিস না?

আমার প্রলয়ংকর উন্মত্ত রূপের সামনে কেউ এগিয়ে আসেনি। আসতে সাহসও করেনি। সব কিছু ভাঙার পর্ব শেষ করে ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম মা'র সামনে। মা'র কণ্ঠে তখন ভয়ের স্পষ্ট ছাপ, বলেছিলেন—কী, কী, আর কী করতে চাস?

দাঁতে দাঁত চেপে আমি তখন বলেছিলাম, —একটু আগে কী বললে, আমি হিজড়ে?

—হ্যাঁ, তাই। তুই একটা শয়তান, গুণ্ডা!

—আর একবার বল আমি হিজড়ে?

—হিজড়ে....হিজড়ে...হিজড়ে... ।

গোয়েন্দা সাহেব, সেই মুহূর্তে আমি সত্যিই শয়তান হয়ে উঠেছিলাম। আর আমার মধ্যে যে শয়তানের জন্ম দিয়েছিল, সেই মুহূর্তে তাকে আমি ক্ষমা করতে পারিনি। আমার ক্যারাটে করা শক্ত হাতের একটি বিশাল চড়ে, সন্তানের কাছে সব থেকে বড় আপনার, বড় নিকটতম মানুষটিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলাম। তারপর সেই একবস্ত্রে, মিসেস সুরমা সেনের সঙ্গে সব সম্পর্কে শেষ করে বেরিয়ে এসেছিলাম রাস্তায়। অনেক, অনেকক্ষণ পার্কের বেঞ্চিতে শুয়েছিলাম। বিশাল আকাশের নিচে শুয়ে থাকতে থাকতে আমি স্পষ্ট টের পেয়েছিলাম, আমার শরীরের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে অবশিষ্ট যা কিছু কোমলতা, যা কিছু শুভ্রতা, যা কিছু ভাল। জন্ম নিচ্ছে বিশাল একটা খুনি দানব, যার মজ্জায় মজ্জায় কেবলি ঘৃণা। ঘৃণা সুন্দরী নারীদের প্রতি। জন্ম নিচ্ছে প্রতিহিংসা আর রক্তের

খেলা, যে খেলায় সুন্দরী নারী দেহ হবে ছিন্নভিন্ন। সেই দানবের নখের আঁচড়ে ফালা ফালা হবে রমণীর নরম শরীরের সব সৌন্দর্য!

ওহ্, হ্যাঁ একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। মীনাক্ষী মল্লিক আমার প্রথম শিকার নয়। তারও কিছুদিন আগে একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েকে আমি হত্যা করেছিলাম। আমার প্রথম খুন! রক্ত-নেশার শুরু মাত্র বারো বছরের সেই মেয়েটি আমাকে বিশ্বাস করেছিল। তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম এক গভীর জঙ্গলে। মেয়েটি ছিল আমার এক বান্ধবীর বোন। ঘটনাটা হাজারিবাগের। সাহসী মেয়েটা আমার সঙ্গে গিয়েছিল রাতের অন্ধকারে বাঘ দেখতে। কোনোরকম চিৎকার করার আগেই আমার কঠিন হাতের চাপে তার কণ্ঠরোধ করে তাকে হত্যা করেছিলাম। তারপর কিশোরীর দেহটি সম্পূর্ণ নগ্ন করে তীক্ষ্ণ নখের আঁচড়ে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিলাম। তারপর এক সময় তাকে সেই গভীর জঙ্গলে ফেলে এসছিলাম বুনো জানোয়ারের খাদ্য হিসেবে।

কেউ সে কথা জানেনি। জানতে পারেনি। জিঘাংসা পরিতৃপ্ত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মনের মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভও ছিল। এরকম নিভৃত হত্যায় কোনো আনন্দ নেই। সভ্য সমাজের বুকে আমার নিষ্ঠুরতা ছড়িয়ে দিতে না পারলে প্রতিহিংসাপরায়ণ মনে তৃপ্তি আসে না। আর সেই তৃপ্তি পেতেই একে একে এল মীনাক্ষী, শ্রীমতী, রমা, পিউ, দূর্বা আর নন্দিতা বসাকেরা। ওদের সঙ্গে প্রথমে আমি বন্ধুত্ব করেছি। নিবিড় বন্ধুত্ব। ওরা কেউ বুঝতেও পারেনি আমার উদ্দেশ্য। সম্পূর্ণ বিশ্বাস অর্জনের পর এক রাতের জন্যে ওদের কাছে থাকতে চেয়েছি। একে আমি বড়লোক, তায় মহিলা। তদুপরি গাঢ় বন্ধুত্ব। যে কোনো মেয়েই এক রাতের জন্যে তাদের বন্ধুকে আশ্রয় দিতে পারে। সেটাই স্বাভাবিক তারপর নিদ্রিত বন্ধুটির গলায় ফাঁস দিতে বেশিক্ষণ সময় লাগেনি। এরপর নিহত মেয়েটিকে নগ্ন করে ধীরে ধীরে তার সুন্দর দেহে রেখে এসেছি তীক্ষ্ণ নখের আঁচড়। কদর্য করেছি সৌন্দর্যকে।

আমি খুনি। বিংশ শতাব্দীর বুকে এক অসুস্থ খুনি। তবু প্রতিটি খুনের পরেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতো সেইসব মেয়েদের মুখ। কত অসহায়ের মতো তারা আমার হাতে নিহত হতে বাধ্য হয়েছে। বাঁচার ইচ্ছে আর আমার ছিল না। প্রতিটি হত্যার পরই আমি চেয়েছি ধরা দিতে। একটা না একটা নমুনা আমি রেখে এসেছি। কখনও মেয়েদের টিপ, কখনও হাতের আংটি। কখনও বা মাথার কাঁটা অথবা চুলের রিবন আর লাল নাইলন কর্ড। প্রতিবারই খুনের আগে আমি জানিয়ে দিয়েছি এবার আমি খুন করতে যাব। অবশ্য বোকার মতো ধরা দেবার বাসনা ছিল না। তাই বার বার ছদ্মবেশ নিয়েছি, আর আপনাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি।

বণিতা বাসুই আমার শেষ অভিযান। হয় সে খুন হবে নয়তো আমি। আমি জানি আমার জন্যে আপনি মৃত্যুফাঁদ পেতেছেন। আমি ধরা দিতেই চলেছি। তবে জীবন্ত আমাকে আপনারা কোনো দিনও ধরতে পারবেন না। বিচারের নামে হাস্যকর প্রহসন আমি সহ্য করতে পারি না। পারলে আমার মৃতদেহটি আমার দুঃখী বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। সমর সেনের মত দুঃখী মানুষ বড় কম আছে। তিনি আমার থেকেও দুঃখী। আমি প্রতিহিংসা নিতে পারি। কিন্তু আমার বাবা তাও পারেন না। কেন না চিরদিনই তিনি বড় নিরীহ আর ভালোমানুষ। জগতে ভালো মানুষদেরই সারাজীবন আঘাত পেতে হয়। এই বোধহয় বিধাতার নির্দেশ।

সাতটি মেয়ে আর আমার বাবার জন্যে এই মুহূর্তে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। আজ মনে হচ্ছে প্রতিহিংসা মানুষকে বড় ভুল পথে নিয়ে যায়। জানি না জন্মান্তর বলে কিছু আছে কি না? যদি থাকে আমাকে অন্তত এদের হাতে শাস্তি নেবার জন্যে ফিরে আসতে হবে। বার বার। আসব। কেন না শাস্তি যে আমায় পেতেই হবে।

গোয়েন্দা সাহেব, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার তৎপরতায় আমার বোঝাস্বরূপ গ্লানিময় জীবনের সমাপ্তি ঘটল তাড়াতাড়ি। বিবেকের চাবুক আর আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। বিদায়—।

আপনাকে ধন্যবাদ

ইতি

অর্চনা সেন

———

হারানো রহস্য
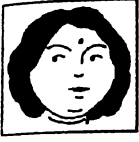
পুলিস অফিসার বিকাশ তালুকদার বললেন, 'জানেন মিস্টার ব্যানার্জি, আমার জীবনে এ পর্যন্ত অনেক রকম কেস্ এসেছে। চুরি, রাহাজানি, ছিনতাই এমনকি খুনও। চুরি ছিনতাই এগুলো মামুলি ব্যাপার। এগুলোর পাত্তা লাগাতে খুব একটা বেশিদিন সময় লাগে না। খুনের কেস্গুলো ভাবায়। অবশ্য সেগুলো শেষ পর্যন্ত মোটামুটি সলভড্ হয়ে যায়। কেউ সাজা পায়। কেউ পায় না। বুঝতেই তো পারছেন আইন যেমন আছে, আইনের ফাঁকও আছে। সেই ফাঁক-ফোকর দিয়ে খুনি পালায়। চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কিছু করার থাকে না। সে সব ক্ষেত্রে নিজের মনে একটা স্যাটিস্ফ্যাকশান থাকে। খুনিকে তো আমি ট্রেস আউট করেছি। এখন আইন যদি তাকে বাঁধতে না পারে সে দোষ তো আমার নয়। কিন্তু দুঃখ বা মানসিক অশান্তি কোথায় জানেন?

কথা বলতে শুরু করলে তালুকদার চট্ করে থামতে চান না। লোকটাকে ওঁর জানা বিষয় নিয়ে যদি বক্তৃতা দিতে বলা হয়, অনর্গল বলে যেতে পারেন। না থেমে অন্তত ঘণ্টা-খানেক। যতক্ষণ না ওঁর গলা শুকোবে অথবা চোয়াল ব্যথা হবে!

বিকাশ তালুকদারের সামনেই বসে ছিল নীল ব্যানার্জি। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর অথবা সত্যপূজারী নীলাঞ্জন ব্যানার্জি। পরপর বেশ কিছু জটিল রহস্য সমাধান করার ফলে পুলিসমহলে ওর বেশ খাতির বেড়েছে। চোর ছাঁচোড়ের কাছে ওর শত্রুতা বৃদ্ধি পেয়েছে নিঃসন্দেহে।

অবশ্য পুলিস মহলে সবাই যে নীলের ভক্ত তা নয়। ঈর্ষা তো থাকবেই। ওকে ঠিক সুনজরে দেখে না এমন অনেক অফিস্যারই আছেন। বিকাশ তালুকদার তাদের থেকে আলাদা। বিকাশ নিজে থেকেই ওর সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিলেন। তারপর সেই আলাপ ক্রমশ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। অবসর পেলেই বিকাশ নীলের বৈঠকখানায় এসে আড্ডা জমান। বেশির ভাগ কথাবার্তাই অপরাধী সংক্রান্ত। বিকাশের মধ্যে আত্মম্ভরিতা কম। খানিকটা খোলামেলা স্বভাবের। নিজের কৃতকার্য হওয়ার কথা যেমন ফলাও করে বলেন, ঠিক তেমনি পরাজয়ের বা অক্ষমতার কথা স্বীকার করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হন না। বোধহয় সেই কারণেই নীল ওকে প্রশ্রয় দেয়। উনি তো স্পষ্টই বলেন,—আমার এই মগজ নিয়ে খুব বেশিদূর এগুনো সম্ভব নয়। কিছুদূর এগিয়েই কেমন সব গুলিয়ে যায়। তখন মনে হয় এ লাইনে না এলেই ভাল হত। ফার্টাইল ব্রেনম্যাটার না থাকলে পুলিসের চাকরি ছেড়ে অন্য কিছু করা দরকার। পুলিসে দরকার বুদ্ধিমান লোক, যেমন আপনি।

নীল ওকে থামিয়ে দিতে বলতো,—এ আপনার অতিবিনয় হয়ে যাচ্ছে তালুকদার। ভুলে যাবেন না আপনি একজন পুলিস অফিসার।

ম্লান হেসে বিকাশ উত্তর দিতেন, — প্রফেসারি করলে আমি কিন্তু অনেক বেশি সাইন করতাম।

—তাহলে তাই করুন, হাসতে হাসতে নীল বলতো।

—হবে না মশাই। শিং ভেঙে কি আর বাছুরের দলে ঢোকা যায়। বয়েস অনেকটা এগিয়ে গেছে।

বিকাশ তালুকদারের দুঃখটা নীল বুঝতো। বুঝতো এই সরল মানুষটা সত্যিই প্যাঁচ-ট্যাচ তেমন জানে না। আসলে লোকটা খুবই নরম স্বভাবের। নীল লোকটাকে বেশ খোলা মনেই নিয়েছিল। নীলের বাড়িতে বিকাশের যাতায়াত ছিল অবাধ। নীল বাড়ি না থাকলে বেশ কিছুক্ষণ নীলের মায়ের সঙ্গে একদম ঘরোয়া সাংসারিক কথাবার্তা বলে চলে আসতেন। আজও তেমনি একটা দু'জনের সান্ধ্য আসরের আড্ডা বসেছিল। নীলের এখন হাত ফাঁকা। বেশ কয়েকদিন যাবৎ তেমন ভাল কোন মাথা ঘামানোর কাজ আসেনি। একা একাই দিন কাটাচ্ছিল। ওর, প্রিয় বন্ধু, কোন কোন সময় সহকারী, লেখক এবং প্রফেসর

অজেয় বসু বেশ কিছুদিন যাবৎ কলকাতার বাইরে। একে হাত ফাঁকা, তায় প্রিয় বন্ধু কাছে নেই। বই গান আর নিজের ব্যবসা নিয়েই দিন কাটাচ্ছিল। বিকাশ আসতে ও একটু স্বস্তি পেয়েছিল।

বিকাশের খেদোক্তি শুনতে শুনতে নীলের মনে হল লোকটা নিশ্চয়ই কোন একটি ব্যাপারে হীনম্মন্যতায় ভুগছে।

সিগারেটটা অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিতে দিতে নীল বলল,—তা বর্তমানে আপনার মানসিক অশান্তির হেতুটা কি?

—হেতু? বলে বিকাশ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। একমনে সিগারেট টানলেন। তারপর সোফায় গা এগিয়ে দিয়ে বললেন,— চোখের সামনে খুন হল। সরেজমিনে তদন্ত হল। ফেলে যাওয়া সূত্র দেখে মনে হল খুন যে করেছে বা করতে পারে তাকে যেন চেনা যাচ্ছে। কিন্তু সে লোকটা এমন কোন সংকেত রেখে যায়নি, যার দ্বারা প্রমাণ করা যায় লোকটা খুনি। তখন যে কী মানসিক অশান্তি হয় আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।

মৃদু হেসে মাথা দোলাতে দোলাতে নীল বলল,—তা বোধহয় হয় না। আমার মনে হয় সে ক্ষেত্রে আপনার ইনভেস্টিগেশনটা ঠিক পথে চলছে না। হয়তো আপনার হিসেবে কোথাও ভুল হচ্ছে। কেন, এরকম কোন ঘটনা ঘটেছে নাকি?

আবার বিকাশ খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে নীরব হয়ে রইলেন। তারপর কপাল চুলকোতে চুলকোতে বললেন, —আজ থেকে বছর দেড়েক হবে। পার্ক-স্ট্রিট অঞ্চলের একটা সফিসটিকেটেড ফ্ল্যাটে এক মহিলা খুন হন। তখন আমি ঐ অঞ্চলেই পোস্টেড। ন্যাচারালি কেসটা আমার হাতে আসে। আমার দিক থেকে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সলভ্ করতে পারিনি। অবশ্য এখন আমি অন্য জায়গায় বদলি হয়ে গেছি। ঠিক যাকে বলে দায়দায়িত্ব, সেটা আমার এখন নেই। কিন্তু ঐ যে বললাম, মনের খচখচানি সেটা আজও যায়নি। তখন মাঝে মাঝে মনে হত লোকটাকে মানে খুনিকে বোধহয় চিনতে পারছি, কিন্তু কোন প্রমাণ ছিল না। আজও নেই। হাত পা বাঁধা অবস্থায় মনের দুঃখ নিয়ে বসে আছি।

—পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে? বছর দেড়েক আগের ঘটনা? কোন কেসটার কথা বলছেন বলুন তো?

—ওই যে, সেই শর্মিলা প্যাটেল বলে একটি বছর ছাব্বিশ সাতাশের মেয়ে খুন হয়েছিল। কাগজে খুব লেখালেখি হয়েছিল সেইসময়?

—ওয়েট, ওয়েট। বোধহয় মনে পড়েছে, শর্মিলা মার্ডার? সো ফার আই ক্যান রিমেম্বার, মেয়েটি ঠিক ভদ্রভাবে জীবনযাপন করতো না।

—ইয়েস, আপনি ঠিকই ধরেছেন। মেয়েটি সম্ভবত কারো রক্ষিতা ছিল। সেটাও অবশ্য সঠিক কি না জানি না। তবে সোজাসুজি বলতে গেলে শর্মিলাকে, মানে এখানকার নতুন ভাষায় প্রায় যৌনকর্মীই বলা যায়। যদিও যৌনকর্মী শব্দটায় আমার আপত্তি আছে। সে যাইহোক, ওর জীবনযাত্রাটা কোন মতেই ভদ্রগোছের নয়। অথচ মেয়েটি ছিল বিবাহিতা।

—হাতে তো এখন সময় আছে।

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

—আমারও সময় আছে। চা আর তেলেভাজার অর্ডার দিচ্ছি। এবার বেশ গুছিয়ে বলুন তো আপনার শর্মিলা হত্যাকাণ্ড।

নীল উঠে গিয়ে দীনুকে তেলেভাজা আর চায়ের ফরমাশ করে এসে জমিয়ে বসল। পৌষের শীত। সন্ধে হতে না হতেই প্রায় কনকনে ভাব। শালটাকে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে নীল সোফার মধ্যে প্রায় সেঁদিয়ে গেল। বিকাশের গায়ে পুলিসি ধরাচূড়ো। একটা সিগারেট শেষ করে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বিকাশ আরম্ভ করলেন ওর স্মৃতিচারণ।

সেদিন বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। সকাল থেকেই টিপটিপে ছিল, বিকেলের পরই নামল মুষলধারে। থানাতেই ছিলাম। রাত তখন প্রায় সাড়ে ন'টা কি পৌনে দশটা। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। থানায়

ফোন আসা মানেই ব্যাপারটা সুবিধার নয়। লোকে থানায় ফোন করে বিপদে পড়লে। মুখটা স্বাভাবিক কারণেই ব্যাজার হয়ে উঠেছিল। কারণ মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে কোনমতেই ইচ্ছে করছিল না বাইরে বেরুতে। কিন্তু ডিউটিতে ছিলাম। ফোন তুলতেই হল। ওপাশ থেকে ভেসে এল একটি পুরুষ কণ্ঠ। স্যানাল, পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলের একটি মাঝারি ধরনের অ্যাপার্টমেন্টের বারো নম্বর ফ্ল্যাটে একটি মেয়ে খুন হয়েছে।

- এক সেকেন্ড, বলে নীল বিকাশকে বাধা দিল, যে লোকটি ফোন করছিল সে কে?

—সেও এক মজার ব্যাপার। পরে আমি অনেকবারই জানার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কে যে ফোন করেছিল তা জানতে পারিনি।

—লোকটার গলার আওয়াজ, আই মিন, কথাবার্তায় ঠিক কী ধরনের লোক বলে মনে হয়েছিল?

— তেমন বিশেষ কিছু কথা তো হয়নি। খুবই অল্প কথায় সে তার বক্তব্য শেষ করেছিল। তবে ঐটুকু সময়ের মধ্যে যা বোঝা গিয়েছিল, তা হচ্ছে, লোকটির গলার আওয়াজ ছিল খ্যানখেনে টাইপ, আর ভাষাটাষাও খুব পরিশীলিত নয়। কোথায় যেন একটু অশিক্ষিত অবাঙালি টান। ঠিক বলে বোঝাতে পারছি না।

—ঠিক আছে, তারপর কী হল?

—জনা তিনেক কনস্টেবল আর একজন ফটোগ্রাফার নিয়ে ঠিকানামতো নির্দিষ্ট বাড়িতে পৌঁছলাম। বাড়িটা ফ্ল্যাট সিস্টেমে ভাড়া দেওয়া হয়। তখন প্রায় সাড়ে দশটা। এমনিতেই ওই এলাকাটা নির্জন থাকে। তার ওপর বৃষ্টি এবং বেশ রাত। আশেপাশে তেমন একজন কাউকে দেখা যায়নি। একটু দূরে দু'একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল।

জায়গাটা চিনতে অসুবিধা হল না। আমাদের ভাষায় পশ বেডলাইট জোন। সমাজের নামী দামি মানুষেরা এখানে স্ফূর্তিটুর্তি করতে আসেন। আর যেসব মেয়েরা সেই বাড়িতে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে তাদের জীবনযাত্রাও স্বাভাবিক নয়।

যাই হোক প্রথমেই কেয়ারটেকারের খোঁজ নিলাম। সে বেটা তো কোন রকমে টলতে টলতে বেরিয়ে এল। পুলিস টুলিস দেখে তার নেশা বোধ হয় সাময়িক ফিকে হয়ে গিয়েছিল। খুনের কথা ওকে জিগ্যেস করতে ও তো প্রায় আকাশ থেকে পড়ল। তারপর লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম বারো নম্বর ফ্ল্যাটে।

ফ্ল্যাটের দরজা কিন্তু লক করাই ছিল। বেল টিপতে কোনো সাড়াশব্দ পেলুম না। শেষমেশ তালা ভেঙে ঢুকতে হল। সাজানো গোছানো সুদৃশ্য ছিমছাম ফ্ল্যাট। আলো টালো জ্বালানোই ছিল। ডাইনিং স্পেসে কাউকে পাওয়া গেল না। ধীরে ধীরে আমরা এগিয়ে গেলাম। প্রথম ডাইনে যে ঘরটা পড়ে সেটাই বেডরুম। নিভাঁজ বিছানায় ধবধবে সাদা চাদর পাতা। বেশ বোঝা যায় সন্ধ্যে থেকে সেটি ব্যবহৃত হয়নি। অবশ্য মৃতদেহ পাওয়া গেল ঐ ঘরেই। ওয়ার্ড্রোবের ঠিক পাশেই। উপুড় অবস্থায় পড়ে ছিল। সারা পিঠ জুড়ে রক্তের ছাপ।

মৃতা মহিলা বেশ সুন্দরী। বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশের মধ্যে। টকটকে গায়ের রঙ। একটু মড টাইপ। বয়েজ-কাট করা চুল। গায়ে ছিল হাউসকোট। পি. এম. রিপোর্ট-এ পাওয়া যায় মহিলাকে পেছন থেকে ক্লোজ রেঞ্জে দাঁড়িয়ে গুলি করা হয়। এক গুলিতেই শেষ। মৃতার স্টমাকে অ্যালকোহলও ছিল।

ইতিমধ্যে দীনু তেলেভাজা আর চা দিয়ে গিয়েছিল। একটা গরম বেগুনি তুলে নিয়ে নীল বলল, —তালুকদারবাবু এবার আর ডেসক্রিপশন নয়। আমি প্রশ্ন করব, আপনি মনে করে করে ঠিক জবাব দিন।

তালুকদার একটা বেগুনি তুলে নিয়ে বলল,—কেন ব্যানার্জি সাহেব, আমি কি ঠিক মতো বলতে পারছিলুম না।

নীল হেসে বলল, — আরে তা নয়, প্রথমত মুখে গরম তেলেভাজা নিয়ে একনাগাড়ে কথা বলা যায় না। দ্বিতীয়ত আমি খুঁটে খুঁটে দরকারি পয়েন্টসগুলো তুলে নিতে চাই। এতে দু'পক্ষেরই সুবিধে। আচ্ছা প্রথমে বলুন, মৃতার নাম?

—শর্মিলা প্যাটেল।

—মানে বাঙালি নয়। দেখতে সুন্দরী। মদ্যপান করত। আচ্ছা, দেহের আর কোথাও কোন আঘাতেব চিহ্ন ছিল কি?

—না, এক গুলিতেই সাবাড়। হৃৎপিণ্ড এফোঁড় ওফোঁড়।

—মৃতার আত্মীয়স্বজন?

—সেও আব এক গোলমেলে ব্যাপাব। তেমন কাউকে পাওয়া যায়নি। তবে ঐ বাড়িবই কেউ জানায়, ওব নাকি স্বামী বলে কেউ একজন আছে। অবশ্য সে কখনও সখনও আসতো। তাব কোন ঠিকানা পাওয়া যায়নি।

—কখনও সখনও আসতো মানে?

—কেয়ারটেকারেব মুখে যা শুনেছি আর কি! মাঝে মাঝে মদ্যপান করে লোকটা আসতো। কিছু হামলাবাজি করতো। তাবপর শর্মিলা মেয়েটির উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতে করতে বেরিয়ে যেতো।

—তাব মানে শর্মিলাকে একাই থাকতে হতো। আচ্ছা ফ্ল্যাটটা কার নামে নেওয়া ছিল? খোঁজ নিয়েছেন?

—হ্যাঁ, সাম রমা প্যাটেল।

—সে আবাব কে?

—নাকি শর্মিলার মা। আবাব কেউ কেউ বলে মা-ফা কিছু না। ওটা শর্মিলাবই আসল নাম। ওদের ঐ প্রোফেশনে নাকি একটা ভাল নাম-টাম নিতে হয়। তবে শর্মিলা নাকি একাই থাকতো।

—চলতো কী করে? ওসব জায়গায় ফ্ল্যাট ভাড়াও তো প্রচুব।

—তাতে কী? শর্মিলার যা রূপেব বহব দেখেছিলুম, তাতে করে পয়সার অভাব হবার কথা নয়। মাঝে মাঝেই নাকি ওব ঘবে নিত্যনতুন লোকেব ভিড় হতো। শোনা যায় কিছু ছবিতেও নাকি নেমেছিল। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, খুন হবাব প্রায় বছর দেড়েক আগে শর্মিলা প্যাটেলের কাছে একজন বাবুরই নিয়মিত যাতায়াত ছিল।

নীল এবাব একটু নড়েচড়ে বসল। চায়েব কাপে আলতো কবে চুমুক দিয়ে বলল,—এই একজন লোকটি কে?

—সেটা কেউই বলতে পাবল না। সপ্তাহে তিন চাবদিন তিনি আসতেনই। কোনো কোনো উইকে রোববার বাদ দিয়ে সবদিনই। প্রায় বাত ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ওখানে কাটিয়ে ফিরে যেতেন।

—তার মানে ঐ লোকটাই শর্মিলার সর্বশেষ বাবু? তাব কোনো হদিশ পাননি?

—না। আসতেন ট্যাক্সিতে, ফিবতেন সেই ট্যাক্সিতেই।

—মানে কণ্ট্রাক্টে ভাড়া করা গাড়ি। তা সেই ট্যাক্সির খোঁজ কবেছিলেন?

—করব না মানে? এব জন্যে স্পেশাল আই বি. পর্যন্ত ডেপুট কবা হয়েছিল। কিন্তু কোনো খোঁজই নেই। আসলে কে আব সাধ কবে খুনের কেসে জড়াতে চায়?

—ফ্ল্যাটের অন্যান্য বাসিন্দাদের মনোভাব কি ছিল, মানে শর্মিলা সম্বন্ধে?

—মুখ কেউই খুলতে চায়নি। আসলে ফ্ল্যাট বাড়ির যা হয়। একই ছাদের তলায় থেকেও কেউ কারো খবরে উৎসাহী হয় না। অবশ্য একজনের মুখে শোনা গেল শর্মিলা নাকি খুব দেমাকি ছিল কাবো সঙ্গে তেমন মেলামেশা কবতো না। সর্বদাই একটা দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করতো। ফলে কেউই আর তার সম্বন্ধে খোঁজ রাখতো না।

—হুঁ, বলে নীল বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। তারপর এক সময় ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কবল, —সেদিন খুনটা হয়েছিল কখন? মানে পি এম রিপোর্ট কী বলে?

—বিকেল পাঁচটা থেকে রাত আটটার মধ্যে যে কোনো সময়েই হতে পারে।

— সেদিন ঐ সময়ে শর্মিলাব ঘরে কে গিয়েছিল? কেয়াবটেকার কিছু জানে?

—না। কারণ সারাদিনই বৃষ্টি পড়ছিল। আর কার ঘরে কে আসছে বা যাচ্ছে তার খোঁজ রাখার কথা তার নয়। মানে এটাই ছিল তার বক্তব্য।

—শর্মিলার বডি রিলিজ করতে কেউ এসেছিল?

—না। বাকি কাজটা পুলিসই করে।

—ওর ঘর থেকেই ওর সেই বাবুটির কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি? মানে কোনো সূত্র টুত্র?

— সাধারণত যারা রক্ষিতা রাখে, তাদের বেশির ভাগ লোকেরই একটা সংসার থাকে। এবং স্বাভাবিক কারণেই রক্ষিতার কথা সে বাড়িতে গোপন রাখতেই চাইবে। ন্যাচারাল্যি সে তার রক্ষিতার ঘরে নিজের কোনো আইডেন্টিটি রাখবে না বা রাখতে চাইবে না। এ ক্ষেত্রেও ছিল না। অবশ্য বেডরুমে প্রচুর ফোঁটা ফোঁটা জল জমেছিল। মানে বাইরে থেকে সেই সন্ধ্যায় নিশ্চয়ই কেউ এসেছিল।

—অর্থাৎ সব দিক থেকেই রাস্তা বন্ধ করে রেখেছেন। স্বামী নামক ব্যক্তিটির সন্ধান নেই। নাগরটিও বেমালুম নিপাত্তা। ট্যাক্সিওয়ালাটাকেও পেলে কাজে দিত। সেও চুপচাপ। খুনের মোটিভ কিছু পেয়েছিলেন?

—সাধারণত এসব ক্ষেত্রে যা হয়, দু'নাগরে বিবাদ, নয়তো মক্ষীরানী, নয়তো তহবিল তছরুপ। তা বাক্স পেটরা ভাঙা হয়নি। আলমারিতে চাবি দেওয়াই ছিল। আর মোটামুটি টাকা পয়সা গয়নাগাটি ঠিক ছিল। মনে হয় ঠিকই ছিল। পাশবুকটাও পাওয়া গিয়েছিল। ব্যাঙ্কে হাজার বিশেক টাকা পড়েছিল।

—অর্থাৎ মোটিভটাও ধোঁয়াটে।

—কী মনে হয় ব্যানার্জি? এ কেস কোনোদিনও সলভ্ হবে? আমার তো মনে হয় এর থেকে সহজ হবে মহেঞ্জোদাড়োর মাটি খুঁড়ে কিছু আবিষ্কার করা।

নীল কিছু না বলে চোখ বুঝে বসে রইল। খানিকক্ষণ উশখুশ করে বিকাশ বললেন,—আমি জানি, এ কেস কোনো দিনও মীমাংসায় আসবে না। পৃথিবীতে বহু খুনের কেস আনসলভড রয়ে গেছে। এটাও তাই হবে। কারো কিছু এসেও যাবে না। যদ্দুর মনে হয় এই বারবনিতার জন্য কাঁদার বা দুঃখ করার তেমন কোনো লোক নেই। থাকলেও তাদের তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু একজন পুলিস অফিসার হিসেবে আমার দুঃখ রয়ে গেছে। চেষ্টা করেও আমি পারিনি। একটা জায়গায় গিয়ে থেমে যেতে হয়েছে। তারপর বদলি। এখন সবই ধামাচাপা। আমার ডায়েরিতে অবশ্য লিখে রেখেছি, 'অ্যান আনসলভড কেস।'

সে রাত্রে আর কোনো কথা হল না। এক সময় বিকাশ চলে গেলেন। নীল অনেকক্ষণ নির্জীবের মতো সোফায় বসে কাটিয়ে দিল।

সবুজ রঙের চকচকে মারুতির পিছনের সিটে বসে থাকা লোকটাকে দেখে চমকে উঠল সোহনলাল। হ্যাঁ, এইতো সেই। দেড় বছর হল এই লোকটাকেই সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। লাইটপোস্টের নিওন আলোটা সরাসরি এসে পড়েছে গাড়ির ওপরে। গাড়ির ভেতরেও যে আলো ছিটকে পড়ছে তাতে লোকটাকে চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না সোহনলালের। সেই টকটকে রঙ। উদ্ধত কপাল। তীক্ষ্ণ নাক। পাতলা ঠোঁট আর দৃঢ় চিবুক। এই দেড় বছরে একটুও পাল্টায়নি। কোঁচকানো ব্যাকব্রাশ করা চুল। দেড় বছর আগে এই লোকটাকে সে অনেক, অনেকবার দেখেছে। কখনও কাছ থেকে, কখনও দূর থেকে। অবশ্য লোকটা তাকে চেনে না। সেও তার পরিচয় জানে না। জানার কোনো দরকারও সেদিন ছিল না। তার দরকার ছিল টাকার। মাসের মধ্যে দু'তিনবার বা অন্য কোনো দরকারের সময় গিয়ে হাজির হতো পার্ক স্ট্রিটের সেই ফ্ল্যাটে। যে ফ্ল্যাটে থাকত শর্মিলা প্যাটেল, তার বিয়ে করা বউ। আসল নাম রমা প্যাটেল। শর্মিলা ওর পোশাকি নাম।

বউ টউ নিয়ে তেমন কোনো মাথাব্যথা তার কোনো দিনও ছিল না। বউ মানে একটা মেয়েছেলের

শরীর। পকেটে পয়সা টয়সা থাকলে অমন শরীর অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু যেটা পাওয়া যায় না ইচ্ছেমত, সেটা হল টাকা। আর সেই টাকা রোজগারের সুযোগটা এসে গিয়েছিল হাতের মুঠোয়। শর্মিলা ছিল তার মুঠো মুঠো টাকা কামানোর কামধেনু।

সোহনলালের মনে হয় অমন একটা ডাকসাইটে সুন্দরী বউ থাকলে টাকা কামানোর অভাব হয় না। মিষ্টি ফুলের চারপাশে যেমন মৌমাছিরা ভিড় করে, ঠিক তেমনি তার বউটার পাশে শহরের আচ্ছা আচ্ছা তালেবর ধনীরা ভিড় জমাতো। সে নিজেই এগিয়ে দিত শর্মিলাকে ওদের কাছে। যদিও প্রথম প্রথম শর্মিলা অনেক আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু টাকায় বোধহয় সব সহ্য হয়ে যায়। শর্মিলারও হয়েছিল

সোহনলাল মনে মনে বিড়বিড় করল। এই লোকটাই, হ্যাঁ এই লোকটাই ছিল শর্মিলার বাঁধা বাবু

কিসের যেন একটা মিছিল-টিছিল বেরিয়েছে। গাড়িগুলো জ্যামে আটকে গেছে। সবুজ মারুতি আটকেছে। আর আটকেছে বলেই দেড় বছর ধরে খুঁজতে থাকা লোকটাকে, এখন এই টলায়মান মস্তিষ্কে খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না সোহনলালের।

শর্মিলার মুখেই শোনা ছিল, লোকটার নাকি দেদার টাকা। মস্তবড় একটা কোম্পানির মালিক। তা হোক। যত মালদার পার্টি আসে ততই সোহনলালের মোচ্ছব। তার দরকার টাকার। বিনা পরিশ্রমে চাই টাকা। আর টাকা না পেলে তার স্ফূর্তি জমবে কেমন করে? নিত্য নেশার জোগান, সেও তো টাকার বদলেই।

দিন চলছিল এমনি করেই। কিন্তু চলল না। দেড় বছর আগের এক বীভৎস বৃষ্টি ঝরা রাতে সব শেষ হয়ে গেল। রমা মানে শর্মিলা খুন হল। তার সুখের সিন্দুক যেন এক নিমেষে কেউ লুঠ করে নিয়ে গেল। সেই রাতটার কথা আজও মনে আছে।

সারাদিন ধরেই বৃষ্টি পড়ছিল। শেষ বিকেলে নামল আরো জোরে। জুয়োর আড্ডা থেকে যখন সে উঠে এল দেখল ঘড়িতে বাজে রাত প্রায় সাড়ে সাতটা। আর পকেটও কপর্দকহীন। ঠিক সেই মুহূর্তে টাকা না হলে চলবে না। টাকা না হলে এমন বৃষ্টিঝরা রাতটাই মাটি! পেটে দু'পাত্তর না পড়লে জগৎ সংসার ম্যাড়মেড়ে। ভিজে জবজবে অবস্থায় যখন সে ফ্ল্যাটবাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল, তখন বৃষ্টির তোড় আরো বেড়েছে। মেঘলা রাতের মোষ-কালো অন্ধকার আর বৃষ্টির ঝাপটায় ফ্ল্যাটবাড়ির সামনেটা কেমন যেন রহস্যময় দেখাচ্ছিল। সবটাই আবছা আবছা। ঠিক তখনই ওর মনে হয়েছিল; কে যেন একটা লোক ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তারপর কোনো দিকে না তাকিয়েই ছুটে গেল রাস্তার অপর ফুটে দাঁড়ানো একটা ট্যাক্সির সামনে। সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্সির দরজা খুলে গেল। লোকটা ভেতরে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্সি স্টার্ট নিল। তারপর নিমেষে উধাও।

ঘটনাটা ঘটতে পুরো দেড় মিনিটও লাগেনি। কেমন যেন ধন্দে পড়েছিল সোহনলাল। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে লোকটা ভিজতে ভিজতে বেরিয়ে এল। এসেই ট্যাক্সি পেয়ে গেল! তারপরই ট্যাক্সি প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল। কে জানে, লোকটা পাগল না অন্য কোনো মতলবে এসেছিল? এদিকে সেও ভিজছিল। আর ফালতু কিছু অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিও তার ছিল না। কে কার ঝাড়ের বাঁশ কাটছে তার কি দরকার? যে দরকারে তার আসা সেটা হলেই হল।

মুখের ওপর ঝরে পড়া বৃষ্টির জল সরাতে সরাতে সে যেই ম্যানসানটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তখনই আরো একটা কাণ্ড ঘটল। প্রায় মাঝবয়েসী একটা লোক, উদ্‌ভ্রান্তের মত সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একেবারে তার মুখোমুখি। ভালো করে কিছু ঠাহর করার আগেই প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়ে লোকটা উন্মত্তের মতো ছুটে বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তায় নেমে গেল। সোহনলালের অশক্ত শরীর সে বেগ সহ্য না করে মাটিতে পড়ে গেল। 'শালে বাইনচোত' বলতে বলতে সোহনলাল যখন উঠে দাঁড়াল লোকটা তখন দৃষ্টির বাইরে।

সোহনলাল আরো একবার পুরনো শব্দটা উচ্চারণ করে মনের সাধ মিটিয়ে প্রায় অস্থির পদক্ষেপে

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেল।

বারো নম্বর ঘরের সামনে গিয়ে সে বেল টিপল। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ পেলো না। মনে মনে তখন সে হেসেছিল। রমা প্যাটেল এখন বাবু নিয়ে ব্যস্ত। ডাকলেই কি আর সাড়া পাওয়া যায়? মিনিট তিনেক কয়েক অপেক্ষা করে আবার বেল টিপল। না কোনো সাড়া নেই। এরপর অনেকক্ষণ ধরে বেলে হাত টিপে দাঁড়িয়ে রইল। আশ্চর্য, কেউ কিন্তু দরজা খোলার জন্যে এগিয়ে এল না। তবে কি রমা ঘুমিয়ে পড়েছে? কিন্তু, তাই বা কেমন করে হয়? এখন তো সবে সাড়ে সাতটা। রমার এখন সন্ধ্যেই হয়নি। বাঁধা বাবুটি যদি এসে থাকে তাহলে অন্তত সাড়ে ন'টার আগে সে ফ্ল্যাট ছেড়ে যাবে না। বাবুটি এ ব্যাপারে বেশ স্যায়না। নির্দিষ্ট সময়ের পর আর কিছুতেই সে রক্ষিতার ঘরে থাকবে না। রমার মুখেই শোনা, রাতে বাবুকে বাড়ি ফিরতেই হবে। নইলে ঘরের জেনানাটির কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে।

আরো বেশ কয়েকবার বেল টেপার পর, কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে সে নেমে এল নিচে। কেয়ারটেকারের কাছে। সে বেটা তখন ঘরের মধ্যে জমিয়ে বসেছে বোতল নিয়ে। বেশ বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতেই সোহনলাল তাকে সব খুলে বলল। আরো বলল, অনেকক্ষণ বেল টিপেও বারো নম্বরে কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছে না।

লোকটা যেতে চাইছিল না। অনেক কাকুতির পর লোকটাকে নিয়ে ও বারো নম্বরে হাজির হল। বহু ধাক্কাধাক্কির পরও যখন কোনো সাড়াশব্দ মিলল না, তখন বাধ্য হয়েই, তাকে মাস্টার-কি দিয়ে দরজা খুলতে হোল। আর তারপরেই আবিষ্কৃত হোল রমা প্যাটেল ওরফে শর্মিলা প্যাটেলের মৃতদেহ। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে ওয়াড্রোবের পাশে।

সেই মুহূর্তেই সোহনলালের চোখের সামনে দুলে উঠেছিল সারা পৃথিবী। না, রমা প্যাটেলের জন্যে তার কোনো শোকটোক ছিল না। মায়া মমতা ঈর্ষা কোনো কিছুই না। তার তখন কেবল একটা কথাই মনে হয়েছিল, তার সোনায় ভরা সিন্দুকটা কে যেন লুঠ করে নিয়ে গেছে।

পুলিস টুলিস আসার আগেই সোহনলাল পালিয়েছিল। পুলিসের হ্যাপায় পড়তে তার বিন্দুবিসর্গ ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তার মনে বিদ্যুতের চমকের মতো একটি ঝিলিক মাথার মধ্যে খেলে গিয়েছিল; রমা প্যাটেল খুন হয়েছে। এবং পরপর দুটি লোক দ্রুতবেগে, মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই পালিয়েছে। লোক দুটির একজন কে হতে পারে তা সে নিমেষেই বুঝে নিয়েছিল। রমার সেই শাঁসালো বাবুটি। কিন্তু আর একজন কে? রমার অন্য কোন বাবু? কে জানে!

তারপর দেড় বছর কেটে গেছে। দেড় বছর সে খুঁজছে রমার সেই বাবুটিকে, যাকে সে আগে অনেকবারই দেখেছে। এই সেই লোক। এখন নিশ্চিন্ত আরামে মারুতির মধ্যে বসে আছে। ঐ লোকটার মুখ দেখলে এখন কিছুতেই বোঝা যাবে না, দেড় বছর আগের এক সন্ধ্যায় সে তার রক্ষিতাকে খুন করেছিল।

অথচ এই দেড় বছরে, সোহনলাল ক্রমাগত দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। রমা প্যাটেলের মৃত্যুর পর তার অবস্থা হয়েছে আরো করুণ। আরো নিশ্চল। রমা প্যাটেলের টাকা পয়সা, গয়নাগাটি, কোনো কিছুই সে হাতাতে পারেনি। সে রাতে কেয়ারটেকার না থাকলে অবশ্য টাকা গয়না যা তার আলমারিতে ছিল, সবই নিয়ে সরে পড়তে পারতো। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কারণ ফ্ল্যাটের চাবি তার কাছে থাকতো না। থানায় গিয়ে সে নিজেকে রমার স্বামী বলে পরিচয় দিতে পারেনি। পুলিসি ঝামেলায় পড়তে সে কোনোদিনও উৎসাহী নয়।

এখন এই বাংলা মদের চুরচুরে অবস্থায়, জীর্ণ দেহ, শীর্ণবাস, টলায়মান নিজেকে দেখতে দেখতে এক অজানিত পুলকে শিহরিত হয়ে উঠল সোহনলাল। পেয়েছে। দেড় বছর আগের পলাতক খুনির দেখা সে পেয়েছে।

হঠাৎ উত্তেজনায় সোহনের নেশার মেজাজ বোধহয় কিছুটা ফিকে হয়েছিল। চিরদিন পরের মাথায় হাত বুলিয়ে, অথবা নিজের স্ত্রীকে পাপপথে নামিয়ে, কোনো কাজকর্ম না করে আরামে দিন কাটানোই তার জীবনদর্শন। আর সেই জীবনদর্শনের মধ্যেই সহসা সোহন খুঁজে পেল একটি লোভনীয় ইঙ্গিত। আজ যখন সে বাবুটিকে পেয়েছে হাতের নাগালে, তখন এ নাগাল ছিঁড়ে কিছুতেই সে তাকে পালাতে দেবে না। এ যে সোনার খনি। একে কী হাতছাড়া করা যায়? এর জন্যেই তো জীবনের সব সুখের ঠিকানা হারিয়ে গিয়েছিল। এখন সেই ঠিকানা তাকে ফিরে পেতেই হবে।

ঘোষ কেমিক্যালসের ওয়ার্কিং পার্টনার ও ডিরেক্টর রামানন্দ বসুর ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে কিছু কানাঘুষো শোনা গেলেও তিনি কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্রে ছিলেন প্রচণ্ড রকমের নিয়মশৃঙ্খলা মানা লোক। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় তাঁর চলার অভ্যেস। ব্যবসা বা অফিসসংক্রান্ত ব্যাপারে পান থেকে চুন খসা তিনি পছন্দ করেন না। ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে অফিসে এসে নিজের চেম্বারে ঢোকেন। কর্মচারীদের উপস্থিতির ব্যাপারেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি। হাজিরার খাতাটা থাকে তাঁর নিজের ঘরেই। নিজের চেয়ারে বসে প্রথমেই তিনি টেনে নেবেন হাজিরার খাতাখানা। কোনোরকম লাল কালির আঁচড় টানতে দেবার পক্ষপাতী তিনি নন। কেবল তিনি চোখ বুলিয়ে দেখে নেবেন সবাই ঠিকমত এসেছেন কিনা। কোনো কর্মচারী যদি পরপর তিনদিন দেরিতে অফিসে আসে, মুখে তিনি তাকে কিছুই বলবেন না। কেবল তাকিয়ে থাকবেন তার দিকে, যতক্ষণ না সে সই শেষ করে নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। তারপর, একই ব্যক্তি তিনদিন পরপর লেট হলেই রামানন্দ বসুর সই করা, কেন দেরি হচ্ছে তার জবাব চাওয়া চিঠি যাবে। চিঠির উত্তর সন্তোষজনক না হলেই কোম্পানির তরফ থেকে ফরমান জারি হবে। এই ধরনের ঘটনা পুনরায় ঘটলে তার ইনক্রিমেন্টের ব্যাপারে কোম্পানি নতুন করে ভাবতে শুরু করবে।

ঘোষ কেমিক্যালসের বেতন খুবই চড়া। অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও প্রচুর। বলতে গেলে আজকের দিনে এত ভাল মাইনে খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যায়। বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টের হারও খুব ভাল। অতএব কেই বা চাইবে বছর শেষে নিজের আখেরের ক্ষতি।

রামানন্দ কিন্তু সত্যিই কাজে গাফিলতি পছন্দ করেন না। কোনোদিনও করতেন না। আর সেই জন্যেই ঘোষ কেমিক্যালসের একজন সাধারণ কর্মচারী থেকে নিজের দক্ষতা আর সততায় হয়েছিলেন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তারপর ধাপে ধাপে উঠে এসেছেন ওপরে। হয়েছেন কোম্পানির ডিরেক্টর এবং ওয়ার্কিং পার্টনার।

অবশ্য ওয়ার্কিং পার্টনার হবার পিছনে অন্য ইতিহাস। এ ইতিহাস সবাই জানে। বিশেষ করে যাঁরা একদিন তাঁর সহকর্মী ছিলেন এবং আজ সময়ের ফেরে তাঁরা তাঁর অধস্তন কর্মচারী মাত্র।

এ কাহিনীতে রামানন্দের ভূমিকা অনেকখানি। তাই তাঁর অতীত ইতিহাস আমাদের জানা দরকার।

রামানন্দ যেদিন প্রথম ঘোষ কেমিক্যালসে আসেন তখন তাঁর বয়েস নিতান্তই অল্প। সবেমাত্র বি এস-সি পাশ করেছেন। পড়ার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আর বেশিদূর তখন এগুনো সম্ভব হয়নি। সেই মুহূর্তে তাঁর চাকরির বড় দরকার ছিল। যদিও সংসারে তাঁর তখন বন্ধন একমাত্র বুড়ি মা। কিন্তু সামান্য কিছু টিউশনি করে নিজের লেখাপড়া, অসুস্থ মায়ের চিকিৎসা এবং সংসার খরচ, কোনো মতেই সম্ভব হচ্ছিল না। বাধ্য হয়েই চাকরির চেষ্টা শুরু করতে হয়েছিল।

অবশ্য বেশিদিন ঘোরাঘুরি করতে হয়নি। খানকতক আবেদনপত্র পাঠাবার পরই ডাক এসেছিল ঘোষ কেমিক্যালস থেকে।

রামানন্দ লোকটি ছিলেন অতীব সুদর্শন এবং সুপুরুষ। তদুপরি মোটামুটি শিক্ষিত। ঘোষ কেমিক্যালসের মালিক ভবেশ ঘোষ প্রথম দর্শনেই রামানন্দর প্রতি মনোযোগী হয়েছিলেন। তারপর মোটামুটি পরীক্ষা করার পর তিনি রামানন্দকে ভাল মাইনে দিয়েই বহাল করেছিলেন।

প্রথম দর্শনের পর এসেছিল গুণের বিচার। আগেই বলেছি, রামানন্দ ছিলেন সৎ এবং কর্তব্যপরায়ণ। ফাঁকি জিনিসটা তাঁর চরিত্রেই ছিল না। নির্বিবাদী, কর্তব্যপরায়ণ রামানন্দ খুব অল্পদিনের মধ্যেই ভবেশের

স্বভাবে চলে আসেন। ফলে তাঁর পদোন্নতি তো ঘটলই, ক্রমশ তিনি ভবেশের দক্ষিণহস্ত হয়ে উঠলেন।

রামানন্দের উন্নতিতে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে ঈর্ষার ভাব দেখা দিলেও, কারো কিছু করার ছিল না। কারণ রামানন্দের ততদিনে কেবল অফিস নয়, ভবেশের বাড়িতেও যাতায়াত শুরু হয়ে গেছে। প্রায় প্রতিদিনই অফিসের কাজকর্ম মিটলে রামানন্দ ভবেশের সঙ্গে একই গাড়িতে ফিরতেন। যেতেন ভবেশের বাড়ি।

যদিও জল্পনা কল্পনার শেষ ছিল না। কিন্তু প্রবীণ কর্মচারীরা মোটামুটি যে ব্যাপারটি আঁচ করে মুখরোচক গল্পের বুনন শুরু করেছিলেন, অচিরেই সেটাই সত্য হয়ে উঠল। এবং এ নিয়ে বেশ কিছুদিন রামানন্দর অসাক্ষাতেও রসাল কাহিনী পরিবেশিত হয়ে চলল।

শিবানী ঘোষ। ভবেশ ঘোষের কন্যা। কিন্তু এই ধনী তনয়াটিকে নিয়ে ভবেশের চিন্তার অন্ত ছিল না। ভবেশ ঘোষের যা অর্থ ছিল তা দিয়ে শিবানীর কয়েক পুরুষ বসে খাবার কথা। কিন্তু অর্থই তো সব নয়। যদিও শিবানী শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, ভবেশের অবর্তমানে ঘোষ কেমিক্যালস্ চালাবার মতো মানসিকতা এবং শিক্ষাদীক্ষা তার আছে। তবুও শিবানীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভবেশ ছিলেন অতিমাত্রায় শঙ্কাতুর। কারণটি ফেলে দিবার মত নয়।

শিবানী তখন পূর্ণ যুবতী। কিন্তু কোনো পুরুষকে মুগ্ধ করার মতো কিছুই ছিল না তার। বড়লোকের গালগাল সন্তান। গায়ের রঙ ধবধবে সাদা। মাথায় অজস্র চুল। মুখটিও নেহাৎ খারাপ নয়। কিন্তু শরীরের চর্বি তরঙ্গ তাকে ক্রমাগত এমন জায়গায় এনে ফেলেছিল, যা অকল্পনীয়। লোকে সাক্ষাতে কিছু বলার সাহস পেতো না। কারণ ভবেশ ঘোষ ধনী। শিবানী ঘোষ তাঁর একমাত্র কন্যা। পরবর্তী মালিকিন। কিন্তু ভবেশের আড়ালে শিবানীর নামকরণ হয়েছিল শ্বেতহস্তিনী। হয়তো কোনোদিন শিবানীর মুখে কোনো কারুমিতির ছাপ ছিল, কিন্তু অস্বাভাবিক মেদবৃদ্ধি তার মুখের সব সৌন্দর্য কেড়ে নিয়ে তাকে একটি বিশালাকার ফুটবলে রূপান্তরিত করেছিল।

ভবেশ যেদিন প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন রামানন্দ সেদিন রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। ভবেশের খাতির, যত্ন, আতিথেয়তা এবং অতি স্নেহপ্রবণতার অন্তর্নিহিত কারণটি সেদিন রামানন্দের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি। বুঝতে অসুবিধা হয়নি কেন সমযোগ্যতা সম্পন্ন অন্য প্রার্থীদের নাকচ করে ভবেশ তাঁকে নিয়োগপত্র দিয়েছিলেন। বুঝতে অসুবিধা হয়নি কেন তাঁর দিন দিন কর্মোন্নতি, কেন তাঁর মাহিনা আর সবার থেকে অনেক বেশি। কেন অতি অল্পদিনের মধ্যেই সামান্য কর্মচারী থেকে ম্যানেজারের পদে এসে দাঁড়িয়েছেন।

সব বুঝেও রামানন্দ মুখে রা কাড়েননি। তাঁর সামনে তখন দুটো রাস্তাই খোলা ছিল। হয় ভবেশের ইচ্ছেকে সম্মান দেওয়া নয়তো এমন সুখের চাকরিতে ইস্তফা টানা। এবং চাকরি ছাড়ার অর্থ আবার সেই পুরনো দিনকে ফিরিয়ে আনা।

রামানন্দ অবশ্য নিজে থেকে কিছুই করলেন না। কারণ কোনো ব্যাপারেই রামানন্দ কোনো প্রতিবাদ জানাতেন না। ভবেশও সেটা বুঝতেন। তারপর একদিন সরাসরি শিবানীকে বিয়ে করার প্রস্তাব রাখলেন।

এবারও রামানন্দর কোনো প্রতিবাদ নেই। কারণ রামানন্দ জানতেন শিবানীকে বিয়ে করলে তাঁর জীবনের একটা দিক যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে, ঠিক তেমনি অন্য আরেক দিক খুলে যাবে। শিবানী ভবেশের একমাত্র ওয়ারিশন। অতএব একদিন ঘোষ কেমিক্যালসের পরবর্তী মালিক হবেন রামানন্দ বসু।

খুব ধুমধাম করেই বিয়েটা হয়েছিল।

কিন্তু বিয়ের পরই রামানন্দের ভুল ভাঙল। শ্বেতহস্তিনীকে যতটা নিরেট বলে তিনি ভেবেছিলেন শিবানী কিন্তু তা নয়। প্রথম চমক লাগল বিয়ের রাতে।

সাধারণত বিয়ের রাতে নববধূকে লজ্জাবনত অবস্থায় পাওয়া যায়। রামানন্দও তাই আশা করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াল অন্যরকম।

রামানন্দ তখন ঘরের একদিকে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছেন আর মনে মনে ভাবছেন কীভাবে কথাবার্তা শুরু করা যাবে। ঠিক তখনই শিবানীকে বলতে শোনা গেল,—তোমার আর কী কী নেশা আছে?

মুখের ধোঁয়াটুকু ছেড়ে দিয়ে রামানন্দ খানিকটা হকচকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—আর কী কী নেশা মানে?

—পুরুষমানুষের নানারকম নেশা থাকে। অবশ্য একটু আধটু নেশা না করলে পুরুষদের ঠিক মানায় না। তা তোমার নেশাগুলো আমার জানা দরকার। না, লজ্জা পাবার কিছু নেই। বিব্রত হওয়ারও দরকার নেই। লুকনো-টুকনো আমি মোটেও পছন্দ করি না।

রামানন্দ, তখন শুকনো আমসি। যদিও তাঁর স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। তবে মাকে আজীবন দেখেছেন। কোনো মানুষের সঙ্গেই তাঁকে এভাবে কাটা কাটা কথা বলতে শোনেননি তাছাড়া কোনো মহিলা যে বিয়ের রাতে এভাবে প্রথম বাক্যালাপ শুরু করতে পাবেন এমন ধারণাও তাঁর ছিল না।

আমতা আমতা করে বলেছিলেন,—ব্যস, এটুকুই। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি থাকে।

—না আপত্তি নেই। মদেও আপত্তি নেই যদি না সেটা সীমা ছাড়িয়ে যায়।

—আমি মদ খাই না।

—হুঁ, বাপির মুখে শুনেছি। ঠিক আছে, তুমি আজ টায়ার্ড। সকাল থেকে অনেক খাটুনি গেছে সন্ধে থেকে অনেক লোকজনকেও অ্যাটেন্ড করতে হয়েছে। তুমি এই খাটটায় শুয়ে পড়। আমি, একটা রাত ঐ ইজি-চেয়ারে কাটিয়ে দিতে পারব।

সত্যিই সত্যিই যখন শিবানী ইজি-চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেল, তখন রামানন্দর বিস্ময় যেন ফেটে পড়তে চাইছিল। কয়েক সেকেন্ড নীরবে শিবানীর দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি বলেছিলেন,—তোমার এ কথাটার মানে ঠিক বুঝলাম না।

যদিও শিবানীর মুখে অভিব্যক্তির রেখা প্রায় অদৃশ্য, তবুও তার চোখের কোণে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গের ঝিলিক খেলে গিয়েছিল। কণ্ঠেও সেই সুর। সে বলেছিল, —এই সামান্য কথাটার মানে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে এমন অশিক্ষিত নির্বোধ তোমায় আমি ভাবতে চাইছি না।

সামান্য চাপা এবং ক্ষুব্ধস্বরে রামানন্দ বলেছিলেন,—আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না।

শিবানীর ঠোঁটের কোণে প্রচ্ছন্ন হাসি। যদিও তা তেমন কিছু ধরা পড়ার মতো নয়। হাসিটুকু অদৃশ্য করে সে বলেছিল,—কোনো ছেলে আমাকে শয্যাসঙ্গিনী করার জন্যে বিয়ে করবে এমন কথা আমি জ্ঞানত ভাবি না। তোমার কাছ থেকেও সে আশা আমি করি না। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, তুমি আমার কুমারী নামটা ঘুচিয়েছ।

—এসব তুমি কী বলছ শিবানী?

—মাসিক কত টাকা হলে তোমার চলে যাবে?

বেশ আহত স্বরেই রামানন্দ বলেছিলেন,—অফিস থেকে যা মাইনে পাই আমার তাতেই চলে যায় কারণ আমার কোনো বদ সঙ্গ নেই, বদ নেশাও নেই।

—শুনে সুখী হলাম। তবে তোমায় একটা কথা বলে রাখা ভাল। এবং সেটা আজই। আমি বেশি কথা বলতে ভালবাসি না। বলতে গেলে তোমার আমার প্রথম পরিচয় আজই। এর আগে যা হয়েছিল, সেটা সৌজন্য। আইনত তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী। এখন থেকে এটাই আমাদের সামাজিক পরিচয়। কেন এবং কী জন্য তোমার মতো একজন সুন্দর শিক্ষিত সুদর্শন মানুষ আমাকে বিয়ে করল, তা হয়তো আমি বুঝি।

— কী বোঝ?

—সেটাই বলছি। আমার বাবার অনেক টাকা। বাবার অবর্তমানে সেই সবকিছুর মালিক হব আমি। এবং আমার অবর্তমানে হবে তুমি।

বাধা দিতে চেয়েছিলেন রামানন্দ,—তুমি কিন্তু,

হাত তুলে রামানন্দকে থামিয়ে শিবানী বলেছিল,—আমার কথা কিন্তু শেষ হয়নি। তোমার মনোভাব তা পরে বোঝা যাবে। তবে প্রথমেই জানিয়ে রাখি, আমার বাবার উইল তৈরি কবাই ছিল। এবং সেটা আজ সকালেই সইসাবুদ সমেত রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে। তাতে স্পষ্ট লেখা আছে, এখন থেকে সব কিছুর মালিক আমি। আর আমার মৃত্যুর পর, সমস্ত ব্যবসা, টাকাকড়ি এবং অন্যান্য যাবতীয় চলে যাবে ট্রাস্টির হাতে। আমি আমার জীবদ্দশায় তা পাল্টাতে পারব না। আর আমার স্বামী হিসেবে তুমি আমার সবকিছুই ভোগ করতে পারবে, তবে তা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছানুসারেই। এবার তোমার কথা বলতে পার।

কিন্তু রামানন্দ কিছুই বলতে পারেননি। কেবল এটুকু বুঝেছিলেন, শিবানীব বাইরের চেহারাটাই রূপ, কিন্তু তার কাছে তিনি নিতান্তই নাবালক। তিনি বুঝতে পারছিলেন না, এমন কঠিন বরফের চাঁই নিয়ে সারাজীবন কেমন করে কাটাবেন? তিনি আরো বুঝেছিলেন তাঁর সংসারে তাঁর ভূমিকা নিতান্তই সামান্য। নিশ্চুপের মতো অনেকক্ষণ বিছানায় বসে ছিলেন। সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখলেন, আপাত কঠোর মেয়েটি কখন যেন তাঁর অতি সন্নিকটে এসে তাঁর একটি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলছে, —তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার তোমার স্বাধীনতায় আমি কোনদিনও হস্তক্ষেপ করব না। মরার আগে আমাব মা বলে গিয়েছিলেন, স্বামীকে ভালবাসতে। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। তোমাকে আমি ভালবাসব। তোমাকে আমার অদেয় কিছু থাকবে না। এবার তুমি ঘুমোও। অনেক রাত হল।

জোর করে রামানন্দকে সেদিন শিবানী বিছানায় শুইয়ে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল, যতক্ষণ না বামানন্দ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

শিবানী তার কথা রেখেছিল। কোনোদিনও তাঁর কোনো ইচ্ছায় সে বাধা দেয়নি। যখনই তাঁর যা প্রয়োজন হয়েছে তিনি পেয়ে গেছেন। ইচ্ছেমত টাকা তুলেছেন, ঘুণাক্ষরেও কাউকেই তাব জন্যে কোনো কৈফিয়ত দিতে হয়নি। তবে তিনি বেশ ভালভাবেই জানতেন, প্রচ্ছন্নে থেকেও শিবানী তাঁর সব হিসেবই রাখেন।

এরপর ভবেশ গত হয়েছেন। গত হয়েছেন রামানন্দর মা। পাকাপাকি ভাবে শিবানীব বাড়িতেই তিনি চলে এসেছিলেন। ভবেশের সমস্ত ব্যবসার ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর শৃঙ্খলিত ব্যবস্থায় ব্যবসাও ফুলেফেঁপে উঠছিল।

অতি দারিদ্রাবস্থা থেকে রামানন্দ জীবন শুরু করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল রাশি রাশি অর্থেব। পেয়েওছিলেন। ব্যবসা বাড়ানোর নেশা তাঁকে করে তুলেছিল, কর্তব্যনিষ্ঠ। কঠোর হাতে তিনি ওয়ার্কিং পার্টনারের ভূমিকাটুকু পালন করে যাচ্ছিলেন।

ব্যবসার খাতিরে মাঝে মাঝে তাঁকে অন্যত্র যেতে হত। অথবা কখনো কখনো অনেক রাত করে, পার্টি শেষ করে বাড়ি ফিরতে হোত। মদ্যপানও করতে হত। কোনো কোনোদিন হয়তো নেশাটা একটু বেশিই করে ফেলতেন। যখন বাড়ি ঢুকছেন, তখন পা টলছে, মাথার অবস্থা টালমাটাল, কিন্তু আধো চেতনার মধ্যে বুঝতে পারতেন একটি কোমল নারী হস্ত তাঁকে বেশ যত্ন করেই বিছানায় শুইয়ে দিচ্ছে। এইটুকুই। তারপর কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়তেন।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে মনে পড়ে যেতো গত রাতের কথা। লজ্জায় এবং সঙ্কোচে তিনি শিবানীর দিকে তাকাতেই পারতেন না। কিন্তু যার জন্যে এত কুণ্ঠা তার দিক থেকে কি কোন প্রতিক্রিয়া থাকতো না। সে তখন টোস্টের ওপর মাখন লাগাচ্ছে। অথবা এগিয়ে দিচ্ছে এগ পোচের ডিশখানা।

মাঝে মাঝে রামানন্দর বেশ আশ্চর্য লাগতো। নিজের স্ত্রীকে তিনি বোঝার চেষ্টা করতেন। শিবানীকে ঠিক কোন পর্যায়ের মহিলা বলা যায়? মুখে তার কোন প্রতিবাদ নেই। নেই কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কিন্তু অদ্ভুত এক নীরব শাসন আছে। প্রশ্রয় আছে। আছে মমতাময়ী হাতের স্পর্শ। তার দৃষ্টি এড়িয়ে কিছু হবার উপায় নেই। তার দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে কিছু করাও যেতো না। বরাবরই একটা ব্যাপার

তিনি লক্ষ্য কবেছেন, যতই কেন শিবানীকে লুকিয়ে কিছু করতে গেছেন কখন যেন তা তার কাছে ফাঁস হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ভাবতেন এ মেয়েটার শরীরের মতো কী চোখের দৃষ্টিশক্তিটাও অনেক অনেক বেশি!

মদ্যপানের ব্যাপারে একদিন তিনি নিজে থেকেই কৈফিয়ত দিতে গিয়ে বোকা বনে গিয়েছিলাম। বলতে চেয়েছিলেন, কোন উপায় ছিল না, পাঁচজনের সাধাসাধিতে, অত্যন্ত দুঃখিত ...ইত্যাদি সব বায়নাক্কা।

শিবানীব মুখে হাসি বড় দুর্লভ। সেই দুর্লভতা নিয়েই শিবানী বলেছিল,—আমি জানি পুরুষ মানুষের একটু আধটু নেশা থাকে। যে পুরুষ সামান্য নেশা করে না তাকে বড় জোলো মনে হয়। চিন্তার কিছু নেই, তবে মাত্রাটা ধরে বাখাব চেষ্টা কব।

বলে কী এ মেয়ে? স্বামী নেশা করে বাড়ি ফিরলেও কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। নেই কোন ঝগড়াঝাটি নেই কোন অনুযোগ। তবে কী শিবানী তাকে ভালবাসে না? স্বাধীনতা মানে অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। কিন্তু সে ধারণাও পাল্টে গিয়েছিল। একদিন রামানন্দ বলেছিলেন,—শিবানী, তুমি তো সারাদিন বাড়িতেই থাক, আর আমায় থাকতে হয় বাইরে বাইরে। প্রায় দিনই এটা সেটা পার্টির ঝামেলা লেগেই থাকে। এক কাজ কর না, তুমিও আমার সঙ্গে পার্টিতে চল। অন্তত তুমি সামনে থাকলে নেশা-টেশাগুলো কম হয়।

কথা হচ্ছিল সন্ধেবেলা চায়ের টেবিলে বসে। চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে তার ভাবলেশহীন মুখ বেশ কিছুক্ষণ রামানন্দর দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপব নিজের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলেছিল,—পার্টিতে তোমার একটা সম্মানেব জায়গা আছে, তাই না?

—হ্যাঁ, তা তো থাকবেই। ঘোষ কেমিক্যালসের ডিরেক্টব বলে কথা। কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করছি। লোকে সমীহ তো কববেই।

স্থির দৃষ্টিতে রামানন্দর দিকে তাকিয়ে শিবানী বলেছিল,—সেই সম্মানটা নষ্ট করা কী উচিত?

—তার মানে?

—আমি তোমার সঙ্গে থাকলে, ঠিক কথা, সামনাসামনি কেউ কিছু বলবে না। বলতে সাহসও পাবে না। কিন্তু ভেবে দেখেছ কী, তোমাব আড়ালে আমার এই ভয়ংকর এবং কদাকার চেহারাটা নিয়ে কতটা হাসাহাসি হবে?

—তাতে কী এসে গেল?

—কিছু না। কেবল তোমাব মতো সুদর্শন মানুষ আমাকে বিয়ে কবার পিছনে তোমার যে অন্য মতলব আছে সে কথাটাও বেশ ফলাও করে মুখরোচক আলোচনা কবতে কেউ ছাড়বে না।

সামান্য সময়ের জন্যে রামানন্দ চুপ করে থাকেন। তারপব বলেন—আচ্ছা শিবানী, তোমাব কী মনে হয়, তোমাকে বিয়ে করেছি কেবলমাত্র তোমার টাকার জন্যেই?

আবার সেই জরদ্গাব মুখটি রামানন্দব দিকে ফিরে তাকায়। তারপর বলে,—একই কথা বাব বাব বলতে আমার ভাল লাগে না। পছন্দও করি না। আমার যা বলার বিয়ের রাতেই বলেছিলাম। তবু বলছি, আমাকে বিয়ে কবার পিছনে তোমার কী মানসিকতা ছিল তা নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই। কোন মাথাব্যথাও নেই। আমাকে তোমাব পাশে কোন পার্টি বা বোর্ড মিটিং বা কোন সামাজিক আসরে কোন দিনই পাবে না। এবাব অন্য প্রসঙ্গে কথা বল।

রামানন্দর কিছু বলার ছিল না। কারণ শিবানী যা বলছে, আক্ষরিক অর্থে তা ঠিকই। প্রসঙ্গ তিনি তোলার জন্যেই তুলেছিলেন। হয়তো বা স্ত্রীর মন রাখতে। কিন্তু সত্যিই কি তাঁর ভাল লাগতো, কোন পার্টিতে বা সামাজিক অনুষ্ঠানে শিবানীকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে? সমস্ত ব্যাপারটাই তাঁর কাছে ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াতো। তখন তিনি নিজেই গোপনীয়তার আশ্রয় নিতেন। লুকিয়ে চুকিয়ে অনুষ্ঠান সারতে যেতেন। তাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হত বোঝাপড়ার গণ্ডগোল। হত সাংসারিক অশান্তি। শিবানী এক অদ্ভুত ধাতুতে গড়া। নিজের শারীরিক বৈকল্যতে হয়তো সে মানসিক পীড়িত। তবু প্রখর বুদ্ধিসম্পন্না ঐ

মহিলার জাগতিক জ্ঞান প্রচুর। কোনটা বিসদৃশ এবং কোনটা হওয়া উচিত নয় এ বোধ তার অতি প্রবল।

রামানন্দও আর জেদাজেদি করতেন না। শিবানীও সব বুঝতো। বুঝতো রামানন্দর দুঃখটা। রামানন্দ টাকা পয়সা, গাড়ি বাড়ি, সামাজিক প্রতিপত্তি সব পেয়েছে। কিন্তু একটা জায়গায় তার নির্জনতা, তার অপ্রাপ্তি মারাত্মক। জীবনের একটা পরম প্রাপ্তি থেকে সে বঞ্চিত। শিবানী বেশ ভাল করেই জানে, রামানন্দর দাম্পত্য জীবন বিষময়। শিবানীর পক্ষে স্বামীর এই ন্যায্য চাওয়াটুকু মেটানোর ক্ষমতা নেই। তার ক্ষমতা থাকলেও রামানন্দর তাকে কোন মতেই ভাল লাগতে পারে না। জোর করে চাওয়া পাওয়ার ব্যাপারগুলো মেটাতে গেলে অবশিষ্ট যা থাকবে তা হবে রামানন্দর বিরক্তি, রামানন্দর অতৃপ্তি আর ঘৃণাবোধ। হ্যাঁ, এটাই সত্যি। কোন পুরুষের পক্ষেই তাকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তার দেহের কোথাও রমণীয় সৌন্দর্যের অবশিষ্ট নেই। যা আছে তা এক বিশাল ভয়ংকরত্ব।

শিবানীর আত্মসম্মান বোধ প্রখর। সে কারো বিতৃষ্ণার পাত্রী হতে রাজি নয়। বরং এই ভাল, একটি নিরাপদ দূরত্বে থেকে ভালবাসার পরশ ছড়িয়ে দেওয়া। শিবানী রামানন্দর অপ্রাপ্তির দুঃখটুকু বোঝে। তাই তার সামান্য ছোটোখাটো উপদ্রব সে সহ্য করে। মনে মনে ভাবে লোকটাকে তো কিছু নিয়ে থাকতে হবে। স্বামীর প্রতি তার সহানুভূতি বড় প্রবল। একদিন, স্বল্পবাক শিবানী স্বামীকে বলেছিল, আমি তোমায় জীবনের একটা বড় দিক থেকে বঞ্চিত করেছি তা ঠিক, তবে তোমার কেউ ক্ষতি করলে বা তার চেষ্টা করলে আমার দেওয়া শাস্তি তাকে পেতেই হবে। আমি থাকতে কেউ তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।

শিবানীর কথার মানে সেদিন রামানন্দর পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি। অবশ্য এই মেয়েটিকে রামানন্দ কোনোদিনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। বোঝার চেষ্টা ছেড়েও দিয়েছিলেন। জীবনের একটা দিককে অবহেলা করেই রামানন্দ মেতেছিলেন। ব্যবসার উত্থানপতনে।

তবু রামানন্দর জীবনে স্খলন এলো। আর সেটাই বুঝি স্বাভাবিক। তখন রামানন্দের বয়েস চল্লিশ ছুঁই ছুঁই।

গঙ্গার ধার ধরে হাঁটছিল শ্যামদুলাল। যদিও এটা তার বাড়ি ফেরার পথ নয়। তার বাড়ি শ্যামবাজার ছাড়িয়ে টালা পার্কের কাছে। সাধারণত, অফিস ছুটির পর সে বাড়িই ফিরে যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে কী যে তার হয় শ্যামদুলাল নিজেও তা ভালমতন বুঝতে পারে না। একটা অদ্ভুত রোগে সে মাঝে মাঝেই ভোগে। রোগটার বহিঃপ্রকাশ অন্য কারো চোখে পড়ার কথা নয়। যেমন সহজ স্বাভাবিক থাকার তেমনিই থাকে। কেউ কোন প্রশ্ন করলে তার উত্তরও পাওয়া যাবে। কোন অসংলগ্ন প্রতিক্রিয়াও থাকে না। কিন্তু শ্যামদুলাল কেবলমাত্র নিজেই বুঝতে পারে সেই অদ্ভুত রোগটা তাকে গ্রাস করেছে। রোগটা যে কবে থেকে আক্রমণ করতে শুরু করেছে তাও সে জানে না। রোগটার যে কী নাম সে জানতে পারেনি। মাঝে মাঝে শ্যামদুলাল ভেবেছে কোন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। কিন্তু যাব যাব করেও আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

রোগটার প্রকৃতি বড় অদ্ভুত। কিছুটা সময়ের জন্যে সব কিছু ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাওয়া। কিছুটা সময়ের জন্য একটা ঘোর। একটা অন্ধকার অবস্থা। পরিপূর্ণ প্রকৃতিস্থ থেকেও তার আগে-পরে কোন কিছুই মনে পড়ে না। সমস্ত জগৎ সংসার তখন কেমন যেন অপরিচিত মনে হয়। প্রতিদিনের দেখা জিনিসকেও কেমন যেন নতুন লাগে। অদ্ভুত একটা স্বপ্নের বিস্ময়কর চাঞ্চল্য। মাথার মধ্যে ভার। ঘোর লাগা চোখ দুটো জ্বালা করতে থাকে। অনুভূতিতে প্রচণ্ড ছটফটানি। ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনে হয় সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতে। রাগের অনুভূতিটা যখন চরমে ওঠে তারপরই হয়ে যায় সব কিছু অন্ধকার। নিঃসীম অন্ধকার। তারপর তার সমস্ত চেতনা যেন লুপ্ত হয়ে যায়। আবার আলোর জগতে ফিরে এলে, সব কিছু সহজ হয়ে এলে, সে মনে করার চেষ্টা করতে থাকে, অন্ধকার আর আলোর মধ্যবর্তী সময়টুকুতে সে কোথায় ছিল, কী করছে, কোথায় গিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই মধ্যবর্তী অন্ধকারের সময়টুক

তাব চেতনায ফিবে আসে না।

গঙ্গাব ধাব ধবে হাঁটতে হাঁটতে শ্যামদুলাল ভাবছিল, আজ কি আবাব সে পুবনো ব্যাধিটা তাকে চেপে ধববে। সকাল থেকেই সে অনুভব কবছিল ভেতবেব সেই ছটফটানিটা। বক্তে বিষম চাঞ্চল্য তাকে অস্থিব কবে তুলছিল ভেতবে ভেতবে।

শ্যামদুলাল, ঘোষ কেমিক্যালসেব পি এ টু ডিবেক্টব। অনেকদিনেব পাকা, পুবনো চাকবি। জীবনটা তাব এই চাকবিব মতো নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ। সংসাবে স্ত্রী আব দুই ছেলে। ছেলেবা পডাশুনা কবে স্ত্রীও এক সওদাগবি অফিসেব জুনিযাব অফিসাব। সংসাব জীবনে তাব কোন ক্ষোভ নেই। নেই কোন হতাশা। নেই কোন অর্থাভাব। থাকাব কথাও নয। কিন্তু—

হ্যাঁ সেই কিন্তুটাই তাকে মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ কবে তোলে। সেই কিন্তুটাই তাকে নিযে যায অন্যতব এক মানসিক বিক্ষোভেব মুখে। দাঁড কবায এক কল্পিত শত্রুব মুখোমুখি। শুরু হযে অন্তবর্তী সংগ্রাম মানসিক চিন্তাও যত বাডে, ততই মাথাব সেই যন্ত্রণা প্রবল হয। তাবপব একসমযে আসে চিন্তা বিলুপ্তি আসে সেই অন্ধকাব অবস্থাটা। লোপ পায সমস্ত জগৎ সংসাব।

গত কয়েকদিন সেই 'কিন্তু' আবাব তাকে চাবুক মাবতে শুরু কবেছে। সাবাদিন কাটছে অস্থিবতাব মধ্যে। তাবপব ছুটিব শেষে, সে আব বাডিব পথ ধবেনি, কখন যেন হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছে এই গঙ্গাব ধাবে। আকাশে তখন সূর্য ডোবাব বং। একসময দাঁডিযে পডে। তাব চোখেব বক্তিমাভায স্মৃতিব কুহেলি কাটিযে অতীত যেন সামনে এসে দাঁডায। মাথা চাডা দেয সেই 'কিন্তু'ব উৎসমুখ

তখন চব্বিশ বছবেব যুবক শ্যামদুলাল দত্ত। তবতাজা যুবক। চোখে ভবিষ্যতেব অজস্র স্বপ্ন। ঘোষ কেমিক্যালসে চাকবি পেযেছিল নিজেব যোগ্যতায। একশ'জন প্রতিযোগীব মধ্যে সে হযেছিল প্রথম যদিও চাকবিটা বিবাট মাপেব কিছু না। স্টেনোগ্রাফাব। অতি সামান্য স্টেনোগ্রোফাব। কিন্তু নিজেব বিবাট তৎপবতা, ভালো ইংবেজি জানা, কথায়বার্তায চৌকস শ্যামদুলাল ঘোষ-কেমিক্যালসেব তদানীন্তন ম্যানেজিং ডিবেক্টাব ভবেশ ঘোষেব নেকনজবে চলে আসে। ভবেশবাবুব বলাব আগেই সে তাব কাজটুকু সম্পন্ন কবে ফেলতো। কোথায কবে কোন টেণ্ডাবেব জন্যে নোট পাঠাতে হবে কোথায কবে কোন পার্টিব অর্ডাব ক্যানসেলশনেব জন্যে ডেমাবেজ সুট কবতে কবে, ইত্যাদি নানান ব্যবসা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তাব হিসেবেব মধ্যে থাকতো। ঠিক সমযে ঠিক বিষযটি সে মালিকেব নজবে এনে তাঁব খার্টনি লাঘব কবতো। এ ছাডাও আবও কিছু যোগ্যতা তাকে নিযে এল ভবেশেব অত্যন্ত কাছাকাছি। একজন বিশ্বাসযোগ্য বিচক্ষণ কর্মী হিসেবে অচিবেই সে তাব ফল পেযেছিল। সামান্য স্টেনোগ্রাফাব থেকে সে হয়েছিল পি এ টু এম ডি। অল্পদিনেব মধ্যেই তাব মাইনে বেডে গিযেছিল প্রায় তিনগুণ।

শ্যামদুলাল এত বেশি বিশ্বস্ত হযে গিযেছিল ভবেশবাবুব কাছে যে অবসব সময ভবেশবাবু তাঁব ব্যক্তিগত জীবনেব অনেক সুখ দুঃখেব কথা বলে ফেলতেন। আব শ্যামদুলাল তাব সামর্থ্য অনুসাবে ভবেশেব ব্যক্তিগত সমস্যাগুলোকেও সমাধান কবে দেবাব চেষ্টা কবতো।

ভবেশেব ব্যক্তিজীবনেব বিবাট হাহাকাবেব দিক ছিল তাঁব একমাত্র কন্যা শিবানী। শ্যামদুলাল তা জানতো। শিবানীকে দেখেও ছিল বহুবাব। কিন্তু তাব তুখোড মস্তিষ্ক শিবানী সমস্যাব কোন উপযুক্ত সুবাহা খুঁজে পাযনি। চব্বিশ বছবেব শ্যামদুলাল স্বপ্ন দেখতো সুখী ভবিষ্যতেব। স্বপ্ন দেখতো, দেখতো শাঁসালো চাকবিব সুন্দবী স্ত্রী আব একটি নিজস্ব ছোটখাটো বাডিব। ভবেশেব এই দুঃখটাকে সে তাব নিজেব দুঃখ বলেই ভাবতো। ভাবতো ঘোষ কেমিক্যালসেব পববর্তী মালকিনেব জীবন খুব ভযাবহ বকমেব দুঃসহ। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র সহানুভূতি জানানো ছাডা তাব আব কবাবও কিছু ছিল না।

অথচ সেই সমস্যাব একদিন সমাধান হযে গেল। যে সম্ভাবনাব কথা তাব মগজে একদিনেব জন্যেও উঁকি দেযনি, কোথাকাব এক উট্‌কো লোক এসে তাব ভবিষ্যতেব সব কিছু ভাবনা ওলটপালট কবে দিল।

শ্যামদুলাল ভেবেছিল মালিককে খুশি কবতে পাবলে সে ঘোষ কেমিক্যাল্‌সেব অনেক উঁচু জাযগায

উঠে যেতে পারবে। হয়তো পারতোও। কিন্তু পারল না। কোথা থেকে যেন এসে হাজির হল রামানন্দ বসু। সুন্দর, সুঠাম, তরতাজা অথচ লাজুক রামানন্দ।

শ্যামদুলালের ভাগ্যের চাকাটা হঠাৎই থেমে গেল। তার স্বপ্নেব জগৎটাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে বামানন্দ এগিয়ে চলল তীরগতিতে।

দেখতে দেখতে স্বভাবলাজুক রামানন্দ হয়ে গেল ভবেশের ডানহাত। যে পবামর্শ এতদিন ভবেশ কবতেন শ্যামদুলালের সঙ্গে, কখন যেন রামানন্দ অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে ভবেশের। এমনকি, শ্যামদুলালের পক্ষে যা সম্ভব হয়নি, তাই সম্ভব হল রামানন্দর ক্ষেত্রে। ছুটির পর এম. ডি,-র গাড়িতে তাবই পাশে বসে রামানন্দ তাঁর সহযাত্রী হয়েছে। প্রায় নিত্যদিনই।

ভোজবাজির মতো সব কিছু পাল্টে যেতে লাগল। একদিন শ্যামদুলাল দেখল, কোম্পানির নতুন ম্যানেজার হয়েছে রামানন্দ বসু। এর অর্থ শ্যামদুলাল রামানন্দকে সম্বোধন কববে 'স্যার' বলে।

এর কিছুদিন পর আরো একটি সংবাদ স্তম্ভিত করেছিল শ্যামদুলালকে। ভবেশকে খুশি করতে সে সব কিছু করেছে, কিন্তু যেটা সে করতে পারেনি, সেটাই সম্ভব করেছে রামানন্দ।

মাঝে মাঝে এখনও শ্যামদুলালের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে। এ সম্ভাবনার কথা কেন একেবারও তাব মনে আসেনি। সেও তো পাল্টি ঘরের ছেলে। সেও তো পাবতো বামানন্দ যেটি করতে পেবেছে সেটি করতে। রামানন্দ সঙ্গে শিবানীর বিয়ে। এর অর্থ ঘোষ কেমিক্যালসের পববর্তী মালিক রামানন্দ বসু। ভবেশ ঘোষের ঐ চেয়ারটায় একদিন বসবে রামানন্দ বসু। আর সে শ্যামদুলাল দত্ত, পরিচয় তাব, পি এ. টু এম ডি।

ঈর্ষার ঘুণ পোকাটার জন্ম বোধ হয় তখনি। যে ব্যাধিতে সে এখন ভুগছে, এর জন্ম বোধহয় তখন থেকেই।

নাগালের মধ্যে থেকে সোনাব আপেল ছিটকে গেছে। এখন কেবল অথর্ব বেদনা নিয়ে যন্ত্রণা পাওয়া। আজ চল্লিশোর্ধ জীবনে মাঝে মাঝেই তার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে তীব্র প্রতিহিংসায়। মনে মনে কল্পনা করে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, রামানন্দকে জব্দ করতে হবে, বামানন্দকে করতে হবে সিংহাসনচ্যুত। কিন্তু সে জানে না কেমন করে? কল্পনায় সে বহুবাব রামানন্দকে হত্যা করেছে.... কিন্তু বাস্তব যা, তাহল সে রামানন্দর এক অধস্তন কর্মচারী মাত্র।

বামানন্দ নিধনের চিন্তা যখন তাকে অস্থির কবে তোলে ঠিক তখনই রোগটা মাথা চাড়া দেয়। ভাবতে ভাবতে কখন একসময় সে হাবিযে যায় অন্ধকারে ঘূর্ণিতে। আর তখন তার কোন জ্ঞানই থাকে না।

গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বছর দেড়েক আগের এক বৃষ্টিঝরা সন্ধের কথা মনে পড়ে গেল শ্যামদুলালের। সেই সন্ধের কথা, সব না হলেও কিছুটা মনে আছে। প্রায় ছ সাত মাস যাবৎ সাবা অফিসে একটি গুঞ্জন চলছিল। স্বয়ং রামানন্দব বিরুদ্ধেই। দেবচরিত্র, কর্তব্যনিষ্ঠ রামানন্দব জীবনে একটি স্খলন ঘটেছে। সে নাকি এক বারবনিতার গৃহে প্রতিদিনই যাতায়াত করে।

এ হেন মুখরোচক সংবাদ করণিককুলের রসালাপ হতে পারে। কিন্তু শ্যামদুলাল? অত স্বাভাবিক ভাবে সংবাদটি উড়িয়ে দিতে চায়নি। রামানন্দর পতন যে তার একান্ত কাম্য। গোপনে সে রামানন্দকে অনুসরণ করা শুরু করল। ঘটনা যদি সত্য হয় তবে রামানন্দর মৃত্যুবাণ তারই হাতে। শ্যামদুলাল জানত শিবানীর কানে কোনক্রমে যদি রামানন্দর অধঃপতনের সংবাদটি পরিবেশন করা যায় তাহলে কোনমতেই রামানন্দর জীবন এত শান্তিতে কাটবে না। কোন মেয়েব পক্ষেই স্বামীর পরনারীগমন মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। শিবানীর তো নয়ই। শিবানীকে তো অনেকদিন ধরেই সে দেখছে।

বছর দেড়েক আগের একটা দিন বেশ গভীর ভাবে নাড়া দেয় শ্যামদুলালকে। মাঝে মাঝেই। খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট। দিনটা ছিল বৃষ্টির দিন। সারাদিনই ঝিমঝিম বৃষ্টি লেগেই ছিল। বিকেলের দিকে নামল জোরে। রামানন্দর মত শ্যামদুলালও অফিস কামাই কবতো ভালবাসাতো না। রোজকার মতই অফিসে গিয়েছিল। কর্তব্যে ফাঁকি দেওয়া তার ধাত নয়। এ জন্য সে রামানন্দরও বেশ প্রিয়পাত্র।

রামানন্দ তাঁর ব্যক্তিজীবন ছাড়া বাকি সব কিছু নিয়েই শ্যামদুলালের সঙ্গে আলোচনা করতেন। এখনও করেন।

সেদিনও সারাটা সময় দুজনে কাজ করেছেন। বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ রামানন্দ তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টির কথা তুলে তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে বলেছিলেন। সাধারণত শ্যামদুলাল অফিস থেকে বের হত সাড়ে ছটা সাতটার আগে নয়। রামানন্দ থাকাকালীন তাকে থাকতেই হত।

আপত্তি জানায়নি শ্যামদুলাল। সত্যিই আবহাওয়ার অবস্থা ছিল বেশ খারাপ। তার ওপর তাকে ফিরতে হবে উত্তর কলকাতায় টালা নামক একটুকুতেই বৃষ্টিজমা এলাকায়। তবু হাতের কাজকর্ম গুছিয়ে রেখে নিচে নামতে নামতে প্রায় ছটা বেজে গিয়েছিল। বাসস্ট্যান্ডে এসে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েও ছিল। আধঘণ্টা কি পৌনে একঘণ্টা অপেক্ষা করেও যখন বাসের আশা সে ছেড়ে দিয়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই এক অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যে একটি ট্যাক্সি এসে তার সামনেই দাঁড়ায়। এবং ভাড়া মিটিয়ে আরোহী নেমেও পড়ে। এ সুযোগ নষ্ট করা যায় না। শ্যামদুলাল তড়িৎ তৎপরতায় ট্যাক্সিটা পাকড়াও করে যে মুহূর্তে তার গন্তব্যস্থলের উল্লেখ করতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে সে দেখতে পায়, ঐ প্রবল বর্ষণের মধ্যে রামানন্দ অফিসবাড়ি থেকে নেমে নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। এবং গাড়ির মুখ ফেরালেন দক্ষিণের দিকে।

চকিতে একটি সন্দেহ, যে সন্দেহ নিয়ে সারা অফিসে কানাঘুষো, শ্যামদুলালের মাথায় সেটি ধাক্কা দিল। রামানন্দর বাড়ি তো ওদিকে নয়। তিনি তো যাবেন লেকটাউন। এই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে নিজে গাড়ি চালিয়ে কোথায় যেতে চান?

দেড় বছর পর, আজও স্পষ্ট মনে আছে, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে সে রামানন্দর গাড়িটিকে অনুসরণ করতে বলে। রামানন্দর গাড়ি তখন ছুটে চলেছে এসপ্ল্যানেডের দিকে। এসপ্ল্যানেড ছাড়িয়ে চৌরঙ্গী। চৌরঙ্গী ধরে গাড়ি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় ডানফুটে এ এ ই আই-এর পার্কিং জোনে। বৃষ্টির জলে ঝাপসা কাচের মধ্যে দিয়ে শ্যামদুলাল দেখে নিজের গাড়ি থেকে নেমে রামানন্দ অপেক্ষা করছেন উল্টো ফুটের গাড়ি বারান্দার নিচে। বেশ কিছুক্ষণ পর একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল তার সামনে। আশ্চর্য, রামানন্দবাবু গিয়ে উঠছেন একটা সাধারণ ট্যাক্সিতে। আর ট্যাক্সিটা যেন তাঁরই জন্যে এসে দাঁড়ালো। তিনি গিয়ে গাড়িতে বসতেই গাড়ি চলতে শুরু করল। গিয়ে পৌঁছল পার্ক স্ট্রিটে। বাঁদিকে ঘুরে সোজা এগিয়ে গেল ক্যামাক স্ট্রিটের মুখ পর্যন্ত। তারপর ডানদিক। আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে এক অতি নির্জন রাস্তায় গিয়ে গাড়ি থামল। ট্যাক্সি থেকে নেমেই রামানন্দ উল্টো ফুটে ছুটে চলে গেলেন। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে একটি ফ্ল্যাট বাড়ির মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

একটা অদ্ভুত কৌতূহল পেয়ে বসেছিল শ্যামদুলালকে।

কোথায় যেতে চান রামানন্দ? এই দুর্যোগের সন্ধ্যায়, প্রবল বৃষ্টি মাথায় করে, নিজের গাড়ি ছেড়ে ট্যাক্সি চেপে এ রকম এক নির্জন স্থানে, এই ফ্ল্যাট বাড়িতে তাঁর আবার কী প্রয়োজন? কে থাকে এখানে? নিজের বাড়ির থেকেও নিশ্চয়ই আরো বড়ো কোন আকর্ষণ আছে এখানে। নইলে রামানন্দর মতো নিয়মমানা সুখী মানুষ তো এই দুর্যোগে এখানে আসতে পারেন না। স্থান কাল পাত্র সবকিছু ভুলে গিয়েছিল শ্যামদুলাল। রামানন্দর রহস্যময় গতিবিধি, বহুদিনের জমানো ক্ষোভ, রামানন্দর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত শ্যামদুলাল সেই মুহূর্তে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। সেই বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যাতেও তার গা গরম হয়ে উঠেছিল। মাথার মধ্যে শুরু হয়েছিল রোমাঞ্চকর দপদপানি। চোখের কোণে প্রবাহিত হচ্ছিল প্রতিহিংসার উষ্ণস্রোত। কালবিলম্ব না করে ট্যাক্সি ড্রাইভারের হাতে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট গুঁজে সে নেমে পড়েছিল। রামানন্দর মতোই ছুটে রাস্তা পার হয়ে সে ঢুকে গিয়েছিল সে বিশাল বাড়িটায়।

বাড়িটা বিশাল হলেও, লোকজন প্রায় কেউই ছিল না। হয়তো তা বৃষ্টির কারণেই! অথবা সাধারণত ফ্ল্যাট সিস্টেমের বাড়িতে যেমন লোকজনের নিত্য-যাতায়াত কম হয় সেই রকম একটা খালি খালি ভাব।

শ্যামদুলাল সদর পার হয়েই দেখতে পেয়েছিল রামানন্দ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছেন। যদিও লিফট্ ছিল। তবুও লিফট্ না নিয়েই তিনি ধীরে ধীরে ওপরে যাচ্ছেন। শ্যামদুলাল নিরাপদ ব্যবধান রেখে সিঁড়ি বেয়েই ওপরে উঠেছিল। দোতলা অতিক্রম কবে রামানন্দ গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন একটি নির্দিষ্ট ঘবেব সামনে। দবজায় কয়েক সেকেণ্ড মত বেল টিপে অপেক্ষা করেছিলেন। তাবপর ধীরে ধীরে দবজায় ধাক্কা দিয়েছিলেন। দরজা খুলে যাবার পর রামানন্দ ধীর পায়ে ঢুকে গিয়েছিলেন ভিতরে। তাবপর.......?

হ্যাঁ তারপর, সব অন্ধকার। চকিতে সব কিছু ব্ল্যাক হয়ে গেছিল। শ্যামদুলালের সামনে নেমে এসেছিল একবাশ অন্ধকার।

মনে নেই। কিছু মনে নেই। গত দেড় বছরেও শ্যামদুলাল মনে করতে পারে না সেই প্রবল উত্তেজনাময় পরিস্থিতির কী পরিণতি হয়েছিল। মনে নেই তারপবেব কোন ঘটনাই। সেই অন্ধকাব থেকে আলোর জগতে সে যখন ফিরে এসেছিল, তখন তার কানে এসেছিল কয়েকটি কথা। নিজেকে সে আবিষ্কার করেছিল নিজের বাড়িতে। তখন তার ভিজে জামা কাপড়ে কাদা। সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝরছে জল। তার জ্ঞান ফিরেছিল স্ত্রী মনিকার কথায়, কোথায় গিয়েছিলে এত রাত পর্যন্ত, কী হযেছে তোমাব, এত থমথমে মুখ, মনে হচ্ছে যেন খুব ভয় পেয়েছো..... .এমনি আরো সব কিছু কথা।

উত্তর দিতে পারেনি শ্যামদুলাল। কেননা, আজও সে নিজেও জানে না, দেড় বছব আগেব সেই সন্ধ্যার পরবর্তী ঘটনা কী ঘটেছিল?

শ্যামদুলাল আবার অফিসে এসেছে। নিয়মিত নিজের কাজ করছে। শর্মিলা খুনের কথা কাগজে পড়েছে। মনের মধ্যে সন্দেহ তোলপাড় করছে। রাগ আর ঘৃণামিশ্রিত চোখে রামানন্দকে দেখছে। কিন্তু প্রমাণসমেত রামানন্দকে সে কাঠগড়ায় তুলতে পারেনি। তারপরেও অনেকবার সে চেষ্টা করেছে রামানন্দ যদি আর একবাব ঐ বাড়িতে যায়। কিন্তু রামানন্দ যেন ভুলে গেছেন সে বাড়িব কথা। এই দেড বছরে কোনদিনও শ্যামদুলাল রামানন্দকে বেচাল হতে দেখেনি। দেখেনি ও বাড়ি যেতে।

দেড় বছর আগের সেই সন্ধে আজও শ্যামদুলালের কাছে বহস্যের কুয়াশায় মোড়া। এখনও মাঝে মাঝে, মাথায় যখন অসহ্য যন্ত্রণা হয়, শরীর যখন অস্থিব হতে থাকে শ্যামদুলাল চলে আসে গঙ্গাব এই নির্জন স্থানে। অতীতে হারিয়ে যাওয়া সেই রহস্যসন্ধ্যার জট ছাড়াতে।

—চলুন না, ঐ গাছতলায় গিয়ে বসি। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবেন।

চমকে ওঠে শ্যামদুলাল। মহিলা কণ্ঠ। সাদরে আহ্বান জানাচ্ছে। মুখ ঘুবিয়ে দেখেন বছর কুড়ি বাইশের শ্যামলা রঙের একটি মেয়ে। উগ্রতার প্রসাধন। আরো উগ্রতর গায়েব সস্তা এসেন্স। শ্যামদুলালের বুঝতে অসুবিধা হয় না। ত্বরিত গতিতে পা বাড়ায় বাড়ির দিকে। ইস, এত রাত হযে গেছে। ঘড়িতে তখন বাত প্রায় নটা।

ঘোষ কেমিক্যালসের ঝকঝকে তিনতলা অফিস বাড়িটার সামনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সোহনলাল। অনেক কষ্ট করে দেড় বছর পর এই লোকটাব পাত্তা করতে পেরেছে। নেহাতই বরাতের জোরে। নইলে সেদিন জুলুস বেরিয়ে রাস্তাঘাট অত জ্যামই বা হবে কেন আর চুরচুরে নেশার মেজাজ নিয়ে সেই বা কেন লোকটার গাড়ির সামনে গিয়ে পড়বে? আরো একটা বড় নসিব ঘটে গিয়েছিল সেদিন। অত জ্যাম দেখে সাহেবের গাড়ির পিছনেই দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল প্যাসেঞ্জার। সঙ্গে সঙ্গে সেও গিযে ট্যাক্সিটা নিয়ে নিতে পেবেছিল। ভাগ্যিস সেদিন জুয়োর জোরে পকেটে কিছু রেস্ত ছিল। আসলে যোগাযোগ যখন হয় এমনি করেই হয়। তারপর সাহেবকে অনুসরণ করে তাব বাড়ি আর অফিস চিনে নিয়েছে। বেশ কয়েকদিন ছিনে জোঁকের মতো সাহেবের পিছু পিছু ঘুরেছে। আর মনে মনে ভেবেছে তার প্ল্যান। এবার আর বাছাধনকে পার পেতে হচ্ছে না। গত দেড় বছর ধরে তার হাঁড়ির হাল কবে ছেড়েছে ঐ বাবুটি। শর্মিলাও মরল, তারও স্ফূর্তির প্রাণটি খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম হল। এই দেড় বছরে সে নিজের দিকে তাকাতেও পারেনি। কোনদিন খাওয়া জুটেছে,

কোনোদিন জোটেনি। সব থেকে কষ্টকর নেশাব জোগান দেওয়া। জুয়োটুয়ো খেলে যেদিন পকেটে কিছু রেস্ত আসে তখনই সে নেশা করতে পারে। নইলে হরিমটর। নিজের জামাকাপড়ের দিকে তাকিয়ে নিজেই লজ্জা পেল। ভিখিরিব হাল। প্যান্টটা যে কতকাল কাচা হয়নি কে জানে। জামাটাব অনেক জায়গায় সেলাই কেটে গেছে। ফেটেও গেছে কলারটা। জায়গায় জায়গায় বাসি তরকারি আর মদের ছিটে। আব জুতো? সেটা যে কীভাবে এখনও পায়ে লেগে রয়েছে কে জানে।

মুখে বেশ কয়েকদিনের না কামানো কাঁচাপাকা দড়ির আগাছা। রুক্ষ চুল আর লাল লাল চোখ অথচ শর্মিলা বেঁচে থাকতে কী তার কেতা! একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে সোহন খানিকটা শঙ্কিত হয়। যা সুন্দর সাজানো ঝকঝকে বাড়ি, গেটে পরিষ্কাব জামা-কাপড়-পরা দারোয়ান। তাব এই ছিন্নবাস, জীর্ণ ভবঘুরে চেহারা দেখে ভিখিরি বলে না গেটেই আটকে দেয়।

এতদূর এসে আর পিছনোর কোনো মানেই হয় না। আব পিছনো মানে আখেরের ইতি। যে লোকটা তার সুখের কাঁটা, তাকে তো ছেড়ে দেওয়া যায না। কপাল ঠুকে সে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ নিয়ে যাতায়াত করছে। অবশ্য সেও এসেছে, কাজ নিয়েই। হ্যাঁ এও তো বিরাট কাজ। বাঁচার তাগিদ। সেকেন্ডখানেক ইতস্তত করেই সে হড়বড় করে ভেতর চলে এল। আশ্চর্য গেটেব লোকটা তাকে যেন দেখেও দেখল না। ঢুকতে কোনো বাধা দিল না। কৈফিয়তও চাইল না।

সোহনলাল পবে জেনেছিল, বাড়িটা একা ঘোষ কেমিক্যালসের নয়। এক তলায় আরো অনেক অফিস-টফিস আছে। দোতলা আর তিনতলাটাই ঘোষ কেমিক্যালসের আন্ডারে।

যাইহোক, একে তাকে জিজ্ঞাসা কবে সে এসে থামল তিনতলাব একটা কাচ-দরজার সামনে। নিওনের আলোয় আর জৌলুসদাব চেয়ার টেবিলের কেতায় ভেতরটা ঝকমক করছে।

টেলিফোনের বক্সের সামনে এক তরুণী কানে ইয়ার ফোন লাগিয়ে সমানে কথা বলে যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে সোহনলাল তরুণীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তরুণী তখন যেন কারো সঙ্গে বিশেষ কিছু কথা বলতে ব্যস্ত। তার এদিকে কোনো নজরই ছিল না। খুব সম্ভবত সোহনেব দেহনির্গত দুর্গন্ধে তরুণী মুখ তুলে দেখল। বেশ বোঝা গেল তার মুখে বিরক্তি।

জাস্ট এ মিনিট! বলে তরুণীটি মুখ থেকে স্পীকারটি সবিয়ে সোজাসুজি সোহনের দিকে তাকাল। সম্ভবত একবার তার সর্বাঙ্গ জবিপ কবে নিয়ে বলল, —কাকে চান?

গলার আওয়াজটি যথাসম্ভব গম্ভীব বেখে সোহন বেশ ভাবিক্কি চালে বলল, —বাসু সাহাব।

এবার তরুণীর মুখে অবিশ্বাস। সে ভাবতেই পারে না এমন একটি লোকের সঙ্গে বাসু সাহেবেব কী ধরনের থাকতে সম্পর্ক পাবে? একে তো তিনি কোম্পানিব ডাইবেক্টর, তাঁব ওপর অত্যন্ত শৌখিন মানুষ, তিনি কীভাবে,

লোকটিকে তরুণীটি সহ্য করতে পারছিল না, তাই ইন্টাব-এক্সচেঞ্জে যোগাযোগ করল রামানন্দব পি এ.শ্যামদুলালেব সঙ্গে। ফোনে জানাল সোহনলালের কথা। ওদিক থেকে কী কথা হল বোঝা গেল না। মাউথপীসটা সরিয়ে তরুণীটি সোহনকে সামনের দিকে একটা ঘর দেখিয়ে সেখানে যাবার নির্দেশ দিয়ে পুনরায় নিজের কাজে ব্যস্ত হোল। সোহনও আব কথা না বাড়িয়ে তরুণী নির্দেশিত ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

সাজানো গোছানো ছিমছাম ঘর। সোহন দেখল চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের একজন ঝকঝকে স্মার্ট ভদ্রলোক টেবিলে বসে কাজ কবছে। সোহন ঘবে ঢুকতেই শ্যামদুলাল মুখ তুলে তাকাল। তারও চোখে মুখে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়। সেও ভাবতে পাবেনি এমন একজন পরিবেশ-বিপরীত লোক এখানে আসতে পারে। তার ওপর সে আবার বামানন্দ বসুর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—আমি একটু বাসু সাহেবের সঙ্গে মোলাকাত করতে চাই।

—বিশেষ কিছু দরকাব?

—জি হ্যাঁ।

—আমি ওনার পি. এ। আমাকে বলা যায় না?

সোহনলাল নিরুত্তরে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে।

—কিন্তু উনি তো এখন অত্যন্ত সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত।

—হামার দরকারটা আরো সিরিয়াস বেপার। হামার সঙ্গে মোলাকাত হলে আপনার সাহেবের ফায়দা হোবে। একটু দেখা করার বেবস্থা করিয়ে দিন।

সোহনকে আর একবার জরিপ করে নিয়ে শ্যামদুলাল ফোন তুলে বলল,—আপনার নাম কী বলব

—নামের দোরকার নেই। কাগজটা পাঠিয়ে দিন। তাহলেই হোবে।

সোহন তার ছেঁড়া শার্টের বুক পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে শ্যামদুলালের দিকে এগিয়ে দিল। ভাঁজ করা ছোট্ট কাগজ। নির্বিকারভাবে ফোন রেখে শ্যামদুলাল উঠে দাঁড়াল। সোহনকে বসতে বলে সে এগিয়ে গেল ডাইরেক্টরের ঘরের দিকে।

সরকারী একটা অর্ডারের ব্যাপারে রামানন্দ তখন খুবই ব্যস্ত ছিলেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে প্রেবিতব্য টেন্ডারের পাতাগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিলেন আরো কিছু রেট কমানো যায় কি না। এমন সময় সামনে এসে দাঁড়াল শ্যামদুলাল।

—আমি একটু ব্যস্ত আছি। পরে আসুন।

—কিন্তু স্যার:

—কী ব্যাপার?

আর কিছু না বলে শ্যামদুলাল সোহনের দেওয়া চিরকুটটা এগিয়ে ধবল।

—কী এটা? বলে তিনি চিরকুটের ভাঁজ খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলেন।

শ্যামদুলাল স্পষ্ট দেখল, রামানন্দর মুখভাব কেমন যেন ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে। যে বিরক্তি নিয়ে তিনি চিরকুটটা খুলেছিলেন, এখন সে ভাবটা অন্তর্হিত। বদলে কেমন এক ধরনের ত্রাসের ভাব ফুটে উঠছে। অবিশ্বাস্য হলেও শ্যামদুলালের মনে হল তার ধারণাটা ঠিক ভুল নয়।

—স্যার?

কিছু না বলে রামানন্দ ফ্যাকাশে মুখে শ্যামদুলালের দিকে তাকালেন।

—লোকটাকে আমি তাড়িয়ে দিতে পারতাম। জানি তো আপনি এখন খুবই ব্যস্ত। তবে, ও বলল, আপনার সঙ্গে দেখা হলে নাকি আপনারই উপকার হবে। ওকে কি চলে যেতে বলব?

রামানন্দ যেন অনেক কিছু ভাবছিলেন সেইমুহূর্তে। শ্যামদুলালের কথায় তাঁর চমক ভাঙল। সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, —না ওকে ভেতরে আসতে বলুন।

—আচ্ছা স্যার। বলেই শ্যামদুলাল চলে আসছিল। রামানন্দ পিছু ডাকলেন, লোকটা যতক্ষণ থাকবে ঘরে যেন কেউ না আসে। আসার দরকার নেই।

শ্যামদুলাল বেরিয়ে গেল। রামানন্দ আবার চিরকুটটা খুললেন, জ্বলজ্বল করছে লেখাটা। মাত্র একটি নাম, ইংরাজীতে লেখা। শর্মিলা প্যাটেল। সারা কাগজে আর কোথাও কিছু লেখা নেই।

মুহূর্তের মধ্যে দেড় বছর আগের অভিশপ্ত সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে গেল রামানন্দর। সে যেন এক দুঃস্বপ্নের সন্ধ্যা। গত দেড় বছর ধরে প্রাণপণে ভুলতে চেষ্টা করেছেন সেই সন্ধ্যেটাকে। একটা ভয় তাঁকে অনেকদিন ধরে তাড়া করে চলেছিল। শর্মিলা হত্যার পর যতদিন এ নিয়ে কাগজ তোলপাড় হয়েছে ততদিনই তাঁর বুকের উথালপাতাল ভাবটা কমেনি। প্রতি মুহূর্তেই সেসময় তাঁর মনে হত, আচ্ছা, কেউ তাঁকে দেখে ফেলেনি তো? যদিও সে সন্ধ্যায় প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল, যদিও তিনি আশপাশ দেখেই ট্যাক্সিতে উঠেছিলেন, কিন্তু ভয়টা তাঁকে ছেড়ে যায়নি। কলকাতার পুলিসকে বিশ্বাস নেই। সামান্য সূত্র ধরেই পুলিস তাঁর কাছে এসে হাজির হতে পারতো। নিবিষ্টচিত্তে তিনি অনেকবার ভেবেছেন কোথাও কোনো সূত্র ফেলে এসেছেন কি না! আশপাশের লোককে, বিশেষ করে কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞাসা করলে নিশ্চয়ই বলবে শর্মিলার ঘরে নিত্য এক বাবু যাতায়াত করতেন। অবশ্য এটা রামানন্দর ঠিক মনে আছে শর্মিলার ঘরে তাঁর কোনো পরিচয়পত্র নেই। জীবনে তিনি কোনোদিনও শর্মিলাকে

কোনো চেকে অর্থ দেননি। যা দিয়েছেন সবই নগদে। শর্মিলার কাছে তাঁর কোনো ছবিও নেই। এমনকি শর্মিলাকে তাঁর আসল পবিচয়ও তিনি দেননি। সেখানে তিনি রামানন্দ নন। শর্মিলা জানত তাব নতুন বাবুটির নাম সুবোধ নন্দী। ব্যবসা-ট্যাবসা করেন। এবং সে ব্যবসা কোথায় এবং কিসের তাও শর্মিলার অজানা ছিল। সাধারণত শর্মিলার মতো মেয়েরা, যারা তাদের জীবিকার সন্ধান সাধারণ পথে খুঁজে না পেয়ে দেহের বেসাতি খুলে বসে, তাবা ব্যক্তিগত রোজনামচা রাখার সময় পায় না। সে বিলাসিতাও বোধহয় তাদেব থাকে না। সেই হিসেবে খুব সম্ভবত শর্মিলার কোনো ডায়েরি ছিল না। থাকলেও সেখানে থাকবে সুবোধ নন্দীর নাম।

তারপব দিন যত কেটে গেছে, খবরের কাগজগুলো একসময় শর্মিলা নামের এক বাববনিতার রহস্যজনক মৃত্যুর ব্যাপারে নির্লিপ্ত হয়ে গেছে, ধীবে ধীরে বামানন্দ নিজেকে ফিরে পেয়েছিলেন। মনে মনে সেদিন থেকেই প্রতিজ্ঞা কবেছিলেন, জীবনে আব এ ভুল নয়। এসব ব্যাপার জানাজানি হয়ে গেলে শিবানীর কাছে মুখ দেখানোই যেত না।

রামানন্দর মনে আর একটা সম্ভাবনার কথা মাঝে মাঝে উঁকি দিত। যে ট্যাক্সিওলা তাকে নিয়মিত পার্ক স্ট্রিটে নিয়ে যেত সে লোকটা না আবাব পুলিসে কিছু বিপোর্ট কবে। কারণ তাঁর পাপকর্মের অনেক কিছুব সাক্ষী ছিল সেই ট্যাক্সি ড্রাইভাব। ইচ্ছে করলে সেই ড্রাইভারটি তাঁর চেহাবাব বর্ণনা পুলিসেব কাছে তুলে ধবতে পাবতো। অবশ্য সেখানেও তিনি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। একটা নির্দিষ্ট জায়গায এসে ট্যাক্সি তাঁব জন্যে অপেক্ষা করতো। ক্যামাক স্ট্রিটেব নির্দিষ্ট বাড়িব সামনে ড্রাইভার তাঁকে পৌঁছে দিত। তারপর নির্দিষ্ট স্থানে ঠিক সময়ে আবার তাঁকে তুলে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাঁকে নামিয়ে দিয়ে চলে যেত। এব জন্যে সে পর্যাপ্ত অর্থও পেত।

টেবিলেব সামনে পাতা চিবকুটটাব দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে গেল সেই ট্যাক্সি ড্রাইভারেব কথা। আজ দেড় বছব পর সেই লোকটা আবাব উৎপাত কবতে এলো না তো? একমাত্র সে আব শর্মিলা ছাড়া তাঁর অভিসারেব কথা আর কারও জানাব কথা নয়।

—আসতে পাবি সাহাব?

রামানন্দ চোখ তুলে তাকালেন। এক পাল্লাব দবজাব ফাঁকে বাড়ানো মুখখানা নজবে এল। যদিও সেই ড্রাইভাবের মুখ আজ স্পষ্ট মনে নেই, তবে এ লোক তো সেই লোক নয়।

—ইয়েস, কাম ইন। বেশ গম্ভীব হয়েই লোকটিকে ভেতরে ডাকলেন বামানন্দ। আপাদমস্তক জ্বলে গেল তাঁর। এই রকম একজন হতকুৎসিত চেহারার লোক তাঁব চেম্বাবে আসতে সাহস পায় ? হাত কচলাতে কচলাতে লোকটি এসে টেবিলেব সামনে দাঁড়াল। বামানন্দব ভ্রূ কুঞ্চিত হয়েই ছিল। মনে মনে তিনি ভাবছিলেন, এ লোকটা কে হতে পাবে? এব সঙ্গে শর্মিলা প্যাটেলের সম্পর্কই বা কী। তবে ও প্রসঙ্গে না গিয়ে তিনি সবাসবি প্রশ্ন কবলেন, —কে আপনি? কী চাই?

দাঁত বের করে হাসল সোহনলাল। সামনেব সাবিব গোটা তিনেক দাঁত নেই। বেশ বোঝা যায় নেশা কবে করে দাঁতগুলোয় কালচে ছোপ ধবেছে। ঠোঁট আর কসেব গায়ে বাসি পানের লালচে কালো ছোপ। সারা চোখে-মুখে হায়েনাব নিষ্ঠুরতা। লোকটার অসহ্য মুখটা দেখে রামানন্দর মেজাজ আবও চড়ে উঠল। প্রায় ধমকের সুরেই তিনি বললেন, —এখেনে কী দরকার?

—আছে সাহাব। একটু বসতে বলবেন না?

—বসার দরকার নেই, এখন আমি ব্যস্ত আছি, কিছু বলাব থাকলে বলে ফেলুন।

—নেহি স'ব, বলে নিজেই সে চেয়াব টেনে গুছিয়ে বসতে বসতে বলল,

—আপনি কাজের মানুষ আছেন, কাজ তো করবেনই। লেকিন হামার প্রয়োজনটাও ফেল্না নাহি আছে। একটু সময় লিবে।

লোকটার স্পর্ধা দেখে বামানন্দ মনে মনে আবও খেপে গেলেন। তবু তিনি যথাসাধ্য নিজেকে সংযত রেখেই বললেন, —দরকাবটা কী?

—ওই যে, ওই স্লীপ।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আপনি শর্মিলা প্যাটেল নাকি?

সোহনের বিশ্রী মুখ থেকে এক অদ্ভুত ধরনের খিকখিকে হাসি বেরিয়ে এল। গা জ্বালানো হাসি। হাসতে হাসতেই সোহন বলল, —হামাকে দেখে কি জেনানা মনে হয় স্যার?

—তাই জন্যেই তো জিজ্ঞাসা করছি, স্লিপে একজনের নাম, এলেন আপনি?

—শর্মিলা প্যাটেলকে আপনি চেনেন না?

—কে শর্মিলা প্যাটেল? এ নামে আমি কাউকে চিনি না।

—দিল্লাগী করছেন স্যার? এরই মধ্যে ভুলে গেলেন? রমা, রমা, যিস্‌কা দুসরা নাম শর্মিলা। একটু কেতাবি নাম না হলে বাবুদের মন ভরতো না তো।

—আপনি ঠিক কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। না, কোন রমা বা শর্মিলা কাউকেই আমি চিনি না।

রামানন্দ উত্তেজিত ছিলেনই। খুব সম্ভব শেষের দিকে তিনি বাক সংযম হারিয়েছিলেন। গলার স্বর সামান্য চড়িয়ে তিনি বললেন, —আপনার আর কিছু যদি বলার না থাকে, তাহলে- -

—আইস্তা সাব, আইস্তা। এতো উত্তেজিত হবেন না। চিৎকার করলে, লোকজন জানাজানি হয়ে যাবে। হামি বলছি আপনি স্যার শর্মিলাকে চিনেন। যদি না পারেন, তাহলে আপনাকে মনে করিয়ে দিই, দেড় বরষ পহেলে শর্মিলা ছাড়া আপনার সাঁঝ বরবাদ হয়ে যেত, আউর কুছ মনে করার?

—স্টপ ননসেন্স। এটা কি গল্প করার জায়গা? না তোমার মাতলামি শোনার সময় আমার আছে?

—ঠিক বলিয়েছেন, কচলানো হাসি দিয়ে সোহন বলল, হামি মাতাল আছে। আউর মুশকিলটা হইয়েছে সিখানেই। সে বেঁচে থাকতে হামার কোন অসুবিস্তাই ছিল না। যোখনই রূপযার দরকার পড়তো ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম, লছমীদেবী আমার দুহাত ভরিয়ে দিতেন। মাতাল ছিলুম তখন। লেকিন এখোন সাহাব, বুকটা হু হু করে, রমা নেই, নেশাভি নেই। মাঝে মাঝে কুছ রূপয়া হাতে এলে চুল্লু টেনে চলে। কালভি কোন রকমে জোগাড় হইয়েছিল।

—আমার কাছে এসেছ কেন? তোমার রমার কাছে যাও।

—সেকী সাহাব? আসমান থেকে পড়ছেন কোনো? দেড় বরষ পহেলে এক সনঝে বেলায় রমা ওর্ফে শর্মিলা প্যাটেল খুন হয়েছে তা আপনি জানেন না?

—কে কোথায় মরল, কে কোথায় খুন হল, তা আমার জানার ব্যাপার নয়।

—বাত তো সহি আছে। লেকিন শর্মিলা খুনের বেপারটা যেতো না জানা যায় ততই ভালো। নইলে,

—নইলে?

—নইলে, মুসিব্বত আপনারই।

—হোয়াট?

—চিল্লাবেন না সাহাব। আপনার অফিসের লোকজন যদি সোবকুছ জানতে পারে, ঘরে সতীলক্ষ্মী বউ থাকা সত্ত্বেও দেড় বরষ পহেলে আপনি এক রেণ্ডি বাড়ি সনঝে কাটাতেন, তারপর একদিন সেই মেয়েছেলেটাকে খুন করে নিপাত্তা হয়ে গেছেন, একবার ভেবে দেখুন সাহাব, তোখন আপনার মান ইজ্জত, ইতো বড় ব্যবসা, ইতো লোকের খাতির, কোথায় যাবে? সে আপনিই বলুন?

লোকটি যে অতীব ভয়ঙ্কর তা বুঝতে দেরি হল না রামানন্দর। বেশ আঁটঘাট বেঁধেই যে নেমেছে এটাও বুঝতে অসুবিধা হল না। কিন্তু লোকটা কে? তার সম্বন্ধে এত কিছু জানলোই বা কেমন করে? ড্রাইভারটা নয়। সে লোকটা ছিল বাঙালি। কিন্তু এর কথায় অন্য টান। অবশ্য গলার সুর তিনি নরম করলেন না। জানেন এখন নিজেকে নরম করার অর্থই লোকটার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া। কিন্তু কী চায় লোকটা? তার বক্তব্যই বা কী? মোটামুটি নিজেকে স্বাভাবিক রেখেই বললেন, —তুমি কে?

—বহুত শরম কি বাত। বলতে লাজ আসছে। হামি সাব রমার হাজব্যান্ড।

—হোয়াট?

—জি সাব। কি কবব বোলেন, খেটে খেতে হামার একদম ভালো লাগে না। তার ওপব সব এই ডানহাতটায় তেমন জোর পাই না। রোজগারটা রমাই করত। মাঝে মাঝে খুব শরম লাগত। জেনানা পয়সায় দিন গুজবান। লেকিন দুধেল গাই তো, যেতো পারা যায় দুয়ে নেওয়া, এই আব কী

এই নির্লজ্জ লোকটার সঙ্গে আর কথা বলতে ভাল লাগছিল না রামানন্দর। কিন্তু ও যেভাবে চেযাবে এঁটে বসেছে চট্ কবে নড়বে বলে মনে হয় না।

—হামাব নাম সাব সোহন। সোহনলাল প্যাটেল। রমা আমার সাদি করা জরু। তো এখোন হামি বহুত বিপাকে আছি। দেড় বরষ হামার কোনো ধান্দা হচ্ছে না। তো, সেদিন আপনাকে গাড়িতে দেখলুম, ভাবলুম কী, হামার বিবিকে আপনি একদিন বহুত দিয়েছেন, তো আজ যদি আমাকে কুছ,

—কুছ মানে?

—এমোন কিছু বেশি লাগবে না। এই ধোরেন মাহিনামে একবার আসবে দোশ হাজার করে দিয়ে দিবেন। একদম ক্যাশ দিবেন। বাস, হামার মুখ বন্ধ, আউর আপনিও যেমন আছেন তেমন থাকবেন। দুনিযাব কোনো আদমি আপনাব টিকিভি ছুঁতে পারবে না।

বামানন্দব অনেক কিছু বলাব ইচ্ছে হয়েছিল। ইচ্ছে করছিল কষিয়ে লাথি মেরে চেম্বাব থেকে বাব কবে দিতে। কিন্তু কিছু না বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সোহনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেখতে লাগলেন লোকটা কদ্দুব এগোয়।

—কী সাব কী ভাবছেন? হামাব অবস্থা একদফে চিন্তা করেন।

—ভাবছি তোমার মতো রাস্কেলকে পুলিসে দোব না অন্য কিছু করব!

—পুলিস? হো হো করে হেসে উঠল সোহন, তাবপর যেন অনেক লজ্জা পেয়েছে, এমন ভাব দেখিযে নিমেষে হাসি থামিয়ে বলল, —গুস্তাফি মাফ বাবুজি, লিকিন, মাহ্‌লি হামাকে দোশ হাজার না দিলে, ও কাজটা হামিই কববে। পুলিসকে হামি জানাবে কি উস্‌দিন সন্‌ঝেবেলা আপনি শর্মিলা প্যাটেল বলে এক জেনানাকে খুন করেছেন, সে জেনানা ছিল আপনার কেপ্ট। লেকিন, পুলিসকে জানানোব আগে হামি যাবে আপনার বিবির কাছে। সতী মাইয়ার কাছে আউর কুছ্ বাতাবে। আউর থোড়া থোড়া দুসবা কামভি কববে। উসোব হামি এখোন বাতলাবে না।

বামানন্দ সোহনেব লেখা চিবকুটটা তুলে নিলেন। তাবপব সেটিকে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপাব বক্সে ফেলে দিলেন। ধীবে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরালেন, তারপব ততোধিক ধীরে ধীবে বললেন —বুঝলে সোহন, তোমার কয়েকটা কথা জানা দরকাব। তুমি খুব ভুল জায়গায় এসেছ। শর্মিলা বা বমা বলে কাউকে আমি চিনি না। কোনোদিন দেখিওনি। এই শহরে আমি একটা বড় ব্যবসা করি। তোমাব মতো ব্ল্যাকমেলাব আমাব অনেক দেখা আছে। তোমাদের কী করে টিট্ করতে হয় সেটাও আমার জানা আছে। নাউ, গেট আউট অফ মাই সাইট। একটা টাকাও তোমাকে আমি দোব না। আর শোন, ফারদাব যদি কোনদিন তোমাকে আমাব সামনে আসতে দেখি, আই উইল গো এক্সট্রিম ফর ইট। নাউ, লীভ দিস রুম।

রামানন্দর কথা শুনে সোহন হাসল তার সেই বিচ্ছিরি দাঁত বের করে। তারপর দু'দিকে হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। একটা লম্বা হাই তুলে বলল, —আপনার পেন আউর প্যাডটা দিবেন সাব?

—হোয়াই?

হোয়াই-এব কোনো উত্তর না দিয়ে সোহন নিজেই তুলে নিল একটা ডট্‌পেন। তারপর টেবিলে রাখা ডেট ক্যালেন্ডারের সাদা পাতায় একটা টেলিফোন নম্বর লিখে রামানন্দর দিকে ঠেলে দিয়ে বলল —একঠো ফোন নাম্বার দিয়ে গেলাম। দুদিন সময়ভি দিলাম। ঠাণ্ডা দিমাগে সোব কুছ ভাল করে চিন্তা করে দেখবেন। তারপর হামাকে ফোন করে জানিয়ে দিবেন আপনি কী করবেন, কী করবেন না! লেকিন ইয়াদ রাখবেন, আপনি একজন বিজনেস ম্যাগনেট আছেন, বাড়িতে আপনার জরু আছে, আপনার প্রেস্টিজ আছে, খুনের আসামি হতে কী দিল চাইবে? না না, এতো তাড়াতাড়ি না। ফর্টি এইট আওয়ার্স সময় আপনার হাতে আছে। ভাবেন, ভাবেন, এখোন হামি যাচ্ছে।

কলে ধরা পড়া ইঁদুরের মতো রামানন্দকে নিজের চেম্বারে রেখে দপদপিয়ে চলে গেল সোহনলাল। রামানন্দর মুখ থেকে একটা অশ্লীল ভাষা বেরিয়ে এল, —ব্লাডি, বাস্টার্ড।

সন্ধে পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ইদানীং নীলের কবিতা পড়ার দিকে ঝোঁক চেপেছে। তাও আবার আধুনিক কবিতা। হাতে কোনো কাজটাজ না থাকলে অবসর সময় কাটায় কবিতা পড়ে। আধুনিক কবিতা আর মডার্ন ফাইন আর্টস্ নিয়ে অনেক বিরূপ কথাবার্তা ওর কানে এসেছে। সেগুলো কতটা সঠিক সেইটুকু যাচাই করার জন্য মাঝে মাঝে ও অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস্-এর প্রদর্শনী-গুলোয় যাবে। ছবি দেখে বুঝতে চেষ্টা করে শিল্পী কী বলতে চেয়েছেন। কখনও রস গ্রহণ করতে পারে। কখনও সত্যিই দুর্বোধ্য রয়ে যায়। আধুনিক কবিতা সেই উদ্দেশ্যে পড়া। কিছু কিছু কবিতা বেশ কয়েকবার পড়ার পর কিছুটা বোধগম্য হয়। আবার কখনও সত্যিই কিছু বুঝতে পারে না। জটিল রহস্যের মতো। শব্দ নিয়ে কবি যেন পাঠকের সঙ্গে রহস্য খেলায় মেতেছেন।

আজও একটা শব্দের চাতুরির মধ্যে যখন ও গভীরভাবে ডুবেছিল হঠাৎ দীনু এসে খবর দিল কে একজন বাবু দেখা করতে এসেছে। কোনো ক্লায়েন্ট হতে পারে এই ভেবে সে বলল, —যা ডেকে নিয়ে আয়।

একটু পরই শ্যামদুলাল ঘরে ঢুকল, —আমি নীলাঞ্জন ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—হ্যাঁ আমিই, বসুন।

সামনের চেয়ারে বসতে বসতে শ্যামদুলাল বলল, —আমার নাম শ্যামদুলাল দত্ত। একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি।

নীল মৃদু হেসে বলল, —প্রয়োজন ছাড়া আমার কাছে খুব কম লোকই আসে। নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছেন?

—আজ্ঞে না। বিপদের একটা ব্যাপার আছে। তবে সেটা ঠিক আমার নয়।

—কী রকম?

—একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। হ্যাঁ, তার আগে জিজ্ঞাসা করি, আপনার ফীজ কী রকম?

—আগে আপনার ঘটনাটা শুনি।

—ব্যাপারটা কী জানেন, আমি হয়তো পুলিসে যেতে পারতাম, অথবা একদম চুপ করে থাকতে পারতাম। কিন্তু মনে হল, কাউকে জানানো দরকার। কোনো রেসপনসিব্‌ল্ লোককে। আপনার নাম আমি শুনেছি। খবরের কাগজেও আপনার রহস্য সমাধানের খবর পড়েছি। আর সত্যি কথা বলতে কী, পুলিসে আমার বড় ভয়। এতো টানা হেঁচড়া! সুস্থ জীবন তখন অসুস্থ হয়ে পড়বে।

—আপনি বলুন, আপনার সমস্যাটা কী?

—আগেই বলেছি, সমস্যাটা আমার নয়, তবে সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকেছে, কেমন যেন একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি তাই।

এরপর শ্যামদুলাল সামান্য সময়ের বিরতি নিল। তারপর বলল, —আমি একটু অল্প বয়সেই চাকরিতে ঢুকেছি। প্রায় বছর পঁচিশ হল আমি ঘোষ কেমিক্যালসের চাকুরে। বর্তমানে কোম্পানির ম্যাকটিভ ডিরেক্টর্ মিস্টার রামানন্দ বসুর পি.এ.। এমনিতে সব ঠিকই ছিল। আমার বস্ খুবই ভালো লোক। মাইনে টাইনেও বেশ ভালো। কিন্তু...?

—কিন্তু? কিন্তুটা কী?

—আপনার জানা আছে কিনা জানি না। প্রায় বছর দেড়েক আগে পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলের এক ফ্ল্যাটে শর্মিলা প্যাটেল নামে এক প্রস্টিটিউট রহস্যজনকভাবে খুন হয়েছিলেন। সেইসময় কাগজেও বেশ কিছুদিন এ ব্যাপার নিয়ে হইচই হয়েছিল, তারপর,

শর্মিলা প্যাটেলের নাম শুনে নীল বেশ নড়েচড়ে বসল। কয়েকদিন আগেই বিকাশ তালুকদারের সঙ্গে তার এ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছিল। তারপর আজ হঠাৎ এই ভদ্রলোকের মুখে সেই

নাম শুনে স্বাভাবিক কারণে নীলের ভাবান্তর ঘটলো। সে বেশ উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল
—কী নাম বললেন? শর্মিলা প্যাটেল? শর্মিলা প্যাটেলকে আপনি চেনেন?

—আজ্ঞে না। কিন্তু হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটায় ঐ নামটা ভাবাচ্ছে।

—কী রকম?

—তবে শুনুন, এই বলে শ্যামদুলাল তাঁর কাধের ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা ক্যাসেট বার করল তারপর বলল, জানি, কাজটা খুবই অন্যায়। অন্তত আমার বস্ যদি জানতে পারেন তাহলে আমার চাকরি নট্। ক্যাসেটটা আমায় কালই ফেরত নিয়ে যেতে হবে। কারণ ঘটনাটা ঘটেছে আজই দুপুরে খুব সম্ভবত উত্তেজিত থাকায় এই ক্যাসেটের ব্যাপারটা ওনার খেয়াল ছিল না। নিশ্চয়ই কাল সকালে এসে উনি প্রথমেই এই ক্যাসেটের খোঁজ করবেন। কাল সকালে গিয়ে প্রথমেই আমাকে এটা যথাস্থানে রেখে দিতে হবে। এটা এখুনি আপনাকে শোনাতে চাই। নিশ্চয়ই রেকর্ডার আছে?

—হ্যাঁ, তা তো আছেই। কিন্তু ক্যাসেটের ব্যাপারটা কী?

—মিস্টার বাসুর ঘরে একটা অদৃশ্য মাইক্রোফোন থাকে। অনেক সময় অনেক কথার নোট রাখতে হয়। হয়তো কোনো পার্টি কোনো কথা পরে অস্বীকার করতে পারেন অথবা কথাবার্তা চলাকালীন কী কী কথা হয়েছিল তা পরে মনে নাও থাকতে পারে, এইসব নানা কারণে ঐ মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা আজ দুপুরে একজন অদ্ভুত ধরনের লোক আমার বসের সঙ্গে দেখা করতে আসে। লোকটি পার্সোনালি বসের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কিছু কথাবার্তা চালায়। আমি বসি আমার বসের লাগোয়া কামরায়। আমার ওপর ইনস্ট্রাকশন দেওয়াই আছে। কোনো অচেনা বা বিশেষ কোনো লোক এলেই টেপটা সচল করা বলাবাহুল্য টেপ মেসিনটা থাকে আমার ঘরেই। আজও চালিয়েছিলুম, শুনুন এটা।

নীল ওর টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে এল। ক্যাসেটটা ভরে চালিয়ে দিল। খুব মনোযোগ দিয়ে ও সোহন আর রামানন্দর বাক্যালাপ শুনল। শুনতে শুনতে একটা অদ্ভুত পুলকে ওর সর্বাঙ্গে একটা শিহরনের স্রোত বয়ে গেল। দেড় বছর আগের এক অন্ধকারে জমে থাকা রহস্যের ওপর কে যেন ধীরে ধীরে আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। উত্তেজনায় ওর শরীর টান টান হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবল বিকাশ তালুকদার যদি এই টেপটা শুনতো তাহলে নির্ঘাত শ্যামদুলালবাবুকে আতিশয্যে একটা চুমুই খেয়ে ফেলতো নীল অতটা করল না। কারণ ওর আবেগ আর আতিশয্যের প্রকাশ অন্যরকম। টেপটা শেষ হতে ও রেকর্ডার থেকে টেপটা তুলে নিয়ে বলল, —আপনি ফীজের কথা বলছিলেন না? আপনাকে কিছু দিতে হবে না। কেসটা আমি অ্যাকসেপ্ট করছি। তবে আর একটা উপকার করতে হবে।

শ্যামদুলাল একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, —উপকার মানে?

—আমি আপনার ক্যাসেট থেকে একটা রিটেক করতে চাই।

—কিন্তু?

—সংশয় কিসের?

—আমার অফিস সংক্রান্ত নিয়মে কাজটা বেআইনি।

—কিন্তু আমার কাছে এসেছেন বিবেকের তাড়নায়। দেড় বছর আগের এই মিস্টিরিয়াস খুনের ব্যাপারটার আজও সমাধান হয়নি। আমার মনে হচ্ছে এই ক্যাসেট আমাদের কিছু সূত্র দিতে পারে। একটা অনাবিষ্কৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হোক এটাই তো আপনি চান?

—কথাটা ঠিক। কিন্তু আমার আসার আর একটা বড় কারণ সোহনলাল লোকটা হঠাৎ আমার বসের কাছে এলো কেন? আর কেনই বা রামানন্দ বসুর মতো লোককে সে ঐসব কথা বলতে সাহস পেলো? যদিও মিস্টার বসু লোকটাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু হুট বলতে কেউ একজন এসে এভাবে চার্জ করবার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে কোন্ যুক্তিতে এটাও তো জানার দরকার। অবশ্য যদি আপনি এটাকে পরচর্চার পর্যায়ে ফেলেন তাহলে আলাদা কথা।

—না শ্যামদুলালবাবু, সত্যকে জানতে গেলে মাঝে মাঝে পরচর্চা করতেই হয়। বিশেষ করে আমাদের, যারা আসল সত্যটাকে খুঁজে বেড়াই। যাইহোক, আপাতত আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন

রবে। সত্যের খাতিরে আপনি সঠিক উত্তর দেবেন নিশ্চয়ই?

—সেই জন্যেই তো আসা।

—আচ্ছা, রামানন্দবাবু লোকটা কেমন?

—ভাল। তবে বেশ কড়া ধাঁচের লোক। বিশেষ করে অফিসের ব্যাপারে কোনো ঢিলেমি উনি পছন্দ করেন না।

—ওনার সম্বন্ধে নারীঘটিত কোনো দুর্বলতার কথা আপনার জানা আছে?

শ্যামদুলাল এ কথার সহসা কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে কিছু ভাবল। তার একবার মনে হল দেড় বছর আগের সেই বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যার সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে। কিন্তু পরমুহূর্তে অযথা নিজের জড়িয়ে যাবার সম্ভাবনার কথা ভেবে ও প্রসঙ্গ তুলল না। তাছাড়া একটা বিশেষ জায়গা পর্যন্ত তার সব কিছু মনে আছে। তারপরই তো সব অন্ধকার। কেন এতদিন পুলিসকে সে একথা জানায়নি, তারও কোন সদুত্তর সে দিতে পারবে না। অনেক ভেবেচিন্তে কিছুটা সময় নিয়ে তারপর বলল, —ওনার জীবনে একটা ট্রাজেডি আছে। সেটি ওনার স্ত্রীর দিকে। যদিও শিবানীদেবীই আমাদের কোম্পানির মালকিন, এবং আমার যতদূর জানা, শিবানীদেবীকে বিয়ের পরই রামানন্দবাবু কোম্পানির ডাইরেক্টর হন। তবে ব্যক্তিগত জীবনে উনি ওনার স্ত্রীকে নিয়ে অসুখী এবং অতৃপ্ত।

—কি রকম?

এরপর শ্যামদুলাল ওর জানা অনুযায়ী রামানন্দ এবং শিবানীর বিবাহিত জীবনের সব কমপ্লেক্স কথা তুলে ধরল। জানাল মানুষ হিসেবে শিবানী দেবী ঠিক কেমন তা তার জানা নেই, তবে ঐরকম একজন বিশালাকার মহিলাকে নিয়ে কেউ দাম্পত্যজীবনে সুখী হতে পারে না।

—রামানন্দবাবুর বাহ্যিক জীবনে কী তার কোন প্রতিফলন দেখেছেন? নীলই প্রশ্নটা করলো।

—নাহলে রামানন্দবাবুকে নিয়ে নানান কথা হবে কেন?

—নানা কথা মানে? কী কথা?

—খুব সম্ভবত ওনার নারীঘটিত কোনো দুর্বলতা ছিল বা আছে।

—শর্মিলা প্যাটেল সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা নেই?

হঠাৎ চমকে উঠল শ্যামদুলাল। তারপর বেশ জোর দিয়েই বলল, —না।

শ্যামদুলালের গলার স্বরের তারতম্য এবং চমক কিন্তু নীলের নজর এড়ালো না। সেটা অবশ্য বুঝতে না দিয়ে ও বলল, —আপনার কী মনে হয় সোহনলালের অভিযোগ সত্যি? আই মিন, রামানন্দবাবু কী শর্মিলাকে খুন করতে পারেন?

—এসব ক্ষেত্রে একদম বাইরে থেকে হলফ করে কিছুই বলা যায় না। মানুষ বিপাকে পড়লে অনেক কিছু করতে পারে। হয়তো রামানন্দবাবু এমন কোনো অবস্থায় পড়েছিলেন, যাতে করে ইচ্ছে না থাকলেও উনি বাধ্য হয়ে খুন করে থাকতে পারেন।

—অর্থাৎ রামানন্দবাবু প্রয়োজনে খুন করতে পারেন?

শ্যামদুলাল কিছু না বলে চুপ করে থাকে। ঘাড় নাড়তে নাড়তে নীল বলে, —হুঁ। আচ্ছা, ওনার স্ত্রীকে কি উনি ভয় করেন?

—পৃথিবীর সব স্বামীই কোনো না কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের স্ত্রীদের বোধহয় ভয় করেন। মানে, কোন একটা বইতে বোধহয় পড়েছিলাম একথাটা।

—এনিওয়ে, সোহনের দেওয়া ফোন নাম্বারটা জেনেছেন?

—না। ওটাতো ও মুখে বলেনি, কাগজে লিখে দিয়েছিলো।

—ফোন নাম্বারটা জরুরি। কালই অফিসে গিয়ে খোঁজ করবেন। আপনার অসুবিধে নেই। আপনি তো ওনার পি. এ.। একটু অপেক্ষা করুন। অফিস থেকে তো ডাইরেক্ট ফিরছেন। চা জলখাবার খান। আমি ততক্ষণে রিটেকিংটা সেরে ফেলি। ভয় নেই, বিশেষ প্রয়োজন না হলে এটা ব্যবহার করব না।

নীল পাশের ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে দীনু চা জলখাবার দিয়ে গেল। মিনিট কুড়ি পর

নীল ফিরে এসে অবিজিন্যাল ক্যাসেট ফেরত দিতে দিতে বলল, —আপনার কোঅপারেশনের জন্য ধন্যবাদ। কোনো নতুন খবব থাকলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। সোহনলাল এলেই খবরটা দেবেন। এই আমাব ফোন নাম্বাব।

শ্যামদুলালেব চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। উঠব উঠব ভাব। নীল সোফায় বসতে বসতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা কবল, —আচ্ছা শ্যামদুলালবাবু, ঘোষ কেমিক্যালসে আপনার চাকরি যেন কতদিনের?

—অনেক দিনের। তা আপনার রামানন্দ বসুব আগে থেকেই। উনি তো আমার অনেক নিচু পোস্টে ঢুকেছিলেন।

নীলেব মুখে ফিকে হাসি। ধীবে ধীবে ও বলল, —এক লাফে সবাইকে টপ্‌কে কেউ গাছে উঠলে অন্যবা চায তাব মইটা কেড়ে নিতে তাই না?

অদ্ভুত প্রশ্নে শ্যামদুলাল থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা কবল,—আপনার প্রশ্নটার ঠিক অর্থ বুঝলাম না।

—অ্যাঁ, না কিছু না।

—তাহলে আজ আমি উঠি?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। সোহনলালেব খববটা কিন্তু জরুবি।

—সে আব বলতে, শ্যামদুলাল উঠে পড়ে। যেতে গিয়ে হঠাৎ ঘুবে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন কবে, —আচ্ছা নীলাঞ্জনবাবু, আপনাব কী মনে হয় সত্যিই শর্মিলাকে রামানন্দবাবু খুন কবেছিলেন?

হাসতে হাসতে নীল বলল, —আপনিও যেখানে আমিও সেখানে। তবে একটা কিছু ধবাব মতো অবলম্বন যখন পাওয়া গেছে তখন আসল খুনি ধবা পড়বেই।

সোহনলাল চলে যাবাব পব সেই যে রামানন্দ গুম হয়ে গিয়েছিলেন তাবপর থেকে বেশ কয়েক ঘণ্টা একটা বোবায় পাওয়া অবস্থা। সাবাদিন অফিসে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু শ্যামদুলালকে জানিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন আব কাবো সঙ্গে তিনি কোনো কথা বলবেন না। কেউ দেখা করতে এলে সে যেন বলে দেয সাহেব খুব ব্যস্ত। অন্যদিন যেন আসে।

আসলে সোহনলাল চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেড় বছরের পুরনো ভয়টা ধীরে ধীবে তাঁকে গ্রাস কবে ফেলেছিল। দেড় বছব ধবে ফিবে পাওয়া শক্তিটা যেন নিমেষে উধাও হয়ে গিয়েছিল। সেই বীভৎস সন্ধ্যাটা তাঁকে সমানে কসাঘাত কবে চলল। ফাইলগুলো টেনে নিয়ে বসতে চেয়েছিলেন চেয়েছিলেন মনটাকে অন্যত্র সবিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু ভয জিনিসটা এমনই, তাকে জোর করে ছাড়াতে চাইলেও সে ছাড়ান দেয না। পুবনো ব্যাধিব মতো সুযোগ পেলেই চেপে বসে।

শর্মিলা প্যাটেল। অসামান্যা রূপসী। প্রথম আলাপ এক পার্টিতে। সবাব নজর কাড়া মেয়েটি বামানন্দকেও আকৃষ্ট কবেছিল। আর পাঁচজনের মতো তিনিও বারবার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন মেয়েটির দিকে। অবশেষে একসময়ে মেয়েটি নিজেই এগিয়ে এসে আলাপের সূত্রপাত কবেছিল।

বামানন্দব ধারণায় ছিল না একটি সুন্দরী মহিলার সান্নিধ্য কত মনোরম হতে পারে। তার ভাঙা বাংলায় আধো আধো বুলি, মিষ্টি হাসি, চোখের কোণে মন অবশ করা চাহনি আর উচ্ছল যৌবনের বর্ণাঢ্য সুষমা রামানন্দকে পাগল করে দিয়েছিল সেই এক সন্ধ্যাতেই। এর ওপর ছিল সুবাব মদিবতা।

রামানন্দ ভেসে গিয়েছিলেন। ভাসাই স্বাভাবিক। প্রথম জীবনে তিনি চেয়েছিলেন প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন অর্থানুকুল্য। একসময় সবই পেয়েছিলেন। হয়েছেন একটি কোম্পানির ডিরেক্টর। ইচ্ছেমতো খবচ করাব টাকা, গাড়ি, বাড়ি, সবকিছু। কিন্তু তার জন্যে বিসর্জন দিতে হয়েছিল জীবনের আব এক দিক।

নিজের হাতেই নিজেকে তিনি কবরস্থ করেছিলেন। শিবানীর মতো এক আপাত অচল মহিলাকে বিয়ে করে যৌবনের মহাস্বাদ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। হয়তো এমনি ভাবেই দিন কেটে যেত ব্যবসার নেশায়। টাকায় নেশায়। কিন্তু তা কাটল না। যৌবনকে অস্বীকার করা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পক্ষে সম্ভব হয়নি। চল্লিশের দোরগোড়ায় এসে তিনি বুঝলেন জৈব যন্ত্রণা তাঁর সমস্ত অতৃপ্তি নিয়ে হাহাকার

হবে চলেছে। দুগ্ধফেননিভ নিভাঁজ শয্যায় অনেক রাত বিনিদ্র কেটেছে। চঞ্চল হয়েছেন একটি নারী দেহের কামনায়। পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখেছেন পাশের খাটে শুয়ে আছে শিবানী। বিপুল মেদ-চর্বি সর্বস্ব বিশাল অবয়বমাত্র। ঘুমের তালে তালে তার সর্বাঙ্গ উঠছে নামছে। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যেও ইচ্ছাবোধ জাগরিত হয়নি, চর্বি-মাংসের ঐ বিশাল পিণ্ডাকার দেহটি ছুঁয়ে দেখতে। সমস্ত কামনা নিমেষে অন্তর্হিত হয়েছে। তাঁকে নিক্ষেপ করেছে মহাশ্মশানের শূন্যতায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুয়েছেন। কতদিন ভেবেছেন এ কোন্ জীবন তিনি অতিবাহিত করে চলেছেন? যে অর্থের কামনায় তিনি জীবনের এক মহাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত, তাই কী তিনি নিজের মত করে পেয়েছেন? এই যে দিনরাত ব্যবসার কথা ভাবেন, তাও তো তাঁর নিজের নয়। সেখানেও যে চরম পরাধীনতা।

ভবেশ ঘোষের উইলের শর্ত মানলে সে শিবানীর ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছুই নয়। শিবানী তাকে ইচ্ছেমত খরচের স্বাধীনতা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রতিটি খরচের জন্যে তাকে পরোক্ষে জানাতে হয় । খরচ কি জন্যে? পরের ধনে পোদ্দারি করলে যার ধন তাকে তো কৈফিয়ত দিতেই হবে।

না, শিবানী তাঁকে কখনোই কোন প্রশ্ন করে না। শিবানীর সে স্বভাবই নয়। কেবলমাত্র ফুলশয্যার রাতেই যা শিবানী অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলেছিল। তারপর থেকে বিনা প্রয়োজনে তো নয়ই, কেবলমাত্র প্রয়োজনটুকু মেটানোর জন্যেই তার বাক্য খরচ।

দিন পনের অন্তর সে একবার করে হিসাবপত্রের খাতায় চোখ বোলায়। যদিও সে কাজের জন্যে অ্যাকাউনট্যান্ট আছেন, অডিট আছে। তবু সে একবার করে অবশ্যই হিসাব দেখবে। কোন কারণে যদি বেশি চেক-টেক কেটে ফেলেন রামানন্দ, শিবানী একবার তার সেই অদ্ভুত ভাবলেশহীন চোখ তুলে কেবল তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবে। ব্যস, তাতেই কাজ হয়ে যায়। রামানন্দকে তখন বলতেই হয় চেকটা কী কারণে কাটা হয়েছে। অথচ রামানন্দ বুঝতে পারেন স্বামী হিসাবে শিবানী তাঁকে ভালবাসে। তাঁর প্রতিটি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে শিবানীর কড়া নজর। দাসদাসীদের হাতে নয়, নিজের হাতে সে স্বামীর পরিচর্যা করে। রামনন্দ কী খাবেন, কোন গাড়িতে চেপে অফিসে যাবেন, কোন স্যুট তিনি করে পরবেন, সঙ্গে কী টাই ম্যাচ করবে, সব কাজই সে নিজে করবে। মাসান্তে একবার করে ডাক্তার আসবে। হবে টোট্যাল চেকআপ।

চল্লিশ ছুঁই ছুঁই রামানন্দর জীবন যখন প্রায় অতিষ্ঠ, মাঝে মাঝে যখন তিনি ভেবে ফেলতেন এভাবে কোন সুস্থ পুরুষ মানুষের বাঁচা সম্ভব নয়, ঠিক তখনই দেখা শর্মিলা প্যাটেলের সঙ্গে। গুমোট ঘরে দমকা হাওয়ার মতো শর্মিলা তাঁর সব কিছু এলোমেলো করে দিল। ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের এক উদ্ভিন্নযৌবনা। চোখে মুখে এক অনাবিল আকর্ষণ। জীবনে এলো আর এক অন্য স্বাদ। যে স্বাদ প্রায় চল্লিশ পর্যন্ত অনাস্বাদিত। তাঁর মধ্যে ঘুমন্ত যৌবন উদ্দাম হয়ে উঠল। তাঁর অস্থির অবদমিত বাসনা, সাগরের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ল শর্মিলার যৌবনদীপ্ত বেলাভূমিতে। এত অপার আনন্দ যে এক নারীর শরীরের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে এ বোধ তাঁর ছিল না। চল্লিশের আনন্দে তিনি ভাবলেন শর্মিলা তাঁর জীবনে না এলে জীবনের এক মহাজ্ঞান তাঁর অগোচরেই থেকে যেত।

মানুষ যখন উদ্দাম চলায় মেতে ওঠে তখন আর তার আশপাশ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে না। আসলে সে তখন অন্য কিছু তাকিয়ে দেখতে ভালবাসে না। তা যদি পারতো তাহলে রামানন্দ দেখতে পেতেন তাঁর অফিস কর্মচারীদের মধ্যে তখন রীতিমত গুঞ্জন উঠেছিল রামানন্দকে ঘিরে। অবশ্যই কেউ এনিয়ে কোন প্রকাশ্য রসালাপে মত্ত হতো না।

এমনি করেই কোথা দিয়ে যেন বছর দেড়েক কেটে গিয়েছিল। শর্মিলার জন্যে একটা বিরাট অঙ্ক প্রতিমাসে খরচ হতো। শিবানীর নীরব জিজ্ঞাসাকে ব্যক্তিগত খরচ বলে পাশ কাটাতেন মরিয়া হয়ে। শর্মিলার প্রেমে তিনি তখন এতোই মশগুল ছিলেন, শিবানীর ভাবাভাবির দিকে ফিরে তাকানোর কোন অবসর ছিল না। অবশ্য শিবানীও তার স্বভাবজাত কারণে কোনদিনও রামানন্দকে কোন প্রশ্ন তুলে বিব্রত করেনি। কিন্তু হঠাৎই সব কিছু তালগোল পাকিয়ে গেল। দেড় বছর আগে, এক বৃষ্টিঝরা রাতে তাঁর সব হিসেব পাল্টে গেল।

শর্মিলা বারবনিতা হলেও তার রূপ, তার ব্যবহার, তার প্রাণ উদ্বেল করা মোহময়ী আকর্ষণ রামানন্দকে অন্ধ করেছিল। বোধহয় তিনি শর্মিলাকে ভালোটালোও বেসেছিলেন। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল শর্মিলাকে এক সন্ধ্যায় না দেখলে তাঁর মন খারাপ হয়ে যেতো। শর্মিলার সঙ্গে ছিল তাঁব নিত্যদিনেব সন্ধ্যা-সুখ।

দেড়বছর আগেব সেই সন্ধ্যেটা আজো মনের মধ্যে দগদগ করে জ্বলছে। সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল। আর বৃষ্টিটৃষ্টি প্রেমিকদেব একটু উদ্বেল কবেই। চেম্বারে বসে কাজ করতে করতেই তাঁর মনে হচ্ছিল শর্মিলার কাছে ছুটে যেতে। শর্মিলার ফ্ল্যাটে যাবার কোনো বাধাই ছিল না। তাতে তাঁর সুবিধাই হয়েছিল। তাঁব সঙ্গে শর্মিলার চুক্তি ছিল শর্মিলা আব কোনো পুরুষকে সঙ্গ দেবে না। তার জন্য তাব যাবতীয় খবচ বহন করলেন রামানন্দ। চুক্তি খবচের বাইরেও অনেক খরচ করতেন তিনি শর্মিলার জন্য। সেটা ভাল লাগাব উপবি দান। ফ্ল্যাটের দুটো চাবি। একটা থাকত শর্মিলার কাছে অন্যটা বামানন্দ রাখতেন নিজের কাছে।

দুপুরের ইচ্ছেটা চাপা দিয়ে বেখেছিলেন সন্ধে পর্যন্ত। তাবপর শ্যামদুলালকে ছুটি দিয়ে, কিছুক্ষণ পব গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন নিজের গাড়ি নিয়ে। নির্দিষ্ট পার্কিং জোনে নিজেব গাড়িটি বেখে বৃষ্টিব মধ্যেই হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিলেন পূর্ব নির্দিষ্ট একটি গাড়ি বাবান্দার নিচে। যেখানে প্রতিদিনই নির্দিষ্ট সময়ে ভাড়া কবা ট্যাক্সিটি এসে দাঁড়িয়ে থাকতো।

সন্ধেব পরই বৃষ্টি নেমেছিল মুষলধারে। প্রায় মিনিট পনেরো অপেক্ষা করতে হয়েছিল ট্যাক্সিওয়ালার জন্যে। যা সে কোনদিনই করতো না। বৃষ্টিব জন্যেই সে আটকে পড়েছিল। লোকটির সঙ্গে বেশি কথা না বাড়িয়ে তিনি সোজা চলে এসেছিলেন সেই ম্যানসনে।

বৃষ্টির জন্যেই হোক আব যে কাবণেই হোক, ম্যানসনেব আশেপাশে তখন কোনো লোকজন ছিল না। এমনিতেই জাযগাটা নির্জন। তায় বৃষ্টি। অবশ্য লিফট্ ছিল। কিন্তু সেলফ্ অপারেটেড লিফ্ট তিনি পাবতপক্ষে এড়িয়েই চলেন। সিঁড়ি ভেঙে খুব খুশি খুশি মনেই তিনি ওপরে উঠে গিয়েছিলেন। সিঁড়িব ডান দিকে বারো নম্বর ফ্ল্যাট। সমস্ত ফ্ল্যাটেবই দবজা তখন বন্ধ। কেবল সামান্য কিছু দূরে দূবে টিমটিমে আলো জ্বলছিল। স্পষ্ট মনে আছে, এই দেড় বছব পবেও, দুপাশে সাবি সারি ঘর, মধ্যে টানা করিডর, কোথাও একজন মানুযেবও সেখানে উপস্থিতি ছিল না। এমনকি কোনো চাকরবাকরও না। অভ্যাসমত বাবো নম্বর ঘবের সামনে গিয়ে বৈদ্যুতিক নবে আঙুলের চাপ দিয়েছিলেন। অন্যদিন একবার কী দু'বার বেল টিপলেই রঙিন হাউসকোট পবা হাস্যমুখী শর্মিলা এসে দাঁড়াতো। তারপর নিজের হাত দুটো বাড়িয়ে রামানন্দকে দু'হাতে ধরে তাকে ভেতবে নিয়ে যেতো। কিন্তু বারবার তিনবাব বেল টিপেও সেদিন কোনো সাড়াশব্দই পাননি। একটু বিস্মিত হয়েছিলেন রামানন্দ। তাঁব সঙ্গে শর্মিলাব দেড় বছরের ঘনিষ্ঠ জীবন। একদিনেব জন্যেও মেয়েটি তাঁর সঙ্গে কোনো চুক্তিব খেলাপ কবেনি। বরং অনেক দিনের পুবনো সাধ্বী-স্ত্রীব মতো তাঁর সেবা যত্ন কবতো, আদব আপ্যায়ন কবতো।

আরো বারকতক বেল বাজানোর পরও যখন দবজা খুলল না, তখন বাধ্য হয়েই তিনি নিজের কাছে রাখা ডুপ্লিকেট চাবি ঘুবিয়ে দবজা খুলে ভেতরে গিয়েছিলেন। সাজানো গোছানো ঝকঝকে ডাইনিং স্পেস। উজ্জ্বল নিওনেব আলোয চাবদিক ঝকমক করছে। কোথাও কোনো মালিন্যের ছাপ ছিল না। টু-রুমস্ ফ্ল্যাট। একটা ঘব ছিল ভেজানো। সে ঘরে কোন আলো জ্বলছিল না। ডাইনিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে, স্পষ্ট মনে পড়ে তিনি শর্মিলার নাম ধবে ডেকেছিলেন। কিন্তু কোন ঘর থেকেই কোনো সাড়া আসেনি। স্বাভাবিক কারণেই দ্বিতীয় শয়নকক্ষের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। দরজা ভেজানো ছিল চাপ দিতেই খুলে গিয়েছিল।

প্রথমটা কিছুই চোখে পড়েনি। ঘরের মধ্যে ঢুকে আরো একবার তিনি শর্মিলাকে নাম ধরে ডেকেছিলেন। সাড়াশব্দ না পেয়ে এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে আসল দৃশ্যটা চোখে পড়েছিল। আঁতকে উঠেছিলেন। প্রথমটা তাঁর বিশ্বাসই হয়নি। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়েছিলেন। ততক্ষণে সব শেষ। খুব কাছ থেকেই কেউ তাকে গুলি করে হত্যা করেছে। সারা পিঠ রক্তাক্ত। একপাশে কাত হয়ে থাকা শর্মিলার

ন্দব মুখে মৃত্যু যন্ত্রণার কালো ছায়া।

ঘটনার আকস্মিকতায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর কি করা কর্তব্য। প্রথমেই ছুটে গিয়েছিলেন টেলিফোনের কাছে। কিন্তু ফোন তোলাব আগেই তার মনে হয়েছিল, একী বোকামির কাজ তিনি করতে যাচ্ছিলেন? ডাক্তারকে খবর দেবেন? না পুলিসকে? কিন্তু তিনি খবর দেবার কে? পুলিস বা ডাক্তাব এসে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করবে তাঁব পরিচয়। মৃতার সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক? তাঁর তো জবাব দেবার মতো কিছু নেই। শর্মিলার সঙ্গে তাঁব তো কোনো সামাজিক পরিচয় নেই। আসল সম্পর্ক যখন জানাজানি হয়ে যাবে কলঙ্কে মাথা হেঁট তো হবেই, উপরন্তু খুনের কেসে জড়িয়ে পড়বেন।

মুহূর্তের মধ্যে ঘরের আলো নিভিয়ে দ্রুত বেবিয়ে এসেছিলেন। বেরুবার আগে উঁকি দিয়ে করিডোরটা দেখে নিয়েছিলেন। না কেউ নেই। দরজা টানতেই লক হয়ে গিয়েছিল। ইয়েল লক। তারপর অতি সতর্কতায় সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসেছিলেন নিচে। রাস্তায় তখন মুষলধারে বৃষ্টি। গায়ে বর্ষাতি তো ছিলই। এক দৌড়ে রাস্তা পাব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সিতে চেপে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে পার্কিংজোন থেকে নিজের গাড়িতে চেপে বেশ কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘোরাঘুরির পব একসময়ে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে চলে গিয়েছিলেন সোজা নিজের বাড়ি।

না, সেখানেও কোনো বিসদৃশ ঘটনার কথা তাঁর মনে পড়ছে না। রোজকার নিয়মেই সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। বাড়ি ফিবে নিজের হাতঘড়িব দিকে তাকিয়েছিলেন। রাত প্রায় পৌনে দশটা।

বর্ষাতিটা খুলে রেখে দোতলায় গিয়ে দেখেন শিবানী নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। তাব দিকে একবার তাকিয়ে শিবানী বলেছিলেন,—গা হাত পা মুছে এসো। নইলে জ্বরটব হতে পারে। কফি কবব?

—নাহ্ থাক। আজ একটু..., বলে তিনি বাথরুমে চলে গিয়েছিলেন। তারপব একসময় রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়েছিলেন। যদিও সে রাত্রে তাঁর কোনো ঘুমই আসেনি। সারাবাত শয্যায় এপাশ ওপাশ করেছিলেন। বার বার মনে পড়েছিল মৃতা শর্মিলার কথা। বার বাব মনে হচ্ছিল তিনি না ফেঁসে যান। একমাত্র তাঁর ভেজা বর্ষাতির গা বেয়ে নেমে আসা বৃষ্টির জল আর গামবুটের ছাপ ছাড়া অন্য কোনো নিদর্শনই তিনি শর্মিলার ঘরে ফেলে আসেননি। আচ্ছা, বৃষ্টিতে কি পুলিসের কুকুরের ঘ্রাণশক্তি কাজ করবে? তা যদি না করে তাহলে পুলিসের সাধ্য নেই তাঁব কাছে আসার। এক যদি না ট্যাক্সি ড্রাইভারটা খুনটুনের খবব শুনে পুলিসে রিপোর্ট করে। অবশ্য রামানন্দর সঠিক ঠিকানা তাবও জানা নেই। রাস্তাতেই কনট্যাক্ট। হিসেব নিকেশ রাস্তাতেই শেষ।

সে রাত্রে রামানন্দব ঘুম আসেনি আরো একটা কারণে। তিনি নিশ্চিত জানেন, শর্মিলাকে তিনি খুন করেননি। শর্মিলার জন্যে তাঁর হৃদয় ছটফট করতো। তাঁর অতৃপ্ত জীবনকে শর্মিলাকে ভরিয়ে দিয়েছিল তার কার্পণ্যহীন যৌবনের ডালি সাজিয়ে।

না, শর্মিলাকে তিনি খুন করেননি। করতে পারেন না। তাহলে কে তাকে খুন করল?

পরের দেড় বছরে শর্মিলার স্মৃতি অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছিল। মাঝে মাঝে মধুর স্মৃতির রেশটুকু তাঁকে রোমাঞ্চিত করতো। একটা অযাচিত বিপদেব হাত থেকে ত্রাণ পেয়ে তিনি আবার নবোদ্যমে ফিবে গিয়েছিলেন নিজের পুরনো জীবনে। না, শিবানীও তাঁকে কিছু সন্দেহ করেনি। একদিনের জন্যেও জিজ্ঞাসা করেনি কেন তখন বাড়ি ফিরতে রাত হতো, কেনই বা এখন সন্ধেব ঠিক পরে পরেই বাড়ি ফিরে আসেন। তবে দেড় বছরে একটা কথাই বার বাব তাঁর মনে খোঁচা দিত, কে খুন করল শর্মিলাকে? তাব কোনো পুরনো নাগর? ঈর্ষাব জ্বালায়? নাকি অন্য কোনো কারণে? পুলিসও কয়েকদিন চেষ্টা চালিয়েছিল। তারপর কালের নিয়মে এক সময় সব থিতিয়ে গিয়েছিল।

বেশ ছিলেন রামানন্দ। কিন্তু হঠাৎ একী উৎপাত? কে এই সোহনলাল? বলছে, স্বামী। দেড় বছর পর হঠাৎ ধূমকেতুর মতো তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতে চাইছে?

সত্যিই কী শর্মিলার স্বামী? শর্মিলা কিন্তু কোনোদিনও তার কোনো স্বামী-টামীব কথা বলেনি।

ও বলেছিল, ছোটবেলার ওর একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তারপর সে মারা যায়। বিধবা মা অনেক কষ্টেসৃষ্টে মানুষ করেছিলেন। কিন্তু এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে সংসার অচল হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে জীবিকার সন্ধানে নামতে হয়। কিন্তু সুন্দরী মেয়ের পক্ষে জীবিকার সহজ পথ খোলা থাকে না। যা থাকে তাতে মায়ের ওষুধ-পথ্য জুগিয়ে সংসার চালানো শর্মিলার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে সহজে অনেক টাকা রোজগারের এই পথটাই খোলা ছিল।

এইসব মেয়েদের কাহিনীগুলো মোটামুটি সব একই। রামানন্দও ও নিয়ে মাথা ঘামাননি। আসলে তাঁর শর্মিলাকে ভাল লেগেছিল। তিনি তাঁর অতীত নিয়ে কিছু চিন্তাও করেননি। একটি নারীর কাছে পুরুষ যা চায় সবই শর্মিলার কাছে তিনি পেয়েছিলেন। তাতেই তিনি সুখী ছিলেন। কিন্তু সোহনলাল হঠাৎ কোত্থেকে যে হাজির হোল?

সোহনলাল চলে যাবার পর সারাদিন ঐ একই কথা ভেবেছেন। তিনি নিশ্চিত জানেন সোহনের কাছে এমন কোনো প্রমাণ নেই যা দিয়ে সে রামানন্দকে ফাঁসাতে পারে। কিন্তু লোকটা জানে যে সেদিন তিনি শর্মিলার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। এবং শর্মিলার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক ছিল এটাও সোহনের অজানা নয়। তাহলে সে কখনই তার মুখের ওপর অত বড় বড় কথা বলে যেতে পারতো না।

কিন্তু সত্যিই যদি লোকটা ঝামেলা করে? যদি সে পুলিসে যায়? যদি সে সারা অফিসের লোককে জনে জনে বলে বেড়ায়? সব থেকে বড় ভয় শিবানীকে নিয়ে। শিবানীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যাই থাক, তিনি যে একজন নিষ্কলঙ্ক পুরুষ এটা সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। সে কেবল জানে তার স্বামীর একটু আধটু নেশা-টেশা করার অভ্যেস হয়েছে। সে ব্যাপারে সে কিছু মনেও করে না। বাড়িতে নিজের ঘরে বসে মদ্যপান করাতেও তার বিন্দুবিসর্গ আপত্তি নেই। বরং নিজেই সে কয়েকবার দামী বিলিতি হুইস্কি বিভিন্ন অকেশানে প্রেজেন্ট করেছে। রামানন্দ বেশ ভাল করেই জানেন, শিবানীর এক প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার আছে তাঁর সম্বন্ধে। শিবানীর ধারণা রামানন্দ সৎ, পরিশ্রমী, বিশ্বাসী এবং চরিত্রবান।

কিন্তু সোহনলাল যদি সে রাত্রের ঘটনার উল্লেখ নিয়ে সরাসরি শিবানীর সঙ্গে দেখা করে, অথবা কোন ভাবে শিবানীর কানে তোলে শর্মিলার সঙ্গে তাঁর অবৈধ মেলামেশার কথা, তাহলে তাঁর সব ইমেজ মুহূর্তে খান খান হয়ে যাবে। স্বরচিত স্বর্গটি নিমেষে চুরমার হয়ে যাবে।

না, সে অসম্ভব। শিবানীর কাছে তাঁর উঁচু মাথা কিছুতেই নামিয়ে আনতে পারবেন না। দাম্পত্যজীবনে অতৃপ্তি হয়তো আছে, কিন্তু তার বদলে আছে একটি নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন সুখের আবাস। শিবানী যদি এসব জানতে পারে তাহলে হয়তো একূল ওকূল দুকূলই বিসর্জন দিতে হবে।

অফিস থেকে একটু আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন রামানন্দ। আজ আর তাঁর কোন কিছুই ভাল লাগছিল না। গাড়ি নিয়ে সোজা চলে গেলেন গঙ্গার ধারে। সোজা ফোর্টউইলিয়মের দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে এসে থামলেন গঙ্গার ধারে। গাড়ির মধ্যেই গঙ্গার দিকে মুখ করে বসে রইলেন অনেক অনেকক্ষণ। মাথার মধ্যে আকাশ-পাতাল চিন্তা।

এক একবার তার মনে হচ্ছিল গুলি করে সোহনলালের খুলি উড়িয়ে দিতে। লোকটা খুব সেয়ানা আর শয়তান। এত সহজে সে নিষ্কৃতি দেবে বলে মনে হয় না। লোকটার স্পর্ধা কী! রীতিমত ব্ল্যাকমেলিং। তাও এক আধ টাকা নয়। প্রতি মাসে দশ হাজার। যা তাঁর পক্ষে একান্তই অসম্ভব। প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা চেক কাটবেন কোন্ অ্যাকাউন্টে? শিবানীর কাছে কৈফিয়ৎ দেবেন কী? একবার দশ হাজার নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রতি মাসের নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত দশ হাজার নেওয়া সম্ভব নয়। শিবানী জানতে চাইবেই। চাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু উত্তর? চ্যারিটি? কোথায়? কাকে? এবং এ চ্যারিটি বেশিদিন চললে খুব ন্যায়সঙ্গত কারণে শিবানী খোঁজখবর নিতে থাকবে। আর শিবানী যে ধরনের চতুর মহিলা, ওর পক্ষে আসল ব্যাপারটুকু জেনে নেওয়া এমন কিছু শক্ত নয়। প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা তোলা মানে আখেরে ধরা পড়ে যাওয়া তখনও একূল ওকূল দুকূলই যাবে। ঘর বার কোনো কিছুই রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

কিন্তু এখন কী করা যায়? ভাবতে ভাবতে রাত গড়িয়ে চলল। সিগারেটের পর সিগারেট শেষ

হয়ে গেল। এরই মধ্যে গাড়ির আশেপাশে দু'একটা স্ট্রিট গার্লেব মুখ উঁকি দিয়ে, বিশেষ অঙ্গভঙ্গি জানিয়ে দূরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে রইল।

রামানন্দর ওসব দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। হঠাৎ তাঁর মাথায় একটি কথা বিদ্যুৎ চমকের মতো খেলা করে গেল। বোধহয় ফুলশয্যার রাতেই শিবানী তাঁকে একটা কথা বলেছিল। আমার কাছে কোনো কিছু লুকিও না। গোপন করাটা আমি ঠিক পছন্দ করি না।

বামানন্দ ভাবলেন, আচ্ছা তাই যদি হয়? সোহন ভয়ানক রকমের নাছোড়াবান্দা শয়তান। টাকা না পেলে ও সবকিছু করতে পারে। দরকার পড়লে ও স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই ব্ল্যাকমেল শুরু করবে। আব শিবানীকে লুকিয়ে টাকা দেওয়া তার পক্ষে কোনো মতেই সম্ভব নয়। অথচ ন্যায়সঙ্গত কারণেই সে এক পয়সাও সোহনকে দেবে না। কাবণ বামানন্দ শর্মিলাকে খুন করেননি। বিনা কারণে তাঁকে চবম দুর্ভোগে পড়তে হবে।

বাঁচার শেষ অস্ত্রটি তিনি তুলে নিলেন। ভেবে দেখলেন এছাড়া কোনো মতেই তিনি অন্তত গৃহশান্তি বজায় রাখতে পারবেন না। শিবানীর কাছে সবকিছু স্বীকার করা। গত তিন বছবের শর্মিলা সংক্রান্ত সব কথা খুলে বলা। তাহলে হয়তো শিবানীর মার্জনা তিনি পেতে পারেন। ভুল তো মানুষই করে। তিনিও করে ফেলেছেন। শিবানী দেখতে জবদগব হলেও প্রচণ্ড বুদ্ধিমতী। সহানুভূতিশীলা। অপবাধী দোষ স্বীকার করলে ক্ষমা কবার মতো মানসিকতা তাব আছে। অন্তত বাইরেব শত্রুটিকে ঘায়েল করতে হলে ঘরেব পদানত হওয়া অনেক সুখেব। হয়তো শিবানীই কোনো উপায় বাতলে দেবে। আর পুলিস? মনে হয় না লোকটার পুলিসে যাবার ক্ষমতা আছে। তাহলে দেড় বছবের মধ্যে সে পুলিসে যেতো। আব গেলেই বা কী? একজন উটকো লোক এসে বলে দিল অমনি তিনি খুনি হয়ে গেলেন? তাব জন্যে প্রমাণ দরকার। তার জন্যে আদালত আছে। আইন আছে। আইনজীবী আছে। শিবানী যদি একবাব ক্ষমা করে দেয় তাহলে সেই সেরকম বুঝলে বড় ব্যারিস্টার বাখবে। সোহনলালকে টিট্ কবা শিবানীব কাছে কিছুই নয়।

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল রামানন্দর। শেষ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। সোজা এসে পৌঁছলেন নিজের বাড়িতে।

রাত তখন প্রায় ন'টা। এ সময়ে অন্যদিন শিবানী নিজেব বিছানায বসে হয় হিসেব-টিসেব দেখে নযতো বইটই পড়ে। বই পড়াটা ওর বিশেষ নেশা। সেদিন কিন্তু শিবানী বিশাল হলঘরটায় তদারকিব কাজ করছিল। চাকর রঘুনাথকে দিয়ে সোফাগুলো একটু এদিক ওদিক সরাচ্ছিল। টুকিটাকি গৃহকর্মগুলো ও সময় পেলেই রঘুনাথকে দিয়ে করিয়ে নেয়। রঘুনাথ অনেক দিনের পুরনো বিশ্বাসী চাকর।

ক্লান্ত, অবসন্ন, প্রায় ঝোড়ো কাকেব মতো রামানন্দ ফিবলেন। তাঁকে দেখলেই বোঝা যায় প্রচণ্ড একটা মানসিক যন্ত্রণা তাঁর মাথার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। শিবানী একবার চোখ তুলে তাকালো। ওব দৃষ্টিতে কোনো ভাষা থাকে না। কিন্তু সেটা বহিঃপ্রকাশ। আসলে ও একবাব কোনো মানুষকে দেখলে তার ভেতরটা পর্যন্ত পড়ে নিতে পারে। খুব নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বললো,— খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে?

রামানন্দ কিছু না বলে ধীরে ধীবে সোফায় বসে পড়লেন। মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিলেন সামনের দিকে।

—বঘু, বাবুর জন্যে বেশ কড়া করে এক কাপ কফি ওপরের ঘবে নিয়ে এস।

রঘু চলে গেল। শিবানী আরো কয়েক সেকেন্ড রামানন্দর দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, —ওপবে এস।

—শিবানী,

—কিছু বলবে মনে হচ্ছে। ওপরে এস।

দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে শিবানী ওর বিশাল শরীর নিয়ে ধীরে ধীরে ওপবে উঠে গেল। রামানন্দ জানেন শিবানীর অনুবোধ মানেই আদেশ। ওর ধীর শান্ত কথাগুলোই শেষ কথা। তিনি শিবানীকে অনুসরণ করে উঠে গেলেন ওপরে, মানে শোবাব ঘরে।

ততক্ষণে শিবানী রামানন্দর পাজামা আর পাঞ্জাবি বার করে এনেছে। রামানন্দ ঘরে ঢুকতেই সেগুলো

ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, —যাও হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে এস।

—কিন্তু?

—সব শুনব। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যা ঘটবার তা অনেক আগেই ঘটে গেছে। পাঁচ মিনিট পরে শুনলেও অবস্থার রকমফের হবে না। যাও-কফি এসে যাবে এক্ষুণি।

অগত্যা পাজামা-টাজামা নিয়ে রামানন্দ অ্যাটাচড্‌ বাথে ঢুকে গেলেন। এখন শীতকাল। গিজার আছে। হাল্কা গবম জলে ভালো করে স্নান করলেন। শিবানী একটা নতুন ধরনের সোয়েটার বুনছিলো রামানন্দর জন্য। রামানন্দ গিয়ে তাঁর সামনে বসে কফিতে চুমুক দিতে শুরু করলেন। মনে মনে ভাবছিলেন কীভাবে কথাটা শুরু করা যায়। উল বুনতে বুনতেই প্রসঙ্গ তুললো শিবানী নিজেই, —খুব ভয়াবহ রকমের কিছু নাকি?

বামানন্দ যেন কথার খেই পেলেন,—হ্যাঁ, মানে, আমি বড় বিপদে পড়ে গেছি।

—সংক্ষেপে বল।

—তোমাকে না জানিয়ে আমি একটা অন্যায় করে ফেলছি।

উল বোনা চলছিলই। বুনতে বুনতেই অত্যন্ত নিথর ববফ-ঘষা গলায় শিবানী বললো, —সে তো জানি।

—জানি, মানে?

—শর্মিলা প্যাটেলের কথা বলবে তো?

প্রায় ভিরমি খাওয়ার অবস্থা বামানন্দর। চোখের কোনে অভাবনীয় চমক। তাঁর মুখের ভাব নিমেষে পাল্টে গেল। কেমন এক হতবিহ্বল কণ্ঠে বললেন,—শর্মিলাকে তুমি চেনো?

—তিন বছর আগে তার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল। একটা পার্টিতে।

—হ্যাঁ।

—তারপর বছর দেড়েক প্রায প্রত্যেকটা সন্ধেই তার ফ্ল্যাটে তুমি যেতে। আর প্রতি মাসে অনেকগুলো টাকা তার জন্যে খরচ করতে।

রামানন্দর কোনো কথা বলার শক্তি ছিল না। বোবার মত কেবল ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলতে পারলেন।

—তা এখন অসুবিধা কী? সে তো বছর দেড়েক আগে খুন হয়েছে।

সেই মুহূর্তে রামানন্দর নিজেকে পাঁঠা এবং নির্বোধ ছাড়া আর কিছুই মনে হল না। এই মেয়েটির কাছে তাঁর নতুন করে বলার যে কিছুই নেই এটুকু ভেবে কেবল একটি স্বস্তির শ্বাস ফেললেন।

—তাতে তোমার ঝোড়ো কাক হবার কী আছে?

—আজ একটা লোক এসেছিল। সোহনলাল নামে।

—অফিসে?

—হ্যাঁ।

—কে সে? কী চায়?

—টাকা।

—কেন?

—আমি নাকি দেড বছব আগে শর্মিলাকে খুন করেছি।

—তাতে তার কী?

—সে নাকি শর্মিলার স্বামী।

—অ।

—কিন্তু শিবানী, তুমি বিশ্বাস কব, শর্মিলার সঙ্গে আমি মিশেছিলুম ঠিকই, কিন্তু তাকে আমি খুন করিনি।

—আমি জানি, মশা আর ছাবপোকা ছাড়া অন্যকিছু তোমার পক্ষে মারা সম্ভব নয়। তা কত টাকা চাইছে, লোকটা?

—অনেক। মাসে দশ হাজার।

হাতের বোনাটা নিয়ে শিবানী উঠে এলো রামানন্দর ঠিক পিছনে। তার এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধ পর্যন্ত দেখে নিতে নিতে বললো,— লোকটার ঠিকানা কী?

—ঠিকানা দেয়নি। দিয়েছে একটা ফোন নাম্বার। সময় দিয়েছে আটচল্লিশ ঘণ্টা। এরমধ্যে তাকে জানিয়ে দিতে হবে।

—কী?

—টাকা সে পাবে কী পাবে না।

—তুমি কী বলেছ?

—একটা ব্ল্যাকমেলারকে যা বলা উচিত। দূর দূর করে লোকটাকে তাড়িয়ে দিয়ে বলেছি, একটা টাকাও তাকে দোবো না।

—অত্যন্ত বোকামি করেছ।

—তার মানে?

—ভবেশ ঘোষের একটা ইজ্জত আছে। তাছাড়া তুমি তাঁর জামাই। জামাই সম্বন্ধে স্ক্যান্ডাল ছড়ালে ঘোষ পরিবারের বদনাম হবে। আর তোমার বদনাম মানে আমারও বদনাম। লোকটাকে একটা ফোন করে দাও।

—কী বলছ তুমি শিবানী?

—ওকে বলে দাও চারদিন পর সকালে এ বাড়িতে চলে আসতে। ও যা চাইছে তাই-ই পাবে।

—মাসে মাসে দশ হাজার টাকা করে গুণাগার দিতে হবে। অকারণে?

—রামানন্দ বসুর ইজ্জতের থেকে মাসে দশ হাজার টাকার মূল্য নিশ্চয়ই বেশি নয়।

শিবানী আর কিছু না বলে সোজা রান্নাঘরে চলে যাচ্ছিল। রামানন্দর জন্যে কিছু মুখরোচক খাবার সে এই সময়েই তৈরি করে নেয়। পাতে নানারকম পদ না থাকলে রামানন্দর আবার খাওয়ায় রুচি আসে না। দরজার পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়ালে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো—একটা লুকনো মাইক্রোফোন তোমার চেম্বারে আছে না?

—হ্যাঁ।

—আজকের ক্যাসেটটা নিশ্চয়ই বার করে নিয়েছ?

—ক্যাসেট মানে, কই না তো।

—এটাও বোকামি। নেওয়া উচিত ছিল। তোমার আর সোহনের কথাবার্তা যদি টেক হয়ে গিয়ে থাকে।

—কিন্তু আমি তো শ্যামদুলালকে কোনো ইনস্ট্রাকশান দিইনি।

—ভুলে যেও না, তাকে স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, কোনো অপরিচিত লোক এলে, এবং প্রয়োজন মনে করলে সে তার কথাবার্তা টেক করতে পারে। অ্যান্ড, সোহন ওয়াজ অ্যান আননোন অ্যান্ড মিসচিভাস পার্সন। যাইহোক কাল সকালে গিয়ে প্রথমেই টেপটার খোঁজ করবে।

শিবানী আর দাঁড়ালো না। বিবশ, অবসন্ন রামানন্দ কেবল ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অপার বিস্ময়ে।

—আপনি ঠিক বলছেন শ্যামদুলালবাবু?

—হ্যাঁ, নীলাঞ্জনবাবু, ক্যাসেটটা ঠিক জায়গায় রেখে দেবার জন্যে আজ আমি বিফোর অফিস আওয়ার্স, পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমি যাবার একটু পরেই রামানন্দ বসু চলে এলেন। আর এসেই প্রথমে ক্যাসেটটা চেয়ে নিলেন। ক্যাসেটটা ফিরে পাবার পরই ওর মুখে একটা তৃপ্তির ভাব দেখেছিলুম।

—টেপের ব্যাপারে উনি কোনো প্রশ্নট্রশ্ন করেছিলেন?

—হ্যাঁ। এসেই আমাকে চেম্বারে ডাকলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কালকের ঐ লোকটির সঙ্গে যে

কথাবার্তা হয় সেটি নোট করেছি কি না। আমি হ্যাঁ বলতেই উনি ক্যাসেটটা দিয়ে যেতে বললেন

—আর কিছু?

—আমি ফিরতে ফিরতেই দেখলুম, টেবিলে রাখা ডেটক্যালেন্ডার থেকে একটা নম্বর দেখে উনি ডায়াল করতে আরম্ভ করলেন। আমি ইচ্ছে করেই একটু দেরি করে ঘর থেকে বের হই। আমার অনুমান ঠিকই ছিল। উনি লাইনটা পাবার পরই ক্যাসেটটা দিয়ে যেতে বললেন।

—আপনি নাম্বারটা নিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, এই নিন।

—ফোনের কোনো কথাবার্তা শুনেছিলেন?

—না। কথা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে উনি আমার দিকে তাকান। বাধ্য হয়ে আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়। একসময় গিয়ে নাম্বারটা নোট করে নিয়েছিলুম।

নাম্বার লেখা কাগজটা নিতে নিতে নীল বলল,—অনেক ধন্যবাদ শ্যামদুলালবাবু, পুলিস এর জন্যে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। আপাতত আর আপনাকে বিরক্ত করব না। তবে একটা কথা, দেবার মতো কোনো খবর থাকলে জানাতে ভুলবেন না। আরো একটা জিনিস মনে রাখবেন, আপনি যে আমার কাছে এসেছেন সেটা যেন কোনোমতেই আপনার ব্যবহারে প্রকাশ না পায়। আপাতত আর আপনার কিছু করার নেই। বল এখন আমাদের কোর্টে। দেখা যাক। গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে সাপটাকে কোথায় পাওয়া যায়।

শ্যামদুলালকে আজ সামান্য বিষণ্ণ লাগছিল। দেড় বছর আগের হঠাৎ অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া এক রহস্য ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। এর ওপর ছিল ঈর্ষার ঘুণপোকা। রামানন্দকে ফাঁসাবার এমন চমৎকার সুযোগ সে হাতছাড়া করতে চায়নি। উৎসাহের আতিশয্যে ছুটে এসেছে নীলের কাছে। তবু কোথায় যেন একটা বিবেক দংশন। একটা অপরাধবোধ ওর মধ্যে সমানে কাজ করে চলছিল। সেটাই প্রকাশ পেল, —ঘরশত্রু বিভীষণের মতো কাজ হয়ে গেল, তাই না মিস্টার ব্যানার্জি?

—অন্যভাবেও চিন্তা করতে পারেন। আমি জানি না রামানন্দবাবু সত্যিই দোষী না নির্দোষ। কিন্তু আপনি যা করেছেন সেটা অন্যায় নয়। বরং এ ব্যাপারটা চেপে থাকলেও বিবেকের দংশনটা আসতো অন্যভাবে। সেটা হতো আরো মারাত্মক আর দীর্ঘস্থায়ী। আজ আপনার মধ্যে একটা সেন্টিমেন্ট প্লে করছে। ভাবছেন নিজের বসের সঙ্গে শত্রুতা করছেন। কিন্তু সত্যিই যদি রামানন্দবাবু খুন করে থাকেন, তাহলে নিজেকে কী উত্তর দিতেন?

—সবই বুঝি নীলাঞ্জনবাবু, কিন্তু সেই তবুটা ছাড়ছে না। যাইহোক, আজ আমি চলি।

শ্যামদুলাল চলে যাবার পর নীল নাম্বারটা দু'একবার মনে মনে আওড়ালো। তারপর ফোন তুলে বিকাশবাবুকে ডায়াল করল। কলকাতার লাইন সম্প্রতি ঠিক মতো কাজ করছে। একবার ডায়াল করেই বিকাশবাবুকে পাওয়া গেল। নীল কোনোরকম ভূমিকা না করেই বলল,—শ্যামদুলাল আজও এসেছিল।

ওপাশ থেকে বিকাশের ব্যগ্র কণ্ঠস্বর,—তাই নাকি? এনি ইমপর্ট্যান্ট নিউজ?

—একটা ফোন নাম্বার পাওয়া গেছে। মনে হচ্ছে নাম্বারটা সোহনলালের। একটু যোগাযোগ করুন। লোকটা সাংঘাতিক এবং নাম্বার ওয়ান ব্ল্যাকমেলার। অন্য কিছু ঘটনা ঘটার আগেই কিন্তু লোকটাকে পাকড়াও করতে হবে।

—ঠিক আছে ব্যানার্জি সাহেব, ওটা আমার হাতেই ছেড়ে দিন। নাম্বারটা বলুন। নাম্বার লিখতে লিখতে বিকাশ বলল, —আমি একটা কথা বলব?

—কেন বলবেন না।

—শ্যামদুলালবাবু ভদ্রলোকটি কেমন?

—হঠাৎ এ প্রশ্ন?

—খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্নটা আসছে। মানে, উপযাচক হয়ে এতসব করছে। উদ্দেশ্যটা কী? নীল হেসে বলল,—এই মশাই আপনাদের এক দোষ। কেউ স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে আপনাকে সাহায্য

করছে। অমনি তার ফ্যাকরা শুরু করে দিলেন? কেন সন্দেহ হচ্ছে নাকি?

—হবে না? আপনার হচ্ছে না?

প্রায় সেকেন্ড খানেকের মত নীরব থেকে নীল বলল, —তা হচ্ছে। ভেবেওছি। একটা কমপ্লেক্স ওর মধ্যে কাজ করছে। ওকে টপকে রামানন্দবাবু আজ বস। মোটিভটা মোটেই ফেলে দেবার মতো নয়। ঠিক আছে, চিন্তা করবেন না। শ্যামদুলালবাবুও আমার মাথায় আছে। ক্যাসেটটা ঠিক মতো আছে তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ও একেবারে সেফ্ভল্টে।

—ঠিক আছে, আমি এখন রাখছি, তবে সোহনকে পেলে আমাকে খবর দেবেন। লোকটার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই। খুব তাড়াতাড়ি ওকে পাকড়াও করতে হবে, নইলে—

—নইলে?

—সে এখন থাক। পরে বলব। আপাতত ওকে খুঁজুন। ফোন রেখে নীল ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে চোখ বন্ধ করল।

ইলেকট্রনিক্স হবার পর একবার ডায়াল করতেই নাম্বারটা পাওয়া যায়। সোহনের নাম করতেই ওপাশ থেকে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে এক পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল—নেহি জি আভি তো সোহনলাল ইধার নেহি হ্যায়। লেকিন...

গলাটা বেশ ভারি করে বিকাশ তালুকদার বললেন, —লেকিন কেয়া?

—উস্‌কা আনেকা কোই ঠিক নেহি, যব উস্‌কো দিল চাতা ইধার আ যাতা।

—আজ উসকা আনেকা কোই চান্স হ্যায়?

—বোলা না যব উস্‌কা মর্জি হোগা,

—ঠিক হ্যয়, এলে বলবেন, সন্ধে সাড়ে ছটায় আমি যাব। আমার নাম রামানন্দ বসু। থাকতে বলবেন। ও হ্যাঁ, জায়গাটা ঠিক কোথায় হবে?

—শ্রদ্ধানন্দ পার্ক। কোই দোকানদারকে রামশরণকা কাঠগোলা বললেই পাত্তা লাগিয়ে দিবে।

—ঠিক আছে, বলে ফোনটা নামিয়ে রেখে বিকাশ তালুকদার সামনে বসা নীলের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, ব্যাটা আজ এলে নিশ্চয়ই গোলায় থাকবে, কি বলেন?

—হ্যাঁ, কারণ ও আজ আসবেই। যেখানেই থাকুক না কেন। বাসুকে আটচল্লিশ ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে গেছে। উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে রামানন্দবাবুর ফোন পাবার আশায়। আর যখন শুনবে রামানন্দবাবু ফোন করেছিলেন, চিন্তার কিছু নেই, একেবারে পাকড়াও করে আনান।

বিকাশবাবু বেল টিপে এস আই রমেন রায়কে ডেকে যা যা করতে হবে বলে দিলেন।

কিছুক্ষণ পর রমেন রায় কেতাদুরস্ত বাঙালি বাবুটি সেজে হাজির হলেন রামশরণের কাঠগোলায়। অপেক্ষা করতে হল না। সন্ধ্যের মুখে মুখেই সোহনলাল এসে হাজির। জমিয়ে বসতে যাচ্ছিল। কিন্তু রামশরণের মুখে রামানন্দর নাম শুনেই সে ত্বরিত লাফে রমেন রায়ের সামনে এসে থতমত খেয়ে গেল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই রমেনবাবু বললেন, —তুমিই সোহনলাল?

—জী। লেকিন আপ?

—আমি রামানন্দবাবুর কাছ থেকে আসছি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ বাতাইয়ে। কুছ সমাচার?

—উনি এখনই তোমায় ডাকছেন।

—আব্‌ভি?

—হ্যাঁ, আব্‌ভি।

অনেক আশা নিয়ে বাইরে এসে হঠাৎ পুলিস জীপ দেখে হকচকিয়ে গেল সোহনলাল। ব্যাপারটা যে ঠিক কী ঘটতে যাচ্ছে তা বোঝার আগেই রমেনবাবু বললেন.—নাও ওঠো।

—লেকিন পুলিস কা জীপ কিঁউ?

—তোমার মতো একটা ছুঁচোকে নিয়ে যেতে জীপই যথেষ্ট। চল, ওঠো।

কী যে ঘটছে আর কী যে ঘটবে কোন কিছু বোঝার আগেই রমেন রায় সোহনের জীর্ণ হাত পাকড়াও করে ফেলেছেন। সোহনের কিছু করারও ছিল না। বরাবরই ও পুলিসকে এড়িয়ে চলে, কিন্তু এখন একেবারে বাঘের মুখে। তার ঐ অশক্ত শরীর নিয়ে পালাবার কথা ভাবতেও পারল না। বাধ্য হয়ে গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, --- পুলিস কিঁউ? কসুর কেয়া হ্যায় মেরা?

—সেটা গেলেই বুঝতে পারবে। ড্রাইভার...

বিকাশ তালুকদারের মানসিক দুর্বলতা যাই থাকুক না কেন, বাইরে জাঁদরেল অফিসার। চেহারাও দোপাট্টা। গলার স্বরও বেশ বাজখাঁই। সোহনকে দেখেই গাঁকগাঁক করে উঠলেন। তিনি জানেন এইসব চরিত্রহীন ছিঁচকেগুলোর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়।

—তোমারই নাম সোহনলাল?

—জী।

—হুঁ। বসো।

সোহনলাল তখন বেশ জড়োসড়ো। মুখের চেহারাও পাল্টে গেছে। কোন মতে ঢোঁক গিলে বলতে পারল, — সাব, ম্যায়নে তো কুছ অপরাধ নেহি কিয়া।

—তোমায় বসতে বলেছি। কি অপরাধ করেছ তা এখনও জানতে চাইনি।

—জী, বলে সোহন গুটিগুটি গিয়ে চেয়ারে বসল। আসলে সোহনের মতো মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষগুলোর চারিত্রিক দৃঢ়তা বলে কিছু থাকে না। সোহনলালের তো নেই-ই।

বিকাশ তালুকদার ওর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, — থাকো কোথায়?

—কোই ঠিক নেহি।

—মানে?

—মেরা কোই আস্তানা নেহি হ্যায়। যব, যিধার সুবিস্তা হোতা

—হুঁ। নেশা করার টাকা কে দেয়?

—জী?

—বলছি, চেহারা দেখেতো মনে হয় না রোজগারপাতি কিছু আছে, তা মদের টাকা আসে কোত্থেকে?

— নেহি জি। হাম দারু নেহি পিতা।

—এক থাপ্পড়ে তোমার বদন পেছন দিকে ঘুরিয়ে দোব। মাল খেয়ে খেয়ে টেঁসে যাবার সময় হয়ে গেল এখনও মিথ্যে কথা। কে দেয় টাকা?

— কোই নেহি সাব। হাম যেইসা আদমিকো কোন্ দেগা দারু পিনেকা রূপয়া?

—শর্মিলা প্যাটেল তোমার কে হয়?

ঠিক এই ভয়টাই করছিল সে। সে জানতো পুলিস তাকে ধরলেই তার বিবির কথা জিজ্ঞাসা করবে। আর বিবির কথা বলতে গেলেই তার কৈফিয়ত দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে। দেড় বছর ধরে পালিয়ে থেকেও নিষ্কৃতি নেই। শর্মিলাকে সে খারাপ পথে নামিয়েছিল ঠিকই, তার পয়সায় স্ফূর্তি করেছে ঠিকই, কিন্তু তার খুন হওয়ার ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। কিন্তু স্বামী হিসেবে তার মৃত্যুর ব্যাপারে পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। বিশেষ সে তার খুন হবার কথা জেনেও পুলিসকে কোন রিপোর্ট করেনি। এও এক ধরনের অপরাধ। যদিও সে শর্মিলাকে খুন করেনি।

—কি হল, কথা বলছ না কেন? শর্মিলা তোমার কে হয়?

—জি, মেরা জরু।

—সে এখন থাকে কোথায়?

—নেহি জানতা সাব।

—থানায় বসে মিথ্যে কথা বললে পিঠের চামড়া গুটিয়ে দোব। আজ থেকে দেড়বছর আগে এক বর্ষার রাতে সে খুন হয়, তুমি জানো না?

সোহনলালের উত্তর দেবার কিছু ছিল না। সে চুপ করে বসে থাকে।

—তুমি জানতে না? উত্তর দিচ্ছ না কেন?

হঠাৎ সোহনলাল হাঁউ মাঁউ করে কঁকিয়ে ওঠে,—লেকিন সাব, আপ বিশওয়াস কিজিয়ে, ম্যায় নে উসকো খুন নেহি কিয়া?

—আমি জিজ্ঞেস করছি সে খুন হয়েছিল এটা তুমি জানতে কিনা?

ঘাড় নেড়ে সোহন বলে,—জি।

—থানায় কিছু রিপোর্ট না করে এদ্দিন গা ঢাকা দিয়েছিলে কেন?

—জি, উও তো রেণ্ডি বন গয়ি থি, ইসি লিয়ে উসকি সাথ মেরা কোই রিস্তা নেহি থা তো.

— সোহনলাল, ঠ্যাঙানি যদি খেতে না চাও তাহলে যা জিজ্ঞাসা করছি সব সত্যি কথা বল, নইলে,

একটা সিগারেট ধরতে ধরাতে বিকাশ তালুকদার বললেন, —তাকে খারাপ পথে নামিয়েছিলে তো তুমি, আর সেই পয়সায় মদ খেতে, তাইতো?

আর মিথ্যে কথা বলার কোন রাস্তা নেই দেখে সোহন বলল,—জি, হাঁ।

—তুমি জানতে সে কবে খুন হয়েছিল?

—জি হাঁ।

—পুলিসে জানাওনি কেন?

—পুলিসকে আমার বহুত ডর লাগে।

এতক্ষণ নীল পাশে বসে সব শুনছিল। হঠাৎই সে ইশারায় বিকাশ তালুকদারকে চুপ করতে বলে জিজ্ঞাসা করল, — শর্মিলা প্যাটেলকে তুমি যে খুন করনি এটা আমরা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তোমায় কেন ডাকা হয়েছে তা বুঝতে পারছ কি?

নীলের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সোহন বলল,— নেহি সাব।

—আমরা জানতে পেরেছি, তোমার স্ত্রীকে কে খুন করেছিল তা তুমি জান।

মাথা হেঁট করে সোহন বলল,—হাঁ সাব। মালুম হোতা কি ম্যায়নে উনহিকো পাযছান লিয়া।

—কে, কে লোকটা?

—বহুত বড়া আদমি। রামানন্দ বাসুজি। ঘোষ কেমিক্যাল্‌স্ কা মালিক হ্যায়।

—কোন প্রমাণ আছে তোমার কাছে?

—জি?

—বলছি, একজন ভদ্রলোকের ওপর খুনের অভিযোগ করছ, তার কোন প্রমাণ তোমার কাছে আছে?

—নেহি সাব, লেকিন।

—লেকিনটা কী?

—যো রাত মেরা বিবি খুন হুই থি, ম্যায়নে উহো সাহাবকো উস্ কোঠিসে ভাগ্‌নে দেখা।

—ব্যস, ততেই প্রমাণ হয়ে গেল যে বসু সাহেব তোমার বৌকে খুন করেছিল? আর সেই ভয় দেখিয়ে তুমি বাসুসাহেবকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছ?

—কেয়া করে বাবু? মেরা বিবি মর গিয়া আউর মেরা ধান্দা ভি খতম হো গয়ি। আব মুঝে জিনে তো পড়েগা।

—বাহ্ চমৎকার যুক্তি।

—লেকিন সাব, আগর উয়ো সব ঝুটা নেহি হ্যায় তো ডরা কিস্ লিয়ে? যব ম্যায়নে উস্‌কো রূপয়াকে লিয়ে বোলা, বিবিজিকো নাম কিয়া, ম্যায়নে দেখা কি সাহাবকো ছলিয়াকা রঙ বদল গিয়া। ইস্‌মে জরুর কুছ গড়বড় হ্যায়।

হুঁ—বলে নীল চুপ করে কি যেন ভাবল খানিকক্ষণ, তারপর বলল, আর কোন লোককে তুমি সেই সন্ধ্যায় দেখতে পাওনি, তোমার বিবির ঘরে বা আশেপাশে?

—নেহি সাব, বলেই সহসা ও থেমে গেল, তারপরই হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়েছে, এমনভাবে বলল, হাঁ সাব, ম্যায়নে তো একদম ভুল গিয়া। উসিবক্ত ম্যায়নে আওর এক বাবুকো হড়বড়াকে ভাগতে দেখা। ও শালে মুঝে জোর ধাক্কাসে মাটিমে গির ফেকা থা, আউর ভাগ্ ভি গিয়া থা।

—কে সেই লোকটা?

—মুঝে নেহি মালুম, কিঁউ কি ইতনা জোর বারিষ হো রাহা থা, ম্যায়নে উনকো হুলিযাভি দেখ নেহি পায়া।

—তার মানে সেই সন্ধ্যায় দুজন লোক গিয়েছিল শর্মিলার ঘরে। আগু পিছু দুজনেই হুড়মুড় করে পালিয়ে গিয়েছিল?

—হাঁ সাব।

—তাহলে কি করে তুমি বসু সাহেবকে দোষী বলছ? পরে যে লোকটা তোমায় ধাক্কা মেরে পালিয়ে গিয়েছিল, সেও তো খুন করতে পারে?

—হো ভি সক্তা, লেকিন, যো আদমী পহেলে ভাগা থা, সক্ তো উনহি পর পহেলাই হোনা চাহিয়ে, কিউঁ কি খুনি আদমি ভাগতা হ্যায় পহেলে, পিছে নেহি।

ঘাড় নাড়তে নাড়তে নীল প্রায় আপনমনেই বলল,— না হে সোহনলাল, এত সহজে বলা যায় না যে বসুসাহেবই তোমার বিবিকে খুন করেছে।

—তব?

—বাসুসাহেবকে তুমি ক'দিন যেন সময় দিয়েছিলে?

—জী দো রোজকা।

—তার মানে এখনও বারো ঘণ্টার মতো সময় আছে? তোমায় আমরা এখন একটা শর্তে ছেড়ে দিতে পারি।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সোহন নীলের দিকে তাকায়।

—যদি বসুসাহেব তোমায় ফোন করে, সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমায় এসে রিপোর্ট করবে। তিনি যা যা বলবেন সব তোমায় বলতে হবে।

—জরুর।

—তাড়াতাড়ি পালাবার জন্যে 'জরুর' নয়, পুলিস যখন একবার তোমার হদিশ পেয়েছে, তখন পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে থাকার চেষ্টা করেও পালিয়ে থাকতে পারবে না। আর ধরা পড়লে, তখন সমস্ত খুনের দায়টা তোমার ওপরেই পড়বে এটা মনে রেখো।

—জরুর সাব। খুনকা ইনজাম ম্যায় নেহি লেনে চাতা। লেকিন মেরা ইনকাম খতম হো জায়গা ঠিক হ্যায় সাব, আপ যো কহতা হ্যায়, সোহি হোগা। আব ম্যায় যা সকতা?

নীল এবার বিকাশ তালুকদারের দিকে তাকালো।

বিকাশ বললেন,—ঠিক আছে এখন যেতে পার, তবে

—চিন্তা মাৎ কিজিয়ে সাব, হাম জরুর আ জায়গা। নমস্তে সাব।

পুলিসি জেরার হাত থেকে ও তখন পালাতে পারলে বেঁচে যায়। সোহন চলে যেতেই বিকাশ নীলের দিকে তাকিয়ে বললেন,—কী মনে হচ্ছে ব্যানার্জি সাহেব?

—তেমন কিছু নয়, ভাবছি দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে?

—আমার একজনের কথা মনে হচ্ছে?

—যেমন?

—অনুমান আর কি, আপনার অতি উৎসাহী শ্যামদুলাল দত্ত নয়তো?

—বুঝতে পারছি শ্যামদুলাল আপনাকে ভাবাচ্ছে। অবশ্য আমাকেও। তবে ভুলে যাবেন না, শর্মিলা

প্যাটেল খুন হয়েছিল রিভলবারের গুলিতে।

—তো কী? শ্যামদুলাল কী একটা রিভলবার জোগাড় করতে পাবে না? শ্যামদুলাল সম্বন্ধে আমবা তো কিছুই জানি না।

—কে জানে? কার কোথায় কী এলেম আছে কে বলতে পারে? কিন্তু লোকটা বেছে বেছে একটা বর্ষাব দিনে অফিসে চাকরি করতে যাবে রিভলবার নিয়ে?

বিকাশ চিন্তাক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন—আমি কিছু বুঝতে পারছি না? তবে মার্ডাবেব উদ্দেশ্য থাকলে রিভলবার নিয়ে যেতেও তো পারে।

—তাছাড়া মোটিভটা?

—ইন্টারনাল জেলাসি। রামানন্দর জন্যে তার হয়তো কেরিযাব নষ্ট হয়ে গেছে। এটা তো ফেলে দেবাব মতো মোটিভ নয়।

—ধরে নিলুম এটাই তার মোটিভ। কিন্তু রামানন্দকে খুনের আসামি কবতে পারলেই কি তাব ভাগ্যের ফিরে যাবে?

—হযতো ফিরতো? কিংবা অন্য কোন কারণও হতে পারে। মোট কথা শ্যামদুলালেব ওপর নজব রাখা উচিত।

—হ্যাঁ রাখবেন। নিশ্চয়ই রাখবেন। তবে কেসটা খুব একটা সহজ নয়। শর্মিলা প্যাটেল হত্যাব কাবণ বেশ রহস্যময়। আজ উঠি। আপনি আপনার কাজ করুন। সোহন ফিরে এলেই আমায খবব দেবেন।

নীল আর দাঁড়ালো না।

সোহনলালের সময়জ্ঞান আছে। তাকে ফোনে বলা হযেছিল সে যেন ঠিক আটটায় সময় আসে। এক মিনিটও সময়ের এদিক-ওদিক হয়নি। ঘোষ বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে সে যখন বেল টিপল ঘড়িতে তখন ঠিক আটটা। বিশাল হল ঘরে তখন রামানন্দ একা বসে ছিলেন। হাতে সেদিনেব খবরেব কাগজ। তাঁব সকালের চা জলখাবার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। খবরের কাগজে তাঁব তেমন মনটন ছিল না। খববেব কাগজ খোলা রেখেই তিনি আনমনে সিগারেট টানছিলেন। আসলে গত চারদিন ধবে তাঁব মনেব মধ্যে একটা সংকোচ কাঁটার মত বিঁধেছিল। প্রায় বিনা কাবণে বিশাল অঙ্কেব টাকা প্রতিমাসে খেসাবত দিতে হবে এটাও তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। একজন প্রতারককে প্রশ্রয় দিতে হবে এটাও তাঁব সহ্য হচ্ছিল না। উচিত, ওকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া। কিন্তু শিবানী কোন ঝামেলা চায় না। শিবানীব ডিসিশানের ওপর হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

ডোব-বেলের আওয়াজ হতেই রামানন্দ গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। যেন অন্য কারো জন্যে অপেক্ষা কবছিলেন এমন ভাব দেখিয়ে বললেন,—ওহ্ তুমি। খুব পাংচুয়াল তো। এস, ভেতরে এস।

বামানন্দর পিছন পিছন সোহনলাল এসে ঘরে ঢুকল। চারদিকে চোখ ঘুরিযে ঘুবিয়ে সব দেখতে লাগল। রামানন্দ ততক্ষণে নিজের সোফায় গিয়ে বসে পড়েছেন। ওকে ওইভাবে দেখতে দেখে বললেন, — অত দেখার কিছু নেই। এখানে এসে বোস।

সোহনলাল হাত কচলাতে কচলাতে তাঁর সামনের সোফায় বসতে বসতে বলল,—আহ্, কিত্‌না দিন যে এমোন ভালো বাড়িতে ঢুকিনি। সে ছিল যেখন রমা জিন্দা ছিল। তাবপব,

একটা দীর্ঘশ্বাসের ভঙ্গিতে সোহনলাল সোফায় হেলান দিল। অত সকালেও সোহনেব গা থেকে দিশী মদের গন্ধ ছাড়ছিল। রামানন্দ নিজে মদ্যপান করলেও দিশী মদের গন্ধটা সহ্য করতে পারতেন না। অন্য সময় হলে উঠে চলে যেতেন। কিন্তু এখন ঐ লোকটাকে সহ্য করতেই হবে।

—আপনি সাচ বলেছেন বাবুজি, রহিস আদমীর বাড়ি বেশি নজব দিতে নেই। তাতে নাকি টাকা কমে যায়। হামিও বেশিক্ষণ থাকতে চাই না। কাজের কথায় আসেন বাবুজি। তো আপনি কী ঠিক করলেন বলুন!

—বোসো, আমার স্ত্রী তোমাব সঙ্গে কথা বলতে চান।

—ভাবিজি?

—কেন, তোমার আপত্তি আছে নাকি?

—নেহি বাবুজি। ভাবছিলুম অন্য কথা। কুছ চমক ভি লাগছে।

—কেন?

—আপনি আমার কথা সোব জানিয়েছেন, ভাবিজিকে?

—তোমার কী মনে হয়, জানাবো না?

—রমার কথা?

—হ্যাঁ।

সোহনের বোধহয় রামানন্দর কথা বিশ্বাস হল না। সে একটু অবাক নেশারু চোখে রামানন্দর দিকে তাকিযে বলল,—সাচ্ বাবুজি?

রামানন্দ কিছু না বলে টেবিলেব পাশে আটকানো একটা নবে চাপ দিলেন। তারপর বললেন, —এক্ষুণি আসছেন। এলেই বুঝতে পারবে সাচ কী ঝুট্?

সোহনের চোখের ভাষা ধীবে ধীরে পাল্টাচ্ছিল। ভ্রূ দুটিও ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে হতে এক জায়গায় এসে থেমে গেলে। তারপব পরিপূর্ণ সন্দেহের দৃষ্টিতে রামানন্দর দিকে তাকিয়ে বলল,—আপনি কী মজাক কবাব জন্যে আমাকে ডাকলেন?

—মজাক নয় সোহনলাল।

রামানন্দ আর সোহন দুজনেই চমকে উঠেছিল। কখন যেন শিবানী এসে ঘরে ঢুকেছে। দুজনের কারোরই তা নজরে আসেনি। শিবানীব হাতে একটা ট্রে। কিছু খাবার আর ধুমায়িত চায়ের কাপ সোফাব সামনে ছোট সেন্টাব টেবিলেব ওপর খাবারের ট্রে নামিয়ে রাখতে রাখতে শিবানী বললে, —আপনি আমাদের সমগোত্রীয় নন যে ঠাট্টা তামাসা করার জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আপনাকে ডেকে পাঠাব। নিন চা জলখাবাব খেয়ে নিন।

—লেকিন?

—এতে কিন্তুব কিছু নেই। প্রথম এলেন এ বাড়িতে। একটু চা খাবার খেতেই হয়। আব খেতে খেতে আপনাব কথা শোনা যাবে।

সেদিন অফিসে যে দাপট নিয়ে সোহনলাল বামানন্দর সঙ্গে বলেছিল, আজ শিবানী আসাব সঙ্গে সঙ্গে ওকে কেমন যেন জড়সড় হতে দেখলেন রামানন্দ। মনে মনে যেমন একটু আনন্দও পেলেন, ঠিক তেমনি জোঁকেব মুখে নুনের উপমাটাও তাঁর মনে এল। ভাবলেন, বাছাধনকে এবার ট্যা-ফোঁ করতে হবে না।

সত্যিই সোহন বেশ কুঁকড়ে গিয়েছিল। মহিলার বিশাল চেহারা আর বরফের মত ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বরে সে বেশ অস্বস্তি অনুভব করছিল। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। সামনে সুখাদ্যের সার। টোস্ট, ওমলেট, তিন চাব রকমেব মিষ্টি। দামি চায়ের মধুর সুবাস। কিন্তু তার হাত সরছিল না। বিশেষ ঐ মহিলার সামনে।

—নিন, খেতে আরম্ভ করুন। কাজের কথা সেরে ফেলুন। আমাদের এখন অনেক কাজ পড়ে আছে।

আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে সোহনলাল একটা টোস্ট তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিল। প্রায় ফোকলা দাঁতে কড়া টোস্টটা এপাশ ওপাশ করতে করতে হাবানো নার্ভটা বোধহয় ফিরে পেল। তারপর আস্তে আস্তে বলল,— দেখুন ভাবিজি,

—না, আবার সেই বরফ ঠাণ্ডা স্বর, ভাবিজি নয়, মিসেস বোস।

কাঁধটা শ্রাগ করার ভঙ্গীতে সোহন বলল,—যো আপকা মর্জি। দেখিয়ে মিসেস বোস, আপনি তো সোবই শুনিয়েছেন, তো শর্মিলা খুন হয়ে গেলো। হামার ভি বহুৎ ক্ষতি হয়ে গেলো। এখোন

হামাকে দেখে আপনি নিশ্চয়ই মালুম পাচ্ছেন হামার পজিশান কেতো খাবাপ আছে, তো,

—মান্থলি দশহাজার না হলে আপনার চলবে না?

—জি।

—আমি কী করে বুঝব টাকা পাবার পরও আপনি মুখ বন্ধ রাখছেন?

সোহনলাল হাসল তার বিশ্রী ফাঁক ফাঁক দাঁত নিয়ে। তারপর বলল, — ম্যাডাম, সোহনলাল খাবাপ আদমি হতে পারে, নিজের জরুকে পয়সার জন্যে অন্য বাবুদের হাতে তুলে দিতে পারে, লেকিন সে বেইমান নয়। সোহনলালের বাত একটাই, রূপয়া। সেটা ঠিকমত পেলে দুনিয়ার আব কোনো বেপারেই সে মাথা গলাবে না। আউর একঠো বড়িয়া বাত কী জানেন, বাবুজির কথা ফাঁস করে দিলে যে হামাবা রূপয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এতো বড়ো বুর্বাক হামি নই।

—আপনি খেয়ে নিন। আমি আসছি।

—হামি কিন্তু চেক নিতে পারব না।

—বেশ।

শিবানী উঠে ওপরে চলে গেলো। শিবানী থাকতে সোহনের খাওয়াটা ঠিক স্বতঃস্ফূর্ত হচ্ছিল না। এবার সে গভীর মনোযোগে আহারে মন দিল। গত রাত্রে তার বরাতে কোনো খাবারই জোটেনি, কেবল মদ ছাড়া। রামানন্দ ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবলেন, নাহ্ লোকটার খিদে বিশ্বগ্রাসী। ওকে ঐভাবে খেতে দেখে রামানন্দর মনে কিছুটা করুণার ভাব এল। সত্যিই যদি এ লোকটা শর্মিলাব স্বামী হয়, এবং তার রোজগারই ওর একমাত্র উপায় হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই এখন ও বিপদগ্রস্ত। আর বিপদগ্রস্ত লোক অন্তত নিজের পেটটা ভরাবার জন্যেও অনেক নিচে নামতে পাবে। কিন্তু তাই বলে প্রতিমাসে দশহাজার। এ যে রীতিমত জানিয়ে ডাকাতি। দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জালিয়াতি!

সোহনলালের মেজাজ কিন্তু খুশ। চায়েব কাপে চুমুক দিতে দিতে সেও ভাবছিল, ভাগ্যিস সেদিন এই লোকটা তার নজরে এসেছিল, নইলে কি এমন নরম সোফায় বসে দামি চায়ে চুমুক দিতে পারতো? তার ওপর একটু পরেই আসছে কড়কড়ে দশহাজার টাকা। শুধু একবার নয়। মাস মাস। ঠিক একই দিনে। আহ্, রমা বেঁচে থাকতেও সে জীবনে একসঙ্গে এত টাকা চোখে দেখেনি। নসিব। নসিব। একেই বলে নসিব। তকদির যখন খোলে এমনি করেই খোলে। এখন থেকে রাজার হালে চলবে। কিনতে হবে একজোড়া ভালো জুতো। দেড় বছরের নাকানি-চোবানি খাওয়া জীবনটার ভোল এবার সে পাল্টে দেবে: সুখের স্বপ্নে যখন সে তলিয়ে গেছে ঠিক তখনই পিছন থেকে শিবানীর গলা পাওয়া গেল,

—মিস্টার সোহনলাল, এই নিন আপনার এ মাসের টাকাটা।

বলেই শিবানী কড়কড়ে এক বাণ্ডিল এক'শ টাকাব নোট সেন্টাব টেবিলের ওপব ছুঁড়ে দিলেন।

—নিন গুনে নিন।

—জরুরৎ কেয়া। আপনি তো গুনেই দিয়েছেন ম্যাডাম।

—টাকা নেওয়া দেওয়াটা গুনেই করতে হয়। নিন গুনুন।

—বাত তো সহি হ্যায়, বলে সোহন প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল নোটের বাণ্ডিলের ওপব। ছোঁ দিয়ে তুলে নিল। তারপর জিভে আঙুল ছুঁইয়ে গভীর মমতায় একটা একটা করে গুনতে শুরু করল।

সামনের টেবিলে বসে বসে রামানন্দ ওর নোট গোনা দেখছিলেন। রাগে তাঁর তখন সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। মনে মনে ভাবছিলেন কতক্ষণে এ আপদ এখান থেকে বিদেয় হবে। লোকটাব উপস্থিতিই তাঁব পক্ষে বিরক্তিকর।

সোহনলালের নোট গোনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। ঠিক তখনি এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্য প্রস্তুত ছিল না সোহনলাল। প্রস্তুত ছিলেন না রামানন্দ। দুজনেই এক লহমার জন্যে একটি শব্দ শুনেছিলেন। ফট্। সেই ফট্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দ দেখলেন সোহনের মাথাটা হুমড়ি খেয়ে টেবিলের ওপব ঝুঁকে পড়ল। তারপরই রামানন্দ দেখলেন মাথা থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে সেন্টার টেবিলেব কাচ ভেসে যাচ্ছে।

ভয়ে, বিস্ময়ে এবং বিহ্বলতায় রামানন্দ সামনের দিকে চোখ তুলে যা দেখলেন তাতে তাঁর অস্ফুট আর্তনাদ করা ছাড়া আব কিছু করার ছিল না।

শিবানীর হাতে তখনও ধরা আছে একটি রিভলভার। অন্য হাতে সোফার ব্যাকপিলো। তখনও কিঞ্চিৎ ধোঁযাব বেশ। শিবানীর চোখের দিকে তাকালেন রমানন্দ। না, কোনো ভাষা নেই। মৃত মাছের চোখেব মতো নিশ্চল আব নিষ্প্রাণ।

ঘটনার আকস্মিতা কাটিয়ে রামানন্দ বললেন,—এ কী করলে শিবানী। লোকটা যে মবে গেল

ববফশীতল কণ্ঠে শিবানী বললো,— মাথায় রিভলবারের গুলি এফোঁড়-ওফোঁড় হলে কেউ বাঁচে না।

—কিন্তু এ তো খুন!

—হ্যাঁ, তাই। এটাই জগতের কাছে ওব শেষ পাওনা ছিল।

—এখন কী হবে?

—আমাব সব ভাবা আছে। লাশটাকে এখুনি শোবার ঘরে নিয়ে যেতে হবে।

—কিন্তু রঘু?

—বঘুকে তিন ঘণ্টাব মতো কাজ দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি!

—আব সব ঝি চাকবেরা?

—আমি না ডাকলে ওবা কেউ আমাদেব সামনে আসে না। ওব দেহটা এমন কিছু ভাবী নয়। তুমি একাই পাববে ওকে নিয়ে যেতে। যাও, আব দেবি কোবো না। আমাকে এদিকের কাজ করতে দাও।

বামানন্দও ভেবে দেখলেন যা কবাব এখুনি করতে হবে নইলে আরো বেশি কিছু অঘটন ঘটতে পাবে। রামানন্দ স্বাস্থ্যবান পুরুষ। ক্ষীণদেহী সোহনলালকে নিমেষে সে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল সটান চলে গেল শোবার ঘরে।

ব্যাকপিলোটা ফুটো হয়ে গিয়েছিল। ওটায় মুড়ে অত্যন্ত কাছ থেকে গুলি চালিয়েছিলো শিবানী ফলে বিভলভাবেব আওয়াজ শোনা যায়নি। কিন্তু পিলোটা এখুনি সরিয়ে ফেলতে হবে। সেন্টার টেবিলটা তাজা রক্তে থই থই কবছে। পিলোটা দিয়েই বক্ত মোছার কাজটা হয়ে গেল। টাকার বান্ডিলটা তুলে নিল অন্যহাতে। গভীর মনোযোগ দিয়ে আশপাশেব আর সবকিছু ভালো করে চোখ বুলিয়ে নেয় শিবানী। না, কোথাও আব কোনো বিসদৃশ কিছু চোখে পড়ছে না। বিভলবাবটা কোমরে গুঁজে, একহাতে বক্তাক্ত বালিশ, অন্যহাতে সোহনের পরিত্যক্ত কাপ-ডিস নিয়ে শিবানীও দোতলায় চলে গেলো।

ওপরে এসে দেখে বামানন্দ নিস্পন্দেব মতো দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের মাঝখানে। পায়েব কাছে সোহনেব মৃতদেহ।

—বোকাব মতো দাঁড়িয়ে থেকো না। খাটের গদিটা নামাও।

রামানন্দ এখন আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে গদীটা তুলে ফেলেন। ডানলোপিলো তুলতে তেমন কোনো শক্তিব দরকার হয় না।

—এবাব ডালাটা তুলে ফেলো।

মর্ডার্ন ডিভান-টাইপ খাট। লেপ কম্বল রাখার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে গদির নিচেই। এখন শীতের সময়। কম্বল টম্বল সব বেরিয়ে গেছে। জায়গাটা ফাঁকাই ছিল। ডালা খুলে রামানন্দ নির্বাক দৃষ্টিতে তাকালেন শিবানীর দিকে।

—কি দেখছ বোকার মতো। লোকটাকে এখন ওখানেই শুইয়ে দাও।

বামানন্দ তাই করেন। এরপর ডালা নামিয়ে গদি-বিছানা পেতে দেন। বাইরে থেকে কেউ বুঝতেও পাববে না গদীব নিচে জমা আছে একটি সদ্যমৃত শরীর।

—যাও, এবাব ভাল করে স্নানটান করে নাও। নইলে অফিসে দেরি হয়ে যাবে।

—তুমি কী বলছ শিবানী? এখন অফিস যাব?

—কেন, না যাবার কি হয়েছে?

—কিন্তু বডিটা?

—সব ভাবা আছে। এখন আর কথা বাড়িও না, আমায় অনেক কাজ সারতে হবে। আর শোন, আমি আজ অসুস্থ। সারাদিন শুয়েই থাকব। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তাই বলবে। আর একটা কথা, ঠিক ছ'টার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসবে।

রামানন্দ এবার মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—সারাদিন তুমি ঐ মড়াটাকে নিয়ে শুয়ে থাকবে?

—আমার ভূতের ভয় নেই। প্রেতাত্মায় কোনও বিশ্বাসও নেই।

—তা জানি। কিন্তু লাইটা সরাবার কী ব্যবস্থা হবে বুঝতে পারছি না।

—জগতে অনেক কিছুই তোমার অবোধ্য। এটাও বোঝার প্রয়োজন নেই। কেবল যা বলব তাই করে যাবে।

বৃথা আর তর্কে গেলেন না রামানন্দ। কারণ তিনি চিরদিনই এই মহিলার পদানত। এই মহিলার বুদ্ধির কাছে তিনি বরাবরই খাটো। তাছাড়া চোখের সামনে একটি জলজ্যান্ত খুন দেখার পর তাঁর হাত-পা তখনও কাঁপছে। আরো একবার নির্বোধ পাঁঠার মতো রামানন্দ গৃহত্যাগ করলেন।

—ছেলেমানুষের মতো কথা বোল না, প্রাথমিক কাজটা আমি করে দিয়েছি। শেষটা তোমাকেই করতে হবে, এবং নিখুঁত ভাবে।

—কিন্তু আমি কী পারব? যদি কেউ দেখে ফেলে?

—কাউকে দেখানোর মতো কাজ এটা নয়। আর তুমি যতটা নার্ভাস হচ্ছ, ব্যাপারটা অত কঠিন নয়।

—তুমি সঙ্গে থাকবে না?

—তাহলে তোমাকে বাদ দিয়েই কাজটা আমি করে আসতাম। এবার যা বলি মন দিয়ে শোন। বডিটা ব্যাকসিটের পাদানিতে শুইয়ে রেখে দেবে। সোজা গঙ্গার ধার দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও রাস্তা নির্জন পাবে। এখন শীতকাল। এত রাত্রে চট্ করে রাস্তায় কাউকে পাবে না। তারপর কোনো এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে বডিটাকে রাস্তার ধারে নামিয়ে দেবে। ব্যস রিস্ক্ ঐটুকুই। নামবার সময়ে সাবধানে নামাবে। যেন কারো চোখে না পড়ে।

রামানন্দ একবার রিস্টওয়াচটা দেখলেন। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। শিবানীর কথায় তাঁর খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হল না।

অবয়বে ফুটে উঠল একটা দোনামোনা আর কিন্তু-কিন্তু ভাব। একটা বাসিমড়া নিয়ে একা গাড়ি চালিয়ে এই শীতের রাতে যেতে হবে। তার ওপর সবার অলক্ষ্যে দেহটা ফেলে দিতে হবে রাজপথে। রামানন্দর হাতটা ঘামতে শুরু করল।

—চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। এতে বিপদ বাড়বে। এত রাত্রে একজন মহিলার পক্ষে নির্জন রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে যাওয়া একটু রিস্কি। তুলনায় একজন পুরুষের পক্ষে ব্যাপারটা অনেক সহজ। তাছাড়া চাকরবাকরদের কাছেও ধরা পড়লে কৈফিয়ত দেবার কিছু সঙ্গত ব্যাখ্যা থাকবে না। রাত বারোটায় তোমার বাড়ি ফেরা আর আমার বাড়ি ফেরায় অনেক তফাত।

—জানি, কিন্তু বড় নার্ভাস লাগছে।

—লাগতেই পারে। তবে এটাই শেষ কাজ।

রামানন্দর আর বলার কিছু ছিল না। বললেও কোনো কাজ হতো না। শিবানীর কথাই শেষ কথা। তাঁর হাজার ভয় থাকলেও তাঁকে সোহনের মৃতদেহ নিয়ে এই রাতে বেরোতেই হবে। এবং কোনো এক নির্জন জায়গায় ফেলে দিয়েও আসতে হবে। তবু তিনি একবার জিজ্ঞাসা করলেন,—কিন্তু শিবানী, বডিটা তো পুলিস পাবেই। তারপর যখন খোঁজ-টোঁজ নেওয়া শুরু করবে?

—সে তো করবেই। তবে এ ধরনের বেওয়ারিশ লাশ নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে পুলিসকে তাদের

অন্যসব কাজ ছেড়ে দিতে হবে। তাছাড়া রাস্তায় লাশ পাওয়ার ঘটনা নতুন নয়। আজকাল এসব প্রচুর হচ্ছে। পলিটিক্যাল মার্ডার তো লেগেই আছে।

গ্রীষ্মকাল রাত সাড়ে এগারোটা এমন কিছু নয়। কিন্তু শীতকালে অধিকাংশ লোকই শুয়ে পড়ে। ঘরের বাইরে বড একটা বের হয় না। ভবেশ ঘোষের বাড়ি এখন নির্জন। রঘু থেকে আরম্ভ করে বাকি সবাই শুয়ে পড়েছে। তাছাড়া তারা সবাই জানে দিদিমণির শরীর খারাপ। সকাল থেকেই তিনি শুয়ে আছেন। স্বাভাবিক কারণেই তারা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে শুতে চলে গেছে। বাড়ি নিস্তব্ধ।

তবু শিবানী একবার উঁকি দিয়ে বাড়ির ভেতরটা দেখে নিল। চতুর্দিক অন্ধকার। ডিভানের খোপ থেকে সোহনেব দেহটা বার করা হয়ে গেছে। দেহটা কাঠের মতো শক্ত। খুব সম্ভবত চোখ আব মুখ থেকে বক্ত বেরিয়েছিল। চোখের চারপাশে আর ঠোঁটের কষে রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়ে গেছে। মুখটা হাঁ হয়ে গেছে। কালো কালো কয়েকটা দাঁত দেখা যাচ্ছে। মুখেব দিকে তাকিয়ে শিউবে উঠলেন রামানন্দ। এ দেহটা নিয়ে এখন তাঁকে এক অকল্পনীয় দুর্ধর্ষ অভিযানে বেরুতে হবে।

শিবানী কিন্তু নির্বিকার। এমনিতে তার মুখে কোনো অভিব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন তা আরো নির্বিকাব। খুব সম্ভবত কর্তব্যের সংকল্পে। শিবানী এগিয়ে গিয়ে মৃতের দুটো হাত বেশ শক্ত কবে চেপে ধরল। রামানন্দ ধবলেন দুটো পা। হাত-পা দোমড়ানো অবস্থায থাকার জন্যে ওদেব বয়ে নিয়ে যেতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু এখন ঐ সব অসুবিধার কথা ভাবলে চলবে না। যেমন করেই হোক মডাটাকে আজ রাতের অন্ধকারেই পাচার করে দিতে হবে। নইলে দুর্গন্ধেই সারা বাড়িব লোক টের পেযে যাবে।

মবলে মানুষের শবীব বেশ ভারী হয়ে যায। বামানন্দ সেটা বেশ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলেন। সব থেকে অসুবিধা হোল সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময়। মড়াব পা ধরে সাবধানে নিচে নামতে তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছিল। বাধ্য হয়ে তিনি পা দুটো ছেড়ে দিলেন। শিবানীব কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে মৃতদেহটা একাই নিচে নামিয়ে নিয়ে এল। তারপর নড়া দুটো ধরে প্রায হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল দরজাব দিকে।

গাড়ি অবশ্য আগেই বার করে আনা ছিল। বারান্দার নিচে। গাড়িবারান্দার আলো নেভানোই ছিল। বামানন্দ আগে এগিয়ে গিয়ে পিছনের দরজা খুলে গাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। একসময় শিবানী সোহনেব দেহটা টেনে গাড়ির কাছে এসে থামলো!

এই শীতেও বামানন্দ দবদব করে ঘামছিলেন। কিন্তু শিবানী যেন অদ্ভুত কোন ধাতু দিয়ে গড়া। অতবড় বিশাল শরীর নিয়েও কোন ঘাম বা ক্লান্তিজনিত কষ্টে তাকে কাতব হতে দেখা গেল না। নির্বিকার ভাবে দেহটি মাটিতে শুইয়ে, প্রথমেই পা-দুটো গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল,—এবাব ভেতর থেকে টান।

বামানন্দ তাই কবলেন। তাবপর দুজনের সমবেত প্রচেষ্টায সোহনের দোমড়ানো দেহটি অত্যন্ত বীভৎস অবস্থায় ব্যাকসিটের পাদানিতে পড়ে রইল।

—তুমি এবার বেরিয়ে পড়। তাড়াতাড়ি এস। না ফেবা পর্যন্ত আমি চিন্তায় থাকব।

স্টিয়াবিং-এ হাত রেখে রামানন্দ বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন শিবানী বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। এতক্ষণ শিবানী থাকতে তাঁর ভয়ের ব্যাপারটা কিছু কম ছিল। কিন্তু ও চলে যেতেই বাজ্যের ভয় এসে জড়ো হোল। অন্তত মিনিটখানেক গাড়ি স্টার্ট দেবার মতো মানসিকতা হারিয়ে ফেললেন। তারপর সাময়িক দুর্বলতা কাটিয়ে ঠিক যে মুহূর্তে তিনি গাড়িতে স্টার্ট দেবেন, ঠিক তখনই অন্তত চার পাঁচটি শক্তিশালী টর্চের আলো এসে পড়ল তাঁর গাড়ির ওপব। অন্ধকারে মধ্যে হঠাৎ তীব্র আলো রামানন্দর চোখ ধাঁধিয়ে দিল। নিমেষে তিনি চোখের ওপর হাতের আড়াল দিলেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে উঠল, সামনে বিপদ।

বিপদের যে একটা ঝুঁকি নিতে যাচ্ছিলেন এটা তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তবু শিবানীব ভরসায় এতদূর এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু বিপদ যে এত কাছাকাছি এসে গেছে তা বুঝতে পারেননি।

ঘোষ বাড়ির গাড়ি-বারান্দা থেকে গেট পর্যন্ত লম্বা টানা লাল সুরকি-ঢালা পথ। দুধারে কিছু বাগান। তীব্র টর্চের আলোয় রামানন্দ সামনের দিকে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর হাত তখনও চোখের ওপর চাপা। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠেছিল। শুনতে পাচ্ছিলেন বেশ কয়েক জোড়া ভারি বুটের আওয়াজ ক্রমশ তাঁর গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। রামানন্দ খুব সম্ভবত গাড়ি থেকে নেমে পালাতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু কোথায় পালাবেন? তার আগেই তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন একটি শীতল নল জাতীয় বস্তু তাঁর রগ স্পর্শ করছে। এবং পরমুহূর্তেই শুনলেন, — পালাবার চেষ্টা করবেন না মিস্টার রামানন্দ বসু। সোহনলালকে খুন করা এবং তাঁর মৃতদেহ পাচার করার অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। চৌবেজি, দেখুন তো, লাশটা খুব সম্ভবত গাড়ির ব্যাকসিটেই রয়েছে।

একটু পরেই শোনা গেল, — হাঁ জি। ইধার এক আদমিকা লাশ গিরা হুয়া হ্যায়।

ভবেশ ঘোষের বিশাল বাড়ির বিশাল হলঘরের সোফার ওপর জড়োসড়ো হয়ে বসে আছেন রামানন্দ। অন্য সোফায় শিবানী দেবী। রামানন্দের পিছনে ও শিবানীর পিছনে একজন করে কনস্টেবল। ওদের হাতে উদ্যত রিভলবার। সামনে দাঁড়িয়ে নীল ব্যানার্জি আর বিকাশ তালুকদার। হলঘরের সব আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। চাকরবাকরেরা সব অন্য ঘরে প্রায় বন্দী। তাদের হয়তো আলাদা ভাবে কিছু জেরা-টেরা করা হবে।

একক সোফায় বেশ আরাম করেই বসেছিলে শিবানী। তার ভাবলেশহীন মুখে এখনও কোনো অভিব্যক্তি নেই। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই সে বলল,—ওঁকে আপনারা ছেড়ে দিন মিস্টার ব্যানার্জি। উনি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

—তা কেমন করে হয় মিসেস বোস, উনি যে মামাল সমেত হাতে-নাতে ধরা পড়েছেন।

—হতে পারে, কিন্তু,

ঠাণ্ডা গলায় নীল বলে, —আমাদের হাতেও কিছু প্রমাণ আছে। অত্যন্ত প্ল্যানফুলি উনিই সোহনলালকে খুন করেছেন।

—আর কী অভিযোগ আছে আপনাদের?

—আজ থেকে দেড় বছর আগে পার্ক স্ট্রিটের একটি ফ্ল্যাটে শর্মিলা প্যাটেল নামে এক মহিলাকে উনি খুন করেছিলেন।

—প্রমাণ আছে?

সামান্য হেসে নীল বলল,—আপনি কী মনে করেন বিনা প্রমাণে আমরা এতদূর এগিয়েছি। বিনা কারণে আপনাদের হ্যারাস করতে এসেছি? পুলিসের কাছে একটি ক্যাসেট আছে, যে ক্যাসেট টেপ করা হয় আপনাদের ঘোষ কেমিক্যালসের ডিরেক্টরের ঘর থেকে। সেই ক্যাসেটে আছে মিস্টার বসু এবং সোহনলালের কিছু কণ্ঠস্বর। যে কণ্ঠস্বর প্রমাণ করে আপনার স্বামী শর্মিলা দেবীর সঙ্গে গভীর সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন।

—তা দিয়ে প্রমাণ হয় না উনি শর্মিলাকে খুন করেছিলেন।

—না তা হয় না। তবে আরো একটি প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। অত্যন্ত নিখুঁত পরিকল্পনায় আপনারা স্বামী-স্ত্রী যুক্তি করে সোহনকে হত্যা করেছেন আজ সকালে। তারপর রাতের অন্ধকারে তার দেহটি ফেলে দিয়ে আসতে চেয়েছিলেন শহরেরই কোনো সুবিধাজনক স্থানে, তাই না?

বরফ-ঠাণ্ডা গলায় শিবানী বলল, —কে বলল আপনাদের এসব কথা?

নীলের ঠোঁটে সেই পুরনো ছোট্ট হাসি,—এই টেপ-রেকর্ডারটায় অনেক কিছু কথা টেপ হয়ে আছে। আপনাদের জানা নেই, জানার কথাও নয়. সোহনকে আমরা কাল সকালেই অ্যারেস্ট করেছিলাম। সেই আমাদের সবকিছু জানাতে বাধ্য হয়। সে জানায় তার এ বাড়িতে আসার কথা। আর তখনি সে আমাদের দেওয়া ছোট্ট টেপটি সঙ্গে নিয়ে আসে। সেটি ছিল ওর পকেটে। ঠিক কথাবার্তা শুরুর আগেই আপনাদের অগোচরে সুইচ টিপে রাখে। সকালের সব কথাই এর মধ্যে টেপবদ্ধ আছে। অবশ্য

রাতের কথাগুলো নয়। কারণ ততক্ষণে টেপের দম ফুরিয়ে গেছে। সেগুলো আপনাদের মুখ থেকেই শুনে নেব। তবে যা টেপ করা আছে তাতেই রামানন্দবাবুর বিরুদ্ধে খুব সহজেই চার্জশিট তৈরি করা যায়! না রামানন্দবাবু, পৃথিবীর কোনো আদালত থেকেই আপনি খালাপ পেতে পারবেন না। অনেক রাত হয়ে গেছে, এবার যে আমাদের উঠতে হবে।

রামানন্দ সেই যে মাথা নিচু করেছিলেন, এখনও পর্যন্ত সেইভাবে বসে আছেন। তিনি বলতে পারতেন তিনি কোনো খুনই করেননি। কিন্তু নীলের কথার কোনো প্রতিবাদ জানালেন না। জানালে সত্যি কথা বলতে হয়। বলতে হয় সোহনলালকে খুন করেছে তার স্ত্রী। যা তার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

বিকাশ তালুকদার এগিয়ে এলেন রামানন্দর কাছে, বললেন, — শর্মিলা প্যাটেলের খুনি কে এটা আদালতে আপনিই জানাবেন। আপাতত আপনাকে সোহনের হত্যাকারী হিসেবে থানায় যেতে হচ্ছে, নিন উঠুন।

রামানন্দ উঠে দাঁড়ালেন। একবার তাকালেন শিবানীর দিকে। তারপর শান্ত গলায় বললেন, —বেশ চলুন।

বোধহয় রামানন্দ যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিলেন, হঠাৎ শুনলেন তাঁর স্ত্রীর বরফ-ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর, —দাঁড়ান অফিসার। অযথা একজন নির্দোষ লোককে নিয়ে আপনারা টানা-হেঁচড়া করছেন। ওঁকে ছেড়ে দিন। কোনো খুনই উনি করেনি।

ঘুবে তাকালেন বিকাশ, বললেন,—আপনি কী কবে জানলেন আপনার স্বামী বাইবে কী করেছেন না করেছেন? কী করে জানলেন উনি খুন করেননি ?

—কারণ উনি আমার স্বামী। আপনাদেব সবার থেকে ওঁকে আমি বেশি চিনি, জানি। একটু আগেই মিস্টার ব্যানার্জি বললেন, সোহনের পকেটে আপনারা একটা টেপ রেখে দিয়েছিলেন।

বিকাশ পকেট থেকে জাপানি ছোট্ট টেপটা বাব কবে বলেন,—এই সেই ক্যাসেট ভরা টেপ।

—হতে পারে। কিন্তু ওটা বোধহয় এখনও আপনারা শোনেননি?

—কী রকম?

—শুনলে আপনারা আমার স্বামীকে গ্রেপ্তার করতেন না।

এবার নীলই এগিয়ে এল। অত্যন্ত শক্ত গলায় সে বলল,—আপনি ঠিকই অনুমান কবেছেন মিসেস বোস। ক্যাসেটটা আমবা এখনও শুনিনি। ওটা আপনাব মুখ থেকেই শুনব বলে অপেক্ষা করছিলাম।

ঠাণ্ডা এবং বেশ গম্ভীব গলায় শিবানী বলে,— সোহনলাল নামের জানোয়ারটাকে খুন করেছি আমি।

রামানন্দ প্রায় আর্তনাদের ভঙ্গিতে বাধা দিলেন,—না, ও মিথ্যে বলছে। খুন করেছি আমি।

—তুমি চুপ কবো। কথার মধ্যে কথা বলা আমি পছন্দ করি না। শুনুন মিস্টার অফিসার, অত্যন্ত পরিষ্কার মাথায়, ভেবেচিন্তে, আমিই সোহনকে খুন করেছি। প্রমাণও আছে। ওর মাথায় যে বুলেটটা আটকে আছে সেটা আমার রিভলভার থেকেই খরচ করা হয়েছে। রিভলভারটা এখনও আমাব ড্রয়াবে আছে। রিভলভারে আমার হাতের ছাপ পাবেন। আমার খাটের নিচে একটা সোফাপিলো আছে। রক্তমাখা। বক্তটা সোহনের মাথায়। পিলোর ওয়ারে আমার হাতের ছাপ পাবেন। এছাড়াও যে ক্যাসেটটা আপনাদেব কাছে আছে সেটা শুনলেই বুঝতে পাববেন, খুনটা কে করেছে। ক্যাসেটটা শুনলেই বুঝতে পারবেন, আমার স্বামী এ খুনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। খুনের এক মিনিট আগেও উনি জানতেন না এমন একটা খুন হতে পাবে।

—সোহনলালকে আপনার খুন কবার উদ্দেশ্য?

—লোকটা আমাব স্বামীর ক্ষতি করতে চেয়েছিল। ও যতদিন বেঁচে থাকতো ততদিনই আমাব স্বামীর মান-সম্মান বিপন্ন হতে থাকতো।

—আমি ঠিক এটাই অনুমান করেছিলাম, নীল বলল, এবাব একটা সত্যি কথা বলবেন মিসেস বসু, দেখি আমার অনুমান সত্যি কিনা।

—আপনি নিশ্চয়ই শর্মিলা প্যাটেলের কথা জানতে চাইছেন?

—আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী।

—শর্মিলার সঙ্গে আমার স্বামীর ঘনিষ্ঠতা আমি তিন বছর আগেই জানতে পেবেছিলাম। আমার চোখকে ধুলো দেওয়া রামানন্দর পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ওকে বাধা দিইনি। আমি জানতাম ওর একটা বিবাট কষ্টের দিক আছে। বিবাহিত জীবন ওর কাছে মরুভূমির মতো হয়ে ছিল। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলাম, শর্মিলা ভালো মেয়ে নয়। ও রামানন্দকে কতটা আনন্দ আর সুখ দিতে পেরেছিল তা জানি না, তবে বেশ বুঝতে পারছিলাম রামানন্দ তলিয়ে যাচ্ছে। ওর চেকের অ্যামাউন্ট দিন দিন বেড়েই চলছিল। আমার একদিন মনে হল, শর্মিলা রামানন্দকে সম্পূর্ণ শুষে নিয়ে তাড়িয়ে দেবে। অত্যন্ত সরল প্রকৃতির রামানন্দ সেদিনের দুঃখ রাখার জায়গা পাবে না। শর্মিলা কোনো ভালো আর ভদ্রঘরের মেয়ে হলে আমি হয়তো অন্য কোনো ডিসিশান নিতাম, কিন্তু.... , হ্যাঁ মিস্টার ব্যানার্জি দেড় বছর আগে এক বৃষ্টিঝরা বিকেলে, আমি শর্মিলার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। ও দরজা খুলে নিজেই আমায় ভেতবে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর

রামানন্দ যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, —শিবানী!

—হ্যাঁ রামানন্দ, ওর হাত থেকে তোমাকে বাঁচানোর জন্যেই ওকে আমি খুন করেছিলাম। বৃষ্টি এতে জোর পড়ছিল, গুলির শব্দ কেউই পায়নি। ধীরে-সুস্থেই আমি বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। অবশ্য সেই সন্ধ্যায় তুমিও সেখানে গিয়েছিলে। বাড়ি ফিরে ভেবেছিলাম তোমায় ফোন কবে সোজা বাড়ি চলে আসতে বলব। কিন্তু তার আগেই তুমি অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছিলে। ভাগ্য ভালো, কেউই তোমার আসা-যাওয়াটা টের পায়নি।

বামানন্দ কোনো মতে বলতে পারলেন,—শর্মিলা খুনের কথা তো তুমি আমায় আগে জানাওনি।

—আগ বাড়িয়ে কিছু বলা, আমার স্বভাবের বাইরে। তাছাড়া তোমাকে জানানোর কোনো প্রয়োজন দেখিনি। মিস্টার অফিসার এবার নিশ্চয়ই আমার স্বামীকে আপনারা ছেড়ে দেবেন?

এবারও নীল বলল,— বোধহয় না। কারণ দ্বিতীয় খুনের সবকিছু প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও উনি মৃতদেহ অন্যত্র পাচার করতে চেয়ে খুনিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। আইন কি আপনার স্বামীকে ছেড়ে দেবে? আমার জানা নেই।

—হুঁ, বলে শিবানী সামান্য সময় চুপ করে রইলো, তারপর বলল,—ভালো কথা, স্ত্রী হিসেবে সুখে দুঃখে আমার স্বামীর প্রতি আমার যা কর্তব্য তা করেছি। এবাব আইন তার পথেই চলুক। চলুন কোথায় যেতে হবে।

—আসুন, বলে বিকাশ তালুকদার এগিয়ে গেলেন। পিছনে রামানন্দ, আর শিবানী। তারও পিছনে আব সবাই।

সারা অফিস যখন তোলপাড়, ঘোষ কেমিক্যালস-এর ছোট বড় সব কর্মচারী যখন ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল, তারা যখন ভাবিত দুই কর্ণধারের অনুপস্থিতিতে কোম্পানিব কী হাল হবে, তখন কিন্তু আর একজন মানুষের মধ্যে অন্যতর এক চিন্তা। সে শ্যামদুলাল। রামানন্দর প্রতি ঈর্ষায় বিদ্বেষে সে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল ঠিকই, চেয়েছিল রামানন্দর পতন, চেয়েছিল একটি অনাবিষ্কৃত সত্যকে জানতে। কিন্তু এ কী হল? এতো সে চায়নি। এ সত্যটুকু বোধহয় না জানলেই ভালো হত।

নানান বিশৃঙ্খলার মধ্যে সারাদিন অফিসে কাটিয়ে সে আজও এসেছে গঙ্গার ধারে। আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া নামছে ধীরে ধীরে। গঙ্গা থেকে বয়ে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শ্যামদুলালের মনে হল, কী দরকার ছিল তাব উপযাচক হয়ে গোয়েন্দার কাছে যাওয়ার? কী দরকার

ছিল আসল সত্যটুকু জানার তাগিদে গোপনীয় ক্যাসেটটি পুলিসের হাতে তুলে দেবার? কীইবা হবে রামানন্দর, বড় জোর ক' বছরের জেল। কিন্তু অন্ধকার চিরে যে সত্যটুকু বেরিয়ে এল, এখন মনে হচ্ছে বড় অকৃতজ্ঞের কাজ করা হয়ে গেছে। পিতৃপ্রতিম ভবেশ ঘোষ চেয়েছিলেন মেয়েকে সুখী করতে; চেয়েছিলেন তাকে সংসারী করতে। করেও গিয়েছিলেন। আর সেই ঘরটুকু, অকৃতজ্ঞের মতো সে ভেঙে দিল।

শিবানীকে তার খুনি মনে হয় না। মনে হয় সে এক অসাধারণ চরিত্রের মহিলা। পতিব্রতার অন্য নাম বুঝি শিবানী। এটাই বুঝি শিবানীর সম্বন্ধে শেষ সত্য কথা। আইনের চোখে শিবানী হয়ত দোষী হবে। কিন্তু তার চোখে শিবানী আরো অনেক বড়ো, আরো অনেক মহিয়সী নারীর মধ্যে জায়গা করে নিল। অন্ধকারের বুকে এই সুন্দর সত্যটুকুকে উপলব্ধি করতে করতে সে বুঝতে পারছিল এবার থেকে তার রোগটা নিশ্চয়ই সেরে যাবে কেননা আর তার কোন ঈর্ষা নেই, নেই কোন বিদ্বেষের জ্বালা। আর বোধহয় তার মনের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া কোন সত্যকে জানার জন্যে গোয়েন্দার দ্বারস্থ হতে হবে না।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে শ্যামদুলালের মনে হল এ বোধহয় ভালোই হল, বোধহয় এটাই হওয়া উচিত ছিল।

রহস্যে ঘেরা শান্তনীড়

মস্ত বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল নীল আর দীপু। তাকিয়ে দেখার মতো বাড়ি। সাবেকি এবং দেমাকি। অনেকটা ঐ মহিলার কথাবার্তার মতোই। মহিলার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের মতোই উদ্ধত এবং অহঙ্কারী ভাবটা ফুটে উঠছে বাড়িটার সর্বাঙ্গে।

আজকালকার দিনে সচরাচর এ-ধরনের বাড়ি পোষাব হ্যাপা অনেকেই সামলাতে চান না। প্রথমেই আসে দেখাশুনো আর যত্ন-আত্তির প্রশ্ন। কিছু না হলেও বিঘে খানেক জায়গা তো হবেই। চারদিকে ইটের পাঁচিল। সামনের দিকে কোথাও কোনো বাড়তি অযত্নের আগাছা নেই। দেয়ালটা দেখলেই বোঝা যায় মাত্র কিছুদিন আগে রঙটঙ করা হয়েছে। এবং সেটা এখনও রোদবৃষ্টি-ঝড়ে মলিন বা কর্দমাক্ত নয়। বিশাল লোহার গেট। কালো রঙ করা। সেটাও বেশ চকচকে। ফটকের বাইরে থেকে ভেতরের অংশটুকু যা চোখে পড়ে সেটাও চোখ জুড়িয়ে যাবার মতোই। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। ফটক সংলগ্ন ঝকঝকে ইটরঙা থামের গায়ে সাদা পাথরের ওপর কালো অক্ষরে লেখা 'শান্তনীড়'।

নীল আর দীপু পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। নীল মুখে কিছু বলল না। কিন্তু দীপু থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল,—নীড়, মানে কি নীলদা?

ঠোটের কোণে হাল্কা হাসি ফুটিয়ে নীল বলল,—তুই কি বলতে চাইছিস বুঝতে পারছি। তবে নীড় মানে কি আর শুধুই পাখির বাসা। নীড় মানে আলয়। রূপক অর্থে আবাসন যেখানে বাস করা যায় সে পাখিই হোক আর মানুষই হোক।

দীপু 'হবে' বলে সামান্য মুখ কুঁচকে পকেট থেকে চার্মস বাব করে ধরাল। তারপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল,—আর কেন, চল ভেতরে যাওয়া যাক।

—তা তো যাব। কিন্তু কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না। তার ওপর গেটটাও তো বন্ধ।

—তালা দেওয়া তো নেই। মাবো না ধাক্কা, খুলে যাবে।

—অগত্যা, বলে নীল আস্তে আস্তে লোহার গেটটা ঠেলল। সামান্য একটু ফাঁক করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। পিছনে দীপুও।

—শালা, বাজারাজড়ার পারসাদ বলে মনে হচ্ছে।

কপট রাগের দৃষ্টিতে দীপুর দিকে ফিরে নীল বলল,—দীপু, যেখানে সেখানে শালা টালা বলাটা কবে ছাড়বি বল তো?

— কেন গুরু, শালা তো এখন ইতর ভদ্র সবাই বলে। যেখানে সেখানে ব্যবহার করাও চলে। এই তো সেদিন, আমাদের বাড়ির ঠাকুরমশাই, মানে পুজোটুজো করে আর কি, একটা ধাঙড়ের সঙ্গে রাস্তায় কলিশন হতে বেমালুম শালাটালা বলে তুবড়ি ছোটালো। শুনে মনে হল ওটা ওর রেগুলার হ্যাবিট। কে জানে, ও শালা মন্তরের সঙ্গে শালাটালা পাঞ্চ করে কি না।

দীপুর কথা বলার ধরনে নীল হেসে ফেলে বলল,—ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুই একটু শালাটালা কম বললে মহাভারত তেমন কিছু অশুদ্ধ হবে না।

—জো আজ্ঞা মহারাজ। কিন্তু চারদিক তো সান্নাটা। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

—চল, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি।

বেশিদূর যেতে হল না। ধোপদুরস্ত ইউনিফর্ম পরা একটি লোক, কে জানে কোথায় ঘাপটি মেরে ছিল, দুম করে সামনে এসে দাঁড়াল। বেশ বোঝা যায় লোকটি এ বাড়ির দারোয়ান।

—আপলোক, কিধার সে আ রাহা হ্যায়?

—মেমসাব কোঠিমে হ্যায়? আই মিন মিসেস স্মিতা গুহ?

লোকটির মুখে অভিব্যক্তি কম। প্রায় নির্বিকার এবং নীরস মুখে বলল, — হ্যায়, লেকিন, আপকা কোই অ্যাপয়েন্টমেণ্ট হ্যায়?

—হাঁ হ্যাঁ, জরুর, বলে নীল পকেট থেকে কার্ড বার করে এগিয়ে দেয়।

সাজানো বাড়ি। কেতাদুরস্ত দারোয়ান। কিন্তু দারোয়ানটি কেতার ধার ধারে বলে মনে হল না কার্ডটা নিয়ে নামটা পড়ল। তারপর নীলের দিকে কুঞ্চিত নেত্রে তাকিয়ে বলল,—আইয়ে আপলোগ

লাল কুঁচি পাথরের নাতিপ্রস্থ রাস্তা পার হয়ে ওরা গিয়ে দাঁড়াল গাড়ি বারান্দার নিচে। সাদা একটা অ্যামবাসাডার দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িটাও বেশ ঝকঝকে। মনে হচ্ছে একটু আগেই কেউ গাড়িটার আগাপাশতলা পালিশ করেছে। আর কিছু না হোক, বাড়ি এবং বাড়ির বাইরের এইসব সাজানো এবং গোছানো ব্যাপার-স্যাপার দেখে যে কেউ বলবে বাড়ির মালিক বেশ পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসেন।

দামি কাঠের গ্রীল এবং কাচ বসানো পালিশমসৃণ বড় দরজা ঠেলে দারোয়ানবাবুটি ওদের দুজনকে নিয়ে গিয়ে বসাল আরো সুন্দর আরো ঝকঝকে করে সাজানো বৈঠকখানায়।

—কি নেই? দীপুর নিম্নস্বরে মন্তব্য।

সত্যিই তাই। দামি অয়েলপেন্টিং থেকে আরম্ভ করে বেলজিয়াম কাচের ঝাড়, জয়পুরী শিল্প-সমৃদ্ধ পাথরের মূর্তি, পেতলের কারুকাজ করা টবে বাহারি কিছু গাছ। দরজা জানালায় দামি সিল্কের পর্দা। খুব সম্ভবত ঘরটায় এয়ার কুলার বসানো আছে। কিন্তু এখন শীতকাল বলে হয়তো চলছে না। মেঝেয় পাতা পুরু মূল্যবান কার্পেট। সারা ঘরে ভারি মিষ্টি গন্ধ ছড়ানো। সম্ভবত কোন বিলিতি এয়ার ফ্রেশনার স্প্রে করা হয়েছে। সমস্ত ঘরখানায় অদ্ভুত শান্ত-নির্জনতা।

ওরা গিয়ে বসল চকোলেট রঙের শরীর-ডুবে-যাওয়া ভেলভেট সোফায়। বসতে বসতে দীপু বলল,— কোথায় নিয়ে এলে বল তো নীলদা? হোল লাইফ মাইরি রকে বসে বসে পাছায় কড়া পড়ে গেছে। এখন এই ডানলোপিলোর কেতা, সহ্য হয়? ভালো করে নড়াচড়াই যায় না। নাহ্, আমি বরং মাটিতেই বসি।

নীল আড়চোখে একবার দীপুকে দেখে নিয়ে বলল,— মেঝেতে কি পাতা আছে দেখছিস?

—এ শালা, থুড়ি, এ বাড়ির লোকজনকে মাইরি বেগবাগানের বস্তিতে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে হোত, রি-অ্যাকশানটা কি হয় তাই দেখতুম।

দীপুটা একটু বেশি বেশি স্মোক করে। বয়েসও ওর বেশি নয়। বছর চব্বিশ-পঁচিশ। কিন্তু বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। বয়েস বোঝা যায় না। ওর একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। নীল, মানে শখের গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জির প্রায় সব রহস্যভেদে ওর সঙ্গে আগে থাকতো ওর বন্ধু লেখক অজেয় বসু। কিন্তু বর্তমানে বন্ধুবরটি নিজের লেখা আর প্রফেসারি নিয়ে এত ব্যস্ত, ওর পক্ষে নীলের নিয়মিত সঙ্গী থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। নীল বুঝতো ওর অসুবিধার ব্যাপারটা। হঠাৎ দীপুর সঙ্গে নাটকীয়ভাবে আলাপ হয়ে গেল নীলের।

দীপুর দাদা শুভঙ্কর ছিল নীলের স্কুল জীবনের বন্ধু। খুব নিবিড় না হলেও শুভঙ্করের সঙ্গে নীলের দোস্তির অভাব ছিল না। স্কুল এবং কলেজ জীবনের পর উভয়ের জীবনযাত্রা আলাদা হওয়ায় আগের সেই দোস্তিতে কিছুটা ভাটা পড়েছিল। যা হয় আর কি। একটা বয়েসের পর যে যার জীবিকার ধান্দায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শুভঙ্করের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় ছিন্নই হতে বসেছিল। হঠাৎই দীপঙ্কর মানে দীপুর সঙ্গে একটা বিশ্রী অবস্থায় নীলের মোলাকাত হয়ে গেল।

অর্ডিনারি বি কম. পাস দীপুর সামনে চাকরি-টাকরির কোনো পথই খোলা ছিল না। ফলে যা হয় তাই। রকবাজি আর আড্ডাবাজিতেই সময় কাটিয়ে দিচ্ছিল। একে বেকার,তায় বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে মাঝে মাঝেই নেশা করা শুরু করেছিল। বেকারের নেশার পয়সা যোগাড় হয় বাবা-দাদার পকেট কেটে। নয়তো জুয়োটুয়ো খেলে। দীপুর সবগুলোই রপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

একদিন প্রায় সন্ধের মুখে নীল একাই ফিরছিল। রাস্তাও ছিল বেশ নির্জন। হঠাৎ ওর নজরে এল

রবের একটা গাছতলায় দু'তিনটে ছেলে এবং একটি মেয়ের মধ্যে চলেছে কিছু বচসা। এবং এরই মধ্যে একটি ছেলে মেয়েটির হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে।

এই অনিশ্চয়তার যুগে এ এক কমন রোগ। প্রায় সব পাড়াতেই এ ধরনেব কিছু না কিছুই ঘটনা ঘটেই। পথচারীরা অকারণ ঝুটঝামেলার জড়িয়ে পড়তে চায় না। বিসদৃশ কিছু তারা দেখেও দেখে না। না দেখার ভান করে তড়িঘড়ি পা চালায়। কিছু কিছু বয়স্ক লোক নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে মন্তব্য করেন, সমাজবিরোধী আর মাস্তান গুণ্ডায় দেশটা অরাজক হয়ে উঠছে দিন দিন জাতিব ভবিষ্যৎ অন্ধকাব.... দেশে আইনকানুন আর কিছুই রইল না. .. ইত্যাদি।

এসব ঘটনা নীলের অজানা কিছুই নয়। কিন্তু তার করারও কিছু নেই। সে সমাজসংস্কাবক নয়। রাজনীতিও করে না। মোটামুটি সে ব্যস্ত তার নিজের কাজকর্ম নিয়ে। অপবাধ এবং অপবাধী নিয়ে তাব কাজকারবার হলেও, এই সব উঠতি ছেলেদের বিসদৃশ আচাব-আচবণ তাকে পীড়া দেয়। কিন্তু সে কিছুতেই এদের অপরাধী বলে ভাবতে পারে না। সে জানে এসবেব মূল কোথায়? কেন আজকেব যুবসমাজ ক্রমাগত অবক্ষয়ের পথ বেছে নিচ্ছে।

তবু তার করারও কিছু নেই। কিন্তু সেদিন তার চোখের সামনেই একটি মেয়েব শ্লীলতাহানির ঘটনা তাকে ঠিক নিশ্চুপ করিয়ে রাখতে পারল না। খবরের কাগজে পড়া আর চোখের সামনে ঘটা, দুটোয অনেক পার্থক্য।

একটু দ্রুত পা চালিয়ে ও এগিয়ে গিয়েছিল গাছতলার দিকে। তিন-চারজন ছেলে। বযেস বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। তাদেব কিন্তু কোনদিকেই কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ভাবটা এমন, এসব কাজ কবাব অধিকার নিয়েই তাবা জন্মেছে। তাদের প্রতিটি কাজেই তাই একটা বেপরোয়া ভাব।

ধীরে ধীরে নীল ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটির অবস্থা তখন শোচনীয়। একজন তাব ভ্যানিটি ব্যাগটা ছিনিয়ে নিতে চাইছে। প্রাণপণে মেয়েটি সেটা বক্ষা করার চেষ্টা করছে। তাদেবই একজন কখন যেন তার একটা হাত চেপে ধরে মোচড় দিতে শুরু করেছে।

সবিস্ময়ে নীল দেখল এদিকের ফুটপাথ প্রায় জনমানবশূন্য। ঠিক উল্টো ফুটে পান-সিগারেটের দোকানেব সামনে দু'তিনজনের সমাবেশ। তারা সিগারেট কেনার অজুহাতে আড়চোখে ঘটনার সাক্ষী হচ্ছে। কিন্তু প্রতিকারের কোন কারণহীন বাসনাই তাদের মধ্যে নেই।

নীলকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে দাড়িওয়ালা একটা ছেলে একবার আড়চোখে তাকালো। তাবপর মাছি তাড়ানোর মতো হাত নাড়িয়ে বলল,—এখানে কি....ফুটুন....ফুটুন....।

খুব শান্ত স্বরে নীল বলেছিল,—তা নয় ফুটে যাওয়া যাবে। কিন্তু এগুলো হচ্ছেটা কী?

পাশ থেকে অপেক্ষাকৃত বেঁটে খাটো একটি ছেলে ফুট কাটল,—এসব পার্সোনাল বেপাব দাদা। কেটে পড়ুন। কেন মাইরি নকরাবাজিতে নিজেকে লটকাচ্ছেন?

নীল ছেলেটির দিকে ফিরেও তাকালো না। সে সোজা মেয়েটিব কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, --এরা সব আপনার চেনা?

কুটো ধরার চেষ্টা করে মেয়েটি হাঁফাতে হাঁফাতে বলল,—বিশ্বাস করুন, এদের কাউকেই আমি চিনি না। অফিস থেকে ফিরছি। হঠাৎ ওরা এগিয়ে এসে ব্যাগটা চাইল। ওব মধ্যে আমার সারা মাসের মাইনে।

হঠাৎ নীলের গলার স্বর পাল্টে গেল। প্রায় আদেশের ভঙ্গিতে অথচ শান্ত আর গম্ভীর স্বরে ও বলল,— তোমরা ওকে ছেড়ে দাও। তোমরা যা চাইছ তা যদি সত্যি হয়, আর মেয়েটি যদি সত্যিই ওর মাইনের টাকা নিয়ে যায় তাহলে ওর পক্ষে ওই ব্যাগটা তোমাদের দেওয়া সম্ভব নয়।

ছেলেগুলো ঠিক এই ধরনের কথা শুনবে ভাবতেও পারেনি। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের বাহাদুর ভাবে। তদুপরি নীলের মতো ছিপছিপে চেহারার লোক, এরকম গ্রাম্ভারি আদেশ করবে তাও এদের কল্পনাব অতীত।

সেই দাড়িওয়ালা ছেলেটাই হঠাৎ এগিয়ে এসে বলল,— কে বে ফোড়নদাস! পুলিস তো নও

চাঁদু, তারা এখন এদিকে আসবেই না। নামের আগে চন্দ্রবিন্দু বসাতে না চাইলে, মানে মানে কেটে পড়।

আবারও সেই বরফ ঠাণ্ডা গলায় নীল বলল,—ওকে ছেড়ে দাও। দেখে বুঝতে পারছ না মেয়েটি অভাবী? টাকাটা তোমাদের দিয়ে দিলে সত্যিই ও অসুবিধায় পড়ে যাবে।

পেছন থেকে কে একজন বলল, —এই যে যুধিষ্ঠিরদা, তাহলে আমাদের অভাবটা কে মেটাবে মাইবি, আপনি? নেলো, এ মুরগিটাকেও মাইরি জবাই করলে হয়। মনে হচ্ছে শাঁসটাস আছে,

সে কথায় কর্ণপাত না করে নীল আবার বলল—আমি তোমাদের অনুরোধ করছি ভাই ওকে ছেড়ে দাও। তোমাদের হয়তো অভাব আছে। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষকে ফতুর করে সে অভাব মিটবে না। ওকে যেতে দাও।

হঠাৎ কোথা দিয়ে কি হয়ে যায়, — দূর বে হুলিদাসকা বাচ্চা বলেই, সেই দাড়িওয়ালা ছেলেটি নীলের মুখ লক্ষ্য করে একটা ঘুষি চালাল। কিন্তু ছেলেটির জানা ছিল না, ওর নাম নীল ব্যানার্জি ওরকম অশিক্ষিত ঘুষি-ঘাযার জবাব কি হয় খুব সম্ভবত ছেলেটি তাও জানতো না। মাত্র কয়েক পলকের হিন্দী সিনেমার একটি দৃশ্য। দেখা গেল দাড়িওয়ালা ছেলেটি মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেছে। মুখ দিয়ে তার মাত্র একটি আঘাতেই উঃ আঃ শব্দ বেরুচ্ছে। প্রায়শই যা হয়, এখানেও তাই হল। যেহেতু এটি হিন্দী সিনেমার দৃশ্য নয়, আর কোন পাল্টা আক্রমণ ওপাশ থেকে এলো না। রণে ভঙ্গ দিয়ে বাকি তিনটি ছেলে ছুটে বাঁচল। কারণ তারা বুঝেছিল, বিপক্ষের লোকটি খুব সাধারণ ভেতো কেউ নয়।

দীপঙ্কর, ওরফে দীপু ওরফে দাড়িওয়ালা ছেলেটির ঝাঁকড়া চুলের গোছা তখন নীলের মুঠোয়। তার ঠোঁটের কষ ফেটে গেছে। খুব সম্ভবত ঘাড়ের রদ্দাটা একটু বড় মাপের হয়ে গিয়েছিল। ফলে সে ঘাড় নাড়াতেই পাচ্ছিল না।

মেয়েটিকে সসম্মানে ছেড়ে দিয়ে নীল দাড়িওয়ালাকে টেনে তুলল। তারপর তার দিকে তাকিয়ে বলল,—হাঁটতে পাববে?

ছেলেটি হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছতে মুছতে বলল,—থানায় যেতে হবে তো?

—নাঃ, আমি পুলিস নই।

—তাহলে?

—চলই না. তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করব।

সেদিন ছেলেটি যেতে বাধ্য হয়েছিল। নীল ওকে নিয়ে গিয়েছিল নিজের বাড়িতে। কথায় কথায় পরিচয় বের হতে জানা গেল ওর নাম দীপঙ্কর রায়। বাল্যবন্ধু শুভঙ্করের ভাই। স্মার্ট, ইয়াং এবং মোটামুটি শিক্ষিত ছেলেটিকে নিয়ে নীল একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইল। নীল ওকে বলেছিল, চাকরি-টাকরি না পেয়ে তুমি একটা রোমাঞ্চকর আনডিগনিফায়েড লাইফ লীড করেছিলে। আমার সঙ্গে থাক, এখানেও রোমাঞ্চ আছে। কিন্তু ডিগনিটিও আছে। চেষ্টা করে দেখব তোমাকে পুলিস লাইনে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা। অন্তত কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে থাক না কিছুদিন আমার সঙ্গে। তাছাড়া তুমি যখন শুভঙ্করের ভাই। শুভঙ্কর আমার স্কুল লাইফের বন্ধু। থাকবে আমার সঙ্গে?

দীপু ভাবার সময় নিয়েছিল। কিন্তু শুভঙ্করই একদিন নিজে এসে হাজির। বলেছিল, —দীপুর মুখে সব শুনলাম। নীল, ভাই একটু চেষ্টা করে দেখ না, যদি ওটাকে মানুষ করা যায়। চাকরি টাকরি না পেয়ে একেবারে বখে যাচ্ছে।

সেই থেকে দীপু নীলের সঙ্গী। কিন্তু অন্যসব নেশা ছাড়লেও, যখন-তখন শালা ইত্যাদি বলা এবং হুসহাস সিগারেট ফোঁকার বাতিকটা নীল ছাড়াতে পারেনি।

স্মিতা গুহর নরম সোফায় বসে ও বোধহয় আরো একটা সিগারেট বার করেছিল। কিন্তু নীল বাধা দিল, —একে তো সস্তা দরের সিগারেট। ঘরের এই মিষ্টি গন্ধটা নষ্ট করতে হবে না। বেরিয়ে খাস।

দীপু বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে কারো নিচে নামার শব্দ পাওয়া গেল।

একটা সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো বিশাল বাড়ি।

বাড়িটার চারদিকে মনোরম সবুজের সমারোহ। বাড়ির ভেতরটা তার থেকেও আরো বেশি মনোরম। সাজানো গোছানোর মধ্যে ছিল রুচি এবং শিক্ষার ছাপ। কি এক বিশেষ প্রয়োজনে এ বাড়ির গৃহকর্ত্রী নীলকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কারণটা এখনও অজানা। টেলিফোনে মহিলার কণ্ঠমাধুর্যও নীলকে আকৃষ্ট করে। যদিও মহিলার কণ্ঠস্বরে ছিল কিছু দাম্ভিকতা। যা হওয়াই স্বাভাবিক। এ ধরনের একটি বাড়ির মালকিন যিনি তাঁর বাচনে কিছু সুপ্ত দাম্ভিকতা তো থাকবেই। নীল আর দীপু আশা করেছিল এই ঘরের মতোই সৌখিন, শিক্ষিত, আভিজাত্যময় কোন রূপসী রমণীর আবির্ভাব ঘটবে।

কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে যাকে নিচে নামতে দেখা গেল আর যাই হোক তাঁর সম্বন্ধে পূর্বের ধারণাটুকুর অবশিষ্ট আর কিছুই রইল না।

বিশাল একটি অ্যালসেশিয়ান সমেত ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন মহিলা। জিজ্ঞাসু নেত্রে উভয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

না, এ মহিলার সর্বাঙ্গে রূপের কোন অবশিষ্ট কিছু ছিল না। মহিলার বয়েস আন্দাজ করা শক্ত। ত্রিশও হতে পারে। পঁয়ত্রিশ হতে পারে। অথবা চল্লিশ পার হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।

সারা শরীরে কোনদিনও যৌবন এবং স্বাস্থ্য বলে কিছু ছিল বলে মনে হয় না। রঙটা অবশ্য অস্বাভাবিক ফরসা। প্রায় সাদা কাগজ।

সেটা রক্তস্বল্পতার কারণেও হতে পারে। অতৈলাক্ত রুক্ষ চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। চোখে সোনালি ফ্রেমের দামি চশমা।

পাওয়ারটা বেশি, ফলে চোখের ভাষা বোঝা কঠিন। ভাঙা গালে আর কণ্ঠায় পুরুষালি ছাপ। পরিধানে ছিল গোলাপি উলেন হাউসকোট। শরীর থেকে দারুণ একটা সুবাস আসছিল। নিশ্চয়ই কোন দামি পারফিউম অথবা বডি স্প্রে। মহিলার আগমনে ওরা দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছিল।

—বসুন। দাঁড়ালেন কেন? বলে মহিলা সামনের সোফায় বসে পড়লেন।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এই মহিলা সম্বন্ধে নীল দুটি কথা ভাবতে পারল। এক, মহিলা যতই কুদর্শনা হোন, অর্থের প্রাচুর্য এবং ভোগের উপকরণ তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে রেখেছে। আর দ্বিতীয় ভাবনাটি হল, প্রকৃতি কাউকে একেবারে বিমুখ করে না। মহিলার কণ্ঠস্বরটি অতীব সুমিষ্ট।

সোফায় বসার পর তাঁর স্বভাবসুলভ দাম্ভিক কণ্ঠে মহিলা বললেন, —আমিই স্মিতা গুহ। ফোনটা আমিই করেছিলাম। কিন্তু আপনাদের মধ্যে কে নীলাঞ্জন ব্যানার্জি?

নীল বলল,—আমিই নীলাঞ্জন ব্যানার্জি। কিন্তু ফোনে প্রয়োজনটা আমাকে জানাননি।

—জানবেন। তার আগে একটু চা খান। মহিলার কণ্ঠে সুরেলা আদেশ। যেটা ঠিক এড়ানোও যায় না অর্থাৎ তিনি যখন বলেছেন তখন ইচ্ছে না থাকলেও চা খেতেই হবে। অবশ্য ওদের দুজনেরই চায়ে কোন আপত্তি ছিল না। এবং চাও এসে গিয়েছিল।

চা পরিবেশন করে পরিচারক লোকটি নিঃশব্দে চলে গেল। শুধু চা নয়, সঙ্গে পেসট্রি। কাজু এবং কোকোর আধিক্য বেশি।

লাজলজ্জা দীপুর বরাবরই কম। একটা পেসট্রি তুলতে তুলতে বলল, —কিন্তু ম্যাডাম আপনার?

—আমি অসময়ে কিছু খাই না। দ্যাট্স্ নো ম্যাটার। আপনারা খেতে থাকুন, আমি আমার বক্তব্য বলি। তার আগে একটা প্রশ্ন, নীলের দিকে তাকিয়ে স্মিতা বললেন,—আমি কিন্তু নীলাঞ্জনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম।

নীল এতক্ষণ মহিলাকে লক্ষ্য করছিল। পালটা জবাবে সেও বলল, —দ্যাস্টস্ নো ম্যাটার। ওর সামনে আপনার প্রবলেম বলতে পারেন। ও আমার সহকর্মী।

—আই সি।

মহিলা কেবল সাফিসটিকেটেড নন, একটু বেশিমাত্রায় মড।

টেবিলে রাখা দামি সিগারেট কেস থেকে একটা 'মোর' তুলে নিলেন। লেডিস সিগারেট অবলীলাক্রমে সেটিকে ঠোঁটে রেখে আরো অবহেলায় তুলে নিলেন লাইটারটি। এতক্ষণ সেটিকে একটি পুতুল ড্রাগন বলে মনে হচ্ছিল। ড্রাগনের পেট টিপতেই মুখ দিয়ে আগুন বেরিয়ে এল।

দীপু আড়চোখে তাকালো নীলের দিকে। নীলের দৃষ্টি কিন্তু স্মিতার মুখেই ঘোরাফেরা করছিল

কোন রকম ভনিতা না করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে স্মিতা বললেন, —বিশেষ একটি প্রয়োজনে আমি আপনার সাহায্য চাইছি। অবশ্য আপনার সময়ের মূল্যটুকু দিয়েই।

—সে তো আপনি ফোনেই জানিয়েছেন। এখন বলুন আপনার কাজটা কি?

স্মিতা আর একবার ধোঁয়া টানলেন এবং ছাড়লেন। মাত্র কয়েকমুহূর্ত মাথা নিচু করে কিছু ভাবলেন. তারপব বললেন, —এই যে দেখছেন, এই বিশাল বাড়ি, এটা আমার। কলকাতা শহরে, এতবড় না হলেও আরো খানতিনেক বাড়ি আছে। সবই আমার। অবশ্য সেগুলো ভাড়া দেওয়া আছে। এ ছাড়াও রয় এন্টারপ্রাইজের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। ব্যবসাটাও খুব একটা ছোটো-খাটো নয়। বছরে আট কোটি টাকার বিজনেস। আর এ সবকিছুই আমাব।

—কিন্তু,

—বুঝতে পেরেছি কী বলবেন। আমার সম্পত্তির পরিমাণ শোনানোর জন্যে আপনাকে আমি ডাকিনি। কিন্তু এটা শোনানোর দরকার আছে। যেহেতু আমার এত বড় সম্পত্তি, আমার শত্রু থাকাই স্বাভাবিক। বাইরের কোন শত্রু সম্বন্ধে আমার তেমন মাথাব্যথা নেই। কারণ সেগুলোর মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমার আছে। কিন্তু শত্রু আমার ঘরেই। তিনি আমার স্বামী।

এবার নীল আর দীপু দুজনেই স্মিতার দিকে তাকালো।

স্মিতাকে বিবাহিতা বলে মনে হয়নি। সিঁথিতে কোন রক্তিম চিহ্নও ছিল না। তবে আজকাল সিঁদুর মাহাত্ম্য বোঝা কঠিন। কেউ কেউ মাঝ কপাল পর্যন্ত লম্বালম্বি সিঁদুর টেনে আনেন। আবার কেউ কেউ আলতো করে এক কোণে ছুঁইয়ে রাখেন। ঐ আলতো করে ছুঁইয়ে রাখার বর্তমান ফ্যাশানটির জন্যে চট্ করে অনেককেই বোঝা যায না তিনি বিবাহিতা কিনা। কিন্তু ওদের দুজনের তাকানোব অর্থ একটাই। যতই বিত্তবতী মহিলা হোন না কেন স্মিতা, এই মহিলাকে বিয়ে করে দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়া যায় কিনা সেটা চিন্তনীয়।

ওদেব চাহনিব কী অর্থ করলেন স্মিতা, তা ঠিক বোঝা গেল না। সে প্রশ্নান্তরেও তিনি গেলেন না। কাবণ তাঁব মুখের অভিব্যক্তি বড়ই নীরস, নির্লিপ্ত এবং নিথর।

অত্যন্ত শান্ত আব স্থির কণ্ঠে বললেন,—আমার স্বামী রজত গুহ। তাঁব গতিবিধি বর্তমানে বেশ সন্দেহজনক। কয়েকটি বিশেষ কারণে আমার মনে হয়েছে তিনি অন্য মহিলায় আসক্ত এবং আমার জীবনের প্রতিও তাঁর লোভ বযেছে।

—আপনাব জীবনের প্রতি তাঁর লোভ, মানে

—মানে আমি বেঁচে না থাকলে এই বিশাল সম্পত্তির মালিক হবেন তিনি।

—এ সব সম্পত্তি কি তাঁর নয়?

—না। এ যা কিছু দেখছেন সবই আমার বাবার। তিনি মারা গেছেন। অনুতোষ রয়। রয় এন্টারপ্রাইজেব প্রতিষ্ঠাতা। আমি তাঁর দ্বিতীয় সন্তান।

—এক্সকিউজ মী মিসেস গুহ।

—বলুন।

—আপনি দ্বিতীয় সন্তান। অর্থাৎ আপনার অন্য ভাই অথবা বোন রয়েছেন?

—যদিও আপনাকে যে কাজের ভার আমি দিতে চাইছি, তার সঙ্গে আমার কটি ভাইবোন সে প্রশ্ন আসে না। তবু বলছি, আমরা দুই বোন। আমি ছোট।

—আর একজন?

—আমার দিদি। মিতা মণ্ডল।

—তিনি কি এখনও জীবিত?

—হ্যাঁ। আসলে এখন আপনি যেটা জানতে চাইছেন সেটাই বলি। দিদিকে বাবা পরিত্যাগ করেছিলেন।

—কেন?

—স্যরি, সেটা পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত ব্যাপার। এক্ষেত্রে সে প্রশ্নেরও কোন প্রয়োজন নেই। এনিওয়ে, যা আমি বলতে চাইছি, বর্তমানে, আমি মনে করি আমার জীবন বিপন্ন। আমি চাই, আপনি আমার স্বামীর গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখুন। সে কী করে, কোথায় যায়, তার মেলামেশা ক'জন মহিলার সঙ্গে, ব্যক্তিগত কারণে অর্থাৎ কী কারণে সে কতটা খরচ করছে, এ সবকিছু আমাকে জানাতে হবে। আসলে, রজতের সঙ্গে আমার বেশিদিন একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। আই ওয়ান্ট টু ডিভোর্স হিম। তার লুপহোলগুলো জানা থাকলে আমি তাড়াতাড়ি ডিভোর্স পেয়ে যেতে পারি।

মনোযোগ দিয়ে মাথা নিচু করে নীল স্মিতার বক্তব্য শুনছিল।

স্মিতা থামতেই, নীল ধীরে ধীরে মাথা তুলল, পকেট থেকে ওর সিগারেট বার করে, 'এক্সকিউজ মি', বলে সিগারেট ধরাল। তারপর ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল,—যদিও আমার পেশা গোয়েন্দাগিরি, তবু বলছি, ঠিক এ ধরনের কাজ আমি করি না। আমি জানি না আপনার স্বামী কতটা দোষী? কোন রকম ক্রাইমও তিনি করেননি। আপনি যা বলছেন, অর্থাৎ আপনার অনুযোগ, আপনার ব্যক্তিগত আশঙ্কামাত্র। কেবল মাত্র এই কারণে

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে স্মিতা বললেন,—রাইট, কেবলমাত্র এই কারণেই আমি পুলিসের শরণাপন্ন হতে পারি না। তাছাড়া পুলিসকে আমি অ্যাভয়েডই করতে চাই। পারিবারিক সংকট নিয়ে পুলিসের থেকে একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর অনেক নিরাপদ। কাজ আপনার তেমন কিছু জটিল নয়। ওনলি ওয়ান উইক, আপনি ছায়ার মতো রজতকে অনুসরণ করবেন, প্রতিদিন রাত্রে আমায় রিপোর্টিং করবেন। নিজে আসবেন না। কাউকে দিয়ে খবর পাঠাবেন অথবা আমার মোবাইলে। কারণ রজত বেশ চতুর। এ বাড়িতে আপনাকে ঘন ঘন আসতে দেখলে তার সন্দেহ হবে। আসল উদ্দেশ্যই তখন মাটি হয়ে যাবে।

হঠাৎ দীপু বেশ শব্দ করে একটা বড়োসড়ো হাই তুলল। ভ্রূ কুঁচকে স্মিতা ওর দিকে তাকাতেই দীপু বলল, —স্যরি ম্যাডাম, ঘুম পেয়ে গিয়েছিল।

ও আর কিছু না বলে ওর চার্মস ধরাল। দীপু মুখে কিছু না বললেও নীল বুঝল, কোন কাজ দীপুর মনঃপুত না হলে, এবং কথা বলার সুযোগ না থাকলে ও অভদ্রের মত ইচ্ছাকৃত হাই তুলে ওর প্রতিবাদ জানায়।

নীল মুচকি হাসল। তারপর বলল,—মাত্র এক সপ্তাহ নজরদারি করলেই আপনি বলছেন আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে?

—সেটা ঠিক এখনই গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারছি না। আপাতত এক সপ্তাহ আপনি ওকে নজর করুন। প্রয়োজন হলে নয় আরো এক সপ্তাহ বাড়তে পারে। আর প্রতি সপ্তাহে আপনার পারিশ্রমিক বিশ হাজার টাকা।

—বিশ হাজার?

—অ্যামাউন্টটা কাজ হিসেবে খুব একটা কম নয়। অবশ্য আপনি যদি মনে করেন টাকাটা কম হয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনার চাহিদা মতই আপনি পাবেন।

নীলের মুখে সামান্য বিস্ময়। ত্বরিতে কিছু একটা ভেবে নিয়ে ও বলল, — কম নয় মিসেস গুহ। বরং বেশিই বলা যেতে পারে। এবং সেইজন্যেই আমার জিজ্ঞাস্য সামান্য এই কাজের জন্যে—

ফের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে স্মিতা বললেন,—আপনার কাছে সামান্য মনে হতে পারে। কিন্তু আমি আমার জীবনের মূল্য সপ্তাহে বিশ হাজারের থেকে অনেক বেশি বলেই মনে করি। তাহলে আপনি

কাজটা অ্যাকসেপ্ট করছেন?

—করতে পারি তবে তার আগে প্রয়োজন কিছু তথ্য। আপনার স্বামী রজত গুহ সম্বন্ধে কিছু খুঁটিনাটি।

—ওহ্ সিওর, বলুন।

—আপনার বক্তব্য অনুসারে আপনিই সবকিছুরই মালকিন। কিন্তু আপনার স্বামীর ব্যক্তিগত কোনো আয় নেই?

—আছে। তিনি বর্তমানে আমাদেরই অফিসে বসছেন। আনফরচুনেটলি তিনি যে পোস্টে আছেন সেটিও খুব লোভনীয় চেয়ার। কোম্পানি নানান প্রোডাক্টের সেলস ডিভিসানের চিফ ম্যানেজারের দায়িত্ব ওঁব ওপর। সেলস-এর বড় কর্তার আনঅফিসিয়াল ইনকাম কত হোতে পারে সেটা কি অনুমান করতে পাবেন? সেই হিসেবে রজতের আয় মন্দ নয়। বাজাবে আমাদের প্রোডাক্টের ডিমান্ড খুব বেশি কোন্ পার্টিকে কত মাল দেওয়া হবে তা নির্ভর করে সেলস-এর বড়কর্তার মর্জির ওপর। খুব সাধারণ বিচারে বুঝে নিন তার আয় কত হোতে পারে, যদি সে বড়কর্তা অসৎ হয়।

—ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, অফিসে উনি কি রকম মাইনে পান?

—খাতায় কলমে মাইনে সতেরো হাজার। ব্যবস্থাটা আমার বাবাই করে গিয়েছিলেন।

—আচ্ছা, উনি যে অন্য মহিলায় আসক্ত, তেমন কোনো প্রমাণ পেয়েছেন?

—প্রমাণ? প্রমাণটা আপনিই পাবেন ওকে ঠিকমত অনুসবণ করলেই।

—বেশ। এবাব বলুন, কোন ধারণায় আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনার স্বামী আপনার জীবন নিতে চান?

—সত্যি কথা বলতে কি, কোনো ধারণাই একদিনে তৈরি হয় না। টুকরো টুকরো কিছু ঘটনা সবকিছু বুঝিয়ে দেয়। রজত অবশ্য এমন কিছু প্রমাণ ফেলে যায়নি যা দিয়ে প্রমাণ করানো যেতে পাবে যে রজত আমাকে খুন করতে চাইছে।

—তাহলে?

— সেটাই বলছি। অনেকগুলো কাবণে রজতের প্রতি আমার অবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছে। প্রথম কারণ, প্রায় ছ'মাস আগে আমাদের এক পুরনো কাস্টমার একটা বড় অ্যামাউন্ট, চেকে পেমেন্ট না করে ক্যাশ পেমেন্ট করে।

—আপনারা ক্যাশ পেমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করেন?

—অফকোর্স, না করার কী আছে? প্রায়শই এবকম হয়ে থাকে। আমাদের কিছু কিছু কাস্টমার তো রেগুলার ক্যাশেই সব ট্রানজাকশান করে থাকেন। সে যাইহোক, আমাদের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট মাসখানেক আগে গুপ্ত ডিস্ট্রিবিউটার্সেব নামে ডিউ বিল সমেত একটি চিঠি পাঠায়। তাতে জানানো হয় অবিলম্বে পাওনা টাকাটি যেন তাঁবা জমা দেন। কারণ এতদিন ক্রেডিট ফেলে রাখার নিয়ম কোম্পানির নেই।

চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর মালিক নিজে এসে হাজির হন। তিনি জানান টাকাটা উনি ওঁর এক বিশ্বস্ত কর্মচারীব হাত দিয়ে প্রায় ছ'মাস আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবং টাকার রসিদও সঙ্গে এনেছেন। পেমেন্টটা করেছিলেন সেলস ম্যানেজারকে যেহেতু তখন ক্যাশ ডিপার্টমেন্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রসিদে রিসিভ পেমেন্ট ছাপও আছে এবং সই করাও হয়েছে।

রজতকে সঙ্গে সঙ্গে তলব করা হয়। সে কিন্তু পুরোপুরি সমস্ত কিছু অস্বীকার করে। জানায় রিসিভ পেমেন্ট স্ট্যাম্প তার কাছে থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না এবং সেখানে যে সইটি করা হয়েছে সেটি তার সই নয়।

ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে অবস্থার মধ্যে দাঁড়ায়। কারণ সিগনেচার এক্সপার্টকে দিয়ে সই পরীক্ষা করিয়েও এক্সপার্ট কিন্তু রজতকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেননি।

স্মিতার কথাব মাঝেই নীল জিজ্ঞাসা করল— তাহলে রজতবাবুকে সন্দেহ করছেন কেন?

—সন্দেহ নয়, আই অ্যাম সিওর অফ ইট। গুপ্ত ডিস্ট্রিবিউটর্সের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। রাশি রাশি টাকার ট্রানজাকশান। কখনও কোনদিনও টাকার ব্যাপারে কোনো গণ্ডগোল হয়নি। পেমেন্টও ওঁদের খুব প্রম্পট। ওঁরা হঠাৎই মিথ্যে কথা বলেছেন এমন কথা বিশ্বাস করি না।

—কিন্তু রজতবাবু তো আর রিসিভিং ক্যাশিয়ার নন। পেমেন্টটা কেন হঠাৎ তাঁরা রজতবাবুকে করতে গেলেন?

—কারণটা আগেই বলেছি, ওঁরা যখন পেমেন্ট করতে আসেন তখন অফিস ছুটি হয়ে গিয়েছিল। রজত কোম্পানির একজন দায়িত্ববান অফিসার। অতগুলো ক্যাশ টাকা তাঁরা ফেরত না নিয়ে গিয়ে রজতের কাছে টাকাটা জমা করে যায়। এর আরো একটা বড়ো কারণ, তাঁরা রজতের সঙ্গে কোম্পানির কী রিলেশান তা জানে। সেই বিশ্বাসেই পেমেন্ট করা। তাছাড়া রিসিভ পেমেন্ট স্ট্যাম্পও ছিল সেখানে।

—অ্যামাউন্টটা কত টাকার?

—একলাখ ছাব্বিশ হাজার। কেসটা নিয়ে এখনও টালবাহানা চলছে। খুব সম্ভবত কোম্পানিকে টাকাটা গুণগার দিতে হবে। কারণ রাম শ্যাম যারই সই থাকুক না কেন, কোম্পানির নামাঙ্কিত রিসিভ পেমেন্ট স্ট্যাম্প সেখানে ছিল।

—আই সী।

—এ ছাড়াও আছে। তহবিল তছরুপ। এবং আমি জানি রজতই সমস্ত ব্যাপারটা ঘটিয়েছে। অবশ্য এর জন্যে চাকরি যায় অতি সাধারণ এক জুনিয়ার অফিসারের।

—কী রকম?

—আমাদের কোম্পানির একটা নতুন প্রোডাক্ট কিছু দিন হল বাজারে ইনট্রোডিউস করা হয়েছে। এবং প্রোডাক্টটা ধরেও নিয়েছে মার্কেট। বর্তমানে তার ডিমান্ড প্রচুর। পার্টিরা আগে থেকে অ্যাডভান্স পেমেন্ট করে মালের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। হঠাৎ দেখা গেল বেশ কয়েকটি, হ্যাঁ চারজন পার্টির নামে গুডস সাপ্লাই হয়ে গেছে এবং তারাও চেকেপেমেন্ট করে দিয়েছে। কিন্তু চেকগুলোর কোনটা জমা পড়েছে এক মাস কোনটা আবার দেড় মাস বাদে, কোন কোনটা আবার জমাই পড়েনি। খুঁজতে খুঁজতে আসল সত্যটা অবশ্য বের হল। চেকগুলো টাইমলি ব্যাঙ্কে না যাওয়ার কারণ সেগুলো অ্যাসিসটেন্ট টু সেলস ম্যানেজারের ড্রায়ারে পড়ে আছে। ব্যাঙ্কে চেকগুলো জমা দেবার দায়িত্ব তারই। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় প্রথমটায় সে বলে সে নাকি ভুলে গিয়েছিল জমা দিতে। কিন্তু ভুল একবার হয়। একটা হয়। কিন্তু একই ভুল বিশেষ চারজন পার্টির ক্ষেত্রে বার বার হয় না। শেষ পর্যন্ত, চাপের মুখে সে সত্য কথা স্বীকার করে। সে নাকি সেলস ম্যানেজারের কথায় ইচ্ছে করেই চেকগুলো আটকে রাখে। এবং চেক আটকে রাখার জন্যে প্রতি হাজার টাকায় পায় দশ টাকা ঘুষ।

হঠাৎ নীল প্রশ্ন করল,—ব্যাপারটা জটিল হয়ে যাচ্ছে। চেক আটকে রাখলে অফিসারটি পার থাউজ্যান্ডে পাবে দশ টাকা। টাকাটা দেবে কে?

—কেন পার্টি।

—কারণ?

—অতি সহজ। ধরুন একটা পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক আপনি পনেরো দিনের জন্যে আটকে রাখলেন। অর্থাৎ পার্টি পনেরো দিনের ক্রেডিট অ্যাডভানটেজ পেল। কোম্পানির ঘরে টাকাটা আসবে ঠিকই, কিন্তু পনেরোদিন পর। আর ঐ রকম একটা চালু প্রোডাক্ট, বিক্রি হতে পনেরোদিন সময় লাগে না। এখন এই পনেরোদিন চেকটা আটকে থাকার ফলে কোম্পানি পনেরো দিনের লাভ থেকে বঞ্চিত হল। আর পার্টি সম্পূর্ণ কোম্পানির টাকায় বিনা সুদে ব্যবসা করে গেল। কোম্পানি হিসবে করে দেখেছে মাত্র কয়েক মাসে কোম্পানি অনেক টাকার প্রফিট মার্জিন লস করেছে।

—বুঝলাম। কিন্তু আপনি যা বললেন তাতে বাড়তি লাভ যা কিছু তা ঐ অফিসারের। এতে মিস্টার গুহর ইনভলভমেন্ট কোথায়?

—ঐটুকু একটা জুনিয়ার অফিসারের এত সাহস হবে না। এ কাজ সে করেনি, তাকে দিয়ে করানো

হয়েছে। সে যা করেছে তা তার বসের ইনস্ট্রাকশানে। রজতই তার বস। রজতই তাকে চেকগুলো কাযদা করে জমিয়ে রাখতে বলে। নইলে তার চাকরি চলে যাবে এমন ভয়ও তাকে দেখানো হয়েছে।

—আপনি জানলেন কি ভাবে?

—অফিসারটি পরে সব স্বীকার করেছে। কিন্তু সিনিয়ার অফিসারের নির্দেশেই যে সে এক কাজ করেছে এমন কোন রিট্‌ন্ পেপাব তার কাছে না থাকার জন্যে অফিসারটিকে কোম্পানিকে ঠকানোর জন্য ববখাস্ত কবা হয়। কিন্তু আসল কালপ্রিট নির্বিকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট কো. প্রমাণ নেই।

—তার মানে আপনি বলতে চান রজতবাবুও ঐ চারজন পার্টির কাছ থেকে চেক প্রতি অং পেয়েছেন?

—হ্যাঁ নিশ্চযই। আর সে অ্যামাউন্টটা ঐ অফিসারটির থেকে অনেক অনেক বেশি।

—আর নাবীঘটিত ব্যাপারে যেন কী বলছিলেন?

—এখানেও কোন ডাইরেক্ট প্রমাণ হাতে নেই। আছে কেবল একটি ফটো। একটি মেয়েব ফটো যেটি রজতেব ঘবে পাওযা গেছে।

—ফটোটা দেখা যাবে?

—যাবে, বলে তিনি অনুচ্চ কণ্ঠে সেলিম বলে কাউকে ডাকলেন। সামান্য সমযেব মধ্যেই সেলিম নামেব লোকটি এসে হাজির হল। স্মিতা তাকে দেখে বললেন— সেলিম, আমার ঘরে ড্রেসিং টেবিলের ওপর একটা খাম আছে। নিয়ে এস।

লোকটি চলে গেল। ওব গমন পথেব দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নীল বলল,—আচ্ছা খুনের ব্যাপাবটা কী?

—রজতের এই সমস্ত কাণ্ডকারখানাব জন্যে ওকে একদিন ডেকে বেশ কয়েকটা কথা শোনাতে বাধ্য হযেছিলাম। এও জানিয়ে ছিলাম, ভবিষ্যতে আব কোনরকম জালিয়াতির ঘটনা ঘটলে তাকে ঐ পোস্ট থেকে সবিয়ে আনা হবে। এবং তাব প্রেস্টিজ বজায় না রেখেই কোম্পানি তাকে যথেষ্ট নিচু পোস্টে নামিয়ে দেবে। তাব উওবে রজত আমায শাসায়, বলে, জল অতদূর গড়াবার আগেই কোম্পানির মালকিন পৃথিবী থেকে সবে যাবে। এবং এমন কৌশলে সে আমায় সরিয়ে দেবে, কারো পক্ষেই তাকে দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভব হবে না।

স্মিতার সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। আব একটা ধবিযে নিয়ে খুব ধীরে ধীরে স্মিতা বললেন, —রজতকে আমি বিশ্বাস করি না মিস্টার ব্যানার্জি। লোকটা অতীব ধূর্ত। ডেভিলস্ ব্রেন। ঐ মাথা থেকে এত সব শয়তানির ব্যাপার বের হয, যেগুলো আমার পক্ষে সব সময় ধরা সম্ভব নয। বাইবের শত্রুব থেকে অনেক বেশি সুযোগ থাকে ঘরের শত্রুর। মিস্টার ব্যানার্জি, আই অ্যাম নট ইন সেফ প্রতি মুহূর্তে আমি আমার জীবন বিপন্ন বলে মনে কবছি। ওব হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে ওকে ডিভোর্স কবতে হবে। কিন্তু ও এতই চালাক, কোথাও এতটুকু ফাঁক রাখেনি যা দেখিয়ে আমি ডিভোর্স পেতে পারি। তাই আমার কয়েকটা এভিডেন্স চাই। নিখাদ প্রমাণ। সেগুলো পেতে গেলে ওর সমস্ত গতিবিধি প্রমাণ সমেত পেতে হবে আর সেই কাজটা আমি আপনাকে দিতে চাই। মিনিমাম এক সপ্তাহ ফোটো এভিডেন্স থাকলে আবো ভালো হয়। এখন বলুন, এ দায়িত্ব আপনি নেবেন কিনা?

কেমন যেন একটা চ্যালেঞ্জিং মুডে নীল বলল,—নিলাম, তবে, ব্যক্তিগত ব্যাপাব বলে উত্তর দেবেন না এমন কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। কারণ কোন অনুসন্ধানের কাজে এগোতে গেলে কিছু পাস্ট হিস্ট্রি জানার প্রয়োজন। এটা নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করেন।

—বেশ, বলুন কী জানতে চান?

—রজতবাবুর সঙ্গে আপনার বিয়ে কতদিন আগে হয়েছে?

—তা প্রায় বছর পাঁচেক।

—আপনাদের কি লাভ ম্যারেজ?

—না। অ্যারেঞ্জড্ ম্যারেজ। রজত ছিল আমার বাবার বন্ধুর ছেলে। রজতকে বাবাই পছন্দ করেন।

—আপনি?

—তার মানে?

—দেখাশুনো করে বিয়ে তো! আপনার তাঁকে পছন্দ নাও হতে পারে।

—রজতকে যে কোনো মেয়েরই পছন্দ হবে কারণ রজত ইজ ভেরি মাচ হ্যান্ডসাম অ্যান্ড রোম্যান্টিক। আমারও ওকে প্রথম দর্শনেই পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু বুঝিনি, গোলাপের নিচেই কাঁটা থাকে। ও একটা ভদ্রবেশী শয়তান।

—আপনার এ ধারণাটা কবে থেকে গ্রো করেছে?

—ইন ফ্যাক্ট বিয়ের পরে পরেই। আমার রজতকে পছন্দ হলেও, হি ডিড্ নট লাইক মি। র‍্যাদার সময়ে অসময়ে আমার চেহারাটা নিয়ে বিদ্রূপও করতো। হয়তো সেগুলোও মানিয়ে নিতে পারতাম, কারণ কথাটা ঠিকই, আমি সুন্দরী নই। কিন্তু যেদিন থেকে ও অর্থের জন্যে উপদ্রব শুরু করল, এবং আমাকে শোনাতে লাগল, কেবল মাত্র টাকার জন্যে ও আমাকে বিয়ে করেছে, সেদিন থেকেই মনটা আমার বিষিয়ে যেতে শুরু করেছিল। তারপর একদিন আবিষ্কার করলাম, ও ওর সুন্দর চেহারার ছোবল দিয়ে বহু মেয়ের সর্বনাশ করেছে। বহু মেয়েকেই ও নিয়মিত শয্যায় সঙ্গ দেয়।

—এ নিয়ে আপনি কোনো অনুযোগ করেননি?

—করেছিলাম। তার ফল অশান্তি, গুণ্ডামি এবং অর্থকরী জুলুম। ফলে বাবা মৃত্যুর আগে সবকিছু আমার নামেই করে দিয়ে যান।

—আপনাদের কোনো ছেলেমেয়ে?

—পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে চার বছর সাড়ে এগারো মাস আমরা আলাদা কামরায় থাকি। ইদানীং তো সাধারণ কথাবার্তাও বন্ধ।

—আর একটি প্রশ্ন করব, যদিও আপনি প্রশ্নটার উত্তর একটু আগেই এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু উত্তরটা জানা দরকার।

—দিদির ব্যাপারে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বলার বিশেষ কিছু নেই। দিদি আমার থেকে বছর দুয়েকের বড়ো। বাবা তাকে বাড়ি থেকে একরকম তাড়িয়েই দেন।

—কারণ?

—অনুতোষ রায়ের একটা সামাজিক স্টেটাস ছিল। ঐ জায়গাটায় উনি বড় বেশি রকমের গোঁড়া ছিলেন। ফ্যামিলি প্রেস্টিজে কেউ আঘাত করলে তিনি মেনে নিতে পারতেন না। দিদির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। দিদির জন্যে বাবা একটি সুপাত্র যোগাড় করেছিলেন। দিদিকে বাবা তাঁর মনের ইচ্ছার কথা জানিয়েও ছিলেন। দিদি মুখে কোন প্রতিবাদ করেনি। নীরবে সব শুনে গিয়েছিল। চূড়ান্ত কাজটি করেছিল বিয়ের ঠিক একদিন আগে। সে একটি ছেলেকে ভালোবেসেছিল। সেই ছেলেটির সঙ্গে বিয়ের আগেরদিন সকালে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এতে বাবার, বুঝতেই পারছেন, মান ইজ্জতের প্রশ্ন জড়িত ছিল। আর সব থেকে বড়ো কথা, যে ছেলেটির সঙ্গে দিদি বাড়ি ছেড়েছিল, সে হচ্ছে আমাদের ড্রাইভার রামলাল মণ্ডলের ছেলে।

—আই সী। আপনার দিদি কি তারপর থেকে এ বাড়িতে আসেননি?

—এসেছিল। বাবা মারা যাবার পর ঘণ্টাখানেকের জন্যে।

—উনি কি কলকাতাতেই থাকেন?

— বোধহয়। ঠিক জানি না। খবর রাখার কোনো ইচ্ছেই নেই। আপনার আর কিছু জানার আছে?

—না।

—আমার কাজ করতে তাহলে আপনার নিশ্চয়ই কোন অসুবিধে নেই?

স্মিতার মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে তাকিয়ে নিয়ে নীল বলল,—আপনার হাজব্যান্ডের কোন ছবি আছে?

—আছে।

—ওটাও দিন। আর আপনার কেস আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম।

—থ্যাঙ্ক য়ু। সেলিম বোধহয় খামটা খুঁজে পায়নি। ঠিক আছে একটু বসুন, আমি আসছি।

মহিলা উঠে গেলেন। দীপু অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছিল। স্মিতা চলে যেতেই ও বলল —রজতবাবু তবু ছ'মাস ঘর করেছে আমি হলে, শালা এরকম কেঠেল ঘোড়ামুখি মেয়ে, লাখ টাকা দিলেও

—তুই চুপ করবি?

—তা করছি, তবে আমার মনে হয় রজতবাবু বড়ো দেরি করে ফেলেছেন। অনেক আগেই এই শুঁটকিটাকে ফিনিস করে দেওয়া উচিত ছিল। যেমন দাম্ভিক তেমনি শালা একটা ফরসা চেলা কাঠ।

নীল একটু উষ্মা নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলল,—তোর তাতে কী? ভুলে যাস না মিসেস গুহ এখন আমাদের শাঁসালো ক্লায়েন্ট। সপ্তাহে বিশ হাজার। তার ওপর ওঁর ব্যক্তিগত জীবন বিপন্ন। বিপন্ন হয়েই উনি আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। ওঁর চেহারা এবং দাম্পত্য জীবন নিয়ে আমাদের কিছু মন্তব্য করাও উচিত নয়। স্মিতা যা বললেন, তা সত্যি হলে রজতবাবু তো একটি পাকা ক্রিমিন্যাল। আর এই ক্রিমিন্যালদের বিরুদ্ধেই তো আমাদের কাজকর্ম।

নীল হয়তো আরো কিছু বলতো। বলা হল না। স্মিতা সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বললেন, —এই নিন মিস্টার ব্যানার্জি। রজতের ছবি। আর এই হল সেই মেয়েটির ছবি। এটাও রাখুন, আপনার অ্যাডভান্স।

রজতের ছবিটা নিয়ে ও খানিকক্ষণ দেখল। সত্যি সুপুরুষ আর রূপবান। স্মিতা ঠিকই বলেছেন চেহারা দিয়েই এ লোক মহিলাকুল মজাতে পারে। মেয়েটির ছবিও বেশ সুন্দর। অনেকটা ফিল্ম অ্যাকট্রেসের মতো।

ছবি দুটি আর চেকটা পকেটে চালান করতে করতে নীল বলল,—তাহলে ম্যাডাম, আমি চলি। যেমন যেমন খবর থাকবে আপনাকে ফোনে জানিয়ে দোব। চ দীপু।

নমস্কার বিনিময় করে ওরা দুজন 'শান্তনীড়' ছেড়ে রাস্তায় নামল। হঠাৎ দীপু বলল,—কত মাল ছাড়ল দেখেছ?

—হ্যাঁ, দেখেছি, পাঁচ হাজার।

—শালা কে বলবে দেশের লোকের হাতে মাল্লু নেই।

—চুপ কর তো। কাল সকাল থেকে কাজ শুরু করতে হবে।

'শান্তনীড়' থেকে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে নীলের মরিস মাইনর ঠায় দাঁড়িয়ে আছে প্রায় মিনিট কুড়ি। ট্যাঙ্ক বোঝাই ফুয়েল আছে। চিন্তারও কিছু নেই। স্মিতা দেবীর কাছ থেকে নীল জেনে নিয়েছিল রজত গুহ বাড়ি থেকে বের হন সাধারণত সাড়ে ন'টা নাগাদ। এখনও প্রায় মিনিট দশেক। নীল আর দীপু দুজনেই সামান্য একটু চেহারার রদবদল করে নিয়েছে। কলকাতা শহরে এখন বেশ ঠাণ্ডা চলছে। প্রায় নয়ে দশে নেমে গেছে। বাতাসে বেশ কনকনে ভাব। আকাশটাও মেঘ মেঘ। গাড়ির মধ্যেও ধাতব কনকনানিটা রয়েছে।

নীলের পরনে চামড়ার জ্যাকেট আর কালো গরমের প্যান্ট। পায়ে স্নিকার। ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি, একটু মড টাইপের উইগ আর সোনালি ফ্রেমের চশমায় চেহারার বেশ হেরফের ঘটে গেছে। আর দীপু। ওকে তো চেনাই যাচ্ছে না। প্রায় কাঁধ পর্যন্ত ঝোলানো চুল। মাথায় রঙচঙা ক্যাপ। একমুখ কায়দা করা গোঁফ দাড়ি। গায়ে চকরাবকরা জ্যাকেট, পরনে জিন্স আর ছুঁচালো-মুখ কালো জুতো। কে বলবে এ সেই রাস্তার মাস্তান দীপু।

দীপু বরাবরই বেশ ছটফটে। সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে ও বলল, — ভাল্লাগে? চিড়িয়াখানার রোদ পোয়ানো কুমীরের মতো এক জায়গায় নট নড়নচড়ন। দেখতে দেখতে শালা কুড়ি মিনিট পার হয়ে গেল। তুমি মাইরি অ্যাদ্দিন পর বেছে বেছে একটা কাজ নিলে বটে।

দীপুর বকবকানির দিকে নীলের কোন খেয়ালই ছিল না। তার দৃষ্টি স্থিব। তীক্ষ্ণ নজবটা আটকে আছে শান্তনীড়ের ফটকে। আসলে ঠিক এ ধরনের একটা কাজে খুব একটা মনপ্রাণ না থাকলেও ব্যাপারটার মধ্যে একটা রহস্যেব গন্ধ পেয়েছে ও। বাববাবই ওব মনে হয়েছে দেখাই যাক না ঘটনাটা কী? স্মিতা গুহর একচেটিয়া সন্দেহ। তার স্বামীব বিরুদ্ধে। কে জানে, হযতো লোকটা সতিাই স্ত্রীকে খুন করতে চায়। আর যে লোকটাব এত বেশি টাকার প্রতি দুর্বলতা, এবং স্ত্রীর দিকে যার কোনো আকর্ষণ নেই প্রায় সাড়ে চার বছর, এবং যে লোকটা স্ত্রীকে খুন কবাব কথা ভাবে বা বলে (স্মিতা গুহর ব্যক্তিগত ধারণা অনুসারে) দু'একটা সপ্তাহ তাকে অনুসরণ করলে ক্ষতি কী? তার ওপর প্রতি সপ্তাহে নগদ এতগুলো টাকা। কাগজ খুললেই প্রায়শই বধূ হত্যাব সংবাদ। আজকের দিনে বধূ হত্যার যথেষ্ট হিড়িক। অনুতোষ রায় উইল করে সমস্ত সম্পত্তি তাঁব মেয়েব নামে করে দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু কোথাও উল্লেখ করেননি স্মিতার মৃত্যুর পর এই বিশাল সম্পত্তি এবং কাববারের উত্তরাধিকাব কে হবেন? এবং যেহেতু উইলে স্মিতার অবর্তমানে সম্পত্তির অন্য কোন ওযাবিশ নেই, আইনত তখন তাঁর সব সম্পত্তির অধিকাব জন্মাবে তাঁর স্বামীর। অর্থাৎ স্মিতার মৃত্যু যদি স্বাভাবিক প্রমাণিত হয় তাহলে তো সব কিছুর মালিক হবেন রজত গুহ। সেই হিসেবে বজত গুহব পক্ষে ঐ বিশাল বাড়িতে কোন একদিন স্মিতার আকস্মিক মৃত্যু ঘটানো অস্বাভাবিক নয়। কাজটার মধ্যে কতটা থ্রিল আছে বা কতদূর ব্যাপারটা গড়াতে পারে সে সম্বন্ধে নীলের আপাতত কোন ধাবণা নেই। বলা যায় না, বামেব মুণ্ডু খুঁজতে গিয়ে শ্যামের ধড় বেরিয়ে আসতে পাবে।

—আচ্ছা নীলুদা, তুমি কখনও বুনো হাঁসের পেছনে ছুটেছ?

—তুই একটু চুপ করবি? তোকে তো ফিলসফি আওড়াতে বলিনি। বলেছি ঐ গেটটার দিকে সমানে নজর রাখতে।

—রেখেছি তো। কিন্তু যা ফগ জমেছে, ভালো কবে কিছু দেখাই যাচ্ছে না।

— দেখবি কী করে? অত বকবক কবলে কি কিছু দেখা যায়। তাকা সামনের দিকে।

নীলের কথায় দীপুও সামনের দিকে চোখ ফেবালো। একটা ছাই রঙেব অ্যামবাসাডাব বেরুচ্ছে 'শান্তনীড়' থেকে।

—হ্যাঁ, তাই তো। মাল তাহলে বেরুচ্ছে। ওহ্ শালা, কি টাইম দেখেছ? সাড়ে ন'টা তো সাড়ে ন'টা। কাঁটায় কাঁটায়। কাল থেকে শালা রোজ এসে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে নীল বলল,—হঠাৎ এত সদিচ্ছা?

—ঘড়িটা শালা আমাব রেগুলাব গোগোড়বাঁই কবে। লর্ড ক্লাইভেব আমলেব ঘড়ি তো। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। লোকটা বেরুলেই ঘড়িটা মিলিয়ে নোব।

—ঠিক আছে, এখন চুপ করে কেবল ছাইবঙা অ্যামবাসাডারটা লক্ষ করে যা।

—আর যদি ওটায় রজত গুহ না থাকে। অন্য কেউ তো বেরুতে পারে।

—না, ও রজত গুহই। কারণ স্মিতা সম্ভবত নিজের গাড়িতেই চড়ে। কাল আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন একটা সাদা অ্যামবাসাডার দাঁড়িয়ে ছিল। অন্য কোন গাড়ি আমবা দেখিনি। এবং রজত গুহ প্রায় প্রতিদিনই সাড়ে ন'টার একচুল আগে পবে বেরিযে যায়। ধরা যেতে পারে তাবও একটা গাড়ি আছে। বাড়িতে গাড়ি চড়ার মত দুজন প্রাণী। তাহলে ঠিক সাড়ে নটায় ছাইরঙা অ্যামবাসাডারে কে যেতে পারে?

—অন্য কোন মক্কেল হতে পারে।

—অঙ্ক তা বলে না। চ, একটু পরেই বুঝতে পারবি।

'শান্তনীড়' ছাড়িয়ে আগের গাড়ি গিয়ে পড়ল প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে। গাড়ি ছুটে চলেছে

সোজা যাদবপুর থানার দিকে। ইচ্ছে করলে বাঁ দিকে লেকগার্ডেন্স-এর দিকে বেঁকে যেতে পারতো কারণ নিঃসন্দেহে সামনের গাড়ির আরোহী রয় এন্টারপ্রাইসের অফিসে যাচ্ছেন। আর অফিসটি ডালহাউসি পাড়ায়। কে জানে হয়তো গড়িয়াহাটার দিকে কোন কাজ থাকতে পারে। বেলা এমন কিছু নয়, তায় শীতের দিন। প্রায় ফাঁকা আনোয়ার শাহ রোড দিয়ে ছাইরঙা অ্যামবাসাডার বেশ দ্রুতই চলছিল। অবশ্য নীলের মরিস, পুরনো দিনের গাড়ি হলেও স্পীড তুলতে সেও সমসক্ষম। নির্দিষ্ট ব্যবধান বজায় রেখেই নীল এগিয়ে যাচ্ছিল।

যাদবপুর থানার কাছে এসেই কয়েক সেকেন্ডের মতো ছাইরঙা গাড়ি একটু থামল।

—এই মরেছে, গুরু, সামনের গাড়ি যে ডানদিকে টার্ন নিল। আমি তখনি বলেছিলুম, এ শালা অন্য মক্কেল।

হ্যাঁ সত্যিই গাড়িটা ডানদিকে যাদবপুরের রাস্তায় এগিয়ে চলল। সামান্য খটকা যে নীলের লাগেনি তা নয়। তবু, এই মুহূর্তে অনুসরণ না করে উপায় নেই। নীলও ডানদিকে বাঁক নিল।

যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড পর্যন্ত অ্যামবাসাডার হু হু করে এগিয়ে গিয়ে রাজা সুবোধ মল্লিক রোডে পড়েই হঠাৎ বাঁ দিকে একটা সিগারেটের দোকানের সামনে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল। নির্দিষ্ট ব্যবধানে নীলও ওর গাড়ি থামাল। একটু পরেই সামনের গাড়ির থেকে নামলেন সুবেশধারী লম্বাকৃতি ছিমছাম মধ্যবয়েসী এক ভদ্রলোক। ভোরের কুয়াশার ভাবটা অনেক কেটে গেছে। সামান্য দূরে থাকলেও নীলের গাড়ি থেকে লোকটিকে চিনতে ওদের দুজনের কারোরই তেমন অসুবিধা হল না। রজত গুহর ছবির সঙ্গে এ লোকটির চেহারায় কোন অমিল নেই।

—কিরে, কী বলেছিলুম?

—আমি কিন্তু গুরু, একটা কথা ভাবছি। প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড থেকে লোকটা এতদূরে গাড়ি চালিয়ে এল সিগারেট কেনবার জন্যে? এদের দোকানের সিগারেটে কি গাঁজার মশলা পোরা থাকে?

—থাকতেও পারে।

—নেমে দেখব নাকি? সে রকম কিছু থাকলে একটা পাকেট নিয়ে এলে হত। কতদিন যে ওসব পাঠ

—দীপু

—স্যরি নীলদা, পুরনো অভ্যেস তো।

রজত গুহর সিগারেট কেনা হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে তিনি গাড়িতে ফিরে এলেন। তারপর গাড়ির মুখ সহসাই ডানদিকে ফিরিয়ে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে গড়িয়াহাটামুখো ছুটিয়ে দিলেন। ব্যাপারটা এতই হঠাৎ ঘটে গেল যে নীল তার গাড়ির মুখ ঘোরাতে ঘোরাতে সামনের গাড়ি অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

—ব্যাপারটা কী হল বল তো? মাল কি বুঝতে পেরেছে আমরা ওর পিছু নিয়েছি?

—এত তাড়াতাড়ি?

—তাড়াতাড়ি কিনা জানি না। কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টোরাস্তায় গাড়ি ছুটিয়ে এলো। অকারণে একটা সিগারেটের দোকানে দাঁড়িয়ে, সিগারেট কিনে, দুম করে অতো স্পীডে গাড়ি ঘুরিয়ে ছুটে চলে যাওয়া, উঁহু, গুরু, ব্যাপার মনে হচ্ছে গোলমেলে।

কিছু না বলে নীল গাড়িতে স্পীড দিল। কিন্তু ইচ্ছে করলেই জোরে চালানো যায় না। বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি এবং আরো নানারকম এটাসেটা যানবাহন তো আছেই, আছে পথচলতি অজস্র মানুষ। প্রতি মুহূর্তেই নীলকে সজাগ হয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছিল। সামনের ছাইরঙা গাড়িটাও চোখে পড়ছিল না।

—গুরু, কেলো হয়ে গেলো তো! পাখি ভ্যানিস। দেখাই তো যাচ্ছে না। কোন মোড়ে টার্ন নেয়নি তো?

সামনের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে রাখতে নীল বলল,—মনে হচ্ছে তোর ধারণাই ঠিক। রজত গুহ লোকটা বেশ চালাক। এবং আমার যদ্দুর মনে হচ্ছে লোকটার মধ্যে গণ্ডগোলের ব্যাপার-স্যাপার আছে।

—ঠিক বলেছ, নইলে সবে আমরা গতকাল 'শান্তনীড়' গিয়েছি। তখন নিশ্চয়ই লোকটা বাড়িতে ছিল না। আজ থেকেই যে আমরা ওর পেছনে পড়ব এটাই বা জানল কী ভাবে? গিল্টি মাইন্ড না হলে এত তাড়াতাড়ি কিছু গেইস করা সম্ভব নয়। আমার আরো একটা কথা মনে হচ্ছে।

—কী?

—'শান্তনীড়ে' নিশ্চয়ই ওর কোন লাগানো-ভাঙানোর লোক আছে। যদিও আমবা গেছি স্মিতা গুহব সঙ্গে কথা বলতে এবং ঘরে তখন আর কোন লোক ছিল না, তা সত্ত্বেও আমাদের মতলব ও জেনে ফেলল কেমন করে? নিশ্চয়ই লোকটা বাইরের ঘরে কোন টেপ ফিট করে রাখেনি। সেটা সম্ভবও নয়।

—কথাটা তোর একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি না। 'শান্তনীড়ে' ওব নিজস্ব কোন সংবাদ সববরাহের লোক থাকতে পারে। আর স্মিতার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে এ ধরনেব লোকের পক্ষে মাস্থলি কিছু টাকার বিনিময়ে লোক নিয়োগ করা অর্থাৎ কোন খাস চাকর রাখা মোটেই বিচিত্র নয।

কথায় কথায় ওদের গাড়ি চলে এসেছিল ঢাকুরিয়া ব্রিজেব কাছে। আর ঠিক তখনই চোখে পড়ল ছাইরঙা অ্যামবাসাডার।

—শালা কথায় বলে না, রাখে হরি মারে কে? ওই দেখো গুরু তোমার ছাইরঙা চার চাকা। ট্রাফিকে আটকে গেছে।

—দেখেছি। কিন্তু সামনে আরো চারটে গাড়ি রয়েছে। খুব মাইনুটলি লক্ষ্য রাখ। দেখিস ডানদিক বাঁদিক কোন দিকে টার্ন নিচ্ছে কি না।

দীপুকে এসব ব্যাপারে বলার কিছু নেই। লক্ষ্য রাখার ব্যাপারটা ওর অনেকদিনের অভ্যেস। যথাসময়ে গাড়ি সিগন্যাল ক্লিয়ার পেল। সামনেব চারটে গাড়িকে কোনরকমে ওভারটেক কবে নীল যখন ছাইরঙার কাছাকাছি এসে গেছে তখন ওরা ঢাকুরিয়া ব্রিজ ক্রস করে গোলপার্ক ছাড়াচ্ছে।

দীপু আবার হুঁশিয়ার করে দিল নীলকে।

—নীলদা, আর একটা জ্যাম পাবে গড়িয়াহাট ক্রসিং-এ। দেখো আবার কোন দিকে বেঁকে না যায়।

বলতে বলতেই সামনের গাড়ি ডানদিকে বালিগঞ্জ সার্কুলাব রোডে ঢুকে পড়ল। নীলও দ্রুত এগোতে এগোতে বলল,—বুঝেছি, এ গলি ও গলি করে মিসগাইড করতে চাইছে।

—খেলাটা মজার, কি বল? বেছে বেছে অনেক দিন পর একটা ভালো মক্কেল পেলে বটে।

ছাইরঙা গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, গড়িয়াহাট রোড আব এ টি. চৌধুরী রোডের ক্রসিংয়ে এসে আবার কয়েক সেকেন্ডের থামা। তারপরই ডান দিক ধবে সোজা সৈযদ আমিব আলি অ্যাভিনু। বেকবাগানের মুখ, ওখান থেকে সোজা পার্কসার্কাস হযে আচার্য জগদীশ বসু রোড। মিন্টো পার্ক ছাড়িয়ে অ্যামবাসাডার ছুটে চলল চৌবঙ্গীর দিকে। চৌরঙ্গীব মুখে জ্যাম। বেশ কিছুক্ষণ পব জ্যাম ক্লিয়ার হল। চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে সোজা রবীন্দ্রসদনেব দিকে। তারপবই ডানদিকে ক্যাথিড্রাল রোড, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম ছাড়িয়ে আবার চৌরঙ্গী রোড। পার্ক স্ট্রিট ক্রসিং। পার্ক স্ট্রিট সিগন্যাল কাটাতে প্রায় তিন-চার মিনিট সময় নিয়ে নিল। পার্ক স্ট্রিট ক্রসিং পেরিয়ে বাঁ হাতি মেয়ো রোড ধরে সোজা কার্জন পার্ক। কার্জন পার্ক ছাড়িয়ে আরো কয়েকটা ছোটখাটো রাস্তা পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত ওল্ড কোর্ট হাউসে রয় এন্টারপ্রাইসের সামনে এসে যখন গাড়ি থামলো তখন ঘড়ির কাঁটা প্রায় সাড়ে দশটা।

স্মিতা গুহর কথা অনুসারে রজত গুহর অফিসে পৌঁছনোর সময় সকাল দশটা। এবং প্রায় বিনা কারণে আধ ঘণ্টা তিনি এপাশ ওপাশ ঘুরে শেষ পর্যন্ত অফিসে ঢুকলেন। অফিস বাড়িটা পুরনো কালের। খুব সম্ভবত আরো অনেক অফিসই আছে ঐ একই বাড়িতে। কোম্পানির চিফ সেলস্ ম্যানেজার। দেরি হলেও কাউকে জবাবদিহির প্রশ্ন নেই। তবু কেন যে এই অহেতুক কালবিলম্ব তাব সঠিক জবাব নীল বা দীপুর জানা নেই। তবে দীপুর ধারণায় লোকটা টেব পেয়ে গেছে ওর পিছনে একটা কালো মরিস মাইনর সমানে লেগে রয়েছে। আর সেই কারণেই এই ঘোরাঘুরি।

পার্কিং জোনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রজত গুহ গাড়ি লক করে সোজা ঢুকে গেলেন অফিস বাড়িটায়।

একবারের জন্যেও ফিরে তাকালেন না নীলদের গাড়িটার দিকে। অর্থাৎ তিনি জানাতে চান পিছনের গাড়ি সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। জানলেও তেমন কোন মাথাব্যথা নেই।

গাড়িতে বসে থাকতে থাকতে দীপু জিজ্ঞেস করল—তাহলে, এবার কী কর্তব্যম্?

নীল নির্বিকার চিত্তে বলল,—কিছুই নয়। গাড়িতে বসে অপেক্ষা করা।

—কতক্ষণ?

—যতক্ষণ না লোকটা বের হয়।

—তাব মানে সারাদিনও কেটে যেতে পারে?

—পারে।

—তাহলে তুমি একটু বোসো গুরু। আমি একটু চা পেঁদিয়ে আসি।

—তাই যা। দেখিস দেরি করিস না যেন। বলা তো যায় না, লোকটার মতলব কি তাও বোঝা যাচ্ছে না। যে কোন ছুতোয় এখুনি বেরিয়ে আসতে পারে। আবার নাও বেরোতে পারে।

—ও তুমি চিন্তা কোরো না, যাব আর আসব।

দীপু ছুটে বেরিয়ে গেল। নীল খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে একটা সিগারেট ধরালো। মনে মনে ভাবছিল রজত গুহর ব্যাপারটা। আচ্ছা সত্যিই কি লোকটার কোনো বদ মতলব আছে? বদ কিনা সেটা ঠিক ও জানে না। তবে মতলবটা খুব একটা সুবিধের নয়। এবং কিছু একটা মতলব নিশ্চয়ই আছে। নইলে কেউ এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে, অযথা সময় নষ্ট করে, এন্তার ডিজেল খরচ করে প্রায় আধ ঘন্টা দেরি করে অফিসে আসে না।

যদিও কাজটা খুব একটা ব্রেন-ওয়ার্কের নয়। কিন্তু পয়সা যখন নিয়েছে, তখন যতই প্রকৃতিবিরুদ্ধ হোক না কেন তাকে সামনেব লোকটার গতিবিধির ওপর নজর রাখতেই হবে। এবং লোকটার চলাফেরার মধ্যেও একটা সাসপেন্স আছে। কিন্তু সেটা কি? লোকটা প্রায় বার দুই তার চোখে ধুলো দিতে চেয়েছিল। কিন্তু নীলও নাছোড়বান্দা। ওর কেমন যেন একটা রোখ চেপে গেছে। রজত গুহর বর্তমান গতিবিধি নিঃসন্দেহে সন্দেহমুক্ত নয়। দেখাই যাক না কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

এইসব একান্ত ভাবনার মধ্যেই দীপু ফিরে এসেছিল। সঙ্গে এনেছিল এক ভাঁড় চা। সে জানে নীলের তেমন কোন চা-বিলাসিতা নেই।

দামি চায়ে যেমন ঘন ঘন চুমুক দিতে সে পারে, তেমনি প্রয়োজনে রাস্তার ফুচ্কা বা ভাঁড়-চায়ে ওর কোন আপত্তিও নেই। দীপুর হাতে গরম ভাঁড় দেখে ওর বেশ ভাল লাগল। হাত বাড়িয়ে ভাঁড়টা নিতে নিতে ও বলল,—বাঁচালি। উচিত ছিল ফ্লাস্কে কিছু চা নিয়ে নেওয়া।

গাড়িতে উঠতে উঠতে দীপু বলল, — তোমাব মক্কেল যা ঘোড়েল, ফ্লাস্কের চা আর আমাদেব কতক্ষণ বাঁচাতো। বুঝতেই পারছি, আজ সারাদিন রাস্তার চায়েই দিন কাটাতে হবে। আমার অবশ্য এসব অভ্যেস আছে। তোমাকে নিয়েই যত কেলো।

—চুপ কর, প্রয়োজন হলে আমি পার্টিতে গিয়ে ভরপেট মদ খেতে পারি, আবার দরকার মতো সাধুবাবাজিব আখড়ায় গিয়ে নিরামিষ ভোজন এবং গঞ্জিকাসেবন কোনো কিছুতেই আমার খুব একটা পিছিয়ে যাবার ব্যাপার নেই।

গাড়িতে বসে বসে দুজনের প্রায় খান ছয়েক করে সিগারেট আর বার দুয়েক চা খাওয়া হয়ে গেল। দীপু বেশ ছটফট করছিল। সত্যিই তো, নীলের মতো ওর অত ধৈর্য নেই। একটা ডেঞ্জারাস পলাতক খুনির পিছনে দৌড়ে তাকে কয়েকটা মোক্ষম ঘুষিতে কাত করতে ওর যেমন থ্রীল লাগে, ঠিক তেমনি ঠায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাবো জন্যে অপেক্ষা করতে বিরক্তির একশেষ। একসময় তো দীপু বলেই ফেলল,—এই জন্যেই মাইরি প্রেম-ট্রেম করা আমার ধাতে সইল না। প্রেম মানেই অপেক্ষা। হয় রাস্তায়, নয় রেস্তোরাঁয়, নয়তো ...। এ শালা একদম আমার ধাতে পোষায় না। মনে হচ্ছে পাঁচটা পর্যন্ত ভেবেণ্ডা ভেজেই কাটিয়ে দিতে হবে। ঠিক আছে গুরু, ব্যাক সীটে আমি ঘুমচ্ছি। গাড়ি চললেই উঠে পড়ব।

—থাক আব ঘুমোবার দরকার নেই। এবার সামনের দিকে তাকিয়ে দেখ।

সত্যিই বিকেল পাঁচটা নয় সাড়ে বারোটার মধ্যেই বজত গুহ অফিস বাড়ি ছেড়ে নিচে নেমে এল। তারপর গাড়ির লক খুলে উঠে বসল গাড়িতে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গাড়ি স্টার্ট নিয়ে জি. পি. ও-র দিকে এগিয়ে গেল। নীল প্রস্তুতই ছিল। ওরাও অ্যামবাসাডারের পিছু পিছু এগিয়ে চলল।

—একটা জিনিস নজর করেছ নীলদা?

—কী?

—লোকটা গেল খালি হাতে, কিন্তু বেরুলো হাতে দামি বাদামি রঙ অ্যাটাচি নিয়ে।

—ক্ষতিটা কী হল? হয়তো কোম্পানির কাজেই অ্যাটাচি নিয়ে বেরুনোর দবকার পড়েছে।

—হতে পারে, বলে দীপু আর কথা না বাড়িয়ে আবার সিগাবেট ধবাল।

—অত সিগারেট খাস না।

—কী হবে, ক্যান্সার?

—হতেও পারে। নাও পারে। অন্য রোগ কি হয় না?

—হলে আর কী হবে? টাঁসতে তো সবাইকেই হবে। আগে নয় পবে।

নীল আড় চোখে একবার দীপুকে দেখে নিয়ে বলল,—অল্প বয়সে বেশি পাকলে যা হয়।

—আরে আরে ঐ দেখ লোকটা ব্রাবোর্ন রোডে ঢুকে পড়ল।

—ক্ষতি নেই, কনজেস্টেড রাস্তা। খুব স্পীডে এগোতে পারবে না।

সত্যিই তাই। এ সময়ে ব্রাবোর্ন রোড জমজমাট। লরি, রিকশা, হাতে ঠেলা গাড়ি, মিনি বাস আব অগুনতি পথচারী। সামনেব গাড়িটা ধীরে ধীবেই এগুচ্ছে। ফ্লাই ওভারের মুখে এসে বেশ কিছুক্ষণ ট্রাফিকে আটকে রইল। ছাড়া পেয়ে অ্যামবাসাডার আগেই বেরিয়ে গেল। খান তিনেক গাড়ির পিছনে থাকাব দরুন নীলের গাড়িটা পিছিয়ে পড়ল বেশ কিছুটা। তবু ছাই রঙা গাড়িটা দেখা যাচ্ছে।

সকালের কুয়াশা এখন কেটে গেছে। রোদও উঠেছে। কুয়াশাব ম্যাজম্যাজানি কাটলেও শীতটা মোটেই কমেনি। রোদ ওঠায় একটা সুবিধা হয়েছে। গাড়িটা দূরে গেলেও প্রায় নতুন ঝকঝকে ছাইরঙা অ্যামবাসাডার দৃষ্টির বাইরে চলে যাবার সুযোগ পাচ্ছে না। অ্যামবাসাডাব ততক্ষণে হাওড়া ব্রিজে উঠে পড়েছে। নীল দু-একটা গাড়িকে ইতিমধ্যে ওভারটেক করে কাছাকাছি চলে এসেছিল।

হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে হঠাৎ শিবপুরের রাস্তা নিল অ্যামবাসাডাব। নীল নিজেব মনেই বিড়বিড় করল, —যেতে চায় কোথায়?

দীপু ফুট কাটল, —বটানিক্‌সে। শীতকাল তো, বোধহয় পিকনিকের ধান্দা আছে।

নীল কিছু বলল না। ওর দৃষ্টি সামনের দিকে। এ বাস্তাটা মোটামুটি কমও না বেশিও না এবকম ভিড। নির্বিঘ্নে খানিকটা এগোবার পরই হোল ঝামেলা। কোনরকম সিগন্যাল না দিয়েই চকিতে বাঁ দিকে একটা নাম-না-জানা গলিতে গাড়ি ঘুরিয়ে দিল। দূরত্বটুকু কভার করে নীল যখন বাঁদিকের গলিতে গাড়ি ঢোকাল, সামনে সব ভোঁ ভাঁ।

গলিটা বেশ নির্জন। গাড়িটাড়ি কিছুই নেই। এমনকি একটা সাইকেল, টানা রিকশা, কিছুই না। একদিকে এবড়োখেবড়ো কিছু ভাঙাচোরা বাড়ি। অন্যদিকে টানা দেওযাল। খুব সম্ভবত কোন ফ্যাক্টরি বা চটকলের সীমানা পাঁচিল। রাস্তা ফাঁকা পেয়ে নীল ওর গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেল। খানিকটা এগোতেই ফাঁকা পোড়ো জমি। জমির ওপাশে একটা বড়োসড়ো ডোবা। ডানদিকের পাঁচিলটা শেষ হয়ে গিয়ে গাছগাছালির জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। যদিও গলিটা খুব একটা লম্বা নয়, তবুও এত তাড়াতাড়ি একটা অ্যামবাসাডার উধাও হয়ে যেতে পারে না। নীল আর দীপু প্রায় আশ্চর্য হয়েই পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো।

দীপুই বলল, —ভোজবাজি নাকি?

নীল অবশ্য কিছুই বলল না। হঠাৎ সামনে দেখা গেল রোগা রোগা চেহারার একটা কালো মতন লোক এগিয়ে আসছে। গাড়িটা এগিয়ে নিয়ে লোকটার সামনে দাঁড করিয়ে নীল জিজ্ঞাসা করল,

—আচ্ছা ভাই, এদিকে একটু আগে কোনো গাড়ি যেতে দেখেছ?

—না তো বাবু।

—ঠিক আছে, বলে নীল আর কথা না বাড়িয়ে গাড়িটা এগিয়ে নিয়ে গেল। গণ্ডগোল বাধল গলিটা যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে গিয়ে। দুপাশে দুটো রাস্তা চলে গেছে। এবং দুদিকেই মোটামুটি জনমানবশূন্য পথ। প্রথমত জিজ্ঞাসা করার মতো কোনো লোক নেই, দ্বিতীয়ত জিজ্ঞাসা করেই বা লাভ কী?

দীপু আবার টিপ্পনী কাটল, —যাহ্ শালা, পাখি ফুড়ুৎ?

প্রায় স্বগোতোক্তির মতো নীল বলল,—এত তাড়াতাড়ি একটা গাড়ি উবে যাবে? এমন কিছু তো দেরি হয়নি।

—কিন্তু এখন যাবে কোন দিকে?

—বুঝতে পারছি না। কাছেপিঠে একটা লোকও নেই যে জিজ্ঞাসা করব।

—আচ্ছা একটু ওয়েট করলে হোত না?

—তোর কি মনে হচ্ছে আশেপাশে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে, গাড়ি সমেত?

—ঠিক তা নয়। তাছাড়া এটুকু রাস্তাব মধ্যে তো আশেপাশে কোনো গলিঘুপচিও নেই। সত্যি বলতে কি নীলদা, ও মাল তোমার আমার থেকে ঢের চালু।

—হুঁ, তাই তো দেখছি।

—গুরু!

—আবার কী হল?

—ক'টা বাজে দেখেছ?

নীল ঘড়ির দিকে তাকাল।

—বলিস কিরে, দেড়টা বেজে গেছে?

—আজকের দিনটাই বরবাদ। ও শালা নির্ঘাত চোখে ধুলো দিয়ে অফিস চলে গেছে। এক কাজ করো। গাড়িটা একটু সাইড কবে নাও। টিফিন কেরিয়ারটা খুলি। খাওয়া-দাওয়া সেরে সোজা চল ডালহাউসি। মাল যেখানেই যাক, অফিস ফিববেই। তারপব দেখা যাবে কী করা যায়।

খিদে নীলেরও পেয়েছিল। দীপুব কথায় কোনো অযৌক্তিকতাও ছিল না। যদিও ব্যাপারটা ওকে বেশ ভাবাচ্ছিল, এত অল্প সময়ের মধ্যে লোকটা গাড়ি সমেত কোথায় উধাও হয়ে যেতে পারে! নিশ্চয়ই এ রাস্তা ওব চেনা। সম্ভবত এ বাস্তায় অনেকবার যাতায়াত কবা আছে। হয়তো কারো বাড়িতে ঢুকেছে কিন্তু তাই বলে তো গাড়ি নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে পারে না!

আরো কিছু সম্ভাব্য ভাবনার খেলা চলছিল নীলের মাথার মধ্যে। নীরবতার সুযোগ নিয়ে দীপু হাত বাড়িয়ে পিছন থেকে টিফিন ক্যারিয়ারটা তুলে নিল।

প্রায় সারাদিন ঘুরতে হোতে পারে এই চিন্তা করেই সঙ্গে খাবার নিয়ে আসা। খাবার বলতে চিকেন স্যাণ্ডউইচ আর নতুন গুড়ের কড়াপাক সন্দেশ।

দীপুর খুব একটা চিন্তা আছে বলে মনে হল না। ও প্রায় গোগ্রাসে খেয়ে নিল। নীলও খাওয়া শুরু করল। অবশ্য পরাজিত সৈনিকের মতো। তার মতো চৌখস ছেলের চোখে একরাশ ধুলো ছিটিয়ে লোকটা বেমালুম হাওয়া হয়ে যাবে এটা ও কল্পনাও করতে পারেনি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে দীপু বলল,—চল এবাব ফেরা যাক। এখানে আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

একটা ফিল্টার উইলস্ ধরাতে ধরাতে নীল বলল,—হ্যাঁ, ফিরতেই হবে। দাঁড়া, একটা লোক আসছে, ওকে একবার জিগ্যেস করি।

—আমরা এখানে পৌঁছবার পর খাওয়া-দাওয়া শেষ করতে কতক্ষণ সময় লেগেছে জান? দীপু নিজেই প্রশ্ন করে নিজেই উত্তর দিল, কমসে কম কুড়ি মিনিট। তুমি কি ভাব কুড়ি মিনিট বাদেও

হাইবঙা অ্যামাবাসাডারকে রাস্তায় ক্যাচ করতে পারবে?

নীল অন্য কিছু ভাবছিল। ভাবনা কাটিয়ে ও বলল,—না, তা নয়। এই যে ভাই শোন।

দূর থেকে লোক মনে হলেও কাছাকাছি আসতে বোঝা গেল, লোক নয় বছর আঠারো-উনিশের একটা ছেলে। গায়ে মোটা খদ্দরের রঙিন চাদর। পরনে ময়লা পাজামা।

ছেলেটা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল,—আজ্ঞে কিছু বলছেন?

—তুমি তো এদিকেই থাক?

—হ্যাঁ কাকু, এই গলি দিয়ে সোজা এগিয়ে গেলেই বাঁ-হাতি একটা বস্তি আছে। ওখানেই থাকি।

—আর এদিকের রাস্তাটা?

—ওটা আপনার শিবপুরের দিকে চলে গেছে।

—হাওড়া যেতে গেলে?

—এ রাস্তা বরাবর সোজা গেলে পড়বেন বড় রাস্তায়। তারপর ডানদিকে মোড় নিয়ে সোজা হাওড়া। আপনারা কাকু যাবেন কোন দিকে?

—ওই, হাওড়া।

—তাহলে যেভাবে বললুম ওই ভাবেই চলে যান।

—আর বাঁদিকের রাস্তায় গেলে?

—ওটা দিয়েও হাওড়া যায়। তবে কিনা একটু গলিটলি পার হয়ে যেতে হবে। রাস্তা গোলমাল হয়েও যেতে পারে।

—ঠিক আছে ভাই, আমরা একটু ঘুর পথেই ঘুরে যাই।

ছেলেটা কী বুঝল কে জানে। নীল আর সময় নষ্ট না করে বাঁদিকের রাস্তা ধরেই এগিয়ে চলল।

—কি তখন থেকে ঢুলছিস? নাম্বারটা মনে আছে?

খাওয়া-দাওয়ার পর দীপুর একটু ঢুলুনি এসেছিল। ওটা ওর বরাবরের স্বভাব। নীলের কথা ওর কানে গিয়েছিল। মাথা নিচু রেখেই ও বলল, — বজত গুহর গাড়ি? ফাইভ সিক্স টু ফোর। ডাবলিউ এম সি।

—একেই বলে খোদার মর্জি। সামনে চেয়ে দেখ।

দীপু খুব একটা ব্যস্ত না হয়ে ধীরে ধীরে মাথা তুলে সামনের দিকে তাকাল। তারপরই তড়াক করে লাফিয়ে বলল,—এটা কী রকম ভোজবাজিকা খেল হলো গুরু। ঐ তো ছাইরঙা ফাইভ সিক্স টু ফোর। জ্বলজ্বল করছে। এও আর এক ভেল্‌কি। ভগবানের ভেল্‌কি।

নীলের ঠোঁটের কোণে হাসি। ও বলল, হ্যাঁ, ভেল্‌কিই বটে। ঠিকই বলেছিস। ভগবানের ভেল্‌কি।

—কিন্তু ব্যাপারটা কী?

—গেইস কর।

—আগে বল তুমি ধরলে কী করে?

—এ আর ধরাধরির কী আছে? সামনে দেখছিস বিশাল জ্যাম। মিছিল-টিছিল আছে বোধহয়।

—জয় মা মিছিলেশ্বরীর জয়। কিন্তু, প্রায় মিনিট কুড়ির মতো গাড়িটা আমরা মিস্ করেছিলুম। তাহলে?

—কি হতে পারে? এবার বল।

—ঠিক বলা যাচ্ছে না; তবে যদ্দূর মনে হয় লোকটার ওখানে কোন কাজ ছিল। হয়তো আমরা ডানদিক বা বাঁদিকে গাড়ি নিয়ে গেলে লোকটাকে পেয়েও যেতে পারতুম। যাইহোক তা যখন হয়নি তখন ধরা যেতে পারে, লোকটা প্রায় মিনিট ষোল-সতেরোর মতো সময় নিয়ে কোন কাজ মিটিয়েছে। আর আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল মিনিট কুড়ি। অর্থাৎ তিন চার মিনিট আগে লোকটা গাড়ি স্টার্ট

দিয়েছে। তারপর জ্যামে আটকেছে। তুমিও খোদার মর্জিতে ফাইভ সিক্স টু ফোরকে ধরে ফেলেছ। কী ঠিক আছে?

—হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে রজত গুহ আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে এ রাস্তা ও রাস্তা করে যখন দেখল আমাদের গাড়ি আর ওর পিছনে নেই তখন হাওড়ার পথ ধরে এসে জ্যামে আটকালো। কিন্তু ও জানে না, আজ ভাগ্য আমাদের সহায়।

—হুঁ, বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়তে নাড়তে দীপু বলল, হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।

নীল কিছু না বলে কেবল হাসল।

দীপু বলল,—তবে গুরু, এবার আর মিস কোরো না।

—কলকাতার রাস্তা। বিশ্বাস নেই। হয়তো ট্রাফিকে পড়ে ওর গাড়ি বেরিয়ে গেল আর আমরা আটকে গেলাম। নীল ব্যানার্জি যতই ভালো গাড়ি চালাক না কেন, কলকাতার রাস্তায় সে পুতুল।

—তোমার কি মনে হয় ও বুঝতে পেরেছে আমারা ওকে আবার ধরে ফেলেছি।

—সেটা একটু গেলেই বোঝা যাবে।

ইতিমধ্যে গাড়ি ছাড়তে শুরু করেছে। ওদের গাড়িটা ছিল একটা স্কুটারের পিছনে। স্কুটারের আগে রজত গুহ।

সব কটা গাড়িই ঢিমেতালে এগোতে এগোতে একসময় হাওড়া ব্রিজ পার হল। ফ্লাইওভার ধরে ব্রাবোর্ন রোড। তারপর ডালহাউসি। কিন্তু রজত গুহ রয় এন্টারপ্রাইসের দিকেই গেল না। মার্টিন বার্ন ছাড়িয়ে নীলহাট হাউস পেরিয়ে সোজা এগিয়ে গেল গণেশ অ্যাভিন্যুর দিকে। এল আই সী বিল্ডিং এর পরই হিন্দ সিনেমা। আবার ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ি আটকালো।

তবে নীল এবার সজাগ হয়েই আছে। ওকে কেমন যেন একটা নেশায় পেয়ে বসেছে। হত না যদি না দুবার লোকটা ধোঁকা দেবার চেষ্টা করতো। মনে মনে ভাবছিল দেখি না তোমার দৌড় কতদূর। যদিও কলকাতার রাস্তায় একটা গাড়িকে সমানে ফলো করা সহজসাধ্য নয় তবুও যখন খেলাটা আরম্ভ হয়েছে তখন লোকটার কেরামতি দেখার বাসনাটাও ওকে পেয়ে বসেছিল।

সিগন্যাল ক্লিয়ার হতেই রজত গুহ ডানদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে ওয়েলিংটন ছাড়িয়ে বাঁদিকে মৌলালির রাস্তা ধরল। নীল ভেবেছিল ও হয়তো সোজাই গাড়ি চালাবে। তা নয়! হঠাৎ ডানদিকে একটা ছোট গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এই গলিঘুঁজিগুলোই বড় ঝামেলায় ফেলে। নীল একটু দ্রুত চালিয়ে গলির মুখে এসে দেখল অ্যামবাসাডারটা এগিয়ে প্রায় গলির শেষ প্রান্তে চলে গিয়েছে। তারপরই আবার বাঁদিকে। এ রাস্তাটা নীলের চেনা। ওর একটা চেনাজানা পত্রিকা অফিস। অর্থাৎ হয় রজত গুহকে ফের ডানদিকে মোড় নিয়ে এস. এন. ব্যানার্জি রোডে পড়তে হবে, নইলে সোজা বেরিয়ে গিয়ে বাঁদিকে ঘুরে আবার লেনিন সরণিতে। না, গাড়ি ডানদিকেই ঘুরেছে।

বিড়বিড় করতে থাকল নীল, এস এন. ব্যানর্জি রোড তো ওয়ান ওয়ে। মানে আবার ডানদিকেই ঘুরতে হবে। ঘুরলও তাই! লোটাস পেরিয়ে সোজা গেল জানবাজার পর্যন্ত। তারপরই বাঁদিকে, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট।

দীপু আর থাকতে না পেরে বলল,—কী করতে চাইছে বল তো?

—একটু নাকানি-চোবানি খাওয়াবার চেষ্টা আর কি! ভাবছে একসময় আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে ওর পিছু নেওয়া ছেড়ে দেব।

—কিন্তু লোকটার তো অনেকরকম কাজকর্ম আছে। অযথা এ গলি সে গলি করার কী মানে? ফুয়েলের তো খরচ হচ্ছে।

—নিজের তো যাচ্ছে না। কোম্পানির টাকা।

—কিন্তু সময়ের কোন দাম নেই?

স্মিতা গুহর অনুমান ঠিক হলে, লোকটার ধান্দা দু'নম্বর রাস্তায় পয়সা কামানো। তার ওপর বেশ ভালো পজিসানের চাকরি। মাইনেও ভালো। খাওয়া-পরার কোন চিন্তা নেই। বেশ-ভূষাতেও বেশ ফিটফাট। তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, লোকটা কী নেহাতই উদ্দেশ্যহীনের মতো ঘুরছে না কোন ধান্দায় আছে? নাকি আমাদের ভোগা দেবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ নীলের কথা থামিয়ে দিয়ে দীপু বলল,—ওই দ্যাখো, ফুড কর্পোরেশনের মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল। কি করবে, ঢুকবে নাকি?

—দরকার নেই। একসময় বেরোতেই হবে। ঢোকা বেরনোর রাস্তা ঐ একটাই।

প্রায় আধঘণ্টা পর অ্যাবাসাডারের নাক দেখা গেল।

ইতিমধ্যে, নন পার্কিং জোনে গাড়ি দাঁড় করানোর জন্যে ট্রাফিক সার্জেন্ট এসে নীলের গাড়ি পাকড়াও করেছিল। অবশ্য নীলের আইডেন্টিটি আর উদ্দেশ্য জেনে ভদ্রলোক তেমন কিছু ঝামেলা করলেন না। অবশ্য বলে গেলেন বেশি দেরি হলে নীল যেন গাড়ি ফুড কর্পোরেশনের চাতালে ঢুকিয়ে রাখে। তা আর করতে হল না। ছাইরঙা অ্যামবাসাডার বাইরে এসে বাঁদিকে মুখ ঘোরালো।

ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ধরে অ্যামবাসাডার ছুটে চলল পার্ক স্ট্রিটের দিকে। ডানলপ অফিসের উল্টো ফুটে একটা নামকরা সেলুনের সামনে এসে আবার অ্যামবাসাডার দাঁড়িয়ে পড়ল। বজত গুহ গাড়ি থেকে নেমে দরজা লক করে প্রায় কোনদিকে না তাকিয়েই সোজা সেলুনে ঢুকে পড়লেন।

—লাও, মক্কেলের আবার এখন কী কাটার দরকার পড়ল গুরু?

—নখ। নীলের সংক্ষিপ্ত জবাব।

—পায়ের কড়াও হতে পারে। আজকাল নাকি সেলুনে এসব ব্যবস্থাও হয়েছে।

অগত্যা অপেক্ষা করা ছাড়া কোন গতি নেই। নীল ঘড়ির দিকে তাকালো। পৌনে পাঁচটা। শীতের সন্ধে তাড়াতাড়িই নামে। মাঝে দুপুরের দিকে রোদ উঠেছিল। কিন্তু তারপরই আবার সেই মেঘলা ভাব ফিরে আসায় বিকেল পৌনে পাঁচটাতেই সন্ধের ছায়া নেমে এসেছে। আর বড় জোর আধঘণ্টা। তারপরই সন্ধে গাঢ় হয়ে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়বে।

নীলই বলল,—এরপরই হবে অসুবিধা। দিনের আলোয় গাড়িটা চেইজ করতে তেমন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু রাতের বেলায়,

—আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না নীলদা, এরকম ভাবে আর কতক্ষণ তুমি ওর পিছু নেবে? তাছাড়া লোকটা এমন কিছু কাজ সকাল থেকে করেনি যা দিয়ে ওর বিরুদ্ধে কিছু বলা যায়।

—দীপু, তুই কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যটা মনে রাখিসনি। লোকটা কোন অন্যায় কাজ করেছে কি করেনি, সেটা বিচার করার জন্যে আমরা ওর পিছু নিইনি। আমাদের এক মহিলা নিয়োগ করেছেন, জাস্ট ওর গতিবিধি লক্ষ করার জন্য। উনি সারাদিনে কোথায় যান, কী করেন ইত্যাদির তথ্য সরবরাহ করার জন্য। আর সেই বাবদ আমাদের কিছু প্রাপ্তিযোগ হবে ব্যাস, সেটুকু করেই আমাদের দায়িত্ব শেষ।

—কিন্তু কতক্ষণ? সারারাত তো আর স্টিয়ারিং ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করা যায় না।

—রাত নটায় মহিলাকে ফোন করে জানাতে হবে। অর্থাৎ তুই ধরে রাখ ন'টা পর্যন্ত আমরা ওর পিছু ছাড়ছি না।

—কিন্তু বসে বসে আমার তো ইয়ে ব্যথা হয়ে গেল। একটু চা-টা না পেলে তো আর চলছে না। তাছাড়া একটু জলবিয়োগের ব্যাপার ছিল।

—জলবিয়োগের ব্যাপারটা যদি খুব আর্জেন্ট হয় তাহলে সামনের ঐ সরু গলিটায় ঢুকে যা। আর চা? ঐ দেখ, রাস্তার ধারে 'ভাঁড়-চা'-এর দোকান। আমার জন্যেও এক ভাঁড় নিয়ে আসিস।

দীপু গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল,—এর মধ্যে মাল যদি হুড়কে বেরিয়ে আসে?

—তুই তো আশেপাশেই থাকিস। চিন্তার কিছু নেই, তাড়াতাড়ি আয়।

—আমি একবার সেলুনটা ঘুরে আসব?

—এখন থাক আর একটু দেখি।

দীপু চলে গেল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই এক ভাঁড় চা নিয়ে ও ফিরে এল।

রজত গুহ বেরোলেন যখন তখন সত্যিই অন্ধকার হয়ে গেছে। কর্পোরেশনের নিওন বাতি সব জ্বলে গেছে। সন্ধের পর এ রাস্তায় লোক চলাচল কমে আসে। গাড়ির মধ্যে প্রায় আধঘণ্টা মত চুপচাপ বসে থাকার পর যে মুহূর্তে নীল ভাবছিল দীপুকে সেলুনে পাঠাবে, ঠিক তখনই রজত গুহ বেশ ফিটফাট হয়ে সেলুন থেকে বেরোলেন।

—মনে হচ্ছে মাসাজ-ফাসাজ করিয়ে এল। বেশ ফিটফাট লাগছে না?

—এবার বাবু কোথায় যায় দেখ্!

—আমি বলব?

—বল্।

—নির্ঘাত শালার খিদে পেয়েছে। যদি আমার হিসেবে খুব ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে রজত মাল কোন রেস্তোরাঁয় ঢুকতে পারে।

—মনে হচ্ছে তোর অনুমান মিলতে পারে। চ, দেখি।

দীপুর অনুমান মিলে গেল। পার্ক স্ট্রিটে পড়ে ডানদিকে খানিকটা এগিয়ে রজত গুহ গাড়ি পার্ক করলেন পার্কিং জোনে। তারপর বেশ ধীরে-সুস্থে এগিয়ে গেলেন মুল্যাঁ রুজে।

—কি গুরু, ঠিক বলিনি?

—এবার? আমাদেরও প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। খেতে হবে। সারাদিনে কয়েকটা স্যান্ডউইচ আর সন্দেশ খেয়ে কতক্ষণ থাকা যায়? নে, চল।

নীলও পার্কিং জোনে, ঠিক রজত গুহর গাড়ির দু গাড়ি পরে ওর গাড়িটা পার্ক করে ঢুকে পড়ল মুল্যাঁ রুজে।

সবে সন্ধে শুরু হয়েছে। কিন্তু তখনই ভিড় খুব একটা খারাপ নয়। আবছা আলো আর সিগারেটের ধোঁয়ায় বেশ একটা রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দীপু ঢুকেই এদিক ওদিক তাকাতে শুরু করে দিল। প্রায় প্রত্যেকটা জায়গায় একজন দুজন করে লোক বসে থাকে। একেবারে শেষের দিকে একজোড়া তরুণ ড্রিঙ্কস নিয়ে বসেছে। ঠিক তার সামনের সিটটাই ছিল ফাঁকা। দীপুই এগিয়ে গিয়ে জায়গাটা নিয়ে নিল। সারাদিন গাড়ি চালিয়ে নীলকে একটু টায়ার্ড লাগছিল। তার ওপর ও এখন মোটামুটি একটা ছদ্মবেশে আছে, এলোমেলো মুখ মোছা যাচ্ছে না। তাতে হয়তো উইগটা সরে যেতে পারে। কিংবা দাড়িটা হাতে উঠে আসতে পারে রুমালের সঙ্গে।

—রজত গুহ কোথায় আছে লক্ষ কর। আমি একটু বাথরুম হয়ে আসি।

নীল চলে গেল বাথরুমে। দীপু একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রত্যেকটা চেয়ারে নজর ফেলা শুরু করল। এ কোণ ও কোণ দেখতে দেখতে সহসা ওর নজর আটকালো রুমের একেবারে অন্য প্রান্তে রজত গুহ বসে আছেন। সামনে দাঁড়িয়ে আছে বেয়ারা। বোধহয় খাবারের অথবা ড্রিঙ্কস-এর অর্ডার দিচ্ছেন।

রজতকে দেখতে পেয়ে দীপুর মুখে স্বস্তির ভাবটা ফিরে এল। ওরও একটু মুখ হাত ধোয়ার দরকার ছিল। কিন্তু উপায় নেই। মাথার পরচুল মুখে দাড়ি। ইতিমধ্যে নীল ফিরে এল।

—কিরে রজতকে দেখলি?

—তোমার ডানদিকে এক্সট্রিম কর্নারে।

—হুঁ, বলে নীল দীপুর সামনে গিয়ে বসল। বেয়ারা এসে গিয়েছিল। মেনু কার্ড দেখতে দেখতে নীল জিজ্ঞাসা করল, —কি খাবি?

দীপু সোজাসুজি বেয়ারার দিকে তাকিয়ে বলল, —আজকে শীত বেশ জম্পেস। তুমি ভাই দুটো বড় রাম নিয়ে এস। ও হুইস্কি-ফুইস্কিতে কাজ হবে না।

—খাবারটাও বলে দে।

—এরি মধ্যে?

—খাবার আনতে দেরি করলে পাখি ফুস্ হয়ে যেতে পারে।

—ঠিক হ্যায় গুরু। আজ রজত গুহর অনারে নয় মাল কমই খাব। দুটো চিকেন তন্দুরি আর দুটো বাটার নান দাও। ড্রিঙ্কসটা তাড়াতাড়ি বলে যাও।

মুলাঁ রুজে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। প্রায় খালি পেটে তিন পেগ করে রাম খেলো ওরা দুজনেই। ঠিক খাওয়া নয় গোগ্রাসে পান করা বলা যেতে পারে। কারণ প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা ছিল রজত গুহ না বেরিয়ে যায়। মাঝে নীল একবার জিগ্যেস করেছিল, দেখ তো লোকটা আমাদের অবজার্ভ করছে কিনা?

—একবারও না। ও শালাকে দেখে বোঝাই যায় না আমাদের সম্বন্ধে ওর কোন মাথাব্যথা আছে।

—কিন্তু লোকটা বেশ ভাল করেই জানে আমরা ওর পেছনে ছিনে জোঁকের মতো লেগে আছি।

—লোকটা মাইরি বেশ হ্যান্ডসাম, আর চালু। হাবভাব কিছু বোঝাই যাচ্ছে না।

—হ্যাঁ, গভীর জলের মাছ হলে যা হয়।

—বেশ মজার অভিজ্ঞতা যাই বল। একটা বিজি লোক, সারাদিন ধরে কোন কাজকর্ম না করে গাড়ি নিয়ে সারা কলকাতা মায় হাওড়া পর্যন্ত বেড়ালো। এখন সন্ধের পর বারে এসে মাল সাঁটছে। আমরা নয় একটা ধান্দায় ঘুরছি। কিন্তু ও লোকটার ধান্দা কি?

—জানি না, তুইও যেখানে, আমিও সেখানে। এখন কি করছে?

—একটা সিগারেট শেষ করে আর একটা ধরালো। কিন্তু গুরু, আমার যে মাথা ঝিমঝিম করছে।

—আর যাই করো মাতাল হয়ো না, মুশকিলে পড়ে যাব।

—কি যে বল, তিন পেগ রাম খেয়ে মাতাল হয়ে যাব? আসলে এটা হচ্ছে এনার্জি বিগেনিং স্টিমুল্যান্ট। এখন তোমার সঙ্গে আমি গভীর রাত পর্যন্ত দৌড়তে পারি। দীপঙ্কর রায়ের স্ট্যামিনা তোমার জানা নেই।

নীল মৃদু হাসল। দীপুর এসব কথার অর্থই হচ্ছে ওর নেশা হয়েছে। তবে ছেলেটার মনের জোর আছে। নেশা হলেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। নীল কথা না বাড়িয়ে খেয়ে যেতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর রজত গুহ উঠে দাঁড়াল। নীলদেরও খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিলও মেটানো হয়ে গিয়েছিল। রজতকে উঠতে দেখে দীপুও তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো।

—অত হড়বড় করিস না, ধীরে-সুস্থে গেলেই হবে। চোর-পুলিসের খেলা। দু'পক্ষই জানে দু'পক্ষের মনের কথা।

—কিন্তু লোকটাকে তো ঠিক এই মুহূর্তে হাতছাড়া করা যায় না।

—না। হাত ছাড়া হবে কেন? নীল ব্যানার্জিকে তিন তিনবার ধাপ্পা দিয়ে ওর পক্ষে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়। ঠিক আছে চ।

রজত গুহর পা বোধহয় সামান্য টলছে। এই প্রথম তিনি চারদিক মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন। নীল আর দীপুকেও সেই দেখার মধ্যেই দেখে নিলেন। তারপর আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগুতে গিয়ে দুবার টাল সামলালেন। বেয়ারাটা বোধহয় মোটারকম বকশিশ পেয়েছিল। ধরার জন্যে এগিয়ে যেতেই ধমক খেল, —শাটাপ।

রজত গুহ বেরুবার আগেই দীপু ওকে টপকে এগিয়ে গেল। বেরুবার মুখে খুব সম্ভবত একটু ধাক্কা লেগেছিল। রজত মুখ তুলে একবার তাকালেন। তারপর আপনমনেই যেন মাথা নাড়ালেন। ততক্ষণে দীপু চলে গেছে দরজার বাইরে।

গাড়ি স্টার্ট দেবার আগেই ব্যাপারটা নজরে এল। পার্কিং ফি দিয়ে নীল সবে গাড়ি স্টার্ট করতে যাচ্ছে, কারণ রজতের গাড়ি রাসেল স্ট্রিটের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, হঠাৎ দীপু দেখল উইণ্ড স্ক্রিনে, যেখানে রেন ওয়াইপার থাকে সেখানে একটা ছোট্ট কাগজ আটকানো রয়েছে।

—আরে, এ কাগজটা আবার এলো কোত্থেকে? বলেই ও হাত বাড়িয়ে বাইরে থেকে আটকানো কাগজটা খুলে নিয়ে এল।

রজত গুহর গাড়ি ততক্ষণে রাসেল স্ট্রিট ধরে মিডলটন হয়ে ক্যামাক স্ট্রিট। তারপরই জগদীশ

বসু রোড ধরে সোজা চৌরঙ্গীর মুখ চলে গেছে। নীলও ঠিক ব্যবধান রেখে পিছন পিছন এগোতে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করল,—কিসের সমন?

দীপু কিছু না বলে নীলের চোখের সামনে কাগজটা মেলে ধরল। মুল্যাঁ রুজেরই পেপার ন্যাপকিন তাতে ডট পেনের কালিতে লেখা আছে, আর কত ঘুরবে চাঁদুরা? ঘুরে ঘুরে কেলান্ত হয়ে পড়লে অসুখে পড়ে যাবে খোকারা। যাও বাড়ি যাও।

দীপুব মুখ থেকে কেবল বেরুলো— শ্ শ্ শালা।

—আঃ ঝুটমুট কেন গাল দিচ্ছিস? অন্য কোনো লোক হলে এতক্ষণে একটা কিছু করে বসত এ তো সামান্য রসিকতা করেছে।

—তাই বলে, 'খোকা' বলবে?

—আর তুই যে 'শালা' বললি। ছেড়ে দে, বাবু এখন কোন্ দিকে যায় দেখি।

—কিন্তু লেখাটা পাঠালো কখন? আমি তো সমানে লোকটাকে নজর রেখেছিলুম। তারপব ও বেরুবার আগেই আমি গাড়িতে পৌছে গেছি।

—একটা সামান্য কাগজ একটা গাড়িব রেন ওয়াইপাবে গুঁজে দেবার জন্যে যদি কোনো বেযাবাকে পাঁচ কি দশ টাকা দিস, সে কি ঐ সামান্য কাজটা কববে না বলছিস?

—কিন্তু বেয়াবা তো আমাদেব গাড়ি চেনে না।

—ওব গাডিব নাম্বাব তো তোব মনে আছে?

—হ্যাঁ।

—আমাদেব গাড়িব নাম্বাব ও মুখস্থ কবেনি এটা তুই কী করে হলফ কবে বলতে পারছিস?

—বোঝ!

চৌবঙ্গী পৌছেই সামনেব গাড়ি বাঁক নিল বাঁদিকে। চৌরঙ্গী ধবে সোজা দক্ষিণমুখো। শীত আব কুয়াশাব বাত। সাড়ে আট মানে অনেক। রাস্তাও বেশ ফাঁকা হয়ে আসছে। এখন আর সকাল বা বিকেলেব মত অত ট্রাফিক জ্যামেব ঝামেলা নেই। বেশ হু হু কবেই আগুপিছু গাড়ি দুটো এগিয়ে চলেছে। সামনেব গাড়িব মতলব বোঝা ভার। কখনও বেশ স্পীড নিয়ে ছুটেছে। কখনও বা একেবারেই ঢিমে তালে। বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম পর্যন্ত এসেই রজত গুহর গাড়ি ডানদিকে টার্ন নিয়ে ববীন্দ্রসদনের দিকে এগিয়ে চলল। তাবপন ববীন্দ্রসদন ক্রস করেই পি জি. থেকে গাড়ি ছোটালো হু হু করে। থামল গিয়ে একেবাবে হাজবা মোড। আবাব বাঁদিকে তাবপব ডান দিকে মোড় ঘুরিয়ে গাড়ি ছুটে চলল রাসবিহারীর দিকে

—গুরু, আব গিয়ে কী হবে? রজত গুহ এবাব বাড়ি ফিরবে বলে মনে হচ্ছে। চলো বাড়ি ফিবি। বেজায ঘুম পেয়ে গেছে।

—ঐ জন্যে বলেছিলুম খালি পেটে অত রাম গিলিস না।

—তার মানে তুমি এখনও পিছু ছাড়বে না?

—বেইমানি করতে পারি না। অন্তত লোকটা আগে ওব বাড়ি পৌছক, তারপর আমাদের ছুটি।

—সত্যি গুরু, তোমার পায়ের ধুলো দাও। সকাল থেকে একনাগাড়ে গাড়ি চালাচ্ছে। এখন বলছ, ও বাড়ি পৌছক তাবপর ছুটি!

—হ্যাঁ, সেই রকমই তো কথা ছিল। আর শুধু এই কাজের জন্যে সপ্তাহের শেষে বিশ হাজাব টাকা।

—উঁহু, টাকা দিয়ে তোমাকে কেনা অত সোজা নয়। আসলে তুমি একটা থ্রীলের মধ্যে আছ।

—রাইট যু আর।

দুটো গাড়ি ততক্ষণে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড ধরে চলেছে আরো দক্ষিণে। দেখতে দেখতে এসে গেল দেশপ্রাণ শাসমল রোড। অন্তত দীপু আশা করেছিল রজত গুহর গাড়ি আর একটু গিয়েই বাঁদিকে প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোডে ঢুকে যাবে। কিন্তু ওকে বা ওদের দুজনকেই আশ্চর্য করে দিয়ে সামনেব গাড়ি বাঁক নিল ডানদিকে। টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড।

—লোকটা মাইরি হয় পাগল নয়তো আমাদের ল্যাজে খেলাচ্ছে। এই রাত দুপুরে ভরপেট মাল গিলে এখন শালা বাড়ি না গিয়ে কোন্ চুলোয় হাওয়া খেতে যাচ্ছে?

—তবেই দেখ, লোকটা বাড়ি যাচ্ছে এই ভেবে রাসবিহারী থেকে আমরা যদি আমাদের বাড়ির পথ ধরতুম তাহলে স্মিতা গুহকে টেলিফোনে কী জবাব দিতুম?

—জানি না মাইরি। যেমন তুমি, তেমনি তোমার মক্কেল।

দীপু উইন্ড স্ক্রিন টেনে সিগারেট ধরাল। ওর তখন দু' চোখের পাতা টেনে আসছে। এই মুহূর্তে ওকে কেউ শুয়ে পড়তে বলতো ও দু'মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়তো। কিন্তু তা হবার উপায় নেই। পাগল নীলের পাল্লায় পড়লে ঘুমটুকু শিকেয় তুলে দিতে হয়। কাচের গায়ে মাথা লাগিয়ে দীপু চোখ বুজিয়ে নিজের মনে সিগারেট খেয়ে চলল। আর নীল? না, ওর চোখে তেমন কোনো ঘুমের বালাই নেই। দৃষ্টি ওর এখন ঠায়-বদ্ধ সামনের ছাইরঙা অ্যামবাসাডারের দিকে। ফাঁকা টালিগঞ্জ সার্কুলারের ন্যায় রজত গুহ পাখির মত উড়ে চলেছে। যাচ্ছে কোথায় কে জানে।

দেখতে দেখতে এসে গেল নলিনীরঞ্জন অ্যাভিন্যু। আরো জনবিরল রাস্তা। সামান্য দু একজন পথচারী আর কয়েক ফার্লং অন্তর অন্তর লাইট পোস্ট ছাড়া আর সব ধুধু। এদিকে গাছগাছড়াও বেশি। ফলে গাড়ির মধ্যে বসে থেকেও বেশ শীত করছিল। গাড়ি চালাতে চালাতেই নীল ওর মাফলারটা ভালো করে জড়িয়ে কানটান ঢেকে নিল। নলিনীরঞ্জন অ্যাভিন্যুর ক্রসিং-এ এসে রজতের গাড়ি সামান্য একটু স্পীড কমালো। ডানদিকে গরাগাছা, আর সামনে তারাতলা রোড। অবশ্য এই থামা কয়েক সেকেন্ডের মতো। রজত গুহর গাড়ি রাস্তা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল তারাতলা রোডে। আরও নির্জন, আরও ফাঁকা রাস্তা। রজত গুহ বোধহয় খেপে গেছেন। বোধহয় স্পীডোমিটারের কাঁটা সত্তরটাওর ছাড়িয়ে গেছে। অগত্যা নীলকেও স্পীড বাড়াতে হল।

দীপু চোখ বন্ধ রেখেই বলল, —কী করছ গুরু? অ্যাক্সিডেন্ট করে মরবে যে।

—তুই ঘুমোচ্ছিস, ঘুমো। আর অ্যাক্সিডেন্ট করলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বর্গে চলে যাস।

—দ্যুৎ, ঘুমোচ্ছি কোথায়? এত স্পীড বাড়ালে ঘুমোনো যায়। তার ওপর তোমার সেকেলে গাড়ি। আমার ভয় মাঝরাতে না তোমার গাড়ির চাকা খুলে যায়।

—আবার বাজে বকছিস? কোথায় এলুম চেয়ে দেখ।

দীপু পিটপিট করে চোখ খুলে বাইরের দিকে তাকালো। কুয়াশা যেন এদিকে একটু বেশি বলেই মনে হচ্ছে। ঠিকমত রাস্তা চিনতে না পেরে ও বলল, —বোধহয় জাহান্নমে।

—তোর মাথা। তারাতলা বোধ হয় শেষ হতে চলল।

—সে কি গো! এ তো কলকাতা প্রায় শেষ করে আনলে! আমার কী ইচ্ছে করছে জান? লোকটাকে এক ঘুষি মেরে অজ্ঞান করে বাড়ি পৌঁছে দিতে! এই শালা ইঁদুর-বেড়ালের দৌড় আর ভাল্লাগে না।

নিজের মনে আরো কত কী ও বিড়বিড় করে গেল। কিন্তু নীল পূর্ববৎ। সামনের গাড়ি তারাতলা পার হয়ে গেছে। তারপর বেহালা, বরিষা ঠাকুরপুকুর পেরিয়ে অ্যামবাসাডার ঢুকে পড়ল জোকার পথে। দেজ মেডিকেলের জোকা ফ্যাক্টরি পার হয়ে আরো কিছুটা গিয়ে একবার দাঁড়াল আমতলার মুখে। তারপর আবার দৌড়। মিনিট পনেরোর যাবার পরই দুম করে আধাজঙ্গুলে একটা বাঁকে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল। এদিকেও জঙ্গল কামানো শুরু হয়ে গেছে। তবুও পাড়াগাঁ ভাবটা রয়ে গেছে।

সরকারি আনুকূল্যে এদিকে বিজলি স্তম্ভ পৌঁছে গেছে। রজত গুহর গাড়ি থেমেছে একটা মাথাঝাঁকড়া গাছের নিচে। দূরত্ব আর দৃষ্টি রাখার ব্যবধানে নীলও ওর গাড়ি থামিয়েছে।

যদিও আলো ছায়া আর কুয়াশায় জায়গাটা বেশ জটিল রহস্যময় হয়ে উঠেছে, বিশেষ এই রাত দশটায়, তবু নীলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সামনের গাড়িটাকে নজরবন্দি করে রেখেছে।

প্রায় মিনিট তিন-চার পর সামনের গাড়িতে দেশলাই জ্বালার আলো জ্বলল। পরক্ষণেই তা নিভে গেল।

গাড়ি থামতেই দীপু জেগে উঠেছিল। বেশ বোঝা গেল ওরও দৃষ্টি সামনের গাড়িতে নিবদ্ধ ছিল।

দেশলাই আলো জ্বলা দেখে ও বলল, —বাবু বোধহয় খুব টায়ার্ড। সিগারেট ধরালেন।

নীল কোন কথাই বলছিল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ও কেবল ঘটনার গতি লক্ষ্য করছিল। ওর মনে তখন ভাবনার মেঘ। সারাদিন ধরে এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরে বিনা প্রয়োজনে, অথবা প্রয়োজনে, এলোমেলো গাড়ি চালিয়ে শীতের এই নির্জন রাতে এমন জায়গায় রজত গুহর কি প্রয়োজন থাকতে পারে? নিছক তাদের বোকা বানাবার জন্যে? কিন্তু কী লাভ? তাদের নাজেহাল করার জন্যে এত রাতে প্রায় জঙ্গলের মত একটা জায়গায় আসার তো কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। নীল নিজেও যেমন ক্লান্ত, ও লোকটাও তেমনি ক্লান্ত। কেবল মাত্র তাদের নাজেহাল করার জন্যে তো এত কষ্ট কেউ করবে না? তবে কি অন্য কোন মতলব আছে? এই নির্জন জায়গায় কিছু গুণ্ডাটুণ্ডা দিয়ে তাদের আক্রমণ করতে চায়? নীল একবার নিজের পকেটে হাত ছোঁয়ালো। অস্ত্রটা ঠিকই আছে। দু-চারজন গুণ্ডা দিয়ে তাকে আর দীপুকে ঘায়েল করা শক্ত। এছাড়া আর কী উদ্দেশ্য হতে পারে? কারো সঙ্গে দেখা করতে চায় নাকি? কিন্তু তার জন্যে এত রাতে এখানে আসা কেন? অফিস থেকে অ্যাটাচি নিয়েছিল। কী আছে অ্যাটাচিতে? কোন চোরাই মাল? নাকি কোন ড্রাগস? সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। এসব চোরা বিনিময় সাধারণত রাতের অন্ধকারে, এমনি নির্জন জায়গাতেই হওয়া সম্ভব। কিন্তু রজত গুহ তো জানে পিছনে ফেউ লেগেছে। তা সত্ত্বেও, নাহ্ লোকটার সাহস আছে বলতে হবে।

কতক্ষণ কেটে ছিল কে জানে। প্রায় হাত ত্রিশ দূরে কুয়াশা অন্ধকারে গাছের নিচে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা। হঠাৎই আবার সেই দেশলাই এর আলো।

—গুরু, আর একটা সিগারেট জ্বললো।

—কিংবা কাউকে সংকেত জানালো, এমন তো হতে পারে?

—তার মানে?

—সে সব পরে। এখন শুধু দেখে যা। আর রেডি থাকিস, অতর্কিতে কোন আক্রমণ হওয়া অসম্ভব নয়।

তারপরও প্রায় আধঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেছে। সময়ের কাঁটা যেন ঘুরতেই চাইছে না। অপেক্ষার সময় সহজে কাটে না।

দীপু তো বটেই নীলও বেশ অধৈর্য হয়ে উঠল। এতক্ষণ ধরে গাড়িটা ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? কী চায় রজত গুহ"

হঠাৎই নীল বলে উঠল, —কী ব্যাপার বল তো? ঘণ্টাখানেকের মতো গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়ির মধ্যে বসে লোকটা দু'দুটো সিগারেট শেষ করল। অথচ ..

—বোধহয় গাড়ির টায়ার পাংচার হয়ে গেছে।

সে কথার উত্তর না দিয়ে নীল বলল, —নাহ্ একটু দেখতেই হচ্ছে।

—সে কী গুরু, এত রাতে তুমি একা যাবে?

—ইচ্ছে হলে তুইও আসতে পারিস, বলতে বলতে নীল গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। এবং অবশ্যই ও সাইড পকেট থেকে রিভলবারটা হাতে নিতে ভুলল না। দীপুও নেমে পড়ল। ধীর পায়ে আগুপিছু সামনের গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।

—ওহ্ মাই গড়, বলেই নীল থমকে দাঁড়াল। বোকা বোকা মুখে দীপুর দিকে তাকাল। তারপর গাড়ির কাছে গিয়ে দুজনেই হতভম্ব। কেউ নেই গাড়ির ভেতরে। দরজার লক ঘোরানোর চেষ্টা করল। নাহ্ গাড়ির চারটে দরজাই লক্ড্।

নীলের চোখে ফাঁকি দিয়ে রজত গুহ কখন যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন।

পরদিন প্রায় ন'টা সাড়ে ন'টা নাগাদ গাড়ির লক ভাঙা হল। পুলিসের তরফ থেকে কাজটা করলেন বিকাশ তালুকদার। আর এই এত ঘণ্টা সময়ের মধ্যে রজত গুহর কোন খবর পাওয়া গেল না। লোকটা

যেন ভোজবাজির মত উধাও হয়ে গেছে। বাড়িতে ফোন করে জানা গেল রজত গুহ গত রাত্রে বাড়িই ফেরেননি।

গাড়ির লক যখন খোলার চেষ্টা চলছে তখন বিকাশ তালুকদার জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা ব্যানার্জি সাহেব, আর য়ু সিওর যে গাড়ি থেকে কেউ নেমে যায়নি?

মৃদু হেসে নীল বলল, —কি করে বলি সিওর? লোকটাই তো গাড়ির মধ্যে নেই। তার মানে সে নেমে গেছে।

—হুঁ, তা বটে, কিন্তু আপনার মতো লোকের চোখে ধুলো দিয়ে,

—হতেই পারে। প্রথমত গাড়িটা ছিল কুয়াশা ঘেরা আলো-অন্ধকারের মধ্যে। প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাত দূর থেকে, তার ওপর গাছের আড়াল, কখন কোন্ ফাঁকে নেমে পালিয়েছে।

—কিন্তু লোকটা আপনার ভারশন অনুযায়ী গাড়ির মধ্যে বসে দুটো সিগারেট খেয়েছিল।

—খেয়েছিল কিনা জানি না। তবে দু'বার দেশলাইয়ের ফ্লাশ দেখতে পেয়েছিলাম।

—তার মানেই খেয়েছিল। অতএব ধরা যেতে পারে প্রায় মিনিট পনেরো রজত গুহ গাড়ির মধ্যেই ছিল।

—আপাতত অঙ্ক তাই বলছে।

—কোনরকম গাড়ি খোলা বা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পাননি?

—তাহলে তো সঙ্গে সঙ্গে চেইজ করতাম।

—লোকটা খুবই চালু। পর পর দুটো সিগারেট খাওয়াটা একটা অছিলা। আপনাদের ডাইভার্ট করেছে ওই ভাবেই। আপনার ভাবছেন নিশ্চয়ই লোকটা গাড়ির মধ্যে আছে, আর সেই ফাঁকে .

নীলের বলার কিছু ছিল না। এভাবে একটা গাড়ি নির্জন গাছের নিচে ফেলে রেখে লোকটা এই জঙ্গলের মধ্যে গেল কোথায়? আশেপাশে তেমন কোনো বাড়ি-টাড়িও নেই। কী হতে পারে? এতটা সময় কোথায় থাকতে পারে? আর লোকটা এমন কিছু অপরাধ করেনি যে তাকে পালাতে হবে। অবশ্য অন্য কোনো অপরাধ করেছে কিনা তা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই নীলের কাছে বেশ অস্পষ্ট আর রহস্যময় বলে মনে হোল। আগাপাশতলা অনেক কিছুই ও ভাবছিল। ইতিমধ্যে গাড়ির লক খোলা হয়ে গিয়েছিল। বিকাশ তালুকদারই প্রথম গাড়ির মধ্যে উঁকি মারলেন। তারপর যখন গাড়ির মধ্যে থেকে মুখ বার করে এনে নীলের দিকে তাকালেন, স্পষ্ট বোঝা গেল সে মুখে হতাশা নয়, এক গভীর চিন্তা।

—কি হল তালুকদার বাবু, মুখটা অমন ব্যাজার হয়ে গেল কেন? এনিথিং রঙ?

বেশ গম্ভীর মুখে তালুকদার বললেন, —আপনিই দেখুন।

বিকাশের মুখ দেখেই নীল অনুমান করেছিল, কিছু একটা ঘটেছে। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে পড়ল। ক্রমশ তারও মুখের চেহারা পাল্টাতে শুরু করল। নীলের পিছন থেকে দীপুও উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল। মুখপাতলা ছেলে সে। ফস্ করে বলে ফেলল— মিস্ট্রি, মিস্ট্রি, হেভি মিস্ট্রি! গুরু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, কেস জনডিস।

খুব জটিল আর প্যাঁচালো কিছু হলেই দীপু সাধারণত একটা শব্দই উচ্চারণ করে, কেস জনডিস।

নীল ধীরে ধীরে মুখ বাইরে এনে তালুকদারের দিকে তাকিয়ে বলল, —তালুকদার, সত্যিই কেস জনডিস। মাথামুণ্ডু কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। ব্যাপারটা তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে?

তালুকদারের গাম্ভীর্যটা মোটেই মেকী নয়। বেশ গম্ভীর হয়েই বললেন, — কী দাঁড়াচ্ছে সে আমার থেকে আপনি কিছু কম বুঝেছেন?

তালুকদারের দিকে প্রায় শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নীল আপন মনেই বকে চলল, —গাড়িটা লক করা ছিল, অথচ কি-বোর্ডে একটা চাবি এখনও ঝুলছে।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তালুকদার বললেন,—হ্যাঁ ঝুলছে। এবং চাবির রিং-এ একটা প্লেট আছে, সেখানে লেখা আছে ইংরেজি 'আর' অক্ষর।

—মানে রজতের 'আর'। অ্যাশট্রের মধ্যে আমরা কি দেখলাম?

—একটা সিগারেট অর্ধেক পুড়ে কালো হয়ে নিভে গেছে। আর...

—হ্যাঁ, আর?

—আর দুটো পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি।

—কিন্তু সেখানেও একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে।

—কী রকম?

—আসুন, একটু ভালো করে দেখা যাক, বলে নীল গাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর অন্য পাশের দরজার লক খুলে তালুকদারকে বলল,— আপনি ও-পাশ থেকে আসুন।

তালুকদার অন্যপাশে গিয়ে গাড়ির মধ্যে মুখ বাড়ালেন। নীল বলল,—এবার দেখুন, দুটো পোড়া কাঠির অবস্থানটা। একটা কাঠির কেবল মুখটুকুই পুড়েছে।

—হ্যাঁ, তাই।

—আর একটা কাঠি?

তালুকদার বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে বললেন,—প্রায় সম্পূর্ণটা পুড়ে কালো হয়ে বেঁকে গেছে।

—শুধু তাই নয়, একটু ভালো করে ভাবতে ভাবতে দেখুন, কাঠিটা অ্যাশট্রের একপাশে হেলান দেওয়া অবস্থায় রয়েছে। এবং কাঠির মুখটা নিচের দিকে।

—হ্যাঁ, তাই। কিন্তু কী হতে পারে?

—সেটায় পরে আসছি। এবার সিগারেটটা দেখুন অ্যাশট্রের মধ্যে কিন্তু নেই। আছে অ্যাশট্রের ওপরে সিগারেট হোল্ড করার জায়গায়। এবং সিগারেটের মুখটা পুড়ে কালো হয়ে নিভে গেছে। এবং সেটা এখনও সিগারেট-হোল্ডারের খাপে আটকানো। অর্থাৎ.....

—অর্থাৎ?

—বলছি, এবার ছাইটা ঠিক কীভাবে পড়েছে দেখুন, মানুষ সিগারেট খেতে খেতে ছাই ঝাড়লে ছাইগুলো ভেঙে ছড়িয়ে যায়, অথবা খণ্ড খণ্ড অবস্থায় পড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে একসঙ্গে অনেকটা ছাই লম্বালম্বি পড়ে আছে।

—ঠিক তাই।

—এবার আমি কিছু বলব নীলদা?

—বেশ, বল।

—সিগারেটা ধরানো হয়েছিল। এবং সেই অবস্থায় দু-একটা টান দিয়ে আগুনটা বেশ করে তাতিয়ে নিয়ে অ্যাশট্রের হোল্ডারের খাঁজে আটকে দেওয়া হয়েছিল।

—কারেক্ট। তারপর?

—ওই যে একটুখানি মুখপোড়া কাঠি দেখছ, ওটা দিয়েই সিগারেটটা জ্বালানো হয়। অর্থাৎ যে আলোটা আমরা প্রথমবার দেখেছিলাম। এবং সেটা খুব সম্ভবত ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে বেশি পোড়েনি।

—বলে যা।

—এরপর গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ পোড়া কাঠিটার ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। ওটা কি আগে থেকেই ছিল?

উত্তরটা নীলই দিল,—না, খুব যদি আমি ভুল না করে থাকি তাহলে আমার অনুমান, গতকাল রজত গুহ সারাদিনই গাড়ি চালিয়েছেন, কিন্তু সিগারেটের কাঠি বা সিগারেট ফেলার জন্য তিনি অ্যাশট্রের ব্যবহার করেননি। ইনটেনসানালি করেননি অথবা অভ্যাসবশত করেননি।

—অভ্যাসবশত কেন বলছেন ব্যানার্জি?

—মিস্টার তালুকদার, আর একবার অ্যাশট্রেটা ভাল করে দেখুন। প্রায় অমলিন। অর্থাৎ ব্যবহারই

হয়নি। অ্যাশট্রেটা খুবই সুদৃশ্য। ওটাকে ব্যবহারের থেকে বোধহয় গাড়ির মধ্যে শোভাবর্ধনের জন্যে রাখা হয়েছে। সাধারণত গাড়ির মধ্যে অ্যাশট্রে আমরা বড় একটা রাখি না। সিগারেট খেয়ে জানলা গলিয়ে ফেলে দেওয়াই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঘটে থাকে।

—তা না হল, কিন্তু নীলদা, মুখপোড়া অর্ধেক সিগারেট আর সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়া কাঠির রহস্যটা কী?

— এবার যেটা বলব সবটাই অনুমান। সিগারেট ধরাবার পর অ্যাশট্রে হোল্ডারে রেখে দেওয়া হয় এবং একটা কাঠি খুব কায়দা করে ঠিক সিগারেটের মাঝ বরাবর আড়াআড়ি করে ঠেকিয়ে রাখা হয়। তারপর সিগারেটটা জ্বলতে জ্বলতে এক সময় মাঝবরাবর এসে দেশলাই কাঠির বারুদের সংস্পর্শে আসে, ফলে....

—ওহ্ ফাইন। গুরু এবার বুঝেছি আগুনের সংস্পর্শে এসে বারুদ জ্বলে ওঠে যে আগুন আমরা দ্বিতীয়বার দেখি। আমরা ভাবছিলাম বুঝি আর একটা সিগারেট ধরানো হল, কিন্তু তা নয় আগুন দ্বিতীয়বার জ্বলে ওঠার আগেই লোকটা গাড়ি থেকে নেমে পালিয়ে যায়। আর দপ্ করে আগুন জ্বলার ফলে, সিগারেটের মুখটা কালো হয়ে যায়। কাঠিটা জ্বলতে জ্বলতে শেষ পর্যন্ত অ্যাশট্রের গায়ে নেতিয়ে পড়ে নিভে যায়। আচমকা জ্বলার ফলে সিগারেটের লম্বা ছাই অ্যাশট্রের মধ্যে পড়ে যায় আর সিগারেটটা অনেকক্ষণ না টানার ফলে এক সময় নিভে গিয়ে যেমন অবস্থায় রাখা হয়েছিল, সেই অবস্থায় থেকে যায়, কী, ঠিক বলেছি তো?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু

—আবার কিন্তু?

—আছে বৎস, আরো অনেক কিছু দেখার আছে। এগুলো কী তালুকদারবাবু?

—ঠিক তাই। আপনি যা অনুমান করেছেন, রক্ত। ওটা আমার আগেই চোখে পড়েছে।

—একটুখানি নয়, অনেকটা।

— সেকি, দীপু বেশ বিস্মিত হয়ে বলল, রক্ত? কোথায়?

—দেখ ভাল করে দেখ।

দীপু প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ড্রাইভারের সীটের পাশে সোফার ওপর বেশ কয়েক ফোঁটা রক্ত। শুকিয়ে গেছে। যেহেতু কুশনের রঙটা ডিপ রাফ্ কালারের সেই হেতু চট করে শুকিয়ে যাওয়া রক্ত বোঝা যায় না। বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে দীপু বলল, —অবিশ্বাস পাদানিতে তো আরো অনেক বেশি পড়ে রয়েছে। কি ডেঞ্জারাস পাবলিক মাইরি।

—হ্যাঁ। ডেঞ্জারাস না মিস্টেরিয়াস সেটা সময় বলবে।

—তার মানে, মার্ডার?

—মার্ডার কি না জানি না তবে রক্তপাত তো বটেই, কী বলেন ব্যানার্জি সাহেব?

—উত্তরে নীল বলল, পরে আসছি। তার আগে চলুন একটু সরেজমিনে তদন্ত করি। দীপু ওপাশের দরজাটা খোল।

দীপু দরজা খুলে দিতে বিকাশ তালুকদার নেমে ওপাশে চলে গেলেন।

নীল বলল, —কী দেখেছেন? না আপনি না, দীপু বল, সবকিছু দেখে তোর কী মনে হচ্ছে।

চোখ কুঁচকে, দৃষ্টিটাকে সরু করে দীপু বলল,—টোটালি একটা ধস্তাধস্তির চিহ্ন রয়েছে। কারণ ব্যাকসীটের কাপড় কোঁচকানো। এক জায়গায় তো কাপড়টা নিচের দিকে খানিকটা নেমে এসেছে।

—তারপর?

—একটা লেডিজ শাল। দেখেই মনে হয় বেশ দামি। কার জানি না।

—বেশ, তারপর?

—পাদানিতে একটা লোহার রড। অনেকটা শাবলজাতীয়। এবং....

—হ্যাঁ, এবং টা কী?

—দাঁড়াও, একটু ভাল করে দেখি। ইয়েস একটা হাল্কা পিঙ্ক কালারের কাজ করা লেডিজ রুমাল রুমালে ইংরেজি মনোগ্রাম করা, 'এস্'। অবশ্য এরকম বিভিন্ন অ্যালফাবেটে মনোগ্রাম করা সৌখিন রুমাল নিউমার্কেটে কিনতে পাওয়া যায়।

—আর কিছু আছে, দেখাব বা অনুমান করাব?

—নাহ্, সেরকম তো আর কিছু চোখে পড়ছে না।

—তালুকদারবাবু আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কি আর কিছু আভাস পাচ্ছে?

বিকাশ তালুকদার কিছু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন,—আর কোনো সূত্রের কথা কী বলতে চাইছেন?

—হ্যাঁ ঠিক তাই।

—না আর আমার তেমন কিছু নজরে আসছে না।

—এটা কিন্তু দীপু তোর বলা উচিত ছিল।

—কী জানি, আর তো আমার মাথায় কিছু ভিড়ছে না।

—একটা গন্ধ, মিষ্টি মিষ্টি অথচ চড়া।

বিকাশ আর দীপু দুজনেই নাক টেনে গন্ধ নেবার চেষ্টা করল।

বিকাশ বললেন পারফিউমের গন্ধ। মনে হচ্ছে বেশ দামি গন্ধ।

—হ্যাঁ, খুবই দামি পারফিউম। ফলে গন্ধটা এখনও আছে। আর যেহেতু গাড়ি বন্ধ ছিল, গন্ধটা সব উবে যায়নি।

হঠাৎ দীপু সোল্লাসে প্রায় লাফিয়ে উঠল, —গুরু এ তো চেনা গন্ধ। কোথায় পেয়েছি যেন, ইয়েস স্মিতা পাতিলের ঘরে।

—স্মিতা পাতিল?

—ধুৎ, খালি ভুল হয়ে যায়, স্মিতা গুহ। সিঁড়ি বেয়ে স্মিতা যখন আমাদের সামনে এসে বসলেন, তখন ওনার গা দিয়ে এই গন্ধটা ভুর ভুর করে বেরুচ্ছিল।

—কারেক্ট।

—কিন্তু সে গন্ধটা এখানে আসবে কী করে?

—কেন, আসতে পারে না? রজত গুহ কী ঐ একই সেন্ট ব্যবহার করতে পারেন না?

—হ্যাঁ তা পারেন, তবে, ঐ এস লেখা রুমাল, দীপু বললো।

—তুই কী বলতে চাইছিস?

—তুমি শুনলে হাসবে।

—আহ্, শুনিই না।

—আমার মনে হচ্ছে রজত গুহকে মার্ডার করা হয়েছে। এই গাড়িতেই এবং সেটা স্মিতা পাতিল, না স্মিতা গুহরই কাজ।

—কোন্ যুক্তিতে? গাড়ির মধ্যে 'এস' লেখা রুমাল? একটা দামি লেডিজ শাল? স্মিতা যে পারফিউম ব্যবহার করেন সেই পারফিউমের গন্ধ? আর ড্রাইভারের সীটের পাশে এবং পাদানিতে রক্তের দাগ দেখে?

—তা নয় বলছ?

—আমি এখন তেমন কিছু বলছি না। তবে যেসব সূত্র পাওয়া গেল তা দিয়ে ডাইরেক্ট স্মিতা গুহকে সন্দেহ করা যায় না।

—কারণ?

—খুনের কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা তা হলফ করে বলা যাচ্ছে না। আচ্ছা ধরে নেওয়া যাক, গাড়ির মধ্যে কেউ একজন আক্রান্ত হয়েছে। সে যেই হোক। লোহার রডটা থাকার জন্য মনে করা যেতে পারে ঐ লোহার রড দিয়ে আক্রান্তের মাথায় আঘাত করা হয়েছিল। কিন্তু কত জোরে আঘাত

করলে একটা মানুষের মাথা ফেটে অত রক্ত বেরোতে পারে? নিশ্চয়ই হাত ঘুরিয়ে সজোরে আঘাত করা হয়েছিল। তা হাতটাকে ঘোরাতে গেলে তো একটা মিনিমাম স্পেসের দরকার। সেটা কী একটা অ্যামবাসাডারের ব্যাকসীটে বসে করা সম্ভব? তাও একজন মহিলার পক্ষে? বিশেষ করে সে মহিলা যখন বেশ ক্ষীণাঙ্গী এবং শারীরিক ভাবে দুর্বল।

—কিন্তু, বলে দীপু খুঁতখুঁত করতে চাইছিল। নীল হাত তুলে ওকে থামিয়ে বলল, - আরো আছে। যদি রজত গুহ আক্রান্ত হয়ে থাকেন, তাহলে সেটা হয়েছিল, গতরাত্রে উনি এখানে গাড়ি চালিয়ে আসার পর। যতই আলো, অন্ধকার, আর কুয়াশা থাকুক, অন্তত গাড়ির মধ্যে কোনো ধস্তাধস্তি বা আক্রমণের ব্যাপার স্যাপার ঘটলে নীল ব্যানার্জির চোখে তা ধরা পড়তোই। এ ছাড়াও আরো প্রশ্ন থেকে যায় অতর্কিতে যদি রজত গুহ পিছন থেকে আক্রান্ত হয়েই থাকেন, তাহলে আক্রমণকারী কোথায় ছিল এতক্ষণ? গাড়ির মধ্যে? তাহলে তো তাকে সারাদিনই গাড়ির পিছনে বসে থাকতে হয়। যা শুনতে খুবই হাস্যকর। এবং ভাবতেও। তা যদি না হয় তাহলে নিশ্চয়ই এখানে গাড়ি থামার পর আক্রমণকারীকে আসতে হয়েছে, পিছনের সীটে যেতে হয়েছে এবং রজত গুহর অন্যমনস্কতার সুযোগে তাঁকে আক্রমণ করতে হয়েছে। এসব সময়সাপেক্ষ। কখন এলো সে? এলে তো তাকে পিছনের দরজা খুলে ঢুকতে হয়? ধরেই নিলাম স্মিতা গুহ রজতকে খুন করার চেষ্টা করেছেন। তার মানে তাকে এতরাত পর্যন্ত এই নিরালা জায়গায় অপেক্ষা করতে হয়েছে। স্মিতা গুহ জানবেই বা কেমন করে যে রজত অত রাত্রে গাড়ি নিয়ে ওখানেই আসবেন। একে তো দুজনের মধ্যে কোনো সদ্ভাব নেই, বাক্যালাপও বন্ধ। তাহলে? আরো একটা কথা, এরকম একটা নির্জন জায়গায় রাতের অন্ধকারে একজন মানুষকে খুন করার ফন্দীফিকির থাকতেই পারে কিন্তু কোনো দুষ্কৃতকারীই চাইবে না, দুষ্কর্মের পর দেহটাকে হাপিস করার জন্য একটা রিস্ক নেবার কথা। কাজ মিটিয়ে সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। আহত বা নিহত রজত গুহর দেহ সরিয়ে ফেলার অথবা ঝামেলা কাঁধে নিতে চাইবে কেন? না, এর মধ্যে রজতের নিরুদ্দিষ্ট হবার কোনো যুক্তি দেখতে পাচ্ছি না। দিনের আলোয় আমি চারদিকে বেশ ভালো করে দেখেছি কোনো বডি টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবার কোন চিহ্নই দেখতে পাইনি।

বিকাশ তালুকদার অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন। বোধহয় মনে মনে অনেক কিছুই ভাবছিলেন। ভাবতে চাইছিলেন ব্যাপারটা কী হলো? একটা লোক গাড়ি চালিয়ে এতদূর এসে বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল। তাও একজন চতুর গোয়েন্দার চোখে এড়িয়ে। তারপর আরো ইনভেস্টিগেট করে আরো কিছু জটিল অবস্থা তৈরি হলো। কোথায় যেতে পারে লোকটা যদি না মার্ডার হয়ে থাকে? মার্ডার হলেও তো তার বডিটা পাওয়া যাবে। কিন্তু সেটাও কাছাকাছি কোথাও নেই। আর যদি মার্ডার না হয়ে থাকে, তাহলে কেউ তাকে গুম করেছে অথবা সে নিজেই হারিয়ে যেতে চাইছে। এলোমেলো, আপাত অসঙ্গত কিছু সূত্র দিয়ে সবকিছু আরো গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। লোকটির হোয়্যার অ্যাবাউটস সম্বন্ধে কোনো কিছুই সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। কেনই বা সারাদিন পাগলের মত গাড়ি চালানো আর কেনই বা শেষ পর্যন্ত এই নিরুদ্দেশ?

—তাহলে ব্যানার্জি সাহেব এখন কী করা যায়?

—একটা কাজ আছে জীবিত অথবা মৃত রজতকে খুঁজে বার করা। এবং এটা নিশ্চয়ই পুলিসের কাজ।

শেষপর্যন্ত রজত গুহকে খুঁজে পাওয়া গেল। প্রায় সাতদিনের মাথায়। বিকৃত পচাগলা অবস্থায়। আগাছা আর জঙ্গলের মধ্যে একটা নালার ধারে। গাড়িটা যেখানে ছিল সেখান থেকে অন্তত সত্তর পঁচাত্তর গজ দূরে। পুলিসই ওর মৃতদেহ আবিষ্কার করে। এমনিতে চেনার কোনো উপায় ছিল না। চেনা গেল কেবল পরনের জামা-কাপড় এবং প্যান্টের পকেটে তার পার্স আর গাড়ির ডুপ্লিকেট চাবি থাকার জন্যে। মৃতের ঘাড়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল। কোন ভারি লোহার ডাণ্ডা জাতীয় কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। রজত গুহর সঙ্গে যে অ্যাটাচি কেসটা ছিল সেটা অবশ্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

রজতের মৃতদেহ পাবার পরই রহস্য বেশ কয়েকটা কারণে জটিল হয়ে উঠল। আব সেই আলোচনা চলছিল নীলের বৈঠকখানায়।

নীলই কথা বলছিল,—বড় অদ্ভুত আর মজার ব্যাপার দেখুন, একটা লোক সারাদিন ধরে এলোমেলো ঘুরল দামি অ্যাটাচি নিয়ে। মাঝে একবাব অফিস-গেল। গেল খালি হাতে বের হল একটা দামি অ্যাটাচি নিয়ে তারপব একটা নির্জন জায়গায় গাড়ি থামিয়ে বহসাময় ভাবে নিখোঁজ হল। সাতদিন পব তাকে পাওয়া গেল মৃত অবস্থায়। গাড়িতে কয়েকটা সূত্র পাওয়া গেল, যা দিয়ে স্মিতাদেবীব বিপক্ষে কেস সাজানো যায়। তাকে রজত গুহব রহস্যময় মৃত্যুব জন্য দোষী সাবাস্ত কবানোও যেতে পাবে। কিন্তু—

—কিন্তু বলে থামলেন কেন ব্যানার্জি?

—অঙ্কটা যে মিলছে না।

—কি রকম?

—স্মিতা সেখানে গেলেন কী কবে? রজত তো উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুবেছিলেন।

—তা নাওতো হতে পাবে? হয়ত কোনো কাবণে স্মিতা জেনেছিল রজত সে রাত্রে ওখানে যাবে।

—বেশ, তা নয় হল। কিন্তু স্মিতাব মতো বোগা পাতলা এক মহিলাব পক্ষে কি ওইভাবে গাড়ির ব্যাকসীটে বসে রজতকে ঠিক ঘাড়ে আঘাত কবা সম্ভব?

—হয়ত স্মিতা কবেননি, স্মিতাব কোনো লোক তাকে খুন কবেছে।

—তাহলে এই সূত্রগুলোর থাকার কী কারণ? স্মিতাব ব্যবহাব কবা পারফিউম, স্মিতার দামি শাল

বিকাশ খানিকটা পুলিসি চালে জিজ্ঞাসা কবলেন, —আপনি কী করে জানলেন শালটা স্মিতাদেবীব?

—আমাব সঙ্গে ওনাব তাবপবে দেখা হয়েছে। শালেব কথা জিজ্ঞাসা কবতে উনি জানান ঐ বিশেষ শালটি তিনি খুঁজে পাচ্ছে না বেশ কয়েকদিন যাবৎ।

—ওঁব সে বাতেব হোয়াব-অ্যাবাউটস কিছু জেনেছেন?

—হ্যাঁ সাবা ভারতবর্ষে যত জায়গায় ওঁদেব এন্টারপ্রাইসেব ব্রাঞ্চ আছে, সব ব্রাঞ্চের ম্যানেজাবদের নিয়ে একটা জরুবি মিটিং ছিল। মিটিংটা হয়েছিল হোটেল বিজ এ। এবং স্মিতা সেখানে ছিলেন প্রায় রাত এগারোটা পর্যন্ত। সে প্রমাণ আছে। সব থেকে বড় কথা কি জানেন তালুকদারবাবু, ঐ সিগারেটের ব্যাপারটা। ওটা স্পষ্টই একটা সাজানো ম্যাজিক। বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে ঐ ব্যাপাবটা কবা হয়েছে। সে আমাব চোখে ধুলো দেবার জন্যই হোক বা অন্য কোন কাবণেই হোক।

—কাজটা কে করতে পাবে?

—বজতও হতে পাবে।

—রজতেব মোটিভ?

—জানি না। তারপর আছে চাবি। কী-প্লাগে একটা চাবি ঝুলছিল অথচ দরজা লক। এবং বজতের পকেটে গাড়ির ডুপ্লিকেট চাবি, কী এব অর্থ?

—হ্যাঁ, গোলমেলে। ধরা যাক রজতই সমস্ত ব্যাপাবটা সাজিয়েছে। সেই স্মিতার পারফিউম ইচ্ছে কবে ছড়িয়ে বেখেছে। স্মিতাব শাল সবিয়ে নিয়ে গাড়ির মধ্যে রেখে দিয়েছে। কী হোলে চাবি ঝুলিয়ে রেখে ডুপ্লিকেট দিয়ে গাড়ি লক কবে কোন এক সময়ে জঙ্গলেব মধ্যে নেমে গেছে।

দীপু সব শুনে যাচ্ছিল। হঠাৎ ও বলল,—তাহলে গাড়িব মধ্যে অত বক্ত এল কোত্থেকে?

নীল হাসল। তাবপব বলল,—ওটা কোন বক্তই নয়। কি তালুকদাববাবু, আপনার বিপোর্ট তো তাই বলছে?

—হ্যাঁ কেমিকাল ইনভেস্টিগেশনেব বিপোর্ট ওটা কোন মানুষ বা জন্তুব বক্ত নয়। এক ধরনের কেমিক্যাল কম্পোজিশনে রক্তেব মত লাল গাঢ় পদার্থ তৈবি কবা যায়। যেটা রক্তেব মতোই শুকিয়ে গেলে কালচে ধরনেব এফেক্ট আনে।

—যা ব্বাবা, কী বিচ্ছু পাবলিক! আচ্ছা নীলদা, ধবেই নিলুম বজত গুহই সমস্ত ব্যাপারটা সাজিয়েছে, কিন্তু সেই আবাব মার্ডাব হল কেন?

—সেটাই তো ধন্দ! এত কাণ্ড করার পর সে নিজেই মার্ডার হয়ে গেল। আসলে, আমার যদ্দুর ধারণা, লোকটা স্মিতার বিরুদ্ধে কিছু একটা ষড়যন্ত্র করছিল যাতে করে স্মিতাকে আইনের চোখে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। কারণ স্মিতা আর রজত দুজনের সম্পর্ক ভাল নয়। স্মিতা চাইছেন ডিভোর্স। আর কে বলতে পারে, রজত সত্যিই তাকে খুন করতে বা আইনের কাছে ফাঁসিয়ে দিতে চেয়েছিল কিনা? হয়তো সেই কারণেই এত সব তোড়জোড়।

—একটা জিনিস কিন্তু ক্লিয়ার হচ্ছে না গুরু, দীপু বলল, রজত গুহ যা কিছু করেছে, সবই তো টাকা বা সম্পত্তির জন্যে। কিন্তু সে যদি আইনের সামনে প্রমাণ করতে চায় সে মৃত এবং তাকে খুন করেছে স্মিতা, তাহলে হয়তো স্মিতা শাস্তি পাবে কিন্তু রজতের লাভ? মৃত প্রমাণিত হলে, আর তো সে সম্পত্তির অধিকার পেতে পারে না।

—ঠিকই বলেছিস। সেই জন্যই তো সব ব্যাপারটা গোলমেলে। আসলে কে যে কী করতে চাইছে বা চেয়েছে তার কোন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে একটা জিনিস ক্লিয়ার যে এসব কিছুর মধ্যেই একটা গভীর ষড়যন্ত্রের খেলা চলছে।

দীপু আবার বলল, —একটা ব্যাপার আমার অত্যন্ত খারাপ লাগছে। এক মহিলা মৃত্যুভয়ে তোমায় ডেকে পাঠিয়ে ফ্যান্টাস্টিক আমাউন্ট অফার করে একজনের পেছনে ফেউ হিসেবে লাগালো। আর ধম্মের কল দেখ, কিছুক্ষণ পর সেই লোকটাই মার্ডার হয়ে গেল। লোকসান আর কাকে বলে?

—তার মানে?

—একটা দিনও কাটতে দিল না। যেখানে হপ্তা শেষে সলিড্ ইনকাম বিশ হাজার। ভাবলুম দু'চার হপ্তা কাটাতে পারলেই, শালা তোকে এত তাড়াতাড়ি কে খুন হতে বলেছিল?

বিকাশ তালুকদার দীপুর কথায় হেসে ফেলে বললেন,—তুমি তো খোকা নিজের লসটা দেখছো, কিন্তু বেড়ে গেল আমাদের হ্যাপা, এখন রজত খুন নিয়ে উঠে পড়ে লাগতে হবে।

—আর বলবেন না দাদা, আপনাদের যে কত হ্যাপা তা আমি জানি। দু'চারদিন একটু-আধটু তদন্ত করবেন, ব্যাস, তারপরই সব ধামাচাপা।

—পুলিসে তো আর চাকরি করো না, করলে বুঝতে অত সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। তার ওপর আমার আবার একটু তদন্ত-বাই আছে। কোন কেস সলভ্ না হওয়া পর্যন্ত মনের অশান্তি কাটে না।

—ওই জন্যেই আপনার আর উন্নতি হল না।

—খুব খাঁটি কথা বলেছো। তা ব্যানার্জি সাহেব আপনি কী ভাবছেন?

—কী আর ভাবব, নীল বলল, ভাবাভাবির তো কিছু নেই। স্মিতাদেবীকে গিয়ে বলব আর আপনার ভয়ের কিছু নেই। আপনার শত্রু চিরদিনের মতো আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। এবার আমার ছুটি।

—ব্যস? বিকাশের কণ্ঠে হতাশার বেদনা।

—ব্যস নয় কেন? রজত খুনের কিনারা করার দায় এবং দায়িত্ব তো আমার নয়। এ কাজ পুলিস হিসেবে আপনাদের করার কথা।

—মন থেকে বলছেন? এই কেসটায় আপনার ব্যক্তিগত ভাবে কোন ইচ্ছে নেই?

—ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর বয়েস আর নেই। আর খুন-খারাপি দেখতে দেখতে কেমন যেন গা সওয়া হয়ে গেছে। আগে জলজ্যান্ত কোন মানুষের অস্বাভাবিক মৃত্যু দেখলে নিজে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তুম। এখন আর তেমন কোন ইন্টারেস্ট পাই না।

—তার মানে আপনি পুরোপুরি প্রফেশনাল হয়ে যাচ্ছেন? কিংবা বুড়ো।

—যা খুশি বলতে পারেন। কারণ একটা জিনিস আমি বেশ ভাল করে বুঝেছি, নেশাকে পেশায় না আনতে পারলে ভাল কাজ হয় না। দু-একটা তারিফ বা হাততালি বা বাহবা নিয়ে বেশিদিন এগুনো যায় না। যে কোন প্রফেশনেই এটাই সারকথা।

বিকাশ কপালে হাত বোলাতে বোলাতে কিছু একটা ভাবলেন, তারপর বললেন, —আপনার কথা

আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না, কথাটা নির্ভেজাল সত্য। বেশ তো আপনার পারিশ্রমিকের ব্যাপারটা র্দ করা যায় তাহলে?

—তাহলে স্মিতার কথা ভুলে গিয়ে রজত খুন থেকে শুরু করব।

—বেশ আপনি রেডি থাকবেন। দেখি কি করা যায়।

বিকাশ চলে যেতেই দীপু বলল, —একী কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে। নীলদা, তুমি সত্যিই শে পর্যন্ত টাকা না পেলে রজত খুনের ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না?

নীল একমনে সিগারেট খাচ্ছিল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, —তোর কী মনে হয়?

— তোমাকে যতদূর জানি, রজত তোমার মগজে প্রচণ্ড ভাবে চেপে বসে আছে। কেউ কিছু ন বললেও তুমি এর শেষ দেখবেই। মানে তোমার নেচার যা বলে।

নীল মৃদু হাসল। তারপর বলল, —তুই ঠিকই বলেছিস দীপু, রজত আমার মাথায় ঢুকে গেছে ব্যাপারটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জিং রহস্য। বলতে গেলে আমার চোখের সামনেই রজত খু হয়েছেন। একজন সত্যানুরাগী হিসেবে এর শেষ সত্যটা তো দেখতে চাইবই।

—তাহলে তুমি বিকাশবাবুকে ওইসব বললে কেন?

—রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই হবে বলে।

—মানেটা বুঝলাম না।

—পরে বুঝিয়ে দোব। নে এখন চল।

—কোথায় যাবে?

—রজতের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং পাস্ট গতিবিধির খোঁজ নিতে।

—তার মানে তুমি এখনই শুরু করতে চাও?

—হ্যাঁ বৎস, হত্যাকে বেশি পুরনো করতে দিতে নেই। তাহলে অনেক সূত্র হারিয়ে যায়।

—এখন যাবে কোথায়?

—স্মিতা থেকেই শুরু করা যাক।

স্মিতার শান্তিনীড়ে ওরা যখন গিয়ে পৌঁছল তখন প্রায় বেলা বারোটা। চড়া শীতের দিন চলছে বহুদিন কলকাতায় এমন ইংলণ্ডীয় শীত পড়েনি। রোদের দুপুরেও কনকনে হাওয়ায় নাকের ডগা বরফ হয়ে আছে। হাতের তালু অসাড়। ভাগ্যিস রোদটা ছিল। নইলে আরো কষ্ট হত।

সৌভাগ্যক্রমে স্মিতা তখন বাড়িতেই ছিলেন। না থাকারই কথা। কিন্তু ছিলেন। দারোয়ানকে বলতে সে ওদের আগের দিনের বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসাল। আজ আর অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রশ্ন তুলল না। বোধহয় এর আগের দিন মেমসাহেবের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনার সংবাদটা জানে। মিনিট দশেক বসার পর স্মিতা এলেন। সঙ্গে সেই অ্যালসেসিয়ান। হাল্কা লতাপাতা মার্কা একটা সিফন জর্জেট পরেছেন। ঊর্ধ্বাঙ্গে চকলেট রঙের উলেন শাল। আজও সেই পুরনো পারফিউমের গন্ধ ভুরভুর করছে। শরীরে মাংসটাংস অত্যাধিক কম থাকায় সিফন জর্জেটে মনে হচ্ছে বাঁশের গায়ে কোন রকমে একটা কিছু জড়ানো হয়েছে। মুখে পুরুষালি রুক্ষতা। শ্যাম্পু করা চুল আরো বেশি রুগ্ণতাকে প্রকট করে তুলেছে। দীপু আজ ভাল করে তাকালো। নাহ্ সত্যিই এক মহিলা যে এত নীরস এবং রুক্ষ ধরনের হতে পারেন তা ওর ধারণায় ছিল না। শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গে শাল জড়ানোর জন্যে তবু একটু মানানসই ব্যাপার হয়েছে। হাতে একটা প্রায় শেষ হয়ে আসা 'মুর' মহিলার বোধহয় সিগারেটের ছাড়া চলে না। নীলকে দেখে মুখের রুক্ষতা যেন আরো একটু বেশি করে ফুটে উঠল। এমনিতেই অবশ্য মুখ দেখে বোঝা যায় না, উনি কতটা হাসতে পারেন। তবু ব্যবহারে কর্কশতা না এনে বসতে বসতে বললেন,
—আপনি হঠাৎ এ সময়ে? আপনার একদিনের কাজের বদলে পুরো সাতদিনের ফীজ তো আমি মিটিয়ে দিয়েছি। এবং রজত মারা যাবার পর লাস্ট যেদিন আপনি এসেছিলেন সেদিনই তো বলে দিয়েছিলাম আপনাকে আর আমার কোন প্রয়োজন নেই।

—আমি জানি মিসেস গুহ।

—নো, হঠাৎ প্রবল আপত্তিতে প্রতিবাদ জানালেন স্মিতা। আই অ্যাম নো মোর মিসেস গুহ। আপনি আমায় স্মিতাদেবী বলে ডাকতে পারেন, অফকোর্স ইফ য়ু লাইক।

—ঠিক আছে স্মিতাদেবী, তাই হবে। এবং এও ঠিক, আমার আপত্তি সত্ত্বেও আপনি একদিনের কাজ হলেও পুরো এক সপ্তাহের টাকা আমায় দিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কোথাও কোন গণ্ডগোল নেই। বাট, আজ আমি অন্য কারণে এসেছি।

—কান্ট ফলো। প্লিজ এক্সপ্লেন মী দ্য রীজন দ্যাট হ্যাজ ব্রট্ য়ু হিয়ার।

—রজত গুহর মৃত্যু তদন্তের ভার পড়েছে আমার ওপর।

ভ্রূ কোঁচকালো স্মিতার। অবশ্য তা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। তারপর অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বললেন, —রজতের মৃত্যুর তদন্ত? বাট, কে আপনাকে এ কাজে লাগিয়েছে? নিশ্চয়ই আমি নই। আই হ্যাভ আ জেনুইন হেট ফর দ্যাট ম্যান। কে তাকে মারল না মারল আই হ্যাভন্ট এনি ইনটারেস্ট। রজত ইজ নট মাই হেডেক।

—আপনি ঠিকই বলেছেন। কারণ আপনি তো ওর হাত থেকে মুক্তি পেতেই চেয়েছিলেন। আর আপনার কাছে ঈশ্বরের অনুগ্রহের মতো তার মৃত্যু ঘটেছে। যার সঙ্গে কয়েকদিন পর আপনার ডিভোর্স হত, বা হওয়ানোর কথা ভাবছিলেন, তার সম্বন্ধে আপনার হেডেক থাকতে পারে না।

—ইয়েস। ঠিক তাই। সেই কারণেই রজতের সম্বন্ধে কোন প্রশ্নোত্তরে আমি যেতে চাই না।

—দ্যাট আই নো স্মিতাদেবী। কিন্তু রজত গুহর রহস্যময় মৃত্যুর ব্যাপারে পুলিসের কিছু কর্তব্য আছে। দায় আছে। আর পুলিসের তরফ থেকে সে দায় এবং দায়িত্ব আমাকে নিতে হয়েছে। আর সেই দায়িত্ব পালনের জন্যই বোধহয় কিছু প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতে হতে পারে। অবশ্যই দেওয়া না দেওয়া আপনার ব্যক্তিগত অভিরুচি। এবং উত্তর দেবেন কি দেবেন না সেটার দায় এবং দায়িত্ব পরে আপনার ওপরই বর্তাবে এটা বলা বাহুল্য।

স্মিতা চট করে কোন উত্তর দিলেন না। টেবিলে রাখা মুর-ওর প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরালেন। তারপর আনমনে সামান্য কিছু ভাবলেন। এবং ভাবতে ভাবতেই বললেন, —ওয়েল আপনার বক্তব্য আমি বুঝতে পারছি। এবং মৃত্যুটা যখন স্বাভাবিক নয় এবং লীগ্যালি আমি যখন এখনও তার উইডো তখন পুলিসের প্রশ্নের উত্তর তো দিতেই হবে। খুব আপত্তিকর না হলে আমি যা জানি তা জানব।

—থ্যাঙ্কস স্মিতাদেবী। রজতবাবু সম্বন্ধে অল্প বিস্তর একটা স্কেচ আপনার কাছ থেকে পেয়েছি। মোটামুটি তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে কিছু আভাসও পাওয়া যায়। আচ্ছা তাঁর হঠাৎ মৃত্যুর ব্যাপারে আপনার কোন আইডিয়া আছে?

ডানদিকে বাঁদিকে ঘাড় নাড়াতে নাড়াতে স্মিতা বললেন,—না। প্র্যাকটিক্যালি একই বাড়িতে বাস করেও আমরা কেউ কারো ব্যাপারে মাথা গলাতাম না। তবে,

—থামলেন কেন?

—কানাঘুষোর কিছু কথা আমার কানে আসতো। তহবিল তছরুপ ছাড়াও নারীঘটিত কিছু ইনভলভ্‌মেন্ট ওর ছিল সে তো আপনাকে আগেই জানিয়েছি।

—ওঁর অন্তরঙ্গতা কি কোন এক বিশেষ মহিলার প্রতি অথবা বহুনারীতে?

—রিসেন্টলি একটি মেয়ের কথাই শোনা যেত। যার ছবি আমি আপনাকে দিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ দেখেছি। মনেও আছে মুখটি। এ মেয়েটির ঠিকানা আপনার জানা আছে?

—শুনেছিলাম ওদিকে ওর কে এক আত্মীয় আছে।

—আচ্ছা, মিস্টার গুহ সেদিন প্রায় সারাদিনই নানান জায়গায় এলোমেলো ঘোরার পর শেষ পর্যন্ত আমতলার দিকে গিয়েছিলেন। অতরাতে ওদিকে যাওয়ার ব্যাপারে আপনি কিছু বলতে পারেন?

—না।

—মাঝে একবার উনি বয এন্টাবপ্রাইসেব অফিসে যান এবং একটি অ্যাটাচি নিয়ে বেরিয়ে আসে. ওঁর অ্যাটাচিটাও অবশ্য পবে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারেও নিশ্চয়ই কোন আলোকপা. করতে পারছেন না।

—অবশ্যই নয়। তার ব্যক্তিগত অ্যাটাচির ব্যাপারে আমার খোঁজ রাখার কোন কাবণই নেই

—টাকাকড়ি খোয়া যাওযাব কোন সংবাদ আছে কি?

—বলতে পাবব না। অফিস থেকেও সে রকম কোন সংবাদ আসেনি।

—আব একটা কথা, আপনার সেই বোন তিনি এখন কোথায় থাকেন?

—আমাব জানা নেই, খোঁজও বাখি না।

—বজতবাবু যে বাত্রে খুন হন, সে সন্ধ্যায় ছিল আপনাদের ম্যানেজারস কনফারেন্স। রজতবাবু মতো একজন ইমপর্ট্যান্ট ম্যানেজার, সেই সন্ধ্যায় ছিলেন অনুপস্থিত। এ ব্যাপার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে, আপনি কি তাঁব সম্বন্ধে কোন খোঁজ করে ছিলেন?

—না।

—অথচ এটা আপনাব কবা উচিত ছিল যতই কেন আপনারা আন্‌হ্যাপি কাপ্‌ল হোন?

ভ্রূ কোঁচকালো স্মিতাব। তাবপব কণ্ঠে শ্লেষ এনে জিজ্ঞাসা কবলেন, —আপনার কি মনে হয় রজতকে শেষ পর্যন্ত আমিই খুন করেছি?

—না স্মিতাদেবী, আমাব প্রশ্নের মানে তা নয়। অত রাত্রে ওকরম একটা জায়গায় গিয়ে আপনি নিজের হাতে বজতকে খুন করবেন, এটা ঠিক বাস্তব ব্যাপার হল না। তাছাড়া সেদিন তার গতিবিধির কোন ঠিক ঠিকানা ছিল না। তবু,

—আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন বুঝতে পাবছি না।

—না, কিছু না। আচ্ছা বজতকে খুন করতে পাবে এমন কোন সন্দেহজনক ব্যক্তি কি আপনাব সন্দেহেব তালিকায আছে?

—আগেই বলেছি বজত সম্বন্ধে আমাব কোন ইন্টারেস্ট নেই। তবে সে যে ধরনের লোক, তাতে তার শত্রু থাকা অস্বাভাবিক নয়।

—অর্থাৎ, বাইরেব কেউ তাকে খুন করতে পাবে?

—যাব শত্রুব অভাব নেই, সে যে কোন সময়েই খুন হতে পাবে।

—তাতো বটেই। আচ্ছা ধন্যবাদ। আজ তাহলে উঠি।

নীল আব দীপু উঠে দাঁড়াল। ওবা দাঁড়াতেই স্মিতাব পাযেব কাছে শুয়ে থাকা কুকুরটাও উঠে দাঁড়ালো। একবাব এসে ওদেব শুঁকে টুকে আবার নিজেব জাযগায গিয়ে শুয়ে পড়ল।

—বাহ্, বেশ ভালো জাতেব কুকুর। কী বকম বয়েস হতে পাবে এব?

—মনে নেই। তবে অনেক দিনেব কুকুর।

—বজতবাবুব পার্সোনাল চাকবটি কি বাড়িতেই আছে?

—সে চাকবি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

—এ ব্যাপাবে কোন ডায়েবি কবেছিলেন?

—কোন প্রয়োজন মনে কবিনি।

—কবা উচিত ছিল। ঠিক আছে। আজ উঠি।

নীল আর দীপু বেবিয়ে এল।

'শান্তনীড়' থেকে বেবিয়ে নীল আব দীপু হাঁটতে হাঁটতে বাস স্টপেজের দিকে এগিয়ে চলল। বেশ হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছিল। নীলেব মবিস বিগড়েছে। গ্যারেজ থেকে ফিরতে আরো কয়েকদিন সময় নেবে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দীপু জিজ্ঞাসা কবল,—কী বুঝলে গুরু?

—বোঝাবুঝিব জাযগায তো এখনো আসিনি!

—স্মিতা মালটিকে সুবিধের মনে হচ্ছে না।

নীলু ধমকে উঠল,—আঃ দীপু, মহিলাদের সম্বন্ধে ভদ্রভাবে কথা বল।

—মহিলা কোথায়, ও তো প্রায় শাড়ি পরা পুরুষ।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। স্মিতার চেহারা নিয়ে আমাদের আলোচনা না করলেও চলবে। রজত গুহর মৃত্যুর সঙ্গে স্মিতার চেহারার কোনো সম্বন্ধ নিশ্চয়ই নেই।

—থাকতেও তো পারে।

কথাটা দীপু ক্যাজুয়ালি বলেছিল। হঠাৎ নীল থমকে দাঁড়ালো। দীপুর দিকে তাকিয়ে বলল, কী বললি? স্মিতার ঐ চেহারার সঙ্গে রজত গুহর মৃত্যুরহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে। কথাটা কিন্তু ফেলে দেবার মতো নয়।

—কী রকম?

—তা জানি না। তবে হলেও হতে পারে।

—রজত গুহ কেন মরল সেটা বলতে পারব না তবে স্মিতা গুহ যদি মরতো তাহলে খুনির মোটিভ বলে দেওয়া খুবই সহজ। অন্তত আমার ওরকম বউ হলে কবেই আমার হাতে খুন হয়ে যেত।

বাস স্টপেজে এসে নীল বলল,—এই মুহূর্তে আমাদের একজনকে খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। সেই মহিলা, যার সঙ্গে রজতের অন্তরঙ্গতা ছিল।

—আচ্ছা রজতবাবুর অফিসে খোঁজ নিলে হয় না? কিংবা ওর যেন কে একজন পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল।

—আমিও তাই ভাবছি। এখন তো বাজে প্রায় বেলা পৌনে একটা। চল প্রথমেই রয় এন্টারপ্রাইসে হানা দিই। দেখি কোনরকম ভাবে সেই মহিলার কোনো হদিশ পাওয়া যায় কি না।

—কিন্তু কিছু খাওয়া-দাওয়া করে নিলে হত না?

—হবেখন।

বাস এসে গিয়েছিল। ওরা ঝটপট উঠে পড়ল।

রয় এন্টারপ্রাইসে যখন পৌঁছল তখন প্রায় দেড়টা বাজতে যাচ্ছে। আর একটু পরে এলেই লাঞ্চ হয়ে যেত।

বাড়িটায় ঢুকতে ঢুকতে দীপু জিজ্ঞাসা করল, —কার সঙ্গে দেখা করবে?

—কোনো হোমড়া-চোমড়া হলে সুবিধা হবে না, একজন মাঝারি মাপের কাউকে পাকড়াও করতে হবে।

ওরা গেটের মুখে ঢুকতেই বেয়ারা এসে বাদ সাধল, —আপ কিধার যানে মাংতা?

নীল নিজের পরিচয় গোপন করে বলল, —আমরা অনেক দূর থেকে আসছি। তোমাদের অফিসে রজত গুহ বলে কেউ কাজটাজ করেন?

বেয়ারাটা নীলের দিকে সামান্য অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, —আপ কিধার সে আ রাহা হ্যায়?

—দিল্লী। দিল্লীসে। রজতবাবু মেরা দোস্ত হ্যায়। উ সাহেবতো বড়া অফসর্ হ্যায় না?

—থা।

—মতলব?

—কুছদিন পহেলে গুহাসাহাব গুজার গিয়া।

বেশ চমকে-টমকে নীল বলল, —সেকী? কবে? আমরা তো কিছুই জানি না।

নীল চেয়েছিল বেয়ারাটাকে কিছু টাকাপয়সা খাইয়ে ভেতরের কিছু কথা বার করতে। কারণ অফিসের কারো সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে বেয়ারাদের শরণাপন্ন হলে সব থেকে বেশি ফল পাওয়া যায়। কিন্তু লোকটা হয় নিরেট নয় স্যায়না। কোনো বিশেষ কিছুই জানা গেল না। শেষকালে নীল জিজ্ঞাসা করল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করা যাবে কিনা?

বেয়ারাটার বোধহয় এইসব অপ্রীতিকর উল্টোপাল্টা প্রশ্ন ভালো লাগছিল না। সে ওদের সটান

নিয়ে গেল ম্যানেজারের টেবিলে। ভদ্রলোক বাঙালি, নাম অরুণ গাঙ্গুলি। বোধহয় টিফিন খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। নীল আর দীপু যেতেই সামান্য বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে বললেন, —আপনারা?

এবার আর বন্ধুটন্ধু বললে বিশেষ সুবিধা হত না। বিশেষত খাওয়ার পূর্বমুহূর্তে উটকো ঝামেলা কেই বা পছন্দ করে। নীল নিজের আইডেন্টিটি কার্ডটা ওর চোখের সামনে মেলে ধরল। অরুণবাবুর মুখের চেহারা পাল্টালো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ বসুন, বলুন কি করতে পারি?

—রজত গুহ সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। বুঝতেই পারছেন, ওঁর মৃত্যুটা খুবই রহস্যজনক

—হ্যাঁ ঠিক তাই। আমরাও তাই ভাবছিলাম।

—ওনার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু জানার দরকার। নইলে তো পুলিসের পক্ষে মৃত্যুর কারণ জানা সম্ভব নয়, এখন আপনি যদি কিছু সাহায্য করেন।

—ব্যাপারটা কি জানেন, অরুণ সামান্য দ্বিধা নিয়ে বললেন, মিস্টার গুহ রয় এন্টারপ্রাইসে যে পজিশনেই কাজ করুন না কেন, ওনার ব্যক্তিগত পরিচয়টা কিন্তু অন্য।

—আমি জানি, উনি এই কোম্পানির মালকিনের স্বামী।

—তাহলে বুঝতেই পারছেন উনি আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

—তবু, ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকলেও আমরা অনেক সময়ে অনেকের সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ রাখি। বোধহয় মানুষের চরিত্র এটাই।

—আপনি ঠিক কী জানতে চাইছেন?

—শুনেছিলাম রজতবাবু বেঁচে থাকতে কোম্পানির বেশ কিছু টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন। কথাটা কি ঠিক?

—এ ব্যাপারে চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট সঠিক বলতে পারবেন, তবে আমরাও কিছু কিছু কথা শুনেছিলাম

—বিয়িং আ ম্যানেজার

—আমরা বেশ কয়েকজন ম্যানেজার আছি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে। মিস্টার গুহও ছিলেন সেলস এর চিফ একজিকিউটিভ আবার একজন ডাইরেক্টরও বটে। মিসেস গুহর বাবা, মিস্টার রয় বেঁচে থাকতেই রজত গুহকে ডাইরেক্টর করে যান। তবে রায়সাহেবের মৃত্যুর পর কিছু হালচাল পাল্টে যায় মিসেস গুহ কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হবার পর মিস্টার গুহ নামকোয়াস্তে ডাইরেক্টর ছিলেন ওঁর হাত থেকে অনেক ক্ষমতা বলতে পারেন নিয়ে নেওয়া হয়। তবে মেইনলি, বর্তমানে ওঁকে সেলস নিয়ে ডীল করতে হত। সেই হিসেবেই উনি সেলস্ ম্যানেজার।

—উনি কি নগদ টাকাকড়ি হ্যান্ডেল করতেন?

—ঐ পোস্টে হাতে নগদ পেমেন্ট আসার সম্ভাবনা আছে। উনি সে টাকা আত্মসাৎ করতেও পারেন আসলে কি জানেন ওঁদের ইন্টারন্যাল ব্যাপার, আমাদের নাক গলিয়ে লাভ কী? তাছাড়া এটা একটা প্রাইভেট ফার্ম। অনেক কিছু হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

—লোক হিসেবে উনি কেমন ছিলেন?

—খুবই দেমাকি। যদিও অফিসিয়ালি আমার পোস্ট খুব একটা নিকৃষ্টমানের নয়, তবুও উনি আমাদের সঙ্গে তেমন কোনো কথাই বলতেন না। আসতেন, নিজের চেম্বারে ঢুকে যেতেন, কিছু নোট-টোট দেবার থাকলে পি, এ-কে ডাকতেন। কিছু ফোন-টোন করতেন, আর বড় বড় ডীলারদের সঙ্গে কথাবার্তা বা খানাপিনায় ব্যস্ত থাকতেন। প্র্যাক্‌টিক্যালি ওঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবর রাখার সুযোগ এবং ইচ্ছে অন্তত আমার ছিল না।

—তার মানে ওঁর ব্যক্তিগত জীবনও আপনার কাছে অজ্ঞাত।

—একজ্যাক্টলি সো।

—অনেক ফোনটোন তো করতেন বললেন।

—হ্যাঁ, মিসেস সেনশর্মা তো তাই বলতেন।

—সেনশর্মা?

—অপারেটর।

—ওঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে?

—জাস্ট আ মিনিট, বলেই অরুণবাবু ফোন তুলে মিসেস সেনশর্মার সঙ্গে কিছু কথা বললেন। তারপব ফোন নামিয়ে রেখে বললেন, —আপনাকে কাইন্ডলি একটু টেলিফোন রুমে যেতে হবে। কারণ বোর্ড ছেড়ে ওনার পক্ষে

—ওহ্! সিওর।

অরুণবাবু বেল টিপে একজন বেয়ারাকে ডাকলেন—সাহাবকো টেলিফোন রুমমে লে যাও।

ঘব থেকে বেরুবার আগে অরুণবাবু ওদের সঙ্গে সঙ্গে দবজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। তারপরে খুব নিচু স্বরে বললেন, —মিস্টাব ব্যানার্জি আমি হযত খুব বেশি আপনাকে হেল্প করতে পারলাম না। হযতো মিসেস সেনশর্মা আপনাকে বেশি কিছু খবব দিতে পাববেন। তবে. গুহব হোযাব আবাউট্স বেশি জানতে গেলে আপনাকে একজনের কাছে যেতে হবে। লোকটা পুরনো। ও বাড়িব অনেক খবব ওই রাখে।

—কে?

—তার নাম আমি বলতে পারি। শর্ত একটাই। এ ব্যাপারে আমি কিন্তু উহ্য থাকতে চাই।

—ওকে। ডান।

—তারিণীচরণ। শান্তনীড়ের বড় কর্তাব আমলেব লোক। ওকে ম্যানেজ করতে পাবলে আপনি অনেক কিছুই জানতে পারবেন।

নীল ঘুরে দাঁড়িয়ে অরুণবাবুব সঙ্গে করমর্দন কবে বলল, —এই খববটাব জন্যে আপনাকে স্পেশাল ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং কোন মতেই আপনার নাম আমি কবব না। প্রমিস।

মিসেস মণিদীপা সেনশর্মা তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দিতে পাবলেন না। কেবল বললেন বজত গুহ অনেক টেলিফোন কবতেন একথা ঠিকই, কিন্তু আড়িপাতা স্বভাব নয় বলেই উনি এর বেশি আর কিছু জানেন না। নানান প্রশ্নাদির মধ্যে একটি মহিলাব নাম জানা গেল। সুদীপ্তা কর। বজত গুহ নাকি এই মহিলাকে অনেকবার ফোন করেছেন। এবং মেয়েটিবও ফোন এসেছে অনেকবাবই। মণিদীপা বেশ ঘোড়েল মেয়ে। চট্ করে সুদীপ্তার ফোন নাম্বাব দিতে চাইছিলেন না। ঠিক মনে পড়ছে না। খুঁজে দেখতে হবে ইত্যাদি বলে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফোন নাম্বারটা পাওয়া গেল। অবশ্য মণিদীপা প্রদত্ত নাম্বার যদি সঠিক হয়।

ফেরার পথে নীল একবার চিফ অ্যাকাউনট্যাণ্ট মিস্টার ভাওয়ালেব সঙ্গে দেখা কবে নিল। ভাওয়ালের কাছ থেকে জান গেল স্মিতা গুহর অ্যালিগেশন মিথ্যা নয। রজত গুহ কোম্পানির অনেক টাকা বিভিন্ন উপায়ে আত্মসাৎ করেছেন।

সেসব হিসেব এখন সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে পড়ে আছে। আবো একটি খবব পাওয়া গেল। যদিও বজত মৃত্যুর সঙ্গে সে খবরের তেমন সম্পর্ক কিছু নেই। বয় সাহেব কোম্পানির এম. ডি থাকাকালীনই স্মিতাদেবী কোম্পানির একজন ডাইরেক্টর ছিলেন। বিয়ের পবও তিনি সেই পদেই আসীন ছিলেন। কোম্পানির অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁকে সইসাবুদ করতে হোত। হঠাৎ মানে বয সাহেব গত হবাব দিন পনেরো কুড়ির মধ্যে উনি এম. ডি. হন। এবং হঠাৎই পুরনো সই পাল্টে নতুন নমুনায় সই করতে শুরু করেন। অবশ্য তারপর থেকে স্মিতাদেবী একই সই করে আসছেন। শুনে নীল একটু চুপ করে বইল। তারপর বলল, —আচ্ছা স্মিতাদেবী যখন সই পাল্টান, তখন কি রজতবাবু ডাইরেক্টর ছিলেন?

—হ্যাঁ। অবশ্য এর কিছুদিন পরেই উনি সেলস্ প্রমোশন ম্যানেজার হয়ে নিযমিত অফিসে বসা শুরু করেন।

—হুঁ। আচ্ছা কোম্পানির ডাইরেক্টর থেকে সেলস্ প্রমোশন ম্যানেজার হওয়া, এটা ওয়ান কাইন্ড অব ডিগ্রেডেশান, তাই না? তা উনি এটা অ্যাকসেপ্ট করলেন কী করে?

—ঠিকই প্রশ্ন করেছেন। অন্য কেউ হলে হয়তো রিজাইন করতেন। কিন্তু এ ব্যাপারে রজতবাবুর দিক থেকে কোন আপত্তি আসেনি। বরং ওঁকে বেশ খুশিই দেখেছিলাম। শুনেছি উনি নাকি ইচ্ছে করেই ওই পোস্টে এসেছেন। আসলে কি জানেন আমরা হচ্ছি কোম্পানির মাইনে করা চাকর। আর উনি ছিলেন বড়কর্তার জামাই। আদার ব্যাপারি জাহাজের খোঁজ রাখার কোন চেষ্টা করিনি।

—ম্যাডামকেও কোন প্রশ্ন করেননি?

—মানে স্মিতাদেবীকে? না মিস্টার ব্যানার্জি। বললাম না, মালিকদের ব্যাপারে বেশি নাক না গলানোই ভাল। আর সে স্পর্ধাও আমাদের নেই।

—আর একটা প্রশ্ন, স্মিতাদেবী কি নিয়মিত অফিসে যাতায়াত করেন?

—বড়কর্তার আমলে উনি বেশ ঘন ঘনই যাতায়াত করতেন? কিন্তু পরে ওর আসা-যাওয়ার কোন ঠিক থাকতো না। এবং এখনও তাই। তাছাড়া

—তাছাড়া?

—ওঁর বিহেভিয়ারটাও কেমন যেন পাল্টে গিয়েছিল।

—কি রকম?

—আগে উনি এতটা রাফ ছিলেন না। আমাদের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই কোম্পানির আয়-ব্যয় নিয়ে আলোচনা করতেন। কিন্তু রায় সাহেব মারা যাবার পর কিছুদিনের মধ্যেই কেমন যেন পাল্টে গেলেন। ব্যবহার এবং চালচলনও পাল্টে গেল। আমাদের সঙ্গে আলোচনা দূরে থাক, কেমন যেন একটা এড়িয়ে যাওয়া ভাব এসে গিয়েছিল।

—কেন?

—মালিকের মর্জি, এর বেশি কিছু বলার নেই। তবে আমার অনুমান ব্যক্তিগত জীবনে উনি খুব আনহ্যাপি। হয়তো সেই কারণেই কি উনি রাফ্ টাইপ্ হয়ে গিয়েছিলেন?

—সেটা কি ওনার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো না থাকার জন্যে হতে পারে?

—আমার অনুমান তো তাই।

—আপনাদের নজরে কিছু পড়েনি?

—পড়েছে, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

—আচ্ছা, রজতবাবু যে কোম্পানির বেশ কিছু টাকাকড়ি আত্মসাৎ করেছেন সেটা জানার পর স্মিতাদেবীর রিঅ্যাকশান কি হয়?

সজনী ভাওয়াল এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সামান্য সময় চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন,

—সত্যি কথা বলতে কি মিস্টার ব্যানার্জি, ঠিক যে পরিণাম ক্রোধ হওয়া উচিত, তা কিন্তু স্মিতাদেবীর ব্যবহারে আমরা লক্ষ্য করিনি। অবশ্য আপনি বলতে পারেন, স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, ফ্যামিলি স্ক্যান্ডালের ঘটনা, তাই উনি আর এ নিয়ে কোনো হইচই করেননি। তবে কি জানেন, সেই একটা প্রবাদ আছে না, মরতে ম'ল সানাই অলা সেটাই স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে গেল। মিস্টার গুহই টাকা আত্মসাৎ করেছেন। ওনার ইনস্ট্রাকশানেই লক্ষ লক্ষ টাকার চেক হোল্ড করা হয়েছিল। তবু, তার জন্যে রজত গুহর গায়ে কোনো আঁচড়ই লাগল না। কিন্তু সেই নিরীহ অফিসারটি যে কিনা হুকুমের চাকর, তার চাকরিটা চলে গেল।

হাসতে হাসতে নীল বলল, —নতুন কিছু নয় ভাওয়াল সাহেব। সভ্যতার শুরু থেকে এই রে চলেছে। যাই হোক, আপনার ইনফরমেশনের জন্যে ধন্যবাদ।

রাস্তায় নেমে নীলকে বেশ গম্ভীর দেখাল। ও কি ভাবছে না ভাবছে বাইরে থেকে চট করে বোঝা যায় না। দীপু আড় চোখে একবার তাকিয়ে বলল, —গুরুকে খুব চিন্তিত দেখছি। কী ভাবছ?

—অনেক কিছুই, আবার কিছু না। আসলে সব ব্যাপারটাই গোলমেলে আর এলোমেলো।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—কর।

—স্মিতা পাতিল, ধুৎ স্মিতাদেবী যদি ফ্যামিলি স্ক্যান্ডাল বাইরে ছড়াতে না চাইবেন, তাহলে তোমার কাছে এতসব বলতে গেলেন কেন?

—হয়তো সহ্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

—কিন্তু একটা সলিড গুল ঝেড়েছে, সে তুমি যাই বল।

—কী?

—আমাদের কাছে বলল এ নিয়ে অফিসে বেশ হইচই হয়েছে, উনি অ্যাকাউন্ট্যান্টদের নিয়ে আলোচনা করেছেন, রজতবাবুর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করেছেন, ইত্যাদি, কিন্তু মিস্টার ভাওয়ালের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল, এ সব কিছুই হয়নি। তাহলে?

—বললাম না সবই গোলমেলে।

—এখন কী করবে?

—সুদীপ্তা করকে খুঁজে পেতে হবে। আর বৃদ্ধ তারিণীচরণকে পাকড়াও করতে হবে।

—পাকড়াও মানে অ্যারেস্ট?

—দূর বোকা, অত সহজে কি কাউকে অ্যারেস্ট করা যায়? লোকটা কেমন তা জানি না। শান্তনীড়ে তাকে একদিনের জন্যেও দেখিনি। যদি খুব খিটকেল বুড়ো হয় তাহলে তো ফন্দিফিকির করে কথা বার করতে হবে। দেখা যাক।

দিন দু'তিন পর বিকাশ তালুকদার এসে হাজির। হাতে একখানা ভাঁজ করা কাগজ। নীলের দিকে কাগজটা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, —রজত গুহ নিরুদ্দেশের সমস্ত তদন্তের দায়িত্ব পুলিসের তরফ থেকে আপনাকে দেওয়া হচ্ছে। সমস্ত রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া আছে। আর তো কোনো অভিযোগ নেই। এবার পুরোদমে লেগে পড়ুন।

নীল কিছু বলার আগেই দীপু বলল, —বিকাশদা আপনি কি ভাবছেন আপনাদের অনুমতির অপেক্ষায় নীলদা চুপচাপ বসে আছে? আমার তো মনে হয়, অবশ্য গুরু আমার কাছে তেমন কিছু ভাঙতে চায় না, তবু বলছি প্রায় সিক্সটি পার্সেন্ট কাজ দাদা এগিয়ে নিয়ে গেছে।

হাঁই হাঁই করে উঠলেন তালুকদার, —বলেন কী মশাই! ডুবে ডুবে জল খেয়ে চলেছেন, আমাকে কিছু জানাননি তো।

—আরে ও পাগলের কথা ধরবেন না। কিছুই এগোইনি। অগাধ জলের মধ্যে ভাসাভাসা কিছু সন্দেহ মনের মধ্যে জট পাকাচ্ছে। এর বেশি কিছু নয়। অবশ্য পুলিসের তরফ থেকে আমাকে কিছু করতে বলা না হলেও, আমার নিজের তাগিদেও আমি কেসটা নাড়াচাড়া করতাম। কারণ, সত্যি কথা বলতে কি দুর্ঘটনাটা প্রায় আমার চোখের সামনেই ঘটেছিল। আর কিছু না হোক, বিবেক দংশন বলে তো একটা কথা আছে।

—সে আমি জানি। তা আমি কি আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি?

—একটা মেয়েকে খুঁজে বার করতে পারবেন?

—মেয়ে? এই বুড়ো বয়েসে মেয়ের পেছনে ছুটতে হবে?

—প্রেম করার জন্যে নয়।

—বড় ইচ্ছে ছিল, সেই ছোটবেলা থেকে, একটা প্রেম করার। আমার এক ছেলেবেলার বন্ধুকে জানি, গণ্ডায় গণ্ডায় প্রেম করেছে, বোধহয় এখনও করে। আমার বরাতে মশাই সারা জীবনে একটা প্রেমও এল না।

দীপু হাসতে হাসতে বলল, —কেন, বউদি?

—দূর ছোঁড়া, বিয়ে করা বউয়ের সঙ্গে প্রেম? হয় নাকি?

—হয় না?

—না। তোমারও বরাতে প্রেম-ট্রেম আছে বলে তো মনে হয় না। সটান বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে

আগে বস, তারপর বছরখানেক পর এসে বোলো বউয়ের সঙ্গে কেমন প্রেম জমেছে।

—নীলদা, তোমার তালুকদাব সাহেব আমার সম্বন্ধে তো দেখছি কিছুই খবর রাখেন না।

—তুমি কি এমন তালেবর ছোকরা, যে তোমার হাঁড়ির খবর রাখতে হবে?

অনেকক্ষণ পর নীল মুখ খুলল,—তালুকদারবাবু পয়েন্টটা যে ঘুরে যাচ্ছে। না মশাই, প্রেম করার জন্যে বা বুড়ো বয়সে চরিত্র নষ্ট করতে আমি একটি মেয়ের পেছনে ছুটতে বলছি না। কিন্তু ঐ মেয়েটিকে পাওয়া খুবই জরুরি। রজত খুনের হয়তো অনেক হদিশই পাওয়া যাবে, এই মেয়েটিকে পেলে।

—মেয়েটি কে?

—খুব সম্ভবত বজত গুহর অন্তরঙ্গ বান্ধবী। মানে,

—বুঝেছি। কী নাম?

—সুদীপ্তা কর।

—ছবি-টবি আছে?

—হ্যাঁ আছে, বলে পার্স থেকে সুদীপ্তাব ছবিটা বার কবে তালুকদার হাতে দিতে দিতে বলল —কাজটা জরুরী। আর কলকাতায় পুলিসের কাছে এটা কোনো কাজই নয়।

—ছবিটা আপনাদের লাগবে না?

—মুখটা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।

—ঠিকানা-টিকানা তো জানা নেই?

—না। তাহলে তো আমিই খুঁজে নিতাম। তবে একটা ফোন নাম্বাব আছে। দু-তিনবার আমি ট্রাই করেছিলাম, কিন্তু নো রিপ্লাই।

—অলরাইট, আর কিছু?

নীল কী যেন বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। দীপু গিয়ে ফোনটা ধরল। দু-একটা প্রশ্ন করার পর ফোনেব মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, —নীলদা তোমার ফোন।

—কে?

—নাম বলল তপন বসু। তবে এও বলল শুধু নামে তাকে চেনা যাবে না। তোমার সঙ্গে ব্যক্তিগত দবকার।

নীল উঠে গিয়ে ফোন ধবল। দীপু ফিরে এসে সোফায় বসতে বসতে বলল, —হ্যাঁ, প্রেমেব কথা যেন কী বলছিলেন?

—তোমার মুণ্ডু বলছিলুম। মিস্টাব ব্যানার্জি ছিলেন বলে উতরে গেলে, নইলে,

—আপনি অযথা রেগে যাচ্ছেন তালুকদার সাহেব, আমি বলতে চাইছিলাম

—তোমায় কিছু বলতে হবে না। রকবাজি আব মস্তানি করে জীবন কাটিয়েছ এখন চেষ্টা কর ব্যানার্জি সাহেবেব সঙ্গে থেকে, যদি এ লাইনে কিছু করতে পার। তবে মনে হয় না কিছু হবে। যেমন আমার কিছুই হয়নি। এ লাইনে ফার্স্ট কথা হল ব্রেন ম্যাটার থাকা চাই, নইলে হবে অষ্টরম্ভা।

বিকাশবাবু আর কিছু না বলে কাগজটা টেনে নিতে যাচ্ছিলেন। নীল ফিরে এল। সোফায় বসতে বসতে একবার তাকিয়ে নিল দুজনের দিকে। তাব মুখ বেশ উদ্ভাসিত। দীপু বলে উঠল, —কী হল গুরু, মুখের স্কেচ বেমালুম পাল্টে গেছে। এনি গুড নিউজ?

ঘাড় নাড়তে নাড়তে নীল বলল, —ঈশ্বব-টিশ্বর বলে বোধহয় কেউ আছেন। চারিদিকে যখন দিশেহারা অবস্থা তখন মাঝে মাঝে আলোর দেখা পাওয়া যায়। খানিকটা দৈব ঘটনার মতো। তপন বসু বলে এক ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু মালটি কে?

—রজত গুহর প্যাঁচে পড়ে যে লোকটার রয় এন্টারপ্রাইস থেকে চাকবি চলে গিয়েছিল।

—তোমার সঙ্গে তার আবার কী দরকার?

—কিছু ভাঙল না। আসছে এখুনি। ঠিকানা নিয়ে নিয়েছে।

বিকাশবাবু এদের দুজনের কথাবার্তা তেমন হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলেন না। তিনি খানিকটা বিহ্বল হয়েই বললেন,— চাকরি যাওয়ার ব্যাপারটা কী ব্যানার্জি সাহেব?

—সে সব অনেক কথা, পরে বলবো। আপাতত আপনি সুদীপ্তার খোঁজ করুন। মেয়েটিকে পাওয়া বিশেষ দরকার।

—ঠিক আছে। আজ উঠি। তাড়াও আছে।

বিকাশ চলে যাবার প্রায় মিনিট কুড়ি পর তপন বসু হাজির হলেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত চেহারা। ইনি যে এককালে একজন অফিসার ছিলেন তা বোঝাই যায় না। চেহারায় এবং পোশাকে দারিদ্র্যের চিহ্ন বর্তমান। মুখে-চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ। বেশ বোঝা যায় চাকরি চলে যাওয়ায় বিব্রত। মুখে দু একদিনের না কামানো দাড়ি। চুল এলোমেলো। বয়েস প্রায় চল্লিশের ঘরে। নীল একটু আগে পরিত্যক্ত বিকাশবাবুর জায়গায় ওঁকে বসতে বলল। তপন বসু বসতে বসতে বললেন, —আপনিই নীলাঞ্জন ব্যানার্জি। নমস্কার। শুনলাম রজত গুহ মিসহ্যাপের ব্যাপারটা নিয়ে আপনিই ডীল করছেন।

—কার কাছে শুনলেন? এটা তো রাষ্ট্র হবার মতো কথা নয়।

ভদ্রলোক একবার নীলের দিকে তাকিয়ে বললেন, —সব বলব বলেই এসেছি। খুবই গোপনীয়। কিন্তু ইনি?

—আমরা একসঙ্গে কাজ করি। আপনি সব কিছু খুলে বলতে পারেন।

—বেশ। আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন করে আমি জানলাম যে এই কেস আপনি ডীল করছেন। এ কথার সরাসরি কোন জবাব আমার কাছে নেই। তবে আমার কথাগুলো শুনলে বুঝতে পারবেন সব কিছুই। রয় এন্টারপ্রাইসে আমার চাকরি প্রায় উনিশ বছর। সামান্য কেরানি হয়ে ঢুকেছিলাম। নিজের যোগ্যতায় শেষ পর্যন্ত জুনিয়ার অফিসার পর্যন্ত হয়েছিলাম। কিন্তু যা মাইনে পেতাম তাতে স্ত্রী, বুড়ি মা, দুই ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে আজকের দিনে সংসার চালানো বেশ মুশকিল ব্যাপার। টানাটানির শেষ ছিল না। তবু কোনরকমে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু একদিকে দারিদ্র্যের অভিশাপ। আর অন্য দিকে সামান্য কাজে লোভের হাতছানি। কয়েকটা চেক মনের ভুলে ড্রয়ারে ফেলে যাওয়া। আর তার জন্যে নগদ রোজগার। পারিনি রজত গুহর প্রপোজাল নস্যাৎ করে দিতে। মাত্র কমাসেই সামান্য একটু অসৎ হয়ে বেশ কিছু টাকা পেয়েছিলাম। কিন্তু তার পরিণতি যে এত ট্র্যাজিক হবে তা ভাবিনি। কিছুদিনের মধ্যেই সব ধরা পড়ে গেল। রজত গুহ বলেছিল কোন ভয়ের কিছু ওই, উনি সব ম্যানেজ করে দেবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে লোকটা আমার ঘাড়েই সব দোষ চাপিযে দিল। আমি নাকি ইচ্ছে করেই চেক আটকে রেখে পার্টির কাছ থেকে টাকা খাচ্ছি। ফলে চাকরি গেল। আর ঐ লোকটা বেমালুম হাজার হাজার টাকা কামিয়ে নিয়ে আমার দিকে ফিরেও তাকালো না।

তপন বসুকে থামিয়ে দিয়ে নীল জিজ্ঞাসা করল, —এসব কথা আমরা জানি। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর আপনি দেননি।

—বলছি, চাকরি চলে যাবার পর প্রথম কয়েকমাস চালিয়ে নিয়েছিলাম কিন্তু অর্থাভাব আর সহ্য করতে না পেরে গিয়েছিলাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিসেস গুহর কাছে। ওনার কাছ থেকেই জানতে পারি রজতবাবুর খুনের ব্যাপারটা আপনিই দেখাশুনো করছেন।

—বুঝলাম, কিন্তু আমার কাছে এসে আপনার লাভ কী? আপনার রাগ তো রজতবাবুর ওপর।

—হ্যাঁ। খুন না হলে আমি নিজেই একদিন ওকে খুন করতাম। লম্পট, জোচ্চোর, ইতর লোক একটা।

—তা না হয় হল, কিন্তু রজতবাবুর ওপর রিভেঞ্জ আপনি তো কোনদিনই নিতে পারবেন না। লোকটাই তো মরে গেছে।

—হ্যাঁ। আফশষ রয়ে গেল, নিজের হাতে লোকটাকে শাস্তি দিতে পারলাম না। সে যাইহোক, মড়ার ওপর রাগ রেখে কোন লাভ নেই। তবে একটা বিশেষ গোপন সংবাদ দেবার জন্যেই আপনার

কাছে আমার আসা। এতে আমার কোন উপকার হবে না। তবে এই রজত গুহ মার্ডারেব ব্যাপারে আপনার কিছু সুবিধে হতে পারে।

—কী রকম?

—রজত গুহ লোকটা এমনিতে খুবই শয়তান। কিন্তু মদের টেবিলে লোকটা যেন অন্যরকম হয়ে যেত। পেটে দু পেগ গেলেই, হড় হড় করে মনেব কথা বলে যেতো। একদিন মদ খেতে খেতে লোকটা আলটপকা কয়েকটা কথা বলেছিল। সেদিন অত গুরুত্ব দিইনি, কিন্তু মার্ডার হবার পর মনে হচ্ছে, কথাগুলো জানলে পুলিসের অনেক সুবিধে হবে।

—তার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস কবি, আপনিও কি মদ্যপান করেন?

—কেউ খাওয়ালে। নিজের অত পয়সা কোথায়? রজত গুহই আমাকে মাঝে মাঝে বারে নিয়ে যেত। আসলে আমাকে হাতে রাখার জন্যে। লোকটা নিজের স্বার্থে সব কিছুই করতে পারতো।

—বেশ এবার বলুন রজতবাবু আপনাকে কী বলেছিলেন?

—অসংলগ্ন সব কথাবার্তা। যেমন স্মিতা গুহকে উনি গদিচ্যুত করবেন। স্মিতাদেবীর নাকি অনেক বাড় বেড়ে গেছে। তারপর একদিন বলেছিলেন, বড় ভুল হয়ে গেছে। একদিন সবকিছু ফাঁস করে দেবো, এইসব আর কি?

—আর কিছু না?

—একদিন বলেছিলেন, স্মিতাদেবী নাকি ওকে খুন করার ধান্দা করেছেন। সুদীপ্তাকে নাকি সেই কারণেই স্মিতাদেবী লাগিয়েছেন।

—কী নাম বললেন, সুদীপ্তা?

—হ্যাঁ সুদীপ্তা কর।

—চেনেন তাকে?

—না চেনার কী আছে? আমাদের অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবে অভিনয় করতে আসতো।

—সুদীপ্তা অভিনেত্রী?

—অ্যামেচার ক্লাবে বা অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবে অভিনয় করে। শুনেছি দু একটা সিনেমা-টিনেমায় নাকি নেমেছে। ইদানীং সিরিয়াল টিরিয়াল কবছে।

—আপনাদের রজত গুহর সঙ্গে মহিলার সম্পর্ক ছিল?

—লম্পট ডিবচ টাইপের লোক। শুধু সুদীপ্তা কেন আরও বহু মেয়ের সঙ্গেই রজত গুহর যোগাযোগ ছিল।

—তাব মানে আপনার বক্তব্য অনুসারে সুদীপ্তাব ঘনিষ্ঠতা একটা অভিনয়?

—নিঃসন্দেহে। কারণ মহিলার স্বামী থাকা সত্ত্বেও অনেক পুরুষের সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল।

—স্বামী আছে কী করে জানলেন?

—সিঁদুব দেওয়া সিঁথি দেখে আর কী ভাবা যায বলুন?

—রজত গুহর সঙ্গে মেলামেশাটা অভিনয় বলছেন কেন?

—রজত গুহর ভারসান অনুযায়ী।

—কিন্তু সে তো মদের ঝোঁকে!

—মদেব ঝোঁক যে নয তা তো প্রমাণ হয়ে গেল। রজত গুহ খুন হয়েছে। আর আমার যদ্দুর ধারণা ঐ সুদীপ্তাই ওকে খুন কবেছে।

—সুদীপ্তার ঠিকানাটা জানেন?

—ঠিকানা তো আমি বলতে পাবব না। হয়তো রিক্রিয়েশন ক্লাবেব সেক্রেটারি বলতে পারবেন. তবে,

—তবে?

—স্মিতাদেবীর বাড়ি আমি যেদিন গিয়েছিলাম, সেদিনই গেটে ঢুকতে যাওয়ার মুখেই দেখি সুদীপ্তা

শান্তনীড়' থেকে হনহন করে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় স্মিতাদেবীর সঙ্গে সুদীপ্তার নিশ্চয়ই কোন যোগাযোগ আছে। রজত গুহর অনুমান হয়তো ঠিক।

নীল মাথা নিচু করে কিছু ভাবছিল। তারপর হঠাৎ-ই ও জিজ্ঞাসা করল, --আপনার নিশ্চয়ই যা বলার সব বলা হয়ে গেছে। এবার আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে। স্মিতাদেবীর কাছে আপনি তো গিয়েছিলেন, আবার চাকরিটা ফিরে পাবার জন্যে, তা উনি কোন আশ্বাস দিয়েছেন?

—আশ্বাস কী বলছেন, দূর দূর করে প্রায় তাড়িয়ে দিলেন।

—কেন?

—রজতের সঙ্গে হাত মেলানো লোকের সঙ্গে উনি কোন কথা বলতে চান না, তাই।

—তার মানে আপনার এ কূল ও কূল দু'কূলই গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তপন বসু বললেন, সে তো অনেকদিনই গেছে, এখন শেষ চেষ্টা হিসেবে যাওয়া।

—আপনার রাগ হয়নি স্মিতাদেবীর ওপর?

—ওনার ওপর রাগ করে কী লাভ বলুন? সব দোষ আমার লোভ আর ভাগ্যের। তবে লঘু পাপে গুরুদণ্ড পেলাম, এই আর কি।

—আপনি তো উনিশ বছর এই কোম্পানিতে চাকরি করছেন, নিশ্চয় স্মিতাদেবীকে এর আগেও দেখেছেন?

—আজ্ঞে সে তো বটেই।

—কোন পরিবর্তন, আই মিন আগের স্মিতার সঙ্গে আজকের স্মিতার?

—পরিবর্তন? হ্যাঁ তা কিছু পরিবর্তন তো ঘটবেই। আসলে ওঁর মধ্যে আগের সেই কোমল স্বভাবটা আর নেই, এখন অনেক পাল্টেছেন। আমাদের মতো চুনোপুঁটি অফিসারের সঙ্গে ভাল করে কোনদিন কথাই বলেননি। এটা আরো বেশি প্রকট হয়েছে বড়সাহেব মারা যাবার পর। হয়তো রজতবাবুর দিকে থেকে পাওয়া আঘাতের জন্য এটা হতে পারে।

—আপনি কি স্মিতাদেবীকে সন্দেহ করেন?

—ঠিক সন্দেহ নয়, তবে গুহর আশঙ্কাটা ফলে গেল, তাই একটা খট্‌কা লাগছে। তাছাড়া সুদীপ্তার মতো একজন সাধারণ মেয়ের ও বাড়িতে যাতায়াত,

—আপনি তো একদিনই ওকে বেরুতে দেখেছেন?

—তা অবশ্য ঠিক। হয়তো আমার সন্দেহটাই ভুল সন্দেহ।

—আপনার এখন চলে কী ভাবে?

—চলছে না। কয়েকটা টিউশনি করি, এই মাত্র।

—ঠিক আছে তপনবাবু, মোটামুটি আপনার দেওয়া খবর আমাকে কিছুটা সাহায্য করবে। এর জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের একটু দরকারি কাজে বেরুনোর ছিল, যদি কিছু মনে না করেন,

—না না সে কী। আমার নেই কাজ তো খই ভাজ অবস্থা। তাই চলে এলাম। ঠিক আছে, আমি তাহলে উঠি।

তপনবাবু নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন। হঠাৎ দীপু বলে উঠল, --কী ব্যাপার গুরু, ফুটিয়ে দিলে কেন লোকটাকে? তুমি তো সাধারণত এরকম করো না।

—লোকটা ঠিক কী কারণে এসেছিল বল তো?

—তোমায় বিশেষ একটি সংবাদ দিতে।

—সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি, মূলত কী?

—আরে তাইতো। আড় চোখে একদিকে তাকিয়ে থেকে ভাবতে ভাবতে বলল, ঠিক কী বলতে এসেছিল? রজত গুহ লোকটা ওকে কতটা বিট্রে করেছে, অথবা রজত গুহর মৃত্যুতে ও বেশ খুশি হয়েছে, নাকি স্মিতাদেবী ওকে আবার চাকরিতে বহাল না করে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে

স্মিতার ওপর কিছু সন্দেহ ছড়িয়ে দেওয়া? ব্যাপারটা বুঝলাম না। তবে এটা ঠিক লোকটা দুদশায় পড়েছে। নতুন কিছু ফায়দা লুটতে চাইছে বলছ?

—জানি না। তবে এই মুহূর্তে বড় দরকার সুদীপ্তা করকে। সত্যিই যদি ওর সঙ্গে রজত গুহর কোন সম্পর্ক থেকে থাকে তাহলে সে কেন স্মিতার কাছে যাবে? নাকি এর মধ্যে স্মিতার কোন চক্রান্ত আছে?

—এটা তো তপনবাবুর কথা। কতটা সত্য সেটা দেখ।

—সত্য ধরে নিলে বলতে হয় স্মিতাদেবী মিথ্যা বলেছেন। কেন না তিনি স্পষ্টই বলে দিলেন তিনি সুদীপ্তাকে চেনেন না। তাহলে কে সত্য বলছে আর কে মিথ্যা বলছে? এই সত্য মিথ্যায় লুকোচুরিতে কার কি লাভ?

—আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।

—আমারও। আসল সত্যটা যে কী সেটাই বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছি না কোথায় লুকিয়ে আছে রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু। নাহ্ চল্, বেরিয়ে পড়ি। এই বন্ধ ঘরে বসে থাকলে মাথা খুলবে না।

—কোথায় যাবে?

—কে জানে? চ তো বেরোই। রয় এন্টারপ্রাইসের রিক্রিয়েশন ক্লাবের সেক্রেটারির সঙ্গে একবার দেখা করাও যেতে পারে।

—ফোন করতে পাব।

—ফোনে সব সময় সুবিধা হয় না।

তারিণীচরণ লোকটাকে দেখতে যতই বোকা বোকা আর ভালমানুষ টাইপ হোক না, আসলে লোকটার পেট থেকে কথা বার করা ততটাই শক্ত আর দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রথমে তো নীলকে ও কোন পাত্তাই দিতে চাইল না। শান্তনীড়ের সামনে প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষার পর যখন কাউকেই বেরুতে বা ঢুকতে দেখা গেল না তখন বাধ্য হয়েই নীলকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে হল। কিন্তু বাধা দিল দারোয়ান

—আপ তো মেমসাবকে লিয়ে আয়া?

—হ্যাঁ।

—লেকিন মেমসাব বাহার চলা গিয়া।

—তাই নাকি? ফিরবেন কখন?

—কেয়া মালুম।

—তাহলে একটু ভেতরে অপেক্ষা করা যাক। কী বল?

—নেহি সাব। অন্দর যানে কা হুকুম নেহি।

—কিন্তু আমায় যে ভেতরে যেতে হবে। তোমাদের যে কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে।

—উস্‌কা ভি হুকুম নেহি।

—মেমসাহাবের হুকুম নেই?

—জি।

—তুমি জান, তোমাদের সাহাব খুন হয়েছেন?

—জি।

—আমাকে তুমি চেনো?

—দো তিন রোজ আগে দেখা।

—ইংরেজি পড়তে পার?

—থোরা থোরা।

নীল পকেট থেকে ওর কার্ডটা বার করে এগিয়ে ধরল। দারোয়ানটা সেটা পড়ল তারপর উদাসীনের মতো ফেরত দিয়ে বলল, —ঠিক হ্যায় সাব, আপ যো ভি হো স্যকতা। লেকিন আভি অন্দর যানে

নেহি স্যকতা।

—তুমি জান, আমি তোমায় এখন অ্যারেস্ট করিয়ে দিতে পারি।

—মেরা কসুর?

—পুলিসের কাজে তুমি বাধা দিচ্ছ বলে!

—তো কিজিয়ে মুঝে অ্যারেস্ট, লেকিন হাম জিস্‌কা নিমক খাতা উসকা কাম তো জরুর করেঙ্গে।

নীল বুঝল লোকটা যা বলছে সব ঠিক। একে এর কাজের বাইরে নিয়ে যাওয়া বেশ শক্ত। আর সেটা বোধহয় ঠিকও হবে না। আর যা কর্তব্যপরায়ণ লোক এর কাছ থেকে বাড়ির ভেতরের কোন খবর বার করাও সম্ভব না। ও ঠিক বুঝতে পারছিল না ঠিক এখনই কী করা দরকার। হঠাৎই একজন সাদা ধুতি আর কালো চাদর জড়ানো বুড়ো মতন লোককে বাইরের দিকে আসতে দেখা গেল। গেট পর্যন্ত এসে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, —কে রে রামসিং, এরা কাকে চাইছেন?

—মেমসাহাবকো।

—বলে দে বাড়ি নেই। পরে আসতে।

গেট পার হয়ে লোকটা বাইরে বেরিয়ে এলো। চকিতে নীল ওর পথ পাল্টে নিল। বোধহয় এই লোকটাকেই ও খুঁজতে এসেছিল।

হনহনিয়ে লোকটা চলে যাচ্ছিল প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোড ধরে। দ্রুত পায়ে নীল ওকে ধরে ফেলল। খানিকটা আন্দাজেই ও ঢিল ছুড়ল, —কোথায় চললে তারিণীদা!

একজন অপরিচিত লোকের মুখে নিজের নাম শুনে লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, —কে তুমি?

—আমায় তুমি চিনবে না, আমি তোমার দিদিমণির কাছে কয়েকবার এসেছিলাম।

—শুনলে তো দিদিমণি এখন বাড়ি নেই। পরে এসো।

—কিন্তু দরকারটা যে'তোমার সঙ্গেই ছিল।

—কেন, আমার সঙ্গে কী দরকার?

—খুব জরুরি আর গোপনীয় ব্যাপার। হাতে সময় আছে?

—না। তেমন বিশেষ দরকার থাকলে পরে এসো। তাছাড়া, আমরা ও বাড়ির চাকরবাকর। চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে খাস বাবু, আমার সঙ্গে তেমন কী দরকার থাকতে পারে?

—তোমাদের রজত দাদাবাবুর সম্বন্ধে কিছু কথা জানার ছিল।

—দিদিমণির কাছেই সব খবর পাবে।

—নাহ্ তারিণীদা, সব কথা কি সবার কাছে পাওয়া যায়?

—আমার কাছেও কোন খবর পাবে না। বৃথাই পণ্ডশ্রম।

—কিন্তু আমি জানি তোমার কাছেই সব গোপন কথা লুকিয়ে আছে!

তারিণী ভ্রূ কুঁচকে নীলের দিকে তাকালো। তারপর বেশ বিরক্তি নিয়েই বলল, —আমার কাছে গোপন সংবাদ? তুমি কে বাপু? ধর আমার কাছে গোপন সংবাদ যদি থাকে, তোমাকে গলা জড়িয়ে বলতে যাব কোন্ দুঃখে?

—দুঃখটা আমার নয় তারিণীদা, দুঃখটা তোমার।

—আমার?

—হ্যাঁ। কত কী তোমার জানা, অথচ কাউকে কিছু বলতে পারছ না। মনের দুঃখ মনেই চেপে আছ আর বুকের ব্যথা বাড়াচ্ছ। বল ঠিক না?

নীল স্পষ্ট দেখল তারিণীর মুখে শঙ্কার ছায়া। কিন্তু সে মাত্র কয়েক পলকের। বুড়ো আবার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বলল, —বয়েসটা তোমার থেকে আমার অনেক বেশি বাবু। ওভাবে টোপ দিয়ে কোন কথাই বার করতে পারবে না। তাছাড়া আমার কোন গোপন কথা নেই। থাকলেও বলব না।

হঠাৎ নীল গলার স্বরটাকে পাল্টে ফেলল, —রজতবাবুকে কে খুন করেছে তা তো তুমি জানোই তাই না?

—না। আমি অন্তর্যামী নই যে সবার মনের কথা জানতে পারব।

—তা বটে। আচ্ছা তোমাদের বাড়ির নতুন অ্যালসেশিয়ানটা যেন কবে এল?

—ওটা অনেকদিনের পুরনো অ্যালসেশিয়ান। কর্তাবাবু তখন বেঁচে।

—কিন্তু এই অ্যালসেশিয়ানটার বয়েস এক বছরও হয়নি।

—আমার কত বয়েস বলতে পারবে?

—আন্দাজ করতে পারি। পঁয়ষট্টি পেরিয়ে গেছে।

—অ্যালসেশিয়ানটাও প্রায় বছর আষ্টেক হয়েছে।

—কর্তাবাবুর আর এক মেয়ে এ বাড়িতে আর আসে না?

—না।

—তেনার বর?

—না।

—রজতবাবুর খাস চাকরটা এখন কোথায়?

—জানি না। তবে এ বাড়িতে থাকে না এটা বলতে পারি।

—আচ্ছা তোমার ছেলেমেয়ে কটি?

হঠাৎ যেন বুড়ো ক্ষেপে গেল। রাস্তার ওপরই চিৎকার করে উঠল, —তোমার এত খবর জানার কী দরকার শুনি?

—চেঁচিও না। তারিণীদা। আমার প্রশ্নের উত্তরগুলো দিলে বোধহয় ভালোই করতে। উত্তর তোমায় একদিন দিতে হবে। আজ নয় কাল। আর আমাকেই দেবে সব উত্তর।

—কোথাকার লাটসাহেব তুমি?

—সে তখন দেখতে পাবে।

—আরে যাও যাও। তোমার মতো কত লাটসাহেব দেখলুম। আর কোন কথা না বলে তারিণী তড়বড় করতে করতে চলে গেল। খুব সম্ভবত উত্তেজনায় ওর শরীর কাঁপছিল। কখন যেন দীপু পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারিণীর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকতে নীল বলল, —কথা তোমায় বলতেই হবে তারিণীদা, আমার নাম নীল ব্যানার্জি। তোমার চোখে অনেক গুপ্ত খবরের আভাস দেখেছি। এড়িয়ে তুমি যাবে কোথায়?

—বুড়োটা মাইরি খবরিয়াল লাট্টুর মতো। রিক্রিয়েশন ক্লাবে যাবে না?

—যাব। আপাতত চল, বাড়ি যাই।

—হ্যাঁ তাই চল, খিদে পেয়ে গেছে।

বাড়িতে গিয়ে বসতে না বসতেই ফোন বেজে উঠল। বিকাশ তালুকদারের ফোন।

—হ্যাঁ, কথা বলছি, বলুন।

ওপাশ থেকে বিকাশ বললেন, —আরে মশাই আগে বলবেন তো সুদীপ্তা মেয়েটা থিয়েটার-টিয়েটার করে। তাহলে অনেক আগেই খুঁজে পেয়ে যেতুম।

—হদিশ পেলেন?

—পুলিসের কাছে এসব নস্যি। শুনুন, আসছে শুক্রবার কলামন্দিরে 'শ্রীমান নাবালক' বলে একটি নাটক হচ্ছে। উনি তাতে অ্যাক্টো করছেন। দুটো কার্ড আমার কাছে আছে। আপনার আর আপনার বিচ্ছুর জন্যে। যান মোলাকাত করে আসুন।

—আপনি যাবেন না?

—আপনি গেলেই আমার যাওয়া। তাছাড়া আমার অত সময়ও নেই। ছাড়ছি।

—ঠিক আছে, বলে নীল ফোন নামিয়ে রাখল।

পাক্কা ন'টায় বই ভাঙল। সুদীপ্তা একটা ট্র্যাজিক রোলে অভিনয় করছিল। দেখতে দেখতে নীল বলল, —ট্র্যাজিক রোলটা মেয়েটা বেশ ভালোই করে তাই না?

—কে জানে। তবে মেয়েটাকে দেখতে বেশ।

—তোর যতো ফালতু কথা। চল, এবার শ্রীমতীকে ধরা যাক।

গ্রীন রুমে গিয়ে কর্মকর্তাদের একজনের হাতে নিজের কার্ডটা দিয়ে বলল সুদীপ্তা করের কাছে ওটা পাঠিয়ে দিতে। দেখা হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন এটাও জানিয়ে দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেক-আপ তুলে সুদীপ্তা এসে দাঁড়াল।

সত্যিই মহিলাকে দেখতে সুন্দর। গলার আওয়াজটাও মিষ্টি। নীলের দিকে তাকিয়ে সুদীপ্তা বলল, —আপনিই নীলাঞ্জন ব্যানার্জি?

—হ্যাঁ আপনার সঙ্গে কিছু দরকারি কথা ছিল।

—বলুন।

—একটু সময় লাগবে যে।

—কী ব্যাপারে সে সম্বন্ধে যদি কিছু আভাস দেন।

—রজত গুহর অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথের ব্যাপারটা নিয়েই একটু আলোচনা করতাম।

—রজত গুহ?

—কেন আপনি তাঁকে চেনেন না?

—না মানে, সামান্য কিছু পরিচয় ছিল। তাঁর মৃত্যুর খবরটা কাগজে পড়েছি। এর বেশি তো আমার কিছু জানা নেই।

—আপনি কী জানেন বা কতটুকু জানেন, তা এই মুহূর্তে আপনার পক্ষেও বলা সম্ভব নয়। তবে আমাদের কাছে কিছু ইনফরমেশন আছে। আর সেই কারণেই আপনাকে একটু বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি।

সুদীপ্তা কয়েক মুহূর্ত কিছু যেন ভাবল। তারপর অত্যন্ত পাকা অভিনেত্রীর মতো গলায় একটা মোহময়ী ভাব এনে বলল, —বেশ তো তাহলে একদিন আমার বাড়ি চলে আসুন বসে কথা বলা যাবে। যদি আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি নিশ্চয়ই করব। কবে আসছেন?

—আপনিই বলুন।

—প্লিজ, আমার ডায়েরিটা দেখি। এ সপ্তাহটা তো রোজই শো। এক কাজ করুন সামনের বৃহস্পতিবার দুপুরে আমি ফ্রী। চলে আসুন, বাড়িতে থাকব।

—আপনার ঠিকানাটা!

—লিখে নিন।

ঠিকানা লিখে নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এল।

কিন্তু মানুষের ভাবনার সঙ্গে বোধহয় ঘটনার মিল খুব কমই ঘটে। অন্তত এক্ষেত্রে তাই হল। শনিবার সকাল থেকে বুধবার পর্যন্ত নীল একা একা নানান জায়গায় ঘুরল। দীপুকেও সঙ্গে নিল না। বিকাশ তালুকদার বার দুয়েক ফোন করেছিলেন। দীপুই ফোন ধরে, উল্টোপাল্টা কিছু বলে বিকাশবাবুকে চটিয়ে দিয়ে ফোন ছেড়ে দেয়। কারণ দীপুর পক্ষেও নীলের অজ্ঞাতবাসের কোন খবর রাখা সম্ভব হয় না। সকালে বেরোয়, ফেরে অনেক রাতে। কোনো প্রশ্ন করলে প্রায়শই যে জবাব দেয় তাও হেঁয়ালিতে ভরা। কেবল বুধবার সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে নীল দীপুকে বলল, —বিরাট চক্রান্ত, বুঝলি রে হাঁদারাম।

দীপুও তুখোড় ছেলে। ও বলে, কিন্তু চালাকরাম তো আর আমায় সঙ্গে থাকতে দেয় না। তাহলে তোমার আগেই তোমায় হাঁদারাম বলে দিতুম। তা গুরু, কেস কি শেষ সীমানায়?

—তা এখুনি বলা যাচ্ছে না। কেবল একজনকে খুঁজে বার করার অপেক্ষায়। তাকে হাতেনাতে

না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই করা যাবে না।

—ব্যাপারটা কিছু খুলে বলবে?

—বলার মতো সময় এখনও আসেনি। তবে তারিণীকে ম্যানেজ করতে না পারলে যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে থাকতে হত।

—বুড়ো তাহলে শেষ পর্যন্ত মুখ খুলল?

—তোকে বলেছিলাম না, মুখ ওর খোলাবই। তবে অনেক সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিতে হল। আসলে এইসব সৎ, নিরীহ, কিছু আদর্শ ধরে রাখা নির্ভেজাল বুড়ো লোকগুলোর সেন্টিমেন্টে টাচ্ না করতে পারলে এদের কাছ থেকে কোনো কথাই আদায় করা যায় না।

—বুড়ো কী বলল?

—যা বলল তা শুনলে তুই তাজ্জব বনে যাবি। কিন্তু লাশটা, না একটা নয় দুটো লাশ যে কোথায় সরালো সেটাই বুঝতে পারছি না।

—লাশ মানে?

—মৃতদেহ। দু'দুটো প্রাণীর দেহ, কোথায় রাখতে পারে? তারিণী বুড়ো মৃত্যুর খবরটা জানে। কিন্তু লাশের হদিশ জানে না। জানলে বলে দিতো। হ্যাঁরে বিকাশবাবুর কোনো ফোন-টোন এসেছিল?

—কাল পর্যন্ত এসেছিল। দিনে দু তিনটে করে। এসে গেছো তাই আজ আর আসেনি। ফোন করব নাকি?

—থাক, কাল একসময় করে নেওয়া যাবেখন। আজ আমি একটু বিশ্রাম করব। পরপর কটা দিন বড় ধকল গেছে। অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়েছে।

—তা, তাজ্জব কি বাত্‌টা শোনাবে না?

—শোনাবো, শোনাবো, সব শোনাবো। কাল বেস্পতিবার না?

—হ্যাঁ, তোমার নায়িকার বাড়ি যাবার কথা।

—আমার নায়িকা? ভালো বলেছিস। সত্যিই, এখন ও আমার ভাবনায় নায়িকা। ওর সঙ্গে কথাটথা না বললে দুয়ে দুয়ে চার আসছে না। অবশ্য ও যদি সত্যি কথা বলে। ঠিক আছে। কেউ এলে বা ফোন করলে তুই ম্যানেজ করে নিস। বড় ঘুম পাচ্ছে, বলে নীল ওর ঘরে চলে গেল। দীপু বুঝল ওর গুরু এখন গভীর চিন্তার রাজত্বে ঘুরছে। এইসময় ওকে বিরক্ত না করাই ভালো।

কিন্তু কিছু কিছু ঘটনা মানুষের সব চিন্তা-ভাবনা ওলটপালট করে দেয়। তখনও আটটা বাজেনি। দীপুই ফোনটা ধরল। 'হ্যালো' বলেই ও ফোনের মুখ চাপা দিয়ে নীলকে বলল, —নাও. কানুর বাঁশি বেজেছে। গলায় খুবই উৎকণ্ঠা। দেখ, তোমার কানু কি বলছে।

ফোন নিয়ে 'হ্যালো' বলতেই ওপাশ থেকে তালুকদার বলে উঠলেন,—ব্যানার্জি সাহেব, এক্ষুণি চলে আসুন, খুব সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে।

—আবার কী হল?

—সুদীপ্তা কর খুন হয়ে গেছে। একটু আগেই ওর বাড়ি থেকে ফোন এসেছিল থানায়।

নীলও এ খবরে চমকে উঠেছিল, —সুদীপ্তা খুন হয়েছে?

—হ্যাঁ, আপনি আমার এখানে চলে আসুন। তাড়াতাড়ি আসবেন।

নীল ফোন রাখতে রাখতেই শুনল, —যাহ্ শালা। তীরে এসে তরী ডুবে গেল গুরু?

কোনো রসিকতাই তখন নীলের ভালো লাগছিল না। ফোন রেখে ও ঝটিতি উঠে পড়ে বলল, —চ্যাংড়ামি না করে শিগগির জামা-প্যান্ট পাল্টে নে। আমি আসছি।

গুলিটা করা হয়েছিল খুব ক্লোজ রেঞ্জ থেকে। খুব সম্ভবত সুদীপ্তা মৃত্যুর আগে বিছানাতেই শুয়ে ছিল। বালিশের ওপর মুখটা একদিকে কাত হয়ে আছে। সারা বালিশ রক্তে মাখামাখি। রগের একপাশে

রক্তচিহ্ন। চারপাশে গোলাকার পোড়া দাগ। সারা বিছানায় ধস্তাধস্তির চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে। এলোমেলো কোঁচকানো চাদর। দুটো পাশবালিশের একটা মাটিতে অন্যটা আধ ঝুলন্ত অবস্থায়। এখন শীতের প্রায় শেষদিক। তবে কম্বল লাগছে। কিন্তু সেটা পায়ের কাছে দলামলা অবস্থায়। মশারি টাঙানো হয়নি।

অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় সুদীপ্তা শুয়ে আছে। গায়ে একটা নাইটি। বাঁ হাতটা একপাশে ছড়ানো, কিন্তু ডান হাত এলানো অবস্থায় ঝুলছে খাটের পাশ দিয়ে।

নীল ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চারদিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। দু-ঘরের স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট। সুদীপ্তা সম্বন্ধে যতটুকু ও শুনেছিল তাতে ওকে মনে হয়েছিল ওর জীবনধারণ খুব একটা স্বচ্ছন্দ গতির নয়। অভিনেত্রীর জীবন। ছোটই হোক বা বড়ই হোক অভিনেত্রীর জীবনে গেরস্ত ব্যাপার স্যাপার একটু কমই থাকে। ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যেও একটা অগোছালো ভাব বর্তমান। হয়তো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওর বাইরে বাইরে কেটে যেতো। ঘরের দিকে মন দেবার অবসর হোত না।

অথচ আসবাব যা কিছু আছে সবই সচ্ছলতার নিদর্শন। দামি ঝকঝকে খাট, ঝকঝকে ড্রেসিংটেবল, গদরেজের আলমারি, কালারড টি ভি, অলউইন ফ্রিজ। সৌখিনতার ছাপ টেলিফোনেও। ডিলাক্স মডেল, হাল্কা অলিভগ্রীন রঙের। জানলার পর্দা বিছানায় চাদর সবই বেশ দামি। এসব দেখে নীলের একটা কথাই মনে হল, অতি অনিশ্চিত এবং সাধারণ এক অভিনয়ের জীবনে এত কিছু করা কী সম্ভব? কে জানে হয়তো ইনকাম ভালই ছিল অথবা রোজগারের অন্য কোন পথ ছিল। বিকাশ তালুকদার সঙ্গে ফটোগ্রাফার এনেছিলেন। সে ভদ্রলোক বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বিভিন্ন পোজে সুদীপ্তা আর তার ঘরের ছবিটবি তুলছিলেন। বিকাশবাবুও নীলের মতো বেশ মনোযোগ দিয়ে সব কিছু দেখছিলেন। এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন,—কী মনে হচ্ছে ব্যানার্জি সাহেব?

—খুনটা খুব সম্ভবত গত রাত্রেই করা হয়েছে।

—আমারও তাই অনুমান। একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন রয়েছে, তাই না?

—অর্থাৎ, মৃত্যুর আগে সুদীপ্তাকে বাঁচার জন্যে লড়তে হয়েছে।

—হ্যাঁ তাই।

—যার দ্বারা সুদীপ্তা নিহত হয়েছে, মনে হয় সে ওর চেনা।

—কী ভাবে বুঝলেন?

—ঘরের ছিটকিনিটা দেখছেন? দরজাটা গতরাত্রে দেওয়াই হয়নি। অর্থাৎ মানুষটি সুদীপ্তার জ্ঞাতসারেই ঘরে এসেছে। নইলে তাকে ছিটকিনি ভেঙে ঢুকতে হত। এবং ঐ একটি দরজা ছাড়া এ ঘরে ঢোকার আর কোন পথ নেই।

—ঠিক।

—আচ্ছা, এ ফ্ল্যাটে আর কে থাকতো?

—এখনও জানা যায়নি।

—আপনাকে ফোন করেছিল কে?

—আমি একটা পুরুষের গলা পেয়েছিলুম।

— কে সে?

—তা কিছু বলল না, কেবল বলল, অমুক এলাকার, অত নম্বর বাড়ির অত নম্বর ফ্ল্যাটের বাসিন্দা সুদীপ্তা কর নামে এক মহিলা খুন হয়েছে, খোঁজ করুন।

—পরিচয় জানতে চাননি?

—চাইবো তো বটেই। কিন্তু কোন উত্তর না দিয়েই লাইনটা কেটে দিল।

—অথচ বাইরের দরজার লক ভেঙে আমাদের ঢুকতে হয়েছে।

—এতে আর অসুবিধার কি আছে? দরজা বাইরে থেকে টেনে দিলেই তো লক হয়ে যাবে। তখন চাবি না ঘোরালে আর খুলবেই না।

—তাই জন্যেই তো বলছি, যে এসেছিল সে সুদীপ্তার চেনা।

ঠিক তখুনি, বাইরে বেশ হট্টগোল শোনা গেল। বিকাশ আর নীল পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

বিকাশ বললেন,—দাঁড়ান দেখি কিসের ঝামেলা।

তবে ঘরের বাইরে যেতে হল না। একজন কনস্টেবল একটি মাঝবয়েসী মেয়েকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এল। মেয়েটার তখন কাঁদো-কাঁদো অবস্থা। কনস্টেবলটি বাঙালি। তালুকদার জিজ্ঞাসা করলেন—কী ব্যাপার সুরেন?

—মেয়েটা হড়বড় করে ফ্ল্যাটে ঢুকতে যাচ্ছিল, কিন্তু পুলিস দেখেই পালাচ্ছিল, তাই ধরে এনেছি

—ঠিক আছে তুমি যাও, আমি দেখছি।

সুরেন চলে গেল। মেয়েটি হঠাৎ হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল। খুব সম্ভবত ঘরের মধ্যে পুলিস আর সুদীপ্তার মৃতদেহ দেখে।

বিকাশ ধমকে উঠলেন,—চেঁচামেচি কোর না, কী দরকারে এসেছ এখানে?

কাঁদো-কাঁদো গলাতেই মেয়েটি বলল,—আজ্ঞে বাবু, আমি ঠিকে কাজের মেয়ে। রোজ যেমন আসি তেমনি এসেছিলুম, তো এসে দেকি দোরগোড়াতে পুলিস। তাই পালিয়ে যাচ্ছিলুম।

—কেন, পালাচ্ছিলে কেন? পুলিসকে এত ভয়টা কিসের?

—পুলিসকে বাবু সবার ভয়। যা টানা-হেঁচড়া করে! তাহলে আমি যাই বাবু, এসবের আমি কিচ্ছু জানি না। শুধু শুধু আমাকে আটকে রেকে কি লাভ বল। আমার পাঁচ বাড়ির কাজ পড়ে আছে

বিকাশ তালুকদার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, নীল ইশারায় ওকে থামিয়ে মেয়েটির সামনে এগিয়ে এসে বলল,— তোমাকে আটকে রেখে আমাদের কোন লাভ নেই। ছেড়েও দোব যদি কয়েকটা সত্যি কথা বল।

—মিচে কথা আমি কোনদিন বলিনি বাবু।

—তা তো বটেই। তবে আজ যদি কোন মিথ্যে বল, বুঝতেই পারছ, খুনের ব্যাপার, শেষকালে হয় তো তোমাকেই,

মেয়েটি বোধহয় আবার কাঁদতে যাচ্ছিল, নীল বলল,— কেঁদে কোন লাভ নেই। আর তোমার ভয়েরও কিছু নেই, এবার বল তো, কী নাম তোমার?

—আজ্ঞে, আমার? চন্দনা।

—এই দিদিমণির কাছে কদ্দিন কাজ করছ?

—তিন চার বচর হবে।

—দু'বেলাই আস?

—আজ্ঞা হ্যাঁ বাবু।

—সকালে কখন আস?

—এই আজ যেমন এয়েচিলুম।

—আর বিকেলে?

—দুটো তিনটে নাগাদ।

—কি করতে হয় তোমায়?

—আন্না বাদ দিয়ে আর সব। এই ধরেন গিয়ে ঘরদোর মোচা, বাসন মাজা আর সাবান কাচা

—কাল বিকেলে কখন এসেছিলে?

—আজ্ঞা কাল একটু রাত হয়ে গিয়েছিল, তায় আপনার ধরেন গিয়ে সন্ধে ছ'টা কি সাড়ে ছ'টা হবেখন।

—তখন কি বাড়িতে দিদিমণি ছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।

—কী করছিলেন দিদিমণি?

—আজ্ঞে ওনার নিজের ঘরে বসে পার্ট মুকস্ত করচিলেন।

—সে সময় আর কেউ ছিল?

—না বাবু।

—দিদিমণি ছাড়া এ বাড়িতে আব কে থাকে?

—কেন, ওনার বর।

—তাকে দেখেছ কোনদিনও?

—দেকব না কেন? দেকেচি তো।

—কালও ছিল?

—কাল আর কোত্থেকে থাকবে? উনি তো বাইরে গাাচেন। তা ধরুন গিয়ে মাসখানেক হবে। ওনাব তো বাইরে বাইরে কাজ।

—কি কাজ করেন?

—বলতে পারবুনি। দিদিমণি বলতেন কোথায় কোথায় যেনো ঘুরে বেড়ান ঐ কাজের জন্যে।

—আর কেউ থাকেন না?

—আমি দেকিনি।

—তাহলে? তোমার দিদিমণির তো বাইরে বাইরে কাজ, দাদাবাবুরও তাই। তাঁরা দুজনই যদি বাড়িতে না থাকেন তাহলে তোমাকে দরজা খুলে দিতো কে?

—এসে বেল টিপে দাঁড়াতুম। দরজা না খুললে বুঝতুম দিদিমণি বাইরে। আমিও চলে যেতুম।

—তুমি এখানে থাকাকালীন, মানে তুমি যখন কাজ করতে, সে সময় বাইরের অন্য কোন লোককে আসতে দেখনি?

—কেন দেকব না? দিদিমণি বাড়ি থাকলেই কেউ না কেউ আসবেই।

—এদের মধ্যে ঘন ঘন কে আসতো?

—একজন ফর্সা মতন লোক। দেকতে শুনতে বেশ ভালো। তাকে অনেক বারই আসতে দেকিচি।

—লোকটা কে?

—কী জানি। তবে হাবভাব দেখে মনে হতো দিদিমণির সঙ্গে লোকটাব বেশ ভাবটাব ছিল। আব থাকতও অনেকক্ষণ। লোকটা এলেই দিদিমণির এই ঘরে চলে আসতো। দরজা বন্ধ করে গপ্পটপ্প করতো।

—তোমার কিছু মনে হয়নি?

—যা সবার মনে হয় তাই হত। সোমত্ত সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে অতক্ষণ দরজা বন্ধ করেগপ্প করার যা মানে হয় তাই মনে হত।

—শেষবার লোকটাকে কবে দেখেছ?

—তা আজ্ঞা. হপ্তাখানেক আগে।

—তোমার দিদিমণির বর এ নিয়ে কিছু বলতো না?

—কী আর বলবে, পেরায় নিকম্মা জোয়ান মদ্দো, তেমন রোজগারপাতি আচে বলে তো মনে হয় না। বউয়ের পয়সায় খায়। তার আবার বলার কী থাকবে?

—তুমি কত মাইনে পেতে?

—তিনশো টাকা।

—তোমার দিদিমণির সঙ্গে লোকটার কোনদিন ঝগড়াঝাঁটি হতে শুনেছ?

—কি করে শুনব বাবু? আমি আমার কাজের তালে থাকি, লোকের কেচ্চা শোনার তেমন কোনো পিবিত্তি নেই।

—তোমার দিদিমণিকে কেউ খুন করেছে। সেটা বুঝতে পারছ?

—তা আর পারবুনি? দেখেশুনে হাত-পা সব পেটের মধ্যে সিঁদিয়ে যেতে লেগেচে। আমি তালে যাই বাবু। আর চার বাড়ি যেতে হবে। দেরি হলে ভট্চাজ গিন্নী বেজায় মুক করে। যাই বাবু?

—যাও।

চন্দনা তড়িঘড়ি করে পালাল।

দীপু এতক্ষণ জেবা শুনছিল। চন্দনা চলে যেতেই বলল,—খুব সেয়ানা মেয়েছেলে। ভাবটা দেখ যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না।

বিকাশবাবু এতক্ষণ ঘবের এদিক সেদিক দেখছিলেন। চন্দনা যেতেই উনি বললেন,—কী বুঝলেন?

—সুদীপ্তার একজন বাবু ছিল। লোকটা রেগুলাব যাতায়াত করতো। হয়তো সে কালও এসেছিল।

হঠাৎ দীপু বলল,—রজত গুহও তো ওর একজন পার্টি ছিল। এ কি আবার নতুন কোন লোক?

—হতে পারে। শুনলি তো, আধা বেকার স্বামী। বউয়ের বোজগারে চলে। রজত গুহ মাবা গেছে। অন্য একজনকে তো ধরতেই হবে। নইলে ক'টা অফিস ক্লাব বা ক'টা পাড়ার ক্লাবে অভিনয় করে কি দু একটা সিনেমায় নায়িকার পিসতুতো বোনেব একদিনেব বোল কোরে কী এত ঠাঁট-বাঁট বজায় রাখা যায়? আসলে এদের বোধহয় বাধ্য হয়েই এইসব করতে হয়। ইচ্ছে না থাকলেও কবতে হয়। সে যাই হোক, আরো একটা পয়েন্ট খুব কনফিউশানে ফেলছে। প্রায় মাসখানেক হল সুদীপ্তাব স্বামী কলকাতায় নেই। কোথাও বাইরে গেছে। কেন বাইবে গেছে? কাজেব ধান্দায়? নাকি অন্য কোনো কারণ আছে? চন্দনাব কথায় বোঝা গেল সুদীপ্তার সঙ্গে ওর স্বামীর তেমন কোনো অটুট সম্পর্ক ছিল না। খিটিরমিটির লাগতোই। সুদীপ্তা রজত গুহব রক্ষিতা আবার স্মিতা গুহর সঙ্গেও দেখা কবতো। নাহ্ সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তবে কী?

বিকাশ বা দীপু নীলের কথা বুঝতে পারছিল না। শেষকালে বিকাশই জিজ্ঞাসা করলেন,—নিজের মনে কী বকে যাচ্ছেন বলুন তো? কিছুই তো বুঝছি না।

—সুদীপ্তা মবে গিয়ে আমাকে একটু পিছিয়ে দিয়ে গেল। এ ফ্ল্যাটে তো আবো একটা ঘর আছে, আমি একটু চোখ বুলিয়ে আসি।

—হ্যাঁ তাই দেখুন। আমি অবশ্য একবাব সাবভে করে নিয়েছি। তেমন কিছু চোখে পড়েনি

—দীপু তুই বোস্, বলে নীল একাই পাশের ঘরে চলে গেল। বিকাশ তালুকদাব তাঁর আনুষঙ্গিক কাজগুলো সারতে শুরু কবলেন। আব দীপু একমনে সিগারেট ফুঁকে চলল। প্রায় মিনিট কুড়ি পব নীল পাশেব ঘর থেকে ফিরে এল। দীপু খুব আশ্চর্য হয়ে দেখল নীলের একটু আগে দেখা চিন্তান্বিত মুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি ফিবে এসেছে। কিন্তু কণ্ঠস্বরে কোনো চাঞ্চল্য নেই।

—দীপু, এবাব ফিবতে হবে। বিকাশবাবু আমবা তাহলে চলি।

—কিছু পেলেন? ও ঘবে?

—পবে সব বলব। আয় দীপু।

এরই ফাঁকে কখন যেন শীতকালটা পালিয়ে গেছে। বজতের মৃত্যু, তার তদন্ত, তাবপর সুদীপ্তা খুন। এইসব কবতে করতে নীলের খেয়ালই ছিল না শীত পালাচ্ছে। এখন তো রীতিমত পাখা খুলতে হচ্ছে। আর গবম আসার সঙ্গে সঙ্গে লোডশেডিং শুরু হয়ে গেছে। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন বিকাশ তালুকদাব এসে হাজির। নীল তখন তন্ময় হয়ে একটা বিদেশী নভেল পড়ছিল। বিকাশকে দেখে ও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল। অভ্যর্থনায় মুখবিত হয়ে বলল,—আরে আসুন আসুন। খবর কি মশাই? সেই যে শেষ দেখা তাবপব একেবাবে নিপাত্তা। সুদীপ্তা কেস কদ্দূব এগুলো বলুন?

বিকাশ ভুরু-টুরু কুঁচকে বলল, —আপনি যে ক্রমশ রসের চূড়ামণি হয়ে উঠেছেন তা তো জানা ছিল না। খবব তো আপনাব কাছে নোব বলে এলুম।

—আমার খববেব জন্যে আপনাকে আবো কয়েকটা দিন অপেক্ষা কবতে হবে। চার ফেলেছি। মাছ আসবেই।

—আব সেই জন্যেই এই নীবব অপেক্ষা? আলস্যে কালহরণম?

দীপু বোধহয় আশেপাশেই কোথাও ছিল। রিকাশবাবুর কথাটা ওর কানে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ও বলল,—বিকাশদা, আপনি যে ইদানীং কাব্যচর্চা কবছেন তা তো বলেননি।

দীপু কখনও তালুকদারদা, কখনও মিস্টার তালুকদার আবার কখনও বিকাশদা বলে ডাকে। সেটা ওর আর মর্জিমাফিক। তবে ইদানীং তালুকদারকে বিকাশদা বলছে বেশি। কিন্তু এই 'খাজুরে' দাদা দিদি সম্বোধনে বিকাশ তেমন পুলকিত হন না। প্রায় অবতারের ভঙ্গিতে উনি বললেন,— কেন, তোমার আপত্তি আছে কাব্যচর্চা করলে?

—কক্ষনো নয়। বরং মনে হয় পৃথিবী পাল্টাচ্ছে। কেরানি কবি অনেক দেখেছি, ডাক্তার কবিও আছে। কিন্তু পুলিস কবি ..... কে জানে হয়তো কোনদিন পয়দা হবে। সোনার পাথরবাটি, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, অমাবস্যার চাঁদ এসব যদি হতে পারে তাহলে পুলিস কবি না হবার কী আছে? কী বল নীলদা?

—ব্যানার্জি সাহেব আপনার এই সাগরেদটি কিন্তু কোনদিন আমার হাতে, ওহে ছোকরা, জবাসন্ধ পুলিসের লোক, পঞ্চানন ঘোষালও পুলিসের লোক ছিলেন। এদের নাম শুনেছ? শোননি। যাকগে ছোঁচোদের কিচকিচানিতে কান দিয়ে কোন লাভ নেই, হ্যাঁ যা বলছিলাম, চার-টার তাহলে ফেলেছেন?

—হ্যাঁ, রহস্যের একটা বিরাট পুকুর। 'চার' একটাই। লোভনীয় চার। কে আগে খেতে পারে দেখি। কারণ মাছ দুটো।

—তার মানে?

—দুটো চাঁদ বা দুটো সূর্য যেমন এক আকাশে থাকে না তেমনি এই দুই গভীর জলের মাছ এক পুকুরে থাকতে পারে না। দুজনেই দুজনের প্রতিদ্বন্দ্বী। কে কাকে আগে নিধন করবে সেটাই হচ্ছে কথা।

—তার মানে আবো খুনখারাবির ব্যাপার আছে?

—হলেও হতে পারে। কারণ এখন দুজনেই মরিয়া। দুজনেই দুজনকে খায়েল করার ফিকিরে ঘুরছে। সব আমার হাতে মাত্র একটা ছিপ। বঁড়শিও একটা। দেখি কী হয়।

—খুব হেঁয়ালি করছেন মশাই। তা মাছ দুটোর নাম জানা যাবে?

—নিশ্চয়ই যাবে। তবে আর কটা দিন। অ্যাট লীস্ট আমার ফাত্নায় টান পড়লে সর্বাগ্রে আপনাকেই তা খবর দিতে হবে।

অবশেষে টান পড়ল। নীলের ফাত্না নড়ে উঠেছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই ও বিকাশ তালুকদারকে ফোন করল,—তালুকদার সাহেব, চারে মাছ এসেছে। রাঘব বোয়াল, এখন যে আপনার বাহিনীর একজনকে নিয়ে হাজির হতে হবে।

—নিশ্চয়ই। কিছু চিন্তা করবেন না। করে কোথায় আগে তাই বলুন?

—এ রহস্যের যবনিকা যেখানে থেকে উঠেছিল, ফিরে যেতে হবে সেখানেই। মানে 'শান্তনীড়ে'।

—অ্যাঁ বলেন কী? শান্তনীড়ে মানে স্মিতাদেবীর বাড়িতে?

—ইয়েস স্যার। আজ রাত ঠিক নটা নাগাদ আপনি মোটামুটি আর্মড দু-একজনকে নিয়ে শান্তনীড়ে চলে আসুন। দারোয়ানটা হয়তো বাধা দেবে। তবে পুলিস টুলিস দেখলে আর কিছু ঝামেলা করবে বলে মনে হয় না। খুব কর্তব্যপরায়ণ লোক।

—ঠিক আছে, চিন্তা করবেন না। পৌঁছে যাবে। আপনি?

—স্পটে দেখা হয়ে যাবে।

—ফোনটা নামিয়ে রেখে নীল কিছুটা সময় আত্মস্থ হতে চাইছিল। দীপু বাদ সাধল,—চারটা কী?

—দুজনকে দুটো ফোন করা। আজ তো অমাবস্যা, তাই না?

—ক্যা জানে! পাঁজি ঘাঁটার অভ্যেস আমার নেই।

—হ্যাঁ, আজ অমাবস্যায় আর লোডশেডিং যদি হয় তো সোনায় সোহাগা।

—বুঝেছি।

—কী?

—হেঁয়ালি ছাড়া আর তুমি কিছুই বলবে না। ঠিক আছে, লাস্ট সীনেই সব দেখা যাবে।

লাস্ট সীনটা যে শুরুর আগেই শেষ হয়ে যাবে তা নীলও আন্দাজ করতে পারেনি। নটার কিছু আগে শান্তনীড়ের পিছনের বাধা পেরিয়ে ইটের পাঁচিল টপ্‌কে ওরা বাগানে ঢুকেছিল। একে অমাবস্যা তায় সত্যি সত্যিই লোডশেডিং। ফলে বাগান ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ছোট্ট পেন্সিল টর্চটা মাঝে মাঝে জ্বালতে জ্বালতে ও বাগানের একদিক ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। দীপু ফিস্‌ফিস্ করে বলল,—ভাগাড়ের দিকে যাচ্ছ কেন? সাপটাপও তো থাকতে পারে।

—ভাগাড়ে কী থাকে বল তো?

—মড়া।

—হ্যাঁ, সেই মড়ার লোভে আজ দুটো শকুন আসবে। সাবধানে চল, নইলে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়বি।

কিন্তু খুব একটা বেশি দূর যেতে হল না। অন্ধকারের বুক চিরে একটা শব্দ হল। শব্দটা চেনা, রিভলবারের। পরমুহূর্তে আরো একটা। এটাও রিভলবারের। সঙ্গে একটি আর্তনাদ।

—এবার টর্চ জ্বালা দীপু। আমাকে ফলো কর।

বলেই নীল নিজের টর্চ জ্বালিয়ে সামনের দিকে দৌড় দিল, পিছনে দীপু। ঘটনাস্থল একটা বিশাল গাছের নিচে।

গুলির আওয়াজ বিকাশ তালুকদারও পেয়েছিলেন। শব্দ আন্দাজ করে আর অন্ধকারে জ্বলন্ত দুটো টর্চের আলো অনুসরণ করে তিনিও ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন। তাঁর হাতেও উদ্যত রিভলবার। নীলকে দেখতে পেয়েই উনি প্রশ্ন করলেন,—কি ব্যাপার হল ব্যানার্জি সাহেব, দু-দুটো গুলির আওয়াজ?

—একটু সময়ের হেরফের আর কি। দুজনেই যে নটার আগেই এসে পড়বে বুঝতে পারিনি।

—কে দুজন? বিকাশের গলায় তখন বিরক্তি।

—দুটো কালপ্রিট। টর্চ আছে তো? জ্বালুন।

বিকাশ টর্চ জ্বাললেন। তিনটে জোরালো টর্চের আলোয় আবিষ্কৃত হোল একটি মৃতদেহ। মহিলার দেহ। বিকাশ সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন। টর্চের আলো মুখে ফেলতেই চমকে উঠলেন,—আরে, এ যে মিসেস স্মিতা গুহ।

—হ্যাঁ তালুকদার বাবু ঠিক তাই।

—আবার খুন? কিন্তু করলোটা কে?

—ঐ একটু দূরে, আলোটা ঘোরান।

আলো ঘুরিয়ে দেখা গেল আর একটি দেহ পড়ে আছে। পুরুষমানুষের। বোধহয় তখনও প্রাণ ছিল। হাতটা তোলার চেষ্টা করছিল। তিনজনেই ছুটে গেল মুমূর্ষুর কাছে। নীল লোকটির কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মুখে টর্চের আলো ফেলতেই দেখা গেল প্রায় ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

—কিছু বলবেন

কোনরকমে লোকটি জিজ্ঞাসা কল,—ও মরেছে?

—হ্যাঁ।

মৃতপ্রায় ব্যক্তিটির বোধহয় আরো কিছু বলার ছিল। তার ঠোঁট কাঁপছিল। নীল আবার জিজ্ঞাসা করল,—কিছু বলবেন? বলুন,

—সেলিম?

—পালাবার উপায় নেই। পুলিস আগেই তাকে অ্যারেস্ট করেছে।

মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখেও হাসি ফিরে আসে। লোকটির মাথা গভীর প্রশান্তিতে বাঁ দিকে হেলে পড়ল।

—এটাও গেল, বলে বিকাশ তালুকদার নিজের টুপিটা খুলে বগলে রাখতে রাখতে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু ব্যক্তিটি কে?

দীপু আর বিকাশ তালুকদারকে চমকে দিয়ে নীল বলল,—রজত গুহ। আগে মরেননি আজ মরলেন। আপনার কিন্তু আরও একটা কাজ বাকি পড়ে থাকছে।

—কী কাজ বলুন। আয়াম অলওয়েজ রেডি।

—রায়দের এদিকটায় একটা বড় তড়াগ আছে আব আছে গাছ আগাছাব জঙ্গল। এবই মধে, দুটো কঙ্কাল আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে।

—কঙ্কাল মানে?

—মানে কঙ্কাল। স্কেলিটান। এতদিনে কোন বডি মাটির নিচে বা পুকুবের তলায় থাকলে সেগুলো কঙ্কালই হয়ে যাবার কথা। কেসটা প্রমাণ কবার পক্ষে অকাট্য নমুনা। আব এখন কঙ্কাল ঘেঁটে বলে দেওয়া যাবে সেটা কার কঙ্কাল।

—কিন্তু কঙ্কালের ব্যাপারটা কী?

—বৈঠকখানায় চলুন। ওখানে বসেই কথা হবে। সেলিম কোথায়? বেঁচে আছে তো?

—হ্যাঁ। দুজন কনস্টেবল আছে ওর দুপাশে হাতে হাতকড়া সমেত।

—ঠিক আছে। চলুন।

—কিন্তু এই বডি দুটো?

—কেউ নিতে আসবে না এতো রাতে। কাল সকালে যা ব্যবস্থা কবাব কববেন।

শান্তনীড়ের সেই সাজানো গোছানো বৈঠকখানা। প্রায় সকলেই আছে। বৃদ্ধ তাবিণীচরণ। হাতকড়া অবস্থায় সেলিম একপাশে বসে আছে মাথা নিচু কবে। দরওয়ান রাম সিং কাঁচুমাচু মুখে একদিকে দাঁড়িয়ে আছে। কেবল নেই বাড়ির মালকিন স্মিতাদেবী। বলতে গেলে অনুতোষ বায়ের পবিবাব প্রায় নিশ্চিহ্ন।

ঘবে ঢুকতে ঢুকতে নীল বলল,—তালুকদারবাবু আমার কাজ শেষ। যদিও একটা বিবাট ষড়যন্ত্রেব নায়ক নায়িকাকে হাতে-নাতে ধরা গেল না। তবে এ বোধহয় একদিকে ভালোই হল। অপরাধেব গ্লানি নিয়ে দুজনকেই জেলে পচে মবতে হত। সেটা হয়তো অনুতোষ বায়েব বংশমর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করতো।

—কিন্তু ব্যানার্জি সাহেব?

—হ্যাঁ বলুন।

—আমি কিন্তু এখনও যে তিমিরে সেই তিমিবে। কিছুই ক্লিয়াব নয। অ্যাদ্দিন জানতাম বজত গুহ মরে গেছে। আজ আবার বলছেন সে একটু আগে মরলো। ওদিকে স্মিতা গুহও খুন হলেন। এখন এ দুজনকে মারল কে তাও বুঝতে পারছি না। অথচ আপনি বলছেন বহস্যেব যবনিকাপাত হয়ে গেছে। পুরো ব্যাপারটাই তো গোলমেলে।

—এখন রাত খুব একটা বেশি নয়। আমি বাড়ি ফিবে যেতে পারতাম। কিন্তু আপনাকে সব কিছু খুলে বলার জন্যেই থেকে গেলাম। হ্যাঁ তালুকদার বাবু শান্তনীড় বহস্যেব এখানেই শেষ। অন্তত শান্তনীড়কে কেন্দ্র করে আব কোন খুন হবে না। কী তারিণীদা তোমাব কী মনে হয়?

তারিণীচরণ থমথমে মুখে একবাব চোখ তুলে তাকাল। তাব উত্তব দেবাব হয়তো কিছু ছিল না। ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়ে সে মূর্তির মতো বসে রইল।

—কিন্তু ব্যানার্জি সাহেব, এই সেলিমটি কে? ওকে অ্যাবেস্ট কবতে বললেন, অবশ্য লোকটা সন্দেহজনকভাবে পালাচ্ছিল, সেই কারণেও আরেস্ট কবা যায। কিন্তু অ্যালিগেশানটা কী?

নীল সামান্য হাসল। তারপর বলল,—কী মিস্টাব সেলিম, আপনাব পবিচযটা আপনি দেবেন, না আমিই দোব।

সেলিমের মুখেও কোন কথা নেই। সে নির্বিকাব সন্ন্যাসীব মতো হাতকড়া পড়ে বসে আছে একটা সোফায়। দুপাশে দুজন বন্দুকধারী কনস্টেবল।

এ লোকটা তো স্মিতা দেবীর খাস বেয়ারা না? হঠাৎ দীপু বললো, —সেদিন ঐ তো ওপব থেকে সুদীপ্তাদেবীর ছবিটা আনতে গিয়েছিল। অবশ্য তাবপর আর ফেরেনি।

— অন্তত মিস্টার সেলিমের বাইরের পরিচয়টা তাই। স্মিতা দেবীর খাস বেয়ারা। কিন্তু তা ... ওর পরিচয় উনি স্মিতাদেবীর আইনত স্বামী।

যুগপৎ বিস্ময়ে দীপু আর বিকাশ বললেন, —আ মোলো যা! এর মানে কী? তাহলে রজত গুহ কে?

—হ্যাঁ বলছি। একটু গোড়া থেকেই বলি, নইলে গুছিয়ে বলা যাবে না। শান্তনীড়ে অশান্তির ছায়া নেমেছিল রায়সাহেবের আমলেই। বিরাট একটা বিক্ষোভ আর ষড়যন্ত্রের শুরু তখনই। রায়সাহেবের দুই মেয়ে; মিতা আর স্মিতা। বিত্তবান রায় সাহেবের কন্যাভাগ্য খুব একটা ভালো নয়। ছোটবেলাতেই ওঁরা ওঁদের মাকে হারান। পরিচারিকার হাতেই দুটি মেয়ে মানুষ। পিঠোপিঠি বোন। দুই বোনকেই দেখতে একেবারেই ভালো ছিল না। তবু ধনী পরিবেশে মানুষ। কিছুটা জেল্লা ছিল। বিশেষত মিতাদেবীর। মিতাদেবী এমনিতে ছিলেন স্বল্পবাক মহিলা। ছোট থেকেই। সব বাবার মতোই রায়সাহেব চেয়েছিলেন দুটি জামাই। ঘরজামাই। পাত্রও দেখা চলছিল। কিন্তু মিতাদেবী তার আগেই একটি ছেলের সঙ্গে ভাবটাব করে ফেলেছেন। ছেলেটি ছিল রায় সাহেবের ড্রাইভারের ছেলে। জানাজানি হতে রায় সাহেব বেশ ধমক-ধামক দিলেন। তারপর প্রচুর অর্থের বিনিময়ে একটি ছেলেকে প্রায় কিনেই নিলেন। যেমন করে হোক মিতার বিয়ে দিতেই হবে।

কিন্তু ঠিক বিয়ের আগের মুহূর্তে মিতাদেবী তাঁর প্রেমিকের হাত ধরে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। রাগে অন্ধ রায়সাহেব সেই দিনই আইনমাফিক বড় মেয়েকে ত্যাগ করলেন। বঞ্চিত করলেন তাঁকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে। বিক্ষোভ আর ষড়যন্ত্রের খেলা শুরু হল তখন থেকেই। সামান্য এক ড্রাইভারের ছেলে, রাজকন্যাকে সে পুষবে কেমন করে? অভাব আর অনটনে জর্জরিতা হলেন মিতা। তাই সব মানসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে রায়সাহেবের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছিলেন। কিন্তু রায়সাহেব ক্ষমা করেননি। শুনিয়ে দিয়েছিলেন সব সম্পত্তি তিনি ছোট মেয়ে স্মিতার নামে করে দিয়েছেন।

রায়সাহেবের বিরুদ্ধে জমে থাকা সব ক্ষোভ রাগে পরিণত হল। বাবার বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। তাই সব ঈর্ষা আর রাগের জ্বালা গিয়ে পড়ল স্মিতাদেবীর ওপর। অথচ স্মিতাদেবীর কোন দোষই ছিল না। চেহারার দিকে দুইবোনের মিল থাকলেও চরিত্রগত ভাবে দু'বোনের চারিত্রিক গঠন ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। মিতাদেবীর মধ্যে ছিল ঔদ্ধত্য, কর্কশতা, অহংকার, সামাজিকতাকে অবজ্ঞা করা, মানীর মান না রাখা। ধনী পিতার কন্যা হিসেবে ছিল তার অপরিসীম গর্ব। এ হেন মিতাদেবী কী করে যে ওরকম একটি ছেলেকে ভালবাসল, যে নাকি ধনে মানে শিক্ষায় বংশমর্যাদায় তাঁর তুলনায় নিকৃষ্ট। এটা খুবই আশ্চর্যের। সে যাইহোক, অন্যদিকে স্মিতাদেবী একেবারেই বিপরীত। যথেষ্ট শিক্ষিতা, বিনয়ী, মিষ্ট ব্যবহার এবং সর্বোপরি নিরহঙ্কারী। রায়সাহেবকে অনেক ভাবে বুঝিয়েছিলেন স্মিতা দেবী দিদিকে যেন বঞ্চিত করা না হয়। এও বলেছিলেন, যুগ পাল্টে যাচ্ছে। হোক নিচু জাতের তবু দিদি যখন তাকে ভালবেসে বিয়ে করেছে, তাকে যেন মানিয়ে নেন। কিন্তু রায়সাহেব সেসব কথার কোন মূল্যই দেননি, কী তারিণীদা, সব ঠিক বলছি তো?

তারিণীচরণ নিঃশব্দে কেবল তার ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানাল।

—এরপর রায়সাহেব আর কোন রিস্ক্ নিলেন না। রূপবান, শিক্ষিত, বংশমর্যাদায় সমগোত্রীয় রজত গুহকে মনোনীত করলেন। আসলে মিতার জন্যেই তিনি রজতকে সিলেক্ট করেছিলেন। যাইহোক খুব ধুমধাম করে স্মিতার সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। ভেবেছিলেন রজতকে মানুষ করে একদিন তার হাতেই সবকিছু বুঝিয়ে দেবেন। কিন্তু ঘটনা ঘটল অন্য কিছু। আগেই বলেছি রায়সাহেবের কন্যাভাগ্য ভালো নয়। বছরখানেকের মধ্যেই রজতের পূর্ণ চরিত্র বেরিয়ে এল। রজতের বিলিতি ডিগ্রি ছিল। অসাধারণ রূপ ছিল। ছিল মার্জিত ব্যবহার। কিন্তু তার চরিত্রের অন্যদিকটা দেখতে পাননি রায়সাহেব। সে একাধারে মদ্যপ, চরিত্রহীন, লম্পট আর জালিয়াত। সে অনুতোষবাবুর ধীরস্থির মেয়েটির ওপর শারীরিক নির্যাতন চালাতো, যখন তখন টাকা-পয়সার জন্য উত্যক্ত করতো। এছাড়া তাদের বিবাহিত জীবন বলেও কিছু ছিল না প্রথম দিন থেকেই।

প্রমাদ গুনলেন রায়সাহেব। ভেবেছিলেন উইলের কিছু রদবদল করে রজতকে কোম্পানির পার্টনার করে যাবেন। তা আর করলেন না। সব মালিকানা রয়ে গেল স্মিতা গুহ'র নামে। কিছু দিনের মধ্যেই শোকে, জীবনের প্রতি অভিমানে আর দুঃখে একটি মাত্র সিভিয়ার অ্যাটাকেই তিনি মারা গেলেন। শুরু হল শান্তনীড়ে অশান্তির খেলা। দানা বাঁধল পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ। শুরু হল মহা সর্বনাশের চক্রান্ত। নিজের অজান্তেই মিসেস স্মিতা গুহ হয়ে উঠলেন দুজনের শত্রু। একদিকে মিতা মণ্ডল। অভাব অনটনে ব্যতিব্যস্ত মিতা অনুতোষ রায়ের বিপুল অর্থের ন্যায্য ভাগীদার হয়েও সব কিছুতেই বঞ্চিতা। আর অন্যদিকে রজত গুহ। যে লোভে, যে আশায় অনুতোষ রায়ের অসুন্দরী এবং রুগ্‌ণা মেয়েকে তিনি বিয়ে করেছিলেন, তার সব কিছু থেকেই তিনি বঞ্চিত। উচ্ছৃঙ্খল, বেহিসেবী, মদ্যপ এবং নিত্যনতুন সুন্দরী মেয়ের জন্যে প্রয়োজন হয় পর্যাপ্ত অর্থের। অথচ মাসের শেষে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ছাড়া তাঁর হাতে কিছুই আসে না। স্মিতার কাছেও চেয়ে কিছু পাওয়া যায় না। চিরদিনের শান্ত মেয়েটি স্বামী নামক ব্যক্তিটির কাছ থেকে যে আঘাত পেয়েছিলেন, তাতে তাঁর স্বভাব ধীরে ধীরে পাল্টে গিয়েছিল। প্রায় দেড় বছরের বিবাহিত জীবন তাঁর মরুভূমির মতো রুক্ষ। তার ওপর স্মিতা তখন নিজের হাতে কোম্পানির হাল ধরেছেন। স্বামীর সঙ্গে দৈনন্দিন সম্পর্কও তার কিছু নেই।

হয়ত এভাবেই কেটে যেত। কিন্তু কাটল না। শত্রুর শত্রু মিত্র হয়ে দাঁড়ায়। তাই রজত আর মিতা হাত মেলালেন পরস্পরের সঙ্গে আর যার অনিবার্য পরিণতি,

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল তারিণীচরণ,—আর মনে করাবেন না বাবু, সেই অভিশপ্ত রাতের কথা আর আমি ভাবতে চাইনে.....উঃ....।

—তারিণীদা, সত্য বড় বেশি রকমের নিষ্ঠুর। তুমি তো সবই জানতে। তোমারই সামনে সব কিছু ঘটেছিল! বড় অন্যায় করেছিলে সেদিন সব কিছু লুকিয়ে রেখে। আর সেই জন্যেই আরো দুটো প্রাণ শেষ হয়ে গেল।

—হ্যাঁ বাবু, ভুল করেছিলুম। সব জেনেও চুপ করে ছিলুম। সেদিন আমি শুধু নিজের কথাই ভেবেছিলুম। সব জেনেও চুপ করে ছিলুম। পাছে এই চাকরিটা চলে যায়। মাথার ওপর যে আমার এখনও তিনটে মেয়ে। চাকর-বাকরের কাজ হয়তো একটা মিলবে কিন্তু এই মাইনে তো কোথাও পাব না। স্বার্থপরের মতো তাই সব জেনেও চুপ করে থাকতে হত।

—আর ভেবে কি করবে? তবু সময় মতো আমাকে যদি সব কিছু না বলতে তাহলে কে জানে আর কত কী ঘটে যেত। যাক, যা বলছিলাম, রজত গুহ আর মিতা মণ্ডল, সমান স্বার্থচুক্তি করে এক অভিশপ্ত রাতে খুন করল দুজনকে। এই বাড়িতেই।

—দু-দুটো খুন? একই রাতে এই বাড়িতে? কারা তারা? বিকাশ জিজ্ঞাসা করলেন।

—প্রথম খুন, একটা কুকুর। অ্যালসেশিয়ান। স্মিতা গুহর প্রিয় কুকুর। তার খাবারের বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার মৃত্যুটা খুব একটা কষ্টের হয়নি।

খুব আশ্চর্য হয়ে দীপু বলল,—তাহলে এখন যে কুকুরটা আছে, এটা নতুন?

—হ্যাঁ নতুন।

—কিন্তু কুকুরটাকে মারলো কেন? তালুকদার জিজ্ঞেস করেন।

—লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে। কুকুর এমনই প্রাণী যে চট্ করে কখনোই অন্য কাউকে তার প্রভুর জায়গা দেবে না।

—তোমার এ কথার অর্থ?

—অর্থ একটাই। যে স্মিতা গুহ একটু আগে মারা গেছেন, তিনি আসল স্মিতা গুহই নয়।

বিকাশ এবং দীপু বোকার মতো একবার দুজন দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বিকাশই প্রশ্ন করলেন, —তাহলে ইনি কে?

—ইনি স্মিতার দিদি মিতা মণ্ডল। অবাক হওয়ার কথা বটে। কিন্তু এটাই সত্যি। আসল স্মিতা গুহকে সে রাত্রে অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মতো হত্যা করা হয়েছিল। চেয়ারে বসিয়ে হাত পা বেঁধে হাঁ করিয়ে

মুখের মধ্যে নাইট্রিক অ্যাসিড ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। প্ল্যানটা ছিল রজত আর মিতার। সেটাকে কার্যকরী করেছিল, ঐ যে সামনে বসে আছে, সেলিমবাবু। কি সেলিমবাবু। কিছু ভুল বলছি নাকি?

—মানে মিতা মণ্ডলের হাজব্যান্ড? কিন্তু সেলিম কেন? জিজ্ঞেস করলেন বিকাশ তালুকদার।

—সেলিম ওর ছদ্মনাম। ওর আসল নাম নিতাই মণ্ডল। ড্রাইভার রামতারণ মণ্ডলের ছেলে।

দীপু জিজ্ঞাসা করল,— তা হঠাৎ ছদ্মবেশের কী দরকার?

—নিজের পরিচয়ে এ বাড়িতে থাকবে কী ভাবে? একটা কিছু ভেক তো নিতেই হবে।

—কিন্তু স্মিতা আর মিতা, লোকে চিনতে পারবে না যে এরা দুজনে আলাদা মেয়ে?

—বাড়িতে চেনার প্রাণী বলতে দুজন। এক, একটি অ্যালসেসিয়ান কুকুর, তাকে আগেই মেরে ফেলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তারিণীচরণ। তারিণীকে বেশ কিছুদিন ওয়াচ করা হয়েছিল। দেখা হয়েছিল সে কিছু বুঝতে পারে কি না। কিন্তু তারিণী অত্যন্ত বুদ্ধিমান, এবং সে তার ব্যক্তিগত লোকসানের কথা ভেবেই নীরব হয়ে গিয়েছিল। তারিণীকে আরো জীবিত রাখা হয়েছিল তাকে দিয়ে পরীক্ষা করার জন্যে। অর্থাৎ ওরা দেখছিল, তারিণী আসল নকলের পার্থক্য বুঝতে পারে কি না? তারিণী না পারলে অন্য কেউ অত কাছের লোক নয় যে তারা দুজনের পার্থক্য বুঝে ফেলবে।

—তাই বলে অফিসের কেউই চিনতে পারল না? অনেক পুরনো লোকও তো ছিল। তারিণীর নয় চাকরির ভয় ছিল। অন্যদের?

—কী করে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারছেন তালুকদারবাবু যে অফিসের কেউ আসল নকল চিনতে পারেননি। তাদেরও তো চাকরির ভয় থাকতে পারে? তবে, চট্ করে দু'বোনের চেহারার পার্থক্য ধরা, অন্তত চেহারার দিক থেকে, একটু কঠিন কাজ। বিয়ের আগে মিতার হয়তো সামান্য ভালো স্বাস্থ্য ছিল। কিন্তু অভাব অনটনে তারও তখন ভগ্নদশা। তার ওপর, স্মিতাকে হত্যা করার পর প্রায় মাস ছ'য়েক মিতা অসুখের অছিলায় বাড়িছাড়া হয়নি, অফিসেও যাতায়াত করেনি।

—ও, দীপু বলে উঠল, তাই বুঝি সই চেঞ্জ করার ব্যাপার ঘটেছিল?

— ইয়েস, চেহারার সাদৃশ্য যদিও বা ম্যানেজ করা যায়, হুবহু একই ধরনের সই বারবার করা বোধহয় সম্ভব নয়।

—কিন্তু বডি দুটো কি বাগানেই পোঁতা হয়েছিল?

—আগেই বলেছি। এটা আমি ঠিক জানতে পারিনি। তারিণীদাও লাশ দুটোর পরিণতি ঠিক কী হয়েছে তা জানে না। তবে আমি অনুমান করছি সেগুলো বাইরে কোথাও নয়, হয় বাগানের কোন মাটির নিচে। নতুবা তড়াগের জলের তলায়। লাশ হাফিস করার এর থেকে সহজ উপায় আর কি আছে।

—কিন্তু, বিকাশ বললেন, পুকুরে তো লাশ ভেসে উঠবে।

—লাশের গলায় দশমনি বাটখারা বা পাথর চেন সমেত বেঁধে দিলে সেটা মাছের খাদ্য হওয়া ছাড়া আর কোন পরিণতি পায় না। এরপর কিন্তু শুরু হল আসল কোঁদল। সম্পত্তি একটা। অংশীদার দুজন। প্রথমে দুজনেই রাজি হয়েছিল সমান সমান ভাগে। কিন্তু কিছুদিন পরেই দুজনেই ভাবল, কেন অন্যজনকে ভাগ দিতে যাবে। একজনের বাবার সম্পত্তি, অন্যজনের স্ত্রীর সম্পত্তি। এরপর দুজনই হল দুজনের শত্রু। দুজনেই হল দুজনের প্রতিদ্বন্দ্বী। দুজনেই দুজনের নিধন যজ্ঞের ব্যবস্থা শুরু করল। তাছাড়া, রজতের চাহিদার কোন শেষ ছিল না। তার ওপর নিজে থেকে ডাইরেক্টর হয়েও সেল্স ডিভিশনের ম্যানেজারশিপ নিল। দু-হাতে কিছু দু-নম্বরি পয়সা লোটার ধান্দায়। তাই মিতা চাইল যেমন করে হোক রজতকে সরাতে। শুরু করল তার ব্যক্তিগত দুর্বলতাগুলোকে নানান লোকে ছড়িয়ে দিতে। বদনামে বদনামে ব্যতিব্যস্ত করে, স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগ এনে, বহু নারীতে আসক্ত এমন একটা কুৎসা ছড়িয়ে ডিভোর্স শুট ফাইল করতে। ব্যভিচারী জোচ্চর স্বামীকে আইনত ডিভোর্স করা যায়।

রজত যে পরস্ত্রীগামী এটা প্রমাণ করার জন্য অনেক টাকার চুক্তিতে এক জন অভিনেত্রীকে সে

বেছে নিল। সুদীপ্তা কর। সুদীপ্তা অভিনেত্রী। তার নিবোজগারী স্বামী। টাকার কারণে, এবং কেরিয়ারের জন্যে তাকে অনেক পুরুষের মনোরঞ্জন করতে হত। মিতা মণ্ডলেব টাকার অঙ্কের লোভে সে সামলাতে পারেনি। রজত গুহর মতো সুদর্শন টাকাঅলা লোকের সঙ্গে নিশিযাপনে তার কোনো আপত্তি হয়নি। সুদীপ্তার সঙ্গে মাখামাখি যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখনই রঙ্গমঞ্চে আমাব আহ্বান। মিতা মণ্ডলই আমায় ডেকে পাঠিয়ে তার চক্রান্তের চূড়ান্ত রূপ দিতে চেয়েছিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা চক্রান্ত তিনি করেছিলেন, আমারই চোখের সামনে রজতকে খুন করা। অর্থাৎ এক ঢিলে দু-পাখি মারা।

আমারই চোখের সামনে অন্য এক ব্যক্তিব দ্বারা যদি রজত খুন হন তাহলে চট্ করে কেউ স্মিতা গুহ ওরফে মিতা মণ্ডলকে সন্দেহ করবে না।

—কিন্তু নীলদা, রজত গুহতো সেদিন খুন হয়নি। তাহলে?

—আগেই বলেছি, দুজনেই দুজনের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। মিতা মণ্ডল নিধনের জন্য রজতও বসে ছিল না। তার প্ল্যানটা ছিল অন্যরকম। সে চেয়েছিল মিতা মণ্ডলেব বিরুদ্ধে কতকগুলো অকাট্য প্রমাণ সাজিয়ে সে খুন হয়েছে এমন একটা ব্যাপার তৈরি কবতে। তাই সে রাত্রে, একটা নির্জন জায়গায় বজত আমাদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল। গাড়ির মধ্যে কেমিক্যাল রক্ত ছড়িয়ে দিয়েছিল। সিগারেটেব কারসাজি, মিতা ব্যবহাব করে এমন একটা শাল, আর পারফিউম ছড়িয়ে দিয়েছিল। ইচ্ছে করেই একটা চাবি কী-বোর্ডে ঝুলিয়ে অন্য চাবি দিয়ে দরজা লক করে জঙ্গলের মধ্যে নেমে গিয়েছিল। দবজা লক করার উদ্দেশ্য যাতে তাড়াতাড়ি আমি খোঁজাখুঁজি শুরু করতে না পারি।

—তা ওভাবে তার ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে যাবার উদ্দেশ্য?

—বলছি। এটা জেনেছি সুদীপ্তার ঘর থেকে পাওয়া একটা চিঠি থেকে।

বিকাশ বাধা দিলেন,—সুদীপ্তার ঘরে আপনি আবার চিঠি পেলেন কখন?

—মনে আছে আপনাদের বসিয়ে রেখে আমি পাশের ঘরে গিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ মনে আছে।

—ঐ ঘরেই চিঠিটা পাই। পড়ছি শুনুন। চিঠিটা আমাকেই লেখা। চিঠিটা পড়েই বুঝতে পারি বজত গুহ বেঁচে আছেন। তাহলে শুনুন, বলে নীল পকেট থেকে একটা হাল্কা সবুজ রঙের চিঠি বার কবে পড়তে শুরু করল—

'প্রিয় নীলাঞ্জনবাবু, যদিও আপনাকে আমি এর আগে দেখিনি বা চিনি না। নামও কোনওদিন শুনিনি। তবে আপনার পরিচয় কার্ড দেখে বুঝেছি কেন আপনি আমার সঙ্গে দেখা কবতে চান। এ চিঠি লেখাব পিছনে আমার কোনো আত্মিক তাগিদ নেই। ওসবে আমাব কোনো বিশ্বাসও নেই। তবু লিখছি এই কারণে আমি বেশ বুঝতে পারছি, যে কোনদিন আমার মৃত্যু হতে পাবে। মানে আমি খুন হতে পারি। কিন্তু আমি খুন হবো এবং আব একজন লাভবান হবে তা হতে পাবে না। তাই দুজনেবই মুখোশ আমি খুলে দিতে চাই। আপনাদের ধারণা রজত গুহ মারা গেছে। না তা নয়, বজত গুহ বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে! আর যার মৃতদেহ আপনারা পেয়েছেন সে আমার স্বামী দিব্যেন্দু কব। হ্যাঁ সে রাত্রে বজতই তাকে খুন করেছে। তার খুন হওয়াব একমাত্র কারণ রজত তাব নিজের মৃত্যুটাকে সাজাতে পারছিল না। এক ঢিলে সে দুটো পাখি মেরেছে। স্মিতাদেবী আমাদের স্বামী-স্ত্রী দুজনকে প্রায় কিনে নিয়েছিলেন অর্থ দিয়ে। আমাদের সত্যিই অর্থের দবকার ছিল। আমাকে স্মিতাদেবী টাকা দিতেন বজতের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন কবার জন্যে। আর আমার স্বামীকে দিতে চেয়েছিলেন এককালীন থোক এক লক্ষ টাকা। যদি সে কোনো নির্জন জায়গায় রজত গুহকে হত্যা কবতে পাবে। রজত বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। তাই সে ঐ দিন সকালে হাওড়ায় আমাদেব পুরনো বাড়িতে আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করে। বিশেষ প্রয়োজনে তাকে আমতলায় যেতে বলে। এখানেও টাকার লোভ। দিব্যেন্দু রাজি হয়। কারণ রজতকে খুন করাব জন্যে স্মিতাদেবী লক্ষ টাকা দেবেন আব বজতকে খুন করার পক্ষে আমতলার নির্জনতা আদর্শ জায়গা। দিব্যেন্দু আমতলায় একটি নির্দিষ্ট যাবার আগে স্মিতাদেবীব সঙ্গে

দেখা করে। তাকে রজতের আমন্ত্রণের কথা বলে। এও জানায়, সেই রাতেই সে রজতকে খুন করবে যদি ফিফ্‌টি পার্সেন্ট অ্যাডভান্স পায়। স্মিতা দেবীর কাছে তখন অত টাকা ক্যাশ ছিল না। নগদ কিছু টাকা দিয়ে তিনি কথা দেন কাজ শেষ হলেই পুরো টাকা তিনি নগদে দিয়ে দেবেন। এবং সেটা পরের দিনই।

পরস্পর চক্রান্তকারী দুটো সামাজিক শয়তানের ফেরে পড়ে সে রাত্রে আমার অপেশাদার নির্বোধ স্বামী রজতের হাতে খুন হয়। রজত নিজের জামাকাপড় তাকে পরিয়ে একটা জলা জায়গায় ওর দেহটা ফেলে দিয়ে সে রাত্রে কোথাও পালিয়ে যায়।

কিন্তু যে অর্থের কারণে দিব্যেন্দু প্রাণ দিল সেই অর্থই আর পেলাম না। রজতের মৃত্যুর খবর রাষ্ট্র হবার পর স্মিতা গুহ একেবারে পাল্টে গেলেন। প্রথমে তো আমাকে চিনতেই পারছিলেন না। একদিন তো সেলিম নামের বেয়ারাটা আমায় গালাগাল দিয়ে প্রায় ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে চেয়েছিল। কিন্তু আমি রুখে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করাতে স্মিতা বলেছিলেন, টাকা তিনি আমায় দেবেন না, দিব্যেন্দুকে ওর কাছ থেকে গিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এবং প্রমাণ করতে হবে রজত মারা গেছে।

কিন্তু কোথায় দিব্যেন্দু? আমি যদি বলি সে বাড়ি আসছে না তাতে কোন লাভ হত না। সে না হলে টাকা পাওয়া যাবে না। তখনও তার মৃত্যুর খবর পাইনি। মৃত্যুর খবর পেলেও স্মিতাদেবীকে তা বলা যেত না। কারণ তাহলে তো চুক্তিমাফিক টাকা পেতে পারি না। কারণ টাকাটা তো রজতের জীবনের বিনিময়ে। কোন প্রমাণ ছিল না রজতের মৃত্যুর। যদিও খবরের কাগজে রজতের মৃত্যুসংবাদ ছাপা হয়ে গেছে। কিন্তু দিব্যেন্দু না এলে তো টাকা পাব না। যাইহোক এর ঠিক এক সপ্তাহ পরে রজত আমার বাড়ি এসে হাজির। ওকে জীবিত দেখেই আমি বুঝতে পারলুম, কার মৃত্যু হয়েছে। রজত সেদিন অ্যাটাচি ভরে অনেক টাকা এনেছিল। আমার হাতে অ্যাটাচিটা তুলে দিয়ে ও বলেছিল,—স্যরি সুদীপ্তা, দিব্যেন্দুকে না মেরে আমার কোন উপায় ছিল না। ওকে না মারলে আমাকেই ওর হাতে মরতে হত। কারণ আমার স্ত্রী ওকে লাগিয়েছিল আমাকে খুন করার জন্যে। অবশ্য তোমার ভাবনার কী আছে? ওরকম অপদার্থ একটা লোক, গেলেই বা কী থাকলেই বা কী? এ টাকাগুলো এখন রাখ। আমি তো আছি, টাকার তোমার কোন অভাব হবে না। অবশ্য এ ব্যাপারে তোমায় সম্পূর্ণ মুখ বন্ধ রাখতে হবে চিরকালের মতো। তারপর স্মিতাকে পুলিস অ্যারেস্ট করার পর, আমার শেষ খেলা খেলতে হবে। সেদিন তুমি আমার পাশে থাকবে, বলবে রজত গুহ নয়, দিব্যেন্দু কর, মানে তোমার স্বামীকে খুন করেছে স্মিতা। সেসব প্রমাণও আমি ছড়িয়ে এসেছি। দিব্যেন্দুকে খুনের বা খুন করানোর অপরাধে স্মিতার নির্ঘাত জেল হবে। আইনত তখন আমি হব রয় এন্টারপ্রাইসের মালিক। আমার কথা যদি মেনে চল, তাহলে তখন তোমায় আমি বিয়ে করব। আর যদি বেগোরবাঁই কিছু করার চেষ্টা করো তাহলে

নীলাঞ্জনবাবু, রজত প্রায়ই আসছে আমার বাড়ি। খুব সম্ভবত সে খবর পেয়েছে আমি স্মিতাদেবীর বাড়ি যাতায়াত করছি। এবং আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এমন খবরও তার জানা হয়ে গেছে। রজত আমায় শাসিয়ে গেছে মুখ না খুলতে। আমি জানি রজত আমায় বিশ্বাস করে না। তাই আমার আশঙ্কা যে কোন দিনই আমি খুন হতে পারি। আমার মতো মেয়ের জীবনের দাম কিছুই নয়। কিন্তু আমি বা আমার স্বামী দুটো শকুনের জন্যে প্রাণ দেবে আর তারা বেঁচে থাকবে তা হয় না। বৃহস্পতিবার আপনার আসার কথা। রজত জানে। এর আগেই যদি আমার মৃত্যু হয় চিঠিটা আমি এমন জায়গায় রেখে যাব যা আপনার বা পুলিসের হাতে পড়বেই। আশা করি পরের কাজটা আপনি বা আপনারা করতে পারবেন। নমস্কারান্তে, সুদীপ্তা কর।

গুম হয়ে সবাই চিঠি পড়া শুনছিল। দীপুই নীরবতা ভাঙল,— তাই সেদিন তোমার মুখে অত হাসি। তা চিঠিটা পেলে কোথায়?

একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে নীল বলল,—অতি বড় চালাকও মাঝে মাঝে ভুল করে। রজতও করেছিল। যে বাদামী রঙা অ্যাটাচিটা সেদিন রজত গুহ অফিস থেকে নিয়ে বেরিয়েছিল, তাতে টাকা ছিল। আর সেই অ্যাটাচিটাই ছিল সুদীপ্তার দ্বিতীয় ঘরে একটা বইয়ের আলমারির পেছনে।

সুদীপ্তা বুদ্ধিমতী। চিঠিটা সেই অ্যাটাচিতে রেখে চাবি না দিয়ে আলমারির পেছনে রেখে দিয়েছিল। খোঁজাখুঁজি হলে আলমারির পেছনে বিসদৃশ ভাবে রাখা অ্যাটাচি পুলিসের হাতে তো পড়বেই।

—তা রজত তো অ্যাটাচিটা সরিয়ে ফেলতেও পারতো।

—হয়তো পারতো, বা পারেনি। সেটা তার নেগলিজেন্সি অথবা সময় পায়নি, যাহোক একটা কিছু হবে।

অনেকক্ষণ বিকাশ তালুকদার চুপ করে ছিলেন। এবার বললেন,—একেই বলে ধাড়ড়ো বুদ্ধি। আমার দ্বারা এতসব হত না। কিন্তু মশাই একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, আপনি সেই চার ছড়ানোর কথা বলেছিলেন। তা সেই চারটা কী?

—আমার 'চার' তপন বসু বলে এক ভদ্রলোক। রয় এন্টারপ্রাইসেই চাকরি করতো। রজত গুহর ট্র্যাপে পড়ে তার চাকরি চলে যায়। ঐ লোকটিরও দুজনের ওপর রেজায় রাগ। রজত গুহর ওপর রাগ ওর জন্যেই সে আজ বেকার। আর স্মিতার ওপর রাগের কারণ স্মিতা, আই মিন মিতা তাকে বাড়ি থেকে চোর জালিযাত বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ওকে দিয়ে দু জায়গায় দুটো ফোন করিয়েছিলাম, এক রজত গুহ দুই মিতা মণ্ডল। রজতকে ও নিজের পরিচয় দিয়ে জানায় রজত বেঁচে আছে সে তা জানে। এও জানে দিব্যেন্দুকে সে খুন করেছে। খুন করেছে তার নিজের স্ত্রী স্মিতা গুহকে। সে জানে কোথায় তার লাশ পোঁতা আছে। একটি নির্দিষ্ট অমাবস্যার রাতে যেন পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে যে জায়গায় তার স্ত্রীর মৃতদেহ পোঁতা আছে সেখানে আসে। টাকা না পেলে পুলিসকে সে সবকিছু জানাতে বাধ্য হবে।

—এবার বুঝেছি, তালুকদার বললেন, মিতা মণ্ডলকেও তার কীর্তিকলাপের উদ্ধৃতি দিয়ে টাকার দাবি জানায়। এবং তারই ফলশ্রুতি আজ রাতে নির্দিষ্ট গাছতলায় দুজনের আগমন এবং নির্গমন, তাইতো?

—ইয়েস স্যার।

—কিন্তু দুজনেই মরল কেন?

—গোড়াতেই বলেছি দুটো শকুন একটা মড়ার খোঁজে আসছে। দুজনেরই উদ্দেশ্য ছিল তপন বসু নামক আপদটিকে শেষ করে দেওয়া। অমাবস্যার রাতটাকে বেছে নিয়েছিলাম আলোর স্বল্পতার জন্যে। বাগানের ওপাশটা প্রায় পোড়ো জঙ্গল। আর বড় একটা দেখভাল না করা পুকুর। ওটা রায়সাহেবের ইচ্ছে ছিল আরো একটা বাড়ি করার। দু'মেয়েকে দুটো বাড়ি দিয়ে পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। মিতা চলে যাবার পর তিনি সে বাসনা ত্যাগ করেন। সেই থেকেই জায়গাটা খালি থেকে থেকে হয়ে গেছে জঙ্গল। যাই হোক অন্ধকারে একটি পুরুষ মূর্তিকে আসতে দেখে মিতা গাছের পাশে লুকিয়ে পড়ে। এবং কাছাকাছি আসতেই গুলি চালায়। অবশ্য রজতও সঙ্গে রিভলবার নিয়ে গিয়েছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেও গুলি করে। এবং,

—আর তপনবাবু?

—তার তো আসার কোন দরকার নেই। আমার ইচ্ছে ছিল দুজনকেই হাতে নাতে ধরার। কিন্তু দুজনেই ফটাফট গুলি চালিয়ে বসবে সেটা আমারই হিসেবের ভুল। আগেই বোঝা উচিত ছিল দুটোই সমান শয়তান। আসলে আমিও তো মানুষ। আর কথায় আছে, টু অ্যার ইজ হিউম্যান। এটা আমার ভুল।

নীল একটু থামল। একটা সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, —তালুকদারবাবু, সেলিম ওরফে নিতাই মণ্ডলের ব্যবস্থা আপনি পুলিসি নিয়মে করবেন। তবে, আপনি পুলিসে আছেন, ভাল পোস্টেই আছেন,

জানাশুনোও আপনাব অনেক, দুজনের জন্যে আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করব। তারিণীদা আর তপন বাবু, দুজনেরই একটা করে চাকরি বড় দরকার। ওদের অবদান এক্ষেত্রে প্রচুর। আপনি চেষ্টা করলেই পারবেন।

—চাকরির বাজার বড় মন্দা বাঁড়ুজ্যেমশাই, ঠিক আছে চেষ্টা করব নিশ্চয়ই। আপনার কথা কি ফেলা যায়?

—ব্যস, আমাব ডিউটি খতম। সঙ্গে আমার মবিস আছে। গুড নাইট। আয় দীপু।

গাড়িতে ফিরতে ফিরতে হঠাৎ দীপু বলে উঠলো, —নীলদা তুমি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো, তোমার জীবনের অধিকাংশ রহস্যেব শেষ দৃশ্যটা শেষ হয় রাতের অন্ধকারে। কেন বলতো?

মৃদু হেসে সিগারেটের ধোঁয়াটা হাওয়ায় ভাসাতে ভাসাতে নীল বলল, —কাকতালীয় বলতে পারিস অথবা বলতে পারিস প্রকৃতির এটাই নিয়ম। প্রকৃতির বোধহয় ইচ্ছে ভোরটা সুন্দর হয়ে নেমে আসুক পৃথিবীর বুক থেকে তার সব কালিমাকে অন্ধকারেই সমাধিস্থ করে নতুন প্রভাতকে দেখতে চায়।

দীপু একবার তাকালো নীলের দিকে। নতুন করে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললো, —বাব্বা! কি কথার কি উত্তর!

মানিকজোড়
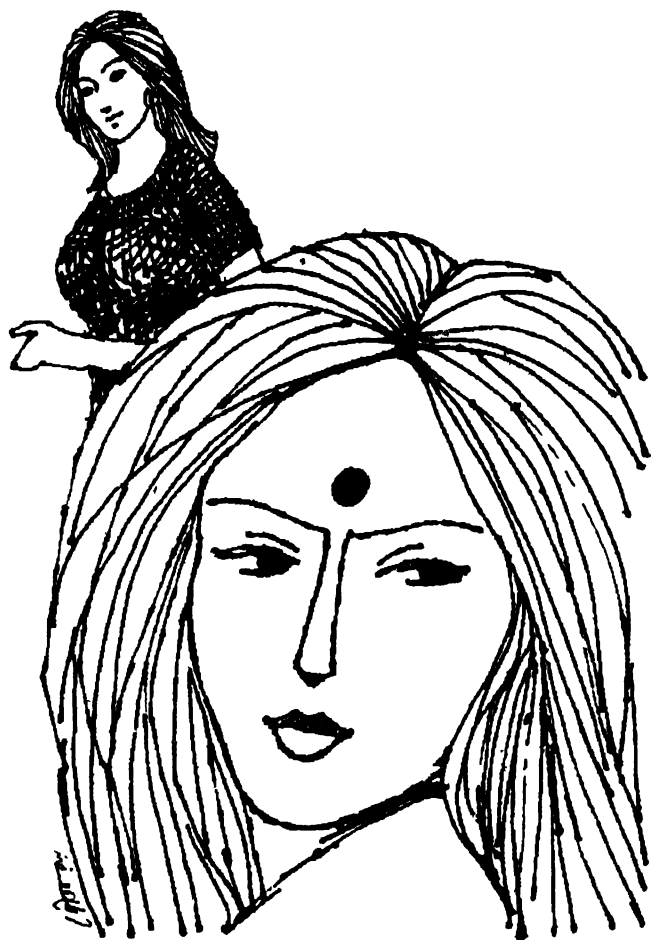
ব্যাপাবটা কারোবই ঠিক মাথায ঢুকছিল না। বিশ্বাস কবতেও মন চাইছিল না কারোবই। এটা কেমন কবে সম্ভব? শুভ্রা অ্যাপার্টমেন্টেব 'এ' ব্লকেব ছাদে দুই বন্ধু পাশাপাশি শুয়ে আছে। কাজল আব তুহিনা। দুজনেই মৃত। একটু আগে ডাক্তাব এসে বলে গেছেন দুজনেব কারো দেহেই প্রাণের অবশিষ্ট নেই।

ঘটনাটা প্রথমেই নজবে এসেছিল কেযাবটেকাব সুবোধ বেবাব। কদিন যাবৎ কয় নিজাবভাবে ওয়াব ক্র্যাক্ দেখা দেওয়ায রেগুলার সেখান থেকে জল লিক্ করে প্রায গোটা ছাদ জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল। সব থেকে অসুবিধা হচ্ছিল পাঁচতলাব তিন বাসিন্দাব। সুকেশ পাবেখ, শ্যামল দত্তবায আব শ্রীমতী লেখা মিত্রের। ছাদটা সার্বজনীন হলেও ঐ তিনজনই ব্যবহাব কবতো বেশি। জামাকাপড় মেলা, লেপ তোষক শুকোতে দেওয়া, কিম্বা জুতোয বোদ খাওয়ানো। ওদেব সিঁডি ভাঙতে হয কম। নীচেব তলাব বাসিন্দাবা ছাদ ব্যবহাব কবে কম। ধকল এড়াতে। তাছাড়া পাঁচতলা বাড়িব মোট এগাবোটা ফ্ল্যাটেব বাবান্দাব সুবিধা থাকায ছাদেব অতিবিক্ত সুযোগটা নীচেব তলাব মানুষেবা অ্যাভয়েড কবেই চলতো।

বিজারভার চিড খেয়ে যাবাব দরুন প্রথমে লেখা মিত্র এই কমপ্লেকশ্যান দেন কমিটিব কাছে। কাবণ ভাদ্রমাসেব চড়া বোদ্দুব পেয়ে মাত্র এক বছব আগেই তৈবি লেপটাই শুকোতে দিয়েছিলেন। আব সেটি যে কোন ভাবেই হোক ছাদেব মেঝেয পড়ে গিয়ে জল খেয়ে চুপচুপে হয়ে গেছে। সে লেপটাই আব সামনেব শীতে ব্যবহাব কবা যাবে বলে মনে হয না। শ্যামল দত্তবাযেব দুই ছেলে বব আব টনি বিকেল বেলায ছাদে উঠে বীতিমত ব্যাডমিন্টন প্র্যাকটিস কবে। কিন্তু ছাদ জলে থাকায তাদেব দু দুটো নতুন ফেদাব নষ্ট হয়ে গেছে। অতএব শ্যামল দত্তবাযও লেখা মিত্রেব ঠিক পবে পবেই কমপ্লেন লজ্ করেন। সুকেশ পাবেখ তাব মাকে নিয়ে একাই থাকে। সুকেশেব ছাদে বিশেষ কোন দবকার থাকে না। সে তাব অফিসেব চাকবি নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু অসুবিধা হয তাব মা মিসেস দেবকান্তা বি পারেখেব। তিনি কখনও বড়ি কখনও মশলা বোদে দেন। এখন জলটল জমে থাকায তাবও বেশ অসুবিধা হচ্ছে। একে বিধবা, তায় গুজরাটি মহিলা। মাছ মাংস খান না। এবং নিবামিষ খাদ্যে আচাব খুবই প্রয়োজনীয মুখতৃপ্তি। অতঃপব সুকেশ পাবেখও একটি লিখিত কমপ্লেন দাখিল কবে।

এ তো আব সবকাবি কমপ্লেক্স নয। হচ্ছে হবে বলে ছ মাস কাটিয়ে দেওয়া যায না। এখানে ওনাবশিপ ফ্ল্যাটে যাঁবা এসেছেন বিশেষ কবে 'এ' ব্লকে তাঁবা অধিকাংশই বহিস আদমি। অবশ্য দুএকজন সাধাবণ পরিবারও আছেন।

তো, কমিটি বিপোর্ট পাবাব সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাকশন নেয। সুবোধ ভোব পাঁচটাতেই এসেছিল রিজাবভারেব ফাটল পবীক্ষা কবতে। এক দিনেব মধ্যেই যাতে ফাটল বোজানো যায সেই কাবণেই। আব তখনই এসে সে আবিষ্কাব কবে দুই যুবতীকে। ছাদেব যে দিকে জমা জলেব উপদ্রব নেই সেই দিকে পাতা শতবঞ্চির ওপব চিত অবস্থায শযান দুই যুবতী। কাছে গিয়ে সে চিনতে পাবে দুজনকেই। একজন পশ্চিম দিকেব 'বি' ব্লকেব এক তলাব অপেক্ষাকৃত ছোট ফ্ল্যাটেব ওনাব বামবঞ্জন ঘোষেব মেয়ে কাজল ঘোষ। আর একজন 'এ' ব্লকের সেকেন্ড ফ্লোবেব দক্ষিণ-পূর্ব দিকেব ফ্ল্যাটেব মালিক তুহিনা রাযচৌধুরী স্বযং।

প্রথমটা সুবোধেব তেমন কিছু মনে হযনি। আব মনে হবেই বা কেন? তুহিনা আব কাজলেব নিবিড় বন্ধুত্ব শুধু শুভ্রা হাউজিং কমপ্লেক্সেব বাসিন্দাবা কেন গোটা 'এ' এবং 'বি' ব্লকেব অনেকেবই জানা। তুহিনা আর কাজল যেন মানিকজোড়। আব ওবা আছেও অনেকদিন। সেই যবে থেকে পাশাপাশি দুটো অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি হয়েছে। সর্বপ্রথম দু ব্লকে ওবা দুজনেই এসেছিল। আব সেই থেকেই ওদেব বন্ধুত্ব।

কিন্তু অত ভোরে দুই যুবতীকে ঐ ভাবে চিত অবস্থায় পাশাপাশি বিসদৃশ ভাবে শুয়ে থাকায় এবং ডাকাডাকিতে সাড়া না দেওয়ায় সুবোধের মনে কিছু খট্‌কা লাগে। দুদ্দাড় পদক্ষেপে সে নীচে নেমে এসে কমিটি সেক্রেটারি নীরেন হালদাকে খবর দেয়। নীরেন হালদার প্রথমে তেমন পাত্তা না দিলেও কাজলের ঐ ব্লকে এসে ছাদে শুয়ে থাকা সাদা মনে মেনে নিতে পারলো না। কারণ 'বি' ব্লক থেকে 'এ' ব্লকে এসে রাত্রে ছাদে শুয়ে থাকাটা তার কাছে বিসদৃশ ঘটনা। সে সটান 'এ' ব্লকের ছাদে এসে মেয়ে দুটির সামনে দাঁড়ায়। হালদার পোড় খাওয়া লোক। মেয়ে দুটোর মুখ চোখের চেহারা দেখেই কিছু একটা আঁচ করে। নাড়িটাড়ি টেপার ধান্দা ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার আশুতোষ চ্যাটার্জিকে খবর দেয়। ডাক্তার আসার আগেই লোকমুখে সারা কমপ্লেক্সে খবরটা ছড়িয়ে যায়। উপচে পড়ে 'এ' আর 'বি' ব্লকের কৌতুহলী বাসিন্দাদের ভিড়। তবে নীরেন হালদার বেশ বিচক্ষণ। কাউকেই বডি ছুঁতে দেয়নি। আশু ডাক্তার নাড়ি টিপে গম্ভীর মুখে বলে দেন, একস্‌পায়ার্ড। আর কিছু করার নেই। আপনি বরং পুলিসে খবর দিন। পুলিসের নামে গুঞ্জন বাড়ে। আর ঝামেলায় থাকতে নারাজ অনেকেই হাল্কা হতে থাকেন।

কিছুদিন যাবৎ পুলিস-অফিসার বিকাশ তালুকদার এই শুভ্রা হাউজিং কমপ্লেক্সের কাছাকাছি থানায় বদলি হয়ে এসেছেন। এ অঞ্চলটায় ইদানীং ক্রাইম বেড়ে যাওয়ায় দায়িত্ববান অফিসার হিসাবে তিনি এই থানার দায়িত্ব পান।

অতঃপর একজোড়া অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্যে তিনি সদলবলে এসে হাজির হন। তাঁর অনেক দিনের বন্ধু গোয়েন্দা নীল ব্যানার্জিকেও তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। তাঁর ধারণা নীল ব্যানার্জি সঙ্গে থাকলে তাঁর চাকরির দিক থেকে তিনি খুব সেফ্। আর নীল ব্যানার্জি রহস্যের গন্ধ পেলেই ভাগাড়ের মরা গরুর সন্ধানে শকুনি যেমন তৎপর হয়ে ওঠে, সেও রহস্যের তাগিদে, আর নিজের তেমন কোন সিরিয়াস কেস হাতে না থাকায় বিকাশ তালুকদারের সঙ্গী অ্যান্ড অ্যাডভাইসার হয়ে যায়। আর দীপু তো নীলের স্যাটালাইট।

ওরা যখন শুভ্রা হাউজিং কমপ্লেক্সে, যার পোশাকি নাম শুভ্রা অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে পৌঁছল তখন কতিপয় মহিলার কান্না আর উৎসাহী মানুষের ভিড়ে এবং টুকিটাকি মন্তব্যে ছাদ সরগরম। কিছু ভিড় পাতলা হবার পরেও।

পুলিস দেখলেই সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। বিশেষতঃ মানুষগুলো যদি সাতে পাঁচে না থাকা গেরস্ত মানুষ হয়। নিমেষের মধ্যে জায়গাটা নড়েচড়ে ওদের আসার পথ পরিষ্কার করে দিল। বিকাশ তালুকদার একবার আলগোছে সবার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন,—আপনারা সবাই এই অ্যাপার্টমেন্টেই থাকেন?

প্রথমে কারো কাছ থেকেই কোন উত্তর এলো না। বিকাশ আবার সবার দিকে তাকাতেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন,—হ্যাঁ এরা সকলেই পাশাপাশি দুটো বাড়িতে থাকে। অবশ্য বিভিন্ন ফ্ল্যাটে।

—ঠিক আছে। আপনারা আপাতত যে যার ফ্ল্যাটে ফিরে যান। এখানে অযথা ভিড় করে কোন লাভ নেই। আমাদের কাজ করতে দিন। দরকার মতো আপনাদের ডেকে নোব।

আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হতে থাকে। তবে ছাদের দরজার মুখ থেকে জটলাটা সরলো না। নীল আর দীপু ততক্ষণে মৃত মেয়ে দুটির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিথর দুটি দেহ। দুটি মেয়েই প্রায় সমবয়েসী। কত আর বয়েস হবে, বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। মনে হচ্ছে দুজনেই ঘুমচ্ছে। এখুনি ডাকলে হয়তো উঠে বসবে। একজনের মুখে তেমন কোন মৃত্যুকালীন যন্ত্রণার চিহ্ন নেই। তবে অন্য মেয়েটির মুখ কিছুটা অস্বাভাবিক। একটা শতরঞ্জির ওপর দেহ দুটো শয়ান। দুজনের মাথার নীচে কোন বালিশ-টালিশ নেই। পাশে একটা বীয়ারের বোতল। তলার দিকে কিছুটা অবশিষ্ট আছে। দুটো কাচের গ্লাস। তার মধ্যে একটি নিঃশেষিত অন্যটি মনে হয় ছোঁয়াই হয়নি। নীল তো বলেই ফেলল, —এটা কেমন করে হয়?

বিকাশ তালুকদার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, —কিসে কী হয় ব্যানার্জি সাহেব?

—একটা ব্যাপার লক্ষ্য করুন, কোন ট্রে নেই। স্ন্যাক্স্ নেই। দুটো গ্লাস আছে। একটা খালি। অন্যটা ভর্তি। একটা ভিনদেশী বীয়ারের বোতল। টুবর্গ। সম্ভবত মেয়ে দুটো ড্রিঙ্ক করতো।

—হ্যাঁ। সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আজকালকার ছেলেমেয়েদের কাছে এখন ড্রিঙ্ক করাটা কোন ব্যাপারই নয়। কিন্তু বিশেষ লক্ষণীয় কি কিছু আছে?

—একটু ভাবুন। বুঝতে পারবেন।

দীপু উসখুস করছিল। ও বলল, —আমি বলব নীলদা?

—বল।

—আইদার ভর্তি গ্লাসে বীয়ার ঢালবার পর ফাঁকা গ্লাসে আর বীয়ার ঢালার সময় পাওয়া যায়নি। আর. .....

নীল সজোরে মাথা নেড়ে বলল,—উঁহু, তা হতে পারে না।

হাঁটু গেড়ে গ্লাসের কাছে নাক নিয়ে ঘ্রাণ নিতে নিতে বলল, —দুটো গ্লাসেই ঢালা হয়েছিল। গন্ধটা সম্পূর্ণ উবে যায়নি।

—আপনি ঠিকই বলেছেন ব্যানার্জি সাহেব, তালুকদার অভিজ্ঞ চোখে বট্‌ল্‌টার দিকে তাকাতে তাকাতে বলে,— দুই বন্ধু ছাদে এসেছিল। বীয়ারের স্বাদ নিতে নিতে রঙিন হবার প্ল্যানও ছিল। সেখানে একজনের ভর্তি হলে অন্য জনেরও ভর্তি হবার কথা। এবং সেটা না করেই বট্‌ল্‌-এর মুখ বন্ধ করে দেবার কোন মানেই হয় না। মানে অঙ্ক মেলে না। অ্যাম আই রং ব্যানার্জি সাহেব?

—না রং নন। অঙ্ক তাই বলছে। বিকাশবাবু একবার দেখুন তো বটলে ঠিক কতোটা বীয়ারের অবশিষ্টাংশ রয়ে গেছে।

বিকাশ এসেই হাতে পাতলা নাইলন গ্লাভস্ পরে নিয়েছিলেন। এগিয়ে গিয়ে আলতো হাতে বট্‌লটা তুলে ছিপিটা পরীক্ষা করেন। হালকা করে লাগানো ছিল। একটু কালচে রঙের টুবর্গ বীয়ারের বট্‌ল্। ছিপিটা না খুলেই আলোর দিকে তুলে ধরে দেখেন যা আছে তাতে মাত্র একটা গ্লাসই ভরতে পারে।

—ব্যানার্জি সাহেব, আমার মনে হয় ওদের একজন পুরোটাই খেয়েছে আর একজন একেবারেই স্পর্শ করেনি।

—হুঁ, বলে নীল আরো তীক্ষ্ম করতে চাইল নিজের দৃষ্টি। হঠাৎ দীপু পাশে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, —গুরু একটা ডিস্‌প্যারিটি তোমার চোখে পড়েছে?

—কী?

—মেয়ে দুটোর চেহারায়?

—যেমন?

—ডানপাশের মেয়েটা, যেমন টকটকে রঙ ঠিক চোখ ফেরানো যায় না এমন মুখ। এককথায় পরমাসুন্দরী। যাকে বলে রীতিমত ডানাকাটা। কিন্তু

—হ্যাঁ, বাঁ দিকের মেয়েটা খুবই আটপৌরে, তাইতো?

—শুধু তাই নয়, সব কিছুতেই দুজনের মিলের থেকে অমিলটাই বেশি। মেয়েটিকে দেখলে মনে হয় বেশ বড়লোকের মেয়ে। সাজে, পোশাকে, চুলের স্টাইলে বেশ মড্ টাইপ। হোয়্যারাজ, সেকেন্ড মেয়েটি, আটপৌরে মুখের মধ্যে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য তো নেইই, উপরন্তু পোশাক-পরিচ্ছদেও নিতান্তই দরিদ্র মনে হয়। একটা অত্যন্ত সস্তা দরের ছাপা শাড়ি। গায়ের রঙটাও মাজা-মাজা। মুখের মধ্যেই দারিদ্রের চিহ্ন স্পষ্ট। মেয়েটা ওর কাজের মেয়েটেয়ে হতে পারে। তবে,

—হ্যাঁ বল, তবেটা কী?

—সুন্দরী মেয়েটির থেকে অন্য মেয়েটির স্বাস্থ্যই যেন সম্পদ। খানিকটা গ্রামবাংলার স্বাস্থ্যবতী সদ্য যৌবনা। অবশ্য চোখ বোজানো থাকলেও মুখটার মধ্যে একটা আলগা চটক আছে। তোমার কি মনে হয়?

নীল মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, —তোব জ্ঞানচক্ষু আস্তে আস্তে খুলছে।

—আরে বাবা দেখতে হবে তো আমি কাব চামচা।

কপট রাগে নীল ধমকায়,—শাটাপ। এ ধরনেব কথাবার্তা আর কখনো বলবি না।

দীপুর কথাটা কানে গিয়েছিল বিকাশবাবুর। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে উনি বলেন, —ইউ আব কারেক্ট দীপুমাস্টাব। আজকাল চামচারা স্বীকারই করতে চায় না যে তারা চামচা। তোমাব সৎসাহস আছে।

—তা যা বলেছেন, দীপু পার্সোন্যাল খোঁচা হজম করতে না পেরে বলে, আজকাল চামচাব ... হাতাদেব দুরবস্থা আরও বেশি। তাই না বিকাশদা।

—ইউ শাটাপ। এখন রঙ্গ রসিকতাব সময় নয়।

—আমিও সেটাই বলতে চাইছিলাম, কোন মানুষকেই কোন সময়েই হ্যাটা করা উচিত নয়।

—তোবা কি দুজনে ঝগড়া কববি, এখানে এসেও?

—নো গুরু, ঠোঁটে আঙুল বেখে দীপু চুপ কবে যায়।

নীল বিকাশ তালুকদারেব দিকে মুখ ফিবিয়ে বলে,—বিকাশবাবু, ঐ দুটো গ্লাস, এবং বীয়ারেব বট্‌ল, তিনটেই ফোবেনসিকে যাবে। উইথ দ্যাট লিক্যুইড়। ফিঙ্গাব প্রিন্ট যেন কোনমতেই মিস্ না হয়

—ওহ্ সিওব। ডোন্ট ওবি। ফোরেনসিক এসব ভুল করে না।

—ঠিক আছে, আপনি আপনাব সুবিধামতো বডি রিমুভ করাব ব্যবস্থা করুন। আর একটা কথা, ছাদেব ওদিকটায় এখনও জল জমে আছে। কোন ফুট প্রিন্ট্ থাকলে কাজে লাগতে পারে। আমি ততক্ষণে ফ্ল্যাটগুলোকে নেড়েচেড়ে দেখি।

সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তখনও সিঁড়িব মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। নীল তাঁকে হাতেব ইশারায় কাছে ডাকল। বৃদ্ধ সটান চলে এলেন নীলেব কাছে,—আমায় কিছু বলবেন?

নীল কাছ থেকে ভদ্রলোককে দেখল। বযস প্রায় সত্তব পেরিয়ে গেছে। চোখের ঔজ্জ্বল্য সবে গিয়ে কেমন একটা ডেড্‌লি যোলাটে ভাব। বঙটা বেশ পরিষ্কাব। চোখে গোল্ডেন ফ্রেমেব বাইফোকাল কাচ। পবনে ভালো কোয়ালিটিব লুঙ্গি এবং সাদা আদ্দির হাফ পাঞ্জাবি।

—হ্যাঁ। এখানে আপনাকেই সব থেকে বয়ঃজ্যেষ্ঠ মনে হচ্ছে। আপনাব কাছ থেকে কিছু ইনফবমেশান চাইছি।

—বেশ তো। বলুন, কী আপনাব জিজ্ঞাস্য?

—যে দুটি মেযে মাবা গেছে তাবা কি এই শুভ্রা অ্যাপার্টমেন্টেই থাকে?

—হ্যাঁ। কাজল আব তুহিনা।

—কাব নাম কাজল?

—বাঁদিকেরটি। ময়লা রঙ, জংলা শড়ি পবা, ওরই নাম কাজল। কাজল ঘোষ। আর পাশেব মেয়েটি তুহিনা বাযচৌধুবী। নামকবা প্রোমোটাব অহীন্দ্র বাযচৌধুরীব মেয়ে।

—প্রোমোটারেব মেয়ে এই ফ্ল্যাটে থাকে?

—না থাকার কী আছে? এই পুরো অ্যাপার্টমেন্টটা অহীনবাবুরই তৈবি। তারই একটা ফ্ল্যাট মেযেব নামে করে দিয়েছেন। পয়সাব তো আর অভাব নেই।

—তা ঠিক আছে। আচ্ছা আপনার নামটা যেন কী?

—সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়।

—আপনি কোন্ মানে কত নম্বব ফ্ল্যাটে থাকেন?

—আমাদেব এই কমপ্লেক্সটা দুটো সেক্টবে ভাগ কবা। 'এ' আব 'বি'। 'এ' ব্লকেব দাম অপেক্ষাকৃত বেশি। 'বি' ব্লকেব দাম অনেক কম। 'বি' ব্লকটা করা হয়েছিল নিম্নআয়ী লোকের জন্যে।

—এবকম কবাব কারণ? এতে তো প্রোমোটাবের লস।

—নাহ্। হবেদবে পুষিয়ে যায়। লস খাবাব জন্যে কি কেউ বিজনেস করে? 'বি' ব্লকে ঘরের সংখ্যাও

বেশি। ঘরের সাইজও ছোট। তার ওপর,

—হ্যাঁ বলুন।

—নিম্ন আয়ের লোকদের জন্যে কিছু স্কিম না করলে সরকারি লোন পাওয়া যেতো না। অহীনবাবু ব্যবসাদার মানুষ তো। সবদিক ভেবেই কাজ করেন।

—হুঁ। দুটো বাড়িতে টোটাল ফ্ল্যাট কত?

—'এ' ব্লকে চারতলা পর্যন্ত দুটো করে মুখোমুখি ফ্ল্যাট। কেবল পাঁচতলায় তিনটে। আর 'বি' ব্লকে সব ফ্লোরেই তিনটে করে ফ্ল্যাট। মানে 'এ' আর 'বি' মিলিয়ে মোট ছাব্বিশটা ফ্ল্যাট। আমি থাকি 'এ' ব্লকের সেকেন্ড ফ্লোরের ছ'নম্বর ফ্ল্যাটে।

—এটা তো ওনারশিপ ফ্ল্যাট?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তুহিনা রায়চৌধুরী কত নম্বর ফ্ল্যাটে থাকতো?

—জাস্ট্ আমার উল্টোদিকের ফ্ল্যাটে। ওর নাম্বার ফাইভ।

—ওর বাড়ির লোকজন, আই মিন অহীনবাবু বা তুহিনার মা?

—আগেই বলেছি অহীনবাবু দেদার বড়লোক মানুষ। ওঁর দুই ছেলে এক মেয়ে। দুই ছেলের আলাদা আলাদা দুটো ফ্ল্যাট আছে। অবশ্য সেটা লেকমার্কেটের দিকে। আর মেয়েকে দিয়েছেন এই ফ্ল্যাট। তুহিনা মোটামুটি একাই থাকতো। মা বাবা বা ভায়েরা মাঝে মাঝে এসে হইহল্লা করে চলে যেতো।

—অ্যাডাল্ট মেয়ে, একা থাকতো? বাবা মা অ্যালাউ করতো?

—আমাদের এই টোটাল কমপ্লেক্সটা খুবই নিরাপদ। দারওয়ানের চোখ এড়িয়ে কমপ্লেক্সে ঢোকা মুশকিল। একা থাকায় এমনিতে কোন ভয়ের কিছু নেই। তাছাড়া তুহিনা খুবই স্মার্ট মেয়ে। সারা কমপ্লেক্সের সবার প্রিয় মেয়ে। যেমন পড়াশুনোয় ভালো তেমনি গানবাজনা, অভিনয়। কথবার্তায় ওকে টেক্কা দেওয়া বেশ শক্ত। ও একাই সবাইকে মাতিয়ে রাখতো।

—কিন্তু ভয়ের ব্যাপার যে ছিল সেটা তো দেখতেই পাচ্ছেন।

বৃদ্ধ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন,—হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। ঐ জন্যেই আমি অহীনকে বারবার বলতাম, তোমার সুন্দরী রূপসী মেয়ে, যতই আপটুডেট হোক, ওকে একা একটা ফ্ল্যাটে রেখো না। অহীন হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলতো, সি ইজ অ্যাডাল্ট ইনাফ। সি নোজ হাউ টু লিভ অ্যালোন।

—হুঁ, বলে নীল একটা সিগারেট ধরানোর সময় নিয়ে আবার জিগ্যেস করল, আর নেক্স্ট মেয়েটি, আই মিন কাজল ঘোষ? চেহারা দেখে মনে হয়—

—আপনি ঠিকই ধরেছেন বড় দুঃখী মেয়ে মশাই। জাস্ট্ রিভার্স অব হার বেস্ট ফ্রেন্ড।

—বেস্ট ফ্রেন্ড মানে?

—ওর সঙ্গে সব থেকে বেশি হলায় গলায় সম্বন্ধ ছিল তুহিনার। আমরা বলতাম মানিকজোড়।

—দুঃখী মেয়ে কেন বলছেন?

—ওর বাবা, মানে রামরঞ্জন ঘোষ, ফ্ল্যাটটা কেনার পরই একটা অ্যাকসিডেন্টে ইনভ্যালিড হয়ে যায়। বাঁচার আশা ছিল না। কিন্তু বাঁচল। তবে দুটো পা খুইয়ে। ফলে চাকরিটা করতে পারল না। বুঝতেই পারছেন, সাধারণ চাকুরে, সীমিত রোজগার। বউয়ের গয়না আর জমানো কিছু টাকায় ফ্ল্যাট কেনা যায় না। তবে অহীনবাবুর দৌলতে, বলতে পারেন দয়ার, ফ্ল্যাটটা ও পেয়ে যায়। তার ওপর কাজল ছাড়াও রামরঞ্জনের আরও এক মেয়ে আর ছেলে আছে। ছেলেটা তো খুবই ছোট। ছেলেটার কেসটাও খুবই স্যাড। ছোট থেকেই ছেলেটা ডাল। একটু ন্যালাখ্যাপা গোছের। ব্রেন কাজ করে না ঠিক মতো। মানে আনডেভলপড্ ব্রেন। এটা ওদের ফ্যামিলির বার্নিং প্রবলেম। চাকরিটা থাকলে হয়তো রাম ম্যানেজ করে চলতে পারতো। ও বসে যাবার পর কাজলকেই সব সামলাতে হতো। এখন সেটাও গেল।

—কাজল কি চাকরি করতেন?

—হ্যাঁ। ওর বাবার কোম্পানিতেই চাকবি পেয়েছিল। আসলে সবই অহীনবাবুর আর ওঁব মেয়ে তুহিনার দয়া। কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিটাও তো অহীনবাবুর।

—ফ্যাক্টরিতে মেয়েদের কোন জব আছে নাকি?

—কেমিক্যালস্ ফ্যাক্টবি। মেয়েটা বি এস. সি পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। চিফ কেমিস্টের আন্ডারেই চাকরি করতো। মালিক ইচ্ছে করলে সবই হতে পারে।

—কাজলরা কোন্ ফ্ল্যাটে থাকে?

—গ্রাউন্ড ফ্লোরে। 'বি' ব্লকে। এক নম্বর ফ্ল্যাট। ওগুলোর দাম আবার সব থেকে কম।

—ঠিক আছে মিস্টার চ্যাটার্জি। আপনাকে আর বিবক্ত করব না। তবে যেহেতু আপনি তুহিনার সামনের ফ্ল্যাটে থাকেন, হয়তো কোন ইনফরমেশানের জন্যে আপনাব শরণাপন্ন হতে পাবি।

—অলওয়েজ ওয়েলকাম।

সোমনাথবাবু চলে যাবার পর নীল বিকাশ তালুকদাবের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দীপু তখন ছাদ থেকে কলকাতার ভিউ দেখছিল। নীল কাছে আসতেই বিকাশ বললেন,—তাহলে বডি এবার নিয়ে যেতে বলি? কী বলেন?

—তা তো বটেই। কিন্তু আপনার ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক কোথায়?

—বিনোদ শুয়োবটাকে বললুম তাড়াতাড়ি আসতে। এখনও পাত্তা নেই বাবুর।

—তাহলে উনি আসা পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা কবতেই হচ্ছে। কারণ এক্ষেত্রে ডিটেল্‌স্ ছবি, ইজ আ মাস্ট।

—একশোবাব। আপনি কি চলে যাচ্ছেন?

—না। দু একজনকে একটু বাজিয়ে দেখি।

—বৃদ্ধ ভদ্রলোকেব কাছ থেকে কিছু পেলেন?

—নাহ্, তেমন ইমপর্টান্ট কিছু নয়। জাস্ট কিছু অর্ডিনারি ইনফবমেশান।

—ঠিক আছে। ভাইট্যাল কাজটা আপনিই করুন। আমি এদিকটা সামলে আপনাকে মীট্ কবব। ছাদটাও একটু খুঁজে দেখি। ওহে চামচাবাবু, যাও গুরুব সঙ্গে। প্রকৃতি দেখার অনেক সুযোগ পাবে জীবনে, কিন্তু এসব মিস্ করলে আর দ্বিতীয়বার সুযোগ পাবে না।

অন্য সময় হলে দীপু একটা কিছু বলতোই। এখন আর কিছু না বলে নীলের কাছে চলে এল। নীল তখন কেয়াব টেকারকে ধরেছে, —তোমাব নাম কী?

—আজ্ঞে সুবোধ বেবা।

—তুমিই প্রথম দেখেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমার কোন সন্দেহ হয়নি?

—হয়েছিল সাহেব। ডাকাডাকি কবতেও যখন ওঠে না, তখনই মনে কু গেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে নীরেনবাবুকে খবর দিলুম।

—নীবেনবাবু কে?

—আজ্ঞে কো-অপাবেটিভেব সেক্রেটাবিবাবু।

—তাকে দেখছি না তো?

—একটু আগেই তো ছিলেন। বোধ হয় নীচে গেছেন।

—কাজল আর তুহিনা খুব বন্ধু ছিল, তাই না?

—একেবারে গলায় গলায়।

—ওরা কি প্রায়ই ছাদে এসে গল্প কবতো?

—বেশির ভাগ সময় তুহিনাদির ঘরেই কাজলদি থাকতো। আবার ছাদেও দুজনে বসে বসে গল্প করতো কোন কোন দিন। তবে এতো রাত বোধ হয় এই প্রথম।

—তা কাল কটার সময ছাদে উঠেছিল তাব কিছু জান?

—আজ্ঞে না সাহেব। আচ্ছা, দিদিমণিদেব কি কেউ মেবে দিয়েছে?

—কেন, হঠাৎ তোমার এ কথা মনে হচ্ছে কেন?

—না সবাই বলাবলি কবছিল, তাই।

—হুঁ। তুহিনা দিদিমণির বাড়িব লোকজন এসে গেছেন?

—ও হ্যাঁ, তাই তো, নীবেনবাবু তো ওঁদের খবব দেবার জন্যেই নীচে গেলেন।

—আচ্ছা সুবোধ, ছাদের জাস্ট নীচতলায় মানে পাঁচতলায কারা থাকেন?

—আজ্ঞে লেখা মাসিমা, পারেখ মাসিমা আর শ্যামলবাবু।

—সব ফ্ল্যাটেই তো দুটো করে ফ্ল্যাট আছে, তাহলে পাঁচতলায হঠাৎ তিনজন থাকে কী করে?

—আজ্ঞে শ্যামলবাবু আব পাবেখ মাসিমা পুরো পাঁচতলাটা নিতে চাইলেন না। ফলে মাঝখানে খানিকটা জায়গা বেঁচে গিয়েছিল। লেখা মাসিমা একা মানুষ। তাই তিনি ওটা নিলেন। ওযান রুম, ওযান কিচেন আর ওয়ান বাথ। সামনে একটুখানি জাযগায ডাইনিং। দামটাও একটু সুবিধে পেয়ে গিয়েছিলেন তাই,

—ঠিক আছে, চল তোমার পাঁচতলাতেই প্রথম যাওযা যাক।

—তাই চলুন।

ছাদ থেকে ওবা নেমে প্রথমেই গেল ডানদিকেব ফ্ল্যাটে। দবজায লেখা শ্যামল দত্তবায। সুবোধই বেল টিপল। বছর পঞ্চাশেব এক ভদ্রলোক দবজা খুলে দাঁড়ালেন।

—এনাবা পুলিসের লোক। আপনাব সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন।

শ্যামলবাবুর মুখে বেশ বিরক্তি। উনি বেজাব মুখে বললেন, —আমি তখনই জানতুম এইবাব পুলিসেব হ্যাপা আরম্ভ হবে। বলুন, কী বলতে চান?

স্বাভাবিক ব্যাপাব। গেবস্ত মানুষ। সাধারণত পুলিসেব গণ্ডগোলেব মধ্যে থাকতে চায না। নীল মুখে ফিকে হাসি টেনে বলে, —আপনাব চিন্তিত হবাব কোন কাবণ নেই মিস্টাব দত্তবায। এটা ফর্মাল ব্যাপাব। দু'দুটো ইযাং মেযেব অ্যাবনবমাল ডেথ। একটু ইন্ট্যারোগেশনেব তো দবকাব আছেই।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। বলুন কী জানতে চান?

ভদ্রলোক মোটেও ঘবেব মধ্যে ঢোকাতে চান না। দবজা আগলে দাঁড়িয়ে রইলেন। নীলও আব ঘবে ঢোকাব বাযনা না করে জিগ্যেস কবল,—আপনারা কি ছাদে ওঠেন?

—মাথাব ওপরেই ছাদ। উঠবো না কেন?

—রাতেও ওঠেন?

—নাহ্।

—কেন, এখন তো ভাদ্র মাস। পচা গবমেব মাস। ছাদে হাওযা খেতেও ওঠেন না।

—নাহ্।

কেঠেল জবাব।

—আপনার স্ত্রী?

—কালেভদ্রে। তবে আমার ছেলে দুটো ওটে। বিকেল বেলায।

—খেলাধুলো করে বুঝি?

—হ্যাঁ। ব্যাডমিন্টন খেলে। তবে বেশ কযেকদিন উঠছে না। ছাদেব ট্যাঙ্ক লিক হয়ে গেছে। জল জমে প্যাচ প্যাচ করছে। তাব ওপর যখন-তখন বৃষ্টি।

—মেয়ে দুটিকে ছাদে উঠতেও দেখেননি?

—নাহ্। আমার ফ্ল্যাটের দরজা সর্বদাই বন্ধ থাকে। আর দশটার পব তো ভেতর থেকে লক করে দিই।

—মেয়ে দুটি কেমন?

—ভালো। মানিকজোড়।

—আপনার সঙ্গে আলাপ ছিল?

—নাহ্। ইয়াং মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে যাব কেন? আমার বউ ওসব পছন্দ করে না।

—আপনার মিসেসের সঙ্গে আলাপ ছিল না?

—নাহ্। আমার মিসেস্ কারো সঙ্গেই কথা বলে না।

হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেলে সুবোধ। শ্যামল খেপে যায়।

—বেটা এক চড়ে তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দোব। হাসা হচ্ছে? এটা হাসির ব্যাপার?

তারপর নীলের দিকে তাকিয়ে বলে,—আপনার আর কিছু জানার আছে?

দীপু অনেকক্ষণ থেকে উশখুশ করছিল, —ও বলে উঠল, নাহ্, আর কিছু জানার নেই, চল ওর অন্য ফ্ল্যাটে চল।

দড়াম শব্দে দরজা বন্ধ করে দেন শ্যামল দত্তরায়। নীল সুবোধের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ নাচাতেই সুবোধ আবার ফিক্ করে হেসে উঠে বলল,—বুঝলেন না। ওনার বউ তো তোত্‌লা। বেজায় তোত্‌লা। একটা কথা শুরু করলে কম করেও আড়াই মিনিট সময় লাগবে সেটা শেষ করতে। ঐ জন্যেই উনি কারো সঙ্গে কথা বলে ফেঁসে যেতে চান না।

—স্যাড। তোমার ওভাবে হাসা উচিত হয়নি সুবোধ। চল পাশের ঘরে।

পাশের ঘরটা লেখা মিত্রের। সুবোধ কলিং বেলে চাপ দিতেই ভেতর থেকে উত্তর এল,—কে সুবোধ?

—হ্যাঁ মাসিমা। পুলিসবাবুরা এসেছেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে।

—ওনাদের বল একটু ঘুরে আসতে। আমি এখন চানঘরে।

—ঠিক আছে, নীল বলল, চল পাশের ঘরে যাওয়া যাক।

বেল টিপতেই এক বৃদ্ধা মহিলা দরজা খুলে দাঁড়ালেন।

—কেযা চাইয়ে?

উত্তরটা সুবোধই দিল, —মউসি ইয়ে দো সাহেব আপসে মিলনে আয়া।

—কিঁউ?

—কুছ বাত্‌চিত্ করনে কো লিয়ে।

—হামসে? ঠিক হ্যায় আইয়ে।

নীল আর দীপু মিসেস পারেখের ঘরে ঢুকল। সুবোধকে বলল, —সুবোধ তুমি বরং নীরেনবাবু এসেছেন কিনা খোঁজ নাও।

—যে আজ্ঞে, বলে সুবোধ চলে গেল। ওরা ভেতরে যেতেই মিসেস পারেখ বললেন, —বৈঠিয়ে। জরুর উয়ো দুনো লেডকিকো বারেমে আপ কুছ পুছতাছ করনে চাহ্‌তে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। বুঝতেই পারছেন দু দুটো মিসহ্যাপ।

—ই ক্যায়সে হো সক্‌তা অভিতক মেরি মগজমে নেহি আয়া। আপলোগ বৈঠিয়ে। আপলোক চায়ে পিয়েঙ্গে?

—না মিসেস পারেখ। তার আর দরকার নেই। আর এটা ঠিক চা খাবার সময়ও নয়। আপনি বসুন। আমাদের দু-একটা প্রশ্ন করার আছে। করেই চলে যাব।

—ঠিক হ্যায়। আপ পুছিয়ে।

মিসেস পারেখ গিয়ে সামনের চেয়ারে বসলেন। খুব রমরমা করে সাজানো নয়। সাধারণ মানুষের ঘরসংসার। দুটো শোবার ঘর। একটা ডাইনিং স্পেস। একটা রান্নার ঘর। একটা বাথরুম। দুটো শোবার ঘরই পাশাপাশি। টানা লম্বা বারান্দা। নীল প্রথমেই একটা অন্য ধরনের প্রশ্ন করল, —পারেখজি, আই মিন, আমি যতদূর জানি, আপনারা গুজরাটের মানুষ।

—জী হাঁ।

—তাহলে হিন্দীতে বলছেন কেন?

—কিঁউ কী, গুজরাটি ল্যাঙ্গুয়েজ আপলোগ সমঝেগা নেহি। ম্যায় হিন্দি ল্যাঙ্গোয়েজ জানতি হ্যায়। থোরা থোরা চায় তো বাংলা ভি। ম্যায় স্কুলমিসট্রেস থি না! ঠিক আছে আমি আপনা সাথ বাংলায় কোথা বলব।

—গুড। আপনি আপনার মতো করেই বলুন। আচ্ছা, মিসেস পারেখ, এই ফ্ল্যাটে আপনারা কে কে থাকেন?

—ম্যায় আউর মেরা লেড়কা, সুরেশ পারেখ।

—আর আপনার স্বামী?

—গুজর গিয়া। সো অ্যাবাউট টেন ইয়ারস এগো। বিনোদ পারেখ। আর আমার নাম হরিকান্তা বি পারেখ।

—ও হ্যাঁ, তাও তো বটে। আপনাদের নামের সঙ্গে স্বামীর নামও জুড়ে দিতে হয়। তা মিসেস পারেখ, আপনার ছেলেকে দেখছি না তো।

—কৌন? সুরেশ? উসকা কোই আনে যানে কা ঠিক নেহি। আজ ইখানে আছে। কাল চলিয়ে যাবে মুম্বাই কি চেন্নাই।

—বিজনেস?

—নেহি সাহেব। উও যো কামসে কাম করতা, উসকা ডিউটি অ্যায়সাই হোতা। কলকাতা ব্রাঞ্চের সেলস্ সুপারভাইজার হ্যায় না।

—তা এখনও বিয়ে থা করেনি?

—করবে। জরুর করবে। সুরেশ এক লেড়কিকো পসন্দ করেছে। বহুত বড়িয়া ঘর কি বেটি। লেকিন উ লেড়কি গুজরাতি নাহি আছে। বাঙ্গাল কা আদমি।

—এসব এখনও মানেন?

—পহেলে তো মানতি থি। লেকিন সুরেশ কি দিল নেহি তোড়নে চাতা। আমি সুরেশের দিল তোড়তে চাইছি না। লেড়কা লেড়কি যখন নিজেদের পসন্দ করে। তখন তো মানতেই পড়বে। আউর আমার উমরভি হয়ে গেছে। আমি কেন লেড়কা লেড়কির মনে কষ্ট দিবে। তো একসাল বাদ বাঙালী কা সাথ সাদি বানায়েঙ্গে।

—আচ্ছা এবার বলুন তো, যে দুটি মেয়েকে আজ সকালে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে তারা কেমন মেয়ে ছিল?

—বহুত আচ্ছি থি। দোনোহি। তুহিনা বেটিকে আমার খুব ভালো লাগতো। আমার দিল চাইতো কি, তুহিনা বেটির সাথে সুরেশের সাদি হোক। লেকিন,

—লেকিন?

—উয়ো দুনো সে আভতক কোই বাতচিত ভি নেহি হুয়া। উয়ো বহুৎ বোড় পহেলেসেই বাঙালিকো পসন্দ কিয়া থা। লিভ ইট ভাই সাব সবই ভগবানকা খেলা। তারপর সামান্য সময় চুপ করে থাকার পর মিসেস পারেখ বললেন, — আচ্ছা জি, আপনার কি মালুম হচ্ছে কোই আদমি দোনো লেড়কিকে আইসিন কিসিনে খুন কিয়া?

—হঠাৎ আপনার খুনের কথা মনে হল কেন?

—নেহি, অ্যায়সাই।

—খুন করতে পারে এমন কাউকে কি আপনার সন্দেহ হয়?

—নেহি মিস্টার। কাজল আর তুহিনা বেটি, দোনোহি বহুৎ আচ্ছি লেড়কি থি। কাজলকা স্টেটাস থোড়া লো হ্যায়। উসকা ফেমিলি বাইটি সে সাদা সাদা। লেকিন দিলসে বহুৎ পেয়ারে লেড়কি। আউর তুহিনা, এক ক্রোড়পতিকা একলৌতি বেটি। বহুৎ সুন্দর, বহুৎ ক্যারেক্ট। লেকিন দিমাকসে বহুত সিম্পল।

—ওদের কোন শত্রু ছিল না বলছেন?

—ডেফিনিট ম্যায় কুছ না বোল সেকু। লেকিন, দোনোকা একই দুষমন? খতম কিয়া একসাথ্‌ ইয়ে বহুত আজগুবি লাগতা।

—আপনি কত রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন?

—বাস, রাত এগারোকা অন্দর আমি শুয়ে পড়ি।

—ছাদে কোন আওয়াজ-টাওয়াজ পাননি?

—নেহি। মুঝে রোজই নিদ্‌কি গোলিয়া খানে পড়তা। ব্লাড সুগার হ্যায়। টেনশন যাদা হোনা ঠিক নেহি। উসি লিয়ে ডাগদরনে প্রেসক্রাইব কিয়া।

—ওদের দুজনের মধ্যে খুব আলাপ ছিল বলছেন?

—ইয়েস। অ্যাজ ইফ দে আর মেড ফর ইচ আদার। ভেরী ইনটিমেট।

—সুকেশবাবু ফিরবেন কবে?

—আ যায়গা চার পাঁচ রোজকা বাদ।

—মিসেস পারেখ আর আপনাকে বিরক্ত করব না, বলে নীল উঠে পড়ে। বেরুনোর মুখে হবিকান্তা পারেখ বললেন,—ইট্‌স্‌ আ ভেরী স্যাড ডিমাইস। মেরী একান্ত্‌ ইচ্ছা কি আপ খুনিকে পকাড় সেকে।

আবার লেখা মিত্র। লেখা মিত্রের ঘরে বেল টিপতেই মহিলা নিজেই দরজা খুলে দাঁড়ালেন। সদ্য স্নান সেরেছেন। দামি সাবানের গন্ধ ভুর ভুর করেছে। সুবোধ মাসি টাসি বলাতে মনে হয়েছিল অনেক বয়স হবে। না, ঠিক তা নয়। বছর চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই বয়েস। উজ্জ্বল টকটকে রঙ। মুখখানিও বেশ মিষ্টি। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। একটা পিঙ্ক রঙের প্রিন্টেড হাউসকোট। নীচে ম্যাক্সি। ঘাড় পর্যন্ত চুল। সিঁথিতে কোন সিঁদুরের দাগ নেই। ডানহাতে একটি মাত্র গহনা। একটি কোয়ার্জ ঘড়ি। পায়ে হাউস স্লীপার।

—আসুন। মহিলাই ডাকলেন।

দুজনে ভেতরে ঢুকল। মিসেস পারেখের থেকে অনেক ছোট ঘর। কিন্তু অনেক বেশি সাজানো। একপাশে বেডরুম। দামি বেডকভার ঢাকা খাট। লাগোয়া বাথ। তার পাশে কিচেন। ছোট্ট একটা ফালি জায়গায় সব কিছুই আছে। ফ্রিজ। ওয়াশিং মেসিন। খাওয়ার টেবিল। চারদিকে চারটে ছোট স্পেসের উপযোগী চারখানা চেয়ার। টেবিলে সুদৃশ্য কাজকরা চায়ের সরঞ্জাম। কিছু খাদ্যবস্তুও আছে। মহিলা সৌখিন। দেওয়ালে প্রিন্টেড ছবি। একটা জঙ্গলের দৃশ্য। ফুলদানিতে ফুল। সবই আছে। এবং গুছিয়েই আছে।

—আপনি একাই থাকেন?

—হ্যাঁ একাই।

—আপনার স্বামী?

—আমি ডিভোর্সি।

—স্যরি।

—এতে স্যরির কিছু নেই। ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। অ্যাডজাস্ট করতে পারিনি। সুখের থেকে স্বস্তিটাই বোধহয় বেটার। এখন আমার কোন আফসোস নেই।

—আপনার প্রফেশান?

—একটি কলেজের লেকচারার।

—আপনার পুত্রসন্তান?

—একটি মেয়ে। বিয়ে হয়ে গেছে। মেয়ে জামাই এলেও রাতে থাকে না। এই তো একটা ঘর।

—মেয়ে দুটিকে তো চিনতেন?

—তুহিনা আর কাজল তো? খুব ভালোভাবেই চিনতাম। তুহিনা ওয়াজ ভেরি মাচ পপুলার ইন দিস কমপ্লেক্স। এতো খারাপ লাগছে। আসলে ভাবতেই পারছি না মানিকজোড় আর নেই। সত্যিই মানিকজোড়। বেঁচে থাকার সময়ও থাকতো একসঙ্গে আর চলেও গেল একসঙ্গে। আমার মেয়ে ববির

সঙ্গে ওদের দুজনেরই খুব ভাব ছিল। বাট, আমি ভেবে পাচ্ছি না হোয়াই দিস ফ্যাটাল অ্যাকসিডেন্ট?

—আপনার কি মনে হয় মিসেস মিত্র, এটা খুন?

—নো।

—এতো জোর দিয়ে বলছেন কেন?

—কে খুন করবে? আর কেনই বা করবে? খুনের তো কিছু কারণ থাকবে? কাজলের তো প্রশ্নই ওঠে না। ও দেখতে শুনতেও তত অ্যাট্রাকটিভ নয়। ফ্যামিলি বার্ডেনও অনেক। একটা চাকরি করে। দিস মাচ। খুন করার জন্যে এটা একেবারেই উপযুক্ত মোটিভ নয়। তো আপনিই বলুন না কাজলকে খুন করে কার কী লাভ?

—আর তুহিনা?

—তুহিনার ব্যাপার একটু ভাবার অবকাশ রাখে। বিকজ সি ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ফাইন লুকিং গার্ল। রাদার ইউ কুড্ স্যে সী হ্যাড আ ট্যানটালাইজিং বিউটি। ভেরি ট্যালেন্টেড। কোয়ালিফাইড ইন অল রেসপেক্ট। নাচ গান অভিনয়। যে কোন ছেলেই ওর প্রেমে পড়ে যেতে পারতো।

—উনি কি অভিনয় করতেন?

—হ্যাঁ, ইদানীং অ্যাকটিং-এ ঝুঁকেছিল। শুনছি টিভি সিরিয়ালেও কাজ করছে। এছাড়া প্রতি বছর অ্যানুয়াল মিট টোগেদারে ও একাই একশো। এই তো গত বছরে করল চিত্রাঙ্গদা। উই ওয়্যার সিম্পলি চার্মড। তাছাড়া, সি ওয়াজ আ গার্ল অব আ মালটি মিলিওনীয়ার ফাদার। আসলে কি জানেন, ও যেখানে যাবে সেখানে ওই সব। যে কোন ফাংশানে ওই মধ্যমণি। আসলে ওরা দুজনে বুজম্ ফ্রেন্ড হলেও দেয়ার ওয়াজ আ গাল্ফ্ ডিফারেন্স। দুই বন্ধুর মধ্যে প্রচুর ফারাক। তুহিনার জায়গা যদি হয় স্টেজে তাহলে কাজল একেবারে শেষ সারির দর্শক। আমার যতদূর ধারণা অনেক ছেলেই তুহিনার জন্যে পাগল।

—আর ইউ সিওর?

—বললাম না এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা। মোটিভের দিক থেকে কি এটা একটা পয়েন্ট নয়?

—কেন? জেলাসি বলছেন?

—হয়তো অনেকেই ওকে চেয়েছে। এর মধ্যে হতাশ কেউ, যে ওকে কোনদিনও পাবে না, সে কি চাইতে পারে না ও পৃথিবী থেকে সরে গেলে আর কেউই ওকে পাবে না।

—ফেলে দিচ্ছি না আপনার কথা। কিন্তু কাজলকে মরতে হল কেন? আমি যতদূর জানতাম ওর এসব ব্যাপার ছিল না। নিজের ফ্যামিলি প্রবলেম নিয়েই ওকে ব্যস্ত থাকতে হোত।

—এমন কি হতে পারে না কাজল খুনিকে দেখে ফেলেছিল।

—ইট মাইট বী। বাট—

—বাট?

সামান্য একটু ইতস্তত করে লেখা মিত্র বলেন,—কাল বারোটা নাগাদ আমি ছাদে উঠেছিলাম। আমার খুব আশ্চর্য লেগেছিল একটা দৃশ্য দেখে।

নীল আর দীপু নড়েচড়ে বসল।

—কী দেখেছিলেন লেখা দেবী?

সামান্য সময়ের জন্যে অনমনস্ক হয়ে অথবা কিছু ভাবতে ভাবতে লেখা মিত্র বললেন, —হ্যাঁ যা বলছিলাম, ছাদে এখন রিজারভার ফেটে গিয়ে জল জমেছে বলে আমি পশ্চিম দিকের কোণে যেতে চেয়েছিলাম, ওদিকটা সামান্য উঁচু বলে জল যায়নি। কিন্তু থমকে যেতে হয়েছিল।

—কেন?

—কাল রাতে ছাদে তেমন কোন আলো ছিল না। আকাশে লালচে মেঘে ভর্তি। হঠাৎ মনে হয়েছিল একটা লোক কিছু একটা খেতে খেতে টলছে।

—কে সে?

—না, বুঝতে পারিনি।

—তারপর?

—তার হাতে কিছু একটা ধরা ছিল। গ্লাস বা ঐরকম কিছু। বুঝতে না পারার আরও কারণ আমার চোখে চশমা ছিল না।

—জিগ্যেস করেননি কে?

—সাহস হয়নি। অত রাত্রে, কালো সিলুটের মতো, ছেলে না মেয়ে ডেফিনিট হতে পারিনি তখন, ভয় না পেলেও আমি সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসেছিলাম।

—তারপর ছাদে কোন চলাফেরার আওয়াজ পাননি?

—না। সব চুপচাপ। আমার অবশ্য ভূতপ্রেতের ভয় নেই। কিন্তু আর উঠিনি। অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় শুয়ে ভেবেছিলাম আমি সত্যিই কিছু দেখেছি কিনা। কিন্তু আবার বিছানা ছেড়ে ওঠার মতো ইচ্ছে আমার ছিল না। এখন মনে হচ্ছে তখন আলসেমি ছেড়ে সাহস করে কাউকে ডাকাডাকি করলে হয়তো মেয়ে দুটো ঐ ভাবে মরতো না। তবে ডাকবোই বা কাকে? এদিকে এক বৃদ্ধা মহিলা। আর ওদিকে আনস্যোসাল এলিমেন্ট। এটিকেট পর্যন্ত জানে না।

—আপনি তো একজনকেই দেখেছেন?

—হ্যাঁ।

—সিওর?

—হ্যাঁ। একজনকেই। তাও কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। তখন কোন রকমে ঘরে ফিরে আসতে পারলে বাঁচি।

—লেখা দেবী, এ তথ্যটুকু আমাদের জানার দরকার ছিল। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আজ আমরা চলি।

—চা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু,

—নো, থ্যাঙ্কস্।

ওরা উঠে এল। লেখা মিত্র গিয়ে দরজা লক করে দিলেন। ছাদে তখনও পুলিসি কাজকর্ম চলছে। বিকাশের গলার আওয়াজ আসছিল। সিঁড়ির মুখের জটলাটা এখন নেই। এবং দরজার মুখে একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। দীপু জিগ্যেস করল,—গুরু, নীচে যাবে না আবার ওপরে উঠবে?

—নীচেই চল। ওপরে গিয়ে আপাতত কোন লাভ নেই।

পুলিস আসাতে সব বাসিন্দারাই সজাগ হয়ে গেছে। যে যার নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে লক করে দিয়েছে। উৎসাহ দেখাতে গিয়ে কেউই আর পুলিসি ঝামেলায় নিজেদের জড়াতে চাইছে না। চারতলার দুটো ফ্ল্যাটেই দরজা বন্ধ। বাঁ দিকের ফ্ল্যাটের দরজায় নাম দেখা গেল ইউ পি আগরবাল। ডানদিকে অশোক ঠাকুর।

—বেল মারব নাকি?

—থাক। নতুন কোন সংবাদ আসবে বলে মনে হচ্ছে না। বরং কাজলদের ফ্ল্যাটেই যাওয়া যাক।

ওরা তিনতলার শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে এমন সময় একজন মধ্যবয়েসী ভদ্রলোককে হন্তদন্ত হয়ে উঠে আসতে দেখা গেল। ওদের নামতে দেখে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়লেন।

—আপনারাই তো পুলিস থেকে এসেছেন?

—হ্যাঁ। আপনি?

—নমস্কার। আমি নীরেন হালদার। কো-অপারেটিভের সেক্রেটারি।

দীপু লোকটাকে ভাল করে দেখতে থাকল। আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো। কাঁচা-পাকা কোঁকড়ানো চুল। চোখে কালো শেল ফ্রেমের চশমা। হাল্কা কাঁচাপাকা গোঁফ আছে। হাসলে সবকটা দাঁতই বেরিয়ে পড়ে। পরনে বুশ শার্ট আর প্যান্ট। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। নীল ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—ভালোই হল। আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম।

—হ্যাঁ। সুবোধ গিয়ে তাই বলল। দেখুন তো কী ঝামেলায় পড়া গেল। সেক্রেটারি হিসেবে আমার ওপর দায়িত্বও অনেক চেপে গেল। আজকালকার ছেলেমেয়েদের কী যে সব হচ্ছে, বলা নেই কওয়া নেই

নীরেন হালদার হয়তো আরো কিছু বলতে চাইছিল, নীল থামালো।

—আচ্ছা নীরেনবাবু, তুহিনার ফ্যামিলির কেউ তো এখানে থাকেন না?

—পার্মানেন্টলি নয়।

—ওদের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ। এখুনি ওর বাবা-মা আসছেন।

—বেশ। তার আগে আমি একবার তুহিনার ফ্ল্যাটটা দেখতে চাই।

—নিশ্চয়ই। কিন্তু ঘরের চাবিটা সম্ভবত তুহিনার কাছে আছে। ওদের ফ্ল্যাটের দরজা তো দেখলাম লক করাই আছে।

—আপনার কাছে মাস্টার কী নেই?

—তা আছে। কিন্তু এখন প্রত্যেকেই আলাদাভাবে তালা ব্যবহার করেন; প্রায় প্রত্যেকেই কোলাপসিব্‌ল্ গেট লাগিয়ে নিয়েছেন।

—দীপু, একবার ছাদে চলে যা। আমার নাম করে জিগ্যেস কর তুহিনার কাছে কোন চাবিটাবি পাওয়া গেছে কিনা?

দীপু ওপরে উঠে যায়। নীল আর আর নীরেন বাবু নীচে নামতে থাকেন। সেকেন্ড ফ্লোরে এসে ওরা দাঁড়াল। একদিকে সোমনাথ চাটুজ্যের ফ্ল্যাট। সোমনাথবাবু উৎসাহী বৃদ্ধ। তিনি দরজা খুলেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওদের নামতে দেখে নিজেই এগিয়ে এসে বললেন,- এটাই তুহিনার ফ্ল্যাট।

নেমপ্লেটে তুহিনার নাম। কিন্তু কোলাপসিবল টানা নেই, দরজায় গদরেজ লক। ইতিমধ্যে দীপু নেমে এসেছে।

—কিরে, পেলি?

—নাঃ ওখানে কোন চাবিটাবি নেই।

—চাবি তো, বলে সোমনাথবাবু বললেন, তুহিনা নার্তনি যখনি কোথাও যেতো বেশির ভাগ সময়েই চাবি আমাদের কাছেই রেখে যেতো। দেখছি, দিয়ে গেছে কি না।

সোমনাথ ফ্ল্যাটে গিয়ে বৌমা বলে ডাক দিলেন। তারপর বেরিয়ে এলেন একটা চাবির গোছা নিয়ে।

—হ্যাঁ, রেখে গিয়েছে, তবে তুহিনা নয়! আজ সকালে ওপরের গণ্ডগোলের সময় সবিতা মানে ওদের কাজের মেয়েটা চাবিটা দিয়েই চলে গেল।

—তার মানে, নীল নিজের মনেই বলল, সবিতা কাল সারা রাতই এ ঘরে ছিল নাকি?

এ প্রশ্নের জবাব সোমনাথবাবু দিতে পারলেন না। অতঃপর দরজা খুলে ওরা তিনজনেই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। সোমনাথবাবু এটিকেট জানেন, উনি আর ঢুকলেন না।

এ ঘরের সঙ্গে অন্য ঘরের তফাত হবে এটা আঁচ করাই ছিল। হাল্কা অলিভ গ্রীন প্লাস্টিক পেইন্ট করা দেওয়াল। গেটের মুখ থেকেই শুরু ডাইনিং স্পেস। সোজা গিয়ে মিশেছে বাইরের বারান্দায়। ডাইনিং-এর মাঝখানে চামড়া মোড়া সোফাসেট। মধ্যে কাচটপ টিপয়। অনেকগুলো ইংরেজি ম্যাগাজিন। তার মধ্যে স্টারডাস্টও আছে আবার সায়ান্স মান্থলিও আছে। একদিকে রঙীন টিভি। পাশে সিডি প্লেয়ার আর ভিসিআর। অন্যদিকে ডিপ ব্লু রঙের ফ্রিজ। ফ্রিজের ওপর ল্যামিনেট করা হাফবাস্ট কালারড্ ছবি। উচ্ছল হাসিতে মুখর তুহিনার একক ছবি। দেওয়ালে তেমন কোন ছবির বাহুল্য নেই। একদিকে কেবলমাত্র একটি ছবি। রামকৃষ্ণ পরমহংসের। দু-পাশে দুটো বেডরুম। পর্দা ঝুলছে। ডাইনিং-এ এখনও নিয়ন জ্বলছিল। নীরেন গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল।

—কাজের মেয়েগুলোর কোন দুখদরদ নেই। আলো জ্বালিয়েই চলে গেছে।

নীল ঘুরে ঘুরে সব দেখছিল। ডানদিকেব বেডরুমে ঢুকল। সাচ্ছল্য ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু অবহেলায় সবই প্রায় স্তূপীকৃত। বিছানায় দোমড়ানো দুটো বালিশ। একটা পাশেব, একটা মাথার। বিছানায় কয়েকটা নাটকেব বই। একটা খোলা কিন্তু উপুড় অবস্থায় রয়েছে। নীল বইটা তুলে নিয়ে দেখল যোশেফ কেসেল রিঙয়েব আর্সেনিক অ্যাণ্ড ওল্ড লেস। আধপড়া অবস্থায় রয়েছে।

—তুহিনা কি রেগুলার নাটক টাটক করতো?

—হ্যাঁ। তুহিনা ইদানিং নাটক আর সিরিয়াল নিয়ে খুব মাতামাতি শুরু করেছিল। খুব ভালো অভিনয় করতো। আমি দেখেছি। আসলে মেয়েটা খুব ট্যালেন্টেড্। যাতে হাত দিত তাতেই সাকসেস। লেখাপড়া, গানবাজনা, খেলাধুলা সবেতেই একস্‌পার্ট।

এসব নীলের শোনা হয়ে গিয়েছিল। ও ভালো করে ঘরটাই দেখছিল। সম্ভবত কিছু একটা খুঁজছিল খাটের লাগোয়া বইয়ের র‍্যাক। অজস্র বই সাজানো। দু-একটা নেড়েচেড়ে দেখল। দীপু পাশেপাশেই ছিল। ফিস্‌ফিস্ কবে ও জিজ্ঞাসা করল,—বিশেষ কিছু খুঁজছ নাকি গুরু?

ঘাড় নাড়তে নাড়তে নীল বলল, —বড় লোকেব একমাত্র আদুরে সুন্দরী মেয়ে। হেভি স্মার্ট অ্যান্ড বিট্ মড্। তায় নাটক কবে। ইদানিং সিরিযালে নামছে। নিজেব গাড়ি থাকাও অসম্ভব নয়।

—তাতে কী হল?

—এ রকম একটি মেয়ের কোন বয়ফ্রেন্ড থাকবে না? কিংবা কোন প্রেমিক? শুনলি তো লেখা দেবী কী বললেন?

—হ্যাঁ, থাকতেই পারে।

—সেটাই খুঁজছি।

—বইয়ের র‍্যাকে প্রেমিককে খুঁজে পাবে?

—ওরে হাঁদা, প্রেমিক নয়, প্রেমিকেব কোন চিঠি, অথবা তুহিনাব কোন ডায়েরি।

—হুঁ, বলে দীপু কিছু ভাবল, তাবপব বলল, বেশ তুমি নয় খুঁজে পেলে, তাতে লাভটা কী হবে?

—কান টানলে মাথা আসে, তা জানিস?

—বুঝলাম।

—কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজিব পরও কোন ডায়েবি বা বয়ফ্রেন্ডেব সন্ধান পাওয়া গেল না।

—এতো সুন্দবী মেয়ে। সিবিযালে নামছে। একটা অ্যালবাম নেই ঘবে!

নিজের মনেই বিড়বিড় করছিল নীল। দীপু শুনতে পেযেছিল, ও বলল, —সুন্দরী মেয়েদেব বুঝি অ্যালবাম রাখতেই হবে?

—কি মেয়ে কি ছেলে, দেখতে সুন্দব হলে তাদেব একটা বিশেষ প্রবণতা থাকে। নিজেকে নানান অ্যাঙ্গেল থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। আসলে মানুষেব সাইকোলজি এটাই। মানুষ নিজেকে যেমন সব থেকে বেশি ভালবাসে ঠিক তেমনি আয়নার সামনে দাঁড়িযে কদাকাব লোকও নিজেকে দেখতে ভালবাসে। এটাই কমন ম্যাটার!

হঠাৎ সিঁড়িতে হৈ চৈ শোনা গেল। তার সঙ্গে মহিলা কণ্ঠের তীব্র শোক বিলাপ। তুহিনার বাবা মা এবং দু ভাই এসে গেছেন। মহিলাই চিৎকার করতে করতে ঢুকলেন, —কই কোথায় আমার তুহি মা। তুহি... .তুহি...

মাকে দুই ছেলেই সামলাচ্ছিল। তুহিনার বাবা ততক্ষণে সেক্রেটারি নীরেন হালদাবের সামনে দাঁড়িযে পড়েছেন, —নীরেন, কী, কী হয়েছে আমাব মেয়ের? তুহির ঘবে এঁরা কারা?

বরফ ঠাণ্ডা গলায় নীবেন বলল,—ওঁরা পুলিসের লোক।

—কেন, পুলিস কেন? তুমি তো বললে তুহি খুব অসুস্থ।

নীরেন থতমত খায়। কোন রকমে ঢোক গিলে তুহিনার মৃত্যু সংবাদটি পবিবেশন কবেই ঘব ছেড়ে চলে যায়।

—ওহ্ মাই গড্, বলে মিস্টাব অহীন চৌধুরী সোফার ওপর ধপ্ কবে বসে পড়েন। সম্ভবত তুহিনাব

মাব কাছে খবরটা পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁর উৎকণ্ঠিত বিলাপ উচ্চ রোদনে পরিণত হল। ভাই দুটোও কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। তাদের মুখ দিয়েও তেমন কোন শব্দ বেবিয়ে এল না। সম্ভবত বড় ভাইটিই এগিয়ে এসে নীলকে জিজ্ঞাসা কবল, —ইজ ইট ফ্যাক্ট?

কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব কোমল কবে নীল বলল,—মৃত্যুসংবাদ নিয়ে কেউ কখনও নির্মম বসিকতা করে না মিস্টার। হ্যাঁ, তুহিনা আব নেই।

ছোট ভাই ফুঁপিয়ে উঠল। মায়েব কান্না গেল আবও বেড়ে। বড় ভাইটিই আবাব জিজ্ঞাসা করল, —বাট হোয়্যার ইজ সী?

—ছাদে।

—হোয়াট ননসেন্স? আমাব বোনেব মৃতদেহ ছাদে কেন?

—কাবণ মৃত্যুটা ওর ওখানেই ঘটেছে।

—ছাদে? ইউ মিন আন্ডাব দ্যা ওপন্ এয়াব?

—হ্যাঁ মিস্টার রায়চৌধুরী। সঙ্গে আরও একজনও মারা গেছে?

—আরো একজন মানে? হুঁ? কে সে?

—হার বেস্ট ফ্রেন্ড। অবশ্য এটা আমাব জানাব কথা নয়। হাউজিং-এর লোকরাই বলছে। তার নাম কাজল ঘোষ।

—কাজল? হোয়াট আ স্যাড ইনসিডেন্ট! বাট হাউ অ্যান্ড হোযাট ফর?

—ওটাই তো আমবা খুঁজে বার করতে চাইছি।

হঠাৎ ছুটে এলেন মিসেস রায়চৌধুবী। ব্যগ্র এবং উতলা কণ্ঠে বললেন,—আমি ছাদে যাব।

—হ্যাঁ যাবেন। ওখানে পুলিস অফিসাব আছেন। তাড়াতাড়ি যান, নইলে হয়তো বডি বিমুভ কবা হয়ে যাবে। খুব শীগগিবই।

ভদ্রমহিলা আলুথালু অবস্থায় ওপবে চলে গেলেন। ছোটভাইটিও সঙ্গে চলে গেল।

এতক্ষণ সিনিয়াব বাযচৌধুরী মাথায় হাত বেখে বসেছিলেন। উঠে এসে ধরা ধবা গলায বললেন,

—বাট হোয়াই দ্য পুলিস ইজ ইন দিস স্পট?

—কাবণ, পুলিস মনে কবে দুজনের মৃত্যুই নরম্যাল নয়।

—নবম্যাল নয়, বিড়বিড় কবতে কবতে অহীনবাবু বলেন নবম্যাল নয়? ইউ মিন

—না বাযচৌধুবী সাহেব, আপাতত আমবা কোন সিদ্ধান্তেই আসতে পাবিনি। তবে বডি দুটো দেখে অ্যাসিউম করতে পারি মৃত্যুটা স্বাভাবিকভাবে আসেনি।

—হোয়াট অ্যাকচুয়ালি ডু ইউ মিন টু স্যে?

—ইট মাইট বী আ কেস অব সুইসাইড অব হোমিসাইড।

—হোমিসাইড? ইউ মিন, মার্ডাব?

—না, বডি যতক্ষণ না পোস্টমর্টেম হয আমবা কিছুই বলতে পারছি না। কাবণ, আপাতদৃষ্টিতে দেহে কোন মার্ডারের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

—বাট আই মাস্ট স্যে, দুটোই অ্যাবসার্ড। তুহিনা আত্মহত্যা কববে না। কবতে পাবে না। প্রথমত তাব কোন অভাব নেই, সে কোন ভাবেই ফ্রাস্ট্রেটেড নয়। ববং সে জীবনে এগিয়ে যাবার জন্যে একটা নতুন লাইন খুঁজে পেয়েছিল।

—আপনি সিবিয়ালে অ্যাকটিং এর কথা বলছেন?

—ইয়েস। হাতে এখন ওর অনেকগুলি সিবিযাল শুটিং এর কাজ শুরু হয়ে গেছে। তাই নিয়ে আমার সঙ্গে কত পরামর্শ করতো।

—সবই ঠিক আছে মিস্টার রায়চৌধুরী। কিন্তু কার যে কখন মানসিকতা পাল্টে যায় তা বাইবে থেকে কাবো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবে খুনের ব্যাপারটা তো আমবা উড়িয়ে দিচ্ছি না।

—দ্যাট ইজ অলসো ইম্‌পসিবল।

—এতো জোর দিয়ে কি সে কথা বলা যায়? কোথায় কার কখন শত্রু তৈরি হচ্ছে তা আপনার আমার কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয়। আপাতদৃষ্টিতে দেখা গেল ওর কোন ভিজিবল এনিমি নেই কিন্তু আপনি কি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবেন মিস্ রায়চৌধুরীর কোন শত্রু নেই বা ছিল না?

হতভম্বের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মিস্টার রায়চৌধুরী বললেন,—কেউ কারো ক্ষতি করলে তার শত্রু সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু আমার মেয়ে এমন কোন কাজ করেনি যাতে করে তার কোন শত্রু তৈরি হতে পারে। ব্যাপার আমার মেয়ে সবার কাছে খুব পপুলার ছিল। এই কমপ্লেক্সের সবাই তাকে ভালবাসে।

—এটাও তো খুনের কারণ হতে পারে। অফকোর্স, সে যদি খুন হয়ে থাকে।

—হোয়াট ডু ইউ মিন? সামান্য সময় নিয়ে কী যেন ভাবলেন তারপর বললেন, বেশ আমি ধরে নিলাম আমার মেয়ের পপুলারিটির জন্যে কেউ তাকে খুন করেছে। দেন হোয়াট্স্ অ্যাবাউট দ্যাট পুয়োর গার্ল?

—আপনি কাজলের কথা বলছেন?

—ইয়েস। কাজল। মেয়েটি খুব ভালো মেয়ে। সহজ সরল সৎ মেয়ে। আমার মেয়ের বেস্ট অ্যান্ড বুজম্ ফ্রেন্ড। তার তো কোন পপুলারিটি ছিল না। আর পাঁচটা সাধারণ গরিব ঘরের মেয়ে। বলতে পারেন দিন এনে দিন খেত। না অর্থ, না যশ, না প্রতিপত্তি, না রূপ! বলুন তার কোন্ শত্রু তাকে খুন করবে?

নীল একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনার এই বিশ্লেষণগুলো আমি যে ভাবিনি তা নয়। একটি সুন্দরী মেয়ে অন্যটি সাধারণ। একজন সোসাইটিতে সবার প্রিয়। অন্যজন নেহাতই একেবারেই সাদামাঠা। তারা দুজন একই রাতে হয় আত্মহত্যা করেছে অথবা কেউ তাদের খুন করেছে। খুন বা আত্মহত্যা যাই হোক না কেন, মোটিভ একটা ছিল। কিন্তু সেটা কী? ওয়েল মিস্টার রায়চৌধুরী, এই মুহূর্তে নানান প্রশ্ন করে আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না। সেটা উচিতও নয়। কেবলমাত্র একটি প্রশ্ন, যদি উত্তর দেন। আসলে আপনিও তো চান এই মিস্ট্রি সলভ হোক।

—চাই। চাই। একশোবার চাই। কী জানতে চান বলুন?

—আপনার মেয়ের কোন অ্যাফেয়ার্স ছিল কি?

অহীনবাবু ভ্রূ তুলে কিছু ভাবলেন, তারপর বললেন,—ও তো আমাকে কিছুই লুকতো না। এ নিয়ে সে আমায় কিছু বলেনি। তাই ধরে নিতে পারি সেসব কিছুই ছিল না।

—ওয়েল মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই। শুধু একটা কথাই বলব, আপনি ভেঙে পড়লে পরিবারের সবাই ভেঙে পড়বে। আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট টু ফাইন্ড আউট দ্য হিড্ন্ ট্রুথ অব দিস মিস্ট্রি। এর বেশি আপাতত কিছু বলার নেই।

অহীন্দ্র রায়চৌধুরীকে রেখে ওরা সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল। নীরেন হালদার অধোবদনে সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে ছিল! নীল নীচে নামতে নামতে বলল,—আপনি এখানে দাঁড়িয়ে?

—আমার মাথায় চক্কর দিচ্ছে। একই সঙ্গে দু দুটো মেয়ে চলে গেল। রায়চৌধুরীবাবুর মুখোমুখি দাঁড়াতেই সংকোচ হচ্ছে। যেখানেই যাই সেখানেই নানান প্রশ্ন।

—কিন্তু আপানার দায়টা কোথায়?

—মনুষ্যত্বের দায়। কো-অপারেটিভের সেক্রেটারি হলেও, সবার সঙ্গেই আমর হার্দিক সম্পর্ক ছিল। সব থেকে খারাপ লাগছে কাজলের ফ্যামিলির কথা ভেবে। এর পর যে ওদের কী হবে ভাবলেই সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

— আপনি আর কীই বা করতে পারেন। টাইম ইজ দ্য বেস্ট হিলার। আপাতত এটা ভেবেই পরের কাজগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে হবে। চলুন একটু কাজলের ফ্ল্যাটে যাই।

— যাবেন? ওরা তো সবাই ভেঙে পড়েছে।

—সেটাই তো স্বাভাবিক। জাস্ট একটা সারভে করে চলে আসব।

ভারি সুন্দর একটা হাউজিং কমপ্লেক্স। পাশাপাশি দু দুটো ব্লক। প্রায় গায়ে গা ঠেকানো। দূর থেকে দেখলে মনে হবে একটাই মস্ত বাড়ি। 'বি' ব্লকের নীচের তলায় অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের তিনখানা ফ্ল্যাটের একটায় থাকে কাজলরা। দরজায় কোন নেমপ্লেটও নেই। বাইরের দেওয়ালটা নিয়মমাফিক রঙচঙে করা হলেও ভেতরটা সম্পূর্ণ উল্টোচিত্র। সর্বত্রই হতদারিদ্র্যের চিহ্ন। দরজা খোলাই ছিল। বেশ কিছু নারী-পুরুষ মুহ্যমান অবস্থায় এদিক ওদিক বসে ছিলেন। ওরা যেতেই একটি বছর বাইশ চব্বিশের যুবক উঠে এসে বলল,—নীরেনদা, কাজলের মা তো সেন্স হারিয়ে ফেলেছেন। কাঁদতে কাঁদতে কেমন যেন বেহুঁশ হয়ে গেলেন।

—সে কী? ডাক্তারকে খবর দিয়েছ?

—অনুপ গেছে ডাক্তারবাবুর কাছে।

—কতক্ষণ হয়েছে?

—প্রায় মিনিট পাঁচেক।

—চল তো দেখি। আসুন মিস্টার ব্যানার্জি।

পাশাপাশি দু কামরার দুখানা ঘর। মধ্যে এক চিলতে জায়গা। ঢুকতেই বাথরুম। রান্নাঘরটা তার পাশেই। দীপু আর ঘরের মধ্যে গেল না। নীল আর নীরেনবাবু যে ঘরটায় বেশি ভীড় সেই ঘরের সামনে গিয়ে বলল,—এই তোমরা এখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? সরে দাঁড়াও। একটু হাওয়া খেলতে দাও।

সবাই সরে গিয়ে ওদের যাবার রাস্তা করে দিল। কিন্তু ভিড় একটুও কমল না। ঘরের অবস্থা তথৈবচ। জরাজীর্ণ খাট। একটা আলমারি। অন্যদিকে কয়েকটা বাক্স উপর ওপর সাজানো। তারই ওপর ডাঁই করা কাপড়চোপড়। ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতা। এক ভদ্রমহিলা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। তাকে ঘিরে কতিপয় মহিলা। একজন পাখার বাতাস করছেন। নীল ওপরে তাকিয়ে দেখল ফ্যান আছে। কিন্তু চলছে না। নীল নীরেনবাবুকে উদ্দেশ করে বলল,—ফ্যানটা কি চলছে না?

— তাও তো বটে, বলে নিজেই সুইচ অন করে দিল। কিন্তু ফ্যান চলল না।

একজন মহিলা বললেন,—কে জানে ফ্যানটার আবার কী হয়েছে। ওটাও সকাল থেকে চলছে না।

নীরেনবাবু বাতাস করা মহিলাকে উদ্দেশ করে বললেন, – সরমাদি, মাসিমা এখন কেমন?

—কি জানি, বুঝতে পারছি না। ডাক্তারবাবু তো এখনও এলেন না।

—অনুপ তো গেছে, নিশ্চয়ই এসে পড়বে।

—আপনি একবার গিয়ে দেখুন না যদি তাড়াতাড়ি আনাতে পারেন।

নীরেনবাবুকে আর যেতে হোল না। অনুপ নামধারী ছেলেটি একেবারে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এসেছে। ছোটখাটো চেহারার সৌম্য দর্শন ডাক্তারবাবুটি প্রথমেই নীরেনবাবুকে বললেন, - এদের একটু সরে যেতে বলুন। একেই তো গুমোট, তার ওপর যদি সবাই ভিড় করে হাওয়া আটকে থাকেন, তাহলে সুস্থ মানুষরাই তো অসুস্থ হয়ে পড়বে।

নীরেনবাবু কটমটিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন,—আপনাদের একটা কথা বললে শোনেন না কেন? দেখবার মতো হাতি ঘোড়া তো কিছু নেই এখানে। যান, বাইরে গিয়ে সবাই দাঁড়ান। আশ্চর্য লোক সব।

ভিড় পাতলা হল অনিচ্ছা নিয়েই। ডাক্তারবাবু নাড়িটাড়ি দেখে প্রথমেই একটা ইনজেকশন দিলেন। তারপর নীরেনবাবুকে ডেকে বললেন,—আমি কয়েকটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি। ডিরেকশন মত খাইয়ে যাবেন। জ্ঞান এখুনি ফিরে আসবে। তবে

—তবে?

—হার্টের কনডিশান ভাল নয়। তার ওপর এই রকম একটা শোক। আপাতত ঘুম পাড়িয়ে রাখা ছাড়া উপায় নেই। কাঁদলে ভাল হত। কিন্তু সেটা আবার হার্টের পক্ষে ক্ষতিকর। এনিওয়ে, সে রকম

অসুবিধে বুঝলে, হসপিটালাইজ করতে হতে পারে। মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করে রাখবেন।

ডাক্তারবাবু উঠে পড়লেন। নীল এগিয়ে গিয়ে বলল,—একসকিউজ মি, আপনিই কি ডাক্তার চ্যাটার্জি?

ঘাড় ঘুরিয়ে নীলের দিকে ফিরে বললেন,—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

—মাফ করবেন, আপনিই তো প্রথম মিসহ্যাপ কেস দুটো পরীক্ষা করেছিলেন?

—হ্যাঁ তাই।

—ওয়েল, আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

—আপনি?

—আমায় চিনবেন না। একজন ইনভেস্টিগেটর। পুলিসের তরফ থেকে আসছি।

—আই সী। বেশ বলুন আপনার কী কথা আছে?

—এখানে নয়। একটু বাইরে যাব।

—হ্যাঁ, সেটাই ভাল।

দুজনেই বাইরে চলে এল। ভাদ্র মাসের কটকটে রোদ। তেমনি গরম। ওরা গিয়ে কমপাউন্ডের একটা গাছের তলায় দাঁড়াল।

—ডাক্তারবাবু, আপনার নির্দেশেই এরা পুলিসে খবর দেয়। তার মানে আপনার অনুমান মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। আমার জিজ্ঞাস্য, একথা আপনার মনে হল কেন?

—প্রথমত আমার ইনট্যুইশান। আমরা বুঝতে পারি কোনটা স্বাভাবিক আর কোনটা অস্বাভাবিক অন্তত আমার ক্ষেত্রে এটা অনেকবারই ঘটেছে। আর সেকেন্ড পয়েন্ট ট্যোটাল সারকামস্টান্সটাই তো স্বাভাবিকতার সপক্ষে রায় দেবে না। আপনারও কি তাই মনে হয় না?

—হ্যাঁ হয়। সবারই হবে।

—ভেবে দেখুন, দুটি সোমত্ত মেয়ে, অবিবাহিতা, অন্ধকার নির্জন ছাদে, বীয়ারের বোতল নিয়ে উঠেছে। একটা গ্লাস খালি আর একটা গ্লাস ভর্তি। বট্‌ল্‌-এ অবশিষ্ট কিছু পানীয় তখনও রয়েছে, অথচ দুজনেই মৃত। কী ভাবা যায়?

—আপনার অনুমান কী? হত্যা অথবা আত্মহত্যা?

—সেটা আপনার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলবে।

—আপনার অনুমানটা জানতে চাইছি।

—এ ক্ষেত্রে অনুমান করাটাই বোকামি। আনসায়ান্টিফিক। তবে দুটোর যে কোনটাই হতে পারে তা আপনারা তো পায়ের ছাপটাপ নাকি খুঁজে পান। এক্ষেত্রে তো পাওয়াও উচিত।

—এ কথা কেন বলছেন?

—ছাদটা সকালেও দেখেছি জলমগ্ন। ওদের বিজারভার নাকি ফেটে গেছে। অবশ্য বডি দুটো যেখানে ছিল সেটা শুকনো জায়গা। তো ভেজা পায়ের ছাপ শুকিয়ে গেলেও সেটা ধরা পড়ে, তাই তো?

—আমাদের পুলিস অফিসার ওখানেই আছেন। দেখা যাক।

ইতিমধ্যে দীপু আর নীরেন হালদার ফিরে এসেছেন। নীরেন বাবু বললেন,—ডাক্তারবাবু মাসিমার জ্ঞান ফিরে এসেছে। কেমন যেন বোকা বোকা দৃষ্টি নিয়ে সবার দিকে তাকিয়ে আছেন। কান্নাকাটিও করছেন না। ব্যাপারটা ঠিক ভাল লাগছে না।

—আপনি ঘুমের ওষুধটা দিয়ে দিয়েছেন?

—হ্যাঁ।

– ঠিক আছে ওঁকে ঘুমোতে দিন। বিকেলের দিকে আমাকে রিপোর্ট করবেন। এত বড় একটা শক্ সামলে ওঠা চাট্টিখানির কথা নয়। তাছাড়া, যদি ওনার আরও একটি মেয়ে আছে। কিন্তু ছেলেটিও তো অ্যাবনরমাল।

—হ্যাঁ।

—রামবাবু কেমন আছেন?

—তিনি কিছুই বলছেন না। কেবল জানলার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি অনেক করে ওনার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। বাট, হি কেপ্ট মাম।

আক্ষেপসূচক ঘাড় নাড়াতে নাড়তে ডাক্তার চ্যাটার্জি বললেন,—বিয়েলি, ফ্যামিলিটা বড় দুর্বিপাকে পড়ে গেল। কাজল মেয়েটিই তো একমাত্র রোজগেরে। তাও অতি সামান্য চাকরি। এতো লোক কেন যে ঈশ্বরকে ডেকে মরে বুঝি না। মানুষই বলুন আর ঈশ্বরই বলুন, ন্যায়বিচার কারো কাছেই পাবেন না!

বেঁটেখাটো মানুষটি চলে গেলেন। নীরেন কিছুক্ষণ ওঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা আক্ষেপ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—তাহলে মিস্টার ব্যানার্জি এখন কী করব?

—কাজলদের বাড়িতে এখন আর যাবার কোন অর্থই হয় না। আমি পরে আলাদা করে মিট্ করব। আপনি একটা ব্যাপার ভালো বলতে পারবেন। কাজল আর তুহিনা ছিল ক্লোজ ফ্রেন্ডস। আপনাদের এই হাউজিং-এ ওই বয়েসী নিশ্চয়ই আরো অনেক মেয়ে আছে?

—হ্যাঁ, আছেই তো। একটু আগেই তো রামবাবুর ঘরের মধ্যে কয়েকজনকে দেখলেন।

—এদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যার সঙ্গে তুহিনা বা কাজলের ঘনিষ্ঠতা ছিল?

—আহেলি বলে একটি মেয়েকে জানি। ভবেন নন্দীর মেয়ে। ওদেরই বয়েসী। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রী। কাজলের সঙ্গে আহেলির বেশ ভালোই যোগাযোগ ছিল। অনেক দিনই দেখেছি আমাদের কমপ্লেক্সের সামনে ঐ মাঠটায় দুজনে বসে গল্প করতো।

—ভেরি গুড। আহেলি নন্দীর সঙ্গে একটু কথা বলব।

—এখানেই তো ছিল। বলেন তো খুঁজে দেখি।

—এখন থাক। কালও বলতে পারি। পরশুও বলতে পারি। আসলে ওদের যেকোন একজনের কোন বিশেষ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে দুজনেরই হোয়্যার অ্যাবাউটস্ জানতে চাই।

—বেশ, আপনি যেদিন বলবেন সেদিনই আমি যোগাযোগ করিয়ে দোব।

ওরা যখন 'এ' ব্লকের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে দেখা গেল পুলিস অ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে। অর্থাৎ বডি মর্গে পাঠাবার প্রস্তুতি সারা। নীল দীপুকে বলল,—তুই গিয়ে বিকাশবাবুকে বলে আয়, বেলা বেড়ে চলেছে। আমরা যাচ্ছি। সন্ধের দিকে পারলে উনি যেন আমাদের বাড়ি চলে আসেন। দেখিস আবার সাপে-নেউলে হয়ে যাস না যেন।

দীপু যেতে যেতে বলে,—নাহ্, এখন সেই অ্যাটমসফিয়ার নেই। পরে লাগবো।

দীপু চলে গেল। নীল নীরেনকে বলে,—সেক্রেটারি সাহেব, একটা ব্যাপারে আমার একটু আশ্চর্য লাগছে।

—কী ব্যাপারে?

—দুটো বাড়িই তো অহীনবাবুর তৈরি।

—হ্যাঁ।

—এবং একেবারে পাশাপাশি। ছাদ টু ছাদ দু হাতের ব্যবধান।

—হ্যাঁ তাই।

—'এ' ব্লকের পাঁচতলায় দেখলাম তিনটে রুম। আপনাদের সোমনাথবাবু বললেন দুজন কম কম স্কোয়ার ফুট নেওয়াতে আর একটা ওয়ান রুম ফ্ল্যাট বেরিয়ে এসেছে।

—হ্যাঁ তাই। আসলে চট্ করে পাঁচতলায় উইদাউট লিফ্‌ট্, পারচেজার পাওয়া একটু দেরি হয়। অবশ্য পাঁচতলার দাম একটু কম পড়ে বলে অনেকেই নেন। কিন্তু কিছুদিন সিঁড়ি ভাঙার পরই চেষ্টা করেন ফ্ল্যাট বিক্রি করে অন্যত্র চলে যেতে। 'এ' ব্লকের পাঁচতলাটা অনেক দিন ধরে ওনারশিপের অভাবে খালি পড়েছিল। শেষে যাও বা পাওয়া গেল তারা আবার অতটা জায়গা সমেত বিশাল ফ্ল্যাট নিতে চাইছিল না। ইন দ্য মিন টাইম লেখা দেবী, একটা ছোট ওয়ান রুম খোঁজ করায় নতুন প্ল্যান

স্যাংশন করিয়ে ওদের ফ্ল্যাট তিনটে তৈরি হয়।

—বোঝা গেল। কিন্তু 'বি' ব্লকের নীচের তলাতেও তো তাই দেখলাম। খুপরি খুপরি তিনখানা ফ্ল্যাট। অবশ্য সোমনাথবাবু একটা ব্যখ্যা করেছেন, তাই কি?

—উনি কি বলেছেন জানিনা তবে 'বি' ব্লকের সব তলাতেই তিনটে করে ফ্ল্যাট। এবং ছোট সাইজ। আসলে অহীনবাবু 'বি' ব্লকটা করেছিলেন মিডল্ ক্লাস বা নিম্নমধ্যবিত্তদের জন্যে। এটা না হলে সরকারি লোন পাওয়া যাচ্ছিল না। তা দোতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত প্রায় সকলেই মিডল্ ইনকাম গ্রুপ। সকলেই একেবারে নিম্নমধ্যবিত্ত নয়। প্রত্যেকেই মোটামুটি চাকরি করে। সত্যিকার লো ইনকাম গ্রুপ বলতে নীচের তিনজন ওনারই। আর সব থেকে এখন করুণ অবস্থা কাজলদের।

দীপু ততক্ষণে ফিরে এসেছে। নীলও চলে আসছিল। হঠাৎই ও ঘুরে দাঁড়িয়ে নীরেনকে একটা প্রশ্ন করে—'এ' ব্লকের ছাদ থেকে 'বি' ব্লকের ছাদে যাওয়া খুবই সহজ। আপনি কী বলেন?

ভ্যাবাচাকা খেয়ে নীরেন বলেন,—এদিকটা তো আমি ভেবে দেখিনি।

সেদিন নয়। তিনদিন পর বিকাশ তালুকদার নীলের বাড়ি এলেন। তখন রাত প্রায় সাড়ে নটা। দীপু আর নীল বসে বসে চেজ খেলছিল। এখন ওদের দুজনকেই দাবায় পেয়েছে। নীলই ওকে শিখিয়েছে। ও বলে দাবা খেললে নাকি বুদ্ধি খোলে। দীপুও ইনটারেস্ট পেয়ে গেছে। তবে নীলকে কোনদিন হারাতে পারেনি এটাই ওর আফসোস।

সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ পেয়ে দীপু বলল,—গুরু, দাবা গুটিয়ে রাখ। তোমার ঢোলগোবিন্দ এলে আর খেলা হয় না। তখন ঢোল পেটানো শুরু হয়ে যাবে।

বিকাশ ঘরে ঢুকেই সোফায় শরীর টান করে মেলে দিয়ে একটা আরামসূচক 'আঃ' ছাড়লেন। দীপু ওঁর দিকে একবার তাকিয়েই উচ্চৈস্বরে চিৎকার করে উঠল,—দীনুদা আমাদের এক পরিশ্রান্ত পথিকের জন্যে গরম শরবতের ব্যবস্থা কর।

বোজা চোখ সামান্য খুলে বিকাশ বললেন,—ডেঁপো ছোকরাদের যে কেন আসকারা দেন ব্যানার্জি সাহেব। এটা আমার মাথায় কিছুতেই ঢোকে না।

—সব জিনিস তো সবার মাথায় ঢোকে না, কি বল নীলদা। এই তো দেখ না, রাত সাড়ে নটা থুড়ি পৌনে দশটার সময় যে কোন ভদ্রলোকই জানেন কোন ভদ্রলোকের বাড়ি খাজুরে আলাপের জন্যে থাবা ফেলতে নেই। এটা নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

—ইউ স্টুপিড, বিকাশ দাবড়ে উঠলেন, লঘুগুরু জ্ঞানটা তোমার একেবারেই গেছে। থাবা মানে কি? থাবা কাদের হয়? বল, বল?

—আজ্ঞে, জোর করে টেনে আনা কাঁচুমাচু মুখে দীপু বলল, আজ্ঞে ঐ, বাঘের থাবা হয়, সিংহের হয়, বেড়ালের হয়, উটেরও হয়,

—স্টপ্ স্টপ্, অত ফিরিস্তির কোন কারণ নেই। তুমি আমায় জন্তু-জানোয়ার ভাবতে শুরু করেছ নাকি?

জিভ কেটে দীপু বলে,—কি যে বলেন তালুকদার স্যার, আমি কি সে কথা বলতে পারি? আপনি গুরুজন, বয়ঃজ্যেষ্ঠ, তার ওপর জাঁদরেল পুলিস অফিসার, আপনাকে ঐ সব ইতর প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করব, এত মূর্খ আমায় ভাবলেন কি করে?

—তুমি কতবড় পণ্ডিত আমার জানা আছে। আর একটা কথা শোন, নীল ব্যানার্জির বাড়ি আমি কখন আসব আর আসব না সে কৈফিয়ত আমি তোমায় দেব না। আমি তোমার মতো ল্যাঙবোট নই। আমি আসি কাজে, দরকারে, তোমার মতো গ্যাজানোর জন্যে নয়। স্টুপিড কোথাকার।

এরপর কথা চালাচালি অন্যদিকে টার্ন নেবার সম্ভাবনা ছিল। নীল মধ্যস্থতা করে,—বিকাশবাবু দীপু আপনার ছোট ভাইয়ের মতো।

—আমার ওরকম ভাই থাকলে চড় মারতে মারতে চৌকাঠ পার করে দিতুম। যাক, এবার কাজের কথায় আসা যাক, ব্যানার্জি সাহেব, আপনার সঙ্গে কিছু পার্সোনাল কথাবার্তা আছে।

নীল হেসে ফেলে। হাসতে হাসতেই বলে,—বিকাশবাবু, বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেতে নেই। দীপুর ওপর রাগ করে আসল কথাগুলোই হারিয়ে ফেলবেন। আপনি নিজেও জানেন দীপুর সামনে সব কথাই বলা যায়। আপনি আরম্ভ করুন। যা দীপু, নিজের হাতে ভালো করে চা করে বিকাশদাকে একটু শান্ত কর।

—যে আজ্ঞে, বলে দীপু উঠে গেল।

—নিন, এবার বলুন। পি এম রিপোর্ট এল?

—হ্যাঁ, এসেছে। তাজ্জব ব্যাপার! দুটো মেয়েরই দেহের কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন না থাকায় আমার মনেই হয়েছিল পেটে কোন বিষটিষ পাওয়া যাবে।

—কেন, সেরকম কিছু পাওয়া যায়নি?

—গেছে। এবং একটা তো মারাত্মক পয়জন, পটাসিয়াম সায়নায়েড। কোত্থেকে যোগাড় করল মশাই কে জানে?

— এটা কার স্টম্যাকে পাওয়া গেছে?

—কাজল ঘোষের স্টম্যাকে।

—আর তুহিনার?

—তুহিনার মৃত্যু ঘটে হাইপোগ্লাইসিমিয়ায়।

—হাউ?

—ওর স্টম্যাকে অতিরিক্ত পরিমাণে গ্লাইপিজাইড ট্যাবলেটের গুঁড়ো পাওয়া গেছে।

—তার মানে হয় সে নিজে নয়তো কেউ তাকে জোর করে অ্যান্টিডায়াবেটিক ট্যাবলেট বেশি পরিমাণে খাইয়ে দিয়েছিল?

—হ্যাঁ, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে কুইক ফল ডাউন অব্ ব্লাড সুগার। এবং ওর শরীরে সে সব সিমট্মসও পাওয়া গেছে। কারডিয়াক অ্যারেস্ট অব্ হার্ট। ব্রেনেও কিছু হেমারেজিং স্পট্ ধরা পড়েছে। কিন্তু একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না ব্যানার্জি সাহেব, ধরে নিলাম দুটো মেয়েই সুইসাইড করেছে, এবং একই সঙ্গে প্ল্যান করে। তাহলে একজন খেলো অ্যান্টিডায়াবেটিক ট্যাবলেট, অন্যজন পটাসিয়াম সায়নায়েড? হোয়াই? সায়নায়েড টের পেতে পেতেই শেষ। সহজ মৃত্যু থাকতে কেন অন্যজন খানিকটা কষ্ট নিয়ে মরতে গেল? খুবই মিস্টেরিয়াস ব্যাপার। আবার ধরুন কেউ যদি খুন করে থাকে সে কেন দুজনের দু রকম বিষ মেশালো?

কোন উত্তর না দিয়ে নীল সমানে সিগারেট টেনে যাচ্ছিল। দীপু গরম চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকল। তালুকদার চায়ের পেয়ালা তুলে চুমুক দিতে দিতে আবার পুরনো কথায় ফিরে এলেন,—আসলে কি জানেন ব্যানার্জি, এটা খুন না আত্মহত্যা সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

বিকাশ তালুকদারকে এই জন্যেই নীলের খুব পছন্দ। লোকটা নিজের অক্ষমতাকে কখনও ধামাচাপা দিয়ে হামবাগ হয়ে ওঠেন না। যেটা বুঝতে পারেন না সেটা খোলাখুলি বলে দেন। ওঁকে খুব বিমর্ষও দেখাচ্ছিল। নীল ওঁকে আশ্বাস দিতে দিতে বলে,—বিকাশবাবু, মাঝে মাঝে এ রকম কমপ্লিকেটেড কেস হ্যান্ডেল না করলে রিটায়ার্ড লাইফে সুখস্মৃতি আঁচড়াবেন কি দিয়ে?

—মজা করবেন না, আমি মরছি 'এখন' নিয়ে আর আপনি চলে গেছেন ভবিষ্যতে। আপনার মাথায় কি খেলছে একটু বলুন। অন্তত একটা পয়েন্ট, যা দিয়ে এগুতে পারি।

নীল মুচকি হাসল। ঘাড় দোলাতে দোলাতে বলল,—আপনি যেখানে আমি তার থেকে এক ইঞ্চিও বেশি এগোতে পারিনি। তুহিনা অ্যান্ড কাজল মিস্হ্যাপ এখন আমার কাছে মিস্ট্রি। দুজনকে মার্ডার করতে গেলে, যেটা প্রায় একই রাত্রে ঘটেছে, বাই দ্য বাই, মৃত্যুর সঠিক টাইম কিছু জানিয়েছে?

—হ্যাঁ, রাত বারোটা নাগাদ প্রথমে কাজলের মৃত্যু হয়। তারও প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ পর তুহিনা

মারা যায়। ফর ইওর ইনফরমেশান, কাজলের মুখে কোন মৃত্যুযন্ত্রণা ছিল না। সে মাত্র একটা সিপ্‌ দিতে পেরেছিল। খুবই ন্যাচারাল। পটাসিয়াম সায়নায়েড মুহূর্তেই কাজ করে। কিন্তু তুহিনার দেহের অনেক জায়গায় ছড়ে যাওয়ার দাগ আছে। শরীরে কিছু স্প্যাজম্‌ এফেক্ট আছে। মুখেও বিকৃতির ছাপ যেটা ওর বাবা-মাও স্বীকার করেছেন।

সে সব কথার মধ্যে না গিয়ে নীল বলল, —ডাক্তারি শাস্ত্রে আমার জ্ঞান খুব সীমিত। কিন্তু আমি এক ভদ্রলোককে চোখের সামনে হাইপোগ্লাসিমিয়ায় মরতে দেখেছি। ভদ্রলোকের মৃত্যু হয় রাত দশটা নাগাদ। এবং রাস্তায়। রাস্তার মৃত্যু। ন্যাচারালি তাঁকে হসপিটালাইজড্‌ করা হয়েছিল। তারপর হসপিটাল পোস্টমর্টেম না করে ছাড়েনি। তাও ধরুন মৃত্যুর পর ঘণ্টা দশ বারো তো কেটে গিয়েছিল পোস্টমর্টেম করতে। আপনি বললেন তুহিনার স্টম্যাকে গ্লাইপিজাইডের গুঁড়ো পাওয়া গেছে। কিন্তু সে ভদ্রলোকের স্টম্যাকে কিছুই পাওয়া যায় নি। পাওয়া গিয়েছিল ব্লাডে। এটা বললাম এই কারণে, তুহিনার স্টম্যাক ওপন্‌ করাও হয়েছিল প্রায় ঐ রকম সময়ের ব্যবধানে। তাহলে?

বিকাশ তালুকদার চা শেষ করে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, —আমি মশাই ডাক্তার নই যা রিপোর্ট পেয়েছি তাই বললাম।

—ব্লাড রিপোর্টও তাই বলছে?

—হ্যাঁ। আনুমানিক পঞ্চাশ মিলিগ্রাম ওষুধ শরীরে গেছিল।

—হুঁ, বলে কিছুক্ষণ গোঁৎ মেরে বসে রইল নীল। চোখ বুজিয়ে কেবল পা দুলিয়ে যাচ্ছিল।

বিকাশবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিল, দীপু ফস্‌ করে ওকে থামিয়ে দিয়ে নিজের ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে ফিসফিস্‌ করে বলল,—গুরু ডিপ থিংকিং-এ চলে গেছে। কথা বলবেন না।

—নারে দীপু, ডীপ থিংকিং-এ যেতে গেলেও কোন একটা ক্লু পেতে হয়। সেটাও এখানে নেই আমার একটা থিওরি আছে জানিস তো?

—হ্যাঁ। এইচ ডাবলু ডাবলু। হাউ, হোয়াই অ্যান্ড হু।

—সেটাই অ্যাপ্লাই কর।

—হাউটা জানা গেল। হাউ দ্যাট্‌ অ্যাকসিডেন্ট ওয়াজ হ্যাপনড্‌। বিষ দ্বারা সংঘটিত দুর্ঘটনা। কিন্তু জানা যাচ্ছে না, বা ডেফিনিট কোন ক্লু নেই হোয়েদার ইট ওয়াজ হোমিসাইড অর সুইসাইড কথাগুলো বিকাশ বললেন প্রায় হাল ছেড়ে দেওয়া ভঙ্গিমায়।

—কিন্তু, দীপু বলল, এর যে কোন একটা সম্ভাব্য দিক ধরে আমাদের এগুতে হবে। নইলে যে অন্ধকারে হাতড়াতেই হবে। আমার নিরেট বুদ্ধি একটা কথাই বলে, শুনছেন তালুকদারদা?

—বলে যান।

—খুন হ'লে তৃতীয় ব্যক্তি কোথায়? আশেপাশে কিন্তু কারো পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ নীল বলল, —ভাল কথা, ছাদ ছিল ভিজে ভিজে। কোন বিশেষ পায়ের ছাপ কি পেয়েছেন?

বিকাশ ম্লান মুখে বললেন,—এতো পায়ের ছাপ পেয়েছি তার মধ্যে থেকে ওয়ান্টেড্‌ ফুটপ্রিন্ট পাওয়া শক্ত। মৃত্যু" খবর শুনে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক এসে ভিড় করেছিল। অর্থাৎ খুন যদি কেউ করে থাকে তার পায়ের ছাপ অনেক পায়ের ছাপের আড়ালে চলে গেছে।

—তাছাড়া, খুন যে করবে সে দুজনকে দুরকম পয়জনই বা দেবে কেন? দীপু ভাবতে ভাবতে মন্তব্য করে। ওকেও এখন খুব সিরিয়াস দেখাচ্ছে। তার মানে নীলদা, তোমার এইচটা জানা সত্ত্বেও এখানে কোন কাজ দিচ্ছে না।

—তা যদি না দেয় তাহলে তোকে নেক্সট্‌ ডাবলুতে যেতে হবে। ডাবলু মিনস্‌ হোয়াই। হোয়াই দিস মিসহ্যাপ? আর এই হোয়াইটা ক্লিয়ার করতে পারলে বাকিটাও বেরিয়ে আসবে।

—হোয়াই সম্বন্ধে আপনি কিছু ভেবেছেন নাকি ব্যানার্জি সাহেব?

—এই হোয়াইয়ের আনসার পেতে গেলে আমাদের যেতে হবে দুটি মেয়ের ব্যক্তিজীবনে। তাদের লিভিং স্টেটাস, তাদের ফ্রেন্ড সার্কল, তাদের সোসাইটি। যেমন একটা ব্যাপার আপনি খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, একই কমপ্লেক্স হলেও 'এ' আর 'বি' ব্লকের স্টেটাস আলাদা। দুই ব্লকে দু ধরনের মানুষের বাস। 'এ' ব্লকে বেশির ভাগই ওয়েল আর্নড্‌ পিপল্‌। কিন্তু বি' ব্লকে মিক্সড্‌। কেউ কেউ

আবাব লোয়ার মিড্‌ল্ ক্লাসের থেকেও নীচু স্তরের মানুষ। যেমন কাজলেব পাবিবাব।

—কিন্তু, বিকাশ বললেন, সবাই বলছে কাজল ঘোষ খুবই গবিব। তা সে কি ভাবে বীয়ার খেতে যায়। এখন তো বীয়ারের দামও অনেক।

—উহুঁ, ভুলে যাবেন না, কাজল অ্যান্ড তুহিনা। দে ওয়্যাব ভেবী মাচ ইনটিমেট টু ইচ আদাব। বুজম্ ফ্রেন্ড্। ধনী দরিদ্রের ব্যাপারটা ওদেব মধ্যে ছিল না। এটা সবাই বলেছে। তুহিনা অত ধনী এবং মড্ মেয়ে হয়েও, অন্য কাবো ঘরে না গেলেও কাজলেব ঘবে যেতো। খাওযাদাওযাও কবতো। অবশ্য রেগুলার নয়।

—আপনি খবর নিয়েছেন?

—হ্যাঁ। নীরেন হালদার বলেছে। এবং এটা সবাই জানে।

—তা নয় হল। কিন্তু এতে কি প্রমাণ হচ্ছে?

—প্রমাণ হচ্ছে কাজলও তুহিনাদেব ঘরে যাতাযাত করতো। গবিব বলে সে একদিন ধনী বন্ধুব অফার করা বীয়ার খাবে না এমন আদর্শবতী মেয়ে ছিল বলে আমাব মনে হয না।

—বেশ, আপনার যুক্তি মেনে নিলাম। কিন্তু অত সুন্দব নিজেব ফ্ল্যাট থাকতে ওরা বীযাব খেতে ছাদে গেল কেন?

—ওই বয়েসের মেয়েদের মতিগতি বোঝা ভাব। হযতো ওপন এয়াবে খেতে ভালো লাগবে এমন ধারণা থেকেও হতে পারে। আসলে এটা বোধহয় ওবা বেঁচে থাকলে বলতে পাবতো। আমাদেব যা হোক একটা কিছু অনুমান কবে নিতে হবে।

দীপু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটা বিশাল হাঁ কবা হাই তুলল। তালুকদার নিজেব হাতঘড়ি দেখে নিয়ে বললেন,—যাক, আব অ্যালার্ম ক্লক হবাব দবকার নেই। আমি আজ উঠছি।

উনি উঠে পড়লেন, পা বাড়াবাব আগে বললেন,—ব্যানার্জি সাহেব, দাদাভাই, একটু মন প্রাণ দিয়ে চিন্তা করুন। আপনি থাকলে আমরা একটা সলিড জায়গায় নিশ্চিত পৌঁছে যাব। তাহলে আজ গুড নাইট করি।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। অনেক বাত হয়ে গেছে। পৌনে এগাবোটা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তালুকদাব বললেন,—আমাদের আবাব রাত আব দিন। চলি, গুড নাইট।

তালুকদাব চলে যাবাব পব দীপু বলল,—বিকাশদা আমাকে বলে তোমাব চামচা। কিন্তু যাবাব সময় তোমাকে ঐ দাদাভাই ডাকটি কি চামচাবাজি নয়?

নীল কোন উত্তব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মাথার ওপব হাত তুলে ছোট্ট আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল,—চ, খেয়ে নিই। কাল ভোরে আহেলি নন্দীর সঙ্গে দেখা কবতে হবে।

—ওহ্ বাবা, এই আহেলি নন্দীটি আবার কে?

—তোর মনে নেই বোধ হয়। ঠিক আছে কাল সকালেই দেখা হবে।

পুরো দিনটাই উদ্দেশ্যবিহীন ট্রেন ভ্রমণ করে কাটিয়ে দিল মঞ্জিল সিন্‌হা। হাওড়া থেকে গন্তব্যবিহীন একটা টিকিট কেটেছিল। হঠাৎ মাঝপথে ফুলেশ্বরতে নেমে পড়ল। রুক্ষ চুল। এলোমেলো শার্ট প্যান্ট। দেখতে সে সুদর্শন এক যুবা। ছিপছিপে কিন্তু রোগা নয়। প্রায় পাঁচ ফুট আট ন ইঞ্চি লম্বা। চোখে ফেটোক্রোমেটিক চশমা। স্বল্প পাওয়ার আছে। মুখে কদিনের না কামানো দাড়ি। গঙ্গার ধাবে এসে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। আকাশ বাতাস পৃথিবী, পৃথিবীর রঙ, সব যেন এই কদিনেই ফিকে হয়ে গেছে।

দুটি মেয়েব আকস্মিক মৃত্যু ওকে এলোমেলো করে দিয়েছে। সে ভাবতেও পারেনি, এভাবে বোকাব মতো দুজনে একই সঙ্গে মরে যেতে পারে। কিন্তু এমনটা তো হবার কথা ছিল না। যদিও সে দু বন্ধুব মধ্যে একটা জেলাস কনফ্লিক্টের আশঙ্কা করেছিল। কিন্তু সেটা এতো ফেটাল হতে পারে তা তার নলেজেই আসেনি।

দুটি মেয়েই একই সঙ্গে তাকে ভালবেসে ফেলেছিল। কাজল ঘোষ আর তুহিনা রায়চৌধুরী। সে এক অদ্ভুত দিন। আজও মনে আছে।

সে একটা মাল্টি ন্যাশান্যাল কোম্পানির বিগ্ বস। নিজের চেষ্টা আর যোগ্যতা দিয়ে সে ঐ জায়গাটায় পৌঁছেছে। দাদা বা মামাদের তেল না দিয়েই।

মঞ্জিল সিন্‌হার বাবা আমেরিকান ব্যাঙ্কের টপ্ ম্যানেজমেন্টের টপ্ বস্। পুরো ইস্টার্ন জোনের দায়দায়িত্ব তাঁর। ন্যাশান্যালাইজড্ ব্যাঙ্কের প্রতিভূরা নিজের দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে বেঁচে যান। কিন্তু ফরেন ব্যাঙ্কের সিস্টেম আলাদা। রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনও আলাদা। তারা দায়িত্ববান লোক বাছতে ভুল করে না। আর তার জন্যে রেমুনারেশনের হারটাও দেন বিশাল।

প্রদীপ সিন্‌হা নিজের দায়িত্বে সজাগ প্রহরী। অত্যন্ত রাশভারী আর কড়া মেজাজের মানুষ। এখন প্রায় চাকরির শেষ প্রান্তে। আর মাত্র বছর দুই বাকি। প্রদীপ সিন্‌হার ইচ্ছে ছিল মঞ্জিলকেও ব্যাঙ্কে ঢোকাতে। কিন্তু সে বিলেত থেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স কমপ্লিট্ করে মালটি ন্যাশান্যালের টাকার লোভটা ছাড়তে পারেনি। নিজের যোগ্যতায় মাত্র কয়েক বছরেই বিশাল জায়গায় পৌঁছে গেছে।

প্রদীপ সিন্‌হা মনে মনে খুবই খুশি এবং গর্বিত ছেলের উন্নতিতে। আর তাঁর ঐ একটাই ছেলে। বয়েসও বেশি না। সাতাশ কি আঠাশ। প্রদীপবাবু আর ওঁর স্ত্রী কুন্তলা দেবী সাধারণত যা হয়, ডানাকাটা খোঁজার প্রতিযোগিতায় নেমে গিয়েছিলেন।

সিগারেটের শেষ অংশটা গঙ্গায় বুক লক্ষ্য করে টুস্‌কি দিল। পৌঁছল না। ভাদ্রের বাতাস একটু ভারীই হয় যদি না হাওয়া বয়। মাঝপথেই টুকরোটা আছড়ে পড়ল।

মঞ্জিল সিন্‌হার জীবনে নারীর কোন অভাব ছিল না। ছোট থেকেই। কেউ না কেউ এসেই যেত একটা সুন্দর বেলাভূমিতে অনেক তরঙ্গ আছড়ে পড়ে। খানিকটা সময় নাচানাচি আর মাখামাখির পর আবার মিশে যায় মহাতরঙ্গে। সেও ঐ স্থির বেলাভূমির মতো একই ভাবে রয়েছে। ইতিমধ্যে বনিতা, শর্মিলা, আশা, দেবযানীদের দল এসেছে। গেছে। সোনারঙ বালির চাদর বুকে নিয়ে সে কিন্তু স্থির থেকেই গেছে।

একদিন হঠাৎ তার অফিসে দুটি মেয়ে হাজির। কদিনই বা হবে? গত বছর পুজোর আগে। সামনে দাঁড়িয়ে চাঁদার বইটা খুলে ধরেছিল। সাধারণত এসব বাড়িতে-টাড়িতে হয়। কিন্তু অফিসের মধ্যে। মঞ্জিল বেশ বিরক্তি নিয়েই তাকিয়েছিল মেয়ে দুটির দিকে। আর তখনি আশ্চর্য হয়েছিল দুটি বিভার্স প্রতিকৃতি দেখে। একজনের গায়ের রঙ মোমের মতো। কিন্তু অ্যানিমিক নয়। মুখ যৌবনের ছোঁয়ায় টসটস করছে। চোখ নাক মুখ অসাধারণ। নীল ডেনিম, সাদা এক্সএল টাউসশার্ট। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। কথাবার্তা যেন ছিলা থেকে ছুটে যাওয়া তীর। আর অন্য জন। মার্জিত। সাজে এবং পোশাকে নম্র। একমাথা ঠাসবুনোট চুল খোঁপা করা। সাধারণ ছাপা শাড়ি শরীরে পেঁচিয়ে আছে। শ্যামলা শ্যামল রঙ। কিন্তু পানপাতার মতো ভারি মিষ্টি মুখ। ডাগর চোখে লাজুক চাহনি। সে প্রগলভা নয়। বরং মিতভাষিণী। সুন্দরী মেয়েটির তুলনায় তার যৌবনভার অনেক বেশি দুরন্ত। কাঁধে একটা সস্তা সাইড ব্যাগ।

----কাকে চান?

সুন্দরী মেয়েটি নিজের কার্ডটি এগিয়ে দেয়। মঞ্জিল কার্ডটা দেখে বলেছিল,—কিন্তু এ নামে তো আমি কাউকে চিনি না।

—তাহলে দেখুন তো এই নামটা চেনেন কিনা। বলেই আর একটা কার্ড এগিয়ে দেয়। তাতে লেখা ছিল, অহীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। আরকিটেক্ট অ্যান্ড প্রোমোটার।

—আই সী। তাহলে আপনি অহীনদার মেয়ে?

—কারেক্ট। কিন্তু তার মানে আমি আপনার ভাইঝি বা আপনি আমার কাকু নন।

মঞ্জিল হেসে বলেছিল,—ওটা কোন ফ্যাক্টর নয়। বলুন কী দরকার?

তুহিনাই উত্তর দিয়েছিল,—আমরা একটা শো করছি। কলামন্দিরে। ফর দ্য বেনিফিট অব লেপ্রসি পেসেন্ট। জানেন তো এখন কুষ্ঠরোগ নিরাময় করার জন্য সরকার উঠে পড়ে লেগেছে। শো দেখাটা বড় কথা নয়। আই ওয়ান্ট মানি। আপনি একটা টিকিট কাটবেন। সেটা একজন দুঃস্থ কুষ্ঠরোগীর জন্যে। গানবাজনা আপনার ইচ্ছে হলে শুনবেন। ভাল না লাগলে চলে আসবেন।

—তার মানে, গানবাজনা কিছুই হচ্ছে না?

—নিজের মুখে বলা শোভা পায় না। গেলেই দেখবেন।

দ্বিতীয় মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মঞ্জিল জিগ্যেস করেছিল,—আর আপনি?

সেই লাজুক লাজুক কণ্ঠে সে বলেছিল,—আমি দর্শকদের শেষ সিটের আসন দখল করার দায়িত্ব নিয়েছি।

—বাহ্, বেশ বলেছেন। এখন আর্টিস্ট পাওয়া ইজিয়ার দ্যান আ বিয়েল শ্রোতা। তা আপনাদের টিকিটের রেট কত?

তুহিনা একশ টাকার টিকিটের বইটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল,—দুটো একশ টাকার দিয়ে দিই?

—দুটো কি হবে?

—কেন, আপনি এবং আপনার মিসেস।

—ওটা এখনও যোগাড় করে উঠতে পারিনি। ঠিক আছে, ফর দ্য শেক অব লেপ্রসি পেশেন্ট আপনার হাইয়েস্ট টিকিট একখানাই দিন।

তুহিনা একটা পাঁচশ টাকার টিকিট এগিয়ে দেয়। মঞ্জিল টাকা মিটিয়ে বলে,—তাহলে এবার আমার ছুটি।

অনেকক্ষণ পর শ্যামলা মেয়েটি বলেছিল,—আমার কিন্তু ঐ একটাই কথা। আপনি না গেলে মনে হবে ধনীর বদান্যতা। সেটা অপমানজনক।

—আর গেলে?

—দানের প্রতি আন্তরিকতা।

—ওয়েল। দেখা যাক কোনটা জেতে।

ভাল লাগছিল না মঞ্জিলের। কিছুই ভাল লাগছিল না। কাজল চলে গেছে। দেখতে দেখতে দশ দিন হয়ে গেল। পৃথিবীতে কোথাও তার অবয়বের কোন চিহ্নই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। মাঝে মাঝে সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায় তার চারপাশে এতো সুন্দরী মেয়ে থাকা সত্ত্বেও, বিশেষ করে তুহিনার পাশে কাজল, একেবারেই বেমানান, তবু কেন তার কাজলকে ভাল লাগত? কেন সে তুহিনার প্রেমকে এড়িয়ে গিয়ে কাজলকেই জীবনসঙ্গিনী করতে চাইল? এটা কি তার প্রথম দর্শনেই প্রেম? সেদিন তুহিনার সঙ্গে কাজল না এলে হয়তো সে তাদের শো দেখতেই যেতো না। কি এক অনিবার্য আকর্ষণে সে ছুটে গিয়েছিল কলামন্দিরে। নির্দিষ্ট সময়ের মিনিট পনেরো আগেই নিজের গাড়ি নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছিল। তার সীট পড়েছিল একেবারে সামনে। সে বোধহয় একটা মুখই খুঁজছিল। ডাগর আর মায়াবি চোখের এক শ্যামলী মেয়েকে। নিজের সীটে বসে এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকে সে কিছুতেই যখন খুঁজে পাচ্ছিল না, হঠাৎই তার মনে পড়ে গিয়েছিল, মেয়েটি বলেছিল শেষের সীটের দর্শকের ভূমিকা পালন করবে সে। অতঃপর সে খুঁজে পেয়েছিল তাকে। শেষের দিকে নয়। মাঝামাঝি রোয়ের একটা সীটে। কাজলকে তার সীটে আবিষ্কার করা মাত্রই সে বুঝতে পারল কাজল তার দিকেই তাকিয়ে আছে। মঞ্জিল মুখে কিছু না বলে সরাসরি কাজলের কাছে গিয়ে দেখল এক মধ্যবয়েসী ভদ্রলোক বেশ খুশ মেজাজে বসে আছেন পাশের সীটে। কোন রকম ভূমিকা না করে সেই ভদ্রলোককে ও জিগ্যেস করেছিল,—আপনি কি একা আছেন?

একটু বিরক্ত মুখে ভদ্রলোক বলেন,—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

—আমার সীটটা একেবারে সামনে। অথচ আমার বান্ধবী এখানে চলে এসেছেন। ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, ইন্টারচেঞ্জ করতে বললে আপনি কি কিছু মাইন্ড করবেন?

প্রোপোজালটা ভদ্রলোকের সম্ভবত ভালো লাগেনি। তবু মিনমিন করে বলেছিলেন, — আমার তো তেমন অসুবিধা হচ্ছে না।

—না, পরোপকার করা, এই আর কি?

দোনামোনা করার কারণটা মঞ্জিল বুঝতে পারছিল। মধ্যবয়সী বিশেষ করে পঞ্চাশের ধারেকাছে যারা পৌঁছে গেছে তারা একটু মেয়ে হ্যাংলা হয়। কিছুই না। তবু একটি মেয়ের পাশে ঘণ্টা তিনেক কাটিয়ে দিতে পারলে উপরি কিছু সুখবোধ। আবার ওদিকে সামনের রোয়ে বেশি দামের টিকিটে বসে শো দেখার মধ্যে যে কেতা থাকে সেটাকেও অবহেলা করতে পারছিলেন না।

—দাদার যদি খুব অসুবিধা হয় তাহলে,

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—দিন আপনার টিকিটটা।

নিঃশব্দে নিজের টিকিটটা ভদ্রলোকটির হাতে গুঁজে দিয়ে ও গিয়ে বসেছিলেন কাজলের পাশে

—এটা কী হল?

লজ্জায় মরে যেতে যেতে কাজল প্রায় মাথা নীচু করে কথাগুলো বলেছিল।

—হওয়াটা যদি একান্তই খারাপ লাগে তাহলে আমাকে একে বারে চলে যেতে হবে। আব ও ভদ্রলোককে গিয়ে বলতে পারব না, মশাই আপনি ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন করুন।

কাজল কিছু না বলে চুপ করে থাকে।

মঞ্জিল একবার ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকিয়েই বলেছিল, —হলটা কিন্তু এয়াব কন্ডিশানড্ ঘামছেন কেন? তবু কাজল নীরব। মাথা হেঁট।

—আপনি কি সত্যিই চান না, আপনার পাশে বসে আমি শো দেখি?

কাজল আর তুহিনার মধ্যে তফাত এখানেই। তুহিনা হলে এতোক্ষণে হয় দারুণ উচ্ছ্বাসিত হত, নইলে ক্যাঁটর ম্যাঁটর করে অনেক কথা শুনিয়ে দিত। তুহিনা যদি হয় ঝড়, কাজল তাহলে শান্ত বাতাস। তুহিনা যদি হয় হাজার আলোর ঝাড়বাতি, কাজল সেখানে মেঠো ঘরের মাটির প্রদীপ।

—তাহলে আমি যাই।

—না। ছোট্ট সংক্ষিপ্ত উত্তর কাজলের।

—বেশ। এবার যে আপনাকে আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

—লোকে কী ভাবছে বলুন তো?

—এটা একটা কথা শুরুর কথা হল? কে কী ভাবছে আর না ভাবছে তাতে আপনাবই বা কী? আমারই বা কতটুকু খোয়া যাবে?

—আপনার কিছুই খোয়া যাবে না। কিন্তু

—কিন্তু?

—সবাই আমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে।

—ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে? কেন কববে?

—চেনা নেই জানা নেই, একজনের সঙ্গে গল্প করতে কবতে শো দেখছি।

—চেনাটা আগেই হয়ে গেছে। নইলে আমি যখন আপনাকে খুঁজছি, তখন আপনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন না। এটা দেখে ফেলেছি। আব জানা? আমি আপনাকে জেনেও ফেলেছি।

—কী জেনেছেন?

—আপনি খুব লাজুক, ধীর স্থির, বিবাট অট্টালিকার পাশে ছোট্ট কুঁড়েঘরের মতো।

ফিক করে হেসে ফেলেছিল কাজল।

—এই তো, হাসি ফুটেছে। তার মানে মেঘটা সবছে।

—তুহিনা জানতে পারলে ব্যাপারটা খুব খারাপ হবে।

—কেন? তুহিনাদেবী তো এখন স্টেজে।

—ও জানতে পারবে। ওর অনেক অ্যাডমায়ারার আছে। অনেক বন্ধু আছে। খবর এতোক্ষণে পেয়েও গেছে।

—নয় পেয়েছে। ক্ষতিটা কী হবে?

—ক্ষতি? খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কাজল বলেছিল, —একটু আগে আপনি একটা উপমা দিয়েছিলেন। বিশাল একটা বাড়ির পাশে ছোট একটা কুঁড়েঘর। কি ভেবে বলেছিলেন জানি না। কিন্তু তুহিনা আব আমি ঠিক তাই।

—স্যর মিস্—

—আমার নাম কাজল। কাজল ঘোষ।

—স্যরি কাজল দেবী, আমি কিন্তু একেবারেই ওসব ভেবে কিছু বলিনি।

—জানি। আবাব তুহিনাকেও জানি।

ইতিমধ্যেই হলের আলো নিভে গিয়েছিল। শো শুরু হয়ে গেল। প্রথম দিকে সাধারণ কয়েকজন শিল্পী গানটান গাইলেন।

—আরে এ তো সব পুরনো দিনের নাম করা শিল্পীদের গান নকল করছে। তাও সব ভুলভাল। কেন ওরা কী নতুন কিছু গাইতে পারে না?

—কি করবে বলুন। ওদের ক্ষমতা সীমিত। হয়তো ওদের কারো কারো নিজেদের নতুন গান শোনাবার যোগ্যতা আছে। ইচ্ছেও আছে। কিন্তু ভয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

—কিসের ভয়?

—যদি দর্শক না শোনে?

—শুনবেই, ভাল গাইতে পারলে নিশ্চয়ই শুনবে। আপনি গাইতে পারেন?

—একটু আধটু।

—গাইলেন না কেন?

—এসব ঠিক করে তুহিনা। বোধহয় আমার গান ওর ভাল লাগে না, অথবা

—অথবা?

—নাহ্, থাক।

একসময়, শেষ পর্বে তুহিনার নৃত্যনাট্য আরম্ভ হল। চিরাচরিত রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য নয়। রাজা-মহারাজার কোন কাহিনীও নয়। ওর দলের একটি ছেলের লেখা মর্মস্পর্শী একটি নাটক। যে নাটক সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের গল্প নিয়ে তৈরি। নৃত্য পরিকল্পনা তুহিনার। নৃত্যনাট্যটা মঞ্জিলের বেশ ভালোই লাগল। দেখতে দেখতে মঞ্জিল এক সময় বলেছিল, —আপনার বান্ধবী কিন্তু এ লাইনে থাকলে ভবিষ্যতে নাম করবে।

—ও তো ইতিমধ্যেই নামী। সবাই ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

—আপনার ইচ্ছে করে না?

—কী?

—লাইমলাইটে আসতে?

—সব কাজ সবার জন্যে নয়।

—চেষ্টা করেছেন কোনদিনও?

—মঞ্জিলবাবু, একটু আগে আপনি বলেছিলেন আপনি আমার সম্বন্ধে জানেন? আপনি কিছুই জানেন না। আমি কে? আমি কী? এ সমাজে আমার স্টেটাস কতটুকু? কিন্তু আমি জানি, ও সব আমার জন্যে নয়।

—কেনটা বলতে অসুবিধা আছে?

—আছে। কারণ, সে সব জেনে আপনার কোন আশা পূর্ণ হবে না।

—আমার কি আশা?

—সেটা আমার থেকেও আপনার অনেক বেশি জানা।

একসময় নৃত্যনাট্য শেষ হয়েছিল। করতালির বন্যা। যেন থামতেই চায় না। ওটাই ছিল শেষ আইটেম। দর্শকরা উঠে দাঁড়াবার আগেই ড্রপসীন আবার উঠে গেল। নৃত্যনাট্যের শিল্পীরা এসে মঞ্চে দাঁড়ালেন। সবাইকে নমস্কার করার পরই সীন পড়তে লাগল। একে একে হলের আলোও জ্বলে উঠল। তখন সবার যাবার তাড়া। তারই ফাঁকে মঞ্জিল একসময় ফিসফিস করে বলে ফেলেছিল, —আবার কবে দেখা হবে?

অবশেষে ভ্রু কুঁচকে কাজল বলেছিল,—কেন?

—আমার ভালোলাগাটা মেরে ফেলতে চাই না। বলুন কবে দেখা হবে?

—আর দেখা না হওয়াই ভাল।

—কেন?

—আপনি যাকে পদ্ম ভাবছেন, তার গায়ে শুধু পাঁকই লেগে আছে।

—সেই পাঁক ধুয়ে যায় প্রথম বর্ষার অফুরান বৃষ্টিতে। তখন পদ্ম অন্য কিছু হয়ে হাসতে থাকে।

—আপনি ভুল করছেন মঞ্জিলবাবু। ভুল ভাঙলে দেখবেন যাকে পদ্ম ভাবছেন সে এক পোকায় কাটা ফুল। যে কোন মুহূর্তেই ঝরে যেতে পারে দমকা বাতাসে।

—ঝড়ো বাতাস তো দিকপরিবর্তন করে অন্য দিকে সরেও যেতে পারে।

—সেটা বাতাসের খেয়াল। কিন্তু পোকায় কাটা পদ্ম জানে তাকে দিয়ে দেবতার পুজো হয় না।

—একবার দিয়ে দেখুন না, দেবতা কতটা নির্মম, তখনই বোঝা যাবে। যে দেবতা ফুলকে অবহেলা করে কীটদংশা বলে, সে তো দেবতাই নয়। তার মহত্ত্ব কোথায়?

—আজ আপনার চোখে একটা রঙিন চশমার ঘোর আছে। ঘোরটা কাটতে দিন, চশমাটা খুলে ফেলুন, অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখবেন না।

—আমি তো চশমাটা খুলতেই চাই। দেখি না আঁধার কতটা বিভ্রম ঘটায়।

কথায় কথায় ওরা কলামন্দিরের গেটে চলে এসেছিল। ভিড় তখন পাতলা।

—কিসে যাবেন কাজল?

এবার না হেসে পারেনি কাজল। বলেছিল,—আপনি বড় তাড়াহুড়ো করেন।

—কেন?

—মিস্ ঘোষ থেকে কাজলদেবী তার পর কাজলে আসতে সময় নিলেন মাত্র তিন ঘণ্টা।

—আপনিটাও বাদ দিতে চেয়েছিলাম। তবে সেটা নিতান্তই অশোভন বলে,

—সেটাও হয়ে থাক।

—অভয় দিলে দেরি হবে না।

—যেন কত অভয় প্রাপ্তির আশায় বসে আছেন?

—এতোক্ষণে একটা বলিষ্ঠ উত্তর দিয়েছেন। কাজল, বল, আমাদের ফের কবে দেখা হবে?

—আপনি কি চান স্পষ্ট করে বলবেন?

—বলতাম, যদি 'আপনি'টা বাদ দিতে।

—সেটা সম্ভব নয়।

—পকেট থেকে নিজের কার্ড বার করে কাজলের হাতে গুঁজে দিয়ে মঞ্জিল বলেছিল,—ফোনে আমি তোমার 'তুমি' ডাক শুনতে চাই, প্রথম যেদিন আমায় ফোন করবে। এখন বল কিসে যাবে?

—তুহিনার গাড়িতে।

—ব্যাড্ লাক। আমি অপেক্ষায় থাকব। তোমার কিছু 'কেন'র উত্তরও সেদিন দিয়ে দোব।

ইতিমধ্যে হইহই করে তুহিনা চলে এসেছিল। ঠিক দমকা ঝড়ের মতো। কাজল আর মঞ্জিলকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখে, কোঁচকানো ভ্রূটাকে নিজের জায়গায় মসৃণ অবস্থায় আনতে সময় নিয়েছিল কয়েক সেকেন্ড। তারপর বলেছিল, —মিস্টার সিন্‌হা, আপনার সীটে দেখলাম এক গোমড়ামুখো বুড়োকে। ভেবেছিলাম আপনি বোধ হয় আসেননি পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার অফিসের কোন বড়বাবুকে। কিন্তু আপনি এসেছেন এবং আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে আলপচারিতায় মগ্ন। আপনাদের কি আগে থেকে আলাপ-পরিচয় ছিল?

মঞ্জিল হাসতে হাসতে বলেছিল, —না তো। তবে আলাপ করতে জানলে একদিনের আলাপই মনে হবে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা।

—হ্যাঁ, তাই দেখছি। আগে থেকে আলাপ থাকলে কাজল আমায় না বলে থাকতে পারতো না। তার মানে আপনি আলাপে মাস্টার ডিগ্রি পেয়ে যাবেন।

—আলাপটা আমি ভালোই করতে পারি যদি আমার কাউকে ভাল লেগে যায়।

—তাই? কাজলেরও কি আপনাকে ভাল লেগে গেছে?

—সেটা এখনও জানতে এবং বুঝতে পারিনি। তবে আপনি তো ওর বুজম্ ফ্রেন্ড। জিজ্ঞাসা করে না হয় আমাকে জানিয়ে দেবেন।

—স্যরি মিস্টার। এ এমনই একটা ব্যাপার যেটায় তৃতীয় পক্ষের ঘটকালিটা নেহাৎ গাঁইয়া বলে মনে হবে।

—কারেক্ট। তাহলে, আজ আমি চলি। গুড নাইট।

মঞ্জিল ভেবেছিল দু-একদিনের মধ্যে কাজল তাকে ফোন করবে। কিন্তু অপেক্ষায় অপেক্ষায় দেড়মাস পার হয়ে যাবার পরেও কাজল তাকে কোন ফোনও করেনি, কোন সংবাদও না।

কিন্তু ঐ শ্যামলা মেয়েটার চোখে কি মাদকতা ছিল কে জানে, মঞ্জিল, মালটি-ন্যাশানাল কোম্পানির টপ্ একজিকিউটিভ, চটপটে, কথাবার্তায় তুখোড় এবং ভবিষ্যতে যার সাফল্য একরকম বাঁধা সেই মঞ্জিল কিছুতেই ভাবতে পারছিল না, তাবড় তাবড় ডাকসাইটে সুন্দরীদের প্রত্যাখ্যান করতে যার মুহূর্ত দেরি হত না, সে ঐ সাধারণ মেয়েটাকে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিল না কেন? নিজের কাছে নিজেই সে হেরে যাচ্ছিল। সে জানতো তার বাবা মা কখনোই ঐ রকম একটি সাধারণ ঘরের আটপৌরে শ্যামলী মেয়েকে তাদের পুত্রবধূ করে আনার ব্যাপারটা মেনে নেবেন না। তবু, কাজল যদি একটু এগিয়ে আসতো তাহলে সব বাধার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো মানসিকতা সে তৈরি করে নিয়েছিল। কিন্তু হারটা যে গোড়াতেই ঘটে গেল। এ কি শ্যামলা মেয়ের অহংকার? নাকি তার সাহসের দীনতা? কাজলের ঠিকানাও তার জানা হয়নি। সে কেবল তার কার্ডটাই দিয়েছে। যাতে তার ঠিকানা, ফোন নম্বর দেওয়া আছে। এখন শুধু কাজলই পারে কাজলকে তার কাছে নিয়ে আসতে।

অতঃপর, অপেক্ষায় অপেক্ষায় যখন তার ক্লান্তি আসছিল, ঠিক সেই সময়, দেড় মাস পর ফোন এসেছিল। একটি মেয়ের। ওর প্রথমেই মনে হয়েছিল, নিশ্চয়ই কাজল। তাই ফোনে অপরিচিত মহিলাকণ্ঠ শুনে ও বলেছিল, —যাক, শেষ পর্যন্ত বরফ গললো?

ফোনের অপর প্রান্তের নারীকণ্ঠ তখন বলছে, —স্যরি মিস্টার সিনহা, আপনি যাকে ভাবছেন সে আমি নই।

—আপনি কাজল নন?

—আমি তার প্রিয় বান্ধবী তুহিনা রায়চৌধুরী।

—আই সী। বলুন ম্যাডাম্ হোয়াট ইজ ইওর নেক্স্ট্ ভেঞ্চার?

—আপনি কি আমায় এতোটাই স্বার্থপর ভাবেন?

—না না, তা কেন? আমার মনে হল হয়তো সামনে আপনার নিশ্চয়ই কোন প্রোগ্রাম আছে।

—সম্পর্কটা কি বড়ই স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে না? দেখুন বন্ধুত্ব জিনিসটা এমনই, যেটা অনেকটা এক হাতে তালি না বাজার মতো। এ সংসারে কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাপার।

—ভালো বলেছেন। খুব দামি কথা বলেছেন। কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। অর্থাৎ আপনি আমায় কিছু দিতে চান? বলুন ম্যাডাম, কারো কাছ থেকে কিছু পেতে আমার খুব ভালো লাগে। কি দেবেন?

—কি চান?

—চেয়ে কিছু পেতে ভাল লাগে না। চাওয়া পাওয়াটা স্বতঃস্ফূর্ত হলেই তার মধ্যে থাকে আন্তরিকতা। নইলে কেমন যেন ভিক্ষে ভিক্ষে মনে হয়।

—কিন্তু ভিক্ষে তো আপনি একজনের কাছে করছেনই।

—কাজলের কথা বলছেন?

—কারো নাম না করলে যে আপনি বুঝতে পারবেন না এতোটা নির্বোধ আপনাকে ভাবতে পারি না।

—তাহলে বলি ম্যাডাম, এ এমনি এক চাওয়া, আপনি তাকে ভিক্ষেও বলতে পারেন। এর জন্যে রাজা তার রাজত্ব ছাড়তে পারে, ফকির তার ঝোলা ফেলে দিতে পারে, মুনি-ঋষিরা, যদিও আমি কোন মুনি-ঋষি দেখিনি, রূপকথায় পড়েছি, তাঁরা নাকি তাঁদের কঠোর তপস্যা জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিতার কাছে ছুটে যেতেন।

—তার মানে আপনি কাজলকে ভালবাসেন?

—সেটা তার সঙ্গে দেখা হলেই বলব।

—আমাকে বলা যায় না?

—কোন মানুষই আর এক মানুষের পরিপূরক হতে পারে না; বকলমে সই করা যায় কিন্তু

ভায়ার্মিডিয়ার মনেব কথা জানানো যায় না। সম্ভবত এমনি একটা কথা কলামন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আপনিই মন্তব্য করেছিলেন।

—সে রাগটার কি আজ প্রতিশোধ নিলেন?

—না। আমি কখনোই প্রতিশোধে বিশ্বাসী নই। কেবল কথাটা ফিরিয়ে দিলাম। আর এটা প্রকৃতিরই নিয়ম। এভরি অ্যাকশান হ্যাজ অ্যান ইকোয়্যাল অ্যান্ড অপোজিট রিঅ্যাকশান। ধ্বনি নিজেকে ফিরে পায় প্রতিধ্বনির মাঝে।

—আপনি খুব ঝগড়ুটে।

—আপনার বান্ধবী বলেছিলেন, আমি বড় তাড়াহুড়ো করি। বান্ধবীকে বলে দেবেন, যদি আপনাব ইগোয় না লাগে, আমি যেমন তাড়াহুড়ো করতে পারি, ঠিক তেমনি অপেক্ষায় পুড়তেও জানি। আজ তাহলে, রাখি?

—না। জিগ্যেস করলেন না তো, কেন আমি ফোন করেছি?

—ঝগড়ুটে মানুষ, ঝগড়া করেই সময় কেটে গেল। স্যরি। বলুন, আপনার মতো গুণী মানুষ অধমকে কেন তলব করলেন?

—এ রকম বোকা বোকা কথা আপনার মুখে মানায় না। একদিন আসুন আমার বাড়ি।

—আপনার বাড়ি? আপত্তি নেই। কিন্তু চিনি না তো?

—খুব সহজ। কসবা। অনেক নতুন কমপ্লেক্স তৈবি হচ্ছে। ওখানে এসে শুভ্রা অ্যাপার্টমেন্ট জিগ্যেস করলেই পেয়ে যাবেন। পাশাপাশি দুটো অ্যাপার্টমেন্ট। আমি থাকি 'এ' ব্লকের তিন তলায়। ফ্ল্যাট নাম্বাব ফাইভ।

—অহীনদাকে গেলে পাব?

—নাহ্। ওটা আমার, একান্তই আমার নিজস্ব ফ্ল্যাট।

—বেশ, যাব। কবে? শনি বা রবিবাব হলে ভাল হয়।

—স্যাটাবডে ইভনিং। সুইট স্যাটারডে।

মঞ্জিল জানতো না ওর জন্যে একটা চমক অপেক্ষা করছিল। ঠিক সন্ধ্যের মুখোমুখি ও গিয়ে দাঁড়িয়েছিল শুভ্রা অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। 'এ' ব্লক বেশি খুঁজতে হয়নি। কেয়ারটেকাবকে জিগ্যেস করতেই সে পাত্তা লাগিয়ে দিয়েছিল। বেল টিপতেই যাকে দেখবে আশা কবেছিল তাকে না, যাকে দেখবে না ঠিক ছিল সেই এসে দবজা খুলে দাঁড়িয়েছিল।

কাজল ঠিক তেমনি আগেব মতোই। সেই নিতান্তই আটপৌবে ডুরে শাড়ি। প্রসাধনও অতি সাধাবণ। শ্যামলা, শরীরে টইটম্বুর। কপালে একটা খয়েবি টিপ। কাজলের চোখে কোন কাজল ছিল না। তার দীঘল চোখ আর দীর্ঘ চোখের পাতায় কাজলেব প্রয়োজন হয না। টসটসে মুখে কোন পাউডারেব ছোঁয়া নেই। ঠোঁটেও ছিল না কোন রক্তিম প্রলেপ। কিন্তু সাবা মুখে ছিল শঙ্কা। ছিল লজ্জা। ছিল নম্রতা। সপ্রতিভ মঞ্জিলও কিছুটা থমকে গিয়েছিল। তা মাত্র কযেক সেকেন্ডের জন্যে। তারপরই সহজ গলায় বলেছিল—ভালো আছো?

মাথা নীচু রেখেই ঘাড় হেলিয়ে কাজল বলেছিল,—হ্যাঁ।

—ভেতরে আসতে বলবে না?

—এটা তো আমার ফ্লাট নয়।

—জানি। তোমার বন্ধুর। তুমি জানতে আমি আসব?

—না। তুহিনা কেবল বলেছিল ওর এক বন্ধু আসবে। এলে বসাতে।

—তাহলে তোমার বসানোর অধিকাব আছে।

—আসুন, বলে সরে দাঁড়িয়ে জায়গা কবে দেয়।

ঘরে ঢুকে হঠাৎই দরজা বন্ধ কবে খপ করে কাজলের হাত চেপে ধরে মঞ্জিল বলেছিল,—এত কষ্ট দিলে কেন, এই দেড় মাস ধরে?

—আমি?

—হ্যাঁ তুমি। জানো না, আমি তোমার ফোনের অপেক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে থাকতাম।

হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চায় কাজল। কিন্তু মঞ্জিল সে সুযোগ তাকে না দিয়ে বলেছিল, —আমার কথার উত্তর দাও।

—হাতটা ছাড়ুন। কেউ এসে পড়বে।

—কেউ মানে তুহিনা। ওকে সব বলে দিয়েছি।

কাজল চুপ করেছিল।

—না কাজল চুপ করে থাকলে হবে না। কেন আমায় ফোন করনি?

—সে সব শুনতে আপনার ভাল লাগবে না।

—লাগবে। তুমি বল।

—আপনার ভুলটা ভাঙিয়ে দিতে চাইছি।

—ভুল? কিসের ভুল?

—যা চাইছেন তা হয় না।

—কেন? তুমি কি কারো বাগদত্তা?

—এই কালো মেয়েকে কে আর কথা দেবার মতো ভুলকাজ করবে?

—তুমি বললে আমি তা এখুনি করতে পারি,

—ক্ষণিকের নেশা কাটলে বাচ্চা ছেলেরা যেমন এক খেলনা ফেলে আর এক খেলনায় হাত বাড়ায়, আপনারও তাই হবে। আপনি বরং—,

—বরং?

—তুহিনা সব দিকেই আমার সেরা। রূপে গুণে, অর্থে, সামাজিক প্রতিপত্তিতে। সেও আপনাকে চায়। আমি কিন্তু কোন ভাবেই আপনার যোগ্য নই।

—কী আশ্চর্য, তুমি আমার ভালো লাগাটাও বেছে দেবে? তাছাড়া আমি কিন্তু তুলনামূলক বাছাবাছিতে বসিনি। কে ভালো কে মন্দ সেটা আমাকেই বিচার করতে দাও।

—আপনি আমায় ক্ষমা করুন। এ হয় না।

—কেন হয় না?

—আপনি অন্ধ। তাই হীরে ফেলে কাচ নিয়ে লাফাচ্ছেন। কাচে হাত কাটবে কিন্তু হীরে বাড়াবে শোভা।

—যে কাচে হাত কাটে সেই কাচই দর্পণ হয়ে নিজেকে দেখতে শেখায়। হীরে কাছে থাকলে চুরি যাবার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হবে, কিন্তু দর্পণ কেবল সাক্ষী হয়ে থাকে। ভালবাসার প্রতি মুহূর্তের অভিব্যক্তি বুকে ধরে রাখে।

—এ আপনার মোহ। আবেগের কথা।

—আবেগটা আছে বলেই তো এগিয়ে যাবার বেগ আসে।

—কিন্তু তুহিনা যে আপনাকে ভালবাসে।

—হোয়াট ননসেন্স!

—তা সে যাই বলুন। এটাই ঘটনা।

—তাই বুঝি নিজেকে লুকিয়ে রাখার এত বাহানা?

—বাহানা নয়। তুহিনা যাকে চায়, সেখানে কি আমি হাত ছোঁয়াতে পারি?

—কেন, তুমি কি তুহিনার ক্রীতদাসী?

—আপনি কিছুই জানেন না মঞ্জিলবাবু। জানলে আমাকে আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা বলেই দূরে সরিয়ে দিতেন।

মঞ্জিল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ডোর বেল বেজে উঠল। মঞ্জিল গিয়ে বসল সোফায়। দরজা খুলে দেয় কাজল। তুহিনা ফিরে এসেছে। হাতে একরাশ খাবার।

—স্যরি, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। অবশ্য কাজল তো ছিলই।

—কিন্তু আপনি এতো সব কি আনলেন?

—মনজিনিসের চিকেন প্যাটিস আর প্যাসট্রি। সঙ্গে স্পেশাল ফ্লেভারড্ পিওর দার্জিলিং টি। খারাপ

লাগবে না, আমি নিজে পছন্দ করে এনেছি।

প্যাকেটগুলো কাজলের হাতে তুলে দিয়ে বলে, —যা, একটু কাজ কর। বসে বসে আড্ডা মারলেই হবে না। বেশ ভালো করে সাজিয়ে নিয়ে আয়। আর চা তো তুই ভালোই করিস। ওটাও আজ তুই করবি।

কাজল চলে যাবার পর তুহিনা গিয়ে বসল সামনের সোফায়। তুহিনার সেদিনের পোশাকটাও ছিল বেশ লাউড। হোয়াইট ফেডেড্ জিনসের টাইট প্যান্ট আর ব্লাড রেড জেন্টেস্ শার্ট। তুহিনার নিজস্ব চুলের গ্রোথ খুব ভাল। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা ঢেউ দোলানো চুলের গোছা। কুচকুচে কালো চুলের মধ্যে ওর ধবধবে ফরসা মুখখানা যেন অন্ধকারে জোনাকির মতো জ্বলছিল। সাজাটা খুবই সাধারণ মুখে হালকা করে ছোঁয়ানো ফেস-পাওডার। ঠোঁটে ঠোঁট রঙ লিপস্টিক। ব্যস। এমনকি কপালে কোন টিপের ছোঁয়াও নয়। আসলে ও নিজেই এতো সুন্দরী কারো সামনে আসতে গেলে ওর কোন মেকাপই লাগে না। চোখ দুটোও দারুণ সুন্দর। গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থিতি।

কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে মঞ্জিলের মনে হল, দুজন যদি পাশাপাশি দাঁড়ায় কাজলকে ওর বাড়ির কাজের মেয়ে ছাড়া, পরিচয় জানা না থাকলে, আর কিছুই মনে হবে না।

—কি দেখছেন এতোক্ষণ ধরে?

—সত্যিই আপনি সুন্দরী।

—আফসোস হচ্ছে?

একটু অবাক চোখে মঞ্জিল জিজ্ঞাসা করেছিল,—কি জন্যে?

—আমাকে ছেড়ে কাজলকে পছন্দ করে ফেলেছেন বলে।

মঞ্জিল হো হো করে হেসে উঠে। বলে, —একেবারেই না। ভালোলাগা কিছু আমাদের মনে ধরে বলেই সেটা আমাদের পছন্দের তালিকায় উঠে যায়। কিন্তু ভালবাসা তো অন্য জিনিস।

—ভালোবাসার ক্ষেত্রে পছন্দ অপছন্দের কোন ভূমিকা নেই বলছেন?

—একেবারেই তা বলিনি। কাজলকে আমার পছন্দ হয়েছিল বলেই তো সে আমার ভাললাগা এবং ভালবাসার পাত্রী। আর ভালবাসাটা তো সব সময় রূপের মুগ্ধতা দিয়ে আসে না; অতি সাধারণাকেও মনে ধরতে পারে। তাকে ভালবাসা যেতে পারে। এর কোন লজিক নেই। থাকতেও পারে না।

—কিন্তু রুচিবোধের একটা সম্ভাব্য দিক থেকে যায়।

—কেন কাজল কি অচ্ছ্যুত না অরুচিকর না কি অপাংক্তেয়?

—আমি একবারও সে কথা বলিনি। কাজল ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড।

—তাহলে রুচির প্রশ্ন ওঠে কেন? কে কি বলবে? সেই জন্যে?

—কিছু মনে করবেন না মিস্টার সিন্‌হা, কাজলকে আপনি ভালবাসেন এটা ওর বন্ধু হিসেবে আমার খুব ভাল লাগছে। কিন্তু ভয়ও করছে।

—কেন?

—কাজল না আঘাত পায় আপনার বা আপনার পরিবার বা আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে। ও খুব গরিব ঘরের মেয়ে। ওর বাবা ইনভ্যালিড। থাকে খুব সামান্য আর ছোট্ট একটা ঘুপ্‌চি ফ্ল্যাটে। ওর পরে একটা বোন আছে। এক ভাই। সেও মেন্টালি অ্যাণ্ড ফিজিক্যালি ক্রিপ্‌ল্‌ড্। হোয়ার‍্যাজ আপনি, আমার বাবার মুখ থেকে যা শুনেছি, বিরাট ফ্যামিলির একমাত্র ছেলে। হ্যান্ডসাম টু সাম এক্সটেন্ট্ রোম্যান্টিক। স্মার্ট। ইয়াং অ্যান্ড, দারুণ একটা চাকরি করেন। আপনার ভবিষ্যৎ খুব ব্রাইট।

—এগুলো কি ক্রাইটেরিয়ান?

—সত্যটাকে অস্বীকার করি কি ভাবে? হ্যাঁ ক্রাইটেরিয়ান তো বটেই। আপনার সঙ্গে বিয়ে হবে আমাদের স্টেটাসের কোন মেয়ের সঙ্গে। যেটা প্র্যাকটিক্যালি সমান সমান। আই মিন ম্যাচিং অর্ডার। কিন্তু আপনার সাময়িক উচ্ছ্বাসের জোয়ারে ভেসে গিয়ে যদি কাজল মনে-প্রাণে দেউলে হয়ে যায়? আপনার বাবা-মা কখনোই এই অসম বিয়ে মেনে নেবেন না। বুঝতে পারছেন তখন কী হবে বা হতে পারে?

—তার মানে বলতে চাইছেন আমার ভালবাসাটাকে কেউ মূল্যই দেবে না।

—আমার তো তাই মনে হয়।

—তাহলে একটা কথা জেনে রাখুন ম্যাডাম। একবার আমি যা ঠিক করি, কখনও আমি সেখান থেকে পিছিয়ে আসি না।

—কিন্তু কাজল বড় নরম স্বভাবের মেয়ে। ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স ওর মধ্যে প্রবল। সেটা ওর পারিবারিক অবস্থার জন্যে। ওর সামনে রোজগারের ওপর ওর সারা পরিবার নির্ভর করে আছে।

—এবার বুঝেছি।

—কি?

—কেন কাজল এই দেড়মাসে একবারের জন্যেও ফোন করেনি। তা আপনি তো ওর প্রিয় বান্ধবী। আপনি তো পারেন ওর এই সিলি সেন্টিমেন্টটাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে।

—চেষ্টা করিনি কে বলেছে? মাসের মধ্যে দশদিন ও নিজের বাড়ি থাকে। বাকি সময়টা কাটায় আমার কাছে। আমি যেখানেই যাই ওকে সেখানেই নিয়ে যাই। পরিচয় দিই নিজের প্রিয় বান্ধবী বলে। কোন কোন সময়ে আমার কোন প্রোগ্রাম থাকলে একান্তই যদি ও যেতে না পারে এ ফ্ল্যাটের চাবির প্রধান দাবিদার ও। আর সেই জন্যেই ওর কোথাও কোন ক্ষতির আশঙ্কা দেখলে ভয়টা ওর থেকে আমরা বেশি হয়। ও নির্জনে কাঁদবে, দুঃখ পাবে একা একা যন্ত্রণা সহ্য করবে, কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা ওর মুখে নেই।

মঞ্জিল একটা সিগারেট ধরায়। কয়েকটা টান দিতে দিতে দেখল কাজল চা আর বাকি খাদ্যদ্রব্যের একটা ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকছে।

—বাপরে, আঁৎকে ওঠে মঞ্জিল বলেছিল, এ সব করেছেন কী? এগুলো খেলে আজ রাতের মতো আমার খাওয়া শেষ।

—ভালোই তো। রাতে একটু কম খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালোই। নিন, শুরু করে দিন।

কাজল অন্য একটা সোফায় বসেছিল। ওর হেঁটমুণ্ড অবস্থাটা কোনদিনও যায় না। তুহিনা তিনজনের দিকে তিনটে প্লেট এগিয়ে দেয়। খেতে খেতে মঞ্জিল বলেছিল, —কাজল খাবার সময় মাথা নীচু করে খাওয়া ভাল। কিন্তু মুখটা নামিয়ে রাখার অভ্যাসটা তোমার ছাড়া দরকার। ওতে দীনতা প্রকাশ পায়। এখান থেকে বেরিয়ে আজ আমি তোমাদের ফ্ল্যাটে যাব।

আঁৎকে ওঠেছিল কাজল। প্রায় আর্তকণ্ঠে শশব্যস্তে বলে ওঠেছিল, —না না, তা কি করে হয়?

—কেন, হয় না কেন?

—না, মানে, আপনার সেখানে যেতে ভাল লাগবে না।

—দেখি কতটা খারাপ লাগে।

সত্যিই মঞ্জিল সেদিন কাজলকে ছাড়েনি। তুহিনা অবশ্য সঙ্গে যায়নি। তবে মঞ্জিল প্রায় জোর করে ওর বাড়ি গিয়েছিল।

সেদিন ফেরার পথে অ্যাপার্টমেন্টের চৌহদ্দি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে কাজল বলেছিল, —মঞ্জিলবাবু, কুঁজোকে চিৎ হবার স্বপ্ন দেখাবেন না। আমরা বড় গরিব।

—জানি। নির্বিকার উত্তর মঞ্জিলের।

—আপনার সঙ্গে আমার কোন ভাবেই মিল হবার কথা নয়।

—আমাকে কি তোমার ভালো লাগেনি?

—সে প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু চাঁদে হাত ছোঁয়ানোর স্পর্ধা বা স্বপ্ন আমি দেখি না। তাছাড়া,

—তুহিনার কথা বলছ? তোমার ধারণাটা ভুল। তুহিনা তোমাকে ভালবাসে। তোমার ভালমন্দ নিয়েই ও কথা বলছিল।

হঠাৎ চুপ করে যায় কাজল। কিছু একটা যেন বলার ছিল। কিন্তু বলার সম্ভবত সাহস হচ্ছিল না।

—চুপ করে আছ কেন? যা বলার স্পষ্ট বল।

একটু থেমে থেমে ও বলেছিল, —আমাকে আপনি মন থেকে সরিয়ে দিন। আমাকে ভুলে যান।

—না কাজল, আর তা হয় না।

সেদিন ও চলে এসেছিল। তার পরের ইতিহাস ক্রমাগত জটিল। আর সেই জট ছাড়াবার আগেই কাজল চলে গেল। শুভ্রা অ্যাপার্টমেন্টের সবাই বলছে এটা সুইসাইড কেস। কাজলের সুইসাইড করার তবু একটা মানে আছে। বাট হোয়াই তুহিনা?

প্রশ্নটা কুরে কুরে খাচ্ছিল। কিন্তু মঞ্জিল কোন সমাধানেই পৌঁছতে পারছিল না। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ও আবার স্টেশনের দিকেই হাঁটা শুরু করল।

আহেলির বয়েস তুহিনা আর কাজলের মতোই। সে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ছাত্রী। তুহিনা আর কাজলের সঙ্গে বেশ ভালোই আলাপ ছিল। তবে যোগাযোগ বা দেখা সাক্ষাৎ বেশি হত কাজলের সঙ্গেই। নীল আগে থেকে ওর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই এসেছে। শুভ্রা অ্যাপার্টমেন্টের সবাই নীলকে পুলিসের ডিটেকটিভ বলে ভেবে নিয়েছিল। ফলে আহেলির বাড়ির লোকেরাও তেমন কোন আপত্তি করেনি বা করতে সাহস পায়নি।

সন্ধের মুখে মুখেই নীল আর দীপু গিয়ে হাজির হয়েছিল 'বি' ব্লকে । কাজলের ঘরের ঠিক তিনতলাতেই ওরা থাকে। একতলা দিয়ে ঢোকার মুখে পড়ে কাজলদের ফ্লাট। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ওদের বিরক্ত না করে সরাসরি তিন তলায় চলে এল। দরজার নেমপ্লেটে লেখা ছিল ভবেন নন্দী। সম্ভবত আহেলির বাবার নাম। মোটামুটি সব ঘরেই বেলসিস্টেম আছে। বেল বাজাতেই আহেলি নিজে এসে দরজা খুলে দিয়ে বলল,—আসুন, আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি।

এ ফ্ল্যাটে তিনটে ঘর। তারই একটায় নিয়ে গিয়ে বসাল। বেশ ছিমছাম সাজানো ঘর। বোধহয় আহেলিরই ঘর। মেয়েটা পড়াশুনো করে। চারদিকে বইটই ছাড়ানো।

এক একটা মেয়ে আছে যাদের দেখলে মনে হয় বেশ হার্দিক। আহেলি সেই রকমই। পাতলা ছিপছিপে চেহারা। রঙটা উজ্জ্বল গৌর। মুখে সর্বদাই মিষ্টি হাসি। ঘন চুলের বিনুনি দুপাশে ঝুলছে। প্রায় কোমর ছাড়ানো চুল যেটা ইদানীং প্রায়ই দেখা যায় না। হাল্কা গোলাপি রঙের একটা আটপৌরে শাড়ি।

ঘরে খাট, ছোট্ট ড্রেসিংটেবিল। পড়ার টেবিল। একটা গদরেজ আলমারি। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথের ছবি। আরও দু একজন অপরিচিত পুরুষ এবং মহিলার ছবি। সব ছবিতেই মালা পরানো। অর্থাৎ এঁনারা গত হয়েছেন। দু-তিন খানা চেয়ার ছিল। অ্যাপার্টমেন্টের ঘরগুলো এমনভাবে তৈরি যে সব ঘরেই বারান্দার ফেসিলিটি আছে। চেয়ারে বসার আগেই নীলের চোখ পড়ে গেল বারান্দায় বছর আঠারো থেকে কুড়ির মধ্যে একটি মেয়ে বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে আছে গালে হাত রেখে।

—মেয়েটি কে?

—কাজলের বোন। চন্দ্রা। আপনার চিন্তার কারণ নেই। ও এখুনি চলে যাবে।

—কাজলের নিজের বোন? অর্থাৎ এই বাড়িতেই থাকে?

—হ্যাঁ। কাজলের ঠিক পরের বোন। ওরা দুই বোন এক ভাই।

—মেয়েটি থাকুক। ওকেও আমার কিছু প্রশ্ন করার আছে।

এই সব কথার মধ্যে চা আর সিঙাড়া চলে এসেছিল। কাপ, ডিস বা খাবারের প্লেট দেখলে গৃহস্বামীর অবস্থা কিছুটা আঁচ করা যায়। আহেলিদের অবস্থা মোটামুটি ভালই। ভদ্রতা করে নীল বলল,—আমি কিন্তু এসেছি আমার কাজে এবং আপনাকে বিরক্ত করতে।

— না মিস্টার ব্যানার্জি। বিরক্তি নয়, আমি মনে করি এটা আমার কর্তব্য।

—থ্যাঙ্কস্। এই বোধটা কিন্তু সবার থাকে না। যাই হোক চা পর্বের কোন দরকার ছিল না।

সামান্য হেসে আহেলি বলে,— এটাও একটা সামাজিক কর্তব্য। এখনও আছে। কতদিন থাকবে জানি না।

—ভালই বলেছেন। তাহলে ম্যাডাম, অযথা সময় নষ্ট না করে আমরা একটু কাজ মিটিয়ে নিই। আমি কতগুলো ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি।

—নিতান্ত ব্যক্তিগত না হলে সব প্রশ্নেরই উত্তর দেব।

—ওঃ। এখানে আপনারা আগে এসেছেন, না কাজলরা?

—ওরাই আগে এসেছে। নীচের তলাতেও তিনটে ফ্ল্যাট আছে। ওগুলোয় প্রথমে ঠিক হয় দারোয়ান আর কোঅপারেটিভের অফিস হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনজন গরিব লোককে অহীনকাকু ফ্ল্যাটগুলো ছেড়ে দেন বেশ কম দামেই। অবশ্য এটা কাজলই আমায় পরে বলেছিল।

—কাজলের বাবার অ্যাক্সিডেন্টটা কি এখানে আসার পরই হয়?

—হ্যাঁ এখানে তখন আমরা চলে এসেছি। তার কিছুদিন পরই। তারপরই তো ওরা উঠে যেতে চেয়েছিল।

—কেন?

—প্রথমত একটা সংস্কার। ঐ ফ্ল্যাটটা নাকি ওদের পক্ষে পয়া নয়। এখানে আসার তিন চার মাসের মধ্যে বাবকাকু ওঁর পা হারান। তখন উড়িয়ে দিলেও আজ মনে হচ্ছে ধারণাটা বোধহয় সত্যিই অপয়া। নইলে, দুম করে কাজল আত্মহত্যা করতে যাবে কেন?

—আর ইউ সিওর কাজল আত্মহত্যা করেছে?

—এছাড়া আর অন্য কী বলতে পারি।

—কেন? ওর মধ্যে কি কোন মেলাঙ্কলি গ্রো করেছিল?

—না। আর সেটাই আমায় ভাবাচ্ছে কেন ও সুইসাইড করতে গেল? রেসপন্সিব্‌ল মেয়ে। খুব একটা হইচইয়ের মধ্যে থাকতো না। যে কোন অবস্থা মেনে নেবার বা তার বিরুদ্ধে লড়ে যাবার ক্ষমতা ওর ছিল। আমাকে প্রায়ই বলতো ওর মাথার উপর কত দায়িত্বের কথা। বাবা শয্যাশায়ী। মা হার্টপেশেন্ট। এক ভাই মেন্টালি অ্যান্ড ফিজিক্যালি ক্রিপল্‌ড।

—মেন্টালি অ্যান্ড ফিজিক্যালি ক্রিপল্‌ড? এটা কি জন্মগত?

—না। বছর পাঁচেক বয়েসের পর থেকে হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে যায়। এখন তো প্রায় ভেজিটেবল। ষোল বছরের ছেলে, বোধশক্তি কিছু নেই। হয়তো বুঝতে পারে কিন্তু উত্তর দেবার মতো ভাষাটা নেই। আর আছে ঐ চন্দ্রা। ওর তো এখন বছর আঠারো উনিশ বয়স। হায়ার সেকেন্ডারি পড়ছে। লেখাপড়ায় খুব ভালো মেয়ে। সবার সব দায়িত্ব বড় মেয়ে হিসেবে কাজলের ওপরই ছিল। তাই গ্র্যাজুয়েশনের পরেই ওকে চাকরি নিতে হয়েছিল ওরই বাবার অফিসে। চিফ কেমিস্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে।

—কিন্তু তুহিনা তো রীতিমত ধনীকন্যা। এখানে সবাই বলে ওদের বন্ধুত্ব নাকি খুব নিবিড়। এটা কী ভাবে সম্ভব হল?

—জানি না। কিন্তু হয়েছে। ইট্‌স ফ্যাক্ট। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কি বন্ধুত্ব হতে পারে না?

—নিশ্চয়ই পারে। তবু, 'তবে' বলে একটা কথা আছে। আপনাদের কিছু মনে হত না?

—না। তুহিনা খুবই মিশুকে মেয়ে। ওরা অ্যাপার্টমেন্টের 'এ' আর 'বি' ব্লকের সবার সঙ্গেই ওর যথেষ্ট সদ্ভাব। তবে অন্য একটা কারণের কথা কেউ কেউ বলে, আমি ঠিক জানি না।

—কি কারণ?

—কাজলের বাবার পা দুটো চলে যাবার জন্যে নাকি অহীন কাকুই প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষে দায়ী।

—কি রকম?

—আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে তুহিনা বোধহয় ঘটনাটা জানতো। তাই ওকে বন্ধু করে নিয়েছিল। হয়তো বাবার কৃতকর্মের জন্য তুহিনাও অনুতপ্ত ছিল।

—ঠিক আছে, এবার আমি কাজলের কয়েকটা ব্যক্তিগত জীবনের প্রশ্ন করব। কাজল কি খুব অ্যানহ্যাপি? মরবিড টাইপ?

—ওর যা পারিবারিক অবস্থা তাতে অ্যানহ্যাপি হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। তবে ইদানীং ওকে একটু বেশি মরবিড দেখাতো।

—কেন জানেন?

—আমাকে জানায়নি। চন্দ্রা হয়তো বলতে পারবে। ওকে ডাকব?

—ডাকুন।

চন্দ্রা বলে ডাকতেই ও বারান্দা থেকে চলে এল। কাঁদছিল নাকি? হতে পারে। সংসারে একমাত্র রোজগেরে দিদির অস্বাভাবিক অকালমৃত্যুতে কান্না আসতেই পারে। ও এলে নীল ওকে বসতে বলল। অনেকটা কাজলের ধাঁচেই মুখ। কিন্তু রঙটা বেশ পরিষ্কার।

—বোস।

মুখের মধ্যে লেগে থাকা বিষণ্ণতা ছাড়াও একটা অন্যমনস্কতার ছাপ ফুটে উঠেছে। কুঞ্চিত ভ্রূর ভাঁজে সতর্কতার ছোঁয়া। তবু সহজভাবেই একটা চেয়ার টেনে নীলের মুখোমুখি বসল চন্দ্রা।

—তুমি এখন কি পড়ছ চন্দ্রা?

—হায়ার সেকেন্ডারি দোব।

—তাহলে তো তুমি অ্যাডাল্ট। তোমার আহেলিদির কাছে শুনলাম তোমার দিদি ইদানীং একটু মরবিড হয়ে পড়েছিল। তুমি কি জান তার কারণটা কি?

—দিদির মনে দুঃখ ছিল। কষ্ট ছিল। অনেক ভাবনাও ছিল আমাদের ফ্যামিলির জন্যে। আজকাল প্রায়ই রাতের দিকে দেখতুম দিদি একটা লাল মলাটের খাতায় কিছু না কিছু লিখছে।

নীল সজাগ হয়ে উঠল।

—ডায়েরি নাকি?

—হতে পারে।

—সেটা কোথায়?

—দিদি চলে যাবার পর আমি অনেক খুঁজেছি। পাইনি।

—দিদির ডায়েরি, তুমি কেন খুঁজেছিলে?

—দিদির তো চলে যাবার কথা নয়। তাহলে কেন সে চলে গেল। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। সেটা হয়তো ডায়েরির মধ্যে দিদি লিখে যেতেও পারে। তাই।

—বেশ, তা তোমার দিদির সঙ্গে কি কারো অ্যাফেয়ার্স ছিল? এবার আহেলিই উত্তর দেয়,

—হ্যাঁ মিস্টার ব্যানার্জি, ছিল।

—ইয়েস, এটাই আমার বিশেষ ভাবে জানার দরকার। ছেলেটি কে? আপনারা চেনেন?

—হ্যাঁ। চিনি। ওর নাম মঞ্জিল সিন্‌হা। খুব উঁচু পোস্টে চাকরি করে আর দারুণ হ্যান্ডসাম। তায় বড়লোক বাপের একমাত্র ছেলে।

—তার মানে আনম্যাচিং পেয়ার?

—আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হবে। আমরাও প্রথমে ব্যাপারটা ভাবতে পারিনি। কিন্তু মঞ্জিল সব জেনেও যখন নীচের ফ্ল্যাটে রেগুলার যাতায়াত শুরু করল, তখন আস্তে আস্তে সবাই সেটা মেনে নিয়েছিলাম।

—আর তুহিনাদেবী?

—সেও। প্রায় দিনই মঞ্জিল এলে দুজনকে ওর ফ্ল্যাটে নিয়ে যেত। গল্প আড্ডা সবই চলতো। অনেক রাত পর্যন্ত। তবে কাজল। কিন্তু শেষদিকে একেবারেই তুহিনার ফ্ল্যাটে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। বিশেষ করে মঞ্জিলবাবু এলে।

—হুঁ। আচ্ছা চন্দ্রা, তোমার বাবা-মা এতে আপত্তি করেনি?

—কী ব্যাপারে?

এই অসম সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত যদি বিয়ে হত তাহলে সংসারের একমাত্র রোজগেরে মেয়ে চলে যাবে। সংসারটা দুর্বিপাকে পড়ে যাবার ভয়ে।

কোন রকম ইতস্তত না করেই চন্দ্রা বলল, —পা দুটো চলে যাবার পর বাবা সংসারে থেকেও নেই। তবে মা খুব খুশি ছিলেন না। বোধহয় ঐ কারণেই।

—মঞ্জিলবাবু কি বিয়ের কথা বলেছিলেন?

—বলেছিলেন। তবে আমার চাকরি না হওয়া পর্যন্ত মঞ্জিলদা অপেক্ষা করবেন এটাও বলে দিয়েছিলেন। বি এ পাস করার পর মঞ্জিলদাই আমার চাকরির ভার নিয়েছিলেন।

—সবই ঠিক আছে। তাহলে মরবিড হবার কারণ?

—ঠিক জানি না। তবে একটা ব্যাপাব আঁচ কবতে পাবা-লাম।

—কী সেটা?

—ইদানীং তুহিনাদির সঙ্গে দিদির সম্পর্কটা কোথায় যেন একটু চিড খেয়েছিল বলে মনে হচ্ছিল।

—সেটা কেন?

—ঠিক জানি না। আগে তুহিনাদি নিজেব ফ্ল্যাটে এসেই দিদিকে ডেকে পাঠাতো। আমাদেব জায়গা কম বলে দিদি অনেকসময় ওদেব ফ্ল্যাটেই বাত্রে থেকে যেতো। তুহিনাদি তো মাঝে মাঝেই প্রোগ্রাম করতো। কখনও নাচ, কখনও গান। এখন আবাব সিবিয়াস অ্যাকটিং নিয়ে মাতামাতি শুরু কবেছিল। দিদিকে দেখতাম তুহিনাদি যতক্ষণ না বাড়ি ফিবতো দিদি বেশ ছটফট কবতো। বাববাব ওদেব ফ্ল্যাটেব দিকে তাকাতো, আলোটালো জ্বলছে কি না। এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু মাস ছ সাত যাবৎ দেখছি, সেই আঁটোসাঁটো ব্যাপাবটা কেমন যেন আলগা হয়ে গেছিল।

একটু থেমে নীল জিজ্ঞাসা করে,—কোন ঝগড়াঝাটি হয়েছিল নাকি?

—ঝগড়া করা দিদিব স্বভাবেব বাইরে। আব তুহিনাদি প্রচণ্ড বকম এটিকেট মেনে চলতে অভ্যস্ত। প্রকাশ্যে ঝগড়া কবাটা ওব স্টেটাসে বাধবে। এসব ব্যাপাবে সত্যি বলতে কি তুহিনাদিব নাক উঁচু স্বভাবটা ছিল প্রচণ্ড বকমেব বেশি বেশি। ঐগুলি বলতে গেলে বলতে হয়, আভিজাত্যেব অহংকাব।

—তাব মানে, তুমি বলতে চাইছ তোমাব দিদি বর্তমানে বন্ধুব বাড়ি যাতায়াত কবতো না?

—না না তা কেন? তাহলে তো প্রথমেই বলে দিতাম ওদেব মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেছে। আসলে একটা বকম ঠাণ্ডা মনোমালিন্য ওদেব মধ্যে গ্রো করেছিল যেটা বাইবেব কোন লোক বুঝতেই পাবতো না। তবে আমি ধবতে পাবতাম কিছু একটা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে ওদেব মধ্যে।

নীল থুত্‌নীতে হাত বেখে কিছু একটা ভাবল। তাবপব দম কবে প্রশ্ন কবে বসল,—তোমাব দিদি আই মিন কাজল কি বেগুলাব বীয়াব খেতো? অথবা এনি আদাব হার্ড ড্রিংকস?

—দিদিব স্বভাব অনুযায়ী খাবাব কথা নয়।

—কিন্তু সেদিন খেয়েছিল। কাবণ, পবদিন সকালে, দুটো বাড়িব পাশ থেকে আমবা একটা বীয়াবেব বোতল পেয়েছি। পেয়েছি দুটো গ্লাস। একটা ফাঁকা, অন্যটা ভর্তি। অবশ্য তোমাব দিদিব গ্লাস পূর্ণই ছিল। কিন্তু সেই গ্লাস থেকে পাওয়া গেছিল পটাসিয়াম সায়নায়েড। যা কিনা তোমাব দিদিব মৃত্যুব কাবণ। এ দিয়ে প্রমাণ হচ্ছে যে তোমাব দিদি অন্তত সেদিন বীয়াব খেয়েছিল।

—কোন দিনই খেতো না। কেন যে সেদিন খেতে গেল এটাই আমাব কাছে বিস্ময়।

আহেলি অনেকক্ষণ চুপ কবে ওদেব কথা শুনে যাচ্ছিল। একটু ফাঁক পেয়েই ও বলল,—মিস্টাব ব্যানার্জি, চন্দ্রা জানে না তবে আমি জানি, আজকাল কাজল তুহিনাব ঘবে যেদিনই বাত্রে থাকতো সেদিনই খেত। এসব ব্যাপাব তুহিনাব কাছে কোন ফ্যাক্টবই ছিল না। কাজল অবশ্য মদটা কোনদিনও ছোঁয়নি।

পাল্টা প্রশ্ন কবে নীল,—আপনি এতসব জানলেন কী ভাবে?

একটু লজ্জিত মুখে আহেলি বলে,—তুহিনা একদিন আমাকেও বীয়াব খাইয়ে দিয়েছিল। যা তিতকুটে, একচুমুক দিয়েই আমি আব খাইনি।

একটা সিগারেট ধবিয়ে নীল বলল,—এবাব আমবা উঠব। একবাব তুহিনাব ফ্ল্যাটটা দেখতে হবে। কিন্তু দুটো পয়েন্টেব কোন সঠিক উত্তব পাওয়া গেল না।

আহেলি বলল,—আমবা যা জানি তা সবই বলেছি কিন্তু,

—হ্যাঁ। দোষটা আপনাদের নয়।

—আপনি কি কি উত্তব পাননি, আবাব বলুন, চেষ্টা করব ভেবে দেখাব।

—প্রথম প্রশ্ন, কী কারণে দুজনের সম্পর্কে জটিলতাব সৃষ্টি হল? আর কেন তুহিনার মতো একজন বিরাট মাপের ধনী কন্যা, ডোন্ট মাইণ্ড, আপনাদেব মতো সাধাবণ পবিবাবেব একটি মেয়ের সঙ্গে এতো মাখামাখি সম্পর্ক তৈরি করেছিল?

—একটা হিন্‌ট্‌স্ আমি দিয়েছি। তবে সেটা অনুমান মাত্র। তাব সঙ্গে নিশ্চয়ই সত্যের কোন সম্বন্ধ নেই। রামকাকুব অ্যাকসিডেন্ট নেহাতই একটা দুর্ঘটনা। সেটা নয়, আসলে ওদের নিবিড় বন্ধুত্বটা তুহিনাব

উদারতা হতে পারে না কি?

—অথচ তুহিনার স্বভাব বলছেন কিছুটা দেমাকি। সে তার নিজের স্টেটাস মেইনটেইন করে। একটু আগেই চন্দ্রা বলেছে তার অহংকার আছে। আভিজাত্যের অহংকার। আপাত দৃষ্টিতে এদের মধ্যে হেভেন অ্যান্ড হেল ডিফারেন্স। সচরাচর এ রকম দেখা যায় না। এর পেছনে কি আর কোন কারণ আছে?

আহেলি আর চন্দ্রা দুজনেই চুপ করে যায়। এসব জটিল প্রশ্নের উত্তর তাদের জানা নেই।

নীল এবার উঠে পড়ে। দরজার মুখে এসে নীল আহেলিকে জিজ্ঞাসা করে,—মঞ্জিলবাবুর ঠিকানা বা অফিসের ঠিকানা জানেন?

চন্দ্রা বলে,—আমার কাছে লেখা আছে। এনে দিচ্ছি।

—চল, তোমার ফ্ল্যাটের সামনে দিয়েই তো যেতে হবে।

আজ আর নীল কাজলদের ঘরে ঢুকল না। দরজা বন্ধই ছিল। চন্দ্রা ঠিকানাটা এনে দিল। একবার চোখ বুলিয়ে নীল ঠিকানাটা নিয়ে পকেটে রাখতে রাখতে চন্দ্রাকে বলল,—তোমার ওপর একটা দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি। আরো একবার ভালো করে খুঁজে দেখো তোমার দিদির কোন ডায়েরি খুঁজে পাও কি না। মনে রেখো ইট ইজ ভেরি ইমপর্ট্যান্ট টু ফাইন্ড আউট এনি ডায়েরি অর সামথিং এল্‌স লাইক দ্যাট।

ঘর ছেড়ে চন্দ্রা জানালো সে খুঁজে দেখবে। 'বি' ব্লক পেরিয়ে ওরা সামনের লনটার ওপর গিয়ে দাঁড়াল। দীপু জিগ্যেস করল, —তুহিনার ফ্ল্যাটে যাবে নাকি?

ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল ফ্ল্যাটের আলো নেভানো।

ঘাড় দোলাতে দোলাতে নীল বলল, —তার মানে আপাতত ওটা খালিই আছে। এবং বন্ধ।

—তাহলে?

—সুবোধ বেবাকে পাকড়াই। মাস্টার 'কি' তো ওর কাছে থাকবেই।

সুবোধ ওর ঘরেই ছিল। চাবির কথা বলতে ও প্রথমে একটু দোনামোনা করছিল, কিন্তু, নীলকে ও ধরেই নিয়েছিল সে পুলিসের লোক। তবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাস্টার কি-টা নিয়ে এলো।

তুহিনার ফ্ল্যাট বন্ধই ছিল। সুবোধই দরজা খুলে দিল। আলো জ্বালতেই ফটাফট নিওন হাসতে শুরু করে দিল। আগের দিনের সঙ্গে কোন পরিবর্তনের কিছু নেই। তবে একদিন হাত না পড়ায় ধুলোটুলো জমতে শুরু করেছিল। সুবোধ সঙ্গেই ছিল। নীল জিজ্ঞাসা করল,—এই দিদিমণির বাড়ির লোকজন এর মধ্যে আর আসেননি?

—আর কার জন্যে আসবেন তেনারা? আসল মানুষটাই তো চলে গেল।

—অন্য আর কেউ এসেছিল?

—আর কেউ না। তাছাড়া সেদিন দারোগাবাবু বলে গেলেন পুলিস ছাড়া আর কাউকে যেন ঘরে ঢুকতে না দিই। আমাদের সেক্রেটারিবাবুও তো জানেন।

—আচ্ছা সুবোধ, তোমার দিদিমণির কোন পুরুষ বন্ধু ছিল?

—হ্যাঁ অনেক। ওনার নাচগানের দল ছিল।

—রিহার্সাল কি এই ঘরেই হত?

—হ্যাঁ, অনেক সময় হত।

কথা বলতে বলতে নীল দ্বিতীয় ঘরে চলে এসেছিল। তুহিনার বেডরুম।

খুব ছিমছাম। আসবাবে মোটেই ভারাক্রান্ত নয়। একটা আমেরিকান ডাবল বেড খাট। দুটো মাথার বালিশ। ভারি মনোরম সাটিনের ওপর কাজ করা বেডকভার পাতা। ঈষৎ কোঁচকানো জায়গায় জায়গায়। ছোট্ট বেডসাইড টেব্‌ল। টেলিফোনটা সেখানেই আছে। বিছানার ওপর একটা কর্ডলেস। কর্ডলেস তুলে বাটন পুশ করতে হিসহিস সাউন্ড ভেসে এল। নো ডায়াল টোন। নিজের মনেই বলল, পাওয়ার ডাউন মানে বেশ কদিন চার্জ দেওয়া হয়নি। বেডসাইডের ওপর একটা সিগারেটের অ্যাশট্রে। তাতে খান চারপাঁচ পোড়া পাফ।

—তুহিনাদেবী কি রেগুলার সিগারেট খেতেন, সুবোধ?

—আজ্ঞে, আমি তো কখনও দেখিনি।

—শেষ কবে ওর [illegible] এসেছিল?

—তা আপনার মারা যাবার দিন [illegible] একটা [illegible] মেয়ে এসেছিল।

—আর পুরুষ বন্ধু?

—একজনেই এসেছিলেন, ঐ [illegible]বাবু

—একাই?

—হ্যাঁ।

—কতদিন আগে?

—[illegible] আগে।

—কাজলদেবী [illegible]

—সঠিক বলতে পারব [illegible]

—থাকতেন [illegible]

—[illegible]

—[illegible]

—[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এমন কথা বলা ঠিক [illegible]

—তোমাকে এ [illegible] কে দিয়েছে?

—প্রমোটারবাবু

—মানে অহীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী?

—হ্যাঁ সাহেব।

—অহীন্দ্রবাবু কি কোনদিনও কাজলদেবীর বাড়ি গিয়েছিলেন?

—না। বাবু আসতেন গাড়ি নিয়ে, মেয়ের সঙ্গে দেখা করেই চলে যেতেন।

—তুহিনার কাজের লোক ছিল বলে শুনেছিলাম।

—হ্যাঁ ছিল। মেয়েটা তো দিনরাতই থাকতো।

—তাকে দেখছি না। সে কোথায়?

—আজ্ঞে সাহেব, যেদিন দিদিমণি মারা গেলেন সেদিন থেকে সে আর আসছে না। খবর শুনে সেই যে সোমনাথদাদুকে চাবি দিয়ে পালাল, তারপর থেকে আর আসে না।

—তার খোঁজ নাওনি?

—না সাহেব। কার বাড়ির ঝি পালালো সে খোঁজে আমাদের কী?

—তার বাড়ির নাম্বার নিশ্চয়ই জানা আছে?

—সেক্রেটারিবাবুর কাছে সবার ঠিকানা থাকে। এমন কি প্রত্যেক ফ্ল্যাটের কাজের লোকের নাম, ঠিকানা, ছবি সব আছে।

নীল ঘরটার চারপাশে মন দিয়ে দেখছিল। দেওয়ালে টাঙানো তুহিনার বিশাল আকারের হাস্যরত মুখ। ফোটোজিনিক মেয়েটাকে হাসলে আরো দারুণ লাগে।

নীল বেরিয়ে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সে সোজা বারান্দায় চলে গেল। অভিপ্রেত কিছু একটা জিনিসই খুঁজে যাচ্ছিল তার চোখ দুটো। বারান্দায় কয়েকটা ফুলের গাছ। গাছগুলো আর টবের চারপাশেও ভাল করে দেখে নিল।

ফিস ফিস করে দীপু বলল, —তুমি যা খুঁজছ, মনে হয় সেটা আমার কাছে।

নীল দীপুর দিকে তাকাল,—তুই জানিস কি খুঁজছি?

—একটু আন্দাজ করতে পারছি। কাজে লাগবে কি না সে তুমিই জান।

—ঠিক আছে, পরে দেখব। দেখি তোর ইনটুইশানটা কেমন?

দেখার আর কিছু ছিল না। বেরিয়ে এল। সুবোধের উদ্দেশে বলল,—একবার নীরেনবাবুকে দেখতে পেলে বলবে আমরা এক্ষুনি আসছি। কোথাও আবার বেরিয়ে না যান।

সুবোধ নীচে নেমে গেলে ওরা আস্তে আস্তে একতলায় নামতে থাকে। কয়েক ধাপ নামার পরই নীল হাত পাতে। দীপু পকেট থেকে একটা ওষুধের ফয়েল বার করে ওর হাতে গুঁজে দেয়। নীলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। জিনিসটা পকেটে রাখতে রাখতে নীল বলে, —নাহ্, সত্যিই তোর বুদ্ধি বাড়ছে।

অফিসঘরে ছিলেন নীরেন হালদার। ওদের দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন। নীল হাত তুলে বসতে বলে বলল, —তুহিনার বাড়ির কাজের মেয়েটির নাম, ঠিকানা এবং ছবি তিনটেই চাই।

—আজই?

—আজ পারলে কাল নয়।

একটা রেজিস্টার টেনে মিনিট খানেকের মধ্যে নাম, ঠিকানা আর ছবি নীলের হাতে দিয়ে বলে, —মেয়েটির নাম সবিতা। বয়সে সাতাশ-আটাশ। ম্যারেড। কিন্তু এখন স্বামীর সঙ্গে বনিবনা নেই। বাড়ি শিয়ালদার কাছে ক্রিক রো-তে। ছবিটা দেখে মনে হবে একটু গাবদা গোবদা মহিলা। তা কিন্তু নয়।

ধন্যবাদ জানিয়ে ওরা বাস রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

দীপু বলল, — একটা ট্যাক্সি পেলে মন্দ হত না।

—এখন কি পাবি? দেখ।

পাওয়া গেল। সেটা দীপুর তৎপরতায়। ট্যাক্সিতে উঠে দীপুই প্রশ্ন করল,—তোমার কী মনে হয়? ট্রায়াঙ্গুলার লাভ? দুটি মেয়ে একটি ছেলে?

—মঞ্জিলের সঙ্গে দেখা না হলে বলতে পারব না।

—আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে।

—কি?

—তুহিনার বাবার সঙ্গে রামরঞ্জনবাবু মানে কাজলের বাবার কোন কানেকশান আছে।

—কেন, একথা তোর মনে হচ্ছে কেন?

—দেখ গুরু, তুমি বলতে পার তুহিনা খুব বন্ধুবৎসল। নিজে বড়লোকের মেয়ে হয়েও একজন অতি সাধারণ মেয়ের সঙ্গে ইনটিমেসি পাতাবে সেটা মোটেও তাজ্জব হবার ব্যাপার নয়। এ রকম অনেক দেখা গেছে। হতেই পারে। কিন্তু কোথায় যেন কি যে একটা খচ্ খচ্ করছে। দুজনের শিক্ষা দীক্ষা, কালচার, স্টেটাস, রূপগুণ কোন কিছুতেই মিল নেই। তবু কেন এত গলায় গলায় দোস্তি! নিশ্চয় এর পেছনে কোন কারণ আছে। আবার দেখ, এত বন্ধুত্ব, তবু সেই বন্ধুত্বে সামান্য চিড় খাওয়ার কথাও শুনলে। এবং সেটা সম্ভবত দুজনের মাঝখানে একটি ছেলের আবির্ভাব ঘটার পর।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে নীল বলল, —তোর যুক্তি ফেলে দেওয়ার নয়। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রেমের ব্যাপারে নিবিড় বন্ধুত্বও হোঁচট খেতে পারে।

—কিন্তু, অ্যাকর্ডিং টু বোথ আহেলি অ্যান্ড চন্দ্রা'স ভারশান, মঞ্জিল প্রেম করেছিল কাজলের সঙ্গেই। এবং তুহিনাও সেটা মেনে নিয়েছিল। ওদের দুজনকে নিয়ে এক সঙ্গে আড্ডা দিত। গল্পগাছা করতো নিজের ফ্ল্যাটে বসে।

—তার অর্থ, প্রেম নয় অন্য কোন ব্যাপারে ওদের মধ্যে হয় তো কোন মনোমালিন্য হয়েছিল। এবং সেটা শেষ পর্যন্ত ছিল না। থাকলে দুজনে একসঙ্গে বসে বীয়ার খেত না। কিন্তু রহস্যটা এখানেই দীপু। নিজের ফাঁকা ফ্ল্যাট থাকতে সেদিন অত রাত্রে দুজনে ছাদে গেল কেন? ফ্ল্যাটে বসেই তো খাওয়া দাওয়া সারতে পারতো।

—হাঁ, এটা আমার কাছেও মিস্ট্রি। এবং আরও একটা মিস্ট্রি, যদিও তোমরা আলোচনা করেছ এ নিয়ে, দুজনের জন্যে দু ধরনের বিষ কেন?

নীল ক্রমশ গুম হয়ে যাচ্ছিল। সিগারেটটাও টানছিল ঘন ঘন। আসলে ওর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব কাজ করছিল প্রচণ্ডভাবে।

—কী ভাবছ গুরু?

—বড্ড ধোঁকায় পড়ে যাচ্ছি। এখনও বুঝতে পারছি না এটা হত্যা না আত্মহত্যা। দুটোর জন্যেই মোটিভ থাকা দরকার। কাজলের আত্মহত্যার মোটিভ থাকতে পারে। সে হয়তো আর সংসার টানতে পারছিল না। অথচ সেটাও এখানে ধোপে টিকছে না। কারণ মঞ্জুল ওদের ফ্যামিলিকে আশ্বাস দিয়েছিল। এমনকি চন্দ্রারও একটা ব্যবস্থা করে দেবে এরকম কথাও হয়েছিল। তবে কি এমন হতে পারে কাজল মঞ্জিলের কাছ থেকে কোন আঘাত পেয়েছিল? মঞ্জুল কি তুহিনার জন্যে কাজলকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল? আত্মহত্যার জন্যে কাজলের এটা যথেষ্ট্রাহ্য মোটিভ হতে পারে।

—হ্যাঁ তা হতে পারে।

—বাট, হত্যার কোন মোটিভ পাচ্ছি না। কাজলকে হত্যা করে কার কী লাভ?

—আছে গুরু। কাজলকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে একজনকে পাওয়া যাচ্ছে।

—তুই তুহিনার কথা বলছিস?

—কেন নয়? তুহিনার মতো সুন্দরী, ধনী এবং উচ্চাশাবাদী মেয়ে থাকতে কাজল তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী এটা মানতে না পেরে তুহিনা তাকে হত্যা করতে পারে।

—তাহলে ধরা যাক তুহিনা? সে যদি কাজলকে খুন করেই থাকে, তার কার্যসিদ্ধি হয়ে গেছে, এরপরও সে কেন আত্মহত্যা করবে? অথবা কেউ তাকে খুন করবে?

—তুহিনার মালটিপারপাস অ্যাকটিভিটির জন্যে সে হয়তো কারো শত্রু হয়ে উঠেছিল। কারণ এখানে অর্থনৈতিক গেইন খুব একটা নেই।

—উঁহু। দুটো আলাদা ধরনের মোটিভের জন্য দুটো খুন অথবা আত্মহত্যা, একই সময়? একই স্পটে? নাহ্, মানা যাচ্ছে না। তাছাড়া তৃতীয় ব্যক্তিটা কোথায়? সে রাত্রে আর কারো উপস্থিতির তথ্য মেলেনি।

দীপু ভাবতে ভাবতে খানিকটা রাস্তা অতিক্রম করার পর বলল — নাহ্ গুরু, আমার রেনে আর কিছু খেলছে না। যদি জানতে পারতাম এটা খুন অথবা আত্মহত্যা তাহলে একটা জায়গায় আসা যেত। দেখ, তোমার মাথায় কিছু খেলে কি না।

—একবার সবিতাকে পাকড়াও করলে হত। যাবি নাকি?

—চল। তবে রাত হয়ে যাবে।

—এরা বাড়ির কাজের মেয়ে। রাত করেই ফেরে।

ওদের ট্যাক্সি যখন শিয়ালদায় এসে পৌঁছল তখন রাত প্রায় নটা। ঠিকানা খুঁজে নিতে অসুবিধা হল না। সেখানেই ট্যাক্সি ছেড়ে ওরা হাঁটতে শুরু করল। দু একটা অলিগলির পর একটা ছোট্ট মাঠকোঠা মত পরিবেশে সবিতাকে খুঁজে পাওয়া গেল। এ শহরটা এখনও ভারী বিচিত্র। মালটি স্টোরিড বিল্ডিং এর পাশেই ঝুপড়ি। এ ওয়ান সিটি হওয়া সত্ত্বেও স্ট্যাটাসিম্বল কিছু করেনি। তবে সবিতা ফুটে থাকে না! ছোট্ট একটা একঘরের একচালা প্রায় বস্তিঘর থেকে বেরিয়ে এল। ছোট খাটো চেহারা। স্বাস্থ্যটা আঁটোসাটো। অনুজ্জ্বল রং। মুখে কোন শ্রী নেই আবার বিশ্রীও নয়। একটু অবাক চোখে নীলের দিকে তাকিয়ে বলল, —কাকে চাইছেন?

—সবিতা তোমার নামই তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—অহীন্দ্র রায়চৌধুরীর বাড়িতে তুমিই তো কাজ করতে?

—না বাবু। তার মেয়ের বাড়িতে করতুম।

—হ্যাঁ তাইতো। দিন রাতই থাকতে?

—হ্যাঁ বাবু।

—তুমি কি জান, তুহিনাদেবী মারা গেছে?

—শুনেছি।

—শুনেছি মানে?

—আজ্ঞে আমি তো কদিন যাইনি?

—সবিতা, আমরা পুলিস থেকে আসছি। মিথ্যে বলার চেষ্টা কোর না। তাহলে কিন্তু জড়িয়ে পড়বে। আমরা অনেক কিছু জেনেই তোমার কাছে এসেছি।

সবিতা চুপ্‌সে গিয়ে আমতা আমতা করে বলে,—ও, আপনারা পুলিসের লোক?

—হ্যাঁ। ঠিক যা যা জিজ্ঞেস করব সঠিক উত্তর দেবে। নইলে

ঢোক গিলে সবিতা বলল,—যে মরে গেছে সে তো গেছেই। আমাদের নিয়ে আর টানাটানি কেন? আমরা তো আর তারে মারিনি।

—আমরা মানে?

—এই ঝি-চাকরদের কথা বলছিলুম। কোথাও কোন [illegible] কিছু হলেই [illegible] ওপর। আমাদের কি অত সাহস আছে?

—আছে সবিতা। আছে। খবরের কাগজ [illegible] অসীম। তাদের দৌলতে আজ [illegible] এক্ষেত্রে তোমার কাছ [illegible]।

—বলেন। জানলে বলে দেব।

—সে রাতে তুমি ওই ফ্ল্যাটে ছিলে?

—হ্যাঁ।

—না বললে কেন?

—পুলিসকে আমার বড ভয়।

—তখন তো জানতে না যে আমরা পুলিস।

—কোন হ্যাপায় যেতে চাই না তাই।

—হুঁ। এবার বল তো, তোমার দিদিমণি কতদিন ধরে নেশা করা শুরু করেছেন?

—মাঝে মাঝেই করতেন। কতদিন তা বলতে পারবনি।

—ওনার বাবা-মা জানতেন?

—না জানার কি আছে? ও সব বড় লোকদের ব্যাপার।

—আর কাজলদি?

—আমি তো কোনদিনও তাকে খেতে দেখেনি।

—ফের মিথ্যে কথা বলছ?

—না মানে, তেমন করে খেতো নি। একটু আধটু। তা সে অহেলি দিদিও তো একদিন খেয়েছিল।

—আর ঐ বাবুটি?

—সোন্দর মতন দেখতে বাবুটি?

—কি, আর কেউ আসতো নাকি?

—হ্যাঁ অনেকেই আসতো। গান-বাজনা-থেটারের সব হিড়িক হতো। ওসব বেলেল্লাপনা কোনদিন চোখেও দেখিনি বাপু!

—ওই সুন্দর মতন বাবুটিও কি ওই সব খেতেন?

—হ্যাঁ ঢের খেতো। বললুম না বড় লোকদের ব্যাপার। ছাই পাশ না গিললে কি আসর জমে?

—তুমি কি করতে?

—তিনাদের জন্যে ভাজাভুজি করে দিতুম।

—ওরা তিনজনেই কি সর্বদা একসঙ্গে তুহিনার ঘরে যেতেন?

—প্রথম প্রথম যেতেন। তারপর কাজলদিদি আর আসতেন নি।

—কেন ঝগড়া হয়েছিল?

প্রশ্নটা শুনে সবিতা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, —হবেনি কেন? এক বাবুরে ধরে দুজনে টানামানি করলে হবেই তো।

—তার মানে তোমার তুহিনা দিদিও সুন্দর মতন বাবুকে চাইতো।

—আমার মনিব। মরে গেছে। নিন্দে করা উচিত নয়। তবে কি জানেন, সোন্দর দেখতে মানুষগুলো খুব হিংসুটে হয়। তোর কি আর বর জুটতো না। ওনার যখন কাজল দিদির সঙ্গে আশনাই, তখন না বাপু, এসব খারাপ জিনিস।

—তা সে বাবুটি কি করতো?

—পুরুষ মানুষকে কোনদিনও বিশ্বাস করা ঠিক নয়। এই তো দেখেন না আমার বর। আমায় কত ভালবাসতো। তখন কি আমায় ঝিগিরি করতে হত? তারপর ঐ সন্ধ্যা ডাইনি যেদিন থেকে ভর করল, আমার বরটা আমায় ছেড়ে তার কাছে চলে গেল। সইবে না। ধম্মে সইবে না। সতীলক্ষ্মীর অভিশাপ একদিন ফলবেই। এইতো দ্যাখো না সইলো? দুজনাকে নিয়ে একসঙ্গে ফুর্তি করতে গেল। দুটোই গেল। ওই সন্ধ্যাটাও একদিন মরবে। তবে আমার বুকের জ্বালা জুড়বে।

দীপু ফিসফিস করল, —গুরু রাস্তা অন্য দিকে ঘুরে যাচ্ছে। স্টিয়ারিংটা ঠিক করে ধরে রাখ।

—হুঁ, বলে নীল বলল, হ্যাঁ ধম্মে সইবে না। ঠিকই বলেছ। তুমি তাহলে বলছ ঐ মঞ্জিলবাবু তুহিনাদিকেও চাইতো?

—আর বলবেন না বাবু সে সব কেচ্ছার কথা। সাধে কি আর বলছি দিদিমণি আর দাদাবাবু দুজনেই ভাল নয়। দিদিমণি তো কতদিন গায়ে ঢলে পড়েছে। একদিন আমি নিজে চক্ষে দেখেছি, দিদিমণি ঐ লোকটাকে জাপ্টে ধরে বিছানায় শুয়ে, নাহ্ থাক।

সবিতা থেমে গেল।

—আচ্ছা এই নিয়ে দুই দিদিমণির সঙ্গে ঝগড়াঝাটি না কি যেন হয়েছিল বললে?

—হয়েছিল। ইংরাজিতে। বুঝতে পারিনি।

—আর একটা প্রশ্ন করব। যে রাত্রে ঐ দুই দিদিমণি মারা গেল সেদিন কি ঐ বাবুটি এসেছিল?

একটু মনে করার চেষ্টা করে বলল, —না বাবু, সেদিন কিন্তু দাদাবাবু আসেনি।

—তুমি, ঠিক জান?

—হ্যাঁ গো। তাইতো সেদিন কাজলদিদি আবার এসেছিল।

—তোমার কাজলদিদি কেমন মেয়ে?

—খুব ভালো। শান্ত শিষ্ট। মিষ্টি মেয়ে। গরিব মানুষ তো। তাই অত প্যাচট্যাচ ছিল না। তোমরা যাকে বল নেশা করা তেমনটি কিন্তু মোটেও নয় ঐ কাজলদিদি। বড় ভালো মেয়ে। তবে খুব ভুল করেছিল। ওই দুশ্চরিত্তির লোকের পেছনে না গেলেই ভালো হোত।

—ঠিক আছে আজ আমরা যাচ্ছি। তবে দরকার পড়লে আবার তোমায় ডাকব। দেখো কলকাতা ছেড়ে আবার পালিও না যেন।

—মরার জায়গা আর কোথায় পার বাবু যে সেই চুলোয় যাব।

সার্কুলার রোডে এসে দীপু বলল, —আমি কিন্তু তোমায় বলেছিলাম ট্র্যাঙ্গুলার ফাইট।

সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, —চল বাস এসে গেছে। কাল মঞ্জিল অভিযান।

অহীন রায়চৌধুরীর দরজার কলিং বেলে চাপ দিয়ে মিনিট সাতেক দাঁড়িয়ে রইলেন বিকাশ তালুকদার। দুটি মেয়ের মৃত্যু রহস্য তাঁকেও বেশ ভাবাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না ওরা আত্মহত্যা করেছে না কেউ ওদের খুন করেছে। খুনের সপক্ষে অনেক যুক্তি খাড়া করেও কিন্তু সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। এর মধ্যে তিনি একবার কাজলের বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। হাঁটু

থেকে দুটো পা হারিয়ে তিনি মনে প্রাণে প্রায় মৃতবৎ। জগৎ সংসার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ছোট একটা ঘরের জানালা সংলগ্ন একটা চৌকিতে সারা দিনরাত কাটিয়ে দিচ্ছেন। খবরও রাখেন না সংসার কেমন করে চলছে। কেবল জানেন তার মেয়ে কাজল তাঁর অফিসেই চাকরি পেয়েছিল এবং সে কয়েকদিন আগে মরেছে।

মাঝে মাঝে নিজের মনেই হাসেন রামরঞ্জন। চাকরি পেয়েছিল তার মেয়ে! এটা অহীন্দ্র রায়চৌধুরীর বদান্যতা? না প্রায়শ্চিত্ত? তার মতো লোকের মনে তাহলে প্রায়শ্চিত্তের কথা আসে? ওর মেয়ে তুহিনা নাকি কাজলকে নিজের বোনের মতো ভালবাসতো!

হাসি পায়। ঘরে কেউ না থাকলে একা একাই রামরঞ্জন হাসেন। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হতে তুহিনা যখন একা এঘরে আসবে, পাকেচক্রে তাকে যদি একবার আয়ত্তে আনতে পারেন তাহলে মোক্ষম প্যাঁচে গলাটা টিপে ধরবেন। তাহলেই সব শেষ।

যেদিন তুহিনাকে উনি শেষ করতে পারবেন, হয়তো সেদিন তাঁর মনের জ্বালা জুড়োবে। লোকে বলে কাজল আর তুহিনা নাকি গলায় গলায় বন্ধু। আর যাই হোক রামরঞ্জন ঘোষ তা বিশ্বাস করেন না। সাপের বাচ্চা সাপই হবে। আর সে সাপের অন্তরে প্যাঁচ থাকবেই। তুহিনার দেহে যে মানুষের রক্ত বইছে তা কখনই বিশুদ্ধ রক্ত নয়। হতে পারে না। জিন, জিনটা যাবে কোথায়?

মাঝে মাঝে রামরঞ্জন শঙ্কিত হয়ে পড়তেন। কাজল যেন ঐ মেয়েটার নকল সারল্যে গলে গিয়ে ওর জালে না পড়ে যায়। অনেক দিনই মেয়েকে ডেকে সাবধান করেও দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি। তবে তার বাপের সব পরিচয় পেয়েও কেন মেয়েটা একটা সাপিনীর সঙ্গে মেলামেশা করে। শুনল না। চলেও গেল!

—মিস্টার ঘোষ, তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আপনার পা দুটো খোয়া যাওয়ার জন্য দায়ী আপনার একদা বন্ধু অহীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী?

রামরঞ্জনের খেদোক্তি শুনতে শুনতে বিকাশ প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন।

—বন্ধু? মুখ বেঁকিয়ে জবাব দিয়েছিলেন রামরঞ্জন, বন্ধু কাকে বলে তালুকদার সাহেব?

—সুখে দুঃখে বিপদে আপদে সংকট মুহূর্তে যে এসে পাশে দাঁড়ায় সেই তো বন্ধু।

—আর যে স্বার্থের জন্যে জেনেশুনে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়?

বিকাশ আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, —আমাকে কোন কিছু না লুকিয়ে সব সত্যি বলুন। একটা কথা ভুলে যাবেন না, আপনার একমাত্র রোজগেরে মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। নিশ্চয়ই কোন জ্বালা নিয়ে।

—না অফিসার, রামরঞ্জন যেন খেঁকিয়ে ওঠেন, কাজল আমার আত্মহত্যা করার মেয়ে নয়। সে আত্মহত্যা করতে পারে না। রেসপনসিবল মেয়ে। জানে তাকে ছাড়া সংসার অচল। তাকে খুন করা হয়েছে। ইয়েস, ইট ওয়াজ আ কুল ব্লাডেড্ মার্ডার।

—একথা আপনি কেন বলছেন?

—অহীন্দ্র রায়চৌধুরীর মেয়ে বা ছেলের সঙ্গে রামরঞ্জন ঘোষের মেয়ে বা ছেলের কখনও বন্ধু হতে পারে না। যেমন অহীন্দ্র রায়চৌধুরীকে রামরঞ্জন আর কোনদিনও বন্ধু ভাববে না।

—আপনি বলুন মিস্টার ঘোষ। সব আমাকে খুলে বলুন।

—কিন্তু সে ব্যাপারে আপনাদের তো আর কিছু করার নেই।

—বিশ বছরের পুরনো পাপ খুঁচিয়ে তার বিষাক্ত চারাটা উপড়ে ফেলা যায় রামরঞ্জনবাবু।

—তাতে কি আমার এই পা দুটো ফিরে আসবে? আবার আমি চাকরি ফিরে পাব? হাবাগোবা ছেলে আর বৌটার চিকিৎসা করাতে পারব? কাজল আর চন্দ্রাকে বাঁচাতে পারব?

—বলতে পারব না। তবে সত্যটা তো আমাদের জানতেই হবে। বলা কি যায় সেই সব পুরনো ছায়া আবার নড়ে চড়ে উঠতেও পারে। জানেন তো পুরনো পাপের ছায়া ঘুমিয়ে থাকে। তাকে ঠেলে তুলতে হয়।

ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়তে নাড়তে রামরঞ্জন বলেছিলেন,—ঠিক বলেছেন, সত্যকে কখনও মিথ্যের বালি

চাপিয়ে অদৃশ্য করে রাখা যায় না। একদিন সে বালি সরিয়ে উঠে আসবেই। আগুন সত্য আর পাপ কখনও চাপা থাকে না।

—হ্যাঁ তাই। আপনি নির্ভয়ে আমার কাছে সব বলুন। আল্টিমেট দোষীর সাজা না হলে দেশের ক্ষতি। দশের ক্ষতি। এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।

আর একবার ডোর বেল নবটায় চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই পালিশ করা কাঠের গেটটা খুলে গেল। একজন ধোপদুরস্ত বৃদ্ধ চাকর দরজা খুলে দাঁড়িয়েছেন।

—রায়চৌধুরী সাহেব আছেন?

বিকাশের পুলিসি ধরাচুড়োর ফলেই লোকটা সামান্য থতমত খেয়ে বিনীত কণ্ঠে বলল, —হ্যাঁ, বড়সাহেব আছেন।

—বলুন, পুলিস অফিসার বিকাশ তালুকদার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।

—বেশ, আপনি দাঁড়ান। আমি খবর দিচ্ছি।

আবার একটু ছোট্ট অবসর। লোকটি চলে গেল। রামরঞ্জন ঘোষের ভাবনা থেকে কিছুতেই বিকাশ সরে যেতে পারছিলেন না। ঘুরে ফিরে সেদিনের কথাগুলো মাথার মধ্যে পাক খেতে শুরু করল। প্রায় অথর্ব আর পঙ্গু, নিঃস্ব, হতাশায় মলিন রামরঞ্জন শুনিয়েছিলেন এক ভয়ানক নৃশংস কাহিনী। হ্যাঁ, রামরঞ্জন ঘোষ আর অহীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী একদা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সামান্য একটা মার্কেনটাইল ফার্মে দুজনেই সাধারণ কর্মী। যদিও তাদের ডিপার্টমেন্ট আলাদা। অফিসের যৎসামান্য মাইনেতে তাদের ঠিকমতো চলতো না। দুজনেই বিবাহিত। দুজনেই কষ্টে সৃষ্টে সংসার চালাতো। হঠাৎ কিছুদিনের মধ্যে রামরঞ্জন লক্ষ্য করলেন অহীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে। বেশভূষায়, চালচলনে। তারপর একদিন দেখলেন, যে অহীন্দ্র রায়চৌধুরী ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে অফিস করতো সে ট্যাক্সি ছাড়া আর চলাফেরাই করছে না। একদিন আর থাকতে না পেরে রামরঞ্জন জিগ্যেস করেছিলেন, —আচ্ছা অহি, তুই আর আমি একই চাকরি করি। যদিও আমাদের ডিপার্টমেন্ট আলাদা। কিন্তু মাহিনে এক। আমি সংসার চালাতে নাস্তানাবুদ। কিছু দিন আগে তুইও তাই ছিলি। তুই কি কোন আশ্চর্য প্রদীপ হাতে পেয়ে গেছিস,

ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি টেনে অহীন্দ্র সেদিন বলেছিলেন, —তা বলতে পারিস।

—তোকে দেখে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনাটা কী? রাস্তাটা একটু বল না। দুটো টাকা বেশি রোজগার করতে কার না সাধ হয় বল তো?

হাসতে হাসতে অহীন্দ্র নিজের কপালে আঙুলের টোকা দিয়ে বলেছিলেন, —এই জায়গাটা বড় বিচিত্র। তবে যার সাহস থাকে তারই দিকে ভাগ্য ভর করে। তখন তাকে দেয়, সে যা কল্পনাও করতে পারে না এমন সব কিছু।

—ঠিক আছে ভাই, ভাগ্য মানছি। এবার বাকিটা একটু বল। আমার ভাগ্যটাকে নেড়ে দেখি।

অহীন্দ্র তখনকার মতো আরো বেশি রহস্যময় হ'য়ে উঠে বলেছিলেন, —আমায় একটু ভাবতে দে।

ভাবনায় ছেদ পড়ে বিকাশের। বৃদ্ধ চাকরটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে, পুলিস সাহেব, বড় বাবুর শরীর আর মন খারাপ। নীচে নামতে পারবেন না। আপনাকেই একটু কষ্ট করে ওপরে যেতে হবে।

—ঠিক আছে তাই চল।

বৃদ্ধ চাকরটি বিকাশকে নিয়ে যায় অহীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর দোতলায় বিশাল ড্রইং রুমে। একটি সোফা দেখিয়ে বলে, —আপনি বসুন। বাবু আসছেন।

আরো মিনিট দশেক পর ড্রইং রুমে এলেন অহীন্দ্রবাবু। মাত্র এই কদিনের মধ্যেই চেহারার ওপর একটা মানসিক ধকলের ছাপ পড়ে গেছে। চোখে মুখে ক্লান্তির কালিমা। একমাত্র মেয়ের আকস্মিক মৃত্যুর আঘাত ভদ্রলোককে আরো যেন বার্ধক্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। পরনে নেভি ব্লু সিল্ক লুঙ্গি আর সাদা পাঞ্জাবি। তালুকদার উঠে দাঁড়াতেই অহীন্দ্রবাবু হাতের ইশারায় ওকে বসতে বললেন। তারপর নিজে গিয়ে বসলেন সামনের সিঙ্গল সোফায়।

—আপনার সঙ্গে আমার আগে দেখা হয়েছিল?

বিকাশ মার্জিত কণ্ঠে বললেন, —হ্যাঁ স্যার, শুভ্রা অ্যাপার্টমেন্টের সেই দুর্ঘটনার দিন।

—নিশ্চয়ই আপনার কিছু জিজ্ঞাসা আছে। কিন্তু আমি যে বড় ক্লান্ত আর ক্ষতবিক্ষত অফিসার।

—আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি মিস্টার রায়চৌধুরী। কিন্তু এই জোড়া মৃত্যুর একটা তদন্ত হওয়া দরকার। কেসটা এখন পুলিসের হেফাজতে। অন্তত দুটি ফুলের মতো মেয়ের মৃত্যুটা ঠিক কী ভাবে ঘটল এটা জানাও তো আমাদের সবারই প্রয়োজন।

—হয়তো কথাটা বোকার মতো শোনাবে, কিন্তু অফিসার, কী লাভ বলতে পারেন? ওদের দুজনকে তো আর আমরা কেউ ফিরে পাব না।

—আপনি কি এ রহস্যের মীমাংসা চান না মিস্টার রায়চৌধুরী?

—রহস্য কি কিছু আছে? ইট্‌স্ সিম্পলি আ কেস অব সুইসাইড।

—আর ইউ সিওর?

—আপনি কি অন্য কিছু ভাবতে চাইছেন?

—আমি কেবল সত্যটা খুঁজে বার করতে চাইছি। ইনভেস্টিগেটিং পুলিস অফিসার হিসেবে এটা আমার ন্যায্য চাওয়া।

অহীন্দ্র রায়চৌধুরী মিনিটখানেক নীরবতার পর বললেন, —বেশ আপনি আপনার ডিউটি পালন করুন।

—তাহলে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

অহীন্দ্রবাবু বিকাশের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান। বিকাশ দুম্ করে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের প্রশ্ন শুরু করেন,—আপনার সঙ্গে রামরঞ্জন ঘোষের কতদিনের পরিচয়?

সহসা অহীন্দ্রবাবুর ভ্রূ দুটো তীর্যক আকার নেয়। বেশ বোঝা যায় তিনি এ ধরণের প্রশ্নে বিরক্ত। সামান্য বাঁকা স্বরে বলেন, —আমার মেয়ের মৃত্যু তদন্তের সঙ্গে এ প্রশ্নের কি কোন সামঞ্জস্য আছে?

সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বিকাশ বলেন,—এটা কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর হল না। আপনি দয়া করে স্মরণে রাখবেন আমি যাই প্রশ্ন করি না কেন সেটা আমার ইউনিফর্মের দায়িত্ব মনে রেখেই করছি।

—রাম আমার অনেক দিনের পরিচিত।

—আপনারা তো একই অফিসে চাকরি করতেন?

—করতাম।

—তারপর ভাগ্যের সহায়তায় আপনি আজ বিশাল জায়গায় পৌঁছে গেছেন।

—সে কথা কি আমার?

—এটা দোষের কথা নয়। আপনার গুণের কথাই বলছি। আপনার পুরুষকার সত্যিই ঈর্ষণীয়। আমার প্রশ্ন কিন্তু তা নয়।

—স্পষ্ট করে বলুন, আপনি কী জানতে চান?

—আপনি যখন এমন ধনী হয়ে উঠছেন, তখন রামরঞ্জনবাবু আপনার সহায়তা চেয়েছিলেন?

— আমার যথাসাধ্য আমি করেছি। বাট হি ইজ ইল-ফেটেড।

— এটা ঠিকই বলেছেন। আমিও হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। লাক বিট্রে করলে হাজার সুযোগ জীবনে এলেও কিছুই করা যায় না। তা আপনি ওকে কি নিজের কোম্পানিতে নিয়ে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, আমি তখন একটা কেমিক্যাল কোম্পানিতে মেটিরিয়ালসের অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করছি।

—কি ধরনের কেমিক্যাল?

— ইন্ডিয়ার একটা নামকরা এবং বড় কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট ফ্যাক্টরিতে। মেইনলি ওরা পেটেন্ট ওষুধই তৈরি করতো। নিজেদেরও কিছু প্রোডাক্ট ছিল।

—তা এসব তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাইরে থেকে আনতে হয়।

—হ্যাঁ, সেজন্য ট্রেড লাইসেন্স আমি পেয়েছিলাম।

— ইউ আর লাকি ইনডিড। তা রামরঞ্জনবাবু এ লাইন সম্বন্ধে কিছু জানতেন?

[illegible] তাই ওকে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম আমার কোম্পানিতে,

মাল ডেলিভারি দেওয়ার সুপারভাইজিং পোস্টে।

—কিন্তু হঠাৎ ওঁর দুটো পা একসঙ্গে কাটা গেল কি ভাবে?

—স্বপ্নবিলাসী আর ঈর্ষাপরায়ণ মানুষেরা ঠিক সাধারণ ভাবে রাস্তায় চলতে পারে না। টাকার ওপর ছিল ওর প্রচণ্ড নেশা। আমরা যে অফিসে চাকরি করতাম সেখানকার যা মাইনে ছিল আমি তার থ্রি টাইমস্ মাইনে বেশি দিতাম। কিন্তু ওর মাত্রা ছাড়া লোভই ওকে মারল।

—কি রকম?

—একটা খুব কস্টলি মেটিরিয়ালস ওর জিম্মায় মুম্বাই থেকে কলকাতায় নিয়ে আসার দায়িত্ব ছিল। বাজারে তখন ঐ মেটিরিয়ালসের স্কারসিটি প্রচুর। লাইফ সেভিং ড্রাগ। অনেক সিকিউরিটি নিয়েই ও মুম্বাই থেকে আসছিল। কিন্তু মতিভ্রম হলে যা হয়। মাঝরাস্তায় কোন একটা স্টেশনে গাড়ি কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড়ালে ও তার থেকে এক পেটি মাল নিয়ে সরে পড়তে চেয়েছিল। খুব কম হলেও সে পেটিটার দাম প্রায় পৌনে এক কোটি টাকা। ইনসিওর করা মাল। শেষপর্যন্ত রেল পুলিসের গুলিতে দুটো পা ঝাঁঝরা হয়ে যায়। তারপর হসপিট্যাল। প্রাণে বাঁচলেও পা দুটোকে আর ধরে রাখা যায়নি।

—কিন্তু তার পরেও তার মেয়েকে আপনি চাকরি দিয়েছেন।

—মেয়ে তো আর কোন দোষ করেনি। আর সেটা আমার সহানুভূতি বলতে পারেন।

মাথা নাড়তে নাড়তে বিকাশ বললেন,—একশোবার। কজনই বা করেন! আর ফ্ল্যাটটা?

—বলতে পারেন কিছু না নিয়েই। শুধু ওর বৌ-বাচ্চাদের মুখ চেয়েই এটা করতে হয়েছিল। সে টাকার জের এখনও চলছে।

—প্রোমোটিং-এর ব্যবসা শুরু করেন কবে থেকে?

—আমি এক জায়গায় পড়ে থাকতে ভালবাসি না। প্রথমে অর্ডার সাপ্লাই করতে করতে নিজেই একটা ফ্যাক্টরির মালিক হলাম। আমার কেমিকেল ফ্যাক্টরি যখন বেশ ভালোই চলছে তখন হোয়াই শুড আই নট ডাইভ ফর আদার ভেনচার?

—আপনি ভাগ্যবান লোক। যা ধরেছেন তাই সোনা হয়ে গেছে।

—কিন্তু ভাগ্য তো বিনা দোষে আমার একটা বুকের পাঁজর ছিনিয়ে নিল। জানেন, ঐ মেয়ে হতেই আমার ভাগ্যটা যেন আরও ফিরে গিয়েছিল।

—আপনার মেয়ের কি কোন শত্রু ছিল?

—না। বরং ওর গুণগ্রাহী ছিল প্রচুর।

—সেটাও কি পরোক্ষ কোন শত্রু তৈরি করেনি বলতে চান?

অহীন্দ্রবাবু খানিকক্ষণ বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন,—এদিকটা তো আমি একেবারেই ভাবিনি। হ্যাঁ হতে পারে।

—কাউকে আপনার সন্দেহ হয়? কাজলকে?

—না না। কাজল আর তুহিনা খুব বিশেষ বন্ধু ছিল। তাছাড়া কাজল ওয়াজ নট হার কম্পিটিটার। কোন ভাবেই দুজনের মধ্যে কোন তুলনা চলে না। কারণ কাজল বরাবরই আমার অনুগ্রহে মানুষ। কাজলের চাকরিটা তো আমারই দেওয়া। আর এর পুরো ক্রেডিট তুহিনার। ওই জোর করে ওকে আমাদের ফ্যাক্টরিতে ঢোকায়।

—তুহিনাদেবী কি নেশাটেশা করতেন?

—করতে পারে। অ্যাডাল্ট অ্যান্ড এনলাইটেন্ড মেয়ে। ওগুলো কোন ফ্যাক্টরই নয়।

—তুহিনাদেবীর কি ব্লাডসুগার ছিল?

—ওর কি ব্লাডসুগার হবার মতো বয়েস হয়েছিল?

—এই একটা রোগ যেটা যে কোন বয়সেই হতে পারে। আপনাদের কারো সুগার আছে?

—হ্যাঁ, আমার মিসেসের আছে।

—তাহলে আপনার মেয়েরও হতে পারে। এর কম বয়সে হওয়াও বিচিত্র নয়।

—হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

—ওনার পিএম রিপোর্ট তাই বলছে। আর আমাদের একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর নীলাঞ্জন ব্যানার্জি ওনার ঘর থেকে একপাতা [illegible] খালি ফয়েল পেয়েছে।

এছাড়াও ছাদ থেকে পাওয়া গেছে একটা খালি শিশি। ফোরেনসিক রিপোর্ট জানাচ্ছে তার মধ্যে অ্যান্টিডায়াবেটিক ট্যাবলেটের গুঁড়ো অবশিষ্ট ছিল।

—আপনার কথার কোন মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। ছাদ থেকে অথবা বাড়ি থেকে ডায়াবেটিক ট্যাবলেটের নমুনা পাওয়ার সঙ্গে আমার মেয়ের কী সম্বন্ধ? নো, নো, আমার মেয়ের ডায়াবেটিস? ইমপসিব্‌ল।

—আপনার স্ত্রী কি ডায়াবেটিসের জন্যে প্রত্যেক দিনই ওষুধ খান?

—হ্যাঁ এবেলা একটা ওবেলা একটা। ওর হাইসুগার।

—ওনার কি কোন মেডিসিন ফয়েল চুরি গেছে?

—জিজ্ঞাসা করিনি। আর সে বলেও নি। তাছাড়া চুরি বা খোয়া গেলেও ধরার কোন উপায় নেই। কারণ উনি লট্ কিনে আনেন। তার থেকে একটা পাতলা পাতা বইল কি সরে গেল কে তার হিসেব রাখে।

—ইয়েস, ইয়েস, যুক্তিগ্রাহ্য কথা। ঠিক আছে মিস্টার রায়চৌধুরী আজ আমি উঠি। যদি দরকার পড়ে আবার আসব। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা, তুহিনাদেবী কি কোথাও ইনভলভড্ হয়ে পড়েছিলেন? মানে কোন রোম্যান্টিক অ্যাফেয়ার্স?

অহীন্দ্র রায়চৌধুরী কিছু একটা ভাবলেন, তারপর বললেন, —সেদিন আপনাদের মিস্টার ব্যানার্জি এ প্রশ্নটা করেছিলেন। তখন আমি বলেছিলাম তুহিনা কিছু করলে আমি জানতে পারব।

—কিন্তু?

—বিকজ দ্যাট ওয়াজ নট দা রাইট প্রেস। সেদিন আমি ইচ্ছে করেই আসল কথাটা বলিনি। সি ওয়াজ সিরিয়াসলি ইন লাভ উইথ আ ব্রাইট অ্যান্ড প্রসপারাস ইয়াং হ্যান্ডসাম বয়।

—আপনি চেনেন তাকে?

—অফকোর্স। আমার বন্ধু প্রদীপ সিনহার ছেলে মঞ্জিল সিনহা। অ্যান্ড আই ওয়াজ প্লিজ্‌ড্ ইনাফ ফর হার প্রেসাস চয়েস।

বিকাশ একমিনিট কিছু ভাবলেন তারপর বললেন,—তাই? কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে আপনার বন্ধুর মেয়েও ঐ ছেলেটিকে ভালবাসতো।

—বন্ধুর মেয়ে? হু ইজ শি?

—কাজল ঘোষ।

—ইউ মিন দ্য ডটার অব রামরঞ্জন ঘোষ? মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে বললেন, বোগাস! তাই যদি হয় তাহলে বলতে হচ্ছে বামন হোয়ে চাঁদ ধরার চেষ্টা করেছিল সে। না না এসব উড়ো খবর। মঞ্জিলের বাবার সঙ্গে আমার আগেই কথা হয়ে গেছিল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বিকাশ একটা কথাই ভাবছিলেন, রামরঞ্জনের স্টোরিটা ঠিক উল্টো। অফিসে চাকরি করতে করতে অহীন্দ্র রায়চৌধুরী স্মাগলারদের ঠেকে আটকে যান। হাতে হাতে নগদ বিদায়। প্রচুর টাকা যখন আসতে শুরু করল, তার ঠাট বাট সব পাল্টাতে শুরু করেছিল। অবস্থা বিপাকে রামরঞ্জন তার কাছে অধিক টাকা রোজগারের পথ বাৎলে দিতে বলেন। সেই সময় অহীন্দ্র রায়চৌধুরীও একজন ইনোসেন্ট লোক খুঁজছিলেন। যার হাত দিয়ে স্মাগলিং গুডস্ সাপ্লাইটা অনেক সহজে হবে। একদিন এই রকমই একটা বাক্স বয়ে দিয়ে আসতে বলেছিলেন। রামরঞ্জন তাই করেন। কিন্তু তার বিনিময়ে যে টাকা তিনি পান সেটা ছিল তার স্বপ্নের অতীত। এ রকম আরো দু-তিনবারের পর রামরঞ্জনের সন্দেহ গাঢ় হোতে থাকে। একদিন তিনি সরাসরি প্রশ্ন করেন অহীন্দ্র রায়চৌধুরীকে। অহীন্দ্রবাবু সে যাত্রায় হ্যানো ত্যানো বলে পাশ কাটান। তারও কিছুদিন পর আরো একবার রামরঞ্জনকে বেশি দামি কিছু বর্ডার পার করে দিয়ে আসতে বলেন। রামরঞ্জন গাঁই গুঁই করার জন্যে অহীন্দ্র রায়চৌধুরী বলেন, এটাই শেষবার। এরপর আর তাকে দিয়ে কোন মালপাচারের কাজ করাবে না। এবং এটা দিয়ে আসতে পারলেই নগদ পচিশ হাজার টাকা।

পঁচিশ হাজারের লোভ সামলাতে পারেননি রামরঞ্জন। তার ওপর এটাই শেষবার। অহীন্দ্রর অ্যাটাচি তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন। এবং অ্যাটাচি ভর্তি টাকা নিয়েও তিনি ফিরছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দ আর চোখে সর্ষেফুল দেখানোর মতো বিশাল ধাক্কায় তিনি ছিট্‌কে পড়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান হারানোর আগে

দেখেছিলেন একটা জিপ পাশ দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে চলে যাচ্ছে তাঁর পা দুটোকে থেঁতো করে দিয়ে। আর সেই জীপের নাম্বার অহীন্দ্র চৌধুরীর জীপের নাম্বার, একই। জ্ঞান ফিরেছিল হাসপাতালের বেডে। আবিষ্কার করেন তার দুটো পা-ই চিরদিনের জন্যে তাঁকে ছেড়ে গেছে। এর পর থেকে চাকার জীবনও শেষ!

অবশেষে বিপাকে পড়ে গেলেন বিকাশ তালুকদার। কার কথা বিশ্বাসযোগ্য? অহীন্দ্র রায়চৌধুরী না রামরঞ্জন ঘোষ?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচলে ভাসতে ভাসতে বিকাশ তালুকদার নিজের জীপে বসে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দেন।

ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সের বিশাল বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই নীল আর দীপুর মনে হল প্রদীপ সিন্‌হার সম্পদ আছে। এবং সেটা জাহির করার জন্যে তিনি সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। বাড়ির সামনেটা ঘষা মার্বেল পাথরের স্ল্যাব। বিরাট একটা গ্রীলের দরজা। দরজার সামনে বিশাল আকারের একটা ব্রাউন রঙের কুকুর। এ পাশ থেকে ওপাশ টহল মানে সেমি দৌড় দিয়ে চলেছে। কুকুরটার আবার ল্যাজটি গোড়া থেকে কাটা। শোনা যায় এতে নাকি কুকুরের দাপট বাড়ে। এর দাপট তো আছেই। গ্রীলের দরজার পরে খানিকটা পাথুরে মেজে। তার দু ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখে পালিশ করা কাঠের পালিশ দরজা। দীপু অনুচ্চ স্বরে বলল, —গুরু, এরা কোন লগ্নে জন্মেছে বল তো। আমি তো সাত জন্মের কল্পনাতেও এ রকম বাড়ি মালিক হতে পারব না। তুমি পারবে?

—তুই বড় বাজে বকিস। যে কাজে এসেছি সেটা হলেই যথেষ্ট।

—কিন্তু বাড়িতে ঢুকবে কী করে? কি জিনিস ঘুরছে দেখেছ?

—ও সব চোর-ডাকাতদের জন্যে। আমরা কি তাই?

—কিন্তু ওটাকে ডিঙিয়ে ভেতরে যাবে কি করে?

—নিশ্চয়ই কোন কলিং বেল-টেলের ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু আশপাশে একমাত্র পাথুরে দেওয়ালের গায়ে 'প্রদীপ সিন্‌হা' নামটা লেখা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। না গেলেও ওদের কিন্তু অপেক্ষা করতে হল না। আর গেটটা হঠাৎই খুলে গেল। দেখা গেল উর্দি পরা এক দারোয়ানকে। বাড়ির চাকচিক্যের সঙ্গে মানানসই।

—আমার মনে হয় গুরু, ভেতর থেকে কোন ভিউ ফাইন্ডার আছে। বাইরে কেউ অপেক্ষা করছে কিনা দেখার জন্যে।

—হতে পারে।

দারোয়ানটি অদ্ভুত স্বরে দুবার শিস দিতেই টহলদার হাউন্ডটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল উদ্ধত শিরে। তার বক্তব্য, ভালো কথা, কিন্তু কোন বেগারবাই করার চেষ্টা করলে টুটি দু টুকরো।

দারোয়ান সামনে এসে দাঁড়াতেই নীল জিজ্ঞাসা করল, —মঞ্জিল সিন্‌হা বাড়ি আছেন?

—আছেন। লেকিন উন্‌কো তৈবিয়ত ঠিক নেহি।

—হ্যাঁ। আমরা ওঁর অফিস থেকে সেই রকম খবরই পেয়েছি। কিন্তু দরকারটা খুবই জরুরি। আপনি যদি এই কার্ডটা পৌঁছে দেন।

—আপ ইধার খাড়া রহিয়ে। ম্যায়ে খবর দিলাতে হুঁ।

উর্দিপরা দারোয়ান ভেতরে চলে গেল। দীপু এখন নীলের গা সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ভদ্র শিক্ষিত এবং মার্জিত সারমেয় পুঙ্গবটিকে কেউ যেন 'স্ট্যাচু' বলে দাঁড় করিয়ে গেছে। সে তখনও উদ্ধত মুণ্ডু উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবখানা এই। ঠিক আছে মনুষ্য বৎসেরা ভদ্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছ। থাক, উল্টোপাল্টা করেছ কি ভবলীলা সাঙ্গ। অতএব ওরা দুজনেই সারমেয়টির মতো স্ট্যাচু।

আবার দরজা খোলা। এবং, আপলোক আইয়ে হামারা সাথ, বলে দারোয়ানের স্বাগত সম্ভাষণে।

নীল আর দীপু ভেতরে ঢুকে গেল। এসি চলছে। বাইরে ভাদুরে গরমে গা জ্বালা করছিল। এখানে এখন শেষ অক্টোবরের সিমলা। দীপু সোফায় বসতে বসতে বলল, —সোয়েটারটা আনলে ভাল হত।

নীল কোন উত্তর না দিয়ে চারপাশ দেখতে থাকে। বর্ণনা বাহুল্য। কেবলি সাচ্ছল্যের ঘনঘটা।

ফের দীপু মুখ খুলল, —কাজল যদি এ বাড়িতে বউ হয়ে আসতো তাহলে ওকে এমন কষ্ট করে

মরতে হত না। এখানেই বধূহত্যা হয়ে যেত। নির্বিঘ্নে। কেউ জানতে পারতো না। বাইরের কুকুরটাকে দিয়ে খাইয়ে দিত। ব্যস বডি লোপাট।

—দীপু, তোকে আমি বহুদিন বারণ করেছি, যেখানে সেখানে উল্টোপাল্টা বকবি না। একটু মুখ বুজিয়ে থাকতে পারিস না?

—ভালো জায়গায় এলে ভাল ভাল কথা মুখ টপকে চলে আসে। ঠিক আছে গুরু, আপাতত কুলুপ।

বেশি নয় মিনিট তিনেকের মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন বছর সাতাশ-আঠাশের দারুণ হ্যান্ডসাম একটি ছেলে। টকটকে রঙ। কোঁকড়ানো মিশকালো ব্যাকব্রাস স্টাইলের চুল। তবে অবিন্যস্ত। গালে কদিনের না কামানো দাড়ি। মেরুন রঙের হাই নেক পাঞ্জাবি আর সাদা চোস্তা। পায়ে বাড়িতে পরার চটি। সোফায় বসতে বসতে যুবকটি একবার দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের হাতে ধরা নীলের কার্ডটি দেখিয়ে বলেন, --আই অ্যাম ভেরি মাচ আনফরচুনেট দ্যাট আই ডোন্ট নো হু ইজ মিস্টার নীলাঞ্জন ব্যানার্জি! এক্সকিউজ মী।

বসা অবস্থাতেই নীল বলল, —আমিই নীলাঞ্জন ব্যানার্জি।

হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে যুবকটি বলল,—আমিই মঞ্জিল সিন্‌হা। হোয়াট কাইন্ড অব কোঅপারেশন ইউ নিড ফ্রম মি?

—একটু যে সময় দিতে হবে।

মঞ্জিল কয়েক সেকেন্ড চুপ করে কিছু ভাবল তারপর বলল, —আমি জানি, আপনারা কেন এসেছেন।

— জানেন?

—অনুমান করতে পারছি। কাজলের মৃত্যু রহস্য? তাই না?

— আপনি বুদ্ধিমান।

স্মিত হেসে মঞ্জিল বলে, — হ্যাঁ, লোকে সেই রকমই ভাবে আমার সম্বন্ধে। সে যাই হোক আমি চেষ্টা করব আপনার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে।

—হয়তো কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন এসে যেতে পারে।

ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়তে নাড়তে মঞ্জিল বলল,—মিস্টার ব্যানার্জি, বললে আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, হয়তো আমি নিজেই একদিন পুলিসের কাছে গিয়ে কনফেস করতাম।

—কনফেশান? কিসের?

—একটি নিষ্ঠুর খুনের। একটি পরিকল্পিত খুনের।

— খুন?

—হ্যাঁ খুন। একান্ত নিরুপায় হয়ে একজন আর একজনকে খুন করেছে।

—মিস্টার সিন্‌হা, আপনি যদি আর একটু ক্লিয়ার করেন।

—প্রায় দিন কুড়ি হয়ে গেল কাজল চলে গেছে। আপনি জানেন না এই কটা দিন আমার কি ভাবে কেটেছে। আচ্ছা মিস্টার ব্যানার্জি, ভালবাসা মানে কি কেবলি আত্মতৃপ্তির চেষ্টা? আত্মসুখের সন্ধান?

—না, তা কেন? ভালবাসার মধ্যে ত্যাগ স্বীকারের দাম অনেক। তবে আজকাল আর ও সব দেখা যায় না। এখন সবাই বড় প্রকট ভাবে আত্মকেন্দ্রিক। নিজের চাওয়া পাওয়ার বাইরে যেতে কেউই চায় না।

—কিন্তু কাজল সে কথাটা মানতেই চাইল না। পারলও না।

—কেন?

—আসলে কাজল আমাকে পাগলের মতো ভালবেসে ফেলেছিল।

—আর আপনি?

—আমিও। তবে পাগলের মতো নয়। সুস্থ স্বাভাবিক এবং সুন্দর ভালবাসাই ছিল আমার কাম্য

—প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, কাজলকেই যদি আপনি ভালবাসবেন তাহলে তুহিনা আপনার জীবনে আসে কেমন করে?

—এটাই ভুল। তুহিনা আমার জীবনে আসেনি। আসতে পারে না। বাট সি ওয়ান্টেড মি লাইক এনিথিং।

—কিন্তু তুহিনাদেবী জানতেন আপনার সঙ্গে কাজলদেবীর লাভ অ্যাফেয়ার্স চলছে।

—জানতো। তা সত্ত্বেও,

—তা সত্ত্বেও আপনি তাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

—কে বলল একথা?

—আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন তুহিনাদেবীর সঙ্গে [illegible] সময় কাটিয়েছেন। ইন অ্যাবসেন্স অব কাজলদেবী। এবং,

—এবং?

—তুহীনাদেবীর কাজের মেয়ে সবিতা আপনাদের দুজনের অনেক ইনটিমেট সীন দেখে ফেলেছে।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর মঞ্জিল বলেন,— না, মিস্টার ব্যানার্জি, ইটস অল লাই। সবিতারা এমনিই একটা ক্লাসের মেয়ে, এমনই তাদের মানসিক রুচি, যে তারা যা দেখে তাতে তারা সন্তুষ্ট হয় না। তাদের মনের গুপ্ত বাসনাটাও ঘটনার ওপর চড়িয়ে দিতে ভালবাসে। এটা ওদের একরকম পারভার্টেড সুখ।

—অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন তুহিনাদেবীর সঙ্গে আপনি কোনদিনও এক সঙ্গে বসে ড্রিংক করেননি? অথবা আপনারা কোন দিনও পরস্পরকে [illegible] করেননি?

একথা শোনার পর মঞ্জিল আবার কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে কিছু চিন্তা করল। তারপর প্রায় হতাশার ভঙ্গিতে বলল,— নাউ, আই ক্যান আণ্ডারস্টাণ্ড, হোয়াই কাজল বিকেম সো সাসপিসাস অ্যান্ড ফিউরিয়াস। অ্যাকচুয়ালি সবিতার মতো মেয়েরা থাকলে সাম ব্রাব মানেও [illegible] বেশি সময় লাগবে না। তবে হ্যাঁ, আমি মানছি, তুহিনা আমার সঙ্গে মেন্টালি ইনভলভড হয়ে পড়েছিল। মনে মনে সে আমাকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল কাজলের কাছ থেকে। আমি ঠিক বলতে পারব না তুহিনার এই চাওয়ার মধ্যে ভালবাসা কতখানি ছিল। হয়তো সত্যিই ছিল, কিন্তু তার থেকেও যেটা বেশি ছিল, সেটা হল—,

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নীল বলে, —জেলাসি কমপ্লেক্স। তাই না?

—ইয়েস মিস্টার ব্যানার্জি। সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স। তুহিনার সঙ্গে কথা বলে তাকে [illegible] সেটা হল জগতের যা কিছু সুখ পাবার বা উপভোগ করার যেন একমাত্র অধিকার তার [illegible] তো নয়ই। কাজলের কাছে হেরে যাওয়াটা তার চরম পরাজয়।

—হ্যাঁ, এটাই স্বাভাবিক।

–অথচ ওরা দুজন ছিলো ভীষণভাবে বন্ধু।

—এবং আপনি আসার পর দুজনের বন্ধুত্বে চিড় ধরে যায়।

—ইট ওয়াজ মাই ব্যাডলাক। আমি ওদের দুজনকে একই দিনে একই সঙ্গে প্রথম দেখেছি। যে কোন ছেলেই ওদের দুজনকে পাশাপাশি দেখলে তুহিনাকেই চাইবে জীবন সঙ্গিনী করতে। এবং তুহিনারও তাই আত্মবিশ্বাস। কারণ রূপে, গুণে, সামাজিক অবস্থা এবং মর্যাদায় তুহিনাই সেরা। অথচ ভাগ্যের কি পরিহাস দেখুন অতি সাদামাঠা মেয়ে কাজলকেই আমার ভাল লেগে গেল। ওকেই আমি ভালবেসেছিলাম। কেন জানেন, আমি একটা উচ্চবিত্ত পরিবারের একমাত্র ছেলে। জীবনে অনেক সুন্দরী মেয়ে আমি দেখেছি। দেখেছি তাদের লোভ, স্বার্থপরতা, তাদের উন্নাসিকতা, তাদের মেকি অহংকার। তাদের ট্যোটাল অসহায়ত্ব আমাকে ভাবাতো। আমার বাবা-মাও চান আমি তাদের মান রক্ষা করে তুহিনার মতো কোন মেয়েকে বিয়ে করি। কিন্তু, কাজলের মিষ্টি লাজুক ব্যবহার, কাজলের যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা, নিজের সংসার বাঁচাবার জন্যে যাবতীয় সুখ বিসর্জন দেওয়ার বলিষ্ঠতা, আমাকে মুগ্ধ করেছিল। মনে মনে আমি হয়তো ওই রকম আটপৌরে সাধারণ মেয়েই চেয়েছিলাম। তাই কাজলকে দেখে ওকে ভালবাসতে আমায় দ্বিতীয়বার ভাবতে হয়নি।

—এবং কাজলও আপনাকে অতটাই ভালবেসে ছিল?

—অনেক সাধনা করে সেটা পেতে হয়েছিল। কিন্তু তুহিনার সঙ্গে ছিল আমার নিছকই বন্ধুত্ব। যদিও আবার বাবা ইতিমধ্যেই কথাবার্তা বলে নিয়েছিলেন আমাদের বিয়ের ব্যাপারে।

—আপনি আপত্তি জানাননি?

—হ্যাঁ, সেই নিয়ে আমার ফ্যামিলিতেও অশান্তি চলছিল।

—তুহিনাদেবী কি আপনাকে ডাইরেক্ট অ্যাপ্রোচ করেছিলেন?

—হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, সে প্রকাশ করেছিল তার নৃশংস দিকটা। একদিন ওভার অবস্থায় আমাকে বলেছিল কাজল আমাকে পেতে পারে না। কিছু পেতে গেলে যোগ্যতার প্রয়োজন। দরকার পড়লে সে আমাকে কাজলের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে। যেমন করেই হোক।

—তার মানে, তুহিনাদেবীই কাজলদেবীকে খুন করেছে এটাই বলতে চাইছেন?

—না, মিস্টার ব্যানার্জি। তাহলে আমার মধ্যে এত ঝড় থাকতো না। যেদিন ঐ দুর্ঘটনা ঘটে, তার আগের দিনই অফিস থেকে বাড়ি ফিরে আমি একটি চিঠি পাই। খাম সেলোটেপ দিয়ে সিল করা। কাজলের চিঠি। ও লিখেছিল, তার তেইশ বছরের জীবনে, সে পরাজয় ছাড়া আর কিছুই পায়নি। তুহিনা তার বন্ধু হলেও, তুহিনা তাকে সর্বদাই পাশে রাখতো একটাই কারণে। কালোর পাশে আলোকে আরো উজ্জ্বল দেখাবে বলে। সে যেখানেই যেতো সবাই তাকে নিয়ে হইচই করুক এটাই সে চাইতো। তুহিনার ধারণা ছিল সে যা চাইবে সেটা কেবল মাত্র তারই। অন্য কারো সেখানে হস্তক্ষেপ মানে অনধিকার চর্চা।

সব শেষে কাজল লিখেছিল, তুহিনার কাছে জীবনের সব পরাজয় সে মেনে নিয়েছে, এমন কি তুহিনার বাবার বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু একটি জায়গায় হবে তার জিত। হারা মানুষ যখন একবার জয়ের মুখে এসে দাঁড়ায় সেখান থেকে সে আর ফিরে তাকাতে চায় না।

এই পর্যন্ত বলেই সহসা মঞ্জিল নিজের করতলে মুখ ঢেকে মাথা নীচু করে বসে রইল।

—তারপর কি হল মিস্টার সিন্হা?

—সে বড় ভয়ানক কথা। তখন বিশ্বাস করিনি। কিন্তু সেটাই অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। কাজল লিখেছিল, সে কেমিক্যাল ল্যাব থেকে পটাসিয়াম সায়নায়েড যোগাড় করেছে! কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে শেষ করে দেবে। ভালবাসার ক্ষেত্রে স্যাক্রিফাইসের মহত্ত্ব দেখাবার মতো ঔদার্য তার নেই। অ্যান্ড শি ডিড্ দ্যাট।

নীল সিগারেট ধরাল। জ্বলন্ত মুখ থেকে ধোঁয়া ওঠা রেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, —তাহলে আপনি বলছেন কাজল চেয়েছিল পটাসিয়াম দিয়ে তুহিনাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। তাই যদি হয় তাহোলে মিস্ ঘোষের স্টম্যাকে সায়নায়েড গেল কেমন করে?

চমকে উঠে মঞ্জিল বলে,—সে কি? সায়নায়েডে মৃত্যু হবার কথা তুহিনার। কারণ কাজলের প্ল্যান ছিল তুহিনাকে ভুলিয়ে ছাদে নিয়ে গিয়ে ওকে খুন করে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে আসবে। তুহিনার ফ্ল্যাট যেমন লক করা থাকে তেমনিই থাকবে।

—হ্যাঁ, কনফিউশানটা সেখানেই। তুহিনার মৃত্যু হয়েছে ওভার ডোজ অ্যান্টি ডায়াবেটিক ট্যাবলেটের রি-অ্যাকশানে। এবং তুহিনার ফ্ল্যাট থেকে পাওয়া গেছে একটি নামকরা ওষুধ কোম্পানির অ্যান্টি ডায়াবেটিক ট্যাবলেটের একটি এম্পটি ফয়েল। ছাদ থেকে পাওয়া যায় একটি শিশি। তার অবশিষ্টাংশে পড়ে থাকা লিকুইডে পাওয়া যায় অ্যান্টি ডায়াবেটিক ট্যাবলেটের কিছু গুঁড়ো। এবং আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি তুহিনা ওয়াজ নট আ ডাইবেটিক পেশেন্ট।

সব কথা শেনার পর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মঞ্জিল বলল, —আহ্! আমার বুকের ওপর থেকে একটা বোঝা নেমে গেল।

—কিসের বোঝা?

—আমি সেদিন থেকে একটা কথা ভেবেই ক্ষতবিক্ষত হয়েছি, আমার কাজল শেষ পর্যন্ত আমার জন্যে খুন করল? কাজল খুনি? আমার সিলেকশান এত রং? একটা শান্ত মেয়ের মধ্যে এত নৃশংসতা? এটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না।

নীল ওর আবেগতাড়িত মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে একবার হাসল, তারপর বলল, —আজ আমি উঠি মিস্টার সিন্হা।

—তাহলে আর আমার পুলিসে যাবার দরকার নেই, কি বলেন?

—আর যাবার কী দরকার? আপনার প্রেমিকা মৃত হলেও নির্দোষ। এটাই তো আপনার শেষ

সান্ত্বনা। কী বলেন?

নিরুত্তরে অন্যমনস্ক হয়ে গেল মঞ্জিল সিন্‌হা।

—অহীন্দ্র রায়চৌধুরী লোকটাকে আমার কিন্তু খুব একটা সুবিধের লোক বলে মনে হল না ব্যানার্জি সাহেব।

—কিন্তু রামরঞ্জন ঘোষ আর অহীন্দ্র রায়চৌধুরী এদের মধ্যে কে সত্যি বলছেন সেটা কি খোঁজ নিয়েছেন?

—নিয়েছি। এবং আমার মনে প্রতি স্টেপেই খটকা লাগছে। একটা জায়গা পর্যন্ত দুজনের কথা একই। ওরা দুজনেই একটা সামান্য কোম্পানিতে সামান্য চাকরি করতেন। কিন্তু তারপরেই ব্যাপারটা ঘোলাটে। হঠাৎ অহীন্দ্রবাবু ধনী হয়ে গেলেন। হাউ? এতো ধনী যে তার নাগাল পাওয়া যায় না। আবার সেই তিনি বন্ধুর কাতর প্রার্থনায় বিগলিত হয়ে তাকে নিজের বিজনেসে টেনে নিয়ে গেলেন এবং মৃত্যু হতে পারতো এমন একটা অ্যাকসিডেন্টও হয়ে গেলো। তাতে চিরজীবনের মতো [illegible] পঙ্গু হয়ে গেলেন। আবার তুহিনার অনুরোধে সেই কোম্পানিতেই রামরঞ্জনের মেয়েকে চাকরি [illegible] শুধুই তুহিনার অনুরোধ না আরও অন্য কারণ আছে? অবশ্য অহীন্দ্রবাবুর পক্ষে [illegible] একটা চাকরি দেওয়া অবাস্তব কিছু নয়। কিন্তু অবাস্তব ঠেকছে অন্য জায়গায়। মানিকজোড় [illegible] দুটি মেয়ে একই জায়গায় বসে আত্মহত্যা করল। আমি কোন অঙ্কই মেলাতে পারছি না। [illegible] বলেন?

নীল সিগারেট টানতে টানতে একমনে বিকাশ তালুকদারের কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল। একসময় একটু থেমে বলল, —বিকাশবাবু, আমি যদি বলি, এটা আত্মহত্যার কেস নয়। কুল ব্রেনেড [illegible]

বিকাশ সরাসরি নীলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন,—প্রমাণ পেয়েছেন কিছু?

—অনুমান।

—আপনার অনুমান বেসলেস হতে পারে না। আমায় বলুন কিছু।

—বলব। আমায় আর একটু ভাবতে দিন। আমি একটা জায়গায় গিয়ে উত্তর [illegible] করুন আপনি একজনকে খুন করবার জন্যে পটাসিয়াম সায়নায়েডের মতো বিষ যোগাড় করলেন, [illegible] সেই বিষে আপনারই মৃত্যু হল। হাউ?

— আপনি কাজলদেবীর কথা বলছেন?

—হ্যাঁ। সেই রাত্রে সম্ভবত কাজল চেয়েছিলেন তুহিনাকে খুন করতে।

—সেকী?

—হ্যাঁ। মঞ্জিলের ওই কারণেই।

—ও ইউ মঞ্জিল?

— একজন প্রেমিক। আর দুটি প্রেমিকা।

— বলেন কি! একসঙ্গে দুই বন্ধুকে নাচাচ্ছিল? ওস্তাদ খেলুড়ে। আর সেই কারণেই, মানে জেলাসিই এই খুনের মোটিভ?

—হতে পারে।

—তাহলে তুহিনাকে মারল কে? একই সঙ্গে দুজনতো আর দুজনকে খুন করতে পারে না! এতো আর বন্দুক পিস্তল নয়। দুজনেই একসঙ্গে চালিয়ে দিল। আর দুজনেই একসঙ্গে ধপাস!

—ওটাই তো ধন্দে ফেলছে। শুনলে আপনি অবাক হবেন, তুহিনাও কিন্তু অ্যান্টি ডায়াবেটিক পিল জোগাড় করেছিল। ওর মা সুগার পেশেন্ট। সম্ভবত মায়ের স্টক থেকেই। ওর ঘর থেকে এম্পটি ফয়েল পাওয়া গেছে। এবং ছাদ থেকে আপনি পেয়েছেন একটি শিশি যার মধ্যে ঐ ওষুধের নমুনা রয়ে গেছে। আবার তারও মৃত্যু ঘটেছে ঐ একই ওষুধের ঘোরে।

— ভারি মজার ব্যাপার তো। খুন করবে বলে যে সায়নায়েড যোগাড় করল সে মরল সায়নায়েডে। আর যে অ্যান্টিডায়াবেটিক পিল যোগাড় করল তার মৃত্যু হল তারই অস্ত্রে? কি মুশকিল!

—একটা পাগলাটে যুক্তি খাড়া করা যায়। দুজনেই মঞ্জিলকে ভালবাসে। দুজনের কেউই তাকে হারাতে রাজি নয়। অতএব ওরা দুজনে ঠিক করল, একক ভাবে কেউ যখন তাদের প্রেমিককে পাচ্ছে

না তখন দুজনেই তাকে ছেড়ে যাবে, আত্মহত্যা করবে। আর সেই জন্যেই দুজনে একসঙ্গে রাত বারোটায় ছাদে গিয়ে নিজের নিজের বিষে নিজেদের খুন করল।

—আপনি ঠিকই বলেছেন, ব্যানার্জি সাহেব, পাগলাটে যুক্তি

—এটা সম্ভব হতে পারতো যদি দুজনেই নিজের নিজের ঘরে বসে বিষ খেত।

খুঁত খুঁত করতে করতে বিকাশ বললেন,—কিন্তু ওদের দুজনকে সবাই বলতো মানিক জোড়, ওরা দুজনেই খোলা আকাশের নীচে বসেছিল। এবং মরেওছিল।

—তাই মৃত্যুটাও এক সঙ্গে মেনে নিল এবং ঈশ্বরের আকাশের নীচে শেষ শয্যা পেতে? এই বলতে চাইছেন?

—দ্যাৎ মশাই আমি কিছুই বলছি না। যুক্তিটা গ্রহণযোগ্য নয় সেটাই বলতে চাইছি।

তাহলে আর কি হতে পারে?

—আপনি তো বলছেন খুন?

—ধরুন খুন। কিন্তু কে? দুটি মেয়েকে হত্যা করে কার লাভ?

—কোন তৃতীয় ব্যক্তি?

—ব্যক্তির কথা পরে। লাভ মানে মোটিভটা খুঁজে বার করুন।

—গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে থাকছে এক জনই। সে হচ্ছে ওস্তাদ প্রেমিকটি।

—কিন্তু কেন? আমার যতদূর মনে হয় কাজলকে সে ভালোবাসে, তাকে সে মারবে না। তুহিনাকে ভালবাসে না বলে তাকে মারবে এও সেই পাগলের যুক্তি।

—আচ্ছা ব্যানার্জি সাহেব, এমন কি হতে পারে না, প্রথমে কাজলের কাছে ফেঁসে গিয়েছিল মঞ্জিল, পরে যখন দেখল তুহিনাও তার জন্যে পাগল তখন তুহিনাকে পাবার জন্যে পথের কাঁটা হিসেবে কাজলকে সরিয়ে দিল।

এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ নিজেই থেমে গেলেন বিকাশ, বললেন, —দ্যুর বাবা, তাই বা হবে কি করে? একই সঙ্গে তো তুহিনাও মরেছে। এক সঙ্গে দুজন প্রেমিকাকে মেরে মঞ্জিলের কোন রাজ্য জয় হবে? নাহ্, হবে না আমার দ্বারা।

অনেকক্ষণ দীপু চুপচাপ বসে দুজনের আলোচনা শুনে যাচ্ছিল। হঠাৎ ও বলল, —আমি এখানে একটা কথা বলতে পারি কি?

বিকাশ একবার শ্যেন দৃষ্টিতে দীপুর দিকে তাকিয়ে বললেন, —কত হাতি গেল তল মশা বলে কত জল?

—ঠিক বলেছেন তালুকদারদা, হাতির পক্ষে নদীতে বেশি জল থাকলে পার হওয়ার জন্যে তাকে জল মাপতে হতে পারে। কিন্তু মশাকে তো আর জলে নামতে হবে না। উড়ে উড়েই নদী পার হয়ে যাবে।

—মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ কোর না তো। যা বলার বলে ফেল।

—তৃতীয় কেউ হতে পারে না কি?

—কে? বিকাশই জিজ্ঞাসা করলেন।

—আরে বাবা, সেটা জানলে তো আমিই নীল ব্যানার্জি হয়ে যেতুম।

—তাহলে আর বড়দের কথায় নাক গলিও না। ধৈর্যধরে চুল চেরা লজিকগুলো শুনে যাও।

যে আজ্ঞে, বলে আবার ঠোঁটে আঙুল রেখে বসে রইল।

—তাহলে এখন কি হবে ব্যানার্জি সাহেব, বিকাশের হতাশ কণ্ঠস্বর।

—আপনি বরং অহীন্দ্র রায় চৌধুরীকে নিয়ে পড়ুন। বলা যায় না, কেঁচো খুঁজতে গিয়ে সাপের দেখা পেয়ে যেতে পারেন।

—আপনি কি ভাবছেন আমি চুপ করে বসে আছি। ওর সঙ্গে একদিন কথা বলেই বুঝেছি লোক সুবিধের নয়। আমার আই বি ছায়ার মতো সেঁটে আছে রায়চৌধুরীর পেছনে। জোড়া খুনই হোক আর আত্মহত্যাই হোক রায়চৌধুরীর দু নম্বর ধান্দা আমি ধরবই। ঠিক আছে, আজ আমি আসি। দেখুন যদি কিছু সুরাহা করতে পারেন। নইলে আত্মহত্যাই স্ট্যান্ড করবে। চলি হে মাতব্বর।

বিকাশ চলে গেলেন। নীল ভ্রূ চুলকোতে চুলকোতে দীপুর দিকে ফিরে বলল, —কিছু বলতে গিয়েও

তখন বলিসনি। কথাটা কী?

দীপু আগে থেকেই লিখে রেখেছিল। চিবকুটটা নীলেব দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, —সাইনটা ভেবে দেখো। এমনটা তো হতেই পারে।

ভাঁজ করা কাগজটা খুলে নীল পডল। তাবপব মৃদু হেসে বলল, —তোব হবে। কিন্তু খুঁজে পাওয়া প্রমাণটা যে চাই।

একটা ছোট্ট সান্ধ্য আসব বসেছিল নীলেব বাড়িতে। নীলই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বিশেষ কয়েকজনকে। সেখানে ছিলেন মঞ্জিল সিন্‌হা, আহেলি নন্দী, নীবেন হালদাব, সুবোধ বেবা, সবিতা আব লেখা মিত্র। টি পয়ের ওপব কিছু খাদ্যদ্রব্য সাজানো আছে। অতিথিরা অল্প স্বল্প কিছু খাচ্ছেন। দীনু, মানে নীলেব কাজেব লোকটি এসে চা দিয়ে গেছে। দীপু একমনে বসে বসে নীলেব গতিবিধি লক্ষ্য কবছিল। তাব আজ মুখ ভার। অন্য সময় হলে এতোক্ষণে অনেক হাল্কা হাল্কা কথা বলতো। কিন্তু আজ যেন সামগ্রিক পরিস্থিতিটাই গুমোট হয়ে আছে। নীল নিঃশব্দে এক কাপ চা নিয়ে ঘবেব এপাশ থেকে ওপাশ পায়চাবি কবে চলেছে। আসলে সেও খুব গভীব কিছু নিয়ে চিন্তিত।

চায়েব কাপে চুমুক দিতে দিতে নীবেন বলল, —মিস্টাব ব্যানার্জি, হঠাৎ এই সান্ধ্য আমন্ত্রণেব কাবণটা ঠিক বুঝতে পাবলাম না। আসলে এটা আমন্ত্রণ না সমন সেটাই বুঝতে পাবছি না। একটু ক্লিয়াব করুন।

লেখা মিত্রও অনেকক্ষণ উশখুশ কবছিলেন। তিনিও নীবেনেব কথায় সায় দিয়ে বললেন, —মিস্টাব ব্যানার্জি আপনি বলেছেন বিশেষ কিছু কথা আছে যেগুলো সবাব সামনে বলা যাবে না। কিন্তু এখানে তো চাঁদেব হাট বসিয়ে দিয়েছেন। ব্যাপাবটা কি সেটা জানতে চাওয়া নিশ্চযই অন্যায় হবে না!

পায়চাবি থামায় নীল। একবাব সবাব দিকে তাকায়। তাবপব সবাইকে উদ্দেশ কবে বলে, —আমি বুঝতে পাবছি আপনাবা সবাই বেশ উৎকণ্ঠিত আমাব আচবণে। হয়তো আমি আলাদাভাবে আপনাদেব সঙ্গে মিট কবতে পাবতাম। কিন্তু আমি চাই অল ওপন খেলতে। আপনাদেব প্রত্যেকেব কাছে আমাব কিছু জিজ্ঞাসা আছে। আমি জানি এব আগে আপনাবা কিছু কিছু কথা গোপন কবে গেছেন। কিন্তু সেগুলো আমাব কাছে আব গোপন নেই। তবু আপনাদেব আবো একবাব আমি সুযোগ দিতে চাইছি।

আরো মিনিট কয়েকেব নীরবতা। উপস্থিত ব্যক্তিদেব মধ্যে একটা চাপা উশখুশ ভাব। নীল এগিয়ে এসে একটা বাড়তি চেয়ারের ওপব বসে পড়ে বলে, —পৃথিবীতে কিছু কিছু অপবাধ ঘটে গেছে যেগুলো নানা কারণে সলভ্‌ড্ হয়নি। কখনো তদন্তকাবী অফিসাববা হযতো আসল অপবাধীকে শনাক্ত কবেছেন, কিন্তু আইনকে কাঁচকলা দেখিয়ে অপরাধী নির্বিবাদে ছাড়া পেয়ে গেছে। আবাব অনেক সময় বহস্য এতই জট পাকানো হয়ে যায় যখন পুলিস তাব খেই খুঁজে পায় না। খুবই কনফিউজিং কেস সেগুলো। শেষ পর্যন্ত সেগুলো আনসলভ্‌ড্ই থেকে যায় বা গেছে। কাজল আব তুহিনাব মৃত্যুবহস্য প্রমাণেব অভাবে কোনদিনও সমাধানেব আসতো না যদি না আহেলি আমায় সাহায্য কবতো।

সবাই চুপ কবে নীলের কথা শুনছিল। নীবেন হালদাবই আবাব প্রশ্ন কবল, —তাব মানে শুভ্রা অ্যাপার্টমেন্টের মৃত্যু রহস্য আপনি ভেদ কবে ফেলেছেন?

নীল মৃদু হাসল। তারপর বলল, —বলতে পারেন।

লেখা মিত্র বলে ওঠেন, —সবার আগে বলুন, এটা খুন না আত্মহত্যা?

নীল হাসি বজায় রেখেই বলল, —আমি আপনাদেব মধ্যে কয়েকজনকে কিছু প্রশ্ন করব। উত্তব সবাব সামনেই দেবেন। তখন আপনাবাই বুঝতে পারবেন এটা খুন না আত্মহত্যা। সাদা চোখে দুটি মেয়েব মৃত্যু নিছক আত্মহত্যা বলেই মনে হবে। আমাদেরও তাই মনে হয়েছিল। যদিও কোন সুইসাইড নোট আমরা পাইনি। আবার হত্যা বলেও নিখাদ কোন সূত্র আমাদেব কাছে ছিল না। যথারীতি হত্যা এবং আত্মহত্যার সম্ভাব্য মোটিভ খোঁজার জন্যে যখন আমবা চাবদিক হাতড়াচ্ছি, তখন আমাব ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু দীপু তার নিজের ধারণার কথা একটা কাগজে লিখে আমাব কাছে দেয়। আব তখন থেকেই আমাদের তদন্ত অন্য দিকে মোড নেয়। দীপুর নোট আমি পবে আপনাদেব জানাব।

আরো একটা কথা জানিয়ে রাখি, এই আসরে আবো দুজনকে আনাব ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আনা

যায়নি। তাঁদের একজন পঙ্গু, অথর্ব আর একজন, সম্ভবত কন্যা হারানোর শোকে ম্রিয়মান। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এঁরা কারা। এবার আমি একে একে কিছু প্রশ্ন করব আপনাদের সবার কাছেই।

বলেই নীল প্রথমেই ডাকল সবিতাকে। সে তো শুনেই কাঁপতে আরম্ভ করল। বলল, —বাবু আমি কিছু জানি না। কিছুই দেখিনি। এসব খুনোখুনির মধ্যে আমি নেই।

—আমি জানি সবিতা, এত প্ল্যান করে কাউকে খুন করা তোমার মস্তিষ্কের কর্ম নয়। তবে আমি যেগুলো জিগ্যেস করব সেগুলোর সঠিক জবাব দেবে। না দিলে কিন্তু তোমারও ঝোলার চান্স আছে।

সবিতার চুপ করে থাকার অবসরে নীল প্রশ্ন রাখে, —তুহিনা দিদির বাড়িতে তুমি তো রাতদিনের লোক?

—হ্যাঁ বাবু।

—যেদিন রাত্রে ঐ ঘটনা ঘটে সেদিন সন্ধেবেলা ঐ ফ্ল্যাটে আর কেউ এসেছিল?

—না তো।

—ভেবে বলো।

—না বাবু। আর কেউই আসেনি।

—দিদিমণিকে সেদিন কেমন লাগছিল? ঠিক করে বলবে।

—আগেই তো বলেছি বাবু, বড়লোকদের খেয়াল ঠিক বুঝি না।

—আমি ঐ দিন সন্ধের কথা জিগ্যেস করেছি।

একটু ভেবে সবিতা বলে,—কেমন যেন আনমনা ভাব ছিল। একটু অস্থির।

—কাউকে ফোন করেছিল?

—ফোন? দাঁড়ান মনে করি। ও হ্যাঁ, করেছিল।

—কাকে?

—তা তো বলতে পারবনি। তবে—

—তবে?

—মনে হল যেন বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলছিলেন।

—কী করে বুঝলে?

—উনি একবার না দুবার বাপি বলে ডেকেছিলেন।

—যা কথা হয়েছিল তুমি তার সবটাই শুনেছিলে?

—না বাবু, আড়িপাতা আমার স্বভাব নয়।

—হ্যাঁ বাবু, এটাই তোমার স্বভাব। এবার বল, কথা শুনে তোমার কী ধারণা হয়েছিল?

সবিতা হঠাৎ গোঁৎ খেয়ে চুপ করে যায়।

বাইরে কিন্তু পুলিস এবং পুলিসের ভ্যান, দুটোই আছে।

—না, মানে—

—সত্যি কথা বললে তোমার কোন ভয় নেই। স্পষ্ট বল কী মনে হয়েছিল?

—দিদিমণি ঐ সব খেতে খেতে বলেছিল, অনেক ধৈর্য ধরেছি। আর নয়। যা করার আজই করব। তারপর ইংরেজিতে আরো কিছু বলল, বুঝিনি, তবে কাজল দিদিমণির নাম বলেছিল, সেটা বুঝেছিলুম।

—তারপর তোমার দিদিমণি কী করেছিল?

ড্রয়ার টেনে একটা ওষুধের শিশি বার করে কেবল দেখছিল আর নাড়িয়ে নাড়িয়ে ঝাঁকাচ্ছিল।

—সেই শিশিটা কোথায়?

—তা তো জানি না।

—বেশ। আর একটা প্রশ্ন, এই খবরটা তুমি আর কাকে জানিয়েছিলে?

—কই, আর কাউকে তো কিছু বলিনি।

হঠাৎ নীল হাত বাড়িয়ে দেয়। দীপুর দিকে। দীপু একটা ছোট্ট কাগজ ওর হাতে তুলে দেয়। নীল কাগজটা দেখতে দেখতে বলে, —একটা খুন করলে দশ পনেরো বছর জেল হয়। কিন্তু জেনেশুনে মিথ্যে কথা বললে তাকে ঘানি টানতে হয় সারাজীবন, কিছু বুঝলে?

সবিতা চুপ করে থাকে। নীল প্রশ্ন চালিয়ে যায়,—চোখে কম দেখো নাকি?

—না বাবু। তাহলে আর করে খেতে হতনি।

—ভেরি গুড, বাংলা পড়তে পার?

—একটু একটু।

—বেশ, বলেই সবিতার কাছে গিয়ে কাগজ সমেত হাতটা সবিতার চোখের সামনে তুলে ধরে বলে,—একেই তো জানিয়েছিলে? তাই না?

সবিতা চুপ থাকে।

—যাও, এবার তোমার নিজের জায়গায় গিয়ে বোস।

তারপর নীরেনবাবুর উদ্দেশে বলেন,—নীরেনবাবু আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব।

—বেশ তো, করুন।

—অহীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ল্যান্ডটা কিনে দুটো অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করেন। পাশাপাশি। তা সব ফ্ল্যাটই তো বিক্রি হয়ে গিয়েছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মোটামুটি।

—মোটামুটি বলছেন কেন?

—তুহিনাদেবীরটা বাদে। কারণ ওটা ওঁর নিজেরই সম্পত্তি। আর কাজলের ক্ষেত্রে অনেক টাকা কম নিয়েছিলেন। একরকম জলের দরেই। অবশ্য সেটাও তো বিক্রি করাই হল।

—এরকম কেন হল? জানেন কিছু সে সম্বন্ধে?

—না স্যার।

—ছাড়া টা ছাড়ই ছিল না ধার ছিল?

—সেটা জানেন ওঁরা দুজন। তবে অহীন্দ্রবাবুকে মাঝে মাঝে রামরঞ্জনবাবুর ফ্ল্যাটে যেতে দেখতুম। অবশ্য প্রথম দিকে। ইদানীং নয়।

—তাগাদা দিতে?

—অহীন্দ্রবাবুর মতো ধনী লোক কি আর ঐ সামান্য টাকার জন্য তাগাদা দিতে যাবেন?

—তাহলে নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ ছিল?

—থাকতে পারে। তবে তার সঙ্গে আমাদের কো-অপারেটিভের কোন সংযোগ নেই। তাই কোন খবরও রাখিনি।

—আপনি নিজে কত নম্বর ও কোন ব্লকে থাকেন?

—'বি' ব্লকের চারতলায়। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে টাকা নিয়ে আমি ফ্ল্যাট কিনি। আমি একজন সাধারণ চাকুরে। কো-অপারেটিভের নিয়ম অনুযায়ী আমি এই টার্মস্ দু বছরের জন্য সেক্রেটারি।

—তুহিনাদের ফ্ল্যাটে কি ঘটনার দিন অহীন্দ্রবাবু এসেছিলেন?

—আমি দেখিনি। বিজারভার ফেটে যাওয়ায়, এবং সবাই কমপ্লেন লজ্ করায় আমি ঐ নিয়েই খুব ব্যস্ত ছিলাম, সারাদিনই।

—সাধারণত রাত কটায় আপনি শুতে যান?

—এগারোটা। অবশ্য বিশেষ কোন মিটিং বা দরকারি কাজ থাকলে একটু দেরি হয়।

—ঐ দিন কখন শুতে গিয়েছিলেন?

—এগারোটার মধ্যেই।

—আপনাদের ফ্ল্যাট থেকে 'এ' ব্লকের ছাদ দেখা যায়?

—বারান্দায় গেলে ছাদ দেখা যায় তবে ছাদের ওপর কী হচ্ছে সেটা তো জানা সম্ভব নয়।

—অর্থাৎ ঐ দিন রাত এগারোটার পর আর কোথায় কী হয়েছে তা আপনার অজানা।

—হ্যাঁ স্যার।

পকেট থেকে দীপুর দেওয়া নামটা নীরেনের সামনে রেখে নীল বলল,—কোন প্রশ্ন নয়, কোন অভিব্যক্তি নয়, যা জিগ্যেস করব শুধু সেটাই সংক্ষেপে বলবেন। একে আপনি সেদিন লাস্ট কখন দেখেছিলেন?

চমকে উঠে নীরেন বলে,—মাত্র একবারই। অ্যাপার্টমেন্টের সামনের লনটায় সবিতার সঙ্গে কথা বলছিল।

—রাত তখন কটা?

— আটটা-সাড়ে আটটা হোতে পারে। এমন কিছু ইমপর্ট্যান্ট ব্যাপার নয়, তাই ঘড়ি দেখে রাখিনি।

—ওয়েল, আপনি বসতে পারেন। কিন্তু অনুগ্রহ করে কোন কথা বলবেন না। লেখাদেবী এবার আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

—আমি তো যা বলার সেদিনই বলে দিয়েছি।

—না বলেননি, নীলের কণ্ঠস্বরে হঠাৎ কাঠিন্য, সব কথা বললে আজ আপনাকে ইনভাইট করার কোন প্রয়োজন হোত না। এবার বলুন, সাধারণত রাত কটা পর্যন্ত আপনি জেগে থাকেন?

—কোন ঠিক নেই। যেদিন ঘুম আসে না সেদিন বই পড়ে শুতে শুতে রাত হয়ে যায়।

—আপনি কি ঘুমের ওষুধ খান?

—খেতে হয়।

—সেদিন খেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কটায় শুয়েছিলেন?

—ঠিক মনে নেই।

—লেখাদেবী আপনি একজন অধ্যাপিকা। আশা করি আপনি ভীতু বা নির্বোধ নন। আপনি জানেন আপনার সত্য প্রকাশে অনেক রহস্যের জট খুলে যাবে। ইজন্ট ইওর স্যাক্রেড ডিউটি টু স্পীক দ্য ট্রুথ?

লেখা মিত্র কিছুক্ষণ সময় নিলেন। কয়েক মিনিট নিজের মনে কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, —ইয়েস, আমি সেদিন আপনাদের সব সত্যি বলিনি। নাউ আই সুড বি ভোকাল। সত্যি বলতে কি, ভূত প্রেতে আমার ভয় নেই তবে চোর ডাকাত আর পুলিসের ভয় আমার আছে। চোর ডাকাত সর্বস্বান্ত করে, আর পুলিস জ্বালাতনের চূড়ান্ত করে ছাড়ে। যার জন্যে ইচ্ছে থাকলেও সাধারণ মানুষ সত্যটাকে এড়িয়ে যেতে চায়।

—না, আমি কথা দিচ্ছি কেউ আপনাকে জ্বালাতন করবে না। আপনি বলুন সে রাত্রে অস্বাভাবিক কি দেখেছিলেন?

—ঘুমের একটা ট্যাবলেট খেয়ে আমি একটা ছোট্ট আলো জ্বালিয়ে একটা বই নিয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ সিঁড়িতে একটা খস্-খস্ আওয়াজ পেলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল বোধহয় সুবোধ ছাদে যাচ্ছে। আমাদের রিজার্ভারটায় চিড় ধরে জল লিক্ করছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর খস খস্ নয়, ধুপধাপ আওয়াজ পেলাম। যেন কেউ পালাচ্ছে। তাড়াতাড়ি করে ডোর আইতে চোখ রাখলাম। দেখি একজন খুব দ্রুত নেমে চলে যাচ্ছে।

—ঠিক কতক্ষণ পরে মনে করতে পারেন?

—কুড়ি-পঁচিশ মিনিট হতে পারে।

—তাকে চিনতে পেরেছিলেন?

—হ্যাঁ। কারণ সিঁড়ির আলো তখনও জ্বলছিল। দীপুর কাগজটা তুলে দেখাতেই লেখা মিত্র বললেন,—ইয়েস, ইউ হ্যাভ ডিটেকটেড দ্য রাইট পারসন।

হাত তুলে ওঁকে থামিয়ে নীল বলল,—ব্যস্, এবার বলুন তারপর কী করলেন? আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন?

—না মিস্টার ব্যানার্জি। ওকে ওই ভাবে অত রাত্রে ছাদ থেকে নেমে যেতে দেখব এটা আমার ধারণাতীত। কিছু মনে করবেন না, আমি একটু সন্দেহপ্রবণ। এবং কৌতূহলও আমার বেশি। তাই নিঃশব্দে দরজা খুলে পা টিপে টিপে ছাদে যাই। প্রথমটা কিছু ঠাহর হয়নি। কারণ আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। তবু, সিঁড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম কে একজন এলোমেলো টলছে, আর মাঝে মাঝে উঃ আঃ করছে। আমার আর দাঁড়ানোর সাহস হয়নি। আমি নীচে নেমে আসি।

—ভূত প্রেতে আপনার বিশ্বাস নেই, তাহলে ভয় পেলেন কেন?

—ভূত-প্রেত না হলেও অন্ধকার ছাদে একজন টলমল করছে। আর একজন পড়িমড়ি করে নীচে পালাল। সত্যি কথা বলতে কি, কোন খারাপ ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে আমি মোটেই

রাজি নই। আমার প্রফেশানের পক্ষে সেটা ক্ষতিকর। নিজের ঘরে ফিরে এসে দরজা লক করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ি। ব্যাপারটা কী হতে পারে এ নিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি।

—ঠিক আছে লেখা দেবী, আর আপনাকে কোন প্রশ্ন নেই। আপনি বিশ্রাম করুন। সুবোধ এবার তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করব।

—বলুন স্যার।

—'এ' আর 'বি' ব্লকের দুটো বাড়ির দুই ছাদের মধ্যে ব্যবধান কত?

—আজ্ঞে সাহেব ঠিক বুঝতে পারলুম না।

—বলছি দুটো ছাদের মধ্যে কত হাতের তফাত?

—আজ্ঞে তিনচার তো হবেই।

—দুটো ছাদেরই তো কার্নিস আছে?

—আজ্ঞে তা আছে।

—তারমানে, ব্যবধান আরও কমে গেল। অর্থাৎ কারো ইচ্ছে হলে সে একছাদ থেকে অন্য ছাদে যেতে পারে। তাই না?

—আজ্ঞে সাহেব, তা পারে।

—দুটো বাড়িরই গেট কি সারারাতই খোলা থাকে?

—আজ্ঞে না। এগারোটা সাড়ে এগারোটার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়।

—কে বন্ধ করে?

—আজ্ঞে বীরবাহাদুর।

—শুনলাম সে ছুটিতে আছে। মাসখানেকের মতো। নীরেন হালদার তো তাই বলেছিলেন।

—হ্যাঁ সাহেব।

—তাহলে বন্ধ করার দায়িত্ব কার?

—আজ্ঞে আমার।

—আচ্ছা মনে করো, হঠাৎ কারো দরকার পড়ল এ বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যাবার, কিম্বা কেউ হয়তো বিয়ে বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরতে রাত হয়ে গেল, অথবা কেউ বাইরে বেড়াতে গিয়ে ট্রেন লেট করার জন্যে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরল, তাকে কি সারারাত বাইরে থাকতে হবে?

—আজ্ঞে তা কেন হবে? বীরবাহাদুরকে ডাকলে সেই খুলে দেবে। অবশ্য চেনা লোক হলে।

—এবং বীরবাহাদুর না থাকলে, এবং দরকার পড়লে তুমিই খুলে দেবে। তাই তো?

—হ্যাঁ সাহেব। এরকম দরকার তো সবারই হতে পারে।

—এবার ভেবে বল তো তোমাদের দুই দিদিমণির যে রাতে মৃত্যু হয় সে রাতে একজন 'বি' ব্লক থেকে 'এ' ব্লকে এসেছিল। যে এসেছিল তার পক্ষে ছাদ টপকে যাতায়াত করার কিছু অসুবিধা ছিল। এবং সে 'এ' ব্লকের ছাদ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেছিল। তার কথা একটু আগেই শুনেছ লেখাদেবীর কাছ থেকে। তোমার কি মনে হয় কথাটা সত্যি না মিথ্যে?

—আজ্ঞে সার, ঠিক খেয়াল হচ্ছে না।

—মিথ্যে কথা বলার কি পরিণাম হবে সেটা তুমি খানিকটা অনুমান করতে পার। বলা যায় না, ঐ দুই দিদিমণির খুনের দায়ে তুমিও ফেঁসে যেতে পার।

সুবোধের অবস্থা সবিতার মতোই হল। খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর কাচুমাচু মুখে বলল, —সত্যি বললে আবার পুলিসে অ্যারেস্ট করবে না তো?

—সত্যি বলার সময়টা এখনও পেরিয়ে যায়নি।

—এসেছিল বাবু! এমন ভাবে ধরল, তার ওপর চেনা মানুষ, খুলে দিয়েছিলুম। বলেছিলো আধঘণ্টার মধ্যে সে ফিরে আসবে। তা সাহেব, আধঘণ্টার আগেই চলে এসেছিলো।

—কথাটা আগে বললে আমাদের পরিশ্রম অনেকটা কমে যেত। আচ্ছা, এই নামটা দেখো তো। এই তো সেই?

নীলের হাতে ধরা কাগজে লেখা নামটা এক ঝলক দেখেই ও মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

—বেশ, এবার গিয়ে নিজের জায়গায় বোস।

সুবোধ নিজের চেয়ারে বসার পর নীল বলল,—তিনজন প্রত্যক্ষদর্শী আমার হাতে যার নাম লেখা আছে তাকেই শনাক্ত করেছেন, যে ঐ দিন রাতে সেই ছাদ ডিঙিয়ে নয়, মেইন গেট দিয়ে 'এ' ব্লকের ছাদে গিয়েছিল। আরও একটা মোক্ষম প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। সেটি হল তুহিনা এবং কাজল ছাড়াও গ্লাসে এবং বীয়ারের বোতলের গায়ে তৃতীয় জনের ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া গেছে। আমরা মিলিয়ে দেখেছি আমার হাতে ধরা নামের মালিকের হাতের ছাপ এবং অকুস্থল থেকে পাওয়া ফিঙ্গার প্রিন্ট একইজনের। এখন কথা হল, আপনাদের আগেই বলেছি, দুটি মেয়ের কেউই আত্মহত্যা করেনি। ইট ওয়াজ অ কেস অব মার্ডার। তাহলে কি যে ছাদে গিয়েছিল সেই দুজনকে মার্ডার করে এসেছে? এবং কাজ মিটিয়ে আবার সে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে গেছে?

নীলের ড্রইংরুমে বসে থাকা কারো মুখেই কোন কথা ছিল না। নীল আর একবার সবার দিকে তাকিয়ে বলল,—এই প্রশ্নের উত্তরে যাবার আগে মঞ্জিলবাবুকে দু একটা প্রশ্ন করতে চাই। মঞ্জিলবাবু, আপনি কিন্তু আমার কাছে কনফেস করেছিলেন, কাজলদেবীই চেয়েছিলেন তুহিনাকে খুন করতে। এবং তার জন্যে উনি পটাসিয়াম সায়নায়েড পর্যন্ত জোগাড় করেছিলেন।

—হ্যাঁ। আমি এখনও তাই বলছি।

—আপনি তাকে বারণও করেছিলেন।

—কাজল বেঁচে থাকলে এখনও সেই চেষ্টা করতাম।

—তার মানে সায়নায়েডে মৃত্যু হবার কথা ছিল তুহিনার। কিন্তু ঘটনাটা ঘটল ঠিক উল্টো।

—আমার একটা কথা পরে মনে হয়েছে।

—কি?

—দুজনে বীয়ার খেতে খেতে হয়তো কাজল তুহিনার গ্লাসে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। এবং সেটা কোনভাবে তুহিনা জানতে বা বুঝতে পেরে, কাজলের অজান্তে পাল্টানো গ্লাসটা আবার পাল্টে দিয়েছিল।

—প্রোব্যাবিলিটির দিক দিয়ে এটা হতে পারে। কিন্তু সে রাতে তুহিনাও মারা গিয়েছিল অন্য আর এক ধরনের আপাত নিরীহ একটি ওষুধের বিষক্রিয়ায়। এবং প্রমাণ পাওয়া গেছে, হেভি ডোজে অ্যান্টিডায়াবেটিক পিল লিকুইড ফর্মে নিয়ে এসে তুহিনাও সে রাত্রে কাজলকে খুন করার ইচ্ছে নিয়ে গিয়েছিল। যে শিশিতে সে লিকুইডটা তৈরি করে সে শিশিটা ছাদ থেকেই পাওয়া যায় এবং তাতে তুহিনার ফিঙ্গার প্রিন্ট মজুত। এটা ফোরেনসিক রিপোর্ট। এর চেয়ে কি এই নয়, সে যেকোন ভাবেই হোক কাজলদেবীর বীয়ারের গ্লাসে ঐ লিকুইড মিশিয়ে ছিল। সে তো জানতো, অত বেশি পরিমাণে একজন সুস্থ মানুষকে অ্যান্টিডায়াবেটিক পিল খাওয়ালে হাইপোগ্লাইসিমিয়ায় সে মারা যাবে। সে তো প্রথমেই কাজলের অজান্তে কাজলের গ্লাসে বিষাক্ত তরলটি ঢেলে দিয়েছে। তাহলে আবার সে কেমন করে সেই গ্লাসটা কাজলের দিকে এগিয়ে দেবে? ব্যাপারটা কি এরকম দাঁড়াচ্ছে না, এগুলেও মৃত্যু পিছলেও মৃত্যু?

—হ্যাঁ, তাই তো! মঞ্জিল আমতা আমতা করে বলে, ব্যাপারটা সেই রকম দাঁড়াচ্ছে। তাহলে কি কাজটা তৃতীয় কোন লোকের?

মঞ্জিলের এ ছাড়া আর কিছু বলারও ছিল না। সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে নীল বলে, —আহেলি তুমি কিছু বলবে?

এতোক্ষণ আহেলি মাথা নীচু করে বসে ছিল। নীলের কথায় মুখ তুলে আস্তে আস্তে বলে, —দাদা, আপনাকে যা কিছু বলার বা এই রহস্য সমাধান করার জন্যে আমরা যা যা করার সবই করেছি।

—সেই সবকিছু যে এঁরা তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাইছেন।

লেখা মিত্র বলে উঠলেন,—হ্যাঁ আহেলি, তুমি যদি নির্দোষ হও তোমার উচিত যা কিছু গোপন আছে সব খুলে বলা।

—আমি তো সবই নীলাঞ্জনদাকে জানিয়েছি। বেশ আরও একবার বলছি। তবে আপনাদের নতুন করে তেমন কিছু বলারও নেই। আপনারা সবাই জানেন, মেসোমশাই মানে কাজলদের ফ্যামিলিটা তছনছ হয়ে গেছে। কাজল চলে যাবার পর। মেসোমশাই পঙ্গু। অসিত মানে কাজলের ছোট ভাই

মেন্টালি অ্যান্ড ফিজিক্যালি ক্রিপল্ড। আর মাসিমা, তাঁরও অবস্থা ভালো নয়। হার্ট পেশেন্ট। এতো ধকল তিনি আর সহ্য করতে পারবেন বলে আমার জানা নেই। কাজলের মৃত্যুর পর পরিবর্তন এসেছিল চন্দ্রার মনে। বরাবরই সে একটু উদ্ধত। রাগী। কাজল চলে যাবার পর সে বাড়িতেই থাকতো না। কোথায় যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতো তা আমাকেও বলতো না। ফলে সকলকে ওদের দেখাশুনো, রান্নাবান্না সবই আমায় করতে হত। সত্যি কথা বলতে কি কাজলের চলে যাওয়াটা আমিও ঠিক সাদা মনে মেনে নিতে পারিনি। ওর মতো রেসপনসিবল্ মেয়ের এভাবে মৃত্যু আমাকেও ভাবাচ্ছিল। তার তুহিনাকে আমি কোনদিনই বিশ্বাস করিনি। কাজলের মুখে তুহিনার বাবা সম্বন্ধেও কিছু সন্দেহজনক কথাবার্তা শুনেছিলাম। এরই মধ্যে নীলাঞ্জনদা একটা কথা বলে এসেছিলেন। কাজলের ডায়েরি লেখা অভ্যাস আছে কি না আর থাকলে সেটা কোথায়?

না ডায়েরি নয়। আমি একটা খাতা পেয়েছিলাম। অসিতের ক্লাস ফাইভের পুরনো রাফ্ খাতা। অসিতের পড়াশুনো বন্ধ হয়ে যাবার পর ঐ খাতা আর কারো প্রয়োজনে লাগেনি। অনাদরে বই খাতার সঙ্গে পড়ে থাকতো। চন্দ্রা না থাকা কালীন সময়ে সময়ে কাজের অবসরে ডায়েরি খুঁজতে খুঁজতে এ খাতাটা আনমনে খুলে ফেলেছিলাম। তাতে ছিল কাজলের কিছু কিছু অসংলগ্ন লেখা। ওটা পড়ার পরই আমি নীলাঞ্জনদার সঙ্গে দেখা করি। খাতাটা ওনার হাতেই তুলে দিই। এরপর বাকিটা নীলাঞ্জনদাই বলবেন। আমার আর কিছু বলার মানসিকতা নেই।

আহেলি চুপ করে যায়। নীল নিজের বুক শেলফ থেকে একটা বড় পুরনো আধ ছেঁড়া খাতা নিয়ে এসে বললে,—এই খাতায় কয়েকটা মারাত্মক কথা লেখা আছে। এটা না পেলে অনেক আনসলভ্ড্ কেসের মতো এটাও আনসল্ভ্ড্ই থেকে যেতো।

লেখা মিত্র ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি প্রায় ধমকের ভঙ্গিতে বললেন,- আপনার সেই তৃতীয় ব্যক্তি কে সেটা কি ঐ খাতা পড়লে বোঝা যাবে? যদি যায় তাহলে পড়ুন। [illegible] নামটা বলে দিন। আমি টেনশনের রুগী। টেনশন আর বাড়াবেন না।

নীল একটু হাসল। তারপর বলল,—হ্যাঁ, এ খাতা পড়লে আপনারা সেই তৃতীয় মিসচিভাস পারসনকে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন। কিন্তু আমি চাই, সে তার নিজের মুখেই সব কথা বলুক। এবং সেও চায় তার সব কথা সবার সামনে বলে নিজেকে দোষমুক্ত করতে না পারলেও, মানসিক যন্ত্রণা মুক্ত করতে পারবে। বেশ তাহলে তাকেই ডাকছি। দীপু, নীচ থেকে বিকাশবাবুকে বল ওকে নিয়ে আসতে।

মিনিট তিনেক সময় কেটে ছিল অখণ্ড নীরবতায়। এতই নীরবতা যে উপস্থিত প্রায় সবারই হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। লেখা মিত্র তো পুরো দু'গ্লাস জলই খেয়ে নিলেন ঢক্ঢক্ করে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়িতে বিকাশ তালুকদারের ভারি বুটের শব্দ শোনা গেল।

আগে দীপু, তারপর বিকাশ তালুকদার ঘরে ঢুকলেন। তারপরই যাকে দেখা গেল তাকে দেখেই লেখা মিত্র, ওহ্ মাই গড্ বলে গ্লাসের তলানিটুকু গলায় ঢেলে দিলেন।

—না, লেখা দেবী আপনার কিন্তু এতো চমকাবার কথা নয়। আপনি তো একেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেছিলেন।

—তাতে কি হল? সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়া আর দু-দুটো মানুষ খুন করা একই ব্যাপার নয়। নিজের হাতে খুন করা আর খুন হয়ে পড়ে থাকাটা দেখে ফেলা এক জিনিস নয়।

—হুঁ, তাও তো বটে। নীল এবার আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বলল, চন্দ্রা, তুমি এখানে এসে বস। এঁরা তোমার মুখ থেকে সব কিছু শুনতে চাইছেন।

—শোনাশুনির কি আছে, রুক্ষ, উদ্ধত ভঙ্গিতে চন্দ্রা প্রায় শ্লেষমেশানো কণ্ঠে উত্তর দিল, —আপনারা সবাই জেনে রাখুন আমিই ঠাণ্ডা মাথায় তুহিনাকে খুন করেছি।

নীরেন হালদার অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার তিনি বললেন,- কী বলছ তুমি চন্দ্রা? তুমি জানো এসব কথা সবার সামনে বলার কী মানে?

উদ্ধত ফণা সাপিনীর মতো ফোঁস করে উঠে চন্দ্রা বলে, --না জানার কিছু নেই। যা সত্যিই সেটাই বললুম। ফাঁসি হবে? এই ভেবে ভয়ে আমার কোন দুঃখ নেই। কেবল আফসোস একটাই যার জন্যে করলাম তাকেই বাঁচাতে পারলাম না। অথচ দিদির বেঁচে থাকাটা বড দরকার ছিল। আমার বাবা

মা ভাই এবার না খেতে পেয়ে মরে যাবে।

—কিন্তু, বিকাশ বেশ নরম গলাতেই জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কি ঘটেছিল যার জন্যে তুহিনা দেবীকে খুন করতে চেয়েছিলে?

সমস্ত চাপা রাগ এক সঙ্গে উগরে দিতে চন্দ্রা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, —ধরা যদি না পড়তুম, তাহলে ঐ ডাইনীর বাবাটাকে পর্যন্ত চিতায় শুইয়ে তবে আমার শান্তি হত। তুহিনা, সুন্দরী, সর্বগুণান্বিতা। না ও একটা ডাইনী। শয়তানী। ওর শয়তান বাবাটা আমার বাবাকে শেষ করে দিয়েছে। আমার মায়ের বুকের অসুখ বাড়িয়েছে। আর শয়তানীটা চেয়েছিল দিদিকেও খুন করতে।

—কিন্তু কেন? এবারও বিকাশ প্রশ্ন করেন, সেটা তুমি জানলেই বা কেমন করে?

—ভাইয়ের খাতায় দিদি মাঝে মাঝেই কি সব লিখতো। আর অন্যমনস্ক হয়ে নিজের মনেই কি সব বিড়বিড় করতো। সন্দেহ হওয়াতে একদিন দিদির অসাক্ষাতে সেই সব লেখা আমি খুলে পড়ি। আপনারা অনেকেই জানেন অহীন্দ্র রায়চৌধুরী দয়া দেখিয়ে দিদিকে চাকরি দিয়েছিলেন। না। তা নয়। আসলে বাবার কাছে থেকে দিদি সব জেনে গিয়েছিল যে অহীন্দ্র রায়চৌধুরীই ষড়যন্ত্র করে বাবাকে খুন করতে চেয়েছিল। পাছে দিদি প্রতিশোধকামী হয়ে ওঠে বা সব কিছু ফাঁস করে দেবার চেষ্টা করে তাই তার মুখ বন্ধ করার জন্যেই চাকরি দেওয়া। অবশ্য দিদির যা ক্যারেকটার ওর পক্ষে কিছু ফাঁস করে দেবার স্ট্যামিনাও ছিল না। তার ওপর সংসার ওরই মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে। সাপের গর্তে খোঁচা দিতে গেলে ছোবল খাবার আশঙ্কা থেকেই যায়। তাই দিদি হয়তো সে চেষ্টা কোনদিনই করতো না। কিন্তু বাপ আর মেয়ের মতলব ছিল অন্যকিছু। তুহিনা দিদির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে দিদিকে হাতে রাখতে চাইতো। তারপর হয়তো একদিন দিদিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিত। সেটা ঘটতে হয়তো আরো কিছুদিন সময় লাগতো। কিন্তু,

এসে পর্যন্ত মঞ্জিল হাতে গোনা কয়েকটা কথা বলেছিল। এবার আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলল,—আয়াম স্যরি চন্দ্রা, তোমার দিদির জীবনে আমি আসাতেই বোধহয় তার জীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল। তাকে চলে যেতে হল অকালে।

—না মঞ্জিলদা, প্রতিবাদ করে চন্দ্রা বলে, এতে আপনার দোষ কোথায়? আপনি উপলক্ষ মাত্র। আপনি তো আমাদের সবার ভালোই চেয়েছিলেন। এমন কি আমার চাকরি না হওয়া পর্যন্ত আপনি দিদির জন্যে অপেক্ষা করবেন বলেছিলেন। তাই তো আমি ডাইনীটাকে মারতে চেয়েছিলুম। নিজের হাতে তার গ্লাসে বিষ ঢেলে দিয়েছিলুম। কিন্তু, আমি ভাবতেই পারছি না ঘটনাটা এভাবে ঘটল কেমন করে?

নীল ধীরে ধীরে চন্দ্রার কাছে গিয়ে তাকে একটা চেয়ারে এনে বসায়। তারপর বলে,—আমি জানি চন্দ্রা তুমি একটা প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলে। আর চেয়েছিলে তোমার দিদিকে বাঁচাতে। কিন্তু তোমার দিদি কেন বাঁচল না সে সম্বন্ধে আমারও কিছু কোয়ারিজ আছে। আমার কয়েকটা প্রশ্নের ঠিক জবাব দেবে?

—বলুন আপনি কী জানতে চান?

—তুমি কী করে জানতে বা বুঝতে পারলে যে ঐ রাতেই তোমার দিদিকে খুন করার চেষ্টা হবে?

—বলতে পারেন খানিকটা আমার অনুমান। সাধারণত তুহিনা নিজের ঘরে বসেই ড্রিঙ্ক করতো। সঙ্গে থাকতো ওর বন্ধুবান্ধব। অবশ্য ইদানীং মঞ্জিলদাও যেতেন। মঞ্জিলদার যাওয়াটা দিদির ভালো লাগতো না। নিজের মনেই গুমরাতো। কিন্তু আমি জানতুম মঞ্জিলদা কখনোই দিদির সঙ্গে বেইমানি করবেন না। তুহিনা বা মঞ্জিলদাও দিদিকে ওখানে যেতে বলতো কিন্তু দিদি কোনদিনও মদ বা বীয়ার স্পর্শ করেনি। এটাই আমার বিশ্বাস ছিল। তাই মঞ্জিলদা ডাকলেও প্রথম প্রথম গেলেও পরে আর যেতো না। কিন্তু সবিতাদি এসে যখন খবর দিল ওরা মানে দিদি আর তুহিনা ওই দিন রাতে ছাদে বসে কি যেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে তখনই আমি একটা অঘটন কিছু ঘটতে পারে এমন আশঙ্কা করে নিয়েছিলুম। আমার আশঙ্কা কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিলে গেছে।

—কিন্তু তুমি বলছ কাজল নিরীহ এবং শান্ত স্বভাবের মেয়ে। তাহলে সে তুহিনাকে খুন করার জন্যে একটা ভয়ঙ্কর বিষ জোগাড় করেছিল, এটা তার চরিত্রের বিপরীত নয় কি?

—যুদ্ধ করতে করতে হেরে যাওয়া সৈনিকদের যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায় তখন তারা ভয়ঙ্কর

রকমের মরিয়া হয়ে ওঠে। দিদিও সেই জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তুহিনার কাছে হারতে হারতে দিদি একটা বিরাট জায়গায় জেতার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেটা তার নারী জীবনের পরম প্রাপ্তির জায়গা। অতিবড় শান্ত মানুষও মার খেতে খেতে একসময় নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। সেও অনবরত হেরে যাওয়া সৈনিকের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।

—কিন্তু তুমি জানলে কি করে তোমার দিদি পয়জনটা কোথায় রেখেছে?

—আহেলিদি আপনার হাতে একটা খাতা তুলে দিয়েছিল। সেটা নিশ্চয়ই পড়েছেন। দিদি একজায়গায় লিখেছিল, সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় লাগছে। ওই সিঁদুরে মেঘেই ও মরবে।

—হ্যাঁ পড়েছি। তোমার মায়ের পরিত্যক্ত সিঁদুরের কৌটোর মধ্যেই বিষ লুকনো ছিল, তাই না?

—হ্যাঁ। ওভাবে লেখাটা দিদির বোকামি। বা অতিরিক্ত টেনশন থেকেই নিজের অজান্তে লিখে ফেলেছিল, নইলে আমি জানতেও পারতাম না দিদির মনোভাব কি?

—বেশ, তারপর?

—সুবোধদাকে বলে বুঝিয়ে আমি ছাদে গিয়ে দেখলুম ওরা দুজনে মুখোমুখি বসে আছে। কিসব কথাবার্তাও হচ্ছিল। সামনে দুটো গ্লাসে ভর্তি বীয়ার। দেখেই আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। সরাসরি দিদিকে বলেছিলাম, —তোর লজ্জা করে না ভিখিরির মেয়ে হয়ে বড়লোকের সঙ্গে মদের গ্লাস নিয়ে বসেছিস?

দিদি কিছু উত্তর দেবার আগেই তুহিনা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছিল, —তুই এত রাত্রে এখানে এসেছিস কেন?

উত্তরে আমি বলেছিলাম,—সেটা তোমার জানার দরকার নেই। কিন্তু তুমি কেন আমার দিদিকে নষ্ট করছ? ওকে কেন মদ খাওয়া শেখাচ্ছ?

—বীয়ার মদ নয়। তোকে পাকামি করতে হবে না। তুই নীচে যা।

—আমি খুব একটা কচি খুকি নই। একটা কথা জেনে রাখ, গরিবের ঘোড়া রোগ সাজে না। আর কোনদিনও দিদিকে এসব খেতে ডাকবে না। চল দিদি, বলে দিদিকে নিয়ে নীচে চলে আসতে চেয়েছিলুম। হঠাৎ তুহিনা নরম গলায় আমায় বলেছিল, —একদিন একটু বীয়ার খেলে কোন রোগে ধরবে না চন্দ্রা। ঠিক আছে এটাই ওর শেষ খাওয়া। আর কোনদিন আমি ওকে খেতে বলব না।

বিশ্বাস করুন মিস্টার ব্যানার্জি ওর ওই একটা কথাতেই আমার সন্দেহ আরো দানা বেঁধে বসেছিল। ও বলেছিল এটাই ওর শেষ খাওয়া। আর তখনই আমি চরম ডিসিশান নিয়ে নিই। আমি বলেছিলাম, বেশ, ঠিক আছে, তোমরা খাও। খাওয়া শেষ হলে আমি দিদিকে নিয়ে এখান থেকে যাব। তুহিনা আর কিছু না বলে চুপ করে যায়। কিন্তু সমস্ত পরিবেশটা খুব থমথমে হয়ে যায়। কারো মুখে কোনো কথা নেই। এমনকি কেউ গ্লাসেও ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছিল না। ভেবে দেখলাম ওখানে থাকলে আমার উদ্দেশ্যটাই মাঠে মারা যাবে। কারণ তুহিনা যেরকম মেজাজি মেয়ে হয়তো বলবে ঠিক আছে আর মুড নেই। এবার যাওয়া যাক।

তুহিনা বসেছিল আমার দিকে পিছন ফিরে। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সিঁদুর কৌটোর সবটাই ওর গ্লাসে উপুড় করে আমি উঠে পড়ে বলেছিলুম, ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। কিন্তু আজই যেন শেষ দিন হয়। এর পর আমি চলে আসি।

খুব মনোযোগ দিয়ে নীল চন্দ্রার সব কথা শুনছিল। চন্দ্রা থামতেই ও বলল, —না চন্দ্রা,এখনও কোথাও একটা যে ফাঁক থেকে যাচ্ছে। খুব ভালো করে মনে করে বলতো, তুহিনার গ্লাসেই তুমি বিষটা ঢেলেছিলে?

—হ্যাঁ, আমার স্পষ্ট মনে আছে।

—তারপর আর কারো সঙ্গে কোন কথা বলোনি? কারো সঙ্গে না? একটু ভাব। মন দিয়ে মনে করার চেষ্টা কর।

চন্দ্রা মাথা নীচু করে গভীরভাবে কিছু ভাবার চেষ্টা করল। তারপর বলল,—নাহ্, তেমন কিছু মনে পড়ছে না। তবে তুহিনা তখন নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর ছাদে এলোমেলো পায়চারি শুরু করে।

—তারপর?

—তুহিনা যখন পায়চারি করছিল সেই ফাঁকে দিদিকে চুপি চুপি বলে এসেছিলাম, সাবধানে থাকিস, তুহিনা তোকে মারার প্ল্যান করেছে। নিশ্চয়ই তোর গ্লাসে কিছু মেশানো আছে। ওটা একদম ছুঁবি না।

—কিন্তু তুমি যে তুহিনার গ্লাসে বিষ মিশিয়ে দিয়েছ এটা কি তোমার দিদিকে জানিয়ে ছিলে?

—না তো!

—ঠিক আছে। আর তোমাকে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। আমার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি।

তারপর সবার মুখের দিকে তাকিয়ে নীল বলল,—আপনারা তো সবই শুনলেন। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কি ভাবে মেয়ে দুটির মৃত্যু হল।

লেখা মিত্র বলে উঠলেন,—না একেবারেই নয়। আমরা তো গোয়েন্দা নই। তুহিনার গ্লাসের পয়জন কাজলের পেটে গেল কি ভাবে? তাছাড়া কাজলের যে গ্লাস ছিল তাতে তো কেউ মুখই দেয়নি।

—হ্যাঁ দিয়েছিল। গ্লাসের গায়ে পাওয়া গেছে কাজলের ফিঙ্গার প্রিন্ট আর তার ঠোঁটের ছাপ পাওয়া গেছে গ্লাসের কানায়।

—তাহলে?

—ইয়েস তাহলে? এই মৃত্যু রহস্যের মেইন পয়েন্ট এখানেই। অনুমান নয়, এটাই আসল ঘটনা। আমার বন্ধু এবং সহকর্মী দীপু একদিন বিকাশবাবুর সামনেই আমার হাতে একটা চিরকুটে দুটো লাইন লিখে ওর সন্দেহের কথা জানিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, বাপের শত্রু অনেক সময় নিজের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। এখানেও তাই হয়েছে। তার বাপের শত্রুকে নিধন করার জন্যে চন্দ্রা নিজের হাতে বিষের কৌটো তুলে নিয়েছিল। দ্বিতীয় লাইনে দীপু লিখেছিল পাত্র বদল হয়ে যায়নি তো? ইয়েস, তাই হয়েছে। চন্দ্রা একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছিল। আর তারই মাসুল কাজলের মৃত্যু।

চন্দ্রা বিড় বিড় করতে থাকে,—ভুল? কি ভুল? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আসার সময় তুমি তোমার দিদির কানে কানে বলে এসেছিলে, তোর গ্লাসে বিষ মেশানো আছে। একদম খাবি না। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু একবারও বলনি, তুহিনার গ্লাসে আরও মারাত্মক বিষ মিশিয়ে দিয়েছ। সেটা যদি বলতে তাহলে কাজল কিছুতেই তুহিনার অগোচরে নিজের গ্লাসটা ওকে দিয়ে ওর গ্লাসটা নিজে নিতো না।

হঠাৎ আহেলি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। নীল ওর কাছে যেতেই ও বলল,—খাতাটা আপনাকে না দিলেই বোধহয় ভালো হতো দাদা।

—কেন? তুমি ঠিক কাজই করেছ।

—চন্দ্রার শাস্তি হলে ওদের সংসারটা যে একেবারে ভেসে যাবে। আসলে খাতার শেষের দিকে চন্দ্রার লেখাটা ছিঁড়ে ফেলা উচিত ছিল। কেন ও বোকার মতো লিখেছিল, দিদির আগেই তুহিনাকে আমি শেষ করে দোব?

—নাহ্ আহেলি, তাহলে তুমি ভুল করতে। আর কাজলের মৃত্যুর জন্যে সারাজীবন তোমার মনে থাকতো অনুশোচনা। কাউকে বলতেও পারতে না। অথচ মনে মনে চন্দ্রার ওপর তোমার থেকে যেতো সারাজীবনের ঘৃণা। বরং, ওর যাই শাস্তি হোক ফিরে এলে ওকেই আবার বুকে টেনে নিয়ে ভাববে তুমি ঠিক কাজই করেছ।

—শাস্তি কি ওকে পেতেই হবে দাদা?

—হ্যাঁ তাই, অপরাধ করলে শাস্তি পেতেই হবে। তবে আদালত এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অতোটা নিষ্ঠুর হবে না।

. .

একটু আগেই মঞ্জিল ফিরে এসেছে ওর ঘরে। এক চোট ভাদুরে বৃষ্টির মধ্যে ঝাঁ চকচকে বাইপাসের রাস্তা ধরে। চোখদুটো ঝাপসা হয়ে গেলেও স্টিয়ারিং ঠিক রেখেছিল। ঘরে ঢুকে প্রথমেই ও বালিশের নীচ থেকে শ্যামলা শ্যামলা ডাগর চোখের মিষ্টি হাসির ব্রোমাইড প্রিন্টটা চোখের সামনে তুলে এনে বিড়বিড় করল, —কেন? কেন আমায় তুমি বিশ্বাস করতে পারনি কাজল? আমি যে তোমায় কথা দিয়েছিলাম.....। আমি তো শুধু তোমাকেই ভালবেসেছি......।

.

———————